চতুর্থ বর্ষ

প্রথম ষাণ্মাসিক বর্ণানুক্রমিক

বিষয়ের সূচী

ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ

১৩৩১—'৩২

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুরুমন্ত্র (গল্প) — শ্রীমন্দাক্রান্তা দেবী	৬১
চণ্ডীস্তব (কবিতা) — জনৈক রাজবন্দী কর্ত্তৃক কারাগারে রচিত	৭৮
চিত্তচিতা — শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬২৪
চিত্তরঞ্জন — শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	৬৭৮
চিত্তরঞ্জন — শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৯
চিত্তরঞ্জন — ডাঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি	৭৭০
চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি — শ্রীকুমুদবন্ধু সেন	৬৮১
চিত্তরঞ্জনের কাব্যপরিচয় — শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী	৭৪৫
চিরন্তন (গল্প) — শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫৬
চোর (গল্প) — শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	২১৩
চৈত্রে	২৬৩
ছিটে ফোঁটা	
(১) মদন ভস্মের পর — শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়	১২৩
(২) কিমাশ্চর্য্যম্	১২৪
(৩) আত্মীয়তা	১২৪
(৪) উদ্দেশ্য	২৬২
(৫) বারমেসে	২৬০
(৬) সদ্ব্যয়	২৬৩
(৭) ইণ্ডিয়ান — "বনফুল"	৩৮৯
(৮) কবির প্রতি — "বনফুল"	৩১০
(৯) পাজি	৩১০
(১০) ঘোড়ারাম	৬৬০
(১১) চালক ছাত্র	৬৬১
(১২) অমর হইবার উপায়	৬৬২
(১৩) প্রশ্নোত্তর	৬৬১
জয় ও পরাজয় (কবিতা) — শ্রীরেণুকা দাসী	৫০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাপানের সামাজিক প্রথা — শ্রীআর, কিমুরা	
জাতি ও শিল্প — শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
জাতিরক্ষা (গল্প) — শ্রীকিশোরীলাল দাশগুপ্ত	
জাতিভেদ – ধর্ম্মে—কর্ম্মে — বিজয়চন্দ্র মজুমদার	
জাতিভেদ—স্বদেশে — শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	২০৩
জীবন যাত্রা (গল্প) — শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	
জীবের নিত্যতা — শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল	
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
জ্যৈষ্ঠে	
তন্ত্রোক্ত দেব-দেবী-চিত্র — শ্রী[illegible] শেঠ	
তর্পণ (কবিতা) — শ্রীসাহানা দেবী	
তিলক চরিত — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	৪৪, ১৩৮, ৩৮১
তৃণফুল (কবিতা) — শ্রীসতীশচন্দ্র রায়	
দলাদলি (গল্প) — শ্রীকৃত্তিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
দলের কথা — শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	
দুকুল হারা (কবিতা) — শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী	
দুটি সরাই (গল্প) — শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	
দুদিক্ (কবিতা)	
দেবত্র (উপন্যাস) — শ্রীনিরুপমা দেবী	১০৭, [illegible], [illegible]
দেশবন্ধু — শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	

সূচীপত্র

লেখক সূচী

চিত্রসূচী

ফাল্গুন

চৈত্র

চিত্রসূচী

ফাল্গুন

চৈত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

ফাল্গুন

প্রথমার্দ্ধ
১ম সংখ্যা

দলের কথা

দলাদলি জিনিষটা যে ভাল নয় সে কথা কে না জানে। অথচ কাজ হাসিল করিতে হইলে দলটা একটা ভয়ানক কাজের জিনিষ। যে দল বাঁধিতে পারে সেই সংসারে জিতিয়া যায়, যে পারে না তার ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য যতই থাকুক, তার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয় না। একতায় যে অশক্তের শক্তি হয় একথা প্রমাণ করিতে বিষ্ণুশর্ম্মার বচন উদ্ধার করিবার প্রয়োজন হয় না।

বৌদ্ধধর্ম্মে 'সঙ্ঘ'কে দেবতা এবং ধর্ম্মের সঙ্গে সমান আসনে বসান হইয়াছে—ইহা ত্রিরত্নের একরত্ন। যত বড় ধার্ম্মিক তুমি হও না কেন, ধর্ম্ম ও বিনয়ের উপর যত বড় শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা তোমার থাকুক না কেন, সঙ্ঘের প্রতি যদি তুমি সমান শ্রদ্ধাবান ও হিতকামী না হও তবে তুমি সদ্ধর্ম্মী নও। এমনি করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই তথাগতের ধর্ম্ম সমগ্র এসিয়ায় এত বড় একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তেমনি খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টের উপদেশ যতদিন পর্য্যন্ত কেবল একটি মহাপুরুষ বা অবতারের গৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন তাহা খুব সামান্যই প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল। যখন church আসিয়া ধর্ম্মের পাশে পূজার আসন গ্রহণ করিল তখন হইতে ইহার প্রসারের আর সীমা রহিল না।

পক্ষান্তরে প্লেটোর মত অতবড় তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ—যা তত্ত্বাংশে খৃষ্টধর্ম্মের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া খৃষ্টানেরাও বিবেচনা করিবেন না—তাহা পণ্ডিত সমাজে যত শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করুক না কেন,

জগতে খুব বিস্তৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আমাদের দেশেও শঙ্করের বেদান্ত যদিও তত্ত্ব হিসাবে অনেক ধর্ম্মমতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু তাহা ধর্ম্মরূপে কোথাও পরিগৃহীত হয় নাই—ইহা পণ্ডিত সমাজে তর্ক ও বিচারের বিষয় মাত্র রহিয়া গিয়াছে। প্লেটো বা শাঙ্কর বেদান্ত লইয়া যে একটা এমনি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে নাই, ইহা যে তার অন্যতর কারণ তাতে সন্দেহ নাই। প্লেটোর দর্শন বা শাঙ্কর বেদান্তও যে একটা পরিপূর্ণ ধর্ম্মমত ও উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তি হইতে পারে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। তাহা যে হয় নাই, কিম্বা গৌণভাবে অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে আংশিকভাবে মাত্র হইয়াছে ইহার একটা বড় কারণ এই যে কোনও বড় একটা দল ইহাদিগকে নিজেদের সাধনের ভিত্তি করিয়া লয় নাই। কাজেই দল জিনিষটা কেবলই নিন্দার বিষয় নয়। সংহতি একটা বিশিষ্ট শক্তি, আর সে শক্তি যে গড়িতে বা পরিচালন করিতে পারে সে সমাজের প্রভূত হিতকারী হইতে পারে।

এমনি এক একটা দল বাড়িয়া উঠিয়াই সমাজ বা জাতি গড়িয়া উঠে। আর সেই জাতিই প্রকৃত সমৃদ্ধি লাভ করে যার ভিতর দল বাঁধিয়া লোকে সমাজের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়। ভাল করিয়া দল বাঁধার নামই organisation, আর মানুষ যে সমাজে টিকিয়া আছে তার মূলই এই যে তাদের সহস্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নানা দলের ভিতর দিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া এক শক্তির সৃষ্টি করে। প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া থাকিলে সমাজ হয় না ;—স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে দলের পর দলের ভিতর দিয়া গাঁথিয়া তুলিয়া যদি সকলকে এক করিয়া গড়িয়া তোলা যায় তবেই সমাজ হয়। আর যে সমাজে যত organisation বেশী সে সমাজ তত শক্তিমান।

বাঙ্গলায় ও ভারতে আজ দল বাঁধা জিনিষটা খুব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যে যেখানে পারিতেছে দল বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। কেউ বা এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছে, কেউ করে নাই। যে দল সব চেয়ে সুনিয়ন্ত্রিত তাহারা আর সকলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

অনেকের মতে এটা নিছক দলাদলি, সুতরাং বড়ই নিন্দার কথা। নিন্দার কথা যে এই সব দলের ভিতর মোটে নাই সে কথা বলিতে চাই না, কিন্তু ইহার ভিতর মস্ত একটা আশার কথা আছে। যদি আমরা উৎকট স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই স্থায়ী এবং সজীব দল গড়িয়া তুলিতে পারি তবে তাহাতে আপাততঃ যতই সংঘর্ষ হউক না কেন, তার শেষ ফল যে মঙ্গলময় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই।

দলাদলি না করিয়া যদি সবাই আমরা একদল হইতে পারিতাম, জাতীয় উন্নতি লাভের পথে যদি সবাই এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া যাত্রা করিতে পারিতাম তবে খুব লাভ হইত সন্দেহ নাই। একদিন সে দিন হয়তো আসিবে। এই দল বাঁধাই এ বিষয়ে একটা প্রকাণ্ড আশার কথা। কিন্তু সে দিন যে এখনও আসে নাই সে কথা অস্বীকার করিলে আমরা কেবল বঞ্চনা করিব। যেখানে একপ্রাণ একমন্ত্র নাই, সেখানে জোর করিয়া একতার দাবী করা

হয় প্রকাণ্ড ভণ্ডামি, না হয় মূঢ় অন্ধতা। যেখানে বিরোধ আমাদের অন্তরে চিরকাল বাসা করিয়া আছে সেখানে সে বিরোধের অস্বীকারই তাহা দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। সে বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে, প্রত্যেক পক্ষে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার ফলেই ক্রমে এমন একটা সমন্বয়ের পথ আবিষ্কৃত হইবে যাহা এ বিরোধটা চাপিয়া রাখিয়া কোনও দিনই আবিষ্কার করা যাইত না।

সংসারের নিয়মই এই। জগৎ এই নিয়মে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিরোধ ছাড়া কোনও দিনই সমন্বয় হয় না। Antithesis নহিলে Synthesis হয় না, differentiation ছাড়া integration হয় না। কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের কোনও প্রকৃত বিরোধ নাই। যে সব বিরোধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে তার সমন্বয় এত সহজ এবং সেই সমন্বয়ের ভিত্তির উপর এক হিন্দু মুসলমান দলের প্রতিষ্ঠা এত সহজ যে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে কেন তাহা হয় না। আমি এ বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি, সে সব কথার এখানে পুনরাবৃত্তি করিব না।

কিন্তু কালধর্ম্মে এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদিগকে তাঁহাদের বিরোধী বলিয়া মনে করেন, এবং হিন্দুদের ভিতরও ঠিক এই রকমের একটা ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কি কারণে এমন হইয়াছে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

চার বৎসর পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল, হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধ অস্বীকার করিয়া সকলকে একদলে বাঁধিবার। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য কথাটা মুখে মুখে এত প্রচার হইয়াছিল যে যেন আমাদের ভিতর হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বলিয়া কোনও বস্তুই নাই। কোনও বিরোধের কথা কেউ তোলে নাই; হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের কি কি অভিযোগ আছে, সে কথা তাঁরা বিস্তারিত করিয়া বলেন নাই। হিন্দুর পক্ষে তার কি জবাব আছে এবং হিন্দুর মুসলমানের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে সে কথাও কেউ তোলে নাই।

কিন্তু তাহাতে প্রকৃত একতা লাভ হয় নাই। তার অনেক দিন পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানে এ বিরোধ স্বীকৃত হইয়াছিল। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দল বাঁধার একটা আশ্চর্য্য ফল হইয়াছিল। ক্রমে হিন্দু ও মুসলমান কংগ্রেস ও লীগের সভ্যেরা দেখিলেন যে তাঁদের মধ্যে পরস্পর সাহচর্য্যের একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, আর তাঁদের বিরোধ যাহা লইয়া তাহার সমন্বয় অত্যন্ত সহজ। তাহার ফলে হইল লক্ষ্ণৌয়ের সন্ধি।

লক্ষ্ণৌয়ের সন্ধি যে হিন্দু মুসলমানের সঙ্ঘর্ষ চিরদিনের জন্য দূর করে নাই, তাহার পরেও যে নানা দিক দিয়া বিরোধ মাথা তুলিয়াছে তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কথা এই যে, লক্ষ্ণৌ সন্ধির ভিতর উভয় পক্ষের পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ছিল না এবং সন্ধিটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সে সন্ধি যাহাদের ভিতর হইয়াছিল তাহাদের হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবার কোনও অধিকার ছিল না। কারণ হিন্দু বা মুসলমান কেহই রীতিমতভাবে দল বাঁধিয়া উঠে নাই, কয়েকজন মাত্র হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমান একত্র বসিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমস্ত মুসলমান ও সমস্ত হিন্দু তাঁহাদের পশ্চাতে ছিল না। এক কথায়, সন্ধি করিবার কাল তখনও আসে নাই।

ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে যখন যুদ্ধ হইতেছিল তখন পাঁচ শত দেশভক্ত মহাপ্রাণ ইংরাজ এবং পাঁচশত দেশভক্ত মহাপ্রাণ জার্ম্মাণ যদি সুইজারল্যাণ্ডে বসিয়া একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতেন তবে সে সন্ধির সর্ত্ত যতই সঙ্গত হউক না কেন, তাহাতে যুদ্ধ না থামিয়া গেলে আশ্চর্য্য হইবার কোনও হেতু ছিল না। কিন্তু ভরসেইলে সঙ্ঘবদ্ধ ইংরাজ ও জার্ম্মাণ জাতির ভিতর যে অনেক অংশে অসঙ্গত ও ন্যায়বিরোধী সন্ধি হইল তাহাতে যুদ্ধ থামিয়া গেল। মুসলিম লীগের বাস্তবিক ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া সন্ধি করিবার কোনও অধিকার ছিল না, সে সন্ধির হিন্দু পক্ষেরও সেরূপ কোনও অধিকার ছিল না। কাজেই এখন অনেক হিন্দু ও অনেক মুসলমান, লক্ষ্ণৌএর সর্ত্তে অনায়াসে তাঁহাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

কিন্তু ঢাক ঢাক গুড়্ গুড়্ না করিয়া যদি হিন্দু পক্ষ ও মুসলমান পক্ষ স্ব স্ব অধিকার লইয়া তর্কে স্বতন্ত্রভাবে দল বাঁধিয়া এমন দুইটা স্বতন্ত্র সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান তার অন্তর্ভুক্ত হইত তবে তাহাতে স্থায়ী একতা লাভের সহায়তা হইত।

হয়ত তাহাতে দেখা যাইত যে যে রাজ-নৈতিক অধিকারের তালিকা লইয়া মুসলমানগণ দল বাঁধিতে অগ্রসর হইয়াছেন, অধিকাংশ মুসলমান তাহাতে সায় দেয় না। তাঁহাদের অধিকাংশ হয়ত হিন্দু দলের দাবীর তালিকায় সম্মতি দিতে প্রস্তুত হইতেন। তবে মুসলমানের স্বতন্ত্র সঙ্ঘ কালক্রমে আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িত। কিম্বা যদি মুসলমান দলের প্রস্তাবিত তালিকায় অধিকাংশ মুসলমানের সম্মতি থাকিত তবে কালক্রমে সমস্ত হিন্দুকে লইয়া একদল ও সমস্ত মুসলমানকে লইয়া একদল গড়িয়া উঠিত। প্রত্যেক পক্ষ নিজের মতামত যথাসম্ভব তর্ক যুক্তি প্ররোচনা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিত। উভয় দলের কাহারও মনের ভিতর কোনও কথা চাপা থাকিত না। দুই দলের ভিতর তর্কের যে কথাটা আছে তাহা নিঃশেষরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া সমস্যাটার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণরূপে প্রকট হইয়া পড়িত।

ইহাতে বিরোধ অবশ্যই হইত, কিন্তু বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষই ক্রমে অনুভব করিতেন যে এ বিরোধের তলায় একটা প্রকাণ্ড মিলনের ক্ষেত্র রহিয়াছে। সেই মিলনের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইবার জন্য দুই পক্ষই চেষ্টা করিতেন। এই প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যাইত যে বিরোধটা এমন কিছু নয় যাহার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সম্ভব নয়। সেই সমন্বয়টা আবিষ্কৃত হইত এবং তাহা গ্রহণ করিয়া উভয় পক্ষ তাঁহাদের পরস্পর বিরোধটাকে চিরদিনের মত একটা পরিপূর্ণ সমন্বয়ের ভিতর

নিঃশেষে ডুবাইয়া দিতে পারিতেন। তখন যে সন্ধি হইত তাহাতে ছাই দিয়া আগুন ঢাকিবার কোনও চেষ্টা থাকিত না—জোড়াতালি দিয়া একতার কোনও আয়োজন থাকিত না। তা ছাড়া সে সমন্বয় সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুতে ও সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমানে হইত। সে সন্ধি অস্বীকার করিবার অধিকার বা প্রবৃত্তি কাহারও থাকিত না।

এমন জগতে সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছে। মানুষে মানুষে, অন্ততঃ সমাজে সমাজে বিরোধ, প্রায়ই অত্যন্ত বিরোধ হয় না, সে একটা পূর্ণতর সমন্বয় লাভের প্রণালী মাত্র। সেই সমন্বয়ের পন্থা এই বিরোধ না হইলে হইত না। সুতরাং দল বাঁধার ফলে যদি বিরোধ হয়ও তবু সেটা যে অমঙ্গলের চিহ্ন হইতেই হইবে এমন কিছু নয়। সেই দল বাঁধা এবং সেই বিরোধই একটা বৃহত্তর একতা ও পূর্ণতর জীবন লাভের সোপান মাত্র হইতে পারে।

খুব একটা বড় কাজ আমাদের জাতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—সে কাজ আমাদের জাতির স্বাধীনতা সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লাভ। সে কাজ করিবার উপায় লইয়া যদি মতভেদ আমাদের থাকেই, তবে সে ভেদটাকে চাপা না দিয়া প্রকাশ হইতে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র মতের দল বাঁধিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন আছে। সুধু এই উপায়েই আমরা সেই চরম সমন্বয়ে উপনীত হইতে পারিব যাহার দ্বারা দেশের ও জাতির চরম মঙ্গল সমবেত চেষ্টায় অনায়াসে লাভ করা যাইবে।

যে ব্যক্তি রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টা করে সে প্রায়ই তাহার ফলে আরও বেশী গরীব হইয়া পড়ে। আমাদের জাতির চরম মঙ্গল অবিলম্বে লাভের জন্য একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততা অনেকের আছে। তাঁহারা বিলম্ব করিতে প্রস্তুত নন। ইঁহাদের মনের ভিতর স্বাধীনতা লাভের যে সংক্ষিপ্ত পন্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার দ্বারা তাঁহারা অবাধে তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত। ইহাতে তাঁহারা কোনও বাধা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তাই যেখানে বাধা আসিয়া দাঁড়ায়, সেখানেই তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়েন। এই শ্রেণীর লোক এই সব বিরোধে বিচলিত, ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। কেননা যে বিরোধ ও সমন্বয়ের পথে যাত্রা আমাদের বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান তাহা গন্তব্য স্থানে পেঁাছিবার সংক্ষিপ্ত সরল পথ নয়। ইহা দীর্ঘ পথ কিন্তু এ পথ নিশ্চয় ও নিরাপদ। তাড়াতাড়ি চলিবার যে পথ সে পথে প্রায়ই উল্টাদিকে গিয়া পৌঁছিতে হয়। এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের লক্ষ্য যাহা, সেখানে পৌঁছিতে হইবে সমস্ত জাতির—জাতির একটা টুক্‌রা লইয়া সেখানে পৌঁছাইলে চলিবে না। যে পণ্ডিত "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতির অনুসরণ করিয়া নিমজ্জমান সঙ্গীর দেহের অংশ বর্জ্জন করিয়া মাথাটি কাটিয়া নদীর পরপারে উঠিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিক তাঁর সহযাত্রীকে আংশিকভাবেও পরপারে পৌঁছাইতে পারেন নাই। যদি সমগ্র জাতিটা সঙ্গে না যায় তবে কোনও পথেই এক পাও অগ্রসর হওয়া হইবে না। জাতির যে অংশ পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, তাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি

ঠেলিয়া যাওয়ার স্বপ্ন বাতুলতা। সমগ্র জাতিকে এই বিজয় যাত্রার পথে টানিয়া লইতে গেলে জীব-ধর্ম্মের প্রথম সূত্র, বিরোধ ও সমন্বয়ের পথ মানিতে হইবে। তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। যেখানে যাত্রা-পথে বাধা আছে সেখানে চক্ষু বুজিলেই বাধাটা সরিয়া দাঁড়াইবে না, তাহাকে ডিঙ্গাইতে হইবে, না হয় ভাঙ্গিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইবে সত্য, কিন্তু এ বিলম্ব অপরিহার্য্য।

যাত্রা শেষ করিবার জন্য অতিরিক্ত তাড়া চলিবে না। দীর্ঘ-পথ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, সে পথে সকলে মিলিয়া যাইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ পথে যাত্রা করিতে গিয়া কেবল অনেক লোকের যে ঠেলাঠেলি হয় সেটা অস্বীকার করিলে যাত্রার পথ খোলসা হইবে না। তাহা মানিয়া লইতে হইবে। সকলের পথের দাবী স্বীকার করিতে হইবে, পরস্পরের বিরোধটা বুঝিতে হইবে, সে বিরোধ মীমাংসা করিয়া ক্রমে সবাইকে এমন একটা শ্রেণীর ভিতর বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, যাহাতে সবাই শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। দীর্ঘ সে যাত্রা, কিন্তু তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিবার উপায় নাই।

সুতরাং দল বাঁধার পথ জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় যাত্রার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সবচেয়ে সমীচীন পথ। ইহার ভিতর বিরোধ আছে বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না, ইহা অতিমাত্র সরল বা সংক্ষিপ্ত নয় বলিয়া হতাশ হইলেও চলিবে না। বিরোধকে হয় জয় করিতে হইবে, না হয় তাহাকে সমন্বয় দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইবে। জোড়া তাড়া দিয়া বিরোধ মিটাইবার বৃথা চেষ্টায় সময়ের অপচয় করা নির্ব্বুদ্ধিতা। "একতা, একতা" বলিয়া মন্ত্র জপ করিলেই একতা আসিয়া পড়িবে না। ইহা অর্জ্জন করিতে হইবে। শান্তি ও মৈত্রীর পথে সর্ব্বদা একতা লাভ করিতে পারিলে পৃথিবী স্বর্গ হইত। পৃথিবী স্বর্গ নয় বলিয়া বিরক্ত হইলে বা এই পরম সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করিয়া বিরোধের অত্যন্ত বর্জ্জন পণ করিলে, আমাদের অন্তরের গৌরব বাড়িতে পারে কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট লাভ হইবে না। বিরোধ যদি আসে, তাহাকে স্বীকার করিব। যথাশক্তি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইব, লক্ষ্য ও পথের দাবী সম্পূর্ণ মানিয়া যদি আপোষ করা সম্ভব হয় আপোষ করিব। কিন্তু তাহা দেখিয়া পিছ পা' হইব না। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ পথ অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তবেই একদিন সমগ্র জাতির সঙ্ঘবদ্ধসমন্বিত চেষ্টা সম্ভব হইবে। দল দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। ভাল করিয়া দল বাঁধিতে হইবে। কিন্তু কিসের দল ?

বৌদ্ধ সম্প্রদায় সঙ্ঘকে জীবনের একটা প্রধান উপাস্য করিয়া সফলতা অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু সুধু সঙ্ঘকে তাহারা অবলম্বন করে নাই। সঙ্ঘের দেবতা বুদ্ধ, তার বন্ধনসূত্র ধর্ম্ম। দেবতা ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিলে সঙ্ঘ অসার প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে, তখন সে সুধুই একটা দল, একটা ঘোঁট হইয়া দাঁড়ায়।

দেশের অভ্যুদয় লাভের জন্য যাঁরা সঙ্ঘ বন্ধন করিবেন, তাঁদের একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে দেবতা ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলে সঙ্ঘ অভীষ্ট লাভের সহায় না হইয়া পরিপন্থী হইয়া পড়িবে। কি সে দেবতা? কোন্ সে ধর্ম্ম?

জাতীয় সকল সঙ্ঘের এক দেবতা দেশ। সঙ্ঘের সেবায় অগ্রসর হইতে গিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে এই সমগ্র ভারত ভূমি—ত্রিশ কোটি মানব অধ্যুষিত এই পুণ্য দেশ তার দেবতা—সেই দেবতার অধ্যুষিত এই সঙ্ঘ। নিরন্তর এই সত্য সবার ধ্যান করিতে হইবে যে দেশ ছাড়া সঙ্ঘ নাই—দেশ হইতে বিযুক্ত সঙ্ঘের সেবা পাপ। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সঙ্ঘের জীবন নিরূপিত করিতে হইবে, তার প্রত্যেক কার্য্য দেশের অভ্যুদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মিত করিতে হইবে। যদি সে লক্ষ্য হইতে সঙ্ঘ ভ্রষ্ট হয় তবে সঙ্ঘকেও বর্জ্জন করিতে হইবে।

যতক্ষণ আমি বিশ্বাস করিব যে আমার দল, আমার সঙ্ঘ দেশের অভ্যুদয় লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে ততক্ষণই সঙ্ঘ আমার সেবার যোগ্য, ততক্ষণই আমি সঙ্ঘের কাছে আমার স্বতন্ত্রতাকে অবনত করিয়া দিব—কিন্তু যদি আমার অন্তরের নির্দ্দেশ এই হয় যে সঙ্ঘ দেশের উন্নতি মার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—বা সঙ্ঘ আপনি দেবতা হইয়া বসিয়াছে কিম্বা দেবতার আসনে উপদেবতাকে বসাইয়াছে, তখন আমার দল আর আমার থাকিতে পারে না।

সঙ্ঘের সেবার লক্ষ্য দেবতা আর তার উপায় হইল ধর্ম্ম। দেবতা ও ধর্ম্ম সঙ্ঘবন্ধনের সূত্র। দেশের অভ্যুদয় দলের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য লাভের জন্য যে বিশিষ্ট কর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই দলের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বা programme ছাড়া একটা গোষ্ঠী চলিতে পারে, একটা ঘোঁট করা যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃত জাতীয় দল গড়া যায় না। দেবতা হইতে বিযুক্ত সঙ্ঘও যেমন বর্জ্জনীয়, ধর্ম্মহীন বা ধর্ম্মচ্যুত সঙ্ঘও তেমনি অশ্রদ্ধার সহিত ত্যাগ করিতে হইবে।

দল বাঁধিতে হইবে কিন্তু দলের প্রত্যেকের একান্তভাবে বিশ্বাস করা চাই যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ই ইহার শেষ লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য লাভের একটী সুচিন্তিত বিশিষ্ট উপায়কে কেন্দ্র করিয়া সে দল বাঁধিতে হইবে। এমন দলের সেবায় জীবন পণ করিতে হইবে—নিজের সুখ সুবিধা ত্যাগ করিয়া, নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করিয়াও এমন সঙ্ঘের সেবা করিতে হইবে। এমন সঙ্ঘ দেশে যত গড়িয়া উঠে ততই মঙ্গল। কেন না সঙ্ঘের ধর্ম্মে যতই প্রভেদ থাকুক ইহার লক্ষ্যের প্রতি যদি ইহার আন্তরিক বিশ্বাস থাকে তবে বিভিন্ন দলের যে ধর্ম্মগত আপাত-বিরোধ তাহা আজ হউক কাল হউক এক চরম সমন্বয়ে পরিনিষ্ঠা লাভ করিবেই। দেশের অভ্যুদয়-কামী যত কৃতী হউন না কেন, তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক যত মহৎ হউক না কেন, তাঁর কর্ম্মশক্তি যত মহীয়সী হউক না কেন, যদি তাঁর সহকর্ম্মী বা সমধর্ম্মী না থাকে তবে তাঁর চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইতে পারে না। দেশের সেবায় ব্যক্তিগত সফলতা বা গৌরবের কোনও মূল্যই নাই—সফলতার

একমাত্র মানদণ্ড দেশের মঙ্গল। সঙ্ঘবন্ধন ছাড়া যেখানে যে মঙ্গল সুলভ নয়, সেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিয়াও দলকে বড় করা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং দল বা সঙ্ঘের খাতিরে স্বাতন্ত্র্যকে কতকটা সংবৃত করিয়া দেশের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। ব্যক্তির উপর সঙ্ঘের এ অধিকার স্বীকার না করিলে কোনও দল কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে সঙ্ঘের এ অধিকারের সীমা আছে। সঙ্ঘ ততক্ষণই সেবার দাবী করিতে পারে যতক্ষণ তাহাকে চরম লক্ষ্যের অনুকূল বিবেচনা করা যায় এবং যতক্ষণ সে তার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম অতিক্রম না করে। এই ধর্ম্ম বা দেবতাকে অতিক্রম করিলে দলের সঙ্গে কাজ করা না করা দলের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিচারসাপেক্ষ। স্বাতন্ত্র্যের এ দাবী অস্বীকার করিয়া যদি সঙ্ঘই প্রধান হইয়া পড়ে তবে হয় তাহা বাঁচিবে না, না হয় তাহার লক্ষ্য লাভ হইবে না। বৌদ্ধ সঙ্ঘ যখন বুদ্ধ ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়াছিল, Jesuit দিগের সঙ্ঘ যখন দেবতা ও ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া দলের অধিকারটাকে সবার উপর বড় করিয়াছিল তখনই তাদের পতন আরম্ভ হইয়াছিল। সঙ্ঘ দেবতা বা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতেছে কি না এ কথা বিচারের বিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীন বিচারের অবসর আছে; সেই স্বাধীন বিচারের দ্বারা সঙ্ঘের কার্য্য-প্রণালী আলোচনা করিবার অধিকার যদি কোনও সঙ্ঘ অস্বীকার করে, কিম্বা দলের লোক যদি এই স্বাধীন বিচারের অধিকার দলের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বিবেককে প্রসুপ্ত করিয়া অন্ধভাবে কেবল দলের অনুসরণ করে তবে দলটা হইয়া দাঁড়ায় অমঙ্গলের নিদান।

আমাদের দেশে দেশের সেবার জন্য যে সব দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের এই সব মৌলিক সত্যের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কোনও দলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যের ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত যে দলের লক্ষ্য কেবল দেশ না আর কিছু। দলের সঙ্গে কাজ করিবার সময় প্রত্যেকের মনে নিরন্তর এই জিজ্ঞাসা জাগ্রত রাখা উচিত; কারণ দল যখন শক্তিমান হইয়া উঠে তখনই তার শক্তির অপব্যবহার করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় বৌদ্ধদের মত নিরন্তর সঙ্ঘের সঙ্গে দেবতা ও ধর্ম্মের জপ—দলের প্রত্যেক কাজ তার লক্ষ্য ও ধর্ম্মের কষ্টি পাথরে নিয়ত যাচাই করা।

তা ছাড়া, আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে সুদূর লক্ষ্যের সম্বন্ধে একমত হইলেই দল সজীব হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। এক দেবতার উপাসক হইলেই সবাই এক হইয়া কাজ করিতে পারে না;—তাদের ধর্ম্মের ভিতর, মন্ত্রের ভিতর ঐক্য থাকা চাই। সুতরাং দলের একটা নির্দ্দিষ্ট, পরিষ্কার অনায়াসবোধ্য কর্ম্মপ্রণালী বা প্রোগ্রাম থাকা আবশ্যক। এই প্রোগ্রাম নির্দ্ধারণ একটা প্রকাণ্ড শক্তির কাজ। দেশের অভ্যুদয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ঠিক এই সময়ে কোন্ কোন্ নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে হইবে, ভবিষ্যতে কোন্ কাজ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এখন আমাদের দেশে যে সকল দল আছে ত'দের কাহারও ঠিক এই রকম বিশিষ্ট প্রোগ্রাম আছে বলিয়া আমি জানি না। প্রোগ্রাম নাম দিয়া যেসব কথা বলা হয় তাহার বেশীর ভাগই অত্যন্ত ভাসা ভাসা অত্যন্ত সাধারণগ্রাহ্য কথা। এক মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত নন-কো-অপারেশনের পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট concrete programme এ'পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই।

ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে এমন কিছুই কোনও দল বলেন না যাহার দ্বারা তাঁদের কোনও বিশেষ কার্য্য ঠিক পরিমাপ করা যায়। প্রোগ্রামের স্থিরতা না থাকায় দলের নেতারা যখন যা খুসী করিতে পারেন, দলের লোকের বা দেশের লোকের একথা বিচার করিবার অবসর হয় না যে তাঁরা সঙ্ঘ-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন কি না। ইহার ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না।

১৯২১ সনে নন কো অপারেশনের নাম করিয়া যে দল গড়া হইয়াছিল, সে দল এ তিন বৎসরের ভিতর যে সব কাজ করিয়াছেন বা সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি নাই। কোনও এক দলের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কাজের মধ্যে যে সঙ্গতি থাকিতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই; কিন্তু যাহারা একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম লইয়া কাজ আরম্ভ করে তাহাদের পক্ষে তিন বৎসরের মধ্যে এতগুলি প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর হয় না। ইঁহাদের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে দেশের অবস্থা বিবেচনায় যখন ইহারা যে কাজটা দেশের পক্ষে বা দলের পক্ষে ভাল বিবেচনা করিয়াছেন তখন তাহাই করিয়াছেন কোনও ধরা বাঁধা প্রোগ্রামের তোয়াক্কা রাখেন নাই।

ঠিক এই কথাটাই দোষের নয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিলে ইহার ফল বিষময় হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা—এবং সে রকম কুফল ফলিবার চিহ্ন যে মোটে প্রকাশ হয় নাই এমন বলা যায় না। যদি দল থাকে অথচ সে দলের কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম না থাকে, দলের নেতা বা নেতৃগোষ্ঠীর বিবেচনা মাত্রই প্রত্যেক কাজের একমাত্র নিয়ামক হয়, তবে প্রায়ই দেখা যায় দলটাই প্রধান হইয়া পড়ে আর তার তথাকথিত লক্ষ্য বা ধর্ম্ম অনেকটা পিছনে পড়িয়া থাকে। দলটা কিসে পুষ্ট হইবে, কি করিলে দলের লোক সন্তুষ্ট থাকিবে ইহাই হইয়া দাঁড়ায় প্রধান সাধনার বিষয়। আর সকল ব্যাপারে, দেশের ও সমাজের কাছে দলের প্রতিষ্ঠা ও অধিকার রক্ষা করাই সব চেয়ে বড় কথা হইয়া পড়ে। সঙ্ঘধর্ম্ম যদি না থাকে তবে কখন অলক্ষ্যে এমনি করিয়া দল দেশকে সরাইয়া দেবতার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে তাহা সব সময় টের পাওয়া যায় না। তখন সঙ্ঘবন্ধনটা কেবল মাত্র দলাদলিতে পর্য্যবসিত হয়।

আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানের দলগুলির ভিতর কোনও প্রোগ্রামের স্থিরতা না থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন দলের স্বাতন্ত্র্যের কোনও লিঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রস্তাবিত কর্ম্মপ্রণালীর নিরুপাধিক বড় বড় কথাগুলি পাশা পাশি দাঁড় করাইলে বুঝাই দায় হয় যে দলে দলে প্রভেদ

কিসের? কাজেই ভিন্ন ভিন্ন দলের বিরোধ যাহা হয় তাহা প্রায়ই তুচ্ছ কথার আড়ালে ব্যক্তিগত বিরোধে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে বিচ্ছেদ হয় কিন্তু সমন্বয় অসম্ভব হয়। কারণ যাহাতে বিরোধের সমন্বয় হইবে সে বিরোধ হইতে গেলে বিভিন্ন দলের ভিতর কোনও সহজবোধ্য সুস্পষ্ট মতপার্থক্য থাকা দরকার। এক পক্ষ তার মতের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিবে, অপর পক্ষ তাহার বিরুদ্ধ যুক্তি উপস্থিত করিবে—এমনি করিয়া উভয় পক্ষের বিচার ও উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক প্রয়োগ হইতে জন্মিবে সমন্বয়। যে পর্য্যন্ত ইহা না হয়, যে পর্য্যন্ত দলে দলে প্রোগ্রাম লইয়া তর্ক ও বিরোধ না হয় সে পর্য্যন্ত বিরোধ কেবল বিচ্ছেদেই পর্য্যবসিত হইবে, সঙ্ঘ বন্ধন কেবলমাত্র দলাদলিতে দাঁড়াইবে।

এ কথা অনেকে অস্বীকার করিতে অগ্রসর হইবেন। তাঁরা বলিবেন এত যে তর্ক হইতেছে, দিনের পর দিন ভিন্ন ভিন্ন দলের খবরের কাগজে এত যে আলোচনা হইতেছে ইহা কি সব ভুয়া? ইহাতে কি পক্ষগণের পরস্পর মতবিরোধ সূচনা করে না?

বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে আমার এইরূপই বিশ্বাস। যে সব কথা লইয়া ঝগড়া হইতেছে সে সবই কথার কথা, তার ভিতর খাঁটি তর্ক খুব বেশী নাই

নন-কো-অপারেশনের যে নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম লইয়া মহাত্মা গান্ধী দল বাঁধিয়াছিলেন তাহাতে প্রকৃত মত-বিরোধের বীজ ছিল। কিন্তু সে বিরোধ আজ মিটিয়া গিয়াছে। আজ কেহই ঠিক সে প্রোগ্রামে আস্থা স্থাপন করেন না। এখন নন-কো-অপারেশন স্থুল স্থগিত হইয়াছে, কাউন্সিলে সবাই প্রবেশ করিয়াছেন, স্কুল কলেজ ভরিয়া উঠিয়াছে, উকীল ব্যারিষ্টার আবার কাজ সুরু করিয়াছেন।

কাউন্সিলে গিয়া কি করা হইবে সে সম্বন্ধে স্বরাজ্য দল একটা কথা বলিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মতবিরোধের অবসর ছিল, তাঁরা বলিয়াছিলেন যে তাঁরা গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক ব্যবস্থায় বাধা দিবেন, বজেটের প্রত্যেক অঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁরা ভোট দিবেন। এ মত তাঁরা কার্য্যে পরিণত করেন নাই; কাজেই ইহা লইয়া মতবিরোধ হয় নাই।

যে কথা লইয়া তর্ক হইয়াছে তার একটা নমুনা এই যে জাতীয় দলগুলির শেষ লক্ষ্য কি? এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভ, কেহ বলিয়াছেন, বৈধ উপায়ে স্বরাজ্য লাভ, কেহ বলেন, বৈধ উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর থাকায় কলোনিগুলির মত স্বাধীনতা লাভ আমাদের লক্ষ্য। ইহা লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। যে স্থলে সকল পক্ষই মানিয়া লইতেছেন যে বর্ত্তমানে বিধিসঙ্গত আন্দোলন দ্বারাই স্বরাজ্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে, সেখানে এ তর্ক নিতান্তই একটা কথা লইয়া তর্ক ছাড়া কি বলিব? যদি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ সমস্যা কোনও দিন উপস্থিত হয় যে স্বাধীন ভারত ইংলণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবে না বিচ্ছিন্ন হইবে, তখন এ কথা লইয়া গুরুতর মত বিরোধের অবসর জন্মিবে। আজ এ তর্কের কোনও সার্থকতা নাই।

আজকালকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের মত পার্থক্যের কথা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাহা তাঁহাদের প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

তেমনি হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, যে সব কথা লইয়া তর্ক ও মতভেদ তাহা একেবারে তুচ্ছ অগ্রাহ্য। একটা মতভেদ চাকরী বাটোয়ারা লইয়া। এ কথা লইয়া তর্ক বোধ হয় কেবল আমাদের দেশেই সম্ভবে। চাকরীতে লোক নিযুক্ত করিবার একমাত্র নিয়ামক জনসাধারণের হিত। যাহাতে দেশের লোক সব চেয়ে ভাল কর্ম্মচারী পায় তাহাই দেখিতে হইবে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলের সমান স্বার্থ। যারা যোগ্য তাদের মধ্যে কয়জন হিন্দু বা কয়জন মুসলমান চাকরী পায় বা না পায় তাহাতে তাহাদের বাপ দাদা খুড়া-জেঠার স্বার্থ থাকিতে পারে, হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ নাই। তেমনি কোরবানিতে গরু জবাই বা মন্দিরের কাছে বাজনা করা প্রভৃতি যে সব তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিরোধ হইয়াছে তাহা রাজনীতির দিক হইতে একেবারে অশ্রদ্ধেয়।

এমন হইলে চলিবে না। এই সব সূত্র ধরিয়া দল বাঁধা হয় সফল হইবে না, না হয় তো সঙ্ঘ ধর্ম্ম ও দেবতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনি প্রধান হইয়া বসিবে। সঙ্ঘবন্ধন দ্বারা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের হিতসাধন আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আমাদের একটা প্রকৃত রাজনৈতিক সমস্যামূলক এক একটা প্রোগ্রাম লইয়া এক একটা দল বাঁধিতে হইবে এবং প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ প্রোগ্রামে আস্থাবান হইয়া একান্তভাবে তাহা অনুসরণ ও দেশে সেই মতবাদ প্রচার করিতে হইবে। এমনি করিয়া যে দল গড়িয়া উঠিবে তাহাতে দেশের চরম উন্নতি সাধিত হইবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মনু-স্তোত্র

(১)

নর-কুল-প্রতিষ্ঠাতা, লোক-পিতা, হে আদিম মনু!
পঞ্চ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে যবে তুমি বহি' খর্ব্ব তনু
আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ হনু, পূর্ণ নগ্ন দেহ,
শৈল-কক্ষে, বৃক্ষ-শাখে, রচেছিলে কুরক্ষিত গেহ,
সে শুভ মুহূর্ত্ত স্মরি' তব অস্থি করিয়া সন্ধান,
জ্ঞান-পূত-শ্রাদ্ধ করে ভক্তিভরে তোমার সন্তান।
এ যুগের নর-দেহে ভিত্তিরূপে তব জীব-অণু;
প্রণমি তোমার নামে হে রোমশ, হে পিঙ্গল মনু।

(২)

বজ্রনাদে, দাবদাহে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে, অন্ধকারে,
সশঙ্ক বিস্ময়ে, স্বল্প অনুভবে, ভেবেছিলে যাঁরে,—
তাঁহার চিন্তায় মোরা তেমনি ত খুঁজি অজানায় ;
যুগ-যুগান্তের পরে তুমি আমি একই সীমানায়।
দীর্ঘতর তনু মোর, বাড়িয়াছে মস্তিষ্ক-প্রসার,
আজিও না বুঝি তবু, কি যে পূজি সার বা অসার ;
অন্ধকারে পথভ্রান্ত,—আজি মোর চূর্ণ অহঙ্কার ;
হে শুদ্ধ সরল মনু, হে বর্ব্বর, করি নমস্কার।

(৩)

যে পিপাসা, ভীতি, আশা, উপভোগে লিপ্ত দুঃখ সুখ,
লোভে, ক্ষোভে, তৃপ্তি রসে উদ্বেলিত করেছিল বুক,
তাদের প্রমত্ত ধারা তেমনি অশ্রান্ত বহে ভবে ;
আদিমাতা অদিতিকে সঙ্গে লয়ে দেখ বসি নভে।
হে মনু-মনাবী শোন, এ যুগে সে অতীতের গান,
রচে যাহা হাস্য, লাস্য, রোদন, বেদন, অভিমান।
মৃত্যুর রহস্য সেই ছায়াপাতে বিশ্ব করে ম্লান ;
তোমা সম ভেবে সুখী,—সে ছায়ায় চির-শান্ত প্রাণ।

(৪)

তোমার স্মরণ-পুণ্যে পলকেতে হয় মোর জ্ঞাতি—
শ্বেত-পীত-কৃষ্ণ বর্ণ যত আছে জগতের জাতি।
কে ব্রাহ্মণ, কে বা শূদ্র, কে অন্ত্যজ, কে বন্য-সন্তাল* ?
বন্যকে যে ঘৃণ্য ভাবে সেই শূদ্র অধম চণ্ডাল।
সভ্যতার অহঙ্কার—তরঙ্গের শিরে কাঁপা ফেণা ;
বারিধির তলে স্থির একই প্রাণ,—প্রাণে যায় চেনা।
মনু-মনাবীর নামে বিশ্বধামে ভাঙ্গি ব্যবধান ;
শ্বেত-পীত-কৃষ্ণে ব্যাপ্ত একই রক্ত, একই ভগবান।

———

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

* Santal

পল্লীগানে বাঙ্গালী সভ্যতার ছাপ

পল্লীগান বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। বাঙ্গালীর যখন স্বাস্থ্য ছিল, বাঙ্গালী যখন কেরাণীগিরির প্রলোভনে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত না, বাঙ্গালীর যখন অন্তরআকাশ আনন্দের বিকাশে ও নির্ম্মলতায় পূর্ণ ছিল তখনকার এই সম্পদ, এই আনন্দের দান, এই স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত গান নানাবিধ কষ্টের মধ্য দিয়া অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিয়াছি, এবং বাঙ্গালী সভ্যতার বিকাশের উপর ইহার যে কত ছাপ রহিয়াছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন। মানুষের মন যখন ভয়-ভাবনা হীন থাকে, যখনই অন্য কোন প্রকার চিন্তাকীট দ্বারা তার হৃদয়পল্লব জর্জ্জরিত হয়না, যখনই তার মন আনন্দে বসরা গোলাপের মত বিকশিত হয় তখনই তার সুঘ্রাণ, তার মাধুর্য্য রূপ ধ'রে আমাদের সম্মুখে আসে অর্থাৎ কবি ও শিল্পীর অতুল তুলির পরশলাভ করিয়া ধন্য হয়। সত্যই জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন "Poetry is the most intense expression of the dominant emotions and the higher ideals of age" এবং আরও নজির-স্বরূপ Blair এর কথায় বলা যাইতে পারে "Poetry is the language of emotions" (এই রকম অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। সুতরাং নজিরের ভারে আসল জিনিষের কথা চাপিয়া রাখিতে চাই না।) মানুষের মন যখনই আনন্দের বেদনায় মুহ্যমান হয় তখনই সে আনন্দদায়ক নব সৃষ্টি করে; আর আনন্দের বিকাশ বলিয়াই উহা চিরন্তন হইবার দাবী রাখে।

(২)

বাঙ্গালী সভ্যতা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজ সভ্যতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বাঙ্গালী সভ্যতার মধ্যে এই সব সভ্যতার ছাপ আছে, একথা অস্বীকার করিলে চলিবেনা। আর এই ছাপ সাহিত্যে বিশেষতঃ পল্লীগানে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সভ্যতা এই বাঙ্গালী সভ্যতার মূল, বৌদ্ধ সভ্যতা ইহার কাণ্ড, মুসলমান সভ্যতা ইহার শাখাপ্রশাখা এবং ইংরেজ সভ্যতা ইহার পত্র-পুষ্প-বিকাশ।

মুসলমান সভ্যতার ছাপ যে এই পল্লীগানে লাগিয়া রহিয়াছে তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝা যাইবে। আরবী এবং পারশী শব্দ সমূহই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আর তা ছাড়াও ভাবের রাজ্যেও ইহার প্রতিপত্তি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি গানের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করা যাউক।

"আল্লার কুদরতের পর খেয়াল কর মন ॥
একতনে হয় পাঞ্জা'তন',
কোন তনে আছেন আল্লা নিরাঞ্জন ॥
কোন তনে হয় মাতা পিতা,'
কোন তনে হয় মুরশিদ ধন ?
আল্লার কুদরতের 'পর খেয়াল কর মন ॥"

এই গানের ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ মুসলমানী। 'তন' পারশী শব্দ, অর্থ শরীর। মুসলমানের tradition এর সাথে পরিচয় না থাকিলে ইহা সহজে বোধগম্য হওয়া কঠিন এবং ইহার expressive কবিত্ব শক্তি ও association উপলব্ধি করা যায় না।

যাঁহারা এই সমস্ত গান রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্তরের মাধুর্য্য ও সুর ইহাতে রূপ পাইয়াছে। একটি গান পারশ্য কবি-কুল-প্রদীপ মওলানা জামী (রহমতুল্লা আলায় হে) র একটী কবিতার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। যথা :—

"মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জান গে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়॥
যে জন জেন্দা লয় খেলকা কাফন
দিয়ে তার তাজ তহবন,
ভেক সাজায়॥
মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়॥"

জামী—

"মানতুজে খাকেম্ ও খাক আজ জামিন,
হামা বেহ্ কে খাকী বুওয়াদ আদমী।"

আমি এবং তুমি মাটি হইতে সৃষ্ট, যদি মাটির মত হও তাহা হইলেই তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশ পাইবে। ঠিক এইভাব লইয়া পারশ্য কবি কুল-তিলক ঋষি হজরত মওলানা সাদী (রহমতুল্লা আলায় হে) অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া বিভিন্নদেশীয় অনেক নামজাদা কবির ভাবের সহিত এই সমুদয় অখ্যাত নামা ও অজ্ঞাত কবিদের রচনার ভাব একেবারে মিলিয়া যায়।

এই ত গেল ইহার সোজা দিকটা। এখন ইহার জটিল আধ্যাত্মিক দিকটার সামান্য একটু আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনা বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইবার আশা যাঁরা করেন, তাঁ'রা নিতান্তই নিরাশ হইবেন। এই কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবেনা যে এই গূঢ় আধ্যাত্মিক দেশের কথা মৌলবী সাহেবেরা যাকে তাকে শিখান না এবং যে সে শিখিবার উপযুক্ত পাত্রও নহেন, তবু কেমন করিয়া এই 'অক্ষর'-জ্ঞানহীন ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এই খানে একটি গান তুলিয়া দিতেছি।

জপরে তার নামের মালা না হয় যেন ভুল
গাঁথ ঐ নাম আপন গলায়।
দূরে যাবে দুঃখ জ্বালা
অন্ধকার হবে উজলা,—
এই দুনিয়ার মূল।

তুমি লায় লাহা ইল্লাল্লা বল,
ঐ আঁধার কাটে চক্ষু মেল,
এই ভবের হাটে ভুলনারে মহম্মদ রসুল।
মুহ্ অল ইস্‌বাত নফুয়লে নবি,
ও তোমার ফানা ফাল্লা যখন হবি,
মেছের শা কয় তবে হবি,
আল্লার মকবুল ॥" *

* এই গানটি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমুদয় টীকা টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ম্যাগাজিন 'কর্ত্তৃপক্ষের' অনুগ্রহে উদ্ধৃত করিতেছি। 'কর্ত্তৃপক্ষের' সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত বনওয়ারী লাল বসু এম, এ মহোদয়কে তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

(১) লায়ে লাহা ইল্লাল্লা—আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই। সাধনা কালে হিন্দুগুরু যেমন শিষ্যকে বিশ্বের মন্ত্র "ওঁ" ধ্যান করিতে উপদেশ দেন পীর সাহেবেরাও তেমনি ভিতরে বাহিরে এই কল্‌মা (মন্ত্র) জপ ও ধ্যান করিতে বলেন। প্রথমেই অবশ্য এই কল্‌মা জপ করা হয় না। প্রথম শুধু "আল্লাহ"—এই কথাটি মনে মুখে জপ করিতে হয়। যে নিয়মে এই সব ধ্যান করিতে হয়, তাহা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ নিষিদ্ধ।

(২) মুহ্ অল ইসবাত, 'নফি ইস্‌বাত' কথার অপভ্রংশ। ইহার ভাবার্থ 'লায়েলাহা ইল্লালা' দ্বারা নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং কল্পনায় সেই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের অসীম সৌন্দর্য্যময় অস্তিত্ব অনুভব করা।

(৩) নফুয়াল নবি, 'নফিয়ন্নবি' শব্দের অপভ্রংশ। ইহার আর এক নাম "ফানাফির রসুল" অর্থাৎ রসুলোল্লার (হজরত মহম্মদ দঃ) ধ্যান করিতে করিতে আত্ম বিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

(৪) এস্‌লাম ধর্ম্মমতে আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভক্তকে সাধনার তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ "ফানাফিশেখ" বা আপন পীরের সহিত লয়প্রাপ্তি। সত্য সনাতন নিরাকার মহাপ্রভুর দর্শন লাভ আকাঙ্ক্ষায় অবশ্য পীরের ধ্যান করিতে হয়। পীর ভক্তের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য লাভের সহায় মাত্র। প্রথম স্তর অতিবাহিত হইলে, ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই সিদ্ধিলাভের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সহায় রছুলোল্লার ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম "ফানাফির রছুল"। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রম 'ফানাফিল্লা' অর্থাৎ আল্লাতে মিশিয়া যাওয়া। বহির্জগতে ও আত্মিক জগতে যাহা কিছু সবাই আল্লার, সবই তাঁহার নাম গানে বিভোর। এইস্তরে উপস্থিত হইলে, সাধক আত্মজ্ঞানহীন হইয়া মহর্ষি মনছুরের (মহর্ষি মনছুর কবি মোজাম্মেলহক্ প্রণীত দ্রষ্টব্য।) মত "আনাল্ হক" বা অহং ব্রহ্ম বলিতে থাকেন। অনন্ত জ্ঞানময়ের সহিত মিশিয়া গেলে লোকের বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কি করেন, কি বলেন, সে জ্ঞান তখন তাঁহাদের থাকে না—কেহ পাগল বলে, কেহ ভণ্ড বলে কোন দিকেই দৃক্‌পাত করেন না। সাহাজাদী জেব্-উন্-নিসা বলেন—

"ছারে রং আস্ত বা মজ্‌নুনে আজ আঁ আহ্‌লে শরিয়ত রা।
কেদর দরূছে মহব্বত নোক্‌তায়ে বাহার ছোখন গিরাদ ॥"

বন্ধুবর মৌলবী রজব আলী সাহেব প্রদত্ত পাদটীকা হইতে ইহার সোজা মানে বোঝা যাইবে। সত্য উপলব্ধি করিলে যে ভাব মানস মন্দিরে জাগে ঠিক সেই ভাবল ইয়া ইহা লিখিত। 'ঐ আঁধার কাটে চক্ষু মেল'—সেই উপলব্ধির উজ্জ্বল বর্ণনা আমাদের সামনে আনিয়া দেয়। সাধকের সাধনা সফল হইল—তিনি গভীর অন্ধকার রজনীর অবসান দেখিতেছেন—পূর্ব্ব আকাশে জ্যোতিঃ প্রকাশের পূর্ব্ব আভাষ পাইতেছেন। এই গানটি পল্লী সঙ্গীতের অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণি।

আরও একটি গান পাঠকের সামনে নজির দেওয়া যাউক।

"নবি দিনের রছুল, আল্লার নাম যায় না যেন ভুল।
ভুলে গেলে মন পড়বি ফেরে হারাবি দুকূল ॥
আওয়ালে আল্লার নূর, দুইয়ামে তোবার ফুল,
ছিয়ামে ময়নার গলার হার
চৌঠা ছেতায়, পঞ্চমে ময়ূর ॥
আব, আতস, খাক বাতাসের ঘরে
গড়েছেন সেই মালেক মোক্তার, চার চিজে।
চার চিজে একমতন করে, দুনিয়াই করেছে স্থূল ॥"

এই ভণিতাহীন কবিতায় মুসলমানী ভাবেরই সমাবেশ। ইহার পরিভাষা (Technicalities না বুঝিতে পারিলে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

এই খানে আর একটি গান উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই গানে সৃষ্টির কথা আছে। হিন্দুর যেমন "শব্দব্রহ্ম"ও ইংরাজের যেমন "Let there be light" বলার সাথে সাথে এই সৃষ্টি, মুসলমানের ও তেমনি "কুন" (অর্থ হও বা কর) শব্দ হইতে সৃষ্টি। (পয়গম্বর কাহিনী—মৌলবী ফজলুর রহিম চৌধুরি এম, এ, দ্রষ্টব্য) এবং সেই কথাই এখানে বলা হইতেছে।

"আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে।
আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, তিন জনা এক নূরেতে নূরেতে ॥
সে সাগর, অকূল আদি——অন্ত নাই তার নিরবধি
নিঃশব্দ ছিল সিন্ধু আদিতে ॥
শব্দ হইল কুন্ জান তার বিবরণ
হুয়াল আছমা কারিগিরিতে ॥"

ঈশ্বর-প্রেম পথের পথিকেরা প্রেমাতিশয্যে জ্ঞানহীন। সাধারণ লোকেরা কিছু না বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অযথা তর্ক করিতে যায়, অন্যায়রূপে গালি দেয়।

(৫) মকবুল বন্ধু, প্রিয়।"

—মৌলবী রজক আলী।

দ্রষ্টব্যঃ—The Edward College Magazine: Vol I No. II P. 12-13.

এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য একটি গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি পাঠক একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন হিন্দু এবং মুসলমানের মিলনের সুর গানে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, অন্যত্র ত দূরের কথা। বাঙ্গালা সমাজতত্ত্বের ইতিহাস লিখিত হইলে এই সব বুঝিবার আরও সহজ পন্থা উদ্ভাবিত হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের প্রাণের মিলন কতটুকু হইয়াছিল তাহা এই গান হইতেই বুঝিতে পারিবেন, হিন্দু ও মুসলমান tradition এর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সম্পদ সৃষ্ট হইয়াছিল।

"মাবুদ আল্লার খবর না জানি।
আছেন নির্জ্জনে সাঁইনিরঞ্জন মণি,
সেথা নাই দিবা রজনী ॥
অন্ধকারে হিমাস্ত বায় ছিলে আপনি
সেই বাতাসে গৈবী আওয়াজ হ'ল তখনি ॥
ডিম্ব ভেঙ্গে আসমান জমিন গড়লেন রব্বানি ॥
ডিম্বরক্ষে আলে, ডিম্বের খেলা আদমে খেলে
অধীন আলেক বলে না ডুবিলে কি রতন মিলে ?
ডুবিলে হবে ধনী ॥"*

ইংরেজ সভ্যতার ছাপ "শিক্ষিত সাহিত্যে" যত বেশী লাগিয়াছে পল্লী সাহিত্যে তত লাগে নাই। আর পল্লী সাহিত্যে যতটুকু লাগিয়াছে তাহা ইহার বাহিরের জিনিষ—অর্থাৎ সভ্যতার কলকব্জা আসবাব পত্রের কথা। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালী সভ্যতায় কলকব্জার আমদানী বেশী ছিল না, কাজেই ইংরেজ সভ্যতার বাহিরের দিকটাই পল্লী গানে বেশী দাগ কাটিয়াছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বাহিরের আসবাব পত্র নৌকা, চরকা, প্রভৃতি ছিল সুতরাং এই সব লইয়া সুন্দর সুন্দর গান দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের ঘরের জিনিষ চরকা লইয়া সাধক কি আত্মতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন দেখা যাউক। সাধারণ নিজের মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

"যা যা তেল দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস্ না তুই কথাতে ॥
চরকার অষ্ট পাখী,
দুই ধারে দুই প্রধান খুটি,
মাঝখানে দুই চাকী
কত কালে ঘুরছে (রে মন)
চরকা ঘুরে কেবল মালের জোরেতে ॥"

মহাত্মাজীর কল্যাণে, ত্যাগী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনায় আজ চরকা আবার আমাদের সাথে পরিচিত, ঘরে ঘরে বিরাজিত। অবশ্য পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে "তেল দাওগে আপন চরকাতে" এবং "চরকা আমার ভাতার পুত চরকা আমার নাতি, চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী" প্রবাদ ছাড়া আমাদের শত করা নিরানব্বই জনই চরকার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিতেন না। এই চরকার সাথে বাঙ্গালীর কত দুঃখের কথাই না জড়িত রহিয়াছে।

বাঙ্গালী সভ্যতার অন্যতম গৌরবের জিনিষ বিশ্ব বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন যাহাতে তৈয়ারী হইত সেই তাঁত হইতেই বা সাধক কি আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, দেখা যাউক। মনকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন শুনুন;

"মন তাঁতি কি বুনতে এলি তাঁত।
এসে প্রথমেই হারালি আত॥
ও-তোর শানায় সুতো মানায় না তোরে,
পোড়া পোড়েন হলনা জাত॥
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি,
হায়, ভুল্লি কি খেই হায়
ঘুচলোনা খেই কোচ্‌কা পড়ালি॥
যত আনাগোনা যায় না গোনারে—
হলো সকল তোর ভস্মসাৎ॥
পেয়ে এমন তানা জানলি আপন কিসে
তাই ভাবিরে, ভাবিরে মনের হুতাশন॥
এই যে বটনা টানা আর খাটেনা রে;—
যে তোর পাছ লেগেছে হয় বজ্জাৎ॥
যত আশা করি তুল্‌তে গেলি ঝাপ
দিলি, এককালে চিরকালে, পাপ সলিলে ঝাপ॥
ভেবেছিস্‌ এবার উঠবি আবার রে;—
ক্রমে ক্রমে হল অধঃপাত॥
হাতে গলে সুতা জড়ালি কেবল।
এলে রবিসুত এ সব সুতো কোথায় রবে বল॥
ভজ নন্দসুত কই আশু তোরে,
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত॥"

এই সমস্ত গানের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার। গানের প্রভাব যে মানব মনের উপর কত বেশী তাহা না বলিলেও চলে। যখন এই সমস্ত গান গীত হয় তখন শ্রোতৃগণের মন সংসারের নীচতা হইতে বহুউর্দ্ধে উঠিয়া যায়। এই সমস্ত গানের জন্যই বাঙ্গালী সাধারণের Moral Standard এখনও অনেক উচ্চে আছে।

এখন বাঙ্গালীর তরী সম্বন্ধে সাধকের রূপ গান দেখা যাউক। বাঙ্গালী যে বাণিজ্যপ্রিয় জাতি ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীমন্ত সওদাগর, চাঁদ সওদাগর ও এই সমস্ত পল্লীগান। 'মহাজনের' 'মাল' লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন এই ভাবটা অনেক পল্লীগানেই আছে। ছয়জনে 'বোম্বেটে' সেই সমস্ত কাড়িয়া লইয়া যায়। (এই বোম্বেটের তুলনা কি পর্টুগীজ বোম্বেটেদের কার্য্য কলাপ হইতে গৃহীত? "বোম্বেটে" শব্দ কতদিন হইল আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে?)

তরী সম্বন্ধে অনেক গান আছে। তুলনা মূলক সমালোচনার জন্য কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি।

(ক)

"গড়েছে কোন সুতেরে এমন তরী জল ছেড়ে ডাঙ্গাতে চলে।
ধন্য তার কারিগিরি বুঝতে নারি এ কৌশল সে কোথায় পেলে।
দেখি না কেবা মাঝি কোথায় বসে হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে,
তরীটি পরিপাটী মাস্তুলাটি মাঝখানে তার বাদাম ঝোলে॥
লাগে না হাওয়ার বল এমনি সে কল সকল দিকে সমান চলে।
তরীতে আছে আটা মণি কোঠা জ্বলছে বাতি রংমহালে,
যেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে পবনে তরী চলে।
সখিন কয় হলে ঝড়ি তুফান ভারি উঠবেরে ঢেউ মন সলিলে,
যেদিন ভাঙ্গবেরে কল হবে অচল চলবে না আর জলে স্থলে।"

(খ)

দিনের দিন বসেরে শুনি।
কোন দিন যেন টলিয়ে পড়ে আমার সাধের তরণী॥
কোন জোয়ারে ভরলেম্ ভরা
সে জোয়ার গিয়েছে মারা,
শেষ জোয়ারের ভাটায় পড়ে কর্‌ছি টানা টানি॥
সে জোয়ার কোন দিন পাবো,
সাধের তরণী জলে ভাসাব,
ব'লে জয় রাধার নাম ধ্বনি॥
একে আমার জীর্ণ তরী
তাতে মাল্লারা 'কল্লা' ভারী।
মুখে বলে হরি হরি অন্তরে শয়তানী।
দাঁড়ি মাল্লা যুক্তি করে
সাধের নৌকায় ছায় কুড়াল মেরে,
পার হব কেমনে ত্রিবেণী॥
তক্তার "বা'ন" ছুটেছে,
সাধের তরণী "খোঁচে" বসেছে, *
কোনখানে কারিগর আছে ঠিকানা না জানি॥

---

* নৌকার তক্তার সংযোগ স্থল জীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য দিয়ে নৌকায় জল প্রবেশ করে। তক্তার 'বান' ছুটেছে অর্থাৎ তক্তার সংযোগ স্থল অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, কাজেই জল উঠিয়া ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

গোঁসাই নলিন চাঁদ বলে,
কারিগর আছে নিরালে,
খুঁজলে পরে মিলবেরে অখনি ॥”

(গ)

আজব তরী দেখে মরি গড়েছে কোন মিস্তিরী
এ তরী বোঝাই নেয় ভারী তিন বেলাতে বোঝাই করি
তবু বোঝাই হয় না ভারী মন ব্যাপারী।
তরীর ভাব দেখে সদাই আমি তাই ভাব্যা মরি।
তরীর মাল্লা আছে ছজনা,
তিন জনে খাটায় তরীর কল,
আর তিন জন আছে বসে তরীর পর।
আমি যে দিক টানতে কই সে দিক টানে না
তারা সদাই করে জঞ্জাল, বাধায় গোল মাল,
কোন দিন যেন সাধের তরী সুকনাতে হয় তল।
ছয় জনাতে ঐক্য মিলে তরী যাও বইয়ে,
তবু তার পাড়ি নাহি জমে যে দিন ‘বান’ চুয়ায়ে উঠবে পানি।
যে দিন তরী মন রসনা নৌকা ছেড়ে পালায়ে যাবে মালো ছয় জনাই ॥

(ঘ) *

“কোন কারিকর গড়েছে তরী।
ও তার গুণের (মন রে)
ও তার গুণের বাই বলিহারি ॥
তরী দমের গুণে (ভোলা মন)
তরী দমের গুণে, জলে আগুনে
চলতেছে আনিবারে।
সদাই ছুইটি চাকা ছুইটিকে ঘোরে ॥
আবার, মাঝ খানে তার নড়ছে তার
দেখ সে কল ঘুরে ॥

---

* নৌকার তক্তার অল্প পরিমাণ স্থান নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার মধ্য দিয়া জল উঠে। এই অবস্থার নাম খোঁচ।

এই ছুই ছত্রে নৌকার জীর্ণতা ও ধ্বংসমুখতা——ইহাই প্রমাণ করিতেছেন।

কিবা হাল ধরেছে (ভোলা মন) দিবারেতে
বসে আছেন কাণ্ডারী ॥
বসে এক খালাসী মাপ্‌ছে নদীর জল।
দুজন তার দুধারে দূরবীণ ধরে
হায় কি মজার কল ॥
আবার দুজন কেবল কয়লা আর জল
যোগায় জল বরাবরি।
কিবা, দুইটি নলে সদাই দম চলে।
কয়লা জল বদ্‌লাবার নালা আবার রয়েছে তলে
তার উপর পানে কেউ না জানে
লাট সাহেবের কুঠুরী।
এখন কলের বলে যাচ্ছে ঢেউ ঠেলে।
যখন আড়াবে কল, তলিয়ে সকল, যাবে এক কালে।
ডেকে কোটাল, সে বিষম কাল,
আর ক্ষণকাল নাই দেরী ॥
মিছে এ তরীর ভরসা করা।
এমন কত শত অবিরত, পড়ছে মারা।
এ দীন বাউলে কয় (ও ভোলা মন)
তার কিরে ভয় সদয় যার শ্রীহরি ॥"

এই গানটি যে আধুনিক রচনা তাহা ইহার ভাব ও ভাষা হইতেই অনায়াসে বুঝা যায়।

তরী সম্বন্ধে আরও অনেক গান আছে। আমি দুই চারিটি মাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পাঠকের বিরক্তির ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আরো সুন্দর সুন্দর গান আছে। মহাজনী ব্যবসা বিষয়ে বেশ একটি সুন্দর গান পাঠকের সামনে হাজির করিতেছি। এই গানে বাঙ্গালীর ব্যবসায়প্রবণতার ছবি আমাদের সামনে জাগে। বাঙ্গালীর এখন যে ব্যবসার নামে মনে আতঙ্ক উঠে পূর্ব্বে তাহা মোটেই ছিল না।

"কও মন তুমি কিসের মহাজন।
করলে এতো দিন কি উপার্জ্জন।
যত বিলাত বাকী, মজুত বাকি করেছ কি নিরূপণ ॥

আপন পাওনাটি বেশ বেশ দেখেছো হিসাবে।
কিন্তু দেনার বেলায়, পড়বে ঘোলায়
জ্বালায় প্রাণ যাবে ॥
যেদিন হবে নিকেশ, রবে কোথায় এ ধন জন ॥
ও কি বাঁকী সদায় করতেছো আদায়,
আস্‌ছে হাল তাগাদায়, কাল পেয়াদায়,
ভাব্‌ছো না সে দায় ॥
তারে গোঁজা দিয়ে প্রবোধিয়ে,
পারবে কি ভোলাতে।
ওরে বস্তা ভরে করছো কিরে মাপ।
পরের ওজন কমি, ধরছো তুমি,
লয়ে ভুজন মুটে, লুটে পুটে,
সারলো সে মোকান ॥
যবে আর কি ছিল মাল, সব দিয়েছো বিসর্জ্জন।
ছি ছি মহাজনী কর্ম্ম নয় এমন।
এ দীন বাউল তার কি টলে, তুচ্ছ লোভ মন ॥
ভবে সেই মহাজন করে যে জন শ্রীহরির চরণ ভজন ॥"

বাউলের এক তারার সাথে খোলা মিঠে গলায় কি সুন্দর সুর শোনা যায় তা অনুভব করিবার, বুঝাইবার নহে। সুর ছাড়া গান, প্রাণ ছাড়া দেহ।

বাঙ্গালী যে ঘরে থাকে সে ঘর সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এইখানে সেই ধরণের একটি গান তুলিয়া দিতেছি।

"চার পোতায় এক ঘর বেঁধেছে ঘরামির নাম স্থিধর।
আড়ে 'দীঘে' একই প্রমাণ ঠিক সমান সে ঘর ॥
ঢাকা ঘরের মধ্যস্থল, মুর্শিদাবাদ সদর মোকাম,
কত গলি শোন বলি, চোষট্টি গলি চার বাজার ॥
কানা কালা বোবারই কারবার, দেখে শঙ্কা হয় আমার
চার বাজারের চার দোকানদার করতেছে কারবার এসে ॥
দোকান মাথায় লয়ে চলে যায় কানা দেখে হাসে।
কাণার জিনিষ কিনে বোবা ডাকে, বলে মালের মূল্য নিসে।

কাণা কালা খেলছে খেলা, খেলছে নিশি দিবসে,
সংসারে অসার তারাই রসে, আমি ভাব্যা পাইনা দিশে ॥
সেই ঘরে বসত করে জনমভরা একজনা,
চক্ষু নাই মুখ আছে কর্ণ দুটি কালা।
নাকে না শোঁকে, চোখে না দেখে কানে না শোনে ক্ষ্যামতা,
আমি অবিশ্বাসী ঈদু, সাধু জানে তা।
ছিল ঘরের আজ্ঞাকারী, "পিরভুয়ারী সবে মাথা" (?)
ভাল মন্দ লাগে ধন্দ গন্ধ মালুম হয় যথা
মাতালে কি বুঝতে পারে তা অপার মুখে কয় কথা ॥

বাগান সম্বন্ধে সাধকের গান দেখা যাউক। বাগান হইতে যে রূপক গ্রহণ করা হইতেছে তাহা অতীব মনোমুগ্ধকর।

"মন তুমি কি ছার বাগান করছো বাগান
আপন বাগান ছাপ রাখনা।
করে নিড়ানী হাতে দিনে রেতে
ঘুরছো বাগান মনরে কাণা ॥
দেখ তোর ফুল বাগানে জঙ্গল হলো
নয়ন তুলে তাও দেখলে না।
বৃথা গাছ করে রোপণ জল সিঞ্চন
করে কি হবে বলোনা ॥
দেখ তোর কল্পতরু শুখাইল
সে তরুতে জল ঢাল্‌না।
বাগানে কুড়িয়ে মাটি হলি মাটি
মাটি করলি সব সাধনা ॥
ছাড়রে ভবের বাগান মনরে পাষাণ
আনন্দ-বাগানে চলনা।
সখিন চাঁদ মনের দুখে বল্‌ছে
যদি বাগান করতে হয় বাসনা।
দেখ তোর মন বাগানে ফুল ফুটিল
গুরু পদ ঠিক রাখনা ॥"

বাঙ্গালীর স্নানের ঘাট সম্বন্ধেও কবির মনভোলান গান শোনা যাউক। সাধক বলিতেছেন।—

"সাম্‌লে ঘাটে নামিস্ আমার মন।
ঘাটেতে কাঁটা গোজা কত আছে,
হোস্‌নারে তাতে পতন॥
ঘাটেতে শেওলা ভারী পা টিপে চল্‌তে নারি,
কেমন করে নামবি তাতে তার উপায় করনা॥"

ঘাটের কথা ত শুনিলেন এখন "অঘাটা"র সম্বন্ধে শুনুন, ঘাট এবং অঘাটের তুলনায় পরস্পরের ছবি পরিস্ফুট হইবে।

"স্নান ক'রোনা অঘাটায়।
আরে পা পিছলে গেলে উঠা দায়॥
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়,
যদি নেয়ে উঠিস্ বেঁচে পড়্‌বি কেঁচে পুনরায়॥
ভব নদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়।
কোথাও গড়ে হাঁটু পানি কোথাও হাতী তলিয়ে যায়॥
নাব্‌লে পরে বাঁধা ঘাটে, আছে কত মজা তায়,
কত সাধু শান্ত হয়ে ভ্রান্ত, "বেটকোরে" মারা যায়॥
সে জনা বলে ঘোলা জলে, ঘাট কি অঘাট চেনা যায়?
জেনে শুনে নাব্‌লে পরে নাইক ক্ষতি তায়॥"

এতক্ষণ বাঙ্গালীর গৌরবের কথাই বলিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজ সভ্যতার ও বাঙ্গালীর অধঃপতনের কথাই বলিব। ইংরেজের কল কব্জার সমাগমেই কবি বলিতেছেন।

"রসিক চিনে ডুবরে আমার মন।
রস ছাড়া রসিক বাঁচেনা, জল ছাড়া মীনের মরণ॥
যে ঘাটে ভরবি জল
সেই ঘাটে ইংরেজের কল,
ও সে কলসের মুখে 'ছাকনা' দিয়ে জল ভরে রসিক জন॥"

ইংরেজ সভ্যতার প্রথম জিনিষ আফিস—ব্যবসার আফিস।

"কও হে কি কাজ করছো আফিসে।
আফিস 'ফেল্' হবে কোন দিবসে॥

ভেঙ্গে রোড়ক তবীল, করছো 'বিল'
ঠেক্‌তে হবে নিকেশে ॥
এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানীর আফিস
বিবাদ বাঁধলে পরে, দুদিন পরে, হবে এবলিস্ ।
সাহেব বিলেত যাবে, যায় কি হবে ?
তুমি রবে কোন দেশে ॥
যখন জানবে তুমি প্রধান অফিসার,
অমনি সর্ব্বনেশে সার্জ্জেন এসে করবে গেরেফ তার ॥
কে আর করবে তালাস, আসলো কি খালাস
পাবে সে কালের পাশে ॥
হায় হায় বিচার যখন করবে ম্যাজিষ্ট্রের
এযে বাবুগিরি কি ঝকমারী, তখন পাবে টের ॥
ধরে দাগাবাজী, সে বাবাজী অমনি ধরবে ঘাড় ঠেসে ॥
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই ।
এসো দয়াল হরি, আফিস তারি, সেই আফিসে যাই ॥
কোন নিকেশের দায়, নাইরে সদায়, থাকবে সুখে স্ববশে ॥"

ইংরেজ সভ্যতার অন্যতম সামগ্রী, আমাদের দেশে নূতন ও অদ্ভুত সামগ্রী সেই গাড়ী সম্বন্ধে বাউলের গান দেখা যাউক ।

"যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেল গাড়ী ।
তোরা দেখ্‌সে আয় তাড়াতাড়ি ॥
উদ্ধারের আছে যত কল,
সকলের সেরা এ কল,
আপনি কলে তুলে দিচ্ছে জল,
হুহু উড়ছে ধোয়া, ঘুরছে বোমা,
আবার হচ্ছে কলের ছড়াছড়ি ॥
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনিয়ার,
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর,
মুখে হরি হরি গৌর হরি,
করছেন টিকিট মাষ্টারী,

ভক্তি টিকিট সাধন করে, ষ্টেশন বৈকুণ্ঠ পুরে,
যাচ্ছে বেদম দম দিয়ে কল ঘুরে ;
কত হাজার প্রেম প্যাসেঞ্জার
পথে কুরতেছে দৌড়াদৌড়ি ॥
যে যেমন টিকিট করে, সেই কেলাসে তারে
অমনি ভব ভূমে পার করে,
এ দীন বাউল ভণে টিকিট কিনে,
কোথা গৌর আমার লওহে বলে,
কত যেতেছে গড়াগড়ি ॥”

হাসপাতাল হইতে কি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত গান হইতে বুঝা যাইবে।

তোরা আয় কে যাবি রে,
গৌর চাঁদের হাসপাতালে নদীয়াপুরে ॥
আর কেন ভাই যাতনা পাই
কলিকালে ম্যালেরিয়া জ্বরে ॥
কখন এমন ছিল নারে দেশে জীবের যন্ত্রণারে ॥
কল্লেন দাতব্য এক ডাক্তারখানা, দীনহীন তরে ॥
জীবন তারণ সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন দেখাতে লোকেরে।
আনছেন রোগী ডেকে ডেকে তাদের জ্বর দেখে দয়া থারমেটারে ॥
গাছ গাছড়া বেদ বিধি
তার আরক তুলে করলেন বিধি
তারক ব্রহ্ম মহৌষধি,
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে ।।
নিতাই বাবু সিভিল সার্জ্জন,
য়্যাসিষ্টাণ্ট অদ্বৈত হলরে,
নেটিভ শ্রীবাস আর শ্রীনিবাস হরিদাস
আছে কমপাউণ্ডারে ॥
নিতাই বাবুর সুযশ ভাল,
জগাই মাধাই রোগী ছিল,

তাদের বৈষম্য জ্বর ছেড়ে গেল,
একটি মিক্‌চারে।
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু, সাধুবাদ দুগ্ধ সাবুরে ॥
হরি কথা পাত্তিনেবু তাতে রুচি হ'লে অরুচি হবে,
গোসাঞি বলেন দিলাম বলে, অনন্ত ঐ ঔষধ খেলেরে।
জ্বর যেতো তোর কপট পিলে, যেতো একেবারে ॥"

এতদিন শুধু 'আফিস', 'রেলগাড়ী', 'হাসপাতাল' প্রভৃতির কথাই হইতেছিল। এখন ইংরাজ সভ্যতার চরম বিকাশ (!) শাসনের কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ওরে মন আমার হাকিম হতে পার এবার।
মন যদি হাকিম, আমি হই চাপরাশী,
কনেষ্টবল হয়ে হাজির হই হুজুরে।
তোমার হুকুম জোরে, আইন জারী করে।
আনবো চোরকে ধরে, করে গেরেফ্‌তার ॥
ছিল পিতৃ বস্তু সত্য,
অমূল্য অসহ্য
হরে নিল তায় মদন আচার্য্য।
চোরের এমন কার্য্য, 'দীনু'র হয় না সহ্য।
মদন রাজার রাজ্য শুদ্ধ অবিচার ॥
কামকে দেওনা ক্ষমা, মস্ত হও দুবেলা,
'রুদ্ধর' সঙ্গে মোহ মদনের খুব জ্বালা।
"কোরক" যেমন দোষী,
মিদাদ দাও তায় বেশী,
মদনকে দাও ফাসি
কাম যাক্‌ দ্বীপান্তর ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত আত্ম পরিজন
সময়ের বন্ধু তারা অসময়ের কেউ নন।
দিয়ে চোরের সঙ্গে মেলা
হ'য়ে মাতোয়ালা,
পেয়ে চাবি তালা,
ভাঙ্‌লে আমার দ্বার ॥"

দেশের সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে পল্লীসাহিত্যের কি রকম পরিবর্ত্তন তাহাই উপরি উদ্ধৃত গান সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত সুতরাং দুই এক জনের সংগৃহীত গান দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে না। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাহাই করিয়াছি। এই সমালোচনা যে অসম্পূর্ণ তাহা সত্য কিন্তু তবু ইহা প্রকাশ করিতেছি কারণ এই প্রচেষ্টায় যদি অন্য কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন, বা স্বাধীন ভাবে বা যুক্ত ভাবে আলোচনা করেন। আমার বিনীত নিবেদন যে আমরা "বঙ্গীয় পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহ সমিতি" (Bengal Folk lore and Folk song Society) নামক একটি অনুষ্ঠান করিতে চাহিতেছি। যাঁহারা এই বিষয়ে উৎসাহী ও সহানুভূতিশীল তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে সুখী ও অনুগৃহীত হইব। *

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন
বঙ্গীয় কৃষক পাঠাগার
পোঃ—খলিলপুর, পাবনা

পৌষ-দিনে

তোফা লুকোচুরি খেলা সূর্য্য আর মেঘে,
ছায়া রৌদ্রে কোলাকুলি, তন্দ্রা জাগরণে,
এক দিকে হাসে গ্রাম কিরণে কিরণে,
অন্য দিকে ম্লান স্তব্ধ সন্ধ্যাবেশ দেখে।
উড়াইয়া ধূলিধূম—স্বর্ণশস্য লয়ে,
চলেছে গরুর গাড়ী সুমন্থর গতি;
নলেন গুড়ের গন্ধে আমোদিত অতি
গ্রামান্তে খর্জ্জুর বন; প্রসন্ন হৃদয়ে
গৃহস্থ ফিরিছে ঘরে বাজার করিয়া,
আনাজ, মাছের পাত্র শোভিছে দু'হাতে,
দীর্ঘ গুম্ফ গল্তার শ্রীপদ শোভাতে
নাচিয়া উঠিছে গ্রাম্য দর্শকের হিয়া।
পরিপক্ক স্বর্ণপীত বকুলের ফল,
আস্বাদন করি সুখে কোকিল বিহ্বল।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

অপাঙ্গিকা

বঙ্ক নেহারণি চারু অপাঙ্গে মধুর,
গ্রীবা আন্দোলনে কাণে স্বর্ণভূষা দোলে,
বিনোদ বকুলবর্ণ কোমল কপোলে
ললিত-অলক্ত আভা, মুখে স্মিতাঙ্কুর।
পল্লীর মল্লীর মালা, নবীনা কিশোরী,
নীরব আনন্দময়ী—প্রভাত আলোকে,
প্রাণের কথা কি তার আঁকা ছিল চোকে?
বীণায় ঘুমায় কেবা ভৈরবী কি টোড়ী?
দিবাস্বপ্নে হেরি তার চারু চিত্রচ্ছবি
সাধ হয় কাণ ভরে শুনি' তার কথা,
শিরীষ-সরস বুকে কত মধুরতা,
কোন্ আশাস্বপ্ন প্রাণে আঁকে বিশ্বকবি।
বকুল কঙ্কণে কেন করিল সম্মান?
স্মৃতি তার ছেয়ে আছে গীতিময় প্রাণ।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

* এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহের সাহায্য লইয়াছি। "বাউল সঙ্গীত" ও "ঝুমুর সঙ্গীত" মহেন্দ্রনাথ কর প্রকাশিত। "হারামণি" মহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংগৃহীত পল্লীগান সংগ্রহপুঁথি। "Old English Ballads"—F. B, Gummerc. "মহর্ষী মনসুর"—মোজাম্মেল হক্। পয়গম্বর কাহিনী—ফজলুর রহিম চৌধুরী।

বিসর্জ্জন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রমানাথের অনুপস্থিতিতে ছায়াই ঠাকুরমার মুখাগ্নি কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। প্রতিবেশীদের কার্য্য প্রতিবেশীরা করিয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বাটীখানিও একেবারে নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ছায়া মৃত-সৎকার করিয়া, স্নান করিয়া, বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহে ফিরিল। গৃহে আসিয়াই সে ঠাকুরমার পরিত্যক্ত স্থানটিতে লুটাইয়া পড়িল। প্রতিবাসিনীরা তাহাকে উঠাইয়া অনেক কষ্টে কিছু জলপান করাইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার পরে ছায়া গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সেই স্থানে শুইয়াই রাত্রিটি কাটাইয়া দিল। প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা রমণী তাহার সঙ্গে শুইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাকে বারণ করিয়া দিল।

ছায়ার টেলিগ্রাম পাইয়া রমানাথ আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, পাগলের ন্যায় বাড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন। বেলা প্রায় দশটার সময় তিনি সেই গ্রামের সীমানার ভিতর আসিয়া পৌছিলেন।

তিনি সভয়নেত্রে দূর হইতেই নিজের ক্ষুদ্রবাটী খানার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একটু নিকটস্থ হইলে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বড়াখানা যেন একান্ত শ্রীহীন, মলিন, তমসাচ্ছন্ন। দেখিয়া তাঁহার পা দুইখানি যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তবুও তিনি মনে একটু শক্তি সঞ্চার করিয়া আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন।

এমন সময় বিপরীত দিক্ হইতে গ্রামের উমানাথ ঘোষাল তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি, চক্কোত্তি মশায় এসেছেন! ভাল আছেন ত?"

রমানাথ দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, গাঁয়ের খবর কি?"

"গাঁয়ের খবর! অন্যান্য ত ভালই। কেবল আপনার,—যাক্, আপনি কি টেলিগ্রামে খবর জানেন নি?"

"জেনেছি, ছোটমার হঠাৎ ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে, জীবন সংশয়, তার পরে এখন—"

"তারপরে আর কি! এই রোগের কি ফল তা'ত বুঝতেই পারেন। এই দুষ্ট রোগ হলে কি'আর কেউ বাঁচে!"

শুনিয়া রমানাথের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীটা যেন সবেগে কম্পিত হইতেছে।

তিনি পথপার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষের শাখা ধরিয়া যেন আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। খানিক পরে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে মারা গেছেন ?"

ঘোষাল যাইতে যাইতে বলিলেন, "কাল সন্ধ্যায়।" আবার একটু দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করেছি চক্কোত্তি মশায়। তিনি যে হঠাৎ এভাবে চলে যাবেন, তা আগে ভাবতেও পারিনি। আমাদের বাড়ীতে বাবার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে এসেই হঠাৎ বাহ্যি বমি আরম্ভ করলেন। তারপরে ডাক্তার ডাকানো হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে গেলেন।"—বলিয়া ঘোষাল মহাশয় চলিয়া গেলেন।

রমানাথ বালকের ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বাড়ীতে আসিলেন। আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। তিনি মস্তকে হস্ত দিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে বাহিরে বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ছায়া গৃহের এক কোণে বসিয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছে। রমানাথ যে সেইখানে আসিয়াছেন, তাহা সে টের পায় নাই।

রমানাথ মৃদুস্বরে বলিলেন "ছায়া !"

ছায়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমানাথ গৃহের মেজেয় বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "ছোটমা কি নেই ?"

ছায়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে টপ টপ্‌ করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু মাটিতে পড়িল। রমানাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কালীঘাটে যাওয়ার তাঁর বড় আশা ছিল, কিন্তু আমি তাঁর সে আশা পূর্ণ করতে পারলেম না। আমি তার এমনই হতভাগ্য সন্তান যে, তাঁর শেষ সময়ের কাজটুকুও করতে পারলেম না। ওঃ—" বলিয়া রমানাথ চক্ষু মার্জ্জন করিলেন।

ছায়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে যাইতে লাগিল। রমানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা যাচ্ছিস্‌।"

ছায়া দাঁড়াইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একটু তামাক সেজে নিয়ে আসি।"

"না,—না, এখন তামাকের দরকার নেই। যাস্‌ নে।"

ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, কিছু খাওয়া দরকার ত। উনোনটা যেয়ে ধরিয়ে দিই।"

"আচ্ছা, তা পরে হবে। এখন আমার কাছে একটু বস।"

তাঁহার সেই স্বর শুনিয়া ছায়ার চক্ষুতে আবার জল আসিল। সে অঞ্চলে চক্ষু দুইটি মুছিয়া পিতার নিকটে বসিয়া পড়িল।

রমানাথ নীরবে বসিয়া রহিলেন। ছায়াও নীরব। কি বলিবে, বলিবার মত আর কি

কথা আছে ! রমানাথ যে সকল কথা ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়াছিলেন, সেই সকল কথা যে তাঁহার মুখ হইতে বাহিরই হইতেছিল না।

ছায়া তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ। আমিই তাঁকে যমের দুয়ারে ঠেলে দিয়েছি।"

রমানাথ শিহরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি কথা ছায়া, তুই কি বলছিস ?"

ছায়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া, চক্ষু মুছিয়া পরে বলিল, "হাঁ, আমিই এক রকম কারণ বই কি ! আগের দিন একাদশী ছিল, দিন রাতের মধ্যে জলস্পর্শও করেন নি। পরের দিন দুটি ভাত খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা দেই নি। আমি—" বলিতে বলিতে ছায়ার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

আবার একটু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "ভাত খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লোকের কাছে আর ধার করব না বলে আমি বারণ করেছিলেম। আবার তখনি ঘোষালদের বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন এল। আমি অনেক অনুরোধ করায় তবে তিনি সেখানে গেলেন। তবে কি আমিই তাঁর মরবার কারণ হইনি বাবা !"

রমানাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া কাঁদিলেন। পরে অতিকষ্টে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "না ছায়া, তোর কিছুই দোষ নাই। যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, তবে কেবল আমারই। আমারি কারণে এতখানি ঘটে গেল। আর তাই বা বলি কেন, আয়ু ফুরিয়ে গেলে কত রকমেই চলে যেতে পারে।"

বলিয়া রমানাথ আবার ভাবিতে লাগিলেন। ছায়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। রমানাথ বহুক্ষণ পরে বলিলেন, "কিছুই নয়। কারও দোষ নয়। এই সংসার অসার। কেবল দুদিনের খেলার ঘর। খেলা হয়ে গেলেই যে যার যায়গায় চলে যাবে।"—বলিয়া তিনি একটি মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা, আপনার কাজ কি একেবারেই ছেড়ে এসেছেন ?"

"না, দশদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।"—বলিয়া রমানাথ একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, "তোর কাছে আর কত আছে ছায়া ? দু চার টাকা হবে, না ?"

ছায়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আর একটি পয়সাও নেই। সব খরচ হয়ে গেছে। ডাক্তারকে আরও কিছু দিতে হবে।"

রমানাথ চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, "বলিস্ কি, তবে যে বড় মুস্কিল হবে।"

ছায়া কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কাছেও কি কিছুই নাই ?"

"আছে, কিন্তু না থাকার মতই। এই সামান্য দু চার টাকায় কি হবে। মুখাগ্নি ত করতে পারিই নাই, এখন এই শ্রাদ্ধশান্তিটুকুও যদি ভাল রকম না করতে পারি, তবে—" কথাটি সম্পূর্ণ না বলিয়াই রমানাথ মৃদুভাবে মস্তকটি আন্দোলন করিলেন।

ছায়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া, পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, "তবে এখন যাই বাবা ?"

"আচ্ছা, যাও।"

ছায়া আজ দুই দিন পরে রন্ধন-গৃহে আসিল। আসিয়া গৃহকোণ হইতে কতগুলি শুষ্ক ঘুঁটে লইয়া আগুন ধরাইয়া দিল। পরে রমানাথের হুকা কলিকা লইয়া আসিয়া তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিল।

রমানাথ বারান্দায় বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। ছায়া পথশ্রান্ত পিতার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। তামাক খাইয়া রমানাথ স্নানাদি করিয়া আসিলেন। ছায়া তাঁহার হাতে ধরিয়া নিয়া অন্নের সম্মুখে বসাইয়া দিল।

রমানাথ অতি কষ্টের সহিত দুই চারি গ্রাস ভাত খাইয়াই উঠিয়া গেলেন। বাকী ভাতগুলি ছায়া অন্য একখানা থালা দিয়া ঢাকিয়া রাখিল।

তাহা দেখিয়া রমানাথ বলিলেন, "তুই খাবিনে ছায়া ?" ছায়া নীরবে মস্তক নত করিল। রমানাথ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "না খেয়ে থাকলে ত কোন লাভ হবে না। এবং এভাবে থাকলে যে তুইও তাঁর পথ ধরবি। তখন আমি—"

ছায়া তাঁহার নেত্রে অশ্রু দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "খাব, বাবা।" বলিয়া সে ভাতের সম্মুখে বসিল। কিন্তু খাইতে পারিল না। ভাতগুলি চক্ষুর জলে ভিজাইয়া পুকুরে নিয়া ঢালিয়া দিল।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন আসিল। গ্রামের কয়জন ধনী স্বতঃই উপযাচক হইয়া রমানাথকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা কয়েকটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, ঠাকুরমার দারিদ্র্য-জীর্ণ আত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথঞ্চিৎ উপশম করা হইল।

শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, অতঃপর রমানাথ কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ছায়াকে এইরূপ একা বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। অথচ তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াও কোথায় রাখিবেন, তাহাই চিন্তার বিষয়। এদিকে বাড়ী ঘরও খালি পড়িয়া থাকিলে ক্রমে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

তিনি নিজে এই বিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ছায়ার নিকট পরামর্শ চাহিলেন। ছায়া সসঙ্কোচে নিজের অভিপ্রায় জানাইল যে, পরে যাহাই হউক, এখন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সে স্থানান্তরে থাকিতে পারিলে একটু শান্তি পাইত।

রমানাথও ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, ছায়ার কথাই ঠিক। এখন তাহাকে সঙ্গেই লইয়া যাইবেন, পরে স্থলবিশেষে কার্য্য হইবে।

পঞ্জিকা দেখিয়া যাওয়ার দিন স্থির করিলেন। বুধবারে যাত্রা শুভ। সেই দিনই রওনা হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সবিতা হঠাৎ পিত্রালয়ে চলিয়া আসায় সকলেই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে, পত্রে তাহাদিগকে প্রকৃত বিষয় না জানাইয়া, শুধু লিখিয়াছিল যে, সে আর সেই স্থানে থাকিতে পারে না, তাই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে কেন যে সেখানে থাকিতে পারে না, তাহাই সকলের বিস্ময়ের কারণ।

ক্রমে তাহার শ্বশুরালয় ত্যাগের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া সকলে অতিশয় দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। সবিতার ললাটে যে সপত্নীর ঘর করা লেখা ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহই ভাবিতেও পারে নাই। উকিল বাবু এই খবর শুনিয়া, নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। গৃহিণী কন্যার দুরদৃষ্ট দেখিয়া মনস্তাপে ম্রিয়মাণা হইলেন।

উকিল বাবুর তিনটি কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল। তিনটি কন্যা বিবাহিতা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কলেজে পড়িত, এবং কনিষ্ঠটি স্কুলে পড়িত। তিনটি কন্যার মধ্যে সবিতা মধ্যমা ছিল।

পিত্রালয়ে আসিয়া সবিতা দুই চারিটি দিন একটু সুখে শান্তিতেই রহিল। পরে ক্রমেই যেন তাহার মনটা স্বামীর জন্য কেমন করিতে লাগিল।

মনের এই গতি দেখিয়া সবিতা আশ্চর্য্যের সহিত ভাবিত, সেখানে থাকিতে ত তাহাকে একবার দেখিতেও ইচ্ছা হইত না। এমন কি, স্বামী যদি তাহাকে আদর করিতেও আসিত, তবুও সে তাহার সেই আদরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত। আর এখন কেন, তাহার সেই প্রাণই তাহার জন্য এমন কাঁদিতেছে! এ কি আশ্চর্য্য!

সবিতা নিজের মনের উপরে নিজেই চটিয়া উঠিত। সর্ব্বদাই বেয়াদব মনটাকে তিরস্কার করিয়া, স্বামীর সেই অন্যায়াচারের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিত।

সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিলেই মনটা আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিত। কিন্তু তাহা কত ক্ষণের জন্য? একটু পরেই আবার সেই অভাবটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত।

তাহার মনের এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া, তাহার বড় বোন ললিতা হাসিয়া বলিল, "বৃথা, সবু, বৃথা।"

সবিতা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি বৃথা দিদি?"

ললিতা সহাস্যে বলিল, "তোর মনে এক রত্তি বল নেই, তবে তুই কি সম্বল নিয়ে এই মহাযুদ্ধের ঘোষণা করেছিস্?"

সবিতা কথাটি ভালরূপ না বুঝিয়া বলিল, "তুমি কি বলছ দিদি?"

ললিতা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "বুঝতে পারছিস্ নে? এই বুদ্ধি নিয়ে তুই যুদ্ধে লেগেছিস্? হা আমার কপাল! তাইত তুই বিপক্ষের হাতেই সব সঁপে দিয়ে, বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিস্।"

সবিতা এইবার একটু বুঝিতে পারিয়া, খানিক লজ্জিত হইয়া, খানিক রাগ করিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার যেমন কথা! আমি বিপক্ষের হাতে কিছুই সঁপে দেই নি। সবই আমার হাতে আছে।"

ললিতা অপরিমিত হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা যা আছে, তা বুঝা গেছে গো! আর বলতে হবে না।"

সবিতা মুখ খানাকে ভার করিয়া বলিল, "কি বুঝেছ তুমি, বলতো?"

"সবই বুঝেছি। মুখে হাসি ফুটেও ফুটে না। গল্প করতে বসলেও মনটা অন্য দিকে দৌড়িয়ে যায়। একটা কাজ করতে বসলেও তাতে মন লাগে না। এ সব ভাবের যা পরিণাম, তাই বুঝেছি।"

সবিতা লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইল। ললিতা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "শুধু শুধু কেন এমন পরাজয়ের কালিমা মুখে মাখ্‌লি সবু? এমন যুদ্ধে কি দুর্ব্বল মেয়ে মানুষ কখনও জয়লাভ করতে পারে! কখনও নয়। তবে কেন বৃথা এই যুদ্ধ ঘোষণা? তার চেয়ে যে সন্ধি করা শত গুণে মঙ্গল।"

সহসা সবিতা সতেজে গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "ইঃ, মেয়ে মানুষ হলেই বুঝি কেবল দুর্ব্বল হয়ে থাকে! আচ্ছা, রোস, আমিই সকলকে বুঝিয়ে দেব, যে মেয়ে মানুষ দুর্ব্বল নয়, সবল,—পুরুষের চেয়েও সবল।"

ললিতা মস্তক আন্দোলন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখা যাবে-গো তোমার বীরত্ব।"

সবিতা রাগ করিয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। কি,—দিদি তাহাকে এত দুর্ব্বল বলিয়া মনে করিল! অভিমানে সবিতার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইল।

ছোট বোন কলিকা তাহার চোখে জল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে দিদি, কাঁদছ কেন?"

সবিতা কিছুই বলিল না। কলিকা কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে মাতার কাছে যাইয়া সবিতার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

শুনিয়া গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা, তোরা আর কি বুঝবি। যার ব্যথা সেই জানে। সবু এখন কোথায়? পাঁচ মেসে পোয়াতী মেয়ে স্বামীর ঘর—"

ললিতা বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "হয়েছে, তোমার আদরের মেয়ের স্বভাব খানার কথাটা একটু ভেবে দেখ। আমি গল্প করতে করতে দুটো ভাল কথা বলেছি, তাতেই তিনি একেবারে কেঁদে ফেল্‌লেন।"

মাতা একটু ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, মেয়েটা আমার বড় অভিমানিনী। একটুতেই তার বড় লাগে।"

বলিয়া গৃহিণী সবিতার নিকটে গিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবুর কাছারী থেকে আসবার সময় হয়েছে, তাঁর জল খাবারটা তৈরী করে রাখ সবু।"

সবিতা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। গৃহিণী আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

সবিতা বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিল। সেই বিবাহের কথা, সেই প্রথম স্বামী সম্ভাষণ, একে একে সবগুলি কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর সেই প্রথম প্রেমস্পর্শের কথা মনে পড়িয়া আজিও সবিতার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই স্পর্শ যেন এখনও সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

সহসা কলিকা সেখানে আসিয়া বলিল, "দিদি, তোমার একখানা চিঠি আছে।"

সবিতা তাহার সুখোচ্ছ্বাস হইতে যেন সদ্য জাগ্রত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "কই, কই? নিয়ে আয়, দেখি কে লিখেছে।

কলিকা মৃদু হাসিয়া নিজের কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সবিতার হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও।"

তাহার সেই হাস্য দেখিয়া সবিতার মুখ আবার গম্ভীর হইল। ধীরে ধীরে শিরোনামার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে চমকিত হইল। তাই দেখিয়া কলিকা একটু হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সবিতা চিঠিখানা খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল।

সবিতা!

তোমাকে আমার এই শেষ অনুরোধ। যদি কর্ত্তব্য মনে কর, তবে অবশ্যই এই অনুরোধ রক্ষা করবে। এক সপ্তাহের মধ্যেও যদি এই পত্রের কোনও উত্তর না পাই, তবে বুঝব, যে বাস্তবিকই তুমি আমার অনুরোধটা রাখা অকর্ত্তব্য মনে করছ। এ আশায় নিরাশ হলে অগত্যা আমি মনটাকে অন্যপথে চালনা করব, তা নিশ্চয়ই জেনো।

সম্প্রতি বাবা রক্তামাশায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর সেবা করবার একটি লোক নেই। তিনি এ যাত্রা বাঁচেন কিনা সন্দেহ। এই অন্তিম শয্যায় শুয়ে বাবা তোমায় ডাকছেন। তাঁর এই শেষ ডাকের তুমি উত্তর দিয়ে, তাঁর সেই চিরদিনের আশা পূর্ণ করে যাও।

আর কি লিখব, তোমার কাছে আর লিখবার কি থাকতে পারে। আর দিবারই বা কি থাকতে পারে! ইতি

তোমার—না, না,—ইতি, শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা

পত্র পড়িয়া সবিতা ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এ সময়ে যে তাহাকে একবার যাইতেই হইবে। কিন্তু আবার একটু পরেই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে কোথায় যাইবে,

কাহার কাছে যাইবে! মুহূর্ত্তের মধ্যে সবিতার সেই কথাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা হাতে লইয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

সত্যই ত তবে ললিতার কথা—ঠিক। সে যে বলিয়াছিল, বৃথা এ অভিমান, বৃথা এ যুদ্ধায়োজন, একদিন না একদিন পরাজয় নিশ্চয়ই হবে। তাহা ত সম্পূর্ণ সত্য। তবু জানিয়া শুনিয়াও সে কেন এখন হইতেই সাবধান হইতেছে না!

সহসা আবার সবিতার প্রতিজ্ঞার কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল। সে যে ললিতার সম্মুখে সগর্ব্বে বলিয়াছিল যে, সে সকলকে দেখাইয়া দিবে, স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা নয়, সবলা। এখন যদি সে সেই কথার বিপরীত কার্য্য করে, ললিতার কথাটাই যদি বজায় থাকিতে দেয় তবে কি সে বিদ্রুপের হাসি হাসিবে না? তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তক যদি স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়ে তবে সে কি মনে করিবে। ছি ছি, তাহা হইবে না।

সবিতা চঞ্চলনেত্রে আবার চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু দুইটি আবার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

পূর্ব্বে স্বামী তাহার নিকট চিঠি লিখিতে প্রথমে যে যে শব্দগুলি লিখিয়া তাহাকে গভীর প্রেমের পরিচয় দিত, এখন সেই সকলের পরিবর্ত্তে নিতান্ত পর পর ভাব মাখানো কয়েকটি ঘৃণাব্যঞ্জক,—বিরক্তিভরা শব্দ লিখিয়াছে মাত্র।

এমন ঘৃণাব্যঞ্জক আহ্বানেই সে তাহার নিকটে ছুটিয়া যাইবে! কেন,—সে এমন দুর্ব্বলতা হৃদয়ে স্থান দিবে! না,—না, তাহা হইবে না। সবিতা সবেগে উঠিয়া, চিঠিখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, জানালা দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিল।

গৃহিণী সেখানে আসিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন, "সুরেশের একখানা চিঠি পেয়েছি সবু। তার বাপের ব্যারাম। তুই সেখানে যাবি কিনা?"

সবিতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সবেগে "নাঃ" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীচপলাবালা বসু

———

সন্ধ্যায়

(মীরাবাই)

এস এস শ্যাম চির অভিরাম
সন্ধ্যা আসিছে নামি—
তব সমাগমে অন্তর মম
নন্দিত কর ওগো প্রিয়তম,
সঞ্চিত মম সকল কামনা
পূর্ণ করহে স্বামি!

তোমাতে আমাতে অন্তর নাহি
তোমা পানে চির রহিয়াছি চাহি—
তুমি যে আমার সূর্য্য হে প্রভু
ধারত্রীতব—আমি!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

———

ভোগ না বৈরাগ্য

একেই ত "সংসারের পথটা দীর্ঘে বড়, প্রস্থে ছোট্ট।"—ইহার উপর যদি আবার স্পর্দ্ধাভরে "ভোগ" ব্যাপারটাকে কুলার বাতাস দিয়া অলক্ষ্মীর মত জীবন থেকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, তাহলে সংসারের সেই সরু দীর্ঘ পথটা সত্যই এত অপরিসর হইয়া পড়ে যে সুখে স্বচ্ছন্দে সে পথে চলিবার জো আর বড় থাকে না।

মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্করের "মোহমুদ্গর" যাই বলুক, মানবের মর্ম্ম কিছুতেই ভুলিতে বা অস্বীকার করিতে পারে না যে, ভোগ জীবনের একটা বড় সম্পদ এবং জীবনের শুভ—ভোগে, ভোগের সত্যে ও সারল্যে—ভোগের নিত্য সাধনায় ও সিদ্ধিতে—ভোগের সহস্রমুখী অমরধারার বহু ও বিচিত্র প্রসারে। মরণ পরিণাম হলেও জীবন সুখের, নানা ভয় ভাবনা ব্যাধি শোক সত্ত্বেও জীবন আকাঙ্ক্ষার, কেন না ইহাতে মানবের চিরদিবসের প্রিয় ভোগের সুবিধা ও রসাস্বাদের অবসর আছে। আমাদের এই জীবন হাসিখুসীর বদলে কান্নাকাটী হইয়া দাঁড়ায় যখন মানুষ জীবনে বিশ্বাস হারাইয়া জীবনকে ভয় করিতে থাকে এবং ভোগের পথে, ঈপ্সার পথে—পুষ্পপুটে কীটের মত—নানা বাধা আসিয়া জীবনের সহজ সরল গতি ও নিয়তির অন্তরায় হইয়া দুঃখের আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। সমগ্র মানব প্রকৃতিকে অনুভূতির সরস সঞ্চারে সফল, সার্থক ও সুন্দর করিয়া পুষ্টি ও বিকাশের ভিতর দিয়া আনন্দের অধিকারভুক্ত করিয়া দেয় বলিয়া ভোগ মানবের এত কাম্য। যার জীবনে আশা নাই, আশ্বাস নাই, ভোগ বিরাগের ত্যাগ দৈন্য ও আত্ম-নিগ্রহ আনন্দের অধিকারহারা সেই স্থবির আতুর অথর্ব্বের কথা—আশায় উজ্জ্বল তরুণের কথা নয়। গৈরিক বিলাসীর "বৈরাগ্য শতক" জীবনের কথা নয়—মরণের কথা। "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" দুঃখীর কথা, দুঃখের কথা। সুখী বা সুখের আশা যে রাখে সে ও-কথা ভুলেও মুখে আনে না।

পুষ্পে ফুটে উঠা যেমন পত্রের পরম সার্থক পরিণতি, ভোগে তেমনি জীবনের সজ্জত সার্থকতা। ভোগের একটা চমৎকার বিশেষত্ব এই যে ভোগ যাহাকে আশ্রয় করে সান্ধ্য দেবারতির রত্নদীপের স্বর্ণ রশ্মির মত, জীর্ণ শাখায় শরতের শুভ্র শেফালীর মত তাহাকে চারিদিকের দীনতা ও মলিনতা থেকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া সুখ সোহাগের অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়া দেয়। ভোগের আলো ও সৌরভের ললিত বেষ্টনে অতি পরিচিত পুরাতনও সুন্দর শোভন তারুণ্য ও নবীনতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। সংযম ও সঙ্কোচ সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী। ফুলের কুঁড়ি যদি সংযমের খাতিরে ফুটিতে সঙ্কোচ বোধ করে তাহলে প্রস্ফুট কুসুমের সৌন্দর্য্য আমরা পাই না এবং তাহার সুরভিভরা প্রাণের পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাকে। তাই ভোগ না থাকিলে Art sense থাকে না।

ভোগের জন্যই মানুষ চায় শক্তি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য। ভোগের জন্যই অগ্নিমজ্জাশিরা-

স্নায়ু পরতে পরতে নর-নারীর দেহের প্রতি এত টান। ভোগের জন্যই মানুষের মায়া মমতা, স্নেহ-ভালবাসা। ভোগবিচ্যুত অবস্থায় মানুষ নির্ম্মম। ভোগ করিবার যোগ্যতা হারাইবার ভয়েই নর-নারী প্রথম যৌবনের শরীর ও মন—অন্ততঃ মনটা—ধরিয়া রাখিয়া জরা বার্দ্ধক্যকে যথাসাধ্য দূরে পরিহার করিতে চেষ্টা করে। ভোগের জন্যই যযাতি নিজের পুত্রদের নিকট হতে যৌবন যাচ্ঞা করে লয়েছিলেন। যৌবনের অস্থায়িত্ব হেতু বিশ্বব্যাপী এত আফশোষ, ভোগের অভাব আশঙ্কাই ইহার মূল। কবিও বলেছেন :—

"যৌবনের লাগি আমি তপস্যা করিব ঘোর।"

আমার দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, তাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আছে,—আমার দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, তাই রূপরসগন্ধস্পর্শাদির অস্তিত্ব আছে, একথায় যদি মতভেদ না থাকে,—দেহীর দেহ ও তাহার সহজ বৃত্তি সমূহের একটা সার্থকতা আছে, একথা যদি মিছা না হয়,—তাহলে ইহা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে যে বিভূতি বিকাশের বাধা, শুষ্ক জড় উদাসীন বৈরাগ্যে আত্ম-বঞ্চনার বাহুল্য, আত্মাবমাননায় প্রাচুর্য্য ও আসক্তির অভাব হেতু জীবনের অনেক সহজ কথা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। বৈরাগ্যের রুদ্ধ বাসনাময় জীবন আত্ম-নিগ্রহের নীরস, নিরাশ, জীর্ণ, কঙ্কালসার অবস্থায় বালুকা বিস্তার শুষ্ক নদী বা উষর কঠিন, শ্যামলতাহীন, ক্ষেত্রের মতই নিরর্থক ও অসুন্দর। আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনার অভাবে নিরর্থকতার সে দুরন্ত কালবৈশাখীতে জীবনের চরম অকল্যাণ মরণের বেদনাতুর ক্রন্দন ছাড়া আর বড় কিছু দেখা বা শুনা যায় না। ভোগের "পিয়াস" না থাকিলে সুষমা ও মাধুরী থাকেনা—থাকিতে পারে না।

যে নিথর উদাসীনতায় ভোগের বসন্ত বিলাস শুষ্ক হয়ে যায়—বিশ্ববাসনার অভিসার নিষ্ফল হয়ে যায় তাহাতে পুণ্য নাই, তাহাতে ধর্ম্ম নাই; কেননা তাহাতে মানবের কল্যাণ অসম্ভব। উছল বাসনার উৎসমুখ রুধিয়া রুখিয়া, জীবনের সহিত বোঝা পড়া করিতে গিয়া স্বেচ্ছায় জীবনে মরণের শ্মশান চুল্লী জ্বালাইলে সে চিতার ধূমে ও দাহে বুক ফাটা হাহাকার ছাড়া আর কিছু লাভ নাই: শাস্ত্রের বিধান বা দর্শনের সিদ্ধান্ত পরাভূত ঔদ্ধত্যের সে মর্ম্ম-বেদনা নিবারণ করিতে পারে না।

ভোগ ও ভোগের রসশ্রী বিশ্বের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা—সহজ মানবের সনাতন বুভুক্ষা। সেইজন্য বৈরাগ্যের ভিতরেও একটা দিব্য সুখের লোভ প্রচ্ছন্ন থাকে। ভোগ না থাকিলে নর-নারীর "আমিত্ব" বা "মমত্ব" থাকে না, সেইজন্য জীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাকে চাপিয়া রাখিবার শ্লোক সংহিতায় নানা বিধি নিষেধ সত্ত্বেও ভোগ চিরধ্রুব ও বিশ্ববিজয়ী এবং তাহার ললিত মধুর সুর সর্ব্বতোপ্রসারী। প্রকৃতির প্রাণে রস ও আলোর মত ভোগ জীবনের বাহক ও ধারক। পুঁথি পত্র যাই বলুক জীবনের সিদ্ধি ও সার্থকতা বাসনাক্ষয়ে ততটা নয়, যতটা নির্ভীক

স্বাধীন ভোগের উচ্ছ্বাস আনন্দে ও নর-নারীর অন্তরের অমরাবতীতে বরণ কিরণ গন্ধ গানের উৎসবে। তাই কবি বলেন :—

"মদিরা, মোহিনী, মুরজ বিনা
গোলাপের দিনে কি ফল জীবনে!"

অরুণ রাঙা প্রভাতে সন্ধ্যা সঙ্গত পুরবী ইমনের অসঙ্গত আলাপের মত জীবনের মূল সুরের একান্তই বিরোধী, মানবতার অনন্ত স্বাধীনতার পরিপন্থী বৈরাগ্য ও তাহার কৃপণতা জীবনের বর নয়, অভিশাপ। বৈরাগ্যের মত্ততায় কামনার সার রূপরসগন্ধাদি ত্যাগ করতঃ সত্যকে জোর জুলুমে খর্ব্ব ও ক্ষুণ্ণ করে জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তিকে উপেক্ষা করিলে—ভোগের আনন্দকে নির্ব্বাসিত করিয়া বৈরাগ্যের বন্ধন পীড়নকে ডাকিয়া আনিয়া জীবনে বাসা বাঁধিবার সুযোগ দিলে দুঃখ ভোগই সার হয়। এ দুনিয়ায় যে বাঁচিতে চায়, বাড়িতে চায়, ভোগ বিরাগ তাহার পক্ষে বিষ। ব্যক্তিত্বের বিরোধী শাস্ত্রানুশাসনের উদ্ধত জুলুমে জীবনের পরম নির্ভর ভোগকে উপেক্ষা উৎপীড়ন করিতে থাকিলে জীবনের সকল অনুষ্ঠানেই সৌন্দর্য্য পুলকের ও আনন্দ গুঞ্জনের পরিবর্ত্তে বিষাদ-বেদনার ক্রন্দন ধ্বনি উঠিতে থাকে। বৈরাগ্যকে ভোগের চেয়ে সত্য সুন্দর জ্ঞান করিলে বিসর্জ্জনের বাদ্য আপনি বাজিয়া উঠে এবং হৃদয়ের উপবাসে রূপরসগন্ধস্পর্শ সুর সার্থকতার পথে প্রতিবন্ধক পাইয়া ভয়াতুরের ভীতি কাতরকণ্ঠে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে থাকে।

কাহারও কাহারও চক্ষে ভোগ বিরাগের জড়তা কৃপণতা কৃত্রিমতার একটা উপযোগিতা একটা নিজস্ব মূল্য হয়ত থাকিতে পারে কিন্তু ভোগের উপযোগিতা, মূল্য ও গৌরব উহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অবস্থা বিশেষে বিষের সঞ্জীবনী শক্তির মত বৈরাগ্য ক্বচিৎ কখনও কাহারো জীবনে কিঞ্চিৎ শান্তি বিধান করিলেও জীবনের চরম তাৎপর্য্য ব্যর্থ করে দিয়ে সুখ ও আনন্দ মানুষের হরণ করেছে বেশী।

বাঁশেও ফুল ধরে। লবনাম্বু সমুদ্র বক্ষেও স্বাদু জলের উৎস ধারা প্রকাশ পায়। যতী বৈরাগীরা মনকে তীব্র কঠোর বৈরাগ্যের অভ্রংলিহ তুঙ্গ শিখরে তুলিয়া যতই গর্ব্ব ও আস্ফালন করুন না কেন, ভোগকে কেহই তাঁহারা একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন না। বস্তু থেকে দূরে রাখিয়া ভাবগত করিবার চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু ভোগ ত কারো আবদারে বা মিনতি বিনতিতে তাহার প্রকৃতিগত বস্তুতন্ত্রতা ত্যাগ করে ধ্যানবিলাসী ভাবের বাহু পাশে বদ্ধ হয়ে উপোষিত থাক্‌বার পাত্র নয়। কাজেই বৈরাগীর সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও ভোগ অন্তরের তীব্র তাগিদে উপলব্যথিত নির্ঝরের মত বৈরাগ্যের পাষাণ বাঁধন টুটিয়া ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ সঞ্চারে বস্তুগত হয়ে পড়ে। অতি বড় দিক্‌পাল বৈরাগীর শান্ত সমাহিত চিত্তও ভোগ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে এবং কোন বাধা না মানিয়া ভোগের বৈচিত্র্যে মজিয়া গিয়াছে, জগতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। পৃথিবীতে সব চাপা যায়, কিন্তু ভোগানুরাগ চাপা যায় না। প্রাণের পথে ভোগের

চলাফেরা নিবারণ করা সংযমের সাধ্যের বাহিরে। উপবাসে ক্ষুধা বাড়ে বই কমে না; ক্রমে এমন সময় আসে যখন অখাদ্য, কুখাদ্য, পেয়, অপেয়, বাছ বিচারের সংযম আর থাকে না।

মধুঋতুর মলয় পবন যতই সাধ্য সাধনা করুক না কেন, জমী রস হারালে, পুষ্প-পল্লব দূরে থাক্ তাহাতে তৃণটী পর্য্যন্ত আর গজাতে চায় না। পৃথিবী জল হারালে সাহারার মত রুদ্র মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায়। নর নারী ভোগ হারালে, চিত্তের খোরাক না পেলে, তাহাদের জীবন মরণের মত হিম ও কঠিন হয়ে যায়। কোন সহজ মানব বা মানবী সে অবস্থা চায় না। শুষ্ক নীতিমূল নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজাকে ভিখারী করা ত্যাগ ও অবস্তুপ্রীতির নাগপাশ মুণ্ডিতমস্তক পীতবসন দশ শীলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভিক্ষুদিগকে দেহ মনে ভিক্ষুক করিয়াছিল কিন্তু সংযমের সহিত সৌন্দর্য্যের ও আনন্দের চিরবিরোধহেতু সংযমী করিতে পারে নাই। ভোগ বর্জ্জনের অসঙ্গত সংকল্পে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ছোট হরিদাসের প্রতি লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করেছিলেন। কিন্তু (Polarity) মিথুনীভাব উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে, ঘৃণায় নারীকে অগ্নি জ্ঞান করিবার তাঁহার সে শিক্ষা ও শাসন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে বাতাসে দৃঢ় গ্রন্থির মতই নিষ্ফল হয়েছে। হবেই ত; যাহা ঝুটা তাহা সাঁচ্চা হয় না। মুনিবরের মূষিককে অবশেষে মূষিকই হতে হয়েছিল। আসল কথা এই যে ভোগের মহিমা ও মর্য্যাদা অস্বীকার পূর্ব্বক পাষাণ বৈরাগ্যের শিলাতলে অনুভূতির আধারকে দলিয়া পিশিয়া দেহী দেহের অতীত হইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন যতদিন সে সত্যে ও সৌন্দর্য্যে সজীব ততদিন তার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত না করিয়া উপায় নাই। তাই দেখা যায় মানুষ ফুল দিয়া ভক্তিভরে দেবপূজাও করে আবার প্রীতি ভরে সৌন্দর্য্য বিলাসে প্রিয়ার কৃষ্ণ কবরীও সাজায়। যতই যাই করুক মানুষ কখনও পাষাণ হয় না—দণ্ডকমণ্ডলু গৈরিকের সাধ্য নাই যে সৌন্দর্য্যের ও আনন্দের ব্যাপারে হৃদয়কে আজ্ঞাবহ করে রাখে। নিভৃত তপোবনের সাত্বিক শিক্ষা দীক্ষা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিত্য সঙ্গ সাহচর্য্য মানবের অন্তঃপ্রকৃতির অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ কর্ত্তে পারেনি।

পর প্রত্যয়ে অজানা অধ্যাত্মবোধ লাভের দুরাশায় যখন জ্ঞানের সহিত প্রাণের বিরোধ ঘটে তখন অনুভূতির সহিত জীবনের বিচ্ছেদের ফলে মানবজীবন বৈরাগ্যের দীনতা রিক্ততার ভিতর দিয়া মরণ প্রতীক্ষায় পর্য্যবসিত হয় এবং হৃদয়ের নিরাশায় ও কল্পনার অবসাদে আহত মর্ম্মের মৌন আর্ত্তনাদে মনের পথে হাহাকার করে কেঁদে বেড়ায়। জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের ব্যর্থতায় তখন মানুষ আর মানুষ থাকেনা—মানুষের ছায়া উপছায়া হয়ে দাঁড়ায়; তাই কবি আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।"

ভোগের প্রীতি ও আনন্দেই জীবনের জয়। বৈরাগ্যের রিক্ত দারিদ্র্যে জীবনের পরাজয়। একথা মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী সত্যকামী বৈদিক ঋষিগণও বুঝিতেন। ঘোর সংসারী তাঁহারা চির সুন্দর ও চির মঙ্গলের নিত্য আরাধনায় নিজের জন্য, পুত্র পৌত্রাদির জন্য দেবগণের নিকট ধনৈশ্বর্য্যাদি ভোগোপকরণ প্রার্থনা করিতেন। উপনিষদেও গোধনাদি অর্জ্জনে আলস্য ও অবহেলার অপকারিতা দেখান আছে। সেইজন্য বিশ্বের মূল নিয়মের দিকে সম্যক্ লক্ষ্য রাখিয়া বেদপন্থীরা মানবের নানা ঋণের উল্লেখ করিয়া তাহাকে ভোগের দিকেই প্রবৃত্তি দিবার প্রয়াস পেয়েছেন। শক্তির সাধক তন্ত্রোপাসকেরও প্রার্থনা "ধন দাও, পুত্র দাও, মনোরমা পত্নী দাও।" জীবনে যারা সাফল্যকামী তারা সবাই বলে, "নেব সকল বিশ্ব দাও সে প্রবল প্রাণ।"

ভোগের নিন্দায় পণ্ডিত মূর্খ, দার্শনিক অদার্শনিক, বদ্ধ সংসারী ও মুক্ত সন্ন্যাসী নিজ নিজ রুচি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুসারে মানবতার অপমানসূচক কত কথা বলেছেন তথাপি সৃষ্টির আদিযুগের সেই বিস্মৃত অতীতের দিন থেকে আজ অবধি ভোগ, তাঁহাদের নিন্দা ও নাসিকা-কুঞ্চন সত্ত্বেও অব্যভিচারী কালের মত নিখিল মানবের সেবা সাধনারূপে জগতের মাঝে পূর্ণ-প্রভুত্বে আধিপত্য করিতেছে। বুদ্ধ চৈতন্য খৃষ্টাদির উপদেশ সত্ত্বেও জগৎ আজও বিকাশে, বিন্যাসে, আভাসে, উল্লাসে ভোগময়! আজও ভোগানুরাগ অনন্যপ্রাধান্যে লক্ষ কাজের মাঝে নিশার শেষে উষার অরুণলেখার মত আপনি ফুটে উঠে মানুষের মনকে উজ্জ্বলে মধুরে বেশ আয়ত্ত করে রেখেছে। মানুষ বাঁচিবার জন্য তার জীবনের অনুরোধে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, অবসরে অনবসরে, স্বতঃ পরতঃ হয় ভোগে না হয় ভোগের রোমন্থনে ব্যাপৃত। তাহার সকল কর্ম্ম ভোগের আশায়। তাহার সমগ্র ললিতকলা, তাহার সমস্ত শিল্প বাণিজ্য সেই সার্ব্বজনীন ভোগের জন্যই। আমরা এসেছি এ দুনিয়ায় বাঁচিতে, মরিতে নয়। সে বাঁচা শ্মশানের আধমরা তালগাছের মত শিরে শকুনি ও তলায় শৃগাল লইয়া শুধু দীন প্রাণধারণ নয়—সে হচ্ছে সুখে, বিলাসে, প্রাণের প্রাচুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যের অনাবিল হাস্যধারায় আত্ম প্রসার আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার পরিপুষ্টি করে আনন্দের আদান প্রদান। সেইজন্য জ্ঞানী কবি নিষেধ করে গিয়াছেন :—

"মহত্ত্ব প্রয়াসে
সুকোমল মনুষ্যত্ব করোনা ব্যথিত।"

প্রবৃত্তির পরিণাম সংপ্রসার, কাজেই ভোগের লক্ষ্য ও পরিণতি হচ্ছে ব্যাপ্তি ও বিকাশ। বিশ্ব প্রকৃতিতেও যেমন মানব প্রকৃতিতেও তেমনি—ভোগে সংকীর্ণের বিকীরণ। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে, প্রীতির প্রেরণায়, জীবনের প্রসারের অনুভূতিতে পরকে আপন করিবার প্রয়াস এবং আপনাকে বিলাইয়া দিবার উদারতা ভোগে যতটা আছে বৈরাগ্যে ততটা নাই। উপনিষদের আত্মতত্ত্বও ভোগের স্থূল আনন্দকে তুরীয়ানন্দের পরিমাপক বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

পৃথিবীর জিনিষ হলেও ভোগের ভিতরও যে মোক্ষের সন্ধান না আছে তা নয়। ঠিক যেমন মোহের ভিতর দিয়া কখনও কখনও মুক্তি ফুটিয়া উঠে। সৃষ্টির স্থিতি ও বিস্তারকল্পে জীবে জীবে, জড়ে ও জীবে এবং বোধ হয় জীবে ও শিবে যে যোগ ও সঙ্গতি, যে প্রীতি ও অনুরাগ, যে আলাপ ও আত্মীয়তা, তাহা মনোজগতের বাসন্তীলীলার অন্তর্ভূত ভোগের হর্ষধারার ভিতর দিয়াই ঘটে। বিজ্ঞানে প্রকৃতি যাচাই করিতে গিয়াও দেখা যায় যে ভোগেই জীবের প্রাণ, ভোগেই জীবের আত্মপ্রকাশ এবং ভোগেই জীবের জীবত্বের দুঃখের অপনোদন। বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিলে ভোগ করিতে পাইবে বলিয়াই ধূলিময়ী ধরণীর ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী আর্ত্ত মানব কিছুতেই মরিতে চাহে না। অন্তরে আনন্দরূপে বাহিরে শক্তিরূপে সংস্থিত ভোগ অতীতের শুষ্ক স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হলেই মানুষের দিন ফুরায়। পূর্ণ পক্ব ফলের বৃন্তচ্যুতির মত তাহার মর জীবনের অবসান হয়। জগতেরও প্রলয় হয় যখন ভোগ্য ভোক্তা আর থাকে না।

ভোগেই প্রকৃতির আত্মকথা। বহুরূপা প্রসূতির ঋতু আবর্ত্তন ভোগের উদ্দীপনার জন্য। সেইজন্য ভারতে প্রত্যেক ঋতুরই একটী উৎসব ঠিক করা আছে। ভোগের জন্যই আকাশ বাতাস আলোক, ভোগের জন্যই তনু, মন প্রাণ, ভোগের জন্যই বিশ্বরাণীর সর্ব্বাঙ্গে—"কাননে, কান্তারে, নগরে, প্রান্তরে, বনে, উপবনে"—লতায়, পাতায়, ফলে, ফুলে, বরণ, কিরণ গন্ধাসনে উচ্ছ্বসিত মলয়-মর্ম্মর মধুঋতুর শোভা সুষমার সমবায়। ভোগের জন্যই তরুর শাখায় লতার কুন্তলে কলিকা বন্ধনমুক্ত কুসুমের বর্ণের ছটা ও তার গোপন মর্ম্মমাঝে মধুর কোলে স্নিগ্ধ সুরভিসম্ভার।

ভোগের জন্যই ফুলরাণী অকাতরে হাসিমুখে উষার আকাশে ও সন্ধ্যার সমীরণে লুটিয়ে দেয় তার সুবাসভরা প্রাণ। ভোগের জন্যই পিক পাপিয়ার সপ্তস্বর কিছুতেই বসন্তের সঙ্গ ছাড়েনা। মানব জীবনেও ভোগের জন্যই যৌবনের ললিত বিকাশ এবং তরুণের মনের নিকুঞ্জে পুলকভরা রসের অভিসার ও রূপের উল্লাস। রূপে মোহ, লাবণ্যে মাদকতা, আসঙ্গলিপ্সায় আনন্দ, রসে মাধুর্য্য, স্পর্শে কোমলতা, গানে বিহ্বলতা, নৃত্যে বিচিত্রতা এ সমস্তই সার্থক হয় ভোগে। কবির সর্ব্বগ্রাহী শুভদিব্য কল্পনা মনভুলানো, প্রাণ জুড়ানো নানা লীলা ভঙ্গীতে ভোগেরই অজস্র সঙ্গীতে ধ্বনিত ও ঝঙ্কৃত। চিত্রে মূর্ত্তিতে স্থাপত্যে শিল্পীর "রূপদক্ষের" সহস্র সাধনাসঞ্জাত ললিতকলার কোমল কান্ত ভাবসম্পদ রস সৃষ্টির দিক দিয়া মানবতার পরিপুষ্টিকল্পে ভোগের সৌকর্য্যে ও অনুকূল্যে নিয়োজিত। কেতকী কদম্ববাসিত কেকামুখর আষাঢ়ের নবজলধর দর্শনে কান্তাবিরহিত তৃষিত যক্ষের প্রিয়াপ্রতীক্ষিতচিত্তে প্রেমের মূর্চ্ছনায় যে ভোগোদ্দীপনার উতলা কাকলী মুক্তকণ্ঠে ফুটে উঠেছিল তারই অবাধ্য ব্যাকুলতাতে মানবতার কবি কালিদাসের অনির্ব্বচনীয় কবিত্ব ধরা পড়ে গিয়াছে। শকুন্তলার বিশ্ববিমোহন প্রণয় চিত্রটী এক হিসাবে সমাজদ্রোহী হলেও সহজ ও সার্ব্বজনীন ভোগের জয়ঘোষণায় মুখর। সুন্দর সুদূর যুগ যুগান্তরের আলোক পুলকের সহস্রস্মৃতি বিজড়িত যমুনা তীরস্থ সেই প্রেমের রত্নমঞ্জুষা ও শোকের বিজয়বৈজয়ন্তী

বিশ্ব বিশ্রুত তাজ ভোগী বিরহীর করুণ প্রেমশতদলের অমর স্মৃতির সুরভি মাধুরী দিয়া গঠিত। তপজপ মন্ত্র তন্ত্র সার করে বৌদ্ধভিক্ষুগণ জ্ঞানকে মাত্র বরণ করে লয়ে বাস কর্ত্তেন নিভৃত গিরি গুহায়। কিন্তু সেখানেও চিররুদ্ধ বিশ্বরহস্যের মীমাংসায় ব্যস্ত থাকিলেও ভাব ও ভোগের হাত থেকে তারা অব্যাহতি পান নাই। জ্ঞানের ভিখারীদের সে গিরিগুহাও সাজানো ছিল কত বিবিধ বিচিত্র মোহন কারুকার্য্যের দ্বারা। আসল কথা এই যে, মানুষ আগে কবি ও রূপদক্ষ কলাবিৎ, তারপর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। মানুষ আগে চায় জীবনকে, জীবনের অনুভূতিকে পুষ্পিত করিতে। তাই আজ শ্বাপদ সর্প সহচর মানব সৃষ্টির ললাম।

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়

———

অকারণের বন্ধু

স্বার্থ নিয়ে সবাই আসে, এমন দেখায় ভাব
যেন তাদের আসা যাওয়ায় নেইক' কোন লাভ;
এ কথা সে কথার ছলে সময় সুযোগ বুঝে
নিজের প্রয়োজনটি তারা মাঝখানে দেয় গুঁজে।

অকারণে তোমার আসা, রয়না প্রয়োজন
তবু প্রয়োজনের ছুতো দেখাও সারাক্ষণ,
প্রাণের টানে তুমিই আসো বন্ধু, মাঝে মাঝে
বোঝাও বৃথা আসো যেন জরুরী কোন্ কাজে।
যে অছিলায় আসো তুমি মন গড়া সেই হেতু
তোমার আসা যাওয়ার পথে কাঠের ভাঙা সেতু।

চতুরতার অভিনয় বা হেতুর ছুতোর খোঁজে
বেদনাময় চেষ্টা তোমার, ক'জন বলো বোঝে?
তোমার ছুতো সবায় হাসায়, কাঁদায় আমার প্রাণ
তোমার উদাস দৃষ্টিতে মোর বুক করে আনচান।
কুণ্ঠাভরা ঐ আকৃতি বালাবধূর প্রায়
কাজের ছুতোর ঘোমটা তলে ভয়ে ভয়েই চায়।

সবার লাগি কারণ লাগে তোমার লাগি নয়
অনবধান তোমার সকল কারণ করে জয়।
অকারণেই এসো তুমি, কুড়িয়ে-পাওয়া-ধন,
প্রিয়জনের প্রেমে কি রয় নূতন প্রয়োজন?
অসংসারের বন্ধু, তোমার অহৈতুকী প্রীতি,
তোমার পথের পানেই চেয়ে ঠায় বসে' রই নিতি।

শ্রীকালিদাস রায়

তিলক চরিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যাভ্যাস

তিলকের সময়ে ডেকান কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে কেরোপন্ত ছত্রে ও অধ্যাপক শুট এই দুইজন ছাত্রদিগের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। কেরোপন্ত ছত্রে গণিত ও জ্যোতিষে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং কিছুদিন কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী তেমন ভাল জানিতেন না, সুতরাং তাহার বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ছত্রে কোন বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা করেন নাই, গ্রন্থের সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে গ্রহের বেধ স্বয়ং নির্ণয় প্রথম ছত্রেই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্কচিহ্নের সহিত পৃথিবীতে বারিপাতের কোন নিকট সম্পর্ক আছে। সার্ব্বজনিক সভার ত্রৈমাসিকে এতৎ সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক ছত্রে নিতান্ত সাধাসিধা চালচলনের মানুষ ছিলেন। ছোট বড় সকলের সঙ্গেই তিনি সমান ব্যবহার করিতেন। ছত্রে অনেকটা সেকালের টোল পণ্ডিতদের মত ছিলেন। ছাত্রেরা যখন খুসী তাঁহার বাড়ীতে গিয়া যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইতে পারিত। ছাত্রদের নিমিত্ত তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল। যাতায়াতের ত কথাই নাই ছাত্রেরা সেখানে খাইতে এবং থাকিতেও পাইত। তিনি গরীব ছাত্রদের বেতনের ভার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সরকার বাহাদুর তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের জন্য একশত টাকা পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারের উদ্যোগিবর্গের মধ্যে রাণাডে ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ছিলেন এবং এই ভাণ্ডারে প্রায় এগার হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় অধ্যাপক ছত্রে কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন।

অধ্যাপক শুট অর্থনীতি, ইতিহাস এবং দর্শন অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতি অনন্যসাধারণ ছিল এবং তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ছেলেদের সঙ্গে তেমন মিশিতেন না। অধ্যাপক কারবট কিছুদিন ডেকান কলেজে গণিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞতা ছাত্রবর্গের হাস্যোদ্রেক করিত। এফ্ এ পরীক্ষা পাশ করিয়া তিলক কিছুদিন বোম্বাইর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন হথর্ণওয়েট সাহেব। তাহারও বিদ্যা কতকটা পুঁথিগত বলিলেই চলে। অধ্যাপনার সময়ে তিনি পরীক্ষা পাশের সুবিধা অসুবিধার কথাই বেশী ভাবিতেন সুতরাং তাঁহার শিক্ষণপ্রণালী তিলকের ভাল লাগিল না, তিনি পুনরায় পুণার ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৭৩ সালে তিনি নিজের চেষ্টায় গণিত আলোচনা করিয়া প্রথম বিভাগে বি, এ পাশ করেন। ঐ বৎসর বামন শিবরাম আপটেও গণিত লইয়া প্রথম বিভাগে বি এ পাশ করিয়াছিলেন আপটের সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ অধিকার ছিল কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি যে কোন বিষয় নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারেন ইহার প্রমাণ দিবেন। এইরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ সালে তিলক গণিতে এম্ এ পরীক্ষা দেন, কিন্তু পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন নাই। তখন এম্, এ পড়া ছাড়িয়া ব্যবহার-শাস্ত্রের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এম্ এ পরীক্ষা পাশ করেন। ইহার পর ফার্গুসন কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি আবার এম্, এ পাশ করিবার মানসে, চারি পাঁচ মাস ছুটি লইয়া, প্রোফেসার ঢেকানের সহিত পুণার হীরাবাগে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এবারও তিনি ফেল হইলেন। ইহার পর তিনি আর এম্, এ পাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই এবং অনতিকাল পরে কলেজও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত এবং গণিতে তিলকের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তথাপি একবার ফেল হইয়াই তিনি কেন এম্, এ পড়া ছাড়িয়া দিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। বি এ পাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি স্কুল খুলিবার অথবা অধ্যাপকতা করিয়া জীবন কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাও স্বাভাবিক। বোধ হয় ১৮৭৯ সালে তিনি যখন আইন অধ্যয়নের জন্য ডেকান কলেজে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অগেরকরের সহিত স্কুল স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। পূর্ব্বে বোধ হয় শিক্ষকতা না করিয়া ওকালতি পড়িবার ইচ্ছাই তিনি করিয়াছিলেন এবং এম্, এ পড়া ছাড়িয়া আইন পড়িবার ইহাই প্রকৃত কারণ। তিলকের সঙ্গে যাঁহারা বি এ পাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আইন পড়িতেছিলেন, এম্, এ,র দিকে গিয়াছিলেন খুব অল্প কয়জন। বিশেষতঃ তখন প্রত্যেক উচ্চাভিলাষী কোঁকনস্থ যুবকের চক্ষুর সম্মুখেই রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিকের দৃষ্টান্ত বিরাজমান। তাঁহার ওকালতির পসার তখন খুব বিস্তৃত, সরকার দরবারেও সম্মান প্রচুর এবং জন সাধারণেরও তিনি অতিশয় প্রীতিভাজন। পণ্ডিত সমাজের অগ্রগণ্য না হইলেও তিনি প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফেরোজ শাহা মেতার পূর্ব্বে রাজনীতিক নেতা ছিলেন মাণ্ডলিক। ফেরোজ সাহার মতই কিম্বা তাঁহার অপেক্ষাও কিছু বেশী নিস্পৃহতা ও স্পষ্টবাদিতার তিনি পরিচয় দিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া গিয়াছেন। তিলক এবং মাণ্ডলিক উভয়েই দাপোলো তালুকের লোক, তদুপরি আবার মাণ্ডলিক তিলকের পিতৃবন্ধু। তবে এ বন্ধুত্ব অবশ্য ধনী ও নির্ধনের। কিন্তু বলবন্তরাও সর্ব্বদা মাণ্ডলিকের বাড়ীতে যাইতেন বলিয়া তাঁহার প্রতিভার প্রত্যক্ষ পরিচয় মাণ্ডলিক পাইয়াছিলেন। সুতরাং স্নেহপরবশ হইয়া স্বয়ং মাণ্ডলিক তাঁহাকে এম্, এ না পড়িয়া এল এল বী পড়িবার উপদেশ দেওয়া যেমন সম্ভব,

স্বচক্ষে মাণ্ডলিকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তিনি না বলিলেও তাঁহার ন্যায় হাইকোর্টের উকিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তিলকের মনে হওয়াও তেমনই সম্ভব।

এল এল বীর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র তিলকের বিশেষ প্রিয় ছিল। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলগ্রন্থগুলি ও টীকা তিনি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও পরীক্ষায় যশ অর্জ্জন করা অপেক্ষা মূল বিষয়ে অধিগত হওয়ার দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। উত্তর কালে সামাজিক বাদবিতণ্ডায় এই শাস্ত্র জ্ঞান তাঁহার বিশেষ কাযে আসিয়াছিল।

১৮৮০ সালে ২০শে জানুয়ারীর কনভোকেশনে তিলক এল এল বী পদবী লাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে ওতভড়ে, ও গাতগলে প্রথম বিভাগে ও শিবরাম পন্ত ভান্তাবকর বিষ্ণুপন্ত ভাটবডেকর, গোবিন্দরাও কানিটকর, মনোহর পন্ত কাথবটে, শারঙ্গপাণি, উপাসণী, টুল্লু এবং গণপত সদাশিবরাও দ্বিতীয় বিভাগে এল এল-বী পাশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

বিয়োগ বিধুর

১

ভাঙ্গলো 'লুকাচুরি' খেলা
শ্যামল বাগান শুকিয়েছে,
ডাণ্ডাগুলির হিসাব নিকাশ
দু-দণ্ডে সব চুকিয়েছে।
ঝুল ঝাপ্পুর খেলতো যারা
দুলতো যারা হিন্দোলায়
'কু' দিয়ে সব বাল্যসখা
কোথায় কে আজ লুকিয়েছে।

২

দশ পঁচিশের ছকটি পাতা
রঙের গুটী পাক্‌ছিল
গড়ছিল শর ফুল ধনুকের
ঘরটা খেলার আঁকছিল।
হঠাৎ ধুলোট জমায় মেলায়
রইলো পাশার দান পড়ে
কেউ জানেনা কোথায় তাদের
বন ভোজনের ডাক ছিল।

৩

ধরছে ভাঙন প্রীতির বাঁধে
জল বাজিছে চারদিকে
ফুল ঝরেছে ঠাস বুনানী
গাবেব ফুলের হার থেকে।
লাগলো আগুন ফুল ছড়িতে
শোভার মিছিল ভাঙ্গলোরে
পারবে প্রাণের প্রবল ব্যথা
প্রলেপ দিয়ে সারতে'কে?

৪

কোন পোড়া বাজ ঘর ছাড়া আজ
করলে কপোত পুঞ্জেরে,
করলে সোনার তরীর বহর
ছন্ন ছাড়া কোন ঝড়ে,
দলহারা আজ পদ্ম চাকী
সন্ধ্যা সরের মাঝখানে
পথ ভোলা কোন পথিক ভ্রমর
সেই পথে যায় গুঞ্জরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

সমস্ত দেশ ছাইয়া এক বিরাট জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। সবাই বলিতেছে এইবার দেশের দৈন্য দূর হইবে। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার উঠিয়াছে,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। সকলেই জানে উত্থান ও জাগরণের ফলে যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা শ্রেয়, যাহা বরণীয় তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে কি? সত্যই কি আমরা জাগিয়া আছি?

দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসীর মঙ্গলকামনা করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা অনেক রকম চলিতেছে। কেউ বলেন, গায়ে জোর বাড়াও। কেউ বলেন, ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, শীঘ্রই তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। কেউ বলেন, দেশের মধ্যে বিদ্যার প্রচার কর, হাওয়া বদ্‌লাইবে। কেউ বলেন যে, দেশের শতকরা ৮০ জন লোক একবেলা খাইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সকলের খাবার ব্যবস্থা আগে কর, তার পর ধর্ম্মকর্ম্ম, তারপর বিদ্যা! ও সব এখন বিলাসিতামাত্র! কেউ বলেন, খাইতে পায়না নিজের দোষে। যে সময়টা ঘুমায় বা পর-চর্চ্চা করে, আর মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যায়, সেই সময়টা চরকা চালাইলে অন্নসংস্থান হইবে। কাহারও মত, সব ছাড়িয়া দিয়া চাষ ও চরকা চালাও। উর্ব্বরা জমি অনেক আছে, দেশের সকলে মিলিয়া চাষ করিয়া ফুরাইতে পারে না। আবার কেউ বা বলেন, আগেকার পুরাণো সনাতন ব্যবস্থায় চাষ করিয়া হাঁ করিয়া আকাশের দিকে জলের জন্য তাকাইয়া, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ও শুখাহাজার বালাই এড়াইয়া, কাবুলিওয়ালা ও মাড়োয়ারির কবল থেকে ও জমিদারের গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া চাষার জীবন মরণ সমান। আবার এক দল বলেন, যদি ভারতবর্ষের চারি ধারে এক বিরাট পাঁচিল তোলা যাইত, আর বিদেশীর সংঘর্ষ থেকে তাহাকে বাঁচান সম্ভব হইত, তাহা হইলে চাষ আর চরকা এদেশকে বাঁচাইতে পারিত। তাঁহাদের মতে পাশ্চাত্যের বহির্মুখীন সভ্যতা দেশটাকে অন্যরকমে গড়িয়া তুলিয়াছে, পুনর্গঠন অসম্ভব। পাশ্চাত্য বিলাসের উপকরণ উঠাইয়া দিলে ও দেশজাত বিলাসের উপকরণ বিলাসিতাকে চিরকাল সজীব রাখিবে। আর সজীব রাখিতে গেলে বিদেশীর অনুকরণে 'যন্ত্রাসুরের' উপাসনার জন্য দেশীয় mill industryর প্রসার বাড়াইতে হইবে।

এখন আমরা কি করি? কোথা যাই? এ যে চিকিৎসা-সঙ্কট! নানা রকম রোগ নির্ণয় হইতেছে, নানা রকম চিকিৎসাও চলিতেছে। এরূপ স্থলে যেমন রোগ বাড়িয়াই চলে, কমে না, আমাদের দেশের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। বে-ওয়ারিশ মড়াকে dissection-roomএ মনের মতন করিয়া চেরা-ফোঁড়া খুব সহজ। আমাদের অবস্থাটা প্রায় সেই রকমই। এখন অন্তে "নারায়ণ ব্রহ্ম" ভিন্ন আর উপায় নাই। চিকিৎসক খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

কিন্তু সত্যই কি আমরা বড়ই পীড়িত, সত্যই কি আমাদের অবস্থা এত খারাপ যে কোন

চিকিৎসাই সম্ভব নয়? এটাও হইতে পারে কি যে একটা কুম্ভকর্ণের নিদ্রা আমাদের সমস্ত শরীরটাকে নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে?

দেশের লোকে ঘুমাইতেছে কি জাগিয়া উঠিয়া কাজে মন দিয়াছে, কি জাগিয়া ঘুমাইতেছে, তাহা ঠিক্ বোঝা যায় না। খালি শুনিতেছি চারিদিকে একটা কান্না ও হাহাকার শব্দ। গরিব চাষা কাঁদে—জমিদারের পাইকের অত্যাচারে বা কাবুলিওয়ালা তাহাদের সৌখিন ভাষায় আলাপ করিয়া গিয়াছে বলিয়া। মধ্যবিত্তের কান্না—সংসারের খরচ কুলায় না, অপোষ্য কুপোষ্যদের তাড়না অসহ্য হইয়াছে, কন্যাদায়ের নিষ্পেষণে জীবনের চেয়ে মরণ অধিকতর স্পৃহনীয় হইয়াছে। জমিদার কাঁদেন,—প্রজারা চালাক হইয়াছে, মুখে মুখে তাহারা Bengal Tenancy Actএর অনেক section আওড়ায়, আর জমিদারকে ফাঁকি দেয়। কলেজের ডিগ্রিধারী কাঁদে যে,—পড়ার খরচটা সারা জীবনের রোজগারেও কুলায় না। রোগী কাঁদিতেছে,—কেননা ডাক্তার-কবিরাজের বিলগুলি এত লম্বা চওড়া যে চিকিৎসা করাইয়া এ জন্মের দেহখানি মেরামত করা অপেক্ষা বিনা চিকিৎসায় চিরনিদ্রামগ্ন হইয়া আবার নবকলেবর ধারণ বেশী সুবিধাজনক। Capitalist কাঁদেন,—labourএর অন্যায় আবদারে। আবার labour কাঁদেন—Capitalistএর পীড়নে বা Capitalএর shynessএর জন্য। এ কান্না থামায় কে?

কান্নাটা যদি থামে, তাহা হইলে না হয় একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় বা নিদ্রাভঙ্গের উপায় উদ্ভাবন করা যায়। শুনিতেছি এ কান্নার কারণ বহুদিনের নিদ্রালস দেহের জড়তা। ঔষধ—জাগরণ। আর এ জাগরণ সম্ভব কেবল বিরাট সাধনায়। সেইজন্য রাজনীতিকের দল নূতন কাঠামে নূতন সাজ পরাইয়া নূতন প্রতিমা রচনা করিয়া নূতন আবাহন-গীতি রচিতেছেন। সে গীত গাহিবে কে, কবে, তাহা কে জানে? পূজার আয়োজন, পুষ্পাঞ্জলি, নৈবেদ্য, যথেষ্ট সংগ্রহ হইতেছে। কিন্তু যাহাদের কল্যাণে এ পূজার ব্যবস্থা, তাহারা কি প্রাণের ডাকে আরাধ্য দেবতাকে ডাকিতেছে? পূজারী কি পবিত্রচিত্তে পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছে? দেশের আপামর-সাধারণ বলিতেছে, নয়নের অশ্রু মুছাইবে স্বরাজপ্রাপ্তি। স্বরাজ ভিন্ন উপায় নাই। কথাটা পাকা সত্য, কোন ভুল নাই। কিন্তু নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া "স্বরাজ" পাওয়া আর নিজের স্বাধীনতা ঘুচাইয়া সোনার খাঁচায় থাকা একপ্রকার নয় কি? যে দেশের লোকেরা নিজেদের মা, বোন্, স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য এখনও Manchester, Lancashireএর উপর নির্ভরশীল, তাহাদের আবার স্বরাজ কি? আমি বুঝি দেশের মোটামুটি অভাব, দেশের লোকের টাকায় প্রতিষ্ঠিত, দেশী লোকের দ্বারা পরিচালিত, এ দেশে অবস্থিত কারখানাগুলিতে তৈয়ারি জিনিষের দ্বারা যতদিন পূরণ না হইতেছে, ততদিন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বা "আমরা মা ঘুচাব তোমার দৈন্য" ইত্যাদি ফাঁকা আওয়াজে না দেশী না বিদেশী—কেহই ভুলিবে না। এরূপ পরমুখাপেক্ষী স্বরাজ বিদ্যুতের মত চমকদার হইতে পারে, কিন্তু অতীব ক্ষণস্থায়ী।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম "স্বদেশী"র হুজুগ উঠিল, তখন একটা উত্তেজনা ও উদ্দীপনার বলে অনেকেই স্বদেশী জিনিষের ভক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ভক্তি অচলা রাখিতে পারিয়াছেন। বেশীর ভাগ লোকই বাধ্যতামূলক সংযমের পর ভোগের স্পৃহা বাড়ার মত বিদেশীর মোহ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। আবার কতকগুলি লোক "দু'পয়সা সাশ্রয়" করিবার মতলবে দেশী জিনিষ ব্যবহার সুরু করিলেন। যাঁহারা সুখে দুঃখে স্বদেশী জিনিষের 'বন্ধু'-শ্রেণীর মধ্যে রহিলেন, তাঁহারা আমার প্রণম্য। সে শ্রেণীর লোক যতই বাড়িবে, দেশের অবস্থা ততই ফিরিবে। উদ্দীপনার মূলে অনেক ভাল কাজের সূচনা হয়, কিন্তু এটা সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য যে, উদ্দীপনার প্রথম নেশাটা কাটিলে মানুষের মতটা উল্টাদিকেই চলে। অনেকেই জানেন কোন এক খ্যাতনামা গ্রন্থকার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর শোকোচ্ছ্বাস-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার পুস্তকখানিকে সাহিত্যে অমর করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেইজন্য উদ্দীপনার তাড়নায় যাঁহাদের 'স্বদেশী' প্রেম বাড়িয়া উঠে, আমি তাঁহাদের দেখিলে ভয় পাই। আর যাহারা 'দু'পয়সা সাশ্রয়ের' লোভে 'স্বদেশী' ভক্ত তাঁহারা সেই 'দু'পয়সা সাশ্রয়' পাইলেই আবার 'বিদেশী' ভক্ত হইতে পারেন।

আমার এক সাহেব বন্ধু বলিলেন, লোকের Sentimentএর উপর নির্ভর করিয়া স্বদেশী জিনিষ কতদিন চলে? 'Ultimate economy' দেখা চাই। প্রতি পদে world competition face করা চাই ইত্যাদি। কথাগুলি সমস্তই সত্য, কিন্তু এই ultimate economy জিনিষটা যথার্থ কি? আজ একটা বিলাতের আমদানি জিনিষ তিন পয়সায় বিক্রয় হইতেছে, আর সেই রকম একটা দেশী জিনিষ চারি পয়সায় পাওয়া যায়। তথাকথিত economist বিলাতী জিনিষটা কিনিয়া ঘরে তুলিলেন। সকলে তাঁহার পথ ধরিলেন। ফলে যে দেশী কারখানাটা চারি পয়সায় সে জিনিষটা দিতেছিল, সেটার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইল। Economistএর জাতভাই জনকয়েক অন্নসংস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের অন্ন উঠিল। এইরূপে এইসকল economistদের গুণে একে একে অনেকগুলা industry বা দেশী কারখানা লোপ পাইল, আর দেশটা একেবারেই পরমুখাপেক্ষী হইল। যদি এক পয়সা বেশী দিয়াও দেশী জিনিষটা লোকে কিনিত, তাহা হইলে দেশী কারবারটা বেশ চলিত এবং এরূপ অনেকগুলি কারখানা দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে একটা প্রতিযোগিতার মূলে দামটাও পরে কমিতে পারিত।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে যত দোষ আমাদের দেশের খরিদ্দারের, আর যত কিছু দেবভাব তাহা একচেটিয়া করিয়াছে আমাদের industrialistরা। অনেক সময় industrialistদের নিজেদের দোষেই অনেক কারবার মাটি হয়। অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা অনেকগুলি industryকে নষ্ট করিয়াছে। বিলাতী মাল repacking ও rebottling করিয়া Made in India ছাপে বিক্রয় করার চেষ্টাও অধঃপতনের একটা মূল। অনেকগুলি কারখানা প্রথম প্রথম বেশ ভাল

জিনিষ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিল, তারপর যখন কাটতি বাড়িতে লাগিল, তখন ভেজাল চালাইতে লাগিল। ইহাতে লোকের বিশ্বাস কতদিন থাকে ?

এই ভেজালের চলন দেশটাকে দিন দিন নষ্ট করিতেছে। এটা চলিতে থাকিলে একদিন দেশের মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইবে। এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, ভেজাল-চলনের দোষটা যে ভেজাল দেয় তাহার, না সস্তার খাতিরে যে ভেজাল জিনিষ কিনিতে যায় তাহার ? যিনি বাড়ীতে গরু পোষেন, তিনি জানেন টাকায় /॥০ সেরের বেশী খাঁটি দুধ জন্মায় না; অথচ সেই তিনিই ঘটি হাতে বৈঠকখানার হাটে টাকায় /৫ দুধ খোঁজেন। ভাল ময়দা ও ঘি দিয়া বাড়ীতে কচুরি ভাজিলে একখানা কচুরির খরচা পড়ে /০ আনা, অথচ লোকে দোকানে পয়সায় দুইখানা কচুরি কিনিতে চায়। মাখন হইতে ঘি তৈয়ারি করিতে সের পিছু ৩৲ টাকার কম খরচ হয় না, অথচ খরিদ্দার মুদির দোকানে /১ ঘি ১৸০ আনায় কিনিতে ব্যস্ত; আবার মুদিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "দেখবেন মশাই চর্ব্বি টর্ব্বি মেশান নেই ত'?" উত্তরে দোকানি বলে, "তাও কি হয় মশাই ! ঘি এ চর্ব্বি——!" চারি পয়সা সেরে বেশী দিলে দানাদার চিনি পাওয়া যায়, অথচ সামান্য লাভের লোভে লোকে বাটা চিনি কিনিবে। বোঝেনা যে /৫ সের বাটা চিনিতে যে কাজ হয়, /৩॥০ দানাদার চিনিতে সে কাজ হয়। অনেক ব্যবসাদারের অবস্থা এমন যে ব্যবসা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে খরিদ্দারের মন না যোগাইলে চলে না। তাহাদের পক্ষে ব্যবসা গণিকাবৃত্তি মাত্র, দেশের উন্নতিসাধন নহে। কাজে কাজে ভেজাল চলিতে চলিতে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে খাঁটি জিনিষওয়ালাদের আদর দিন দিন কমিতেছে।

যাহা হউক অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও কতকগুলি স্বদেশী শিল্প টিকিয়া আছে। যুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্বদেশী শিল্প টিকিতে পারে মনে হয়। এ গুলিকে বাঁচাইয়া রাখা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যের যিনি অবহেলা করিবেন, তিনি যেন "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ" বলিয়া চীৎকার না করেন। আমাদের মোটামুটি অন্ন বস্ত্র সংস্থান করিবার জন্য যে সকল industry আজ সচেষ্ট, তাহাদের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অভাব-অভিযোগ-নিবেদন বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। দেশের এ দুর্দ্দিনে প্রত্যেক দেশবাসীর উচিত ছিল নিজেদের বুকের রক্তে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা। কিন্তু এ অভাগা দেশে তাহারা দেশবাসীর করুণার ভিখারী।

যাঁহারা জাগিয়া আছেন বা নুতন জাগিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশী শিল্প বিস্তারের অনেক চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা ঘুমাইতেছেন, তাঁহাদের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলে যদি কিছু হয়। আর যাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা কি হইবে, স্বয়ং ভগবান্ জানেন কি না সন্দেহ।

সভ্য জগতের ইতিহাস বলে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি স্বরাজলাভের প্রথম সোপান। আমরা

এই স্বরাজ চেষ্টার দিনে সেই উন্নতি-কামনা মনে মনে করিলেও কাজে কি করিয়াছি ? স্বদেশী শিল্পের শত্রু অনেক। বিজাতীয় বণিক্ সম্প্রদায় তাহাকে নাশ করিতে অনেক প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সজ্জিত। তাহাদের কর্ত্তব্য তাহারা পালন করিতেছে, তাহাদের দোষ কি ? কিন্তু স্বদেশদ্রোহী বিলাসী সম্প্রদায় তাহাদের নিজেদের ক্ষণিক সুখের জন্য স্বদেশী শিল্পকে যে আঘাত করিতেছে, তাহাতে "Et tu Brute" বলিয়া Caesarএর চিরনিদ্রায় মগ্ন হওয়ার মত স্বদেশী শিল্পকেও বুঝি সেই পথের পথিক হইতে হয়। অন্য সভ্যদেশের লোকেরা তাহাদের নিজের শিল্পের উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ বিদেশী পণ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য আইনের বলে Protective duty বা bountyর শরণাপন্ন হয়। এ দেশের আইন পরদেশীর হাতে। তাহাদের স্বার্থের হানি অসম্ভব। অতএব এরূপ duty বা bounty আমাদের দেশের শিল্পের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইবে না। Protection অর্থে "রক্ষা" আর bounty অর্থে "দান"। দেশের লোকের সামান্য স্বার্থত্যাগের দ্বারা দেশীয় শিল্পকে জীবনদান করা যায়, আর তাহার জীবনরক্ষাও করা যায়। তাহার জন্য Government এর আইনের বিধানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। একদিকে বিদেশী-পণ্য ও বিদেশীর কূট ব্যবসায়নীতি ও অপরদিকে দেশবাসীর ঔদাসীন্য, এই দোটানার মধ্যে দেশী শিল্পের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়াছে—জানিনা কোন্ মহাপুরুষের সঞ্জীবনী মন্ত্রের গুণে মৃতের শরীরে আবার প্রাণসঞ্চার হইবে !

"মৃত্যুঞ্জয়"

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা——শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(ষষ্ঠ গীত)

সায়া।

সে যে মম মধুমাখা ভুল !
তরুণ অরুণ রাগে সদা জাগে মম আঁখির আগে—
আমার সে বিভব অতুল।
বেদনায় গলে যায় প্রাণ,
অশ্রু নামিয়া আসে, রুদ্ধ দীরঘ শ্বাসে ভেঙ্গে বুক হয় শতখান,—
তবু পথ পানে চাই, তবু হাসি, তবু গাহি গান !—
পুলকে বেড়িয়া রাখি স্মৃতি সে মাধুরী-মাখা,
পোড়া প্রাণ পিয়াসে আকুল
সে যে মোর মধুমাখা ভুল !—আমার সে বিভব অতুল

সুর——সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।
স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

সিন্ধু মিশ্র——ঠুংরী।

স্থায়ী।

০ ১
II { র্সর্রঃ -র্সঃ নর্সঃ -ণঃ | ধণঃ -ধঃ পধঃ -পঃ I
সে৹ ৹ যে৹ ৹ ম৹ ৹ ম৹ ৹

২ ৩
I মপঃ -মঃ জ্ঞমঃ -জ্ঞঃ | রজ্ঞঃ -রঃ সরঃ -সঃ |
ম৹ ৹ ধু৹ ৹ মা৹ ৹ খা৹ ৹

০ ১ ২´ ৩
| সা -রা | -সা -জ্ঞা I -রা -া | া া } |
ভু ৹ ৹ ৹ ৹ ল্ ৹ ৹

০ ১ ২´ ৩
| { া সসা | সা সা I রা রা | রপা মপা |
৹ ভরু ণ অ রু ণ রা৹ গে৹

০ ১ ২´ ৩
| -মঃ -জ্ঞাঃ | জ্ঞজ্ঞা -রমঃ মঃ I মা -া | া মমা |
৹ ৹ স দা ৹৹ জা গে ৹ ৹ মম

০ ১ ২´ ৩
| মা মা | মপধণা -র্সর্সা I র্সা -া | -া া } |
আঁ খি র৹৹৹ ৹আ গে ৹ ৹ ৹

০ ১ ২´ ৩
| { ণা ণর্সঃ -র্রঃ | -র্রর্রা র্রা I র্রা র্রা | র্রর্সা র্রা |
আ মা৹ ৹ ৹র্ সে বি ভ ব৹ অ

০		১		২´				
র্মঃ	-র্জ্ঞাঃ |	-র্রা	-র্সা I	-ণা	-ধপা |	-মজ্ঞা	-রঁরসা }	II
তু	•	•	০	•	••	••	••ল্	

অন্তরা।

	০		১		২´		৩		
II {	সা	সা |	সা	-মা I	মা	মা |	মা	-পা	|
	বে	দ	না	য়	গ	লে	যা	য়	

০		১		২´		৩		
| পা	৷ |	৷	৷ I	পা	-৷ |	পা	পা	|
প্রা	ণ্	•	•	অ	০	শ্রু	না	

০		১		২´		৩		
| পা	পা |	পা	পধা I	-পধা	-ধপা |	-মা	-৷	|
মি	য়া	আ	সে॰	••	••	•	•	

০		১		২´		৩		
| মা	-৷ |	মা	মা I	পা	ধা |	ণা	র্সা	|
রু	দ্	ধ	দী	র	ঘ	শ্বা	সে	

০		১		২´		৩		
| মা	মা |	জ্ঞা	-রজ্ঞা I	রা	-সা |	সা	সরা	|
ভে	ঙে	বু	০ক্	হ	য়	শ	ত॰	

০		১		২´		৩		
| মা	-৷ |	-৷	-৷ I	-৷	৷ |	৷	৷ }	|
খা	•	•	•	ন্	•	•	•	

০		১		২´			৩		
| { মা	ণা |	-৷	ণণা I	ণা	ণঃ	-ধণধণঃ |	র্সা	-৷	|
ত	বু	•	পথ	পা	নে	••••	চা	ই	

০			১		২´		৩		
| র্সর্সা	,র্সঃ	নর্সঃ |	-র্রর্সর্রা	-র্সর্রর্সণা I	ণা	ণা |	ণা	র্সণর্সণর্সা	|
ত	•, হা	সি॰	•••	বু••••	ত	বু	গা·	হি••••	

০ ১ ২´ ৩

| র্রা -া | -া -া I -া া | া া } |

গা ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০

০ ১ ২´

| { র্রা র্রা | র্সর্রঃ -র্জ্জা র্রঃ I র্সা র্সা | র্সা র্সা |

পু ল কে০ ০ বে ড়ি য়া রা খি

০ ১ ২´ ৩

| -া ণণা | ণাঃ ণঃ I ধা ধা | পা পা |

০ স্মৃতি সে মা ধু রী মা খা

০ ১ ২´ ৩

| মা মা | পধঃ -ণাঃ I জ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা সা |

পো ড়া প্রা০ ণ্ পি য়া সে০ আ

০ ১ ২´ ৩

| রা -া | া া } I { সা রা | মা -পা |

কু ল্ ০ ০ সে যে মো র্

০ ১ ২´

| ধা ধা | ধা পধঃ -ণঃ I ণা -া | া া |

ম ধু মা খা০ ০ ভু ল্ ০ ০

০ ১ ২´ ৩

| ণা ণর্সঃ -র্রঃ | -র্রর্রা র্রা I র্রা র্রা | র্রর্সা র্রা |

আ মা০ ০ ০র্ সে বি ভ ব০ অ

০ ১ ২´ ৩

| র্মঃ -র্জ্জাঃ | -র্রা -র্সা I -ণা -ধপা | -মজ্ঞা -রসা } II II

তু ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ল্

দ্রষ্টব্য।

রাগিণীর পরিচয় সম্বন্ধে যাহা ১ম গীতের নিম্নে এবং ঠুংরী তাল সম্বন্ধে যাহা ৫ম গীতের নিম্নে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহাই এ গীতের সুর ও তাল সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য।

——লেখিকা।

দুটি সরাই

মুখোমুখী দুটি সরাই। রাস্তার এ পাশে একটা প্রকাণ্ড দালান, হৈ চৈ ও হল্লা'তে মজ্গুল, সমস্তগুলি দরজা জান্লা খোলা, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ছড়াছড়ি, ভেতরে অদ্ভুত কোলাহল, টেবিলের ওপর ঘুষি-চাপড়, কাঁচের গ্লাসের টুং টুং আওয়াজ, লেমনেড্ ভাঙার শব্দ এবং গানের ঝঙ্কার।

"ভারী মধুর সুন্দরী সে—
জাগ্লে প্রভাত আকাশ পারে
নিয়ে রূপোর কল্সাটিকে
অম্নি চলে কূয়োর ধারে।"

সাম্নের সরাইখানাটি একেবারে নির্জ্জন, পরিত্যক্ত শ্মশানের মতো। জান্লার পাখীগুলি সব ভাঙা, দরজার কাছে বড় বড় আগাছা গজিয়েছে, সাম্নের পথটি খোয়ায় আচ্ছন্ন, একেবারে নোংরা! এ এমন দরিদ্র করুণ চোখে তাকায় যে এখানে যাওয়া মানে প্রকাণ্ড একটা দয়ার কাজ করা!

ঢুকে দেখ্লুম নির্জ্জন লম্বা ঘরটা ভয়ানক থম্থম্ করছে। নড়্বড়ে কতকগুলি টেবিল, তার ওপরে কতকগুলি ভাঙা ধূলোমাখা গ্লাশ, পায়া-ভাঙা বিলিয়ার্ডের টেবিল আর চূড়ান্ত মশা! আমি এত মশা কোথাও দেখিনি, ছাতে দেয়ালে গ্লাশে জনলায় ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে বসবাস কর্ছে।

ঘরের শেষ কিনারে জান্লা ধরে একটি স্ত্রীলোক অনিমেষ চোখে বাইরের পানে চেয়ে রয়েছিল।

আমি তাকে ডাক্লুম—শুনুন কর্ত্রী।

সে আস্তে মুখ ফেরাল। দারিদ্র্যচিহ্নিত কুৎসিত করুণ মুখখানি দেখ্লুম। আদতে সে মোটেই বৃদ্ধা নয়, বেশী কেঁদে কেঁদে তার মুখের সমস্ত রঙ্ ধুয়ে গেছে।

সে চোখ মুছে জিজ্ঞেস কর্লে—আপনি কি চান্?

বল্লুম—কিছু খাব ও খানিকক্ষণ বসব।

সে আমার পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইল যেন সে আমার কথার মানে বুঝ্তে পারে নি।

জিজ্ঞেস কর্লুম—এটা কি সরাইখানা নয়?

মেয়েটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে।

—হাঁ, যদি বলেন, সরাইখানাই বটে। কিন্তু আর সবাইর মতো ঐটেতেই আপনি গেলেন না কেন? ওটায় যে বেশী ফুর্ত্তি......

—আমার কাছে এই-ই ভালো। আপনার কাছেই থাক্তে চাই এখানে।

তার কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করে' একটা টেবিলের কাছে বসে পড়্লুম।

যখন সে বুঝ্লে আমি সত্যিই ঠাট্টা কর্ছি না, সে ভারী ব্যস্ত হয়ে দরজা জান্লা খুলে দিলে, বোতল গুছোল, গ্লাশগুলি মুছ্ল নেক্ড়া দিয়ে, আর মশা তাড়াতে লাগ্ল। পেছনের ঘরে গিয়ে চাবীর আওয়াজ করে' তালা খুলে রুটির বাসন, মদের বোতল ও খাবার প্লেট বা'র্ কর্ল। আর মাঝে মাঝে তার ফুঁপিয়ে ওঠা এক গভীর দীর্ঘশ্বাস কাণে এসে লাগ্তে লাগ্ল ক্ষণে ক্ষণে।

—এই নিন্ বলে' খাবারের থালা ও বাটিগুলি আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে সে আবার তার জান্‌লাটির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞেস্ করলুম—আপনার এখানে লোক আসে না, না?

—না, একটিও না। আমরা যখন একলা ছিলাম এখানে, তখন এ-রকমটি ছিল না, আমাদের ঘরে তখন লোক ধরত না আর। কিন্তু ঐ প্রতিবেশিনী আসতেই সব উল্টে গেল। লোকে বলে—এইটে একদম নীরস নোংরা তাই সবাই ওরা ঐটেয় যায়। এ বাড়ী সত্যিই সুন্দর নয়, আমিও দেখ্‌তে একটুও ভালো নই, ঘুরে ঘুরে আমার জ্বর হয়, আমার দুটি মেয়ে মারা গেছে, তাই কাঁদি। ও-সরাইয়ের কর্ত্রী-মেয়েটি চমৎকার দেখতে, দামী পোষাক পরে, গলায় তার সোনার হার, তার দাস দাসীর অন্ত নেই। সমস্ত সহর—গাঁয়ের যুবকরা তার ভক্ত, সবাই তার খরিদ্দার, আর আমার ঘরে কেউ ভুলেও একবার পা ফেলে না একটি দিনের জন্যও।

জান্‌লার কাঁচের ওপর কপালের ভর রেখে সে তেমনি উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও-দিকের সরাইখানাতে তার যেন কি একটি জিনিষ দেখ্‌বার আছে।

হঠাৎ রাস্তার ও-ধারে একটা হল্লা বেধে গেল। গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ গোলমাল—সব কিছু ছাপিয়ে উঠ্‌ল কার ভারী চওড়া গলার গান।

"নিয়ে রূপোর কলসীটিকে
সাম্‌নে কুয়োর দাঁড়িয়ে আছে,
দেখ্‌তে মোটেই পাচ্ছে না যে
তিনটি সেনা আস্‌ছে পাছে।"

সেই সুর শুনে মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ল। আমার দিকে চেয়ে আব্‌ছা গলায় বল্লে—শুন্‌ছেন? ঐ আমার স্বামী, খুব চমৎকার তাঁর গলা, না?

আমি তার দিকে স্তম্ভিতের মতন চেয়ে রইলুম।

—কি? আপনার স্বামী? আপনার স্বামীও ওখানে যায় না কি?

হৃদয়-নেংড়ান সুরে সে বল্লে—আপনি কি আশা করেন? মানুষের ঐ স্বভাব, তারা কাঁদুনে লোককে দেখ্‌তে পারে না, কান্না সহ্য হয় না কারুর, আমার মেয়ে দুটি চলে' গেছে পর আমি রোজ কাঁদি। তার পর এই নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড ঘরটা—যেন বিষাদে মাখামাখি। যখন তিনি ভারী শ্রান্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন তখন তিনি ঐ সরাইখানায় যান। তিনি চমৎকার গাইতে পারেন, ওখানকার কর্ত্রী সুন্দরী মেয়েটি তাঁকে গান গাইতে খালি অনুরোধ করে! চুপ! ঐ তিনি গাইছেন!

সে জান্‌লা ধরে' তেম্‌নি দাঁড়িয়ে রইল, তার দুটি প্রসারিত হাত কাঁপছে, গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে' পড়্‌ছে, আর তাকে ভারী কুৎসিত দেখাচ্ছে এতে। তার স্বামী তখন সরাইখানার সুন্দরী কর্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার অভিলাষে গেয়ে চলেছেন—

"প্রথম জনে বল্লে তারে
কেমন আছ লাল পরী গো?"——*

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

* আলফন্স্ দোদে হইতে।

উদয়পুর-দৃশ্যাবলী

("মাধুরী"র সৌজন্যে.)

"জগনিবাস" হ্রদ
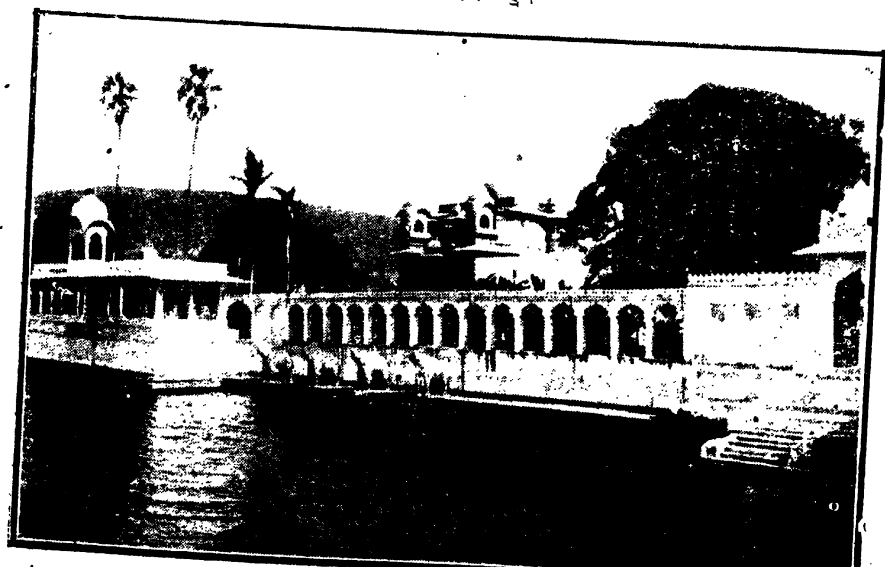
ত্রিপোলিয়া ও প্রাসাদ
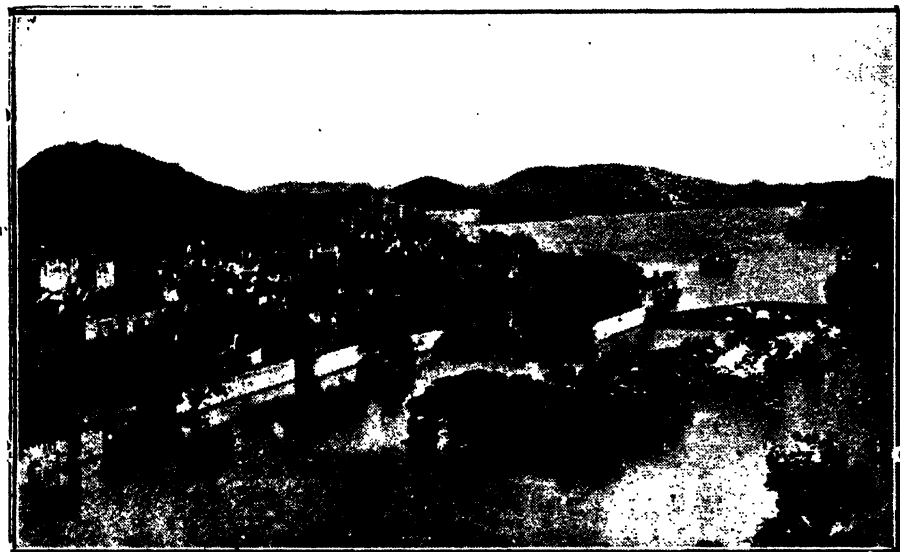
পেশোলা হ্রদ

" শিবনিবাস "

জগদীশ-মন্দির

গণগৌর ঘাট

রাজপ্রাসাদ ও নগর
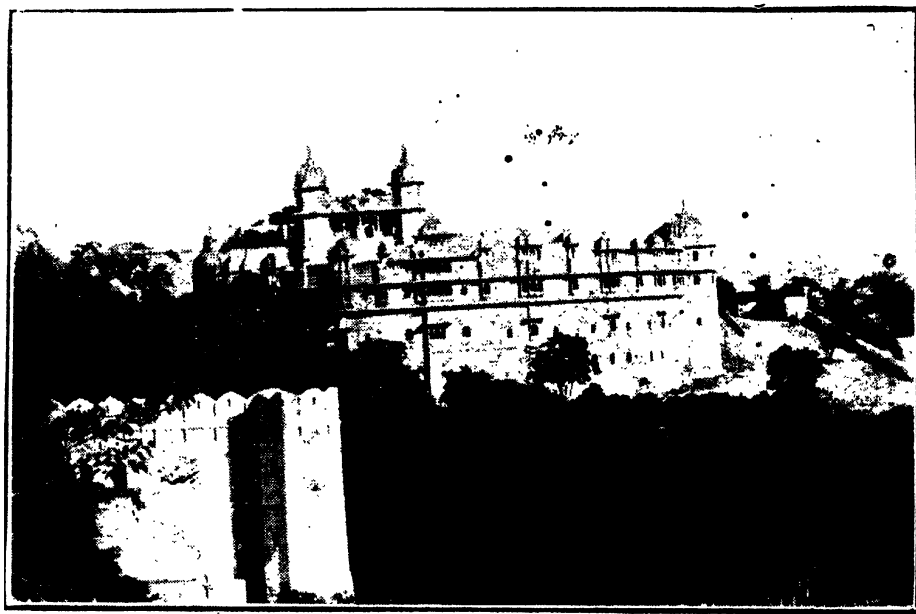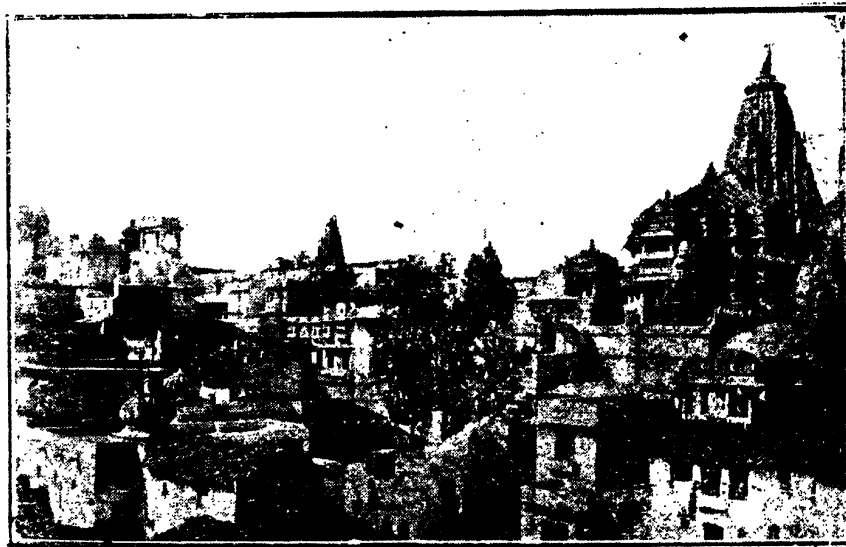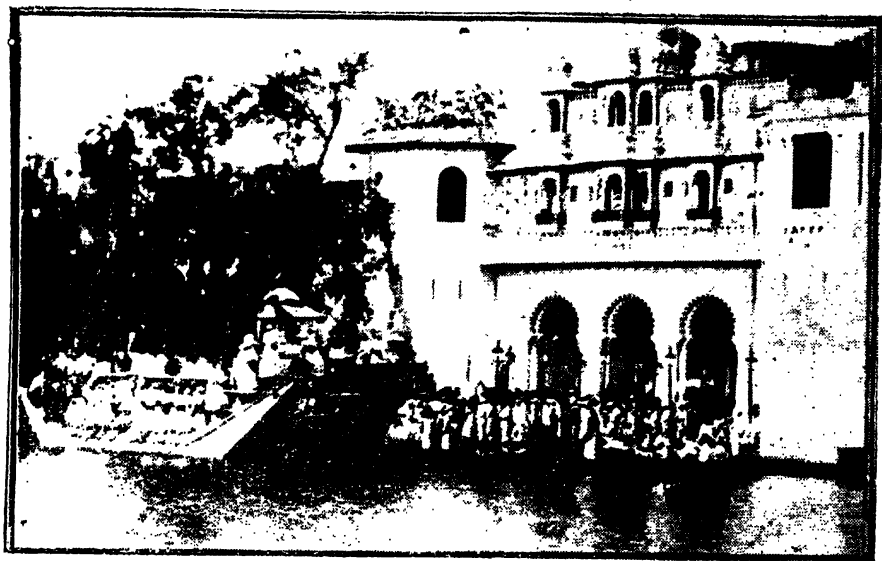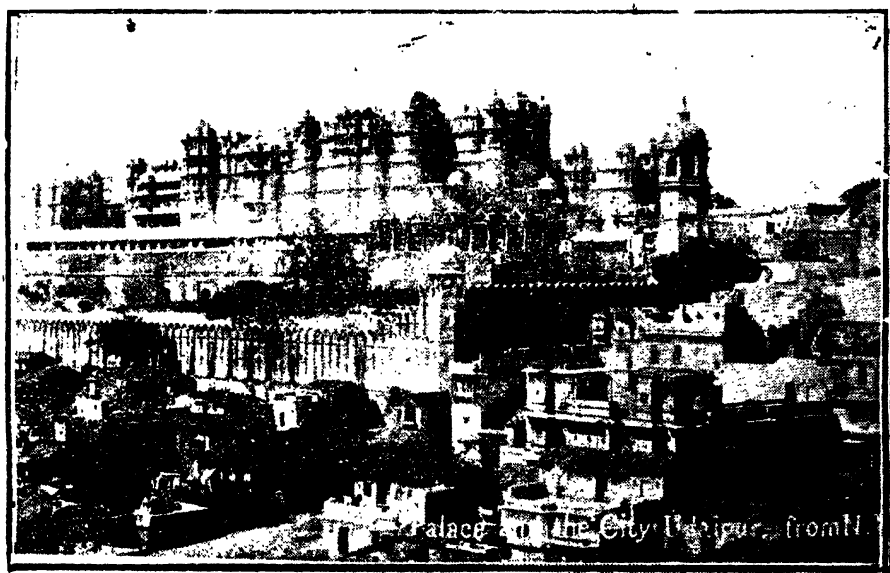
গুরুমন্ত্র

(১)

চোদ্দ বছর বয়সে মৃদুলার যখন বিবাহ হইল তখন, শুভদৃষ্টির সময়ে এক নিমিষের জন্য তরুণ কিশোর স্বামীর দিকে চাহিয়াই তাহার মনে হইল, তাহার মত ভাগ্যবতী কেহ নাই। এই স্বামী-সৌভাগ্যের গর্ব্ব অনুভব করা তাহার পক্ষে তেমন অসঙ্গত হয় নাই; কেননা কুলে শীলে, রূপে গুণে, স্বাস্থ্যে অর্থে মৃদুলার স্বামী, স্বামী হইবারই উপযুক্ত। কিন্তু এই সৌভাগ্য তাহার কাছে অতুল সম্পদ বলিয়া মনে হইল, যখন সে বুঝিতে পারিল, স্বামী তাঁহার সবটুকু স্নেহ মমতা এবং ভালবাসার অর্ঘ্য দিয়া তাহাকে তাঁহার তরুণ হৃদয়ের রাণী করিয়া লইলেন। মৃদুলার মনে হইত তাহার স্বামী দেবতা। দেবতার মতই সে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আরাধনায় ডুবিয়া গেল।

মৃদুলা, শিবপূজা করিত। পূজার উপকরণ সাম্‌নে রাখিয়া যখন সে চোখ্ বুঁজিত, তখনি দেখিতে পাইত, তাহার অন্তরের মধ্যে স্বামীরই দিব্য মূর্ত্তি দেবত্বের মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিগদ্গদ চিত্তে, এক একটি করিয়া ফুল ও বেলের পাতা যখন সে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিত তখন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইত, তাহার প্রত্যেকটি ফুল ও বেলের পাতা, স্বামীর পায়ে যাইয়া স্থান পাইতেছে। পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া, স্বামীর পায়ে প্রণাম করিয়া বলিত, "তুমি আমার দেবতা, আমার অন্য দেবতা নাই"।

সত্যেন্দ্র শুনিয়া হাসিত। মৃদুলা স্বামীর এই হাসির মধ্যে তাহার জীবনের চিরবাঞ্ছিত ধনের সন্ধান পাইয়া ধন্য এবং তৃপ্ত হইত।

এমনি একটানা সুখের স্রোতের মধ্য দিয়া একে একে পঁচিশটি বছর কাটিয়া গেল; তরুণ তরুণী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া হইল, কিন্তু তাহাদের ভালবাসা তেমনি জীবন্ত, জাগ্রত ও প্রখর রহিল। পাকাচুল ও শিথিল চর্ম্মের অন্তরালে যে দুইটি হৃদয় ভালবাসার ভরা জোয়ারে টলমল করিতেছিল, তাহা তখনো তরুণ ও তরুণীর।

(২)

সে বছর পূজার সময়ে মৃদুলা ও সত্যেন্দ্র বাড়ী আসিল। একদিন বিকালে, তাহাদের প্রতিবাসী নন্দর দিদি তুলসীদাসী, কুঁড়োজালির মধ্যে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃদুলা তাঁহার বসিবার জন্য তাড়াতাড়ি একখানা কুশাসন পাতিয়া দিল। তুলসীদাসী আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন আছিস্ বউ ?"

মৃদুলা বলিল, "বেশ আছি ঠাকুরঝি।"

"তোর বউরা বুঝি কেউ আসে নি ?"

"না, ঠাকুরঝি। বেটের এখন তাদের নিজের নিজের গেরোস্তালি—তাদের সুবিধে বুঝে তো আসবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌লে কি তাদের চলে ?"

"আমাদের সময়ে কিন্তু চল্‌তো, বউ। সোয়ামীর কাছা ধরে ব্যাড়ানো,—সে আমরা লজ্জায় ভাবতেও পারিনি।"

কথাটা এক রকম সত্য, কেননা তুলসীদাসী দশ বৎসর বয়সে বিধবা, সুতরাং স্বামীর কাছা ধরিবার সুযোগ বিধাতা তাঁহাকে কোন দিন দেন নাই।

মৃদুলা বলিল, "তা থাক্, ঠাকুরঝি, তারা তাদের নিজের সংসার নিয়ে সুখে থাক্।"

তুলসীদাসী বলিলেন, "এখনকার বউরা, সে তুই বল্‌লেও থাক্‌বে, না বল্‌লেও থাক্‌বে। তা' থাক্‌গে। তুই-ই বা তাদের কি তোয়াক্কা রাখিস—সত্যেন তিনশো টাকা মাইনে পাচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছায়, তোর দিন একরকম ভালই কেটে গেল। তা' হ্যাঁ, বউ, দিন তো এক রকম হয়ে এল, পরকালের কিছু করেছিস্ ?"

প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মৃদুলা তুলসীদাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তুলসীদাসী বলিলেন, "বলি, এ দিকটা তো বেশ সুখে সোয়াস্তিতেই কাটালি কিন্তু পরকাল—সেটা হচ্ছে আসল, খাঁটি জিনিষ, সেটার চিন্তা করবার তো এখন বয়স হয়েছে।"

মৃদুলা হাসিয়া বলিল, "তার আর কি চিন্তা করব, ঠাকুরঝি ? সে যা হয় হবে।"

"ওমা, বলিস্ কি ? পরকালের উপায় কর্‌বিনি—উদ্ধারের চিন্তা করবিনি !"

মৃদুলার মনে কেমন যেন একটা খোঁকা লাগিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, দুর্জ্ঞেয় পরকালের কথা, মধ্যে মধ্যে স্বামীবিচ্ছেদের দুর্ভাবনা লইয়া তাহার মনে আসিত। তাহা ছাড়া সে বিষয়ে যে চিন্তা করিতে আর কিছু আছে তাহা তাহার কোন দিন মনেও আসে নাই। সে জানিত তাহার স্বামীই ইহকাল পরকালের দেবতা—তাঁহাকে পূজা করিয়া তাহার ইহকাল যেমন সুখে কাটিতেছে, পরকালও তেমনি সুখে কাটিবে। কাজেই এই নূতন প্রশ্নে সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—

"মেয়েমানুষের স্বামীই ইহকাল, পরকাল।

তুলসীদাসী, "গুরুভরসা" বলিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শুনিস্‌নি বউ, অন্তিমে কেউ কারো নয়। অন্তিমে গুরু ভরসা।"

মৃদুলা ভাবিল, স্বামীই তো গুরু—আর আবার গুরু কে ? সে চুপ করিয়া রহিল।

তুলসীদাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মন্ত্র নিয়েছিস্ ?"

মৃদুলা বলিল—"না"।

যদিও তুলসীদাসী তিনকাল কাটাইয়া বাট'বছর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

"ওমা, এখনো মন্তর নিস্‌নি। ওটা নিয়ে ফেল্ বউ, আর দেরি করিস্ না। হিঁদুর ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যে ওটাও একটা কর্ম্ম। দীক্ষা না নিলে তার উদ্ধার নাই। তোদের কুলগুরু কে ?"

মৃদুলা বলিল, "আমাদের গুরুবংশের কেউ নেই।"

"তা নেই নেই। আমার গুরুদেব—" বলিয়াই তুলসীদাসী কুঁড়োজালি সহিত হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ দেবতা। ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর নখদর্পণে। তাঁর কাছে মন্তর নে। তাঁকে একবার দেখলেই তোর চোখ্ খুলে যাবে। আর কি ক্ষ্যামতা তাঁর! ধূলো মুঠো হাতে করে, সোণা মুঠো করে দেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি বউ। গুরু—পারের কাণ্ডারী,—" বলিয়া তিনি আবার কপালে হাত ঠেকাইলেন।

মৃদুলা তবু কোন কথা বলিল না। তখন তুলসীদাসী আসন হইতে উঠিয়া খুব মুরুব্বিয়ানা ধরণে বলিলেন,

"ওটা করে ফেলিস্ বউ, আর দেরি করিস্ না। আমার গুরুদেব সকালেই আস্‌চেন, এলেই তোকে আমি খবর দেবো।"

কুঁড়োজালির মধ্যে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি চলিয়া গেলেন। মৃদুলার মনের মধ্যে পরকালের কথাটা সেই সময় হইতে কেমন যেন উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগিল।

(৩)

মণীন্দ্র, গ্রাম সুবাদে সত্যেন্দ্রের ভাই। সে বি, এ, পাস, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ—কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই। পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাই চলে আর সাধুসন্ন্যাসীর নাম শুনিলেই সেখানে ছোটে। কিছুদিন হইল, কোথায় এক অসাধারণ স্বামীজির সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। মণীন্দ্র তাঁহার কাছে দীক্ষা লইয়া, গেরুয়া ধারণ করিয়া যোগাভ্যাসে মন দিয়াছে। পিতার আশীর্ব্বাদে অর্থোপার্জ্জনে তাহার মন দিতে হইত না, কাজেই যোগে মন দেওয়ার তাহার অখণ্ড অবসর ছিল।

মণীন্দ্র কিছুদিন বাড়ীতে ছিল না, হরিদ্বার গিয়াছিল। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, সত্যেন্দ্রেরা আসিয়াছে। সত্যেন্দ্রদের সহিত দেখা করিবার জন্য এক দিন সে তাহাদের বাড়ীতে গেল। সত্যেন্দ্র তখন বাড়ীতে ছিল না। মৃদুলাকে দেখিয়া মণীন্দ্র বলিল,—"ভাল আছ তো বউদি ?"

মৃদুলা, মণীন্দ্রের দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"একি মণি ঠাকুর পো, তোমার এ বেশ ?"

মণীন্দ্র, হাসিয়া বলিল, "আমি দীক্ষা নিয়েছি।"

মণীন্দ্র বি, এ পাস। বি, এ পাসের উপরে মৃদুলার বড় ভক্তি ছিল, কেন না, তাহার

স্বামীও বি, এ পাস। এই বি, এ পাস ঠাকুরপোটিও দীক্ষা লইয়াছে শুনিয়া তাহার মনের মধ্যে তুলসীদাসীর কথাগুলি আবার জাগিয়া উঠিল।

মৃদুলাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, মণীন্দ্র, একটু হাসিয়া বলিল,—"দাদার তো এ সব বালাই নাই।"

কথাটা উপহাসের হইলেও মৃদুলার তাহা ভাল লাগিল না। কেননা, তাহার স্বামীর কোন ক্রটী ধরিয়া কেহ কিছু ইঙ্গিত করিলেও তাহার সহ্য হইত না। মৃদুলা, স্বামীর দোষ ঢাকিবার জন্য বলিল,—"আমাদের যে গুরু নাই।"

মণীন্দ্র সুযোগ পাইয়া বলিল, "গুরু না থাক্‌লেও পরকাল তো আছে? দাদাকে বুঝিয়ে কারো কাছে সাধন নাও। ওটা না হ'লে মনুষ্য জন্ম বৃথা।"

মৃদুলা সত্যই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—"সত্যি, ঠাকুরপো?"

"সত্যি না তো কি? শুন্‌তে যদি স্বামীজির কাছে তা হ'লে বুঝ্‌তে পারতে কি অন্যায় করেছ। তাঁর শ্রীমুখে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব যদি দাদাও শোনেন তা' হ'লে তাঁকেও তাঁর শিষ্য হতেই হবে—এ তোমাকে বলে রাখ্‌লাম। বেদ, বেদান্ত, উপানষদ তাঁর কণ্ঠস্থ। সংসারে থাক্‌লেও একেবারে নিঃস্পৃহ—জীবন্মুক্ত।"

মণীন্দ্রের বর্ণনায়, স্বামীজির উপরে মৃদুলার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইতে লাগিল। সে বলিল,—"তিনি এদিকে আস্‌বেন না, ঠাকুর পো?"

"আস্‌তেও পারেন। তাঁরা কামচর। লোকের মনোভাব বুঝে, যারা সাধন নেবার জন্য ব্যাকুল, অযাচিত তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে, সাধন দিয়ে যান।"

সাধনের কথা ঐখানেই শেষ হইল। সত্যেন্দ্র তখনো বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া, মণীন্দ্র চলিয়া গেল।

রাত্রে স্বামীর পাশে শুইয়া মৃদুলা দীক্ষার কথাটা ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু স্বামীকে দেখিয়াই তাহার ইহকাল পরকাল একাকার হইয়া গেল। কিন্তু তবু সে অনেক চেষ্টা করিয়া সত্যেন্দ্রকে বলিল,—"একটা কথা শুন্‌বে?"

সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"এস আমরা মন্তর নেই।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কিসের মন্তর—সাপের?"

মৃদুলা, গম্ভীর হইয়া বলিল,—"ছি, এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা কর'তে নাই।"

"আচ্ছা, না-ই করলাম ঠাট্টা। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ এ কথাটা আজ মনে হলো কেন?"

"মনে কি হ'তে নাই? পরকালের কথা ভাব্‌বার তো আমাদের বয়স হয়েছে।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—"পরকালের ভাবনা ভাব্‌বার বুঝি একটা বয়স ঠিক্ করা আছে? ইহকাল যদি ঠিক থাকে, পরকাল আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তাঁর জন্য ভাব্‌তে হবে না।"

মৃদুলা, অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল,—"তাই কি না?"

"তাই, মিলি। আচ্ছা কখনো মিথ্যা কথা বলেছ?"

"না।"

"চুরি করেছ?"

মৃদুলা, হাসিয়া বলিল, "না।"

"কারো ভাল দেখে হিংসা করেছ?"

"ভালো দেখ্‌লে হিংসা হয় না কি?"

"তোমার হয় না কিন্তু অনেকের হয়। যাক্ তোমার হয় না। দুঃখী দেখে দয়া হয়?"

"সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। তা সকলেরি হয়ে থাকে।"

"ভগবানে বিশ্বাস আছে?"

"আছে" বলিয়া মৃদুলা অভিমানের সুরে বলিল, "অত কথার আমি উত্তর দিতে পারি না। আমি যা বল্‌লাম তার উত্তর দাও।"

কথাটা গ্রাহ্য না করিয়া, সত্যেন্দ্র একটু দুষ্ট হাসি মুখে আনিয়া বলিল, "কখনো পরপু——"

মৃদুলা, স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ্।"

সত্যেন্দ্র, হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে পরকালের জন্য তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।"

কথাটা মৃদুলার মনঃপুত হইল না। গুরু মন্ত্র না হইলে যে সংস্কার অপূর্ণ থাকে এইটাই তখন তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর এদিকে তেমন আগ্রহ নাই দেখিয়া সে কিছুদিন চুপ করিয়া রহিল।

প্রায় দুইমাস পরে হঠাৎ একদিন মণীন্দ্র ঝড়ের মত মৃদুলার কাছে আসিয়া বলিল, "বউদি, তিনি এসেছেন।"

মৃদুলা, জিজ্ঞাসা করিল—"কে, ঠাকুরপো?"

"স্বামীজি। নিশ্চয়ই তোমার মনে, সাধন নেবার জন্য খুবই আকুলতা জন্মেছে। স্বামীজির আগমন নিশ্চয়ই সেইজন্য, নইলে, তাঁর এখন আস্‌বার কোন কথা ছিল না।"

দীক্ষার জন্য মৃদুলার মনে একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল সে কথা সত্য। এই অন্তর্দর্শী মহাপুরুষকে একবার দেখিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া মণীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন, ঠাকুরপো?"

মণীন্দ্র বলিল, "আমাদের বাড়ীতে। চলনা একবার তাঁকে দেখ্‌বে। তাঁকে দেখ্‌লেই তোমার ভক্তি হবে—তোমার সকল সন্দেহ কেটে যাবে।"

মৃদুলা বলিল, "যাবো।"

"কখন?"

"তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করে বল্‌ব।"

"বেশ, তা' হ'লে কাল দুপুরে আস্‌ব।" বলিয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল।

যখন মৃদুলা ও মণীন্দ্রে কথা হইতেছিল, তখন সত্যেন্দ্র পাশের ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। মণীন্দ্র যাইতেই সে মৃদুলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মণি এসেছিল কেন!"

মৃদুলা বলিল, "স্বামীজি এসেছেন।"

সত্যেন্দ্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কৌতুকের স্বরে বলিল, "স্বামীজি!"

মৃদুলা, বিরক্তির ভাবে বলিল, "সব কথাতেই ঠাট্টা।"

"আহা, স্পষ্ট করে না বল্‌লে বুঝ্‌ব কি করে?"

"মণি ঠাকুরপোর গুরু—স্বামীজি।"

"ও, বুঝেছি। তাই কি?"

মৃদুলা হাত দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "চল না, তাঁর কাছে দুজনে দীক্ষা নেই।"

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল, "গুরুর একাক্ষর মন্ত্র কাণে না গেলে যে পরকালের পথ মুক্ত হয় না, তা আমি বিশ্বাস করি না, মিলি। গুরু বাক্য যে অভ্রান্ত তাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

মৃদুলা বলিল, "কিন্তু সকলেই তো বলে গুরুবাক্য অভ্রান্ত।

"তুমিও তা মনে করতে পার, কিন্তু আমার যে অতটা ভক্তি বিশ্বাস নাই।" তার পর একটু হাসিয়া বলিল, "বেশ তো, তুমি যদি তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাও, নাও না।"

সত্যেন্দ্র জানিত, তাহাকে বাদ দিয়া কোন কাজ করাই মৃদুলার পক্ষে সম্ভব নহে। মৃদুলা, চুপ করিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র বলিলি, "নেবে?" সত্যেন্দ্র মনেমনে নিশ্চয় জানিত মৃদুলা উত্তর দিবে "না"।

কিন্তু মৃদুলা যখন বলিল, "পর কালের পথ কে করতে না চায়।" তখন সত্যেন্দ্রের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা গুরুতর আঘাত লাগিল। মৃদুলার কথায় তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যেন পরকালে তাহারা কেউ কারো নয়। তাহাদের মিলনের নিবিড় বন্ধন, মৃদুলা যেন এক কথায় শিথিল করিয়া দিল,—সত্যেন্দ্রের সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে কতকটা অভিমানের সুরে বলিল,—"বেশ ত, তুমি দীক্ষা নাও; তোমার পরকালে যাতে গতি হয়, তার আমি অন্তরায় হতে চাই না।"

মৃদুলা, কাতর হইয়া বলিল, "তুমিও নেবে।" সত্যেন্দ্র কেবল একটি কথায় উত্তর দিল, "না।"

মৃদুলা, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যার পরে, সত্যেন্দ্র মৃদুলাকে বলিল, "মিলি, কাল ভোরে জলপাইগুড়ী যাবো। চা-বাগানের টাকাগুলি, না গেলে পাওয়া যাবে না। চিঠি লিখে-লিখে হায়রাণ্ হয়ে গেছি। দিন দশেক দেরি হবে।"

পরদিন সকালে সত্যেন্দ্র চলিয়া গেল।

(৪)

দুপুরে, মণীন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "বউদি।" মৃদুলা বলিল "চল।"

তাহারা যখন স্বামীজির নিকটে উপস্থিত হইল তখন মণীন্দ্রদের বৈঠক খানায় লোকের ভিঁড় জমিয়া গিয়াছে। গ্রামের বহু স্ত্রীপুরুষ সেখানে উপস্থিত। মধ্যস্থলে, একখানা আসনের উপরে স্বামীজি বসিয়াছেন। তাঁহার পুষ্ট, উন্নত গৌর দেহশ্রী দেখিলেই মনে হয় তিনি একজন মহাপুরুষ। স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি শ্রোতাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, জগৎ মিথ্যা; পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্বামীস্ত্রী, এ শুধু মায়ার সম্বন্ধ—বাজিকরের ভেল্‌কি। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম—এ কেবল তাই। বেদ, উপনিষদ, পুরাণের জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন, এই বিরাট জগৎ একটা মোহের স্বপ্ন। তাঁহার বাক্য-বিন্যাসের অসীম কৌশলে তাঁহার ভাব প্রকাশের অতুলনীয় ভঙ্গীতে, তাঁহার প্রবল যুক্তির মুখে, ফলে ফুলে ভরা, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী, শ্রোতাদের চোখের উপর, দেখিতে দেখিতে অবাস্তবে মিলাইয়া গেল; যাহা চাক্ষুষ, যাহা এতদিন রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে জীবন্ত জাগ্রত মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছিল, তাহা একটা শূন্যগর্ভ জল বুদ্‌বুদের মত স্বামীজির প্রবল যুক্তির খোঁচায় বিদীর্ণ হইয়া, অসীম শূন্যের মধ্যে লয় পাইল! এত দিনের রক্তের টান, নাড়ীর বন্ধন, সব মিথ্যা হইয়া গেল, আর মৃত্যুর পরপারের চির-অন্ধকার—চির-দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তাহার কুহেলিকা ভেদ করিয়া, আভ্রান্ত সত্যের আকারে দেখা দিল।

ভাবের আবেগে শ্রোতাদের মন টলমল্ করিতে লাগিল।

স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হইতেই দলে দলে নরনারী তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া সাধন চাহিল। হাসিমুখে স্বামীজি সকলকে সাধন দিয়া ধন্য করিলেন।

সকলের মত মৃদুলার মনও প্রবল ঔদাস্যে ভারিয়া উঠিয়াছিল। সকলের মত সেও স্বামীজির পদপ্রান্তে বসিয়া সাধন ভিক্ষা করিল।

মণীন্দ্রের নিকটে স্বামীজি মৃদুলার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি মৃদুলাকে বলিলেন, "মা, তোমার মনে এখন ধর্ম্মের জন্য আকুলতা জন্মেছে। এ অতি শুভ মুহূর্ত্ত। তুমি দীক্ষা নাও—তুমি পরম শান্তি লাভ করবে।

মৃদুলা, ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমার স্বামীর অমত।"

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন,—

" ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ণদাতা।
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা ॥

—কে কার? এ শুধু পথের আলাপ। যিনি প্রকৃত স্বামী তাঁর সন্ধানের পথ তোমায় বলে দেবো। তাঁকে পেলে, স্বামী, পুত্র, কন্যা সব পাবে।"

স্বামীজির সহিত মৃদুলার অনেক কথা হইল। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, এবং স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে, মৃদুলা অভিভূত হইয়া পড়িল। সে নিঃশঙ্ক হইয়া বলিল, " আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেবো।"

তারপর, স্বামীজি মৃদুলার কাণে বীজমন্ত্র দিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বলিলেন, " নিজের দেহমন সব সময়ে শুদ্ধ রাখ্‌বে। পুরুষের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে। এখন তোমাকে পৃথক্ জীবন যাপন করিতে হবে।"

হুজুগের উন্মাদনা যেমন সহজে আসে তেমনি সহজে যায়। যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদরও তাহাই হইল। তাহার বাড়ীতে আসিয়াই যাহা কিছু অসার তাহাই সার করিয়া আগের মতই স্বামী, স্ত্রী, পুত্র লইয়া সংসারে মন দিল।

কিন্তু মৃদুলার উন্মাদনা অত সহজে কাটিল না। সে গুরুমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। কিন্তু যে শক্তি এত দিন তাহার মন পূর্ণ করিয়াছিল, দীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ যেন তাহা কোথায় চলিয়া গেল। গুরুর আদেশ, স্বামীর সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে হইবে—সেই কথাটা তাহার মনের মধ্যে ওলট্ পালট্ করিতে লাগিল। যতই সত্যেন্দ্রের ফিরিবার দিন আছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার অশান্তি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, "এমন কথা কেন স্বীকার করিলাম!" কিন্তু গুরুর আদেশ অলঙ্ঘ্য। মৃদুলা, নিরুপায়ের মত অবসন্ন হইয়া পড়িল।

সতেন্দ্র বাড়ী ফিরিল। রাত্রে মৃদুলা, পূর্ব্বের মত নিজে তাহার বিছানা পাতিয়া দিল। খাওয়া দাওয়া করিয়া সত্যেন্দ্র আসিয়া শুইল। মৃদুলা কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। আজ পঁচিশ বছর তাহার স্থান স্বামীর পাশে—আজ সে কেমন করিয়া সে স্থান ছাড়িয়া যাইবে। প্রবল আকর্ষণে স্বামীর শয্যা তাহাকে টানিতে লাগিল, অনতিক্রমণীয় বাধার মত গুরুর আদেশ তাহার পথ আগলাইয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে আপনাকে দৃঢ় করিয়া সে মেঝেয় একটা মাদুর বিছাইয়া লইল।

তাহাকে মাদুর বিছাইতে দেখিয়া সত্যেন্দ্র বলিল "ওকি মাদুর কেন?"

মৃদুলার চোখে জল উছলিয়া উঠিতেছিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন গলার কাছে আসিয়া তাহার দম আটকাইয়া ধরিতেছিল। বুকের মধ্যের উন্মত্ত ঝড়ের দমকা কোনমতে চাপিয়া রাখিয়া সে বলিল " শোব।"

সত্যন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, " শোবে, ওখানে কেন বিছানায় কি জায়গা নেই?"

মৃদুলা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "স্বামীজির আদেশ ?"

সত্যেন্দ্রের হৃৎপিণ্ডটা, মৃদুলা যেন দুই পায়ে পিষিয়া দিল। মর্ম্মান্তিক ব্যথায় সে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"দীক্ষা নিয়েছ ?"

মৃদুলা, চোখের জলে, ভাসিতে-ভাসিতে, মাথা নীচু করিয়া বলিল, "নিয়েছি।

তীব্র অভিমানে, সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর কি আদেশ।"

মৃদুলার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে কোনমতে বলিল, "পুরুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে বলেছেন।

সত্যেন্দ্র, দুঃখ এবং শ্লেষের স্বরে বলিল, "স্বামীজির আদেশ অবশ্য অলঙ্ঘ্য—অভ্রান্ত ও নিশ্চয়।"

মৃদুলা কথা বলিতে পারিল না। চোখের জলে, তাহার বুক ভাসিতে লাগিল। সমস্ত হৃদয় দুইখানি বাহু বাড়াইয়া উন্মুখ আগ্রহে স্বামীর দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

দুর্জ্জয় অভিমানে সত্যেন্দ্র আর একটি কথাও বলিল না। শুইয়া পড়িয়া, নীরবে, চোখের জলে বিছানা ভিজাইতে লাগিল।

(৫)

ছয়টা মাস কাটিয়া গেল। মৃদুলা, শান্তির বিনিময়ে অসহ্য অশান্তি এবং দুঃখের বোঝা বহিতে লাগিল। একাধিকসহস্রের স্থানে একাধিক লক্ষ গুরুমন্ত্র জপ করিয়াও তাহার মনের ব্যথা কমিল না—বরং তাহা বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। সত্যেন্দ্র প্রায় নির্ব্বাক্ হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। গুরুমন্ত্রের তীক্ষ্ণ তরবারি খানি, দুইজনের মধ্যের সোনার যোগসূত্র গাছি কাটিয়া দুইখণ্ড করিয়া দিল।

একদিন একখানা ডাকের চিঠি পাইয়া, মৃদুলা সত্যেন্দ্রকে বলিল, "বউদির সাবিত্রী ব্রত প্রতিষ্ঠা, এ মাসের তেরোই। আমাদের যেতে লিখেছে।"

সত্যেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর দিল—"বেশ।" মৃদুলা, কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "যাওয়া সম্বন্ধে কি বল ?"

"আমার মতের জন্ত ত কিছু আটকায় না, মিলি।"

আঘাতটা খুবই লাগিল। মৃদুলা, কোন মতে আপনাকে ঠিক রাখিয়া বলিল, "তুমিও যাবে।"

সত্যেন্দ্র ম্লান হাসিয়া বলিল "যদি বল যাবো।"

"তবে চল।"

"চল।"

ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন তাহারা যাইয়া উপস্থিত হইল। কার্য্যও সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে বউদি, সত্যেন্দ্রের সহিত কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। সত্যেন্দ্রকে

তিনি একটু অতিরিক্ত ভাল বাসিতেন। তাহার কারণ, মৃদুলা ছিল তাঁহার ছোট বোনটির মত। সত্যেন্দ্র ও মৃদুলার ভালবাসা যাহা একখানা হীরার মত এই পঁচিশ বছর ধরিয়া জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে, যাহার আভা একটি দিনের জন্যও ম্লান হয় নাই, তাহা তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

কাজ শেষ করিতে-করিতে তাঁহার প্রায় রাত্রি দশটা হইল। তখন বাড়ীর সকলেই শুইয়াছে। মৃদুলাদের ঘরের দরজায় যাইয়া তিনি ডাকিলেন "মিলি ঘুমিয়েছিস্?"

"না।" বলিয়া, মৃদুলা উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সে সাবিত্রী-ব্রতের কথাই ভাবিতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়াই মেঝেয় মৃদুলার বিছানা দেখিয়া তিনি প্রথমে একটু বিস্মিত, পরে একটু হাসিয়া, সত্যেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ বয়সে এ আবার কি নূতন রঙ্গ। হয়েছে কি?"

সত্যেন্দ্র, তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া শান্তস্বরে বলিল, "আমার ত কিছু হয় নি, বউদি! যার হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

বউদি, মৃদুলার দিকে সস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কি লো?"

বউদির প্রশ্নে, মৃদুলার বুকের মধ্যে ব্যথার ঝন্‌ঝনা বাজিয়া উঠিল। লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

বউদি বলিলেন, "কি হয়েছে বল্‌না? অভিমান!"

মৃদুলা, কোন মতে চোখের জল আটকাইয়া উত্তর দিল, "আমি দীক্ষা নিয়েছি।"

বউদি হিহি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি বুড়ো বয়সে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেছিস্।"

মৃদুলা, মাথা নীচু করিয়া বলিল "গুরুর আদেশ।"

কথাটা শুনিয়া বউদি গম্ভীরমুখে বলিলেন, "ওঃ, গুরুর আদেশ!"

যেন এক কথায় সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল, যেন ইহার পরে বলিবার আর কিছুই রহিল না!

এই যে নির্ম্মম উপেক্ষা, যাহা গুরুর নামের দোহাই দিয়া, মর্ম্মান্তিক ভালবাসার অবজ্ঞা করিতে পারে, তাহা সত্যেন্দ্রের বুকে আগুন ধরাইয়া দিল। অনেক দিন পরে তাহার কথার সংযম ছুটিয়া গেল।

সে বলিল, "বউদি, আপনাদের কাছে গুরুর আদেশের চেয়ে বড় কিছু নাই। কিন্তু এই যে পঁচিশ বছর ধরে আমি ভালবাসার সাধনা করেছি—প্রাণ, মন, দেহ, দিয়ে—সে কি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, একজন অপরিচিতের এক দিনের একটা কথায় সে ভালবাসাকে এমন করে তাচ্ছিল্য করা যায়। প্রেমের অপমানে মুক্তির পথ সহজে হয় কি না, ভক্ত শিষ্যেরাই তা জানেন, কিন্তু প্রেম, যা বিশ্বের আনন্দ, তাকে ধ্বংস করে, আনন্দময়ের সন্ধান পাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। যে ইহকালের সাথী, তারি ছোঁয়াতে নাকি পরকালের পথে আগল্ পড়ে! কিন্তু সকলের চেয়ে আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে এই যে, আমি যে সারা জীবন যেবীর

মত পূজা করে এসেছি তা উপেক্ষা করে, যাঁ'রা কামিনীকে নরকের দ্বার বলে ঘৃণা করে সেই শত্রুর দলেই মিলি যেয়ে অনায়াসে মিশ্‌তে পারল।"

গুরুর আদেশ, তীক্ষ্ন ছোরার আঘাতের মত সত্যেন্দ্রের মর্ম্মকোরকের বৃন্তটি ছিন্ন করিয়া দিয়া, জগতের কতখানি শাশ্বত সৌন্দর্য্য যে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে বউদি তাহা ঠিক না বুঝিলেও, সত্যেন্দ্রের কথার ঝাঁঝে থতমত খাইয়া বলিলেন, "সত্যি মিলি, তোর এতটা বাড়াবাড়ি ভাল হচ্ছে না।"

মৃদুলা কোন কথাই বলিল না। বউদি সত্যেন্দ্রের সহিত দুএকটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্রও প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মৃদুলা, তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওগো, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। তুমিই আমার গুরু, তোমার চেয়ে বড় আমার কেউ নাই—তুমিই আমার ইহকাল, পরকাল। না বুঝে অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর।"

তাহার চোখের জলে, সত্যেন্দ্রের বুক ভিজিয়া গেল। সত্যেন্দ্র সস্নেহে, মৃদুলাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিবিড় চুম্বনে, তাহার সকল ব্যথা মুছিয়া লইল।

শ্রীমন্দাক্রান্তা দেবী

সুন্দর

কি সুন্দর এবং কি সুন্দর নয় এ নিয়ে ভারি গোলমাল বাধে যে রচনা করছে এবং যারা রচনাটি দেখছে বা পড়ছে কিম্বা শুনছে তাদের মধ্যে, কেননা সবারই মনে একটা করে সুন্দর অসুন্দরের হিসেব ধরা রয়েছে, সবাই পেতে চায় নিজের হিসাবে যা সুন্দর তাকেই, কাজেই অন্যের রচনার সৌন্দর্য্যের হিসেবে সে নানা ভুল দেখে!

নিজের রচনাকে ইচ্ছা করে খারাপ করে দিতে কেউ চায় না, যথাসাধ্য সুন্দর করেই রচনা করতে চায় সবাই, কেউ পারে সুন্দর করতে কেউ বা পারে না,—আমার হাতে বাঁশি দিলে বেসুরে বাজবেই, অকবি যে সে কবিতা লিখতে গেলে মুস্কিলে পড়বেই! কচ্ছপ জলে বেশ সাঁতার দিতো কিন্তু বাতাসে গা ভাসান দেওয়া তার পক্ষে এক নিমেষও সম্ভব হয়নি, অথচ আকাশে ওড়ার মতো, কবিতা ছবি ইত্যাদি রচনার ঝোঁক তাবৎ মানুষেরই মধ্যে রয়েছে—গান শুনে মনে হয় বুঝি আমিও গাইতে পারি, মন মেতে ওঠে এমন, যে ভুল হয়ে যায় সুরের পাখি বুকের খাঁচায় ধরা দেয়নি একেবারেই। বালক যখন সুরে বেসুরে তালে বেতালে মিলিয়ে নেচে গেয়ে চল্লো তখন তার সব অক্ষমতা সব দোষ ভুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেলে শিশুকণ্ঠের এবং সুকুমার দেহের ভাবাটির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, কিন্তু বড় হয়ে ছেলেমো করা তো সাজেনা একেবারেই। তবেই দেখা যাচ্ছে স্থান কাল পাত্র

হিসেবে সুন্দর ও অসুন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রচনার মধ্যে। হরিণ সে বাঁশি শুনে ভোলে, সাপ সে বাঁশি শুনে ফণা তুলে তেড়ে আসে, সাপ খেলানো বাঁশি সাপের কানে সুন্দর সুর দিলে, মানুষের কানে হয় তো খানিক সেটা ভাল ঠেকলো তাই বলে বিয়ের রাতে সানাই উঠিয়ে নহবৎখানায় সাপুড়ে এনে বসিয়ে দেয় কেউ ? অবশ্য রুচিভেদে গড়ের বাদ্য ঢাকের বাদ্য বিয়ের রাতে এসে জোটে, ঘুমন্ত পাড়ার কানের শ্রবণশক্তি তেজস্কর পদার্থ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে কনসার্টের দলও অলিতে গলিতে এসে আবির্ভূত হয়; কিন্তু নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখ সে নিশ্চয়ই বলবে—কিছুক্ষণের জন্য বলেই এ সব সইছে—ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি—এটা মানুষের মন বলেই দিয়েছে বহুকাল আগে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ ভরে যে শাঁক ঘণ্টা বাজে তার স্বর-মাধুর্য্য সম্বন্ধে অন্য মত কারও আছে বলে তো বোধ হয় না। গড়ের বাদ্যি গড়ের মাঠে সুন্দর লাগে, মন্দিরের শাঁখ ঘণ্টা দূরে থেকেই ভাল লাগে। সভাস্থলে বীণা বেণু মন্দিরা, ঘরের মধ্যে সোনার চুড়ির ঝিন্ ঝিন্ স্থান কাল পাত্রের হিসাবে সুন্দর অসুন্দর ঠেকে। মাঠ ছেড়ে গড়ের বাদ্যি যদি ঘরের মধ্যে ধুমধাম লাগায় তবে সে স্থান কাল পাত্রের হিসেব ডিঙিয়ে চলে ও সেই কারণেই ভারি বিশ্রী ঠেকে কানে। মন্দির ঘরে থেকে যখন দূরে নদীর ওপারে থেকে আরতির ঝনঝনা অনেক খানি বাতাস আলো দিয়ে ধুয়ে পাঠায় এপারে তখনি সুন্দর ঠেকে সেটি। সন্ধ্যা প্রদীপ সন্ধ্যা তারা একজন খুব ঘরের কাছে একজন খুব দূরের কিন্তু সুন্দর হিসেবে দুজনে সমান বলে দেখি আলোর তীক্ষ্ণতা দুজনেই স্তিমিত করে নিয়ে সুন্দর হল মানুষের চোখে।

দখিন হাওয়া শরতের আলো এ সবের মাধুর্য্যের পরিমাপ্ তাপমান যন্ত্রের দ্বারা হয় না মনের বীণায় এরা আপনার সুন্দর পরশ বুলিয়ে দিয়ে জানায় যখন তখন বুঝি কতখানি মধুর এবং কতখানি সুন্দর এরা। মানুষের মধ্যে যারা ওস্তাদ নয় তারা নিজের হাতে কাঠের বীণাটায় ঘা দিতে থাকে মাত্র, মনে ঘা দেওয়ার কৌশল জানেনা তারা। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার উত্তর মানুষ না পেলে বাহির থেকে না পেলে তার নিজের ভিতর থেকেও, এইজন্যেই মনে হয় দেশে দেশে কালে কালে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নিয়ে মানুষ ক্রমাগত আলোচনা করে চলেছে। পণ্ডিত থেকে অপণ্ডিত সবাই জানে সুন্দর আছে, কিন্তু কার কাছে কেমনটা সুন্দর কেমনটি নয় এর মীমাংসা হল না আজও। স্থান কাল দুই অনুকূল প্রতিকূল হয় সুন্দর সম্বন্ধে—এটা কতকটা স্থির হয়ে গেছে; কিন্তু পাত্র হিসেবে কার চোখে কি যে সুন্দর এর মীমাংসা প্রত্যেকে নিজেরাই করছি। শাঁখ ঘণ্টা দূরে থেকে একটা সময়ে লাগলো ভালো বলে কানের কাছে তাকে যদি কেউ টেনে এনে বলে শোনো কি সুন্দর, তবে তর্কের ঝড় না উঠে যায় না; এ কথা গড়ের বাদ্য ইমামবারার আজান সবারই সম্বন্ধে খাটে। দূরে থাকার দরুণ অনেক জিনিষ সুন্দর ঠেকে দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছে টেনে আনলেই তাদের সব সৌন্দর্য্য চলে যায়।

এই যে ব্যক্তিগত মতামত, সুন্দর অসুন্দরকে নিয়ে এই যে সব ছোট খাটো তর্ক বিতর্ক,

যার কোনো শেষ দেখা যায় না, এটিকে নানা সুন্দরের সৃষ্টি করে করে মানুষ দেখতে চেয়েছে নিরন্তর করতে পারে কিনা, রচনাকে স্থান কাল পাত্রের অতীত করে দিতে চেয়েছে মানুষ; শোনাবার জন্যে যে সব রচনা তা মানুষ উপযুক্ত ছন্দোবন্দ সুর সার ইত্যাদি দিয়ে, দেখবার জন্যে যে রচনা তা যথোপযোগী রং চং ও নানা কায়দা দিয়ে সব সময়ে সবার উপভোগ্য ও সুন্দর করার চেষ্টা করে গেল কালে কালে; সুরকে সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে, কথাকে ছন্দশাস্ত্রে, ছবিকে বর্ণশাস্ত্রের মধ্যে ধরে মানুষ দেখতে চল্লো কি হয়, কিন্তু বাস্তবিক যা সুন্দর তা ধরা গেল না একটা কিছুর মধ্যে, সে বিচিত্রতা ও বিস্তার চেয়ে বাঁধন কাটতে থাকলো বারে বারে—কোনো ছবি বর্ণ ছেড়ে খালি রেখার ছন্দ ধরে হয়ে উঠলো ভারি সুন্দর, কোন গান শাস্ত্র মতো তাল মান সুর ছেড়ে প্রায় সহজ কথা হয়ে পড়ে হল সুন্দর, কথা আবার কোথাও ছবি হয়ে হতে চল্লো সুন্দর, তিন শাস্ত্রের পাতা উল্টে পাল্টে এক হয়ে গেল, ছন্দ পেয়ে ছবি অথবা ছবি পেয়ে ছন্দ সুন্দর হয়ে ওঠে বোঝা কঠিন হল বোঝানও কঠিন হল! রচনাতে স্থান কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করার জন্যে নতুন নতুন উপায়ের সৃষ্টি হয়েই চল্লো। আকাশের চাঁদকে আমরা প্রায় সকলেই সুন্দর দেখি, কিন্তু কি নিয়ে চাঁদটি সুন্দর যদি এ প্রশ্ন করা যায় তবেই গোলযোগ বাধে—কেউ বলে চাঁদনী নিয়ে চাঁদ সুন্দর, কেউ বলে না তার ছাঁদটী নিয়েই চাঁদ সুন্দর, কেননা অনেক শিল্পি দেখেছি কালো চাঁদ এঁকেছেন—অথচ ছবিটির সৌন্দর্য্য হানি একটুও ঘটেনি। আর্টিষ্ট মানুষের অনেক রকম পাগলামি থাকে সুতরাং কালো চাঁদের উদাহরণটি সবাই স্বীকার করতে না রাজিও হতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই উপায় দেখেছি প্রকৃতিদেবীও অবলম্বন করেছেন নিজের রচনাতে—তুষার সাদা তাকে কালো নীলবর্ণ করে দেখিয়েছিলেন তিনি আমাকে যতদিন পাহাড়ে বাস করেছিলেম ততদিন,—প্রত্যেক প্রভাতে সোনার আকাশপটের মাঝখানে কালো তুষারের ঢেউ অথচ দৃশ্যপটে একটুও সৌন্দর্য্য হানি হলনা।

চাঁদনী রাতের বেলায় আমরা বলে থাকি—দিব্বি ফুট ফুটে রাত—অন্ধকার রাতের বেলায় দিব্বি ঘুটঘুটে অন্ধকার তো বলিনে! কিন্তু কবিরা দুটোই যে সুন্দর তার এত প্রমাণ হাতের কাছে রেখে গেছেন যে তা উঠিয়ে লেখা বড় করা মিছে। এই সে দিন একখানা চীনদেশের পাখা আর একখানি জাপানের পাখা হাতে নিয়ে দেখছিলেম—জাপানের পাখাখানি সাদা, তার উপরে নানা রংএর ছবির বাহার—দিনের আলোয় সুন্দর পৃথিবীর একটুখানি যেন দেখা যাচ্ছে; চীনের পাখাখানি ঠিক এর উল্টো ধরণে আঁকা—অন্ধকার রাত্রির একটি মাত্র প্রলেপ তার মধ্যে কোন ছবি কি কোন রং নেই স্নিগ্ধ গভীর ঘুমপাড়ানো কালো অথচ ভারি সুন্দর। এই যে সুন্দরকে দেখতে দুই দেশের দুই শিল্পি পাখা মেল্লে, একজন দিনের দুয়ার দিয়ে আলোর মাঝে উড়ে পড়ল প্রজাপতির মতো একেবারে অন্ধকার সাগরে খেয়া দিয়ে চল্লো—নিভে যাওয়া একটী তারার একটুখানি ধুলিকণা এরা দুজনেই তো দেখে গেল দেখিয়ে গেল সুন্দরকে?

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ

তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন একথা একেবারেই বলা চল্লনা—বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ এরূপ করায় দোষ দেখবেন! কালো দিয়ে যে আলো এবং রং সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো—এর সাধনা বড় কঠিন সেই জন্যে জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়েস না পার হলে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করতে হুকুম পায়না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মতো মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এই রকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা তাই কোন একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব্ব নগরের বিচিত্র রংএর তারা ফুলে গাঁথা রঙ্গীণ মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে, প্রথম মানুষ ভাবলে এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল; মানুষ বল্লে ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর! আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখি—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রংএ সাজিয়ে পাঠালে,—এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশের নীল পদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখি, এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশ-বহ আসতে লাগলো, একটির পর একটি, মানুষের কাছে—সব শেষ এল রাতের কালো পাখি আকাশ পটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলিয়ে—পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো!

এই যে একটি মানুষের কথা বল্লেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে রংএ সুরে ছন্দে!—ময়ূরই সুন্দর কলবিঙ্ক নয় কাক নয় এই কথা যারা বলছে—এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই!

সুরের নানা ভঙ্গী দখল না করে আমাদের গাইয়েগুলি মুখভঙ্গীটাতেই যখন পাকা হয়ে উঠলো, তখন সভার লোকে দূর ছাই করে তাকে গঞ্জনা দিলে, সুরের সৌন্দর্য্য ফুটলোনা তার চেষ্টায় বটে কিন্তু ঐ মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে আর একটা জিনিষ ফুটলো যেটি হয়ে উঠলো একখানি সুন্দর ছবি ওস্তাদের!

আর্টিষ্টদের কেউ কেউ ভুল করে বলেন "সুন্দরের সন্ধানি!" সুন্দর যাকে ঘিরে থাকেনা সেই বেড়ায় সুন্দরের খোঁজে গড়ের মাঠে, জু'গার্ডেনে, মিউজিয়ামে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সুন্দর কি, সুন্দর কি নয় এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক লেখা লেখি এবং সৌন্দর্য্য তত্ত্বের রসতত্ত্বের

যত পুঁথি আছে তার বচন ধরে ধরে যেন লাঠি হাতে চলা ততক্ষণ সুন্দর যতক্ষণ কাছে নেই,—সুন্দর এলেন তো ওসব ফেলে চল্লো মন স্বচ্ছন্দে অবাধগতিতে সব তর্ক ভুলে! অজ রাজা যখন নগরে প্রবেশ করেছিলেন তখনকার কথা কার না জানা আছে,—ফুল ফুটে গিয়েছিল সেদিন আপনা হতেই। মধুকরের কাছে যে ভাবে মধুর খবর হাওয়া এসে দিয়ে যায় সেইভাবে খবর আসে সুন্দরের যে লোক যথার্থ আর্টিষ্ট তার কাছে, তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়না সুন্দরকে খুঁজে খুঁজে। আর্টিষ্টে আর সুন্দরে লুকোচুরির লীলা চলে অনেক সময়ে কিন্তু সে দুই ছেলেতে পরিচয় হবার পরে খেলার মতো, ইচ্ছা করে গোপন থেকে পর্দ্দা টেনে দিয়ে খেলা,—তার মধ্যে রস আছে বলেই খেলা চলে। যে সুন্দরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্ধান করছে তার ছুটোছুটির সঙ্গে এ খেলার তফাৎ রয়েছে।

পিঁপড়ে ছুটোছুটি করে চিনির সন্ধানে কিন্তু মধু আহরণে মৌমাছির ছুটোছুটি সে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার! পিঁপড়ের চিনি সংগ্রহের সঙ্গে তার পেটের যোগ—চিনি না পেলে সে মরা ইঁদুরে গিয়ে চিম্‌টি বসায় কিন্তু পেট খুব তাড়া দিলেও মাছের আর মাংসের জুস্ দিয়ে মৌচাক ভর্ত্তি করতে চলেনা মৌমাছি। মৌমাছি কি খেয়ে বাঁচে এবং আর্টিষ্ট তারাও কি খেয়ে জীবনধারণ করে তার রহস্য এখনো ভেদ হয়নি শুধু এটুকু বলা যায় তাহা পিঁপড়ের মতো সুন্দর সামগ্রীকে পেটের তাড়নার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে বার হয় না—ফুল ফোটে ওধারে সুন্দর হয়ে খবর আসে বাতাসে তাদের কাছে চলে যায় তারা সুন্দরের নিমন্ত্রণে সন্ধানে নয়! মৌচাকে যেমন মধু তেমনি ছবি মূর্ত্তি কবিতা গান কতকি পাত্রে ধরলে মানুষ সুন্দরকে, ওদিকে আবার বিশ্বজগতে সুন্দর নিজেকে ধরে দিলেন আপনা হতেই ফুলে ফলে লতায় পাতায় জলে স্থলে আকাশে কতকিতে তার ঠিকানা নেই, এত সুন্দর আয়োজন কিন্তু ভোগে এল শুধু দু'চারজনের আর বাকি অধিকাংশ তারা এসবের মধ্যে থেকে শুধু সৌন্দর্য্যতত্ত্বই বার করতে বসে গেল। সেই বেজান্ সহরের কথা মনে হয় উপবনে সেখানে পাখি গাইলো ফুল ফুটলো মুকুল খুল্লো ফল ধরলো পাতা ঝরলো সবই সুন্দরভাবে হয়ে চল্লো দিনে রাত্রে কিন্তু সহরের কোনো মানুষ এগুলো থেকে কিছু নিতে পারলেনা পাথরের চেয়েও পাথর হয়ে বসে রইলো, শুধু দুচারজন পথিক দুটো একটা হতভাগা ভিখিরী নয় পাগল তারাই কেবল থেকে থেকে এল গেল সেই দেশের সেই বাগানে যেখানে দৃষ্টি ভোলানো সুন্দরের সামনে মুখ করে বসে আছে মুক, অন্ধ, বধির, নিশ্চল মানুষের দল খোলা চোখ মেলে।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হলনা তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়ন রঞ্জনকে চিনে গেল।

মাটি থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্য্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা তা পর্য্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্য্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা করে চলেছেন সুন্দরের জন্যে বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ধরে চলে না, হলে গড়ার উপযুক্ত করে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারেনা সে এ কথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালী নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমীতে বিছিয়ে দেয় চাষা কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে বসে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মান্‌ছেনা তার হাতে তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম্ম।

ছন্দ এবং সুর সার এবং রং প্রস্তুত ও তুলিটানার প্রকরণ ভারি সহজে মানুষ আরম্ভ করতে পারে কিন্তু তুলি টানা হাতুরি পেটা কলম চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না এমন কি রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল কৌশল ধরা থাকে না,—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে! এইযে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে ছবি মূর্ত্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হল, কর্ম্ম খুব হাঁক ডাক ধুম ধামে নিষ্পন্ন হল এ দুয়েরই চেয়ে ভাল হ'ল কর্ম্মটি যখন সহজে নিষ্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু কর্ম্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়লোনা!

হাড় মাসের কত গাঁঠ খিল বাঁধন কসন ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার নিয়ে তৈরি হ'ল মানুষের দেহ যন্ত্র এই সব যান্ত্রিক ব্যাপার যা নিয়ে মানুষটা চলছে বলছে সেগুলো আড়ালে রইলো একখানি পাত্‌লা পর্দ্দার ওপারে তবেই সুন্দর ঠেকলো মানুষটা। আর্গিণ যন্ত্রের ঘেরাটোপ খুলে দিয়ে তার ভিতরের কারখানা যদি চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায় তবে সেটা খুব সুদৃশ্য বলে ঠেকেনা।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেম, যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কায একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে—এতে করে ভারি একটা আনন্দ হ'ল কিন্তু একটি পাখিকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দে তফাৎ ছিল—পাখির ডানার মধ্যে নানা কলবল কি ভাবে কায করছে তার খোঁজই নেই ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার আপনার নির্ম্মাণের কৌশল লুকিয়ে চল্লো দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চল্লো সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষে রচনা করলে—যেখানে

নির্ম্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা পড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্য্যহানি হল, কলের দিক ফুটলো রসের দিক সৌন্দর্য্যের দিক চাপা পড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমন কি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি—যার চলার হিসেব ও কলবল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছেনা—দেখি!

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণ ভিতরের পদার্থে হরিহরআত্মা—যেমন রূপ তেমনি ভাব, *বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যা তার অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর* বর্ত্তমান হল। চোখের বাহিরে যে পরকোলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অচ্ছেদ্য হল তখনই সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ, চশমার কাঁচে আঁচড় পড়লো চোখ রইলো পরিষ্কার, কিম্বা চোখের মণিতে ছানি পড়লো চশমা রইলো ঠিক ঠাক এ হলে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হল না।

মৌখিক আত্মীয়তা ভারি বিশ্রী ঠেকে কেন না কথা সেখানে শুধু মুখ থেকে বার হচ্ছে—বুক থেকে নয়, কোলাকুলি সেও বাইরে বাইরে ছোঁয়াছুঁয়ি বুকে বুকে লাগা একে বলতে পারা গেল না! ভারি সুন্দর লাগে যখন মানুষটির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বাইরেটির সঙ্গে ভিতরের ভাবগুলি সুন্দর মিল নিয়ে এসে লাগে মনে।

শিল্প সামগ্রী সংগ্রহের সময়ে দুএকখানা পার্সি কেতাবের খালি মলাট হাতে পড়ে সেখানে মলাটখানাই একটা বাহিরের এবং ভিতরের সৌন্দর্য্য নিয়ে উপস্থিত হয় সামনে। এইভাবে কত সমুদ্রের ঝিনুক ফুলের পাপড়ির মতো হাতে পড়েছে, আশ্চর্য্য বর্ণ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নিয়ে,—প্রত্যেক বারেই লক্ষ্য করেছি চোখ এবং মন দুই আকর্ষণ করেছে বস্তুগুলি। শাস্ত্রে সুন্দরের কতকগুলো লক্ষণ দিয়ে বলা হয়েছে এই হলেই হল রমণীয়, কিন্তু শুধু চোখে এবং দূরবীক্ষণ লাগিয়ে ও তারপরে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখেও সুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশের রামধনুতে যে সুন্দর তিনি রয়েছেন পৃথিবীর ধূলিকণায় তিনিই রয়েছেন অতলের তলাকার একটুকরো ঝিণুকের ভিতর বাহিরে সমান সৌন্দর্য্য ও শোভা বিকীর্ণ করে—হৈ সবমেঁ সবহীতেঁ ন্যারা!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চণ্ডী স্তব

(জনৈক রাজবন্দী কর্ত্তৃক কারাগারে রচিত)

ত্রিলোক-শরণ্যা তুইমা-গো, সমবেত চরণ সকাশে
দীন ছেলে কৃপার ভিখারী, দলিত কি হবে পথ-পাশে ?
পথে পথে কত না কণ্টক, ক্ষত ধারে কত না রুধির,
বেদনার কত না যাতনা, হাহাকারে শ্রবণ বধির,
অশ্রুরাশি দীর্ঘশ্বাস বহে, বহে যেন ঝঞ্ঝা বৃষ্টি প্রায়,
তবুও কি টলে না ও হৃদি দিনে দিনে দিন বহে যায় ?
আশা গেছে আছে শুধু তৃষা, আলো গেছে আছে শুধু ধূম,
জীবনের পরিচয় শ্বাস ভেদ করে নীরব নিঝুম।
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তোর, এ কি লীলা ওগো মায়াময়ি !
তোর ছেলে ডেকে কেঁদে সারা এ কি মায়া জগদম্বা অয়ি ?
কি সাধ জেগেছে তোর মনে সন্তানেরে কি খেলা খেলাবি ?
বল্ ভেঙ্গে বল্ গো পাষাণি, কত কাল ভুলে সব রবি ?
কেন তবে মা বলে ডাকাস্, কেন তবে আছাড়ি পিছাড়ি,
শ্মশানের মাঝে থেকে কেন অট্টহাসি দিগন্ত বিদারি ?
শেষ যদি সব হবে হো'ক—কেন তবে দিগন্তে ঈশানে
মেঘ ফেটে আলো ফুটে যায় জোছনার পরিচয় দানে ?
শুধায় কাহারে বল্ মাগো, তোর কাছে তাইতো এয়েছে
ব্যথা কি মা বাজে এতদিনে, যা' সবার সব কি সয়েছে,
সত্যই কি কোলে তুলে নিতে বাহু তুমি দিয়েছ বাড়ায়ে ?
বরাভয়ভরা দশ হাতে আশীর্ব্বাদ দেবে কি ছড়ায়ে ?

সত্য মাগো তোরে ভুলেছিল। তা বলে কি নিষ্ঠুর শাসনে
উৎপাটিয়া হৃদ্‌পিণ্ডখানি দণ্ড দিবি কঠোর পেষণে ?
তা'বলে কি শূন্য মাঝে মাগো হুহুঙ্কার তাণ্ডবের তালে
মরম চমকি দিতে হয় ডাকিনীর মন্ত্রমায়াজালে ?
শিরে নাই শিরস্ত্রাণ যার অঙ্গে নাই বস্ত্র উত্তরীয়,
নিরাহারে জীর্ণ শীর্ণ দেহ সেকি মাগো এত দণ্ডনীয় ?

তা'রি শিরে বাদলের ধারা আঁখি ভেদি বজ্রের আলোক,
শুষ্ক অস্থি তাহারই নিঙাড়ি প্রবাহ বহিছে দুঃখ শোক।
কে না জানে তা'র প্রতারণা তোরে ত লুকানো কিছু নয়
তোর পূজা রটনা করিয়া পূজেছে কেবল স্বার্থ চয়।
চাহে না'ক ভাই বোন কিছু চাহে নাই আপনার জনে,
রচে নাই ধর্ম্মের সংসার মজে নাই সাধ্যের সাধনে।
যা' চেয়েছে চাহিবার নয় বলিয়াছে নিষ্কাম করম,
অশক্তের শক্তি আরাধনা অভক্তের অন্ধ অধরম।
ভণ্ডের ভক্তির ভোজবাজি শঠতার পরিচয় দানে
মজিয়াছে মজায়ে সকলে শুধু শাঠ্য প্রতারণা জানে।
সেই সব জেনে শুনে মাগো কেন চুপে ছিলি অন্তরালে
প্রেতবৃত্তি লিখেছিলি তোর নাড়ী-ছেঁড়া সন্তানের ভালে।
তার পর অকস্মাৎ তুই বজ্রাঘাতে শাসনের তরে
দলিতে, ছলিতে এলি নাকি ? এত শাস্তি সন্তানের পরে ?

দে মা দে মা বর দে মা মা গো, বরদাত্রি জগদ্ধাত্রি অয়ি,
রাজলক্ষ্মী মহালক্ষ্মী রূপে অভয়া মা আয় ব্রহ্মময়ি।
তোর ছেলে তোর কোলে থেকে আলো দিক্ তোর রূপ পেয়ে
সর্ব্ববাধা জিনুক বিক্রমে মুক্তকণ্ঠে তোর জয় গেয়ে।
শিরে থাক তোমার নির্ম্মাল্য দাও তারে কবচ অক্ষয়
যশ তার ছুটুক দিগন্তে রবিকর সম প্রভাময়।
বিদ্যা তার ভাতুক্ ত্রিলোকে দূরে যাক্ দুর্ব্বলতা ভয়,
লক্ষ্মী তার ভবনে ফিরুক ভূষণ হউক শোভাময়।
হিংসা দ্বেষ রিষ বিষ জ্বালা ভুলে যাক্ চির দিন তরে
নিতান্তই ফেলিয়াছ যদি দাও দাও বজ্রে ভস্ম করে।
ভুলে যাক্ মিথ্যার সাধনা মিথ্যা ধর্ম্মে বিড়ম্বিত তারা,
তো'র এই সাজান সংসারে রচিয়াছে বন্ধনের কারা।
এই তোর সাধের পূজন এই তোর সর্ব্বস্ব সংসার,
ইহারই মঙ্গল তরে শিরে নিক তব পদধূলি সার।
এই মায়া সত্য করে মাগো মহামায়া নাম নিলি কবে,
সব সত্য হইবে যেদিন সেই দিন দেখা দিবি তবে।
এই কাম্য এই সাধ্য করে সাধনার পূজনের পথ,
অন্য সব ছলনার কথা, মিথ্যায় না টানে মনোরথ।
মন যারে বুঝিতে না পারে আত্মা যাহা চাহেনাক ভুলে
তাতে না মজাস্ যেন মাগো! এ প্রার্থনা করি পদমূলে॥

ফ্রান্সে শিক্ষা-বিজ্ঞানের অনুশীলন

(Paul Lapie)

মানুষকে গড়িয়া তোলা যায়, হয় বাহির হইতে, নয় ভিতর হইতে। জড়-কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায় উহাকে হাতেগড়া যায়, অথবা উন্নতির স্পৃহার দ্বারা উহাকে অনুপ্রাণিত করা যায়। জ্ঞানের বোঝা উহার উপর চাপানো যায়, অথবা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য উহাকে উস্‌কাইয়া দেওয়া যায়। একটা বাহিরের নিয়মের দ্বারা উহাকে দমন করা যায়, কিংবা আত্মশাসনে উহাকে অভ্যস্ত করা যায়। উহাকে পাখী পড়ানো রকমে পাঠাভ্যাস করান যায়, কিংবা রীতিমত শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়। পাঠশালার সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত মতবাদ দুই অংশে গঠিত; এক অংশ অভ্যাস, আর এক অংশ শিক্ষা। কিন্তু যে অনুপাতে এই দুই উপাদানের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়, তদনুসারেই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক। ফরাসী সম্প্রদায়ের নিয়ম-পদ্ধতিটি কি?

* * * *

পাঠশালা-শিক্ষাপদ্ধতির ফরাসী সম্প্রদায় ১৬ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগে দেখা যায়, শিক্ষাপদ্ধতি অন্তর্জাতীয় ছিল। Coimbre হইতে ভিয়েনা পর্য্যন্ত, সকল দেশের শিক্ষার্থীদিগকেই একই পাঠ্যপুস্তক, আরিষ্টটলের একই ভাষ্যকারের গ্রন্থ দেওয়া হইত। কিন্তু "নবজীবনের" পর হইতে টুলোবিদ্যার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় ফ্রান্সে, শিক্ষা-পদ্ধতি একটা বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয় এবং এইকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই ফরাসী শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক লক্ষণ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

যদি এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তখনকার টুলো-শিক্ষার ধরণটা যেন আমরা স্মরণ করিয়া দেখি। প্রথমেই নজরে পড়ে, যাহাতে মন জাগিয়া ওঠে এরূপ ব্যবস্থা আদৌ ছিলনা। সমস্ত পূর্ব্বপক্ষ-প্রবন্ধের অনুকূলে ও প্রতিকূলে ছাত্রদিগকে তর্ক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত নাকি? তাহাদের সমস্ত যুক্তিধারাকে একটা বাঁধাবাঁধি আকারে পরিণত করিতে হইত না কি? এই সকল অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে, উহাদের বিচারশক্তি কি তীক্ষ্ণ হইতে পারে? এই সম্প্রদায়ের বাদানুবাদের মধ্যে শেষ-কথা ছিল না—যুক্তি; শেষ কথা ছিল—গ্রন্থ। আপ্ত বাক্যের সম্মুখে মনকে নতশির হইতে হইত। তখন মতামতের সংগ্রাম শুধু কথার খেলা ছিল; শুধু একটা মার-প্যাঁচের ব্যাপার ছিল। বাহ্য-প্রতীয়মান প্রমাণের শৃঙ্খলা,—শুধু শব্দের একটা কলকৌশল মাত্র ছিল। উহারা চিন্তা করিবার কলা-কৌশলের শিক্ষা দিবে বলিত, কিন্তু আসলে কতকগুলা মানসিক বাঁধাবাঁধি রাস্তা গড়িয়া তুলিত। তারা বলিত, মনকে গড়িয়া তুলিবে, কিন্তু আসলে কতকগুলা ত্র্যবয়বী ন্যায়-বাক্যের যন্ত্র গড়িয়া তুলিত।

এই টুলো-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম করে তাহারা ছিল ১৬ শতাব্দীর কতকগুলি

লেখক;—উহাদের মধ্যে Rabelais ও Montagne প্রধান; উঁহারা উভয়েই টুলো-সম্প্রদায়কে একই রকমে তিরস্কার করে :—টুলো-পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগের স্মৃতির উপর এত ভার চাপাইয়া দেয় যে, তাহাতে করিয়া উহাদের বিচার-শক্তির শ্বাসরোধ হয়। মনকে প্রত্যক্ষ সত্যসম্পদে সমৃদ্ধ না করিয়া উহারা বৃথা বাদানুবাদে মনের শক্তি ক্ষয় করে। কি দৈহিক ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে, কি সাহিত্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে, Rabelaisর দাবী আরও বেশী ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্যক্রমের তালিকা বেশী বিস্তৃত হইলেও তাঁহার উপদেশ একই মূলতত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হইত। উভয়েরই মতে, শিশুদের শিক্ষা খেলার সঙ্গে হওয়া উচিত, শব্দ-শিক্ষা না হইয়া বস্তু-শিক্ষা হওয়া উচিত। একটু ইতর-বিশেষের সহিত উভয়ই, একই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাঠশালার ভিতর ও মনের ভিতর, আর একটু বেশী স্বাধীনতা, আর একটু বেশী বাতাস, আর একটু বেশী জীবন-উদ্যম। প্রথম অভিব্যক্তি হইতেই ফরাসী শিক্ষা-সম্প্রদায় উদার শিক্ষার পতাকাতলে আপনাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

কি রাব্‌লে, কি মোতাইং—ইঁহারা কেহই টুলো-পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু দেখা যায় ১৭ শতাব্দীতে এক শিক্ষা-সম্প্রদায় এই টুলো-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সাধারণ শিক্ষার উপর জেসুইট্ খৃষ্টসম্প্রদায়ের প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জেসুইট্-শিক্ষাপদ্ধতি—ইহা টুলো শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন আর কিছুই নহে—ইহা সৌখীন সমাজের রুচির উপযোগী করিয়া গঠিত। জেসুইট্‌দিগের ছাত্র, 'বাবু' কছমের লোক। তাহার আচার ব্যবহার সুললিত, তাহার ভাষা মার্জ্জিত। রাব্‌লে Sorbon-ছাত্রদের উপর যে সব বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা ইহাদের উপর খাটে না। কিন্তু Sorbon-ছাত্রদিগের মতো ইহাদেরও স্মৃতিভাণ্ডার ল্যাটিন উপদেশ বচনে পূর্ণ—যাহার অর্থ তাহারা আদৌ বুঝে না। Sorbon ছাত্রদিগের মতোই উহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও নিতান্ত লঘু ধরণের। টুলো পন্থীদিগের যেরূপ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস, তাহাদের যেরূপ অভ্যাস, তাহাতে করিয়া তাহারা না জানিয়া বুঝিয়াই তাহাদের বিচার-বুদ্ধিকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু ইহার বিপরীতে জেসুইটেরা ধর্ম্ম-সমাজকে এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমাজকে কতকগুলা আজ্ঞাবহ লোক দিবার জন্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তির স্বাধীন চেষ্টাকে দমন করিয়া, কতকগুলা স্বতশ্চল যন্ত্র সৃষ্টি করে। ইহাও একটা কারণ যে, শিশু-প্রকৃতির উপর উহাদের বিশ্বাস নাই। উহাদের ছাত্রদিগের উপর কাজ করিবার জন্য, বাহ্য উপায় ছাড়া আর কিছুর উপর উহারা নির্ভর করিতে পারে না; কতকগুলা ছেলেমান্‌সি প্রক্রিয়ার দ্বারা উহারা শিশুদিগের প্রতিযোগিতা-বুদ্ধিকে উস্‌কাইয়া দেয় এবং কায়িক শাস্তির দ্বারা উহাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। জেসুইটদিগের যেরূপ উদ্দেশ্য, যেরূপ প্রোগ্রাম, যেরূপ কার্য্যপ্রণালী,—রাব্‌লে ও মোতাইং যাহা প্রশংসা করিয়াছেন,—জেসুইটিক্ শিক্ষা স্পষ্টই তাহার বিপরীত। কিন্তু ১৭ শতাব্দীতে জেসুইট্‌দিগের কলেজ, আভিজাতিক শ্রেণীর ও

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাছা-বাছা লোক গ্রহণ করিলেও, ফ্রান্স্ উহাদের শিক্ষাসংক্রান্ত মতামত নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে নাই। একজন ফরাসী পাদ্রির দ্বারা অনূদিত ও সমালোচিত হইলেও Ratio Studiarum নামক গ্রন্থখানি ফরাসীর রচনা নহে।

ইহার বিপরীতে, দেকার্ত্তের রচনা বিশিষ্টরূপে ফরাসী। দেকার্ত্ত জেসুইট্‌দিগের কৃতজ্ঞ ছাত্র হইলেও তাঁহার "প্রণালী সম্বন্ধীয় সন্দর্ভের" প্রথম ভাগে, "লা ফ্লেশের" কালেজে উহাদের নিকট হইতে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেন, সেই শিক্ষার তীব্র সমালোচনা করিতে বিরত হন নাই। দেকার্ত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি অতি-প্রয়োজনীয় স্বতঃসিদ্ধ সূত্র ব্যক্ত করিয়াছেন—বিশেষরূপে এই জন্যই, ফরাসী শিক্ষা-পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট যে কয়েকটি বড় বড় নাম আছে, ঐ সব নামের মধ্যে তাঁহারও নাম পরিগণিত হইতে পারে। স্বতঃসিদ্ধ সূত্র দুটি এই :—

১ম—মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষ শিক্ষাগ্রহণশীল।

২য়—বিচার-বুদ্ধিই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী সাধন-যন্ত্র।

জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিক্ষাগ্রহণশীল। সুবুদ্ধি—এই শব্দের ঠিক্ অর্থ সাধারণ বুদ্ধি, বা কাণ্ডজ্ঞান; এই বুদ্ধি অল্পাধিক সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু এই বুদ্ধিকে কাজে লাগাইতে সকলে সমানরূপে সমর্থ নহে। ইহা শিখাইতে হয়। চিন্তাধারাকে কিরূপে সুশৃঙ্খলরূপে চালাইতে হয় এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এই শিক্ষা লাভ করিলে, কিরূপে ভাল করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহারও শিক্ষা হয়। ইহার দ্বারা জীবনের ভুলভ্রান্তি ও যাহা কিছু মন্দ সমস্তই এড়ানো যায়।

সুপ্রণালী-অনুসৃত শিক্ষা কখনই ব্যর্থ হয় না। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত প্রযত্নের দ্বারা এই ফল লাভ করিতে পারে। বাহির হইতে মনের উপর যে জ্ঞান চাপানো হয় তাহা অনিশ্চিত। বুদ্ধিবিবেচনা না খাটাইলে, চিন্তাধারায় একটা নৈশ্চিত্য আসে না, কাজও সরল পথে অগ্রসর হয় না। মাল্‌ব্রাঁশ্ এই বিষয়টা এতটা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে যাহা কিছু বিচারবুদ্ধি চর্চ্চার অনুকূল নহে তৎসমস্তই বর্জ্জনীয়। ইন্দ্রিয়-গৃহীত জ্ঞানকে তিনি শিক্ষা-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন। তিনি ইতিহাসকে অবজ্ঞা করেন; কেন না, ইতিহাস স্মরণশক্তিকে সাহায্য করে। দেকার্ত্তীয় শিক্ষাপদ্ধতির তিনি পক্ষপাতী। বিচার-বুদ্ধির অনুকূল শিক্ষাকেই তিনি অগ্রাসনে বসাইতে চাহেন।

এই দেকার্ত্তীয় শিক্ষা-পদ্ধতির ভাব Jansen-বাদীদিগের লেখাতেও কতকটা পরিলক্ষিত হয়। উহাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি প্রত্যেক বিষয়ে জেসুইটদিগের শিক্ষাপদ্ধতির বিপরীত। শিশুর মনের উপর কাজ করিবার জন্য, না তাহারা প্রতিযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করে, না তাহারা ভয়ের সাহায্য গ্রহণ করে। উহারা অন্তরাত্মার গভীর দেশে আত্মমর্য্যাদার ভাব জাগাইয়া দেয়। উহারা চাহে, বালকদিগের চেষ্টা উত্তম স্বাধীন ভাবে প্রকটিত হয়।

যাহাতে বালকেরা নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া ফলগর্ভ চেষ্টা করিতে পারে এইজন্য উহারা নানা কৌশল উদ্ভাবন করে। উহাদিগকে তাহারা কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা দেয়—চিন্তা করিবার কলাকৌশল। ছাত্র অজ্ঞাত হইতে জ্ঞাততোয় গিয়া পৌঁছিবে। এই মূলসূত্র অনুসারে, বালকেরা অন্য ভাষার পূর্ব্বে মাতৃভাষা শিক্ষা করিবে, স্থূল তথ্য হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে ক্রমে অগ্রসর হইবে। সেইরূপ ব্যাকরণ সম্বন্ধেও,—পাঠ কালে যে সব দৃষ্টান্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, শুধু সেই সব দৃষ্টান্ত স্থলেই নিয়ম বলিয়া দিতে হইবে,—তাহার পূর্ব্বে পৃথকভাবে নহে। বালকদিগের মনে যে সব জ্ঞানের কথা প্রবেশ করাইতে হইবে, সে কেবল ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া।

এই শেষোক্ত লক্ষণটির দরুণ, দেকার্ত্তের জ্ঞানবাদী শিষ্যদিগের সহিত উহাদের একটু পার্থক্য থাকিলেও, আসলে উহাদের চিন্তাধারা, উহাদের পদ্ধতি দেকার্ত্ত-শিষ্যদের সহিত বেশ মিশ খায়। মনে হয় যেন উহারা দেকার্ত্তের রচিত "পদ্ধতি বিষয়ক সন্দর্ভ" হইতে এই শিক্ষাপদ্ধতি টানিয়া বাহির করিয়াছে।

তেমন জানসেন্‌বাদী না হইলেও, Fenelon শিক্ষা সম্বন্ধে Arnaud ও Necole-র দলভুক্ত ছিলেন। তাহাদেরই ন্যায়, বালকের উপর, বালকের স্বাধীনতার উপর, বালকের চিন্তাধারার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার প্রোগ্রাম্‌টা কি? প্রথম কয়েক বৎসর শরীরের উপর যত্ন করিতে হইবে, "শিক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে না"। সময় উপস্থিত হইলে ছাত্রের স্বাভাবিক কৌতূহলকে উস্‌কাইয়া দিতে হইবে। মনোযোগের ক্লান্তি এড়াইবার জন্য, এবং সেই বিষয়ে সফল হইবার উদ্দেশে অধ্যয়নের "বৈচিত্র-সম্পাদন" করিতে হইবে। কোন সুযোগ উপস্থিত হইলেই, জ্ঞাতব্য বিষয়গুলা অপ্রত্যক্ষভাবে, প্রকারান্তরে, ছাত্রের মনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। একটু কৌশল করিয়া এবং ঘোর-ফের উপায়ে, দোষত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে। সংক্ষেপে—বালকের জন্য স্বাধীনতা ও শিক্ষকের জন্য বহিঃপ্রতীয়মান চেষ্টা-বিরতি। ইহার মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ Montaigneকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং Rousseau-র পূর্ব্বাভাস দেয়।

১৭ শতাব্দীতে, ফেনেলোঁ, এবং ফেনেলোঁ অপেক্ষাও জান্‌সেন-সম্প্রদায় আরও বেশী বৈপ্লবিক। কিন্তু জান্‌সেনবাদীরা উহাদের সাহসিকতাকে চূড়ান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যায় নাই। বালকদিগের পক্ষে যে শিক্ষাপদ্ধতি উহারা উত্তম বলিয়া মনে করে, বালিকাদের পক্ষে তাহা ঠিক বলিয়া মনে করে না। Pascal যিনি এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে Port-Royal-এর মত ব্যক্ত করিয়াছেন তিনি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধির অনুশীলন সম্বন্ধে ভয় পান এইরূপ মনে হয়। তিনি খুব উদার ভাবে উহাদের স্মরণশক্তিকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন; কেন না, উহাদের মন বিবিধ স্মৃতির দ্বারা ভূষিত হইলে, উহারা আর চিন্তা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিবেনা এবং চিন্তা করিতে শিখিলে উহাদের চিন্তা অবশ্যম্ভাবীরূপে খারাপ চিন্তাই হইবে। উহাদের অপেক্ষা ফেনেলোঁ বেশী শিষ্ট ও উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি

স্বীকার করেন যে, স্বীয় সন্তানদিগকে শিখাইবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহাই নারীগণ শিখিবে। এবং এই মূল সূত্রটি বহুল পরিমাণে ফলগর্ভ। কিন্তু তিনি শুধু পারিবারিক কল্যাণের হিসাবে নারীকে শিক্ষা দিতে চাহেন, নারীর নিজস্ব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট করিতে চাহেন না।

তাঁহার সমসাময়িকেরা আরও ভয়ত্রস্ত। তাঁহার মতামত, জান্‌সেনবাদীদিগের মতামতের দ্বারা কতকটা অনুপ্রাণিত হইলেও, তাহারা অন্যত্র হইতে গৃহীত মতামতের দ্বারা ঐসব মতামত একটু রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল। মাদাম-দে-ম্যাৎনো, চরিত্র গঠন ও হাতের কাজ শিক্ষার পর সাধারণ জ্ঞানশিক্ষা বালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। Abbi Fleury নারিদের শিক্ষার জন্য কেবল তিনটি বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন :—ফরাসী ভাষা, তর্কশাস্ত্র ও পাটীগণিত; এবং কিছুকাল পরে Abbi de Saint Pierre চাহিয়াছিলেন যে, স্বামীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য যতটা দরকার ততটা নারীদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। অন্য শিক্ষাদাতারা নূতন মতামত ও পুরাতন মতামত বিভিন্ন অনুপাতে একত্র মিশাইয়াছিলেন।

যুবরাজের (Dauphin) শিক্ষক (Bossuet) বস্তুয়ে ল্যাটিন-গ্রীক ভাষা শিক্ষা ও প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা সম্বন্ধে জেসুইটদের রুচি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জান্‌সেনবাদী-দিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি তাঁহার শিক্ষা তালিকার ভিতর, ফরাসী ভাষা এবং বিজ্ঞান ও দর্শন সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; এমন কি, ১৮ শতাব্দীর প্রারম্ভে, Rollin স্পষ্টই দেখা যায়, জান্‌সেনবাদী-দিগের প্রভাবের বশীভূত হইয়া, বলপ্রয়োগ অপেক্ষা প্ররোচনার পক্ষপাতী ছিলেন, স্মরণশক্তি অপেক্ষা তিনি বিচার বুদ্ধিরই বেশী প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু তাঁহার "শিক্ষা সংক্রান্ত সন্দর্ভে"র যেটি বিশেষ লক্ষণ সেটি হইতেছে—তদন্তর্গত উপদেশগুলির "বিজ্ঞতা" বা 'উপাদেয়তা' :— শিশুদিগের কাজ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে; তাহাদের মানসিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে; ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে; দেখিতে হইবে উহারা আমাদের উপদেশ ঠিক্ অনুসরণ করিতেছে কিনা। পুনরাবৃত্তি করিতে ভয় করিবেনা; ভাল করিয়া শিখিলে, শিক্ষার কাজও দ্রুত অগ্রসর হইবে; শিশুরা যদি কোন বিষয়ে তলাইয়া জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইল বলিতে হইবে। বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই উপদেশগুলি যে-কোন শিক্ষক-সম্প্রদায় গ্রহণ করিতে পারে।

ইহা নিশ্চিত, ১৭ শতাব্দীর ও ১৮ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ফরাসী মতামতের প্রতিনিধিরা, ফ্রান্সে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদাতা ছিলেন না। কি দেকার্ত্ত, কি Port-Royal, কি Fenelon এবিষয়ে কেহই জয়লাভ করিতে পারেন নাই। জয়ী হইয়াছিল জেসুইটেরা। প্রায় উক্ত শতাব্দী হইতে, উহাদের শিক্ষা পদ্ধতি এক নূতন বিভাগে, এক বিশাল বিভাগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। Abbi de La Sulla, লোকের মধ্যে সামান্য রকমের শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য "খৃষ্টীয় বিদ্যালয়-সংলগ্ন ভ্রাতৃ-সমাজ" স্থাপন করিলেন। নানা নিদর্শন হইতে এইরূপ

প্রতীতি হয় যে, জেসুইটেরা মধ্যবিত্ত ও আমীর-ওমরার ছেলেদের জন্য যে প্রণালী প্রয়োগ করিত, সেই প্রণালী উহারা নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিল। "বিদ্যালয়-পরিচালন" গ্রন্থ "Ratio descendi et docendi" গ্রন্থে সেই সব অভ্যাস ও কার্য্যক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হইত যাহা ছাত্রের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে খর্ব্ব করে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মকানুন স্থাপন করিয়া এবং বেত্র ও চাবুক প্রয়োগের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইত। এই মূক ও বিষাদময় বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা কেবল কতকগুলি সচরাচর ধরণের জ্ঞান লাভ করিত, যথা—লিখন, পঠন ও পাটীগণিতের চারিটা নিয়ম। ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে ছাত্রেরা ভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাইত। ইহা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অগ্রাহ্য করা নয় কি? ইহা মানসিক ভীরুতা নয় কি? ইহা রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মঘটিত একটা গূঢ় অভিসন্ধি নয় কি? যাই হোক La Salle লোকশিক্ষার সমস্যাটা সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপন করায় তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়—কিন্তু ইহা নিশ্চয় তাঁহার প্রণালীটা আদৌ উদার ধরণের ছিল না। এই লোকশিক্ষার বিভাগে ও শিক্ষার অন্য বিভাগে, যে প্রণালী Rabelai ও Montaigne কর্ত্তৃক প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তাহার পর যাহা দেকার্ত্ত, জান্‌সেনবাদীগণ ও Fenelon কর্ত্তৃক বরাবর অনুসৃত হয়, সেই পুরাতন ফরাসী প্রণালী আবার পরে প্রবর্ত্তিত হয়।

সেই ফরাসী শিক্ষাপদ্ধতির পুরাতন ধারা আবার (Roussau) রুসো কর্ত্তৃক পুনঃ গৃহীত হইল। জাঁ-জাক্ রুসোর নির্ভীকতা, দেকার্ত্তকে এমন-কি মোতাইংকেও ভীত করিয়া তুলিতে পারিত। যাই হোক রুসো তাহাদিগের ঠিক অনুবর্ত্তন না করিলেও, তিনি তাঁহাদের শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষকেই তিনি জয়যুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার Emile সর্ব্বজন-বিদিত গ্রন্থ; ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রধান প্রধান বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

১। মানুষ স্বভাবতই ভালো। সমাজই মানুষকে খারাপ করে। অতএব মানুষকে সমাজের প্রভাব হইতে অপসারিত করিয়া, তাহাকে একাকী প্রকৃতির মধ্যে শিখাইয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষা দিবার চেষ্টা তাহার নিজের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ছাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতার বিকাশে শিক্ষক যেন বাধা না দেয়। শিক্ষক আপনাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবেন, শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের পথে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক হইবে, সেই সমস্ত শিশুর নিকট হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। শিক্ষা উদার ধরণের হইবে, এমন কি তাহাকে শিক্ষা না বলিলেও চলে; শস্যের চাষ করা ঠিক নয়,—শস্যকে আপনা আপনি গজাইতে দেওয়াই ঠিক।

২। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। যতই নেতিবাচক হউক না কেন, শিক্ষাদাতার কার্য্যক্রম ছাত্রের মানসিক অবস্থা অনুসারে পরিবর্ত্তন করা উচিত। ভবিষ্যতের জন্য কি শিক্ষা করা আবশ্যক সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া, শিখিবার কি অবস্থায় শিশু এখন

আসিয়াছে তাহাই বেশী বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। প্রত্যেক বয়সে, শিশুর স্বভাব কিরূপ এবং কিরূপ শিক্ষাক্রম, কিরূপ প্রণালী তাহার উপযোগী ?

১২ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু একটা ক্ষুদ্র পশু মাত্র। ঐ সময়ে তাহার শরীর ও তাহার ইন্দ্রিয়বোধ লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। প্রথমে তাহাকে তাহার স্বাভাবিক খাদ্য দিতে হইবে—মাতৃ-স্তন্য। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাহাতে আরামে থাকে তাহাই দেখিতে হইবে। আঁটা সাঁটা কাপড় দূর করিয়া দিবে, জুতা মোজা দূর করিয়া দিবে। Emile খালি পায়ে চলিবে। প্রকৃতির আরোগ্যদায়ী ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ঔষধ একটা কলকৌশল মাত্র—এমিলের সহিত ঔষধের কোন সংস্রব থাকিবে না। তাহাকে কোনও প্রকার শিক্ষা দিবে না। তাহাকে ইতিহাস শিখাইতে চেষ্টা করিবেনা। (তথ্যসমূহের শৃঙ্খলটা সে ধরিতে পারিবে না। সাহিত্যও তাহাকে শিখাইবে না ; La Fontaineর উপকথা সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না)। ইহার বিপরীতে সে যেন সব জিনিষ নিজের চোখে ভাল করিয়া দেখে, তাহার ইন্দ্রিয়গণকে যেন কাজে খাটায়, অন্ধকারের মধ্যেও যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পায় ; সে যেন স্থানের দূরত্ব বুঝিতে পারে ; সে যেন অনুভূতির পূর্ব্বায়োজন করে, যাহাতে তাহা হইতে কতকগুলা ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করিতে পারে। সে স্বাধীন। যে সব জ্ঞান জোর করিয়া মনের উপর চাপানো হয়, তাহা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে অর্জ্জিত জ্ঞান কি বেশী পাকাপোক্ত নয় ? তাছাড়া যদি সে তাহার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, প্রকৃতি কি তাহার জন্য তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইবে না ? যদি সে বেশী জোরে হস্তসঞ্চালন করে, বাধা পাইয়া তাহার হাত ব্যথিত হইবে। যদি দূরত্বের গণনায় ভুল করে তা হইলে বহুকষ্টে বিলম্বে সে তাহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবে। ১৮ শতাব্দীতে রুসো প্রাকৃতিক মঞ্জুরীসমূহের একটা খসড়া চিত্র দিয়াছেন।

১২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু মানুষ হইয়া উঠে। সে বিচার করিতে পারে, যুক্তি করিতে পারে। এই সময়েই তাহার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের খাদ্য যোগানো দরকার। সে কি খাদ্য ?—যে খাদ্য প্রকৃতির মধ্যেই পাওয়া যায়। তারকাপূর্ণ আকাশ নিরীক্ষণ করিয়া সে জ্যোতিষ শিখিবে, পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া সে ভূগোল শিখিবে, একটা ব্যবসায়ের কাজ করিয়া সে যন্ত্রবিদ্যা শিখিবে। কিন্তু এখন সে ব্যাকরণ শিখিতে পারে না, ইতিহাসও শিখিতে পারে না। তাহার কাছে পুস্তক নাই। কেবল "পদার্থগুলিই" তাহাকে শিক্ষা দেয়। ইহাকে কি রীতিমত শিক্ষা বলা যায় ? না, সে কেবল এখন জ্ঞানের হাতিয়ার গড়িয়া থাকে—যে হাতিয়ারের সাহায্যে পরে সে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিবে। ১৪ বৎসর বয়সে এমিল "শিক্ষিত হয় নাই, পরন্তু শিক্ষালাভের উপযুক্ত হইয়াছে।"

অবশেষে ১৪ বৎসর বয়স হইতে ভাব-রসের কাল আরম্ভ হয়। তখন হইতে সে যুবক-দিগের সহিত দার্শনিক ও ধর্ম্ম-ঘটিত সমস্যা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, স্বকীয় নৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে। দৈহিক শিক্ষার ন্যায়, মানসিক শিক্ষার ন্যায়, এই ধর্ম্মঘটিত

বঙ্গবাণী

সম্পাদক

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
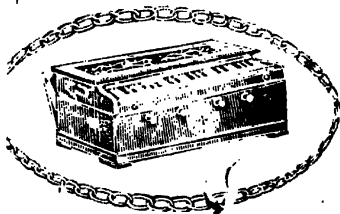
কার্য্যালয়

৭৭ নং রসারোড নর্থ,

ভবানীপুর।

বার্ষিক ৪৸০ প্রতি সংখ্যা [illegible]

শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্পাদিত হয়। এমিল নিজেই তাহার ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিবে।

ভাব-রসের বয়স শুধু ধর্ম্ম ও নীতির বয়স নহে, ইহা প্রেমেরও বয়স। এমিল সোফির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। উহাদের উপন্যাস পাঠ করিবার দরকার নাই; "Emile" সংক্রান্ত শেষ গ্রন্থ, পূর্ব্ব গ্রন্থগুলা অপেক্ষা কম নির্ভীক। রুসো মনে করিলেন, Sophiaর নিজের জন্য শিক্ষা করিতে হইবে না, শুধু এমিলের জন্য শিক্ষা করিতে হইবে। সাধারণ সংস্কারের বিরুদ্ধ কথায় (প্যারাডক্সে) যিনি ভয় পান না, সেই তিনি Abba de Saurtpierreএর কতকগুলি প্রচলিত-বিরুদ্ধ কথায় (প্যারাডক্সে) ভীত হইয়া পড়িলেন।

Emileএর মূল্য নির্দ্ধারণ করা আমাদের দরকার নাই, শিক্ষাদানের সাহিত্যে এমিল্ কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিব। এমিল্ অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। পরে এমিল্ অধিকতর পূর্ণতা লাভ করিবে। এমিলের দোষগুণের বিচার হইবে। ইহা প্রদর্শিত হইবে যে, শিক্ষাদাতা, শিশুকে সমাজ হইতে প্রত্যাহৃত করিতে পারেন না, পরন্তু শিশুকে তাহার সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপযোগী করিয়াই তোলাই শিক্ষাদাতার কর্ত্তব্য। যাই হোক্ লোকে রুসোকে বিস্মৃত হইবে না।

যাহারা শিক্ষা-সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত, তাহাদের উপর রুসো তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে: Kant, Basedow, Pestalozzi, Spencer ও Tolstoi—তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মতবাদগুলির জন্য রুসোর নিকট ঋণী। তাঁহাদের একটা মত যাহা খুব ফলপ্রসূ—তাহা কি?—না, বয়সের বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষাদান। এই মতটিকে রুসো অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। তিনি বয়সগুলার মধ্যে এমন একটা অতলস্পর্শ খাদ খনন করিয়াছেন, যাহা জীবনের ধারাবাহিক প্রবাহে আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না। মানবশিশু নিছক একটা ক্ষুদ্র পশু নহে, পূর্ণবয়স্ক মানুষও নিছক আসক্তির দাস নহে। রুসো পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, শিশুর শিক্ষা শিশুর ক্রমবিকাশের অনুসরণ করিবে। একথা খুবই ঠিক্। এবং এই বিষয়টি ১৯ শতাব্দীর বহু গ্রন্থকারের নিকট বেশ পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি মাদাম Necker-এর মর্ম্মভেদী গ্রন্থখানি "ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু শিক্ষাপ্রণালী" এই নামে অভিহিত হইয়াছে। এমিলের অন্তর্নিহিত মুখ্য ভাবটি, ১৬ ও ১৭ শতাব্দীর ফরাসী শিক্ষা-সম্প্রদায়ের সহিত রুসোকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়াছে। রুসো বারংবার শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত চেষ্টা ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়াছেন, ইহাতে করিয়া Montagne ও Fenelon-র সহিত কি তাঁহার মতের মিল হইতেছে না? দেকার্ত্ত একটা স্বতঃসিদ্ধ বীজসূত্রের কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন—যাহার অভাবে সকল শিক্ষাদানই ব্যর্থ হয়—সেটি কি?—না, মানবস্বভাবের আদিম সাধু ভাব। এবিষয়েও কি দেকার্ত্তের সহিত রুসোর মতের মিল হয় না?

• রুসোর প্রতি অনুরাগ না থাকিলেও, শিক্ষার কথা বলিবার সময়, ১৮ শতাব্দীর দার্শনিকেরা

রুসোর পক্ষ গ্রহণ করেন। Condillac তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর স্থাপন করিয়াছেন—তাঁহার আধ্যাত্মিক মতবাদ হইতে তিনি এই নিয়মগুলি বাহির করিয়াছেন :— সূক্ষ্মতত্ত্বের পূর্ব্বে স্থূলতথ্যের শিক্ষা দিতে হইবে। কতকগুলি সাধারণ ধারণায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া পদার্থসমূহের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। "কলা ও বিজ্ঞান সৃষ্টি করিবার সময়", সভ্যতায় সমস্ত ধাপ মাড়াইয়া চলিবার সময়, মানুষ যে পথ অনুসরণ করে, শিক্ষাসম্বন্ধেও সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু অনেকস্থলে, রুসো ও তাঁহার পূর্ব্বগামীদের প্রবর্ত্তিত নিয়মের সহিত এই সকল নিয়মের মিল হয়। স্মৃতি অপেক্ষা বিচারচিন্তার উপর কোঁদিয়াকের বেশী আস্থা। তিনি বলেন, "পদার্থ সকল স্মরণ করিতে পারা অপেক্ষা, আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে, পদার্থ সকল আরও ভাল করিয়া জানা যায়।" বাস্তবতঃ তাঁহার দর্শনবাদ দেকার্ত্তের দর্শনবাদ হইতে খুব ভিন্ন হইলেও, তিনিও দেকার্ত্ত-বাদীদিগেরই ন্যায় খুব জোরের সহিত ব্যক্তিগত বিচারচিন্তার পক্ষ সমর্থন করেন।

এমন-কি Helvetius তেমন দেকার্ত্তবাদী না হইলেও, দেকার্ত্তের ন্যায় তিনিও বলিয়াছেন, 'শিক্ষা হইতেই সমস্ত ব্যক্তিগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়'। এই প্রতিজ্ঞাটি হইতে দূর-পরিণাম বাহির করিয়া তিনি এইরূপ সমর্থন করেন—১৯ শতাব্দীতে Jacotot সমর্থন করিয়াছেন যে, শিক্ষা সর্ব্বশক্তিমান; আমাদের সবাইকে প্রতিভাবান করিয়া তোলা, কিংবা মাঝামাঝি রকমের মানুষ করিয়া তোলা—সে সমস্তই নির্ভর করে শিক্ষার উপর।

এই মত হইতে সভাবতঃই এই কথা আসিয়া পড়ে,—সকল মানুষকেই (সকল মানুষই সমান) সমান রকমের শিক্ষা দিতে হইবে। এই কথা যে শুধু Helvetius বলিয়াছেন তাহা নহে, Diderot যিনি তাঁর বন্ধুর সমস্ত নূতন ধরণের মত স্বীকার করেন না, তিনিও বলেন, শিশুদিগের জন্য বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক, ও "সার্ব্বজনিক" একটা পাঠশালা হওয়া উচিত। এবং জেসুইটদের যিনি বৈরী সেই La-Chalotais প্রায় ঐ সময়ে একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৮ শতাব্দীর প্রারম্ভে, আমরা দেখিয়াছি জেসুইট্‌রা শুধু অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে জয়লাভ করেন নাই, তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ লোকের মধ্যেও বিস্তার করিয়াছেন। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে, জেসুইট্‌রা ফ্রান্স হইতে তাড়িত হয়। তখন "দার্শনিকেরাই" বিজয়ী হইল; রুসোর মতই প্রবল হইল; Emile-"ফ্যাশানেব্‌ল্‌" হইয়া উঠিল; তখন শিক্ষাদাতারা উদার শিক্ষা-প্রণালী লোক-শিক্ষার মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করিবে মনে করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন

রাষ্ট্র-সাধনায় হিন্দু জাতি

প্রত্নতত্ত্বের বাস্তব মালমশলাগুলিকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কাঠামে ফেলিতেছি। দেখা যাউক ভারতীয় নরনারীর কোন্‌মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসে।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কোনো একটা বিদ্যার নাম নয়। "জুরিস্‌-প্রুডেন্‌স্‌" বা আইন-তত্ত্ব, ধন-বিজ্ঞান, নগর-বিজ্ঞান, রাজস্ব-বিদ্যা, লড়াই-বিদ্যা, "আবাপ" বা আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন-তত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিদ্যার সমবায়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত হয়।

গণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রই হউক বা রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রই হউক, প্রত্যেকের শাসনেই এই সকল প্রকার বিদ্যা কাজে লাগে। কাজেই শাসনের "রূপ" বা "গড়ন" বিষয়ক তথ্যগুলা "ঢুঁড়িয়া বাহির" করিতে হইলে অথবা এই সমুদয়ের "ব্যাখ্যায়" বা বিশ্লেষণে লাগিয়া যাইতে হইলে এই সকল বিদ্যারই ডাক পড়িতে বাধ্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক উঠাবসায়ই নৃতত্ত্ব "(অ্যান্‌থ্রপলজি)" এবং চিত্ত-বিজ্ঞান ("সাইকলজি")ও আবশ্যক।

বর্ত্তমান গ্রন্থের হিন্দু নরনারী সাত শ' বৎসর ধরিয়া গণতন্ত্রের "রাজ্" চালাইতেছে,—আর ষোল সতের শ' বৎসর ধরিয়া রাজ-তন্ত্রের "রাজ্" চালাইতেছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির "পাব্‌লিক ল" বা রাষ্ট্র-শাসন এই কয় পৃষ্ঠার ভিতর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

কোথাও দেখিতেছি হিন্দুসমাজের মাতব্বরেরা নগরের স্বাস্থ্যরক্ষায় মাথা ঘামাইতেছে। কোথাও বা পল্টনের খোরপোষ জোগাইবার জন্য ধন-সচিবেরা শশব্যস্ত। কখনও জনগণকে আত্মকর্ত্তৃত্বের সাধনায় নিরত দেখিতেছি। কখনও বা অসংখ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন জনপদগুলাকে ঐক্য-গ্রথিত করিবার দিকে রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মেজাজ খেলিতেছে।

এই আবহাওয়ায় হিন্দুজাতি শক্তিযোগী এবং টক্কর-প্রিয়। ভারতের নরনারী এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে হিংসা-ধর্ম্মী এবং বিজিগীষু। রাষ্ট্রীয় লেনদেনগুলা,—কি "তন্ত্রে"র কাজকর্ম্ম, কি "আবাপে"র কাজকর্ম্ম,—সবই ভারতবাসীর হাতের জোরের আর মাথার জোরের প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেক সেনা-চালনায়, প্রত্যেক খাজনা আদায়ে, প্রত্যেক "শ্রেণী"-স্বরাজে আর প্রত্যেক জমি-জরীপে লোকগুলার রক্তের স্রোত ছুটিতেছে আর মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে।

সেই রক্তের স্রোত আর মাথার ঘামই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসল উপকরণ। হিন্দু রক্ত-দরিয়ার তেজ মাপিতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

জরীপ করিবার যন্ত্র

রক্তের তেজ মাপিতে হইবে। কেমন করিয়া? মাপ-কাঠি কোথায়? জরীপ করিবার যন্ত্রটা কৈ?

যাহা জানা আছে তাহার সাহায্যে অথবা তাহার তুলনায় অজানাকে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জানা আছে বর্ত্তমান জগৎ। অতএব বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-সাধনা জরীপ করা সম্ভব।

(১)

পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য ইত্যাদি ভারতীয় গণিত-পণ্ডিতদের বিদ্যার দৌড় কতটা? মাপা সম্ভব একমাত্র তাহার পক্ষে যে জানে নিউটন, ম্যাক্‌সোয়েল, আইনষ্টাইন ইত্যাদির মর্ম্মকথা। সেইরূপ পাতঞ্জলি, নাগার্জ্জুন ইত্যাদির। হিন্দু রসায়নের কিম্মৎ বুঝে কে? যে বুঝে উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর "রস-রত্ন-সমুচ্চয়" বা রসায়ন-সমুদ্র কি চিজ। চরক সুশ্রুত ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই "ফর্ম্মুলা"ই লাগিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তুলনায় প্রাচীন ভারতকে লজ্জিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লজ্জা একমাত্র হিন্দু রক্তের লজ্জা নয়। গোটা প্রাচীন দুনিয়াই,—জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তুলনায় "সেকেলে"।

পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এই কথাটা মনে রাখিতে অভ্যস্ত নন। তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্ত্তমান জগতের আসরে বসাইয়া মনের সুখে ভারতমাতাকে বে-ইজ্জৎ করিতে ভাল-বাসেন। গ্রীক, রোমান এবং "ক্যাথলিক-খৃষ্টিয়ান" ইয়োরোপের অজ্ঞান, কুসংস্কার, "তুক্‌মুক্", "হাঁচি", "টিক্‌টিকি", "ভুতুড়ে কাণ্ড" এবং লাখ লাখ অন্যান্য বুজরুক ইঁহারা বেমালুম ভুলিয়া যান। আর, ভারত সন্তানেরা প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা-অসভ্যতা এবং সু-কু সম্বন্ধে প্রায় একদম কিছুই জানেন না। কাজেই পশ্চিমাদের সঙ্গে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া ভারত সম্বন্ধে লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকা এতকাল আমাদের দস্তুর রহিয়াছে।

(২)

যাহা হউক, হিন্দু নরনারীর রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগ মাপিবার আর এক উপায় হইতেছে পুরাণা ইয়োরোপের দৌড়টা চোপর দিন রাত নিজের কব্জায় রাখা। গ্রীস, রোম এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা ইত্যাদি মুল্লুকে মানবজাতি কতখানি উঠিয়াছিল? সেই উঠার তুলনায় চরক, আর্য্যভট্ট আর নাগার্জ্জুনকে মাথা হেঁট করিতে হইবে না।

এই সকল বিজ্ঞান-বিদ্যার আখড়ায় সেকালের হিন্দুরা বুক খাড়া করিয়া,—সেকালের

গ্রীক, রোমাণ এবং খৃষ্টিয়ানদের সঙ্গে টক্কর চালাইয়া,—সমানে সমানে "বাপের বেটা" বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী রাখিত। "হিন্দু অ্যাচীভ্মেণ্ট্স্ ইন্ একজ্যাক্ট্ সায়েন্স্" অর্থাৎ "মাপজোক নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-বিদ্যায় হিন্দু জাতির কৃতিত্ব" নামক গ্রন্থে (নিউ ইয়র্ক, ১৯১৮) হিন্দু রক্তের স্রোত এই তরফ হইতে দেখানো হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে রাষ্ট্র-সাধনার ময়দানে দাঁড়াইয়া হিন্দু নরনারী, গ্রীক, রোমাণ এবং মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ানদের সঙ্গে পাঞ্জা কষিতেছে। এই কেতাবের লড়াই বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে নয়,—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ইয়োরোপের সঙ্গে।

"গড়ন-বিজ্ঞানে"র জাতি বিভাগ

"মর্ফলজি" বা "গড়ন"-তত্ত্ব অর্থাৎ রূপ-বিজ্ঞান সার্ব্বজনিক ও সনাতন। এক টুক্‌রা হাড় দেখিবামাত্র বলিয়া দেওয়া সম্ভব এটা বাঘের বুকের পাঁজরা না ভেঁড়ার পিঠের শির-দাঁড়া। জীবতত্ত্ববিদেরা এই সমস্যা লইয়া দিন রাত ব্যাপৃত আছেন। কথাটার মধ্যে হেঁয়ালি কিছুই নাই।

"বুদ্ধদেবের দাঁত" নামক বস্তু "আবিষ্কৃত" হইবা মাত্র এই কারণেই অস্থিতত্ত্ববিৎ মহলে লড়াই উপস্থিত হওয়া সম্ভব। বস্তুটা যে শূয়রের দাঁত নয় আগে তাঁহার মীমাংসা করা দরকার হইয়া পড়ে।

ভূ-তত্ত্ববিদেরাও এই ধরণের গবেষণায়ই অভ্যস্ত। এক টুকরা পাথর অথবা কয়লার চাপ বা এমন কি ধূলা বালুর নমুনা পাইলেই তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন দুনিয়ার কোন্ কোন্ মুল্লুকের কত হাত মাটির বা "পাণি"র নীচে অথবা কোন্ পাহাড়ের ডগায় এই সব মাল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

রূপ-বিজ্ঞান মানুষের বেলায়ও খাটে। দলবদ্ধ মানুষ বা সমাজ এবং সমাজের "রাষ্ট্রীয় তন্ত্র" ও "আবাপ" অর্থাৎ ঘরে-বাইরের সকল প্রকার লেন দেন সম্বন্ধেও মর্ফলজি বা গড়ন-তত্ত্বের "রূপ-কথা" খাটিবে। অনেক স্থলেই হয়ত "অণুবীন" যন্ত্রের অর্থাৎ "ইন্টেন্সিহ্ব্" বা গভীর দৃষ্টিশক্তির এবং সমালোচনা শক্তির দরকার। কিন্তু সর্ব্বত্রই বিশ্বব্যাপী যুগ-বিভাগ, স্তর-বিভাগ, জাতি-বিভাগ, উপজাতি-বিভাগ ইত্যাদি শ্রেণী-বিন্যাস কায়েম করা সম্ভব। তথ্য "বিশ্লেষণ" সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলেই হইল।

পল্লী জীবনের এক চাপ দেখিবা মাত্র কখনো হয়ত বলিব এটা "আদিম"। কখনো বা "প্রাচীন" বলিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় করা হইবে। আবার "মধ্যযুগের" পল্লী এবং "বর্ত্তমান" যুগের পল্লী ইত্যাদি বস্তুও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিদর্শনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সেইরূপ লড়াইয়ের কায়দা বা জমিজমা বন্দোবস্ত দেখিলেই এই সবের "দেশ কাল পাত্র" ঠাওরানো সম্ভব। অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, শুল্ক ও খাজনার নাম ইত্যাদি শুনিবা মাত্র এইগুলার "কুলশীল" বলিয়া দেওয়া কঠিন বিবেচিত হইবে না।

রাজা, রাজপদ, রাজশক্তি ইত্যাদি বস্তু দুনিয়ায় আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। কিন্তু কালিদাস সেক্‌স্‌পীয়ারের "রাজা" যে চিজ্ বৈদিক সাহিত্য বা "ইলিয়াদ-ওদিসি"র "রাজা" সেই চিজ নয়। "রাজশব্দোপজীবী" যে কোনো ব্যক্তির রক্ত অণুবীনে পরখ করা যাইতে পারে। করিলেই বুঝা যাইবে ইহার ভিতর তাসিতুস-বিবৃত জার্ম্মাণ-রাজা, না "জাতক"-সাহিত্যের "গণ-রাজা", না ফ্রান্সের বুধোঁ বাদশা, না মৌর্য্য "সার্ব্বভৌম", না আধুনিক ইংরেজ সমাজের হাত পা ঠুঁটা-করা রাজা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্যান্য কোষ্ঠীর মতন রাজ-রক্তের কোষ্ঠীতেও গণকেরা যুগ ও জাত্ খোলসা করিয়া দিতে সমর্থ।

গড়ন-বিজ্ঞান খাটাইয়া হিন্দু জাতির মূর্ত্তি-পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। মান্ধাতার আমল, আদিম সমাজ, প্রাচীন দুনিয়া, মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ান বিশ্বরূপ আর বর্ত্তমান জগৎ ইত্যাদি নৃ-তত্ত্ববিদ্যার শব্দগুলা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সন তারিখ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। গোঁজামিলের সম্ভাবনা নাই।

এই সকল পারিভাষিক শব্দ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা নেহাৎ অসতর্কভাবে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত,—বিশেষতঃ যখন ভারতীয় এবং প্রাচ্য তথ্য লইয়া তাঁহাদের কারবার চলে। এইজন্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসরে গোঁজামিল ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। সেই কুসংস্কার এবং গোঁজামিল চলিতেছে আজকালকার ভারতীয় পণ্ডিতগণের ভারত-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার আসরেও। দেশী এবং বিদেশী দুই প্রকার পণ্ডিতের বিরুদ্ধেই বর্ত্তমান গ্রন্থ লড়াই ঘোষণা করিতেছে।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই

প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সেই সময়ে,—১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে এলাহাবাদের পাণিণি আফিস হইতে মৎপ্রণীত "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্ অব্ হিন্দু সোসিঅলজি" অর্থাৎ "হিন্দু সমাজের বাস্তব ভিত্তি" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। তাহাতে এই লড়াইয়ের সূত্রপাত করা হইয়াছে।

এই পৌনে এগার বৎসরে,—অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে,—বিদেশের সর্ব্বত্র সেই লড়াইকে সমাজ-বিজ্ঞানের আসরে আসরে আনিয়া হাজির করিয়াছি। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বৈঠকে এই বাণী শুনানো হইয়াছে। মার্কিণ সমাজের উচ্চতম বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পত্রিকায় এই সংগ্রাম গিয়া ঠাঁই পাইয়াছে (১৯১৬-১৯২০)।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-ফ্যাকাল্টিতে এই লড়াই ঘোষণা করা হইয়াছে ফরাসী ভাষায়। "আকাদেমি দে সিয়াঁস্ মোরাল্ এ পোলিতিক" নামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পরিষদের

"চল্লিশ অমরের" কাণেও এই বাণী প্রবেশ করিয়াছে। পরে এই পরিষদের পত্রিকায় প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২১)।

জার্ম্মাণ সমাজেও,—জার্ম্মাণ ভাষায়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লড়াই উঠাইতে কসুর করি নাই। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্ম্মাণির রাষ্ট্র-সাহিত্য এই সকল তথ্যের আবহাওয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে (১৯২২-১৯২৩)।

যুবক ভারতের সংগ্রাম-দূত রূপেই এই অধম লেখক জগতের পণ্ডিত মহলে পরিচিত। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে",—এই মাত্র ভরসা।

১৯২২ সালে লাইপৎসিগ শহরে "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরিজ্ অব্ দি হিন্দুজ্" অর্থাৎ "হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র-দর্শন" নামক ইংরেজি গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছি।

এক্ষণে তাহার প্রথম অংশের খানিকটা বাংলায় লিখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। বর্ত্তমান গ্রন্থে হিন্দুজাতির রাষ্ট্রীয় "চিন্তা" বা "রাষ্ট্র-দর্শন" সম্বন্ধে কোনো কথা নাই। অধিকন্তু "প্রতিষ্ঠানের" বৃত্তান্ত হিসাবেও এই কেতাবের মাল পূর্ব্বোক্ত ইংরেজি রচনার মাল হইতে কিছু কিছু পৃথক্। যাহা হউক,—বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আনুকূল্যে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সুযোগ জুটিয়াছে বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে "পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। তাহাতে আছে একমাত্র "রাষ্ট্র-দর্শন"। আর প্রধানতঃ শুক্রাচার্য্যের মতামতই তাহার ভিতর ঠাঁই পাইয়াছে।

আথেনিয় "স্বরাজের"র অনুপাত

ভারতে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পঠন-পাঠন আজকাল কতটা হয় বলিতে পারি না। এই বিদ্যা বিষয়ক এম,এ পরীক্ষা পূর্ব্বে ছিল। এখনো আছে নিশ্চয়। বোধ হয় আজকাল পি, এইচ্, ডি ও চলে।

(১)

কিন্তু গোড়ায় গলদ। এশিয়ার সঙ্গে তুলনায় গ্রীস, রোম এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপকে পশ্চিমা পণ্ডিতেরা যে চোখে দেখিয়া থাকেন আমরাও বিনাবাক্যব্যয়ে গোলামের মতন ঠিক সেই চোখেই দেখিতে শিখিয়াছি। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার ইয়োরোপকে রক্তমাংসের মানুষ ভাবে দেখিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। তাহার জন্য অনুসন্ধান, "রিসার্চ্চ্" গবেষণা আবশ্যক। সেদিকে ভারতবাসীর খেয়াল কৈ ?

ইয়োরোপকে কথায় কথায় আমরা "স্বরাজের"র মুল্লুক, "স্বাধীনতার মুল্লুক, "জাতীয়তার"র

মুল্লুক, "গণ-তন্ত্রে"র মুল্লুক, "আইনের মুল্লুক", "ঐক্যে"র মুল্লুক, "শান্তি"র মুল্লুক ইত্যাদিরূপে বিবৃত করিতে অভ্যস্ত। আসল নিরেট সত্যগুলা কি? প্রায় একদম উল্টা।

(২)

আথেনিয় সমাজে ২৫,০০০ নরনারী মাত্র স্বাধীন, স্বরাজী এবং গণতন্ত্রী, চরম উন্নতির যুগে—অর্থাৎ পেরিক্লেসের আমলে (খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী)। "অনধিকারী" "গোলাম" "প্যারিয়া" তখন কত জন? চার লাখ।

মানবজাতির রাষ্ট্র-সাধনার তরফ হইতে এই অনুপাতটা কি বড় লোভনীয় চিজ? চার লাখ নরনারীকে "বাঁদী" করিয়া রাখিয়া পঁচিশ হাজার হিন্দু সেকালে কি কখনও কোথাও আত্মকর্ত্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা ও সাম্য ফলাইতে পারে নাই? পঁচিশ হাজার লোকের সাম্য, স্বাধীনতা ও স্বরাজ বস্তুটার ভিতর মানব সমাজের কোন্ স্বর্গ লুকাইয়া আছে?

প্রশ্নটাকে গভীর ভাবে আলোচনা করিবার জন্য খতাইয়া দেখিতে হইবে আথেন্স (আটিকা) রাষ্ট্রের চৌহদ্দি কতটুকু ছিল। আথেন্সের গৌরব যুগই বা কত বৎসর কত মাস কতদিন ইতিহাসের কথা? বুঝা যাইবে যে,—এশিয়ানদের তুলনায় আথেনিয়েরা "অতি-মানুষ" ছিল না।

কিন্তু ডিকিন্‌সন, গিল্‌বার্ট মারে, ব্যরি ইত্যাদি গ্রীকতত্ত্বের পাণ্ডারা ভারতসন্তানকে চোখে আঙুল্ দিয়া সে সব কথা বুঝাইয়া দিতেছেন কি? না। এরূপ বুঝানো তাঁহাদের স্বার্থ নয়। এই ধরণের তথ্য তাঁহাদের রচনায়ও পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসী শিখিয়াছে ঠিক উল্টা।

এই সকল ইংরেজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান গ্রীক-তত্ত্বজ্ঞ প্রত্যেকেই এক একটি লর্ড কার্জ্জন। অর্থাৎ বর্ত্তমান এশিয়াকে ইয়োরোপের গোলাম রূপে পাইয়া ইহাঁরা সেকালের প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যেও আকাশ-পাতাল পার্থক্য আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন!

এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো ভারতবাসীর মাথা খেলিয়াছে কি? "গ্রীক-তত্ত্বে"র ভিতরে আধুনিক "ইম্পিরিয়্যালিজ্‌ম্", শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্য ও এশিয়া-বিদ্বেষের দর্শন অতি সূক্ষ্মভাবে অসংখ্য বুজরুকি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা সন্দেহ করা পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনো ভারতসন্তানের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভূগোল ও রাষ্ট্রীয় ধারা

তার পর অন্যান্য কথা। ধরা যাউক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিষয়। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংরেজরা বিজিত "পরাধীন" জাতি। অর্থাৎ বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতের যে যে যুগ বিবৃত হইতেছে তাহার প্রায় সকল ভাগেই ইংরেজজাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল না। আইরিশ ঐতিহাসিক গ্রীণ এ কথা খুলিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।

যে হিসাবে আজকালকার দিনে "জাতীয়তা" বুঝা হইয়া থাকে সে চিজ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অধিকাংশ জনপদেই অজ্ঞাত ছিল। ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রীম্যান-প্রণীত "ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভূগোল" (লণ্ডন ১৯০৩) ঘাঁটিলেই বুঝা যায় "কত ধানে কত চাল।"

অধিকন্তু, ইংল্যাণ্ডই ইয়োরোপের একমাত্র দেশ নয়। আর, সর্ব্বত্রই "মাৎস্য ন্যায়" আর বংশে বংশে "ষাড়ের লড়াই" ইতিহাসের প্রধান তথ্য।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, "ন্যাশন্যালিটি" ইত্যাদি বোলচাল "খৃষ্টিয়ান" অভিজ্ঞতায় মিলে কি? মিলে না। তুর্ক-মুসলমানেরা যখন ইয়োরোপকে ছারখার করিয়া ছাড়িতেছিল তখন খৃষ্টিয়ান হেবনিস তাহাদের সঙ্গে দোস্তি পাতাইতে লজ্জাবোধ করে নাই।

আলেকজান্দারের আমল হইতে বুর্বোঁ আমল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়ানরা আত্মকর্তৃত্বহীন স্বরাজ-শূন্য পর-পীড়িত জাতি। বাদশার যথেচ্ছাচার আর জমিদারের অত্যাচার ছিল এই সকল নরনারীর সনাতন "কন্‌ষ্টিটিউশ্যান" বা রাষ্ট্রধর্ম্ম।

নারীজাতিকে বে-ইজ্জৎ করিতে গ্রীক আইন, রোমাণ আইন এবং "খৃষ্টিয়ান" আইন সমান ওস্তাদ। ইয়োরোপীয়ান "সমাজে" নারীর ঠাঁই কোনো দিনই সম্মানসূচক বা এমন কি "সহনীয়"ও ছিল না। কথাটা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্যই বিবেচিত হইবে না। জার্ম্মাণ পণ্ডিত বেবেলের গ্রন্থ ঘাঁটিয়া দেখিলেই আপাততঃ চলিবে। পরে আরও "ইণ্টেন্‌সিহ্ব্‌" "রিসার্চ্চ্‌" বা খোজ চালানো যাইতে পারে।

ভূমি-গত গোলামী ইয়োরোপীয়ান কিষাণ সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে কবে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। লাম্‌প্রেখ্‌ট্‌, বিশ্যর, সোম্বার্ক ইত্যাদি জার্ম্মাণ পণ্ডিত-প্রণীত আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলা পাকা সাক্ষ্য দিবে। এখনো ইতালিতে, পোল্যাণ্ডে এবং বল্কান অঞ্চলে সেই ভূমি-গোলামি কিছু কিছু চলিতেছে।

পাশ্চাত্য দণ্ড-বিধি

দণ্ড-বিধি বা পেন্যাল কোডের আইনে ইয়োরোপীয়ানরা মহা সভ্য, না? সেকালের গ্রীসে ড্রাকো-সংহিতা জারি ছিল। আথেন্সের ঋণ-কানুন ছিল পাশবিক। সে কালের রোমে ছিল "দ্বাদশ বিধান" প্রচলিত। মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ান রাষ্ট্রে "ইন্‌কুইজিশ্যন" নামক নির্য্যাতন-বিধিও "আইনসঙ্গত" ব্যবস্থাই বিবেচিত হইত।

পরবর্ত্তী যুগের সাক্ষ্য দেখিতে পাই জার্ম্মাণির ন্যুর্ণবার্গ সহরে। এই নগরের দুর্গে "ফোল্টার-কাম্মার" বা নির্য্যাতন-ভবন আজও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়ান দণ্ড-প্রণালীর সাক্ষী ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। হেবনিসের দোজে-প্রাসাদেও সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান বিচার-জুলুম মূর্ত্তিমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের বহর খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইয়োরোপের সমসাময়িক আইনগুলা ধারায় ধারায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে,—অত্যাচারী, নির্য্যাতন-প্রিয়, নিষ্ঠুরতার অবতার বেশী কাহারা। "সাইকলজি" বা চিত্ত-বিজ্ঞানের আসরে প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ চালানো সম্ভবপর কিনা তাহার "বাস্তব" প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজ সমাজে কিরূপ আইন ছিল? "কেম্ব্রিজ মডার্ণ হিষ্ট্রি" নামক গ্রন্থে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের বিলাতী পেন্যাল কোডে অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে ২৫০ টা অপরাধের তালিকা দেখা যায়। এই সকল অপরাধের একমাত্র সাজা প্রাণ-দণ্ড।

পরবর্ত্তীকালে যে সকল অপরাধকে অতি সামান্য বিবেচনা করা হইয়াছে সেই সকল অপরাধের জন্য ১৪০০ ইংরেজ নরনারীকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল ১৮১৫ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের ভিতর। কোনো দোকানের জানালা ভাঙিয়া দু এক আনা দরের রং চুরি করার অপরাধেও শিশুদের প্রাণ যাইত! হিন্দু নরনারীর দণ্ড-বিধিতে কি এই তালিকা ছাপাইয়া উঠিবার প্রমাণ দেখা যায়?

যাঁহাদের পক্ষে "ক্রিমিনলজি" বা অপরাধ-বিজ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞ প্রণীত অন্যান্য আইন-কেতাব সংগ্রহ করা কঠিন তাঁহারা ঘরে বসিয়া অধম-তারণ "এন্‌সাইক্লোপিডিয়াটা" "ঘাঁটকাইতে" পারেন।

"বাপ্‌রে! গ্রীস?" "বাপ্‌রে! রোম?"

ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ দফায় দফায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া মাপিয়া জুকিয়া আলোচনা করা দরকার। ইয়োরোপীয় সভ্যতা, দর্শন, ইতিহাস, সুকুমার শিল্প, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদিতে যাঁহাদের দখল নাই তাঁহারা ভারতীয় জীবন চর্চ্চা করিতে অনধিকারী।

(১)

ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিতদের ভিতর যাঁহারা "ভারততত্ত্বের" আলোচনা করেন তাঁহারা ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মহা পণ্ডিত নন। তাঁহারা সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষা জানেন বটে। এই সকল ভাষায় প্রচারিত পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করিবার বিস্তায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাঁদের অধিকাংশই না জানেন নৃতত্ত্ব, না জানেন চিত্ত-বিজ্ঞান। কি সঙ্গীত কি চিত্র কলা, কি আইন, কি তর্ক-প্রণালী, কি ধনদৌলত, কি নগরজীবন, কি শিক্ষা-প্রণালী,

কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি চিত্ত-বিজ্ঞান, এই সকল বিষয়ের ইয়োরোপীয় ধারা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই অনভিজ্ঞ। কথাটা ভারতবাসীর মরমে প্রবেশ করিবে কি?

ইংরেজ গাড়োয়ানরা শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায় কথা বলিতে পারে,—হাসিঠাট্টা ও করিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরেজ মাত্রকেই শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে ওস্তাদ বিবেচনা করা চলিবে কি? হিন্দু মাত্রেই "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত" আর "সঙ্গীত-রত্নাকর" ইত্যাদি গ্রন্থের "বোদ্ধা" বিবেচিত হইতেন কি? সেইরূপ জার্ম্মাণ য়োলি, ফরাসী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, আর মার্কিণ হপ্‌কিন্স্‌ ইত্যাদি ভারত-তত্ত্বের ব্যাপারীরা ইয়োরামেরিকায় জন্মিয়াছেন বলিয়া ইঁহারা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম, গ্রীক দর্শন, রোমাণ আইন, রেণেসাঁস যুগের স্থাপত্য, বুর্বোঁ রাষ্ট্রনীতি, সমাজে পাশ্চাত্য নারীর ঠাঁই আর ইয়োরোপীয় কিষাণদের আর্থিক অবস্থা সবই বুঝেন এইরূপ বিশ্বাস করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

অর্থাৎ পশ্চিমা "ইণ্ডোলোজিষ্টরা" আজ পর্য্যন্ত ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই "আলোচ্য বিষয়টার বিজ্ঞানের" কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিতে হইবে। সংস্কৃত, ফার্শী ইঁহারা যতই জানুন না কেন প্রত্যেক মিঞাকেই "বাজাইয়া" দেখা আবশ্যক।

(২)

এই গেল বিদেশী ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের কথা। ভারতীয় ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের অবস্থা কিরূপ? কেবল ভারত-তত্ত্বজ্ঞ কেন, আমাদের যে-কোনো লাইনের চরম পণ্ডিতেরাও ইয়োরোপীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আদর্শ এবং চিন্তাপ্রণালীর বিকাশধারা সম্বন্ধে প্রায় পুরাপুরি অজ্ঞ। কথাটা শুনাইতেছে খুবই কড়া। কিন্তু ভারতবাসী বুকে হাত দিয়া বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভারতীয় পাণ্ডিত্য তলাইয়া মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। দেখা যাইবে,—কেন এই কথাটা ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ না করিয়া খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম না।

ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কেতাব মুখস্থ করিয়াছেন আমাদের অনেকেই। একথা অজানা নাই কাহারও। কিন্তু চাই "স্বাধীন"ভাবে "ভারতীয় স্বার্থে" ইয়োরামেরিকার ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ক্ষমতা। পশ্চিমারা যেমন "ভারত-তত্ত্ব", "প্রাচ্য-তত্ত্ব" ইত্যাদি বিদ্যা কায়েম করিয়া নিজেদের জ্ঞান-মণ্ডল বাড়াইয়া তুলিতেছে ভারত-সন্তান সেইরূপ ইয়োরামে-রিকা-তত্ত্ব বা পাশ্চাত্য-তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে কি? সেই ক্ষমতা সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতে ব্যবস্থা কোথায়?

(৩)

এই অজ্ঞতা যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতবাসী ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা সাধন করিতে ভয় পাইবে। "বাপ্‌রে! গ্রীস?" "বাপ্‌রে! রোম?" এইরূপ থাকিবে ততদিন ভারতীয় পণ্ডিতদের চিন্তা-প্রণালীর ঢঙ্।

আর ততদিন ভারতবাসী ভারতীয় সভ্যতাকে "আধ্যাত্মিক" হিসাবে ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা হইতে উচ্চতর ভাবিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গোঁফে চাঁড়া মারিতে লজ্জাবোধ করিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কাপুরুষতা : রণে ভঙ্গ দেওয়ার নামান্তর মাত্র ছাড়া ইহা আর কিছু নয়।

কিন্তু কাপুরুষতা দেখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। গ্রীক সাহিত্য, ল্যাটিন সাহিত্য এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান সাহিত্য,—মূলেই হউক বা অনুবাদেই হউক,—যুবক ভারতে আলোচিত হইতে থাকুক। রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে সেকালের হিন্দু নরনারীর সু-কু সম্বন্ধে, মায়—তথাকথিত "জাতিভেদ" সম্বন্ধেও একালের ভারতসন্তানকে লজ্জিত হইতে হইবে না।

যুবক এশিয়ার দায়িত্ব

দুনিয়ায় আঁধারই বেশী। ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু "জ্যোতি", "সৎ" ও "অমৃত" আনিবার জন্য লড়াই জগতে দেখা গিয়াছে তাহাতে ইয়োরোপীয়ান "রাষ্ট্র-যোগের দান নিন্দা করিতে বসা মুখখুমি। আবার সেই লড়াইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র-সাধনার ন্যায্য ইজ্জৎ দাবী করিতে না পারাও মুখ্‌খুমি মাত্র নয় গোলামি।

প্রাচ্য সংসারে ইয়োরোপীয়ান সংসার অপেক্ষা বেশী অন্ধকার বিরাজ করিত না। একথা স্বীকার করা পশ্চিমাদের স্বার্থ নয়। বিজ্ঞানের তর্ক-শাস্ত্রকে একমাত্র সহায় লইয়া যুবক এশিয়াকে এই পথে বহুকাল একাকী বিচরণ করিতে হইবে।

দুজন একজন করিয়া পশ্চিমা পণ্ডিত ও হয়ত ক্রমশঃ এই পথের দিকে ঝুকিতে থাকিবেন। তাহার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। গড়ন-বিজ্ঞানের বিচারে হিন্দুনরনারীকে এক-ঘরে করিয়া রাখা আর বেশী দিন সম্ভব-পর হইবে না।

তবে কুসংস্কারের মাত্রা বিজয়-গর্ব্বে অঙ্কীকৃত পশ্চিমা বিজ্ঞান-মহলে এখনো অতি গভীর। "এসব দৈত্য নহে তেমন!" "লেগেসি অব্‌ গ্রীস্‌" অর্থাৎ "সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক জাতির দান" নামক সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ-সঙ্কলন-গ্রন্থের সুর দেখিলে পণ্ডিত মহাশয়দের বাড়াবাড়ি বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য "শহ্বিনিজ্‌ম্‌" বা হাম্‌-বড়ামি এই কেতাবের আবহাওয়ায় চরম-ভাবে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই হাম্‌-বড়ামির একটা একটা করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যুবক এশিয়ার অন্যতম দায়িত্ব।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তর্ক-শাস্ত্র

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান কথা হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন। এই জন্য রাষ্ট্রীয় লেনদেন বিষয়ক তথ্য-গুলার দাম বাহির করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে; জীবনের গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে এই

সকল তথ্যের সম্বন্ধ কিরূপ ? এই প্রশ্নই তথ্যের দর কষাকষি সমস্যার অর্থাৎ "ব্যাখ্যা"-সমস্যার আসল প্রশ্ন।

এই খানেই তর্ক-প্রণালী বা আলোচনা-প্রণালী লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে হইয়াছে। ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস, শাসন-বিষয়ক ধারা, আইনের বিধান সবই আসিয়া জুটিয়াছে। নৃতত্ত্বের ছাপ, চিত্ত বিজ্ঞানের প্রভাব আর দুনিয়ার আব্‌হাওয়া এই সকল সূত্রে হাজির হইতে বাধ্য।

তুলনা মূলক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপকরণ কিছু কিছু সঞ্চিত করা গিয়াছে। এমন কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিদ্যার ভূমিকা স্বরূপই এই কেতাবের বিভিন্ন অধ্যায় গৃহীত হইতে পারে। রাষ্ট্র বস্তুটা কি, রাষ্ট্র শাসন কাহাকে বলে, এই সকল কথা দফায় দফায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া বিশ্লেষণ করিবার দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে।

(২)

আর এক তরফ হইতে ও এই গ্রন্থকে আলোচনা প্রণালী বা তর্ক শাস্ত্রের সামিল করা সম্ভব। তথ্য গুলার "ব্যাখ্যা" লইয়াই যে একমাত্র গোল বাঁধে তাহা নয়। তথ্য গুলার "সত্যাসত্যতা" লইয়াই প্রথম বিপদ।

কোন্ তথ্যটাকে হিন্দু রাষ্ট্রের "বাস্তব" তথ্য বিবেচনা করা যাইবে ? এই প্রশ্নই "সত্যাসত্যতা"—সমস্যার প্রাণ।

এই সূত্রে সকল প্রকার সাক্ষীর জমানবন্দি প্রতি পদবিক্ষেপে সমালোচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য হইয়াছি। ভারতীয় রাষ্ট্র শাসন সম্বন্ধে সত্য উদ্ধার করা বড় সোজা কথা নয়। যে সকল সাক্ষ্য এতদিন মহাপূজ্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছে তাহাদের কিস্মৎ সম্বন্ধেও সতর্ক হইবার কারণ দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

"লিপি"-সাহিত্য, মুদ্রা এবং বিদেশী ভারত-বৃত্তান্ত এই তিন শ্রেণীর সাক্ষ্য ছাড়া আর কোনো প্রমাণ লওয়া হয় নাই। তৃতীয়টার অর্থাৎ বিদেশী সাহিত্যের নজির তোলা হইয়াছে বটে,—কিন্তু অনেক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া।

ধর্ম্ম সূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, এবং রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি সকল সাহিত্যই বর্জ্জিত হইয়াছে। এমন কি কৌটিল্যের "অর্থ শাস্ত্র"কেও যথাসম্ভব বাদ দেওয়া গিয়াছে। যেখানে যেখানে এই সকল সাহিত্যের সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেখানে সেখানে গ্রন্থের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে।

(৩)

কি "ব্যাখ্যা"র তরফ হইতে কি "সত্য উদ্ধারের" তরফ হইতে দুই দিক হইতেই অসংখ্য সন্দেহ এবং কূট প্রশ্ন তুলিয়াছি। এই সংশয় গুলার কিনারা করা হয়ত বহু ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় নাই। সংশয়গুলা বাজারে হাজির করাই বর্ত্তমান রচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাজেই এখানে ওখানে "ধান ভানতে শিবের গীত" অনেক শুনা যাইবে। সেগুলা বাজে কথা নয়। এই সংশয় গুলাই যুবক ভারতের বিজ্ঞান সেবাকে নবযৌবনে ভরিয়া তুলিবে।

যাঁহারা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান অথবা ভারতীয় ইতিহাস ইত্যাদির ধার ধারেন না তাঁহারাও তর্ক-শাস্ত্রের হিসাবে গ্রন্থটার ভিতর কিছু কিছু সরঞ্জাম পাইবেন। সমাজ-তত্ত্বের "লজিক" বা যুক্তি-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যেন হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন-বিষয়ক তথ্য সমূহ লইয়া খেলা করা হইয়াছে স্থানে স্থানে এইরূপ বোধ হইবে।

"দলা মেতোদ দাঁ লে "সিয়াঁস্" অর্থাৎ "বিজ্ঞানের আলোচনা প্রণালী" নামক ফরাসী গ্রন্থ কিছু কিছু মনে পড়িবে।

গোটা বই পড়িবার সময় যাঁহাদের নাই তাঁহারা সরকারী আয় ব্যয়, পল্লী-শাসন, দুনিয়ায় গণ-তন্ত্র এবং জনগণের সমাজ-কেন্দ্র এই চার পরিচ্ছেদ ঘাঁটিয়া দেখিতে পারেন। গ্রন্থকারের আলোচনা-প্রণালী এবং সিদ্ধান্তের নমুনা মোটামুটি পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্ট গুলা একত্রে দেখিলেও খানিকটা চলিতে পারে।

কেতাবের আত্ম-কাহিনী

কোনো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই বিভিন্ন "প্রদেশ" হইতে সকল প্রকার প্রমাণ হাজির করিতে চেষ্টা করি নাই। ভিন্ন ভিন্ন "যুগের" প্রমাণ ও কোনো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই দেওয়া হয় নাই। যে প্রদেশে অথবা যে যুগে প্রতিষ্ঠানটাকে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে পাকড়াও করিতে পারিয়াছি একমাত্র সেই প্রদেশ বা সেই যুগের সাক্ষ্যই লওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশ এবং প্রত্যেক যুগ হইতে রগ্ড়াইয়া রগ্ড়াইয়া তথ্য বাহির করিতে প্রয়াসী হইলে প্রত্যেক অধ্যায় লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের আকারের স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। কোনো কোনো পরিচ্ছেদ লইয়া ও স্বতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সেই প্রয়াস করা কর্ত্তব্যও বটে।

মোটের উপর হাজার দুই পৃষ্ঠা লিখিবার মতন মালমশলা আছে। তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের মতলব তাহা নয়। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ ছয় জন লেখক তিন তিন বৎসর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে একত্রে খাটিলে বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থমালা দেখা দিতে পারে।

এই কেতাবকে বহরে যথা সম্ভব ক্ষুদ্র করা হইয়াছে আর এক উপায়ে। "লিপি"-সাহিত্য অথবা অন্য কোনো প্রমাণ ভাণ্ডার হইতে লম্বা লম্বা বিবরণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। এই সকল সুবিস্তৃত বিবরণের ভিতর সাধারণতঃ হয়ত বা কেবল্ মাত্র একটা বিশেষণে বা একটা ক্রিয়া পদে আসল কাজের কথা থাকে। বর্ত্তমান রচনায় সেই বিশেষণটা অথবা ক্রিয়া পদটা মাত্র,—তাহাও আবার অনেক স্থলেই মূলের আকার নয়,—খাঁটি বিংশ শতাব্দীর ঘাট মাঠের বাংলায়—আনিয়া খাড়া করিয়াছি।

লম্বা লম্বা মৌলিক বৃত্তান্ত এবং তাহার দশ গজি চওড়া তর্জ্জমা প্রত্নতত্ত্বের গ্রন্থে বিশেষ মূল্যবান্। কিন্তু জীবন-তত্ত্বের ব্যাপারীর পক্ষে "ভিতর কার কথাটা" টানিয়া বাহির করাই বিজ্ঞান-চর্চ্চার একমাত্র লক্ষ্য। প্রত্নতত্ত্বের হাবি জাবি জবরজঙ্ ল্যাবরেটারিতে বা কর্ম্মশালায় রাখিয়া বঙ্গমঞ্চে দেখাইতেছি কেবল মাত্র হিন্দু নর-নারীর রাষ্ট্রীয় রক্ত-তরঙ্গ।

গ্রন্থ-পঞ্জী

দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা সবই বোধ হয় পড়িয়া দেখিয়াছি। তাঁহাদের আলোচনা প্রণালীর সঙ্গে অথবা সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক প্রায় প্রত্যেককেই বোধ হয় অগ্রজ হিসাবে ইজ্জৎও দিতে ক্রটি করি নাই। ইহাদিগকে "ফুটনোটের"র পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া না রাখিয়া কেতাবের মালের সঙ্গেই ইঁহাদের নাম গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিশেষতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হইতেছে বলিয়া গ্রন্থকারের একটা নতুন রকমের দায়িত্বও আছে। "বাংলা সাহিত্যে"র সঙ্গে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতগণের "আবিষ্কৃত" ভারত-তত্ত্বের পরিচয় এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

কোল্‌ব্রুক, মেইন, জিবুলাঁ, সেনার, ফয়, হিল্লেব্রাণ্ট্, ষ্টাইন ইত্যাদি বিদেশী ইণ্ডোলজিষ্টদের নাম বাঙালী বাংলা ভাষার সাহায্যে জানিতে পারে না। এমন কি রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি ভারতীয় সুধীর রচনাও বঙ্গ-সাহিত্যে অজ্ঞাত। একমাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার অন্যতম ইংরেজি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক "প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি" নামে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে (১৯২৩)।

বাঙালী পাঠকগণের সঙ্গে এই সকল এবং অন্যান্য লেখকের রচনার সংযোগ স্থাপন করা অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছি।

(২)

তাহা ছাড়া, গ্রীস, রোম, এবং ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, আইন, রাজস্ব-বিজ্ঞান, পল্লী-স্বরাজ, রণ-নীতি, নগর-জীবন, ভূমি বিধান ইত্যাদি বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে সকল রচনা আছে সে সব ত বাঙালীর সাহিত্যে একদম অজানা। কতকগুলা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম "এক কথায় পরিচয়ে"র সহিত কেতাবের ভিতর যথাস্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্মেমান, রামজে, আর্ণল্ড্, জেমস্, হ্বাল্‌শ্ ব্রিসো, জোসেফ্-বার্থেলেমি, লেরোআ-ব্যোলিয়ো; গুড্‌নো, হ্বিয়োবি, গম, হ্বিনোগ্রাদফ্, হেপ্‌কে, গের্ডেস, হাইল, লোহ্বি, হোল্ডস্ হ্বার্থ ইত্যাদি নানা "অকথ্য" নামে কেতাবের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের চৌহদ্দি

বুঝিবার পক্ষে বাঙ্গালী পাঠকের সাহায্য হইবে আশা করি। বাংলা সাহিত্য যে কত দরিদ্র তাহাও প্রত্যেক সুবিবেচকেরই সহজে মালুম হইবার কথা।

বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনায় যে সকল বিদেশ-বিষয়ক গ্রন্থ কাজে লাগে তাহার কয়েকটা ইতিমধ্যে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। নিম্নে এই গুলার নাম প্রদত্ত হইল :—

১। গীজো—প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" (ফরাসী গ্রন্থ)

—অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

২। এঙ্গেল্‌স্—প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (জার্ম্মাণ গ্রন্থ)

—অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

৩। লাফার্গ—প্রণীত "ধনদৌলতের রূপান্তর" (ফরাসী গ্রন্থ)

—অনুবাদক ঐ

গ্রন্থ তিনটাই যন্ত্রস্থ।

যুবক ভারতের ইজ্জৎ রক্ষা

এই পৌনে এগার বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে বুঝা পড়া চলিতেছে অতি সজাগ ভাবে। পর্য্যটনের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ প্রকার তথ্য সঙ্কলন, তথ্যের ব্যাখ্যা, জীবন-সমালোচনা, আর দার্শনিক তর্ক-প্রশ্ন জুটিয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ।

তাহার ভিতর সিদ্ধান্ত ও সমন্বয় বেশী আছে কি সংগ্রাম ও সংশয় বেশী আছে বলা কঠিন। তবে সর্ব্বত্রই ঝড় বহিয়া যাইতেছে।

প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা বাংলায় এবং তিন হাজার পৃষ্ঠা ইংরেজীতে এই সকল দুনিয়া-জোড়া অভিজ্ঞতা মূর্ত্তি পাইয়াছে। তাহার চাপ—ঝড় তুফানের ঝাপ্‌টা সমেত,—বর্ত্তমান গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরকেও বোধ হয় কিছু কিছু সহিতে হইল।

এক ঢিলে অনেক পাখী মারিতে চেষ্টা করিয়াছি। রচনার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বহু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

আগামী দশ বৎসরের ভিতর এই কেতাবের "হুঁকো-নল্‌চে দুইই বদলানো" আবশ্যক হইলে যুবক ভারতের ইজ্জৎ রক্ষা পাইবে। এই বুঝিয়া বাঙলার বিজ্ঞান-সেবীরা এবং বিদ্যা-"সংরক্ষকে"রা ভাবুকতার বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

তন্ত্রোক্ত দেব দেবী চিত্র

প্রবন্ধের নামে পাঠক পাঠিকার মনে যে একটা গভীর বিষয়ের গুরুত্ব বা গবেষণার কল্পনা প্রথমেই উদয় হইতে পারে, সেরূপ ইহার মধ্যে কিছু নাই। এক খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির কথা অবগত হইয়া উহা সংগ্রহ করি।* ইহা একখানি সংস্কৃত পুঁথি,—তন্ত্র। বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, তাহার উপর সচিত্র। এই কারণেই উহা দেখিবার কৌতূহল হয় নচেৎ আমি তন্ত্রের কিছু বুঝি না।

শ্রীশ্রীপারিজাত সরস্বতী

এই পুঁথি কবে এবং কাহার দ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্ত পুঁথি খানির মধ্যে কোন স্থানে খুঁজিয়া পাই নাই, উহার লেখার কোন সময় ঠিক জানিতে না পারিলেও, উহার অধিকারীর নিকট হইতে জানিয়া যতদূর বুঝিলাম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের দ্বারা অন্ততঃ একশত পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে। পুঁথির অবস্থা দেখিয়া উহার প্রাচীনতার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয় না।

* শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুঁথি খানি দেখিতে ও ছবিগুলির ফটো লইতে দিয়াছেন সে জন্ম তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। —লেখক।

শ্রীশ্রীঅর্দ্ধনারীশ্বর শিব

শ্রীশ্রীজয়দুর্গা

পুঁথির লেখা ও বিষয়ের কোন বৈচিত্র্য বা পারিপাট্য লক্ষ্য হইবার পূর্ব্বে, উহার মধ্যে ধ্যান-বর্ণিত দেব-দেবীর বহুবর্ণে অঙ্কিত বহুসংখ্যক চিত্র প্রথমেই নয়ন আকৃষ্ট করে। উহার মধ্যে বহুপ্রকার মন্ত্রের ও অন্যান্য অতি সুন্দর সোনালী ও রক্ত বর্ণে অঙ্কিত চিত্রসকল সন্নিবেশিত

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গা
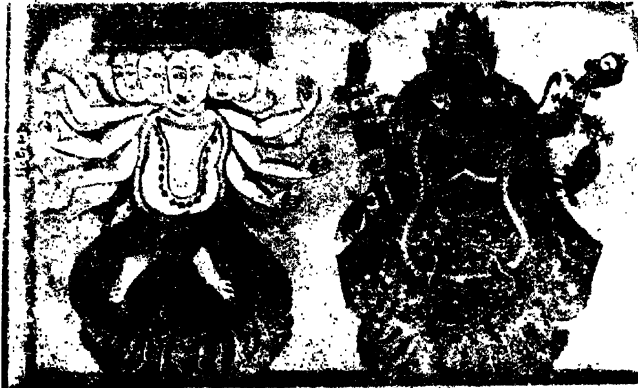
শ্রীশ্রীবনদুর্গা

থাকিলেও, অজ্ঞতাবশতঃ সে সব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অঙ্কিত ধ্যানোক্ত দেব-দেবীর রঙ্গিন ছবিগুলি আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। পুঁথির কাগজগুলি কোথাও কোথাও বিশেষ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নচেৎ লেখাগুলি এখনও বেশ উজ্জ্বল রহিয়াছে।

ইহাতে সর্ব্বসমেত প্রায় একশত চিত্র আছে। সকল গুলিই বহু বর্ণে রঞ্জিত এবং অনেক

শ্রীশ্রীহেরম্ব গণেশ

শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়

গুলিই এখনও বেশ সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। উহার কোন কোন খানির স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর

রং উঠিয়া যাইলেও, লিখিত বর্ণনার সহিত ছবিগুলির বর্ণ সমাবেশ মিল করিয়া দেখিয়া পুরাতন দিনের বাঙ্গলার এই শ্রেণীর চিত্রকলার নিদর্শনগুলি একটা লোভের সামগ্রী বলিয়া মনে হওয়ায়, উহা রক্ষাকল্পে উহার মধ্য হইতে কতক গুলির ফটো গ্রহণ করিয়া এই সহিত দিলাম।

একবার বৃন্দাবনে একখানি অতি সুন্দর সুচারু চিত্রসম্বলিত পুঁথি নয়ন গোচর হইয়াছিল, কিন্তু উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আলোচ্য পুঁথি খানিতে যে সব চিত্র

শ্রীশ্রীশক্তি গণেশ

আছে, ইহা এক শ্রেণীর খাঁটি বাঙ্গলা ছবির নিদর্শন এই হিসাবে মূল্যবান এবং পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা এরূপ চিত্রশোভিত হস্তলিখিত পুঁথির কথা জানেন না বা দেখেন নাই, তাঁহাদের কাছে হয়ত ইহা কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে।

এই স্থানে একটী কথা স্মরণ রাখিতে বলি যে, আলোক চিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মে ছবির লাল, সবুজ হরিদ্রা প্রভৃতি বর্ণ-রঞ্জিত অংশ গুলি সমস্তই কাল হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহরিহর শেঠ

দেবত্র

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"অরুণদা, তুমিও যে মীরার দৌরাত্ম্যে বাড়ী ছাড়্‌লে? এ এক মজা মন্দ নয়! কষ্ট যা পাবার তা তো চূড়ান্ত ভোগ করছ দেখছি, কোথায় লাগে আমার পাথর ভাঙ্গা? মীরাটা তো আধমরা হ'য়ে গিয়েছে। তবে এই দুঃখ কষ্ট সইবার অভ্যাস এই একটা মস্ত লাভ তোমাদের হ'য়ে গেল,—সান্ত্বনার এই টুকুই এর মধ্যে, না?"

অরুণ সনতের সেই শীর্ণোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "ভাই, আমার আর করুণার জীবন তো এর চেয়েও শতগুণ মন্দ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বার কথা। যে দেবতা তাকে অসঙ্গত উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি যে আবার তাদের স্বভাবে কতকটাও ফেলে দিয়েছেন এর জন্য তাঁকে প্রণাম করাইতো উচিত! কিন্তু পারতো মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ইলা দেবীর কাছে সেদিন যা শুনলাম—"

"তাকে ফিরাবো কিজন্য? লেখা পড়া করছে করুক না। কষ্ট হচ্চে বটে কিন্তু এই রকম স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে মীরাও যদি ইলার মত পড়তে চায় পড়ুক, কিন্তু করুণাকে নিয়েই যে মুস্কিলে পড়লাম। কাকিমা বলে দিলেন, তিনি গ্রামে প্রচার করেছেন করুণার বিয়ে হ'য়ে গেছে! তাঁকে সকলের কাছে মিথ্যাবাদী না হ'তে হয়। প্রমথতো রাজী ছিল আগে, কিন্তু এখন গিয়ে তাকে সেকথা বলতেই সে কি যে মাথামুণ্ড বক্‌তে লাগল! তার মা বোনরাও সেই কথা ব'লে সঙ্গে আস্‌তে চান্। মীরি পোড়ামুখি এই সব কাণ্ড ক'রে এসেছে দেখছি! করুণা তো সহজে আমার সামনেই এলোনা, কাছে গেলাম তো মুখ ঢেকে কাঁদতেই রইলো শুধু; কোন রকমে এনে তাকে মীরার কাছে ফেলেছি। কি করব একটা পরামর্শ দাও।"

"ভাই সনৎ, তাকে নিয়ে গেলে তোমরা যে বিব্রত হবে তা বুঝতেই পারছি। সে যেমন ছিল তেমনি তাকে রাখ্‌লে না কেন প্রমথর বাড়ী? প্রমথর মা বোন্ তাকে যেমন ভালবাসেন দেখেছি, তাতে—"

"কি বল্‌ছ অরুণদা? তুমি কি ভুলে যাচ্চ করুণা আমার ঠাকুরদাদার অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারিণী? সে তাঁর 'দেবত্র' সার্থক করে তুল্‌বে; তাকে আমি পরের বাড়ী ফেলে রাখ্‌ব? আর তুমি অরুণদা! তুমিও যে এমনি ক'রে ভিক্ষা ক'রে মুটের মত খেটে—"

"সনৎ, সনৎ, যদি সত্যই 'দাদা' ব'লে মনে কর এই একটা প্রার্থনা আমার রাখ—আমাদের এই পরম ও চরম দুর্ভাগ্যের কথা আর আমার সামনে উচ্চারণ ক'রনা।"

সনৎ অরুণের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল সেই আরক্ত সুন্দর মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ

হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুটি নিষ্প্রভ, দৃষ্টি মাটির দিকে। সনৎ আবেগভরে কহিল, "কেন দাদা, তুমি এতে এত দুঃখিত হ'য়েছ? ঠাকুরদাদা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, আমার দ্বারা তাঁর 'দেবত্র' চলবেনা। তুমিই তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তুমি তাঁর ইচ্ছাকে অবহেলা করে পাপ কর্‌ছ অরুণ দাদা! একা মার ওপর সব ফেলে রেখেছ। আর করুণার যে অবস্থা আমি করেছি এতে তারও একটা উপায়ের তো দরকার। যে জন্যে আমি করুণাকে তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে পালাই সে বিষয়েও যে আমি সফল হবনা তা ঠাকুরদা যেন দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। মীরা তার দাদার কৃতকার্য্যেরই প্রায়শ্চিত্ত করছে। আমার জন্যেই সে এমন বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু তবু এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি, করুণাকে তার প্রাপ্য দেওয়ার জন্য সে কখনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বোন্‌টি আমার নীচ নয়।"

বাধা দিয়া অন্তর্গূঢ় বাষ্প-সমাচ্ছন্ন-কণ্ঠে অরুণ বলিল, "সনৎ, দেবতার সন্তান তোমরাও যে তাই তা কি আমায়ও ব'লে তুমি বোঝাবে? আমি কি তোমাদের ক্ষুদ্রতার আশঙ্কা করি সনৎ? তা নয়। কেবল তোমাদের অবস্থার খানিক অংশ নিতে চাই মাত্র। তেমরা যা কর্‌ছ আমিও তাই করি, এতে বই একটু শান্তি পাই। জেঠিমার কোলে তোমরা নেই, সে কোলে আমি সুখে থাক্‌তে পারিনা—পারিনা ভাই! তোমরা—"

"আমি যে জন্যে খেটেছি জানতো দাদা, আশীর্ব্বাদ কর দেশের জন্য দশের জন্য আবার যদি দরকার হয়—"

"হ্যাঁ ভাই, সর্ব্বান্তঃকরণে কর্‌ছি" বলিয়া অরুণ সনৎকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সনৎ তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর আমার বোন্‌টীও ছোট থেকে এই রকমই আদুরে, ঝোঁক ধরা! ও নাকি বলে 'দাদুর দান করা জিনিষে আমরা ভাগীদার হতে যাব—আমরা কি এতই ছোট লোক!' কাকিমার মুখে শুনলাম আমরা ভাই বোনে খেটে খাব এই তার প্রতিজ্ঞা, যাক্ এ সব কথা পরে হবে, এখন করুণার কি করা যায় একটু বুদ্ধি দাও অরুণ দাদা।"

অরুণ স্তব্ধভাবে সনতের কথাগুলি শুনিল। ক্ষণপরে তাহার সেই বিবর্ণ পাংশুমুখ তুলিয়া সনতের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "তোমার মনে আছে সনৎ, তুমি ন'কড়ি ভট্টাচার্য্যের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধে আমায় সম্মতি দিতে দেখে তিরস্কার করেছিল? যদিও জেঠিমা সেকথা আমাকে একবারও বলেননি, কিন্তু বল্‌তেন যদি নিশ্চয়ই আমি সম্মতি দিতাম। কি তুচ্ছ করুণার জীবন—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ আমার জীবন যাতে আমাদের জন্য তোমাদের সংসারে অশান্তি আসে? কিন্তু হতভাগ্যদের ভাগ্যদোষে তাই-ই এসেছে। তোমায় বিচলিত করবার জন্যই তোমার মা সেই নকড়ি ভট্টাচার্য্যের ছেলের কথা বলেন, আর তারই ফলে তুমি করুণাকে নিয়ে চলে এলে, যাতে দাদামশায় এই ব্যবস্থা কর্‌লেন। মীরা আর তাঁর মা কি অসঙ্গত অপমানকর প্রস্তাবে দুঃখিত হয়ে বাড়ী হ'তে চ'লে আসেন তাও আমি জানি। তারই ফলে করুণার ও আমার

এই চরম অবস্থা, যাতে তোমাদেরও পথের ভিখারী দেখ্‌তে হল। যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আমার একটা কথা রাখ, করুণার জন্য আর ব্যস্ত হয়োনা। তাকে আমার কাছে দিয়ে তোমরা দুই ভাই বোনে মায়েদের কোলে কিছুদিন অন্ততঃ থাকগে। সেই কটিদিনও আমি কল্পনায়ও অন্ততঃ— ”

“অরুণদা, ভুলে যাচ্ছ কি তুমি না গেলে, করুকে না পেলে, মা আমাদেরও কোলে নিতে পার্‌বেন না?”

“সে পথ যে দাদামশায় একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন ভাই,—এছাড়া আর উপায় নেই যে।”

পাশের ঘরের দরজা একটা খুলিয়া যাইতেই উভয়ের দৃষ্টির সহিত মীরার দৃষ্টির বিনিময় হইল। সে ঘরের মধ্যে আরও কেহ যেন ছিল, মীরা দ্বার খুলিতেই সে সরিয়া গেল। মীরা সনৎ ও অরুণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া সনতের পানে চাহিয়া বলিল, “আমাদের পরামর্শ তোমাকে বল্‌তে এসে তোমাদের পরামর্শও শুনে ফেলেছি দাদা। অরুণ বাবু তোমায় যে কথা বল্‌ছেন আমি তোমার হ'য়ে উত্তর দিচ্চি। করুণাদি'কে নিয়ে যাবার তাঁর কোন অধিকার নেই। তার যা ব্যবস্থা কর্‌বার আমরাই তখনো করেছি, এখনো কর্‌ব। তখনো যখন তিনি কথা কর্‌নি, এখনো কইতে পাবেন না।”

সনৎ হাসিয়া উঠিয়া অরুণের পানে চাহিয়া কহিল, “শুন্‌ছ দাদা ওর জুলুম! এর সঙ্গে কি কেউ পার্‌বে?”

অরুণ নিঃশব্দে রহিল দেখিয়া সনৎই মীরার কথার উত্তর দিল, “তুমিই কি ব্যবস্থা কর্‌লে শুনি?”

“সে এখন শুন্‌তে পাবেনা, বাড়ী গিয়ে ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। কালই বাড়ী যাবার ব্যবস্থা কর।”

“সেইতো মুস্কিল বাধ্‌ছেরে, করুর তো বিয়ে দিতে পারিনি—কাকিমা যে বলেছেন—”

“কাকিমাকে তোমার মিথ্যাবাদী হ'তে হবেনা, যত যা মিথ্যার ভার সব আমার ওপর রইলো।”

“শুনি তবু—কি কি ভার তুমি নিলে?”

“বল্লাম তো এখন কেউই শুনতে পাবে না।”

“কে এ ব্যবস্থা কর্‌লেন? তুমি আর করুণাই কি? ইলা আসেন নি? তাঁকে—”

“আমি এর মধ্যে নেই জান্‌বেন। সেবারেও যেমন আপনি আর মীরা—এবারেও তাই।”

ইলা ঘরের মধ্য হইতে দ্বারের নিকটে আসিল। “হাঁ, একমাত্র মীরা, আর তা সমর্থন করেছে সেই করুণাই!”

মীরা ইলার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই উত্তর দিল,—“এবং সেই তর্কই এতক্ষণ ইলাদিদির সঙ্গে তার চল্‌ছিলো।”

সনৎ তাঁহাকে দেখিয়া সহর্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনিও এসেছেন? আপনারি সঙ্গেও এখন যে দেখা হবে তা মনে করতে পারিনি। আপনি——"

ইলা ক্ষীণ হাস্যে বলিল, "আমায় 'আপনি' বলতে শিখে গেলেন যে এই দু বছরে?"

"দু বছর কি কম সময়? আপনার বাবাকেও অরুণদার সঙ্গে সেবারে দেখেছি, আপনার কথাও অরুণদার মুখে শুনেছিলাম। আপনার দৃষ্টান্তে আমাদের মীরাটীও খুব সাহস পেয়েছে দেখ্‌ছি।"

"মীরার সাহস আমার চতুর্গুণ বেশী! আমি যা পারিনি সে অম্লানবদনে তাই পারছে! যাক্ এক বছরের কথা ছিল, আর এক বছর নিজগুণে বাড়িয়ে ফেলেছিলেম! মীরাকে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ, মাকে কাকিমাকে ব'লে এসেছি সবাই গিয়ে একসঙ্গে 'নবান্ন' করব! আমাদের সংসারের সঙ্গে আপনি অকারণে অনেকটা জড়িয়েছিলেন ব'লে ঐ কথাটা যখন তাঁদের বলি—অজ্ঞাতে মনে আপনার নামটাও এসেছিল। আমাদের এদিনে আপনিও কি গিয়ে একটু আনন্দ করবেন না?"

মীরা সহসা বলিয়া উঠিল, "আঃ দাদা কানে বড় লাগ্‌ছে কিন্তু তোমাদের এই 'আপনি' 'আজ্ঞা' কথাগুলো।" সনৎ মৃদু হাসিল। ইলা মুখ নত করিয়া বলিল "এবারটা মাপ্‌ করবেন। আমি আর আপনাদের আপন কই? তাহ'লে কি 'আপনি' 'আজ্ঞা' করতেন!"

"এই জন্য? তাহ'লে বল এখনি এর সংশোধন করছি।"

"এবারটা আপনারাই যান, আমি এর পরে যাব। আপনি তো ছিলেনই না, মীরাও এবার যায়নি, কিন্তু আমি গরমের ছুটি পূজার ছুটি পিসিমাদের কাছেই প্রায় এখন কাটাই যে।"

"তা শুনেছি, আর সেই জন্যই তো আশ্চর্য্য হচ্চি যে যখন আমার মা কাকিমাকে অন্য কেউ দেখেনি সে সময়ে একমাত্র যিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছেন—সাহায্য করেছেন—এখন এই আনন্দের দিনে তিনিই তাঁদের একবার দেখবেন না?"

"আনন্দের দিন আসুক সেদিন নিশ্চয়ই যাব।"

"আজও বুঝি সেদিন আসেনি তোমার মতে?"

"না"!

অরুণ এতক্ষণ নিঃশব্দেই ছিল এইবার ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বলিল, "সনৎ, করুণাকে ইলাদেবীর কাছে রেখে যেতে হবে তোমায়। তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার নেই এখন। আমি চেষ্টা দেখি যদি তাকে পাত্রস্থ করতে পারি, তারপরে নিয়ে জেঠিমার কোলে দিও।"

"কেন বলুন দেখি?"

সনৎকে বাক্যব্যয় করিতে না দিয়া মীরা উগ্রস্বরে অরুণের কথার উত্তর দিল। তার

পরে তাহার দিকে তীব্র চক্ষে চাহিয়া বলিল, "সে যদি বিয়ে না করে? আপনার কি জোর আছে? কিসের জন্যে আপনি তাকে এমন ক'রে রাখ্‌বেন? জানুন, তার বিয়ে হ'য়ে গেছে—কপালে তার সিঁদুর দিয়ে দিলে আর তো তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে কোন ভয় নেই। এইবার আপনি আর কি আপত্তি কর্‌বেন?"

মীরা ঝড়ের মত সে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। সনৎ বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ইলার দিকে চাহিল।

ইলা নতমুখে বলিল, "আমিও এসে শুন্‌লাম করুণাকে সে এই কথাই বল্‌ছে। দেশে গিয়ে তারা বল্‌বে যে, করুণার স্বামী নিরুদ্দেশ, এই পরামর্শ ঠিক্ করেছে মীরা! এতে কেউ কিছু আর বল্‌তেও পারবে না, সেও এই খোলসের ভেতর নিরুপদ্রবে নিজের ঘরে বাস কর্‌বে।"

সনৎ সবেগে বলিয়া উঠিল, "না না, এরকম হ'তেই পারে না। তার চেয়ে অরুণদা যা বল্‌লেন তাই হোক্! করুণা তোমার কাছেই থাক্! আমরা পাত্র দেখ্‌ছি—"

ইলা নত মুখেই বলিল—"যা সম্ভব নয় সে চেষ্টা আর কর্‌বেন না, আপনাদের দুজনকেই বল্‌ছি! হয় সনৎ দা করুণাকে বিয়ে ক'রে বাড়ী নিয়ে যান্—নয়ত এই পথ! মীরা অনেক ভেবেই একথা বলেছে।"

"আমি বিয়ে কর্‌বো, তুমিও এই কথা বল্‌ছ মীরার মত? তাহ'লে ঠাকুর্দ্দাকে কেন এত কষ্ট দিলাম?—তা ছাড়া বিয়ে করা—আমি প্রমথকে বল্‌ছি, সে আমার কথা কখনো ঠেল্‌বে না।"

গমনোদ্যত সনৎকে থামাইয়া ইলা বলিল, "কি কর্‌ছেন আপনি পাগলের মত। সে যদি সম্ভব হ'ত প্রমথ বাবু তখনি সম্মত হতেন। আর তিনিও তো আপনারই মত জীবন নিয়েছেন, নিজের দায় মুক্ত হ'তে অন্যায় জোর কেন কর্‌বেন তাঁর ওপরে?"

সনৎ অরুণের পানে চাহিয়া হতাশভাবে বলিল "উপায় কি অরুণদা!"

অরুণ ব্যগ্রস্বরে ইলাকে বলিল, "আপনি একবার করুণাকে আমার কাছে এনে দেন্, সে কি কর্‌ছে তাকে আমি বুঝিয়ে বলি।"

"করুণা কিছু করছে না অরুণ বাবু, যে কর্‌ছে তাকেই আপনি বলুন।

"বলুন—কি বল্‌তে চান্?"

মীরা আসিয়া অরুণের সম্মুখে দাঁড়াইল! অরুণ উত্তর দিল "করুণাকে আমার কাছে এনে দেন একবার!"

"তাকে আপনারা পাবেন না।"

অরুণ ইলার পানে হতাশভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি উপায় করুন কিছু।"

"কাউকেই উপায় কর্‌তে হবে না, ঐ দেখুন করুণা আপনিই পালিয়ে এসেছে।" ইলা উত্তর দিল।

প্রতি পদক্ষেপে তাহার পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছিল তবুও প্রাণপণ বলে সে যেন চলিতে চায়। সেই ম্লান ছায়াখানির দিকে চাহিয়া সকলেই যেন চমকাইয়া উঠিল। মীরা ছুটিয়া গিয়া যেন তাহাকে বুক দিয়া আশ্রয় দিবার জন্য জড়াইয়া ধরিল। "আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলাম তবু কোন দিক দিয়ে পালিয়ে এলি ভাই?"

অরুণ মৃদুস্বরে বলিল, "করু, আমার কাছে এস দিদি, ছোটবেলার কথা মনে আছে কি তোমার? বাবার কথা, তোমার ভাইদের কথা, তাদের অবস্থা! যে দেবতারা তোমায়, আর তোমার দাদাকে মানুষের সমাজে স্থান দিয়ে তাঁদের স্নেহের ছায়ায় মানুষ ক'রে তুলেছেন, নিজের তুচ্ছ সুখ দুঃখের জন্য তাঁদের মধ্যে আর বিপ্লব এনো না! একেই তো যথেষ্ট হ'য়ে গেছে—আর না, এস আমি—"

মীরার বুকের মধ্য হইতে রোদনরুদ্ধস্বরে করুণা বলিল, "আমি তো যেতে চাই দাদা, মীরা যে কিছুতে যেতে দিচ্চে না আমায়! আমায় যে বন্দী ক'রে রেখেছে সে।"

"স্নেহের বাঁধনও কর্ত্তব্যের জন্য নির্ম্মম হয়ে ছিঁড়তে হয় দিদি! যিনি তোমায় অমন ক'রে ধ'রে আছেন—জান কি তাঁরা অম্লানমুখে কতবড় আত্মত্যাগ কর্‌ছেন! ঐ দেবতাদের 'দেবত্রকে' আমরা আমাদের আশাতৃষ্ণা নিয়ে ভোগ কর্‌ব? তার মালিক সাজব? ছি, তার চেয়ে মৃত্যুও কি ভাল নয়? জোর ধর! যাঁরা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বস্ব—তাঁরা কি জীবন নিয়েছেন দেখ দেখি? আর আমরা পারব না? যাদের ছোট ছোট ভাইগুলি অনাহারে মরেছে—যাদের বাপ আত্মহত্যা করে দুঃখের জ্বালা এড়িয়েছেন—তাদের ছেলে মেয়ের এত সুখতৃষ্ণা থাকতে নেই! করুণা!—চলে এস আমার কাছে।"

"আমি যে—আমি যে পার্‌ছিনা মীরার জোরে দাদা—ছাড়িয়ে নাও আমায়—"

সজোরে করুণাকে জড়াইয়া রাখিয়া মীরা মুখ তুলিয়া অরুণের পানে চাহিল,—মুখ রক্তবর্ণ অথচ আয়ত চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে,—তীব্র স্বরে বলিল "বলুন আর কত বল্‌তে চান? অমনি ক'রে আরও দু'চার কথা বল্‌লেই আমার কোলের মধ্যেই এটা মরে যাবে, সকল দিক পরিষ্কার হবে। এখনি অর্দ্ধেক শেষ হ'য়ে এল বোধ হচ্চে! ইলুদি ম'রে যায়—ধর। কিন্তু তবুও শুনুন অরুণ বাবু, কিছুতেই আমি করুণার সেই দেহটাও আপনাকে দেবনা!—তাই-ই আমি ঘাড়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে জেঠিমার কোলে ফেলে দেব। দাদুর দেবত্র দান সার্থক এই রকমেই হবে! আপনি যে রকমে কর্‌তে চাচ্চেন তার চেয়ে এই ভাল। তবু করুণার দেহটা জেঠিমার কোল পাবে। দাদা——"

মীরার বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া সনৎ চেঁচাইয়া উঠিল, "উঃ অসহ্য মীরা, আরনা! বল্ আমি কি কর্‌ব? করুণাকে বিয়ে কর্‌তে বলিস্ তো? তাই কর্‌ব—তাই হবে—চুপ্ কর তুই।"

"না—না—না—" ঠিক্ যেন অভ্যাহত কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিত হইল, আর করুণার

একেবারে হতজ্ঞান দেহভার লইয়া মীরা পড়িতে পড়িতে কোন রকমে বসিয়া পড়িল। ইলা উভয়কেই ধরিয়াছিল, তাই দুইজনে একেবারে ধরাশায়ী হইল না।

মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে করিতে ইলা বাষ্পাচ্ছন্নকণ্ঠে বলিল, "কেন যে আপনারা এত কাণ্ড কর্‌ছেন আমি তো বুঝ্‌ছিনা! মীরা যা কর্‌তে চাচ্চে তাইই বা এত অসম্ভব কিসের? করুণার বিয়ে নাই বা হ'ল! এত কাণ্ডর পর অন্যত্রে বিয়ে দিতে চাওয়াও আপনাদের অন্যায়! এই যে মীরা বিয়ে কর্‌বেনা, শুধু পড়বে বল্‌ছে, এতে কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌বেন কি? করুণাও তেমনি ভাবে কিম্বা পিসিমার কোলে আরও সুন্দরভাবে জীবন কাটাবে! বড় পিসিমাও তো অরুণবাবুকে বলেছেন, 'আমি করুণার বিয়ে আর দেব না, তাকে মাত্র আমার কোলে এনে দাও'। অরুণবাবু সনৎ দাদার জন্যই করুণার ওপর এই অন্যায় করতে যাচ্চেন। কিন্তু কি দরকার এর? ছোট ছোট বিধবা মেয়েরা যে ভাবে জীবন কাটায় কুমারীরাই তা পারবে না কেন? তাদের বিয়ে দেওয়াই জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা কেন মনে করবেন এখনো? সেই বিয়ের যত অন্যায় যত বিপদই সংসারে আসুক না কেন, তবু এ বিয়ে দিতেই হবে? কেন? করুণাকে নিয়ে মুস্কিল এই—তার বিয়ে হয়ে গেছে এই কথা রটনা করতে হয়েছে! এ না ক'রেও তাঁদের উপায় ছিলনা, কেননা সনৎদা তাকে যে ভাবে নিয়ে আসেন, আর যতদিন সে সেখানে অনুপস্থিত থাকে, এতে সমাজের কাছে একটা জবাবদিহি যাঁরা সমাজে বাস করেন তাঁদের দিতেই হবে। মীরা যা কর্‌ছে এ পরামর্শ সঙ্গতই, এটা তার জন্য ব্যবহার কর্‌তে হবে। বিধবা না সাজিয়ে সধবা সাজিয়ে রাখাই ভাল। এইটুকু মিথ্যার আড়ালে করুণার বাকি জীবনটা যদি শান্তিতে কাটে কাটুকনা। সনৎদা—অরুণবাবু—আপনারা আর আমাদের দায়ে নিজেদের জীবনকে বিব্রত কর্‌বেন না! যান আপন আপন কাজে যান্, আমরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিচ্চি। মেয়েটাকে মেরে ফেল্লেন যে সকলে মিলে!"

সনৎ যেন এতক্ষণে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের যে বাড়ী যেতে হবে! মাকে বলে এসেছি সকলে মিলে নবান্ন কর্‌ব।"

"বেশ তো, করুণা আজ একটু সুস্থ হোক্, কাল সকলেই যাবেন।"

"আপনিও—তুমিও যাবে তো?"

"বলেছি ত আমি এবারটা নয়, আপনারাই যান্ এখন?"

অরুণ ইলার পানে চাহিয়া বলিল, "সে হবেনা ইলা দেবী, করুণার জন্য এবারটাও আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। এ মিথ্যার অংশ আপনাকেও নিতে হবে। বল্লেন যে আমাদের কোন কিচ্ছু ভাব্‌তে হবে না আপনাদের জন্য, তবে কেন পাশ্ কাটাচ্ছেন?"

ইলা বিষণ্ণস্বরে উত্তর দিল, "এর জন্যই পাশ্ কাটাচ্ছি মনে করবেন না। করুণার জন্য চেষ্টা করা হচ্চে সেটা মিথ্যা বলে ওদের যখন ধারণা নয়, তখন আমিই বা কেন তাকে মিথ্যা

বল্‌ব ? বরং আপনার আর মীরার জন্যই সেখানে গিয়ে আমাদের কষ্ট পেতে হবে। মীরার মা চোখের জল ফেল্‌তে থাক্‌বেন, জেঠিমা যা হবেন তা চোখের জল ফেলার বাড়া। মীরা তা গ্রাহ্য কর্‌বেনা—কিন্তু অন্যের কি তা সম্ভব ? মীরার ওপরেই খানিকটা রাগ এসে যাবে হয় ত। আর আপনি এই যে আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রে খেয়ালে দিন কাটাচ্ছেন এতেও কষ্ট বোধ হয়। কি দরকার আপনার ন্যায়বাগীশ হ'য়ে ? নিজেদের জীবনের যে কাহিনীর আভাস আপনি দিলেন সেই জীবনের শেষ পরিণতি কি একজন অধ্যাপক মাত্র হওয়া ? কিম্বা আপনার জীবন-দেবতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে সেইরকম কাজে জীবন উৎসর্গ করা ? আর কি আপনাদের মত অবস্থায় কেউ পড়েছে না ? আপনাদের দাদামশায় তাঁর দেবত্রে কি আদেশ করে গেছেন আপনাকে ? তাঁর দেশের, তাঁর গ্রামের নানা দুরবস্থা সাধ্যমত দূর কর্‌বার জন্যই কি তাঁর আপনার ওপোর এই ভার দেওয়া নয় ? আর আপনি কিনা নিজের ব্যক্তিত্বটাই মনে রেখে তার লজ্জা, দুঃখ, আর বেদনার ভারে এত বড় কর্ত্তব্য ভুলে বসে আছেন। সনৎ দা জেলে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মীরা এখানে কষ্ট করছে, কিন্তু আপনি তো জানেন তারা কেউ অগৌরবের মধ্যে নেই। তবে কেন আপনিই সব চেয়ে বিসদৃশ কাজ কর্‌ছেন অরুণবাবু ?"

ইলার সতেজ উক্তিতে অরুণের মুখ ম্লান হইয়া উঠিতেছিল, সে একবার যেন নিজের অনিচ্ছাতেও বলিয়া ফেলিল "সনতের কথা নয়, কিন্তু——"

"কিন্তু মীরা—এই কথা তো আপনার ? লেখা পড়া শেখার জন্য সে যদি কষ্টই করে তাতেই বা আপনি নিজের কর্ত্তব্য ভুলবেন কেন ? মীরার কষ্টের কি কিছু লাঘব করতে পারছেন এতে ? যা আপনার উত্তর তা আপনি না বল্‌লেও বুঝ্‌ছি অরুণবাবু, তবু মীরার জন্য আপনার দেবত্রের কাজে অবহেলা করবার ক্ষমতা নেই। আপনি——"

"বড়মা করছেন—বড়মা যা করছেন——"

"অসম্পূর্ণ হচ্চে অনেক কাজ। একা স্ত্রীলোক তিনি, আপনি তাঁর সাহায্য করলে—ডানহাতের মত থাক্‌লে এতদিন গ্রামের কত উন্নতি করতে পার্‌তেন ভাবুন দেখি ? সনৎদাকেও বলি এও দেশেরই কাজ, কিছুদিন ঘরকে গ'ড়ে তুল্‌তে নিজের গ্রামে গিয়ে বাস করুন না কেন ? দেখুন গে তাঁদের গ্রামে কত জঙ্গল, কত পচা পুকুর, কত আবর্জ্জনার স্তূপ, কত দুঃখ, দৈন্য, অভাব রোগ শোক। কিছুদিন গিয়ে এদেরই সংস্কারে হাত লাগান্ অরুণদাদার সঙ্গে। আমি আপনাদের গ্রামে ক'বারই গিয়ে দেখেছি—"

"আমি যে খদ্দর প্রতিষ্ঠানে যাব—পি সি রায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমায় নেবেন বলেছেন ?"

"বেশ তাই যাবেন, তবু ক দিন মায়ের কোলে থাকবেন তাঁর কাজ এগিয়ে দেন গে, তবে মীরা—"

"আর সে অমন বাঁদরামি করতে পাবেনা। তার পড়ার ভালমত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"—সনৎ উত্তর দিল।

"আমার জন্য কেন ভাব দাদা-আমি তো বেশ আছি। মেজ মামীমা আমায় বেশ ভালবাসেন, আমার জন্যে মিছে কেন তোমরা এত কাণ্ড করছ?"

"থাম থাম, আর বাহাদুরি করতে হবে না, যা শরীর হয়েছে মরে যাবেন কোন দিন।"

"ইস্, নিজে তুমি ভারি মোটা হয়েছ কিনা; তবে কথার তেজ বেড়েছে বটে। আচ্ছা দাদা কি করে আমার সুখের ব্যবস্থা করবে শুনি? নিজে তো যাবে খদ্দর প্রচারিণী সমিতিতে।

"কেন, কাকারও কি কিছু টাকা নেই ব্যাঙ্কে? কাকিমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়েছিস্ শুনলাম—"

"বটে। আমার বিধবা মার সম্বল কটি ঘুচাতে তোমাকে দেব বৈকি।"

"বাঁদরি, তোর সব কথায় কথার দরকার কি? আমার এখন তোর সঙ্গে বকবার সময় নেই।

"বুঝেছি, জেঠামণির যে ক হাজার টাকা তোমার নামে ব্যাঙ্কে আছে তারই বড়াই হচ্ছে। তা দিয়ে করুণার বিয়ে দিবে, আমায় পড়াবে, তোমার ব্যাং-এর আধুলিতে আর কি কি করবে শুনি?"

"সর্ব্বাগ্রে তোর বিয়ে দেব, তবেই তুই জব্দ হবি। তোর মেজ মামীমার ভাই ক'হাজার টাকা চায় শুনছি! হাজার পাঁচেক পেলেই সে এখনি তোকে বিয়ে করে বিলাত যাবে, তার পরের জন্যও না হয় ঐ আন্দাজ টাকা ঠিক করা যাবে। মেজ মামীমাকে বলে ঠিক করে যাচ্ছি এখনি সব।"

মীরা একটুখানি স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "আমায় বুঝি পড়তে হবে না-কেমন?"

"কেন পড়্‌বি না, তুইও এমনি পড়বি।"

মীরা এইবার হাসিয়া বলিল, "এই সর্ত্ত রেখে তবে সব ঠিক করবে তো?"

"নিশ্চয়।"

"মনে থাকে যেন। চল এইবার সবাই বাড়ী যাওয়া যাক, ওবেলার গাড়ীতেই চল। অরুণ বাবু, ইলাদি, কেউ যাবে না বল্লে চল্‌বে না। আজ দাদা বাড়ী এসেছেন এবারের নবান্নে যিনি যোগ না দেবেন তাঁর সঙ্গে—তাঁকে—"

"কি? জন্মের মত আড়ি—না কি?"

"তুমি আমার বেশী বেশী আর রাগিও না ত দাদা, যিনি না যাবেন বুঝতেই পারবেন তিনি।"

"কি বুঝবেন শুনি? ছমাস ধরে ফাঁসি, না তারও বেশী কিছু?" ইলা হাসিয়া মীরার পানে চাহিল।

"চির জীবন ধ'রে এমন বল্‌তে থাকব, চিরদিন যে ফাঁসিরও বাড়া হবে—বুঝলে?"

করুণা ইলার পানেই এতক্ষণ প্রত্যাশাপন্ন নেত্রে চাহিয়াছিল, মীরার জোরে এখন তাহাকেও

নরম হইতে দেখিয়া কোলে মুখ গুঁজিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় সেইখানে রেখে এস দিদি। সেই যমুনাদের কাছে। আমায় বাড়ী নিয়ে যেওনা আর।"

অস্ফুট ভাষায় বলিলেও কথাগুলা সকলেরই কানে গিয়া আবার সকলকে নির্ব্বাক করিয়া দিল এবং করুণা যে তাহার স্নেহপূর্ণ বেদনা ও ব্যগ্রতার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া এখনো সনৎ ও অন্যান্য সকলের তাহাকে লইয়া বিব্রতের কথাই মাত্র ভাবিতেছে ইহাতে মীরার ক্ষুন্নতার সঙ্গে অভিমানের দুঃখও সঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইলা করুণার মাথার উপরে স্নেহকোমল হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সকলকে আর দুঃখ দিওনা করুণা, তোমার জেঠিমার কাছেই চল। আমার বিশ্বাস তিনিই সকলের সব অস্বস্তি, অশান্তি দূর করার উপায় করে দেবেন। সব মীমাংসা তাঁর কাছেই হয়ে যাবে। মীরাকে আর দুঃখ দিওনা তোমরা।"

আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সকলে যথাসময়ে গৃহাভিমুখে রওনা হইল। মীরা সমস্ত পথ কাহারো সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিল না। তাহাকে চিন্তিত ও অন্যমনা দেখিয়া সনৎও তাহাকে বেশী উত্যক্ত করিতে চেষ্টা করিল না। আপন আপন চিন্তার ভারে সকলেই যেন কিছু ক্লিষ্ট। যে আনন্দের আশায় উৎফুল্ল হইয়া সনৎ সকলকে একত্রিত করিবার চেষ্টায় চারিদিকে ছুটিয়াছিল সে আনন্দস্রোত যেন কোথায় বাধা পাইয়া তাহার গতি সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছিল। সনৎ ইলার যুক্তিতে আপাততঃ স্থির হইলেও অন্তরে কি একটা অশান্তির ছায়া তাহাকে যেন অনুসরণ করিয়াই ফিরিতেছিল।

অরুন্ধতী স্থির সংযতভাবেই সকলকে গ্রহণ করিলেন। অরুণ করুণা বা মীরাকে একবারও কোন অনুযোগ করিয়া নিজের কোন অভিমান কি বেদনার কথা বলিলেন না। কেবল করুণার বিষয়ে মীরার মাতার প্রচারিত কথার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া করুণার যে এখনো বিবাহ হয় নাই একথা সকলের সাক্ষাতেই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন। গ্রামে মহা আন্দোলন বাধিয়া গেল। কোন কোন বর্ষীয়সী তাঁহার কৈফিয়ৎ নিতে অগ্রসর হইলে অম্লানমুখে নিজের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া লইয়া অরুন্ধতী উত্তর দিলেন, "এত বড় মেয়ে অথচ বিয়ে দিতে পারা যায়নি সেই লজ্জাতেই বিয়ে হয়েছে বলা হইয়াছিল। বাবা ওকে চিরকুমারী রেখেই দেবতার দাসী করে দিয়ে গেছেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা সব দেবতার কাজ করবে, সংসারী হবেনা—এইই তাঁর আদেশ।

তবুও সহজে গোলমাল থামিল না। দুইটি এত বড় বড় অবিবাহিতা কন্যা যে গৃহে সে গৃহে কিরূপে অন্নপান গ্রহণ করা যায় ইহার মীমাংসায় গ্রামের মাতব্বররা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গ্রামে ঘন ঘন বৈঠক বসিতে লাগিল এবং অরুণ ও সনতের সেখানে যাইবার জন্য আহ্বান আসিতে লাগিল। তাহাদের কাহাকেও সেদিকে ভিড়িতে না দিয়া অরুন্ধতী মাতব্বরদের বলিয়া পাঠাইলেন যাহা বলিবার আছে তাঁহারা যেন তাঁহার গৃহে পদধূলী দিয়া বলিয়া যান। অগত্যা তাঁহারা দুই একবার ভট্টাচার্য্য গৃহেও সমবেত হইলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর নিকট সেই এক জবাবই পাইলেন

"ইহাদের বিবাহ ভগবান যদি দিতে দেন তখন হইবে। এখন এর জন্য আপনারা আমাকে যদি সাজা দিতে চান্ আমি মাথায় করিয়া লইব।"

"মা, তুমি এ গ্রামের লক্ষ্মী, তুমি অন্নপূর্ণা, তোমায় কি সাজা দেব? কিন্তু মা, সমাজকে এমন করে অবহেলা করলে, জানই তো মা, গীতাতেই ভগবান বলেছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা—" ইত্যাদি।

"বাবা, আমি সমাজকে মাথায় ধরি। আপনারা তো বেশীর ভাগই রাঢ়ী-বারেন্দ্র। বলুন, কৌলিন্য আর উচ্চ কুলের জন্য আপনাদের ঘরেও চিরদিন অবিবাহিতা আর বড় মেয়ে কি থাকেনা? স্বর্গগত ঠাকুর তাঁর সর্ব্বস্ব তাঁর গ্রামের জন্য—আপনাদের জন্যই—দেবত্র করে দিয়ে গেছেন—তাঁর ছেলে মেয়ে আর আমি আপনাদেরই আশ্রিত দাস দাসী, আমাদের আপনারা উৎপীড়ন না করে সেই স্বর্গগত মহাত্মার ব্যবস্থা মতই চল্‌তে দেন—এতে সকলেরই মঙ্গল হবে। আমায় আপনারা তো যথেষ্ট দয়া করেন, এটুকু দয়াও আপাততঃ করুন, পরে দেখবেন আপনারা আপনাদের হিতৈষী স্বর্গস্থ মহৎ ব্যক্তির সম্মানই রেখেছেন।"

অরুন্ধতীর মিষ্ট বাক্যে, বিশেষ তাঁহাকে কোন মতেই টলাইতে না পারিয়া, অগত্যা গ্রামের প্রধানরা "আচ্ছা আচ্ছা মা তোমার বিবেচনার ওপরই নির্ভর করে আমরা আরও কিছুদিন চুপ করে থাক্‌লাম" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জাতিচ্যুতির ভয়ে তাঁহাকে দমাইতে পারা যাইবে না তাহা তাঁহারা অরুন্ধতীর "সাজা মাথায় করিয়া লইব" কথাতেই বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে গ্রামের লোক সর্ব্বদা উপকৃত। সম্মুখের এই নবান্ন, লক্ষ্মীপূজা মাঘমাসব্যাপী নিত্য ভোজন,—এসব এখন ত্যাগ করারও ক্ষতি সামান্য কথা নয়। আর ঐ ছেলে দুটি উহারাও যে ভাবে গ্রামের পিছনে লাগিয়াছে, সকলেরই বাড়ীর পাশের আঁস্তাকুঁড়, খানা ডোবার ময়লা, পুকুরের পাঁক ও পানা শেওলা, আর গ্রামের ভীষণ জঙ্গল, বিনাব্যয়েই পরিষ্কার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন উহাদের বেশী ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। ওদের ঘরে আইবড় মেয়ে আছে তারা পড়াশুনা করে, তা কার কি ক্ষতি? আমরা তো সে মেয়েদের ঘরে আনিতে যাইতেছি না। বরং মেয়েগুলো পাড়ার ছোট ছেলে মেয়েদের যে একটু পড়াশুনা বিনা পয়সায় শিখাইতে চাহিতেছে সেও বা মন্দ কি? যে দিন কাল, একটু লেখাপড়া মেয়েগুলারও এখন জানা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আর বেশী টানাটানি না করিয়া মানে মানে চুপ করাই ভাল। বিশেষ বড় বৌমা, আহা তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা—তাঁর অনুরোধ আমাদের না মানলে অপরাধ হবে। ইতিমধ্যে সকলেই ক্রমে চুপ করিয়া গেলেন। শক্তি এবং সাধনা দুইয়ের কাছে অজ্ঞকেও ক্রমে মাথা নামাইতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী

সাহিত্য-বীথি

হোলি—আমাদের হোলির বা ফাল্গুনের দোলযাত্রার অনুরূপ যে পর্ব্ব বহু প্রাচীনকালে অন্যদেশে ছিল, তাহার একটু সন্ধান লইব। ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময়ে এদেশে মেসোপোটেমিয়া দেশের নাম যথেষ্ট পরিচিত হইয়াছে; ঐ দেশের সাড়ে চারি হাজার বৎসর আগেকার বিবরণে হোলি পর্ব্বের অনুরূপ পর্ব্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিবরণে যে জাতির সামাজিক প্রথার কথা আছে তাহাদের নাম ছিল সুমের্। হয়ত আমাদের সিন্ধুদেশে যে প্রাচীন কীর্ত্তি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার ব্যাখ্যায় ধরা পড়িতে পারে যে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার জনকদের সঙ্গে সুমেরদের বংশগত মিল ছিল।

সুমেরদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার সময় আকাশদেবের সঙ্গে ভূদেবীর বিবাহ হইত, আর ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেশের রাজাকে দেবতার কাছে আর এক বৎসর রাজত্ব করিবার জন্য নূতন সনদ বা আদেশ লইতে হইত, আর যতক্ষণ সেই আদেশ পাওয়ার পূজা-পার্ব্বণ চলিত ততক্ষণ দেশকে রাজাশূন্য বা অরাজক মনে করা হইত, ও একজন বোকা রকমের দাসকে কৃত্রিম রাজা সাজাইয়া দেওয়া হইত। সুমেরদের পরবর্ত্তী বাবিলনের রাজা ও প্রজাদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, ও সেখান হইতে পারস্যদেশেও এই প্রথা সংক্রামিত হইয়াছিল।

যে দাসকে রাজা করা হইত সে বোকা না হইলেও তাহাকে নেকা-বোকা সাজিতে হইত। এই নেকা-বোকা বা foolকে হাস্যকর রকমে সাজাইয়া দোলায় চড়াইয়া রাস্তায় বাহির করা হইত, আর রাস্তার লোকে হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার গায়ে ধূলা-কাদা ছিটাইয়া দিত। এই কৃত্রিম রাজা হোলির রাজা ও তাহার পারিষদেরা সকলের কাছে রাজস্ব চাহিত, যাহার দোকানে যাহা পাইত লুটিত, আর সকলের গায়ে লাল রং এর জল ছিটাইয়া দিত। সেই পর্ব্বের দিন স্ত্রী পুরুষেরা পবিত্রতা ও শ্লীলতা ছাড়িলে দোষের হইত না, ও রাস্তায় রাস্তায় শ্লীলতা-বিরোধী অনেক অনুষ্ঠান হইত।

এ উৎসবটা অতি প্রাচীনকালে আদি সুমেরদের আমলে হয়ত শরৎ ও বসন্ত উভয় ঋতুতেই হইত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে এ উৎসব হইত বসন্তে,—যখন শীতের শেষে নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। আমাদের দেশে আগে যে দোলের উৎসবের পরেই বসন্তে বা মধুমাসে (চৈত্রে) নূতন বৎসর আরম্ভ হইত, তাহা মনে করিয়া দিতেছি। মধু ও মাধব অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ, এই দুই মাস লইয়া বসন্তকাল, আর সেই বসন্ত হইতে অর্থাৎ মধু মাধব হইতে নূতন বৎসর গণিত হইত।

আর একটী কথা মনে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অথবা বৈদিক যুগের পরের প্রাচীন সাহিত্যে এই অতি প্রাচীন হোলির নিদর্শন পাওয়া যায় না। আর্য্যের সমাজে আদৃত না থাকিলেও এ পর্ব্ব প্রাচীনকালে হয়ত এদেশে ছিল; কিন্তু কোন্ সমাজে ছিল, ধরা কঠিন।

"কৃত্রিম রাজা খাড়া করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিলে সত্যকার রাজার আয়ু বৃদ্ধি হইত বলিয়া বিশ্বাস ছিল। অতি প্রাচীনকালে সুমেরদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান গোড়ায় হইত শরৎ কালে। ভারতে এই প্রথা এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়। সম্বলপুর অঞ্চলের চোহান রাজাদের মধ্যে এ প্রথা আছে। বিজয়া দশমীর দিন রাজার পুরোহিতকে কৃত্রিম রাজা সাজাইয়া ঘোড়ায় চড়াইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেই কৃত্রিম রাজা খেলা খেলা'রকমে লোকের অপরাধের বিচার করে ও দু-এক পয়সা জরিমানা করে। এ অভিনয়ের শেষে স্বয়ং রাজা গদ্দিতে বসিয়া উৎসব করেন।"

জাতিভেদ—ধর্ম্মে-কর্ম্মে

সুখে বাঁচিবার চেষ্টায় মানুষেরা যখন দল বাঁধিয়া আলাদা আলাদা রাজ্য বসাইয়াছিল, তখন দলে দলে সম্পর্ক না রাখাই ছিল আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। গোড়ায় যদি এক দলের সঙ্গে অপর দলের ভাষার মিল থাকিত, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই সে মিল নষ্ট হইত; প্রতি দলের ভাষা হইয়া যাইত আলাদা। যে যাহার নিজেদের ভাষায় নিজেদের পূজ্য ঠাকুর-দেবতাদের নাম রাখিত; এ অবস্থায় দলে দলে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বিশেষ ভেদ না থাকিলেও, ঠাকুর-দেবতাদের ভিন্ন নামের ফলে প্রতি দলের ধর্ম্ম হইত আলাদা। প্রতি দলে ঠাকুর দেবতাদের কৃপাতেই হইত সেই সেই দলের জীবনরক্ষা ও রাজ্যরক্ষা; বিরোধী দলের ঠাকুর-দেবতারা হইতেন অতি বড় শত্রু।

পুরাতন বাইবেলের ঈশ্বরের মত সকল জাতির ঈশ্বরই অসূয়া বুদ্ধিতে অন্যের ঈশ্বরকে সহিতে পারিতেন না। পরের রাজ্য দখল করিবার নাম হইত "স্বর্গরাজ্য বিস্তার করা"; এক দলের স্বর্গরাজ্য বিস্তার হইলেই বিজিতদলের লোকেদের পক্ষে জেতার দলের ভাষা ও ঠাকুর-দেবতা না লইলে বড় চলিত না। একদল অপরকে জয় না করিলেও বিশেষ অবস্থার ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন দলের বা জাতির লোকেরা একটা সুনির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কাছাকাছি থাকিতে বাধ্য হইত, তবে একের পক্ষে অন্যের ঠাকুর না নিলে চলিত না। ধরুন, যদি শিবের পূজকেরা সাপের পূজা করিতে না চাহিতেন, তবে হয় শিব-পূজক সাধুর নৌকা ডুবিত, না হয় ছেলেকে সাপে কামড়াইত, আর শেষে মনসার স্তোত্র পড়িলে বিপদ কাটিত।

ঠাকুরদের প্রভাব স্বীকার করিয়াই জাতির জাতীয়ত্ব রক্ষা হইত। যে কাজ করিলে বা খাদ্য খাইলে ঠাকুরদের অবমাননা হইত, তাহা হইত ঠাকুর-দেবতাদের দৃষ্টিতে পাপ; রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষেরা নিজেদের ত্রুটিতে যে সকল অপরাধ করিত, তাহা যত বড় অপরাধ হইলেও দেবতারা কিছু দণ্ড দিতেন না, কিন্তু যে খাদ্য খাইলে দেবতাকে অপমান করা হইত, তাহার দণ্ড ছিল অতি গুরু। অন্য দলের লোককে জব্দ করিবার জন্য চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি করিলে দেবতারা বরং খুসী হইতেন, কিন্তু যদি কোন পক্ষী বন্য না হইলে তাহার মাংস খাওয়ায় দেবতার নিষেধ থাকিত, তবে সে অশুদ্ধ মাংস খাইলে দেবতার শাসিত সমাজ ও রাজ্যের মধ্যে অপরাধী স্থান পাইত না। এ যুগের বিজ্ঞানের বিচারে যাহা পাপ নয়, কিন্তু দেবতার দৃষ্টিতে যাহা পাপ, সেইরূপ পাপের ফলে গ্রীস দেশে একজনকে প্রাচীন কালে মারিয়া কবর দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতেও যখন দেবতার ক্রোধে জাত মহামারী দূর হইল না, তখন দেশের লোকেরা অপরাধীর বংশের লোকদিগকে নির্ব্বাসন করিয়া, ও দেবতার দেশের ভূমিতে অপরাধীর হাড় থাকা অন্যায় মনে করিয়া, লোকেরা মৃতের হাড়গুলি তুলিয়া খুব দূরের সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দেবতাদিগকে ঠাণ্ডা করিল। একজন

লোক যতই ভাল হউক, কোন ব্যবহারে দেবদ্রোহী হইলে তাহাকে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করাই চাই ; নহিলে দেবতা এ সমাজকে পিষিয়া মারিতে পারেন।

"খ"-জাতির লোকেরা যেখানে ক-জাতির লোকেদের দেবতার শত্রু, সেখানে ক-জাতির দেবতার কাছে খ-জাতির লোককে আনিয়া নরবলি দিলে পুণ্য হয়। কন্ধ প্রভৃতি জাতির লোকেরা ওড়িষার সীমায় ও মধ্য-প্রদেশে অন্য জাতির লোক ধরিয়া নিজেদের ঠাকুরের কাছে আগে প্রকাশ্যে নরবলি দিত ; এখনও দেয়,—তবে লুকাইয়া। ইংরেজদের আমলে ঐ সকল জাতির লোকেরা কাছাকাছি বাস করে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই একে অন্যের লোক ধরিয়া নরবলি দেয়। রায় বাহাদুর হীরালালের বর্ণনায় ও পুলিসের রিপোর্টে জানা যায় যে, এই মানুষ চুরি ও নরবলি খুব অল্পই ধরা পড়ে। আমাদের যে দু-চারিজন হিতৈষী নেতারা ছুঁৎমার্গ তুলিয়া অথবা ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ জাগাইয়া দেশের লোককে এক করিতে চা'ন, তাঁহারা দেখিবেন যে কোন কোন হাড়ে-বদ্ধ সংস্কারের ফলে দেশের অনেক জাতির লোকেরা কিরূপে গভীরভাবে পরস্পরের প্রতি "অসহযোগ" রাখিয়া বাস করে। গা ছুঁইলে বা ছোঁয়াইলে মিলন আসিবে না ; আসল প্রতীকারের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

একটা প্রবল জাতির ক্ষমতা ও রাজ্য বাড়িয়া গেলে অন্য একটি দুর্ব্বল দলের লোকেরা ঠিক বিজিত না হইলেও ক্ষমতাশালী দলের আওতায় পড়িতে পারে। এইরূপে আওতায় পড়িয়াও দুর্ব্বল দলটি পরাক্রান্তদের রাজ্যের উপান্তে আপনাদের ভাষা, দেবতা ও আচার বজায় রাখিয়া মিত্রভাবে বাস করিতে পারে ; এমন দৃষ্টান্ত এ দেশে অনেক আছে। আবার একেবারে আপনাদের দল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও একটা দুর্ব্বল জাতি বড় জাতির প্রভাবে পড়িতে পারে ; এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে দুর্ব্বল জাতির লোকেরা নিজেদের মূল জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইয়া ক্ষমতাশালীদের আশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় দুর্ব্বলেরা আপনাদের ভাষা হারায় ও ধীরে ধীরে ক্ষমতাশালীদের দেবতা ও আচার অনেক পরিমাণে গ্রহণ করে। যদি এই দুর্ব্বলেরা মানসিক ক্ষমতায় ক্ষমতাশালীদের কাছাকাছি না হয়, তবে তাহারা বড়দের সঙ্গে অভেদে মিলিয়া যাইতে পারে না,—বাধ্য হইয়া একটি কোণায় ক্ষমতাশালীদের অনুগ্রহে বাস করে। একালে যাহাদের নাম হইয়াছে depressed class বা অধঃপতিত জাতি, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই শেষোক্ত কারণেই আর্য্য-সভ্যতায় পুষ্ট সমাজের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছে ; ব্রাহ্মণেরা নিষ্ঠুরতার ব্যবহারে উহাদিগকে পায়ে দলাইয়া নীচু করিয়া রাখে নাই। নীচুকে বড় করার উদ্যোগ খুব ভাল, কিন্তু এ প্রসঙ্গে সকল স্থলেই ব্রাহ্মণ্য শাসনের অত্যাচারের নামে মিথ্যা গালি দিলে অন্যায় করা হইবে। যাহারা নীচের স্তরে অসহায় হইয়া স্থান পাইয়াছিল, তাহারা বাচিয়া ব্রাহ্মণ্য-শাসন লইয়াছে,—আর অনেক স্থলে এখনও তাহারা পুরোহিতাদি পায় নাই। বাঙ্গলায় যাহাদিগকে অধঃপতিত বলা হয়, তাহাদের একটা বড় দলের লোকেরা সীমান্তের কোন কোন বন্য

জাতির লোকের শারীরিক চেহারাবিশিষ্ট; একেবারে মাদ্রাজ অঞ্চলের কোন কোন জাতির লোকেরা যদি উহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে চেহারা দেখিয়া কেহ তাহাদিগকে আলাদা করিতে পারিবেন না।

একটি ক্ষমতাশালী জাতির সঙ্গে যখন অন্য আর একটি ক্ষমতাশালী জাতির সংঘর্ষ হয়, তখন হয় দুয়ে মিলিয়া অনেক সংঘর্ষের পর এক হইয়া যায়, আর না হয় একের প্রায় উচ্ছেদ সাধন ঘটে। এরূপ স্থলে জাতিভেদে ও জাতির মিলনে নানারূপ জটিল অবস্থা দেখা দেয়। উহার একদিকের একটা সোজা অবস্থার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক সময় উত্তর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে বহুদূর পর্য্যন্ত এমন একটা জাতির প্রভাব ছিল, যাহাদের মধ্যে মহিষকে সম্মান করা ও মহিষের আত্মার মত একটি দেবতাকে পূজা করার প্রচলন ছিল। বিন্ধ্যপ্রদেশের নাগ-পূজক দলের তাড়ায় তাহারা শেষে যে দেশটিতে বিশেষভাবে আবাস পাতিয়াছিল, সে দেশের নাম হইয়াছিল মহিষের দেশ অর্থাৎ দ্রবিড় ভাষায় ইরুমাইনাড়ু; এই ইরুমাইনাড়ুর যেটি প্রধান "উর্" বা স্থান তাহা এখনও ঠিক ইরুমাই (মহিষ) + উর নামে অর্থাৎ মহিষুর (মহীশূর) নামে পরিচিত। ইহাদিগকে যাহারা তাড়াইয়াছিল, তাহারা তাহাদের বিন্ধ্যদেশের "ঠাকুরাণী" দেবতার কাছে মহিষ বলি দিত এবং এখনও মাদ্রাজ অঞ্চলে তাহা করিয়া থাকে। এই কালমূর্ত্তি ঠাকুরাণীটি মহিষ দেবতার রাজ্যকে দখল করিবার সময় মহিষ-দেবতার পূজকদিগকে দেখাইয়া দিলেন যে মহিষ মারিলে কোন অনিষ্ট ঘটে না। শত্রুর দেবতাকে অপদার্থ বানাইবার এ একটা কৌশল। আমার অনুমান যে নীলগিরির টোডা জাতির লোকেরা এই মহিষপূজকদের শেষ প্রতিনিধি। টোডাদের শরীরের গড়ন ও অবয়ব এত ভাল যে, নৃতত্ত্ববিদেরা দক্ষিণ দেশে অন্য দ্রবিড়দের মধ্যে উহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মনে করিয়াছেন যে, হয়ত উহারা মূলে আর্য্যবংশের লোক ছিল। মহিষ-দেবতাকে জব্দ করিবার যে অনার্য্য পুরাণ আছে, তাহাই আর্য্যদের মধ্যে মহিষাসুরের পুরাণে সংক্রামিত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিব না, কারণ উহা এখানে নিষ্প্রয়োজন। অন্য দলের লোকেরা যেখানে জোর করিয়া স্বাতন্ত্র্য রাখে অথচ প্রতিবেশী থাকে, সেখানেই এই রকমের পুরাণ হয়; কিন্তু যেখানে দুই দলের মিল হয়, যেখানে এ ধরণের পুরাণ রচিত হয় না।

ধর্ম্মের প্রভেদ বড় বিষম প্রভেদ; উহা কিছুতেই যেন দূর হইতে চায় না, আর ঐ ধর্ম্মের প্রভেদেই জাতিভেদ বড় পাকা হয়। এ কালে যাঁহারা খ্রীষ্টিয়ানী প্রভৃতি উন্নতিশীল ধর্ম্ম পালন করেন, ও নিজেদের ধর্ম্ম অন্য সকলকে দিবার জন্যে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের মতে মিল না থাকিলে আপনাদের মত উন্নত লোকেদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন না। অর্থাৎ যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না বলেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের নামে জাতি রক্ষা করেন। প্রভেদ বাড়াইবার পক্ষে ধর্ম্মের কতখানি জোর, তাহা বুঝাইবার জন্যেই দৃষ্টান্তটি দিলাম। জাতিভেদ জন্মিবার অন্য কারণগুলির আলোচনার সময়ে,—বিশেষভাবে এক দলের লোকের মধ্যেই জাতিভেদের উৎপত্তির কথা বলিবার সময়, এই ধর্ম্মভেদের কথা আবার বলিতে হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ছিটে-ফোঁটা

মদন ভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছে একি সন্ন্যাসি ?
　　গৃহীর সুখে দিয়েছ ছাই চড়ায়ে ;
আর্ত্তরবে তপ্ত হাওয়া বিশ্বে দেছ নিঃশ্বাসি,
　　দিয়েছ শুধু বিয়ের দর চড়ায়ে।

মন্দ সে ত ছিল না যুবা, খেলার রীতি চিন্‌তো সে,
　　ভিজিয়ে দিত মলয়-পিচকারীতে ;
কুহুর সুরে সিক্ত করা কুসুম শরে বিঁধ্‌ত সে,—
　　পক্ষপাত ছিল না নরনারীতে।

কিশোর সেই দেবতাটিরে নিমেষে করি ভস্মরাশ
　　না জানি প্রভু মোদের কোন কসুরে,—
লেলিয়ে দিলে বাঙ্গলা দেশে, মূর্ত্ত মহা সর্ব্বনাশ—
　　ঘটকবেশী এ কোন বুড়া অসুরে!

শিরীষ ফুলে, আমের বোলে বানায় না এ ধনুশর,
　　নিরর্থকই কোকিল মরে ফুকারি ;
নরম হাতে মরম গেঁথে সময়টুকু নিরন্তর
　　করে না মাটী ; এ বটু খাঁটি শিকারী!

পকেট নিয়ে নিঠুর খেলা খেলছে বুড়া বিদঘুটে,
　　প্রাণের দায়ে হার মানায় দুনিয়া।
রৌপ্যময় চক্রপরে ক্ষিপ্র তার শর ছুটে,
　　আস্‌তে যেতে পরাণ ঝন্‌ঝনিয়া।

পকেট কারো ভরাট করে, কারো পকেটে টান মারে,
　　খাম্‌খেয়ালী কার্য্য! বুড়া অন্ধ!
হৃদয় বেঁধা সইতে পারি, জেবের টান সয়না রে,
　　জেবের মাঝে জীবন আছে বদ্ধ।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে ভুল করেছ সন্ন্যাসি,
ঘটকরূপে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
বেহাই-ভূতের কৃষ্ণছায়া বিশ্বে দেছ বিস্তারি,
দিয়েছ শুধু বিয়ের দর চড়ায়ে।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

কিমাশ্চর্য্যম্

নিজে বাঁচলে বাপের নাম-এই মন্ত্র ঘনই জপি ;
ওরে চাচা আপ্‌না বাঁচা দারৈরপি ধনৈরপি।
জীবতি—যঃ পলায়তি, নয়ক বাক্য অব-হেলার ;
ইংরেজেরাও করে স্বীকার, ঐটি best part of valour.
ঘৃতপক্ক সাত্ত্বিকাহার করে' থাক মৌন ব্রতে ;
কেন না, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ পুণ্য-পথে।
কর্ম্ম ছুঁড়ে ধর্ম্ম ঢোঁড়—চক্ষু বুঁজে বদ্ধ গুহায় ;
অনায়াসে পাবে শেষে মহাজনের পন্থা উহায়।
কাম্‌ড়ে ধর দন্তে তৃণ, চিত্ত কর নিত্য নরম।
তবু যদি মুক্তি না পাও, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

আত্মীয়তা

একি দণ্ড আত্মীয়তার,—নেমন্তন্ন রোজই!
বিনা গাড়ি ভাড়ায় ভাল নিজের ঘরের ভোজই
খেতে গেলেও জোটে, যখন ফুরায় ভাল-খাদ্য ;
আমি কিনা ঘরের লোক,—শেষে খেতেই বাধ্য।
ডাক্তারেরা বন্ধু সবাই, ভিজিট্ নিতে চান্ না ;
অন্য পক্ষে বেগার ঠেলায় কাজেও সময় পান না।
দূর করতে দুর্ভাবনা ধরি হুঁকার নলটা ;
কেড়ে নিতে হাতের নিধি জোটে বন্ধুর দলটা।

লীলা

(Anton Tchekor এর গল্প অবলম্বন)

তার নাম ছিল লীলা, কিন্তু সকলেই তাকে লিলি ব'লে ডাকৃত; ক্রমে আসল নাম অনেকেই ভুলে গেল। লিলির বয়স কত বলা বড় কঠিন, কারণ ১৯ থেকে ২৫ পর্য্যন্ত—নানা জনে নানা অনুমান করত। বন্ধুরা ২২এর উপরে উঠ্‌ত না এবং সেটা অন্ধ ভক্তের অনুমান বলেও কেউ মনে করতো না। লিলির সামনে বয়সের কথা উঠ্‌লে অথবা আলোচনা হ'লে সে শুন্‌তো আর হাসতো—কোন কথাই বলতো না। এই হাসিই ছিল তার পরম সুন্দর। আসলে যে তার অতুলনীয় রূপ ছিল তা নয় কিন্তু এমন কমনীয়তা এমন লাবণ্যে ভরা মিষ্টি চেহারা বড় কারু দেখা যায় না। আবার যখন সে হাস্‌তো তখন সে হাসিতে তার মুখে এমন দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠত এমন অপূর্ব্ব শোভা হ'তো যে আর কারো সাধ্য থাকতো না তার উপরে বিরক্ত বিমুখ বা বিরূপ থাক্‌তে পারে। লিলি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত—নানা কবির গ্রন্থ থেকে অনর্গল প্রয়োজন-মত কবিতা আওড়াতে পারত। তার মুখে কবিতাগুলো যেন নতুন সঙ্গীত ও নতুন প্রাণ পেতো। বহু বারের শোনা কবিতাও তার মুখে এমন মিষ্টি লাগ্‌তো! দুই একটী গান তার এমন প্রিয় ছিল যে সময়ে অসময়ে সেই সব গানের দু-এক লাইন তার মুখে লেগে থাক্‌তো। অনেকে এই গানের সুরেই পাগল হ'তো কিন্তু গানে তার নাম ছিল না। ওস্তাদেরা বল্‌তেন সে তাল মানের ধার ধারে না। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, এক একটা গান এমন প্রাণ খুলে ভাবে ভুলে মিষ্টি সুরে গাইতো, যে ওস্তাদির যারা ধার ধারে না সেই সব সাধারণ শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতো। কারু কোন চাঞ্চল্য চাপল্যের ফাঁক থাকতো না। লিলির চালচলন কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ এমন ছিল যে মনে করলেই কেউ কোন অস্বাভাবিক স্বাধীনতা নিতে পারতো না—কোন রকমে অসম্মান. কর্ত্তে সাহস করতো না, অথচ সে যখন তার থিয়েটারে রিহার্সাল বা অভিনয় কর্ত্তে যেতো তখন তার চারিপাশে সুমিষ্ট হাসি তামাসার হিল্লোল বয়ে যেতো, তবু কোন দুর্দ্দান্ত রস-লোলুপেরও সাহসে কুলাতো না যে একটু অতিরিক্ত স্বাধীনতা নেয় বা কোন প্রকারের ইতর রসিকতা করে!

একদিন অগ্রাণের সকালবেলা, তখনও শীত বেশী পড়ে নি সবে আরম্ভ হ'য়েছে মাত্র। লিলি আপনার শোবার ঘরে তখনও শুয়ে শুয়ে শালমুড়ি দিয়ে আরাম কর্চ্ছিল। বিছানায় বসেই হাত মুখ ধুয়ে গরম গরম চা ও দু এক খানা গরম লুচি খাচ্ছিল। এখানে কারও কোন দিন আসার যো ছিল না, কিন্তু মাস তিনেক হ'তে সুরেশের উপর লিলির কেমন টান পড়ে গেল যে তার বেলায় সকল বিধি নিষেধ উঠে গেল। সে যখন তখন আসার যে কোন সময়ে দেখা করার অধিকার—পেয়ে গেল। যে অধিকার পাবার জন্য কত বড় বড় লক্ষপতি লালায়িত হয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছিল হেলায় সেই অধিকার সুরেশ কি করে পেলো তা সুরেশের বন্ধুরাও ভেবে ঠিক কর্ত্তে পারলো না, আর লিলির পরিচিতেরাও বুঝতে পারলো না। কোন কোন নিরাশ রসিক "স্ত্রী লোকের চরিত্র, পুরুষের ভাগ্যদেবতাও জানে না" এই শ্লোক আওড়িয়ে মনের দুঃখ মেটাতে লাগ্‌লেন। সুরেশের বয়স ২৭।২৮; দেখতে লম্বা ছিপ ছিপে, সুন্দর দুটা চোখ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু সুরেশের মুখে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে কেউ সুরেশের উপর রাগ করে থাকতে পারতো না; হাজার অপরাধেও সুরেশকে কেউ কঠিন ভাবে ব্যথা দিতে পারতো না। সুরেশ সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কে কেসিয়ারি করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রথম যৌবনে তার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু সেটা বেশী ঘনিষ্ট হবার সুযোগ পায় নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা অপেক্ষা বাঁশী বেহালাতে বিপুল উৎসাহ দেখে মা সরস্বতী সুরেশকে বেশী বিব্রত করতে পারেন নি; পরে বিয়ে করে শ্বশুরের সাহায্যে বিদ্যার আশীর্ব্বাদের অভাব পূরণ ক'রে নিল। যাক্‌গে সে পুরাণো কথায়!

সুরেশ সেই সকালে লিলির পাশে বসে নানা কথা গুঞ্জন করছিল, আর মাঝে মাঝে চায়ের বাটীতে চুমুক দিচ্ছিল। হঠাৎ নীচে গাড়ী আসার শব্দ হ'লো, একটু পরেই কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। 'বেহারা বেহারা' ক'রে ডাকলেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। আর একবার চেঁচিয়ে ডাকার পূর্ব্বেই সুরেশ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো "লক্ষ্মীটি তুমি শিগ্‌গির নীচে যাও; যদি তোমাদের থিয়াটারের কোন অভিনেত্রী হ'ন, হয়ত এ পর্য্যন্ত এসে পড়বেন। তাঁদের কারো কাছে এম্নি ভাবে দেখা হওয়া আমি মোটেই পছন্দ কর্ব্বো না।" লিলি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল "আর আমিই বুঝি খুব পছন্দ কর্ব্বো? তোমার মত অরূপ রতন সাত রাজার ধন মাণিক না দেখালে আমার গরব আর বাড়বে কিসে?" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে লিলি কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিল, শালখানা ভালকরে গায়ে জড়িয়ে চটী পায়ে দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে নীচে নেমে গেল। সেখানে নীচের বসার ঘরে গিয়ে দেখে একটী ১৮।১৯ বৎসরের মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটীর রং বেশ ফরসা, গড়নও নিতান্ত মন্দ নয় কিন্তু তাই বলে অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যবতী নয়। প্রথমেই নিমেষের মধ্যে এই মেয়েটীর বেশভূষা রূপ লাবণ্য আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে নিজের একটা তুলনা করে নিলে। সে যে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিল তবু তার মধ্যেই সেই সাত তাড়াতাড়িতেও চুলের ও কাপড়ের একটু ভাবভঙ্গী করে এসেছিল, কাপড় জামাও তার মূল্যে ও পরিচ্ছন্নতায় উৎকৃষ্টই ছিল, তবু কি যেন তার ছিল না যা এই মেয়েটীর মধ্যে দেখ্‌তে পেল। সেটা দেখ্‌তে পেয়ে লিলি যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লো। বড় বড় চালাক চতুর তুখোড় লোকের কাছে যে একটু দমে না সে যেন এই মেয়েটীর কাছে জড় সড় হয়ে গেল।

এমনিভাবে কয়েক মিনিট চলে গেলে মেয়েটী বল্লে "হ্যাঁগা তুমিই নাকি সেই লিলি?" লিলি কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেল "হ্যাঁ আমিই লিলি, তবে সেই লিলি কি না

জানি না।" মেয়েটী বল্‌ল "ওগো সেই লিলি যার জন্যে ভদ্র লোকের ছেলেরা কাজকর্ম্ম ফেলে বাড়ীঘর ছেলে মেয়ে ভুলে পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায় তুমিই ত সেই ? ওগো তুমি আমাকে বাঁচাও।" লিলি থতমত খেয়ে সরে গেল। যার কথার ধারে কত বড় বড় বেয়াড়া রসিকের মুখ ভোঁতা হয়ে যায়, সে এই উনিশ বছরের মেয়েটীর কাছে কেমন যেন হয়ে গেল। মেয়েটী আবার বল্লো "ওগো বাঁচাও গো তুমি চেষ্টা কর্ল্লেই বাঁচাতে পার। এই দেখছো আমার বয়স,, আমার একটী ছেলে একটী মেয়ে—আমাদের সর্ব্বনাশ করো না, দয়া করে বাঁচাও আমাকে।" লিলি বিরক্ত হয়ে অনায়াসে ঝঙ্কার কর্ত্তে পারতো, কিন্তু কেন যেন সে সব এলো না। থতমত খেয়ে বল্‌লো "আমি কি করে কাকে বাঁচাবো ? আমি কি কর্ত্তে পারি ? আমি যে কিছুই বুঝিতে পার্চ্ছি না।" মেয়েটী বল্লো যে "ওগো আমাদের বাবু আজ তিন দিন বাড়ী যান নি ! কি আর কর্ব্বো—নাম কর্ত্তেই হবে—সুরেশ রায়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে কাজ কর্ত্তেন। কাল সন্ধ্যাকালে ব্যাঙ্কের লোকেরা খুঁজতে এসে বলে গেল বাবু পাঁচ হাজার টাকা ভেঙ্গেছেন। ব্যাঙ্কের বড় বাবু বলেছেন টাকাটা পুরিয়ে দিতে পার্ল্লে তিনি ছেড়ে দেবেন ফৌজদারী কর্ব্বেন না। আমি কত কেঁদে কেটে এক দিনের সময় চেয়ে নিয়েছি। সে পাঁচহাজার ত তোমার পায়েই ঢেলেছে—। ওগো তুমি দয়া কর—তোমার কত আছে ! অমন কত টাকা তোমার হেলায় আসবে, কত হেলায় তুমি দিতে পার। আমার যে আর কেউ নাই। বাবা মা চলে গেছেন। শ্বশুর কুলেও আর কেউ নাই। ছেলে মেয়ে নিয়ে পথের ভিখিরি হব ক্ষতি নাই কিন্তু স্বামীর হাতে দড়ি পড়বে সে সইতে পার্ব্বো না। দয়া কর, তুমি একটী বার দয়া কর।" এই কথা বলে মেয়েটী কেঁদে ফেললো। হাপুষ নয়নে কাঁদতে লাগলো। মেয়েটীর কোন কথার মধ্যে কত ভুল ছিল হয়ত লিলি সে জাতীয় কোন কথা শোনার মতও সে নিজে ছিল না। ইচ্ছা কর্ল্লে সে বেশ দুকথা শুনিয়েও দিতে পারতো। কিন্তু ঐ যে মেয়েটীর মধ্যে কি একটা ছিল যাহা রমণীকে পরম রমণীয় করে, সুন্দরকে অতি সুন্দর করে, উজ্জ্বলকে পরমোজ্জ্বল করে, আর সেই জিনিষটা যে তার নাই লিলি আজ তাহা প্রাণে প্রাণে মর্ম্মান্তিক ভাবে অনুভব কর্‌ছিল। কাজেই শক্ত কথা তার মুখে এলো না। সে বললো "সুরেশ এখানে আসে বটে, কিন্তু সে ত আমাকে টাকা দেয়নি। মাঝে মাঝে দুএকটা জিনিস উপহার দিয়েছে। একবার মাস দেড়েক হ'লো গোছা ভরা আঙ্গুর দুসের এনে দিয়েছিলো আর তার সঙ্গে একটা চমৎকার ফুলের তোড়া।"

মেয়েটী বল্‌ল, "হায়রে, খুকু আমার তখন জ্বরে ভুগছিল। ডাক্তার বলে গেল বেদানা আর আঙ্গুরের রস খাওয়াতে। পয়সা কোথায়—আঙ্গুর কিনে দেবো ? এদিকে তোমায় এনে দিল দুসের আঙ্গুর আর ফুলের তোড়া। খুকু আমার একটা ফুল পেলে আহ্লাদে আটখানা হয়।" লিলি থতমত খেয়ে বল্লো "সুরেশ দামী কোন উপহার কোন দিনই দেয় নি, আর কে কি দেয় না দেয় সে খবর অত কেই বা রাখে ? আমার অত খেয়ালেও

নাই। ভালকথা মনে হ'লো—এই যে আমার কাণে হীরার দুল এটা আজ ৫ দিন হ'লো লাভ চাঁদ মতি চাঁদের দোকান থেকে এনে দিয়েছে।" মেয়েটী বলে উঠ্‌লো "হায়রে হায়! ৫ দিন আগে আমার জন্মদিন ছিল এবারে বললো হাতে একটী পয়সা নাই এবার জন্মদিনে তোমায় কিছু দিতে পার্‌লাম না! হায়রে হায়! মানুষ এমনি করেই ঠকায় আর ঠকে, হা ভগবান্‌!"

মেয়েটীর দীর্ঘশ্বাস যেন লিলির বুকে গিয়ে পড়ল। সে কেমন অসোয়াস্তি বোধ কর্‌তে লাগলো। তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো "আমার কাছে ত এখন পাঁচ হাজার টাকা নাই। কি করে কি কর্ব্বো। আমি তেমন গয়না ভক্তও নই, এইযা গায়ে দু এক খানা।"

মেয়েটী অমনি বলে উঠ্‌ল "তাইত, তোমার টাকা নাই—তোমার গয়না নাই, অথচ দেশশুদ্ধ সবাই তোমার জন্য পাগল। টাকার তোড়া তোমার পায়ে গড়াগড়ি যায় আর এই আমার মত দুখিনীকে দিতে হলেই তোমার টাকাও থাকে না গয়নাও থাকে না। পুরুষ মানুষকে ত ঠকাচ্ছই আমাকে কেন ফাঁকি দাও! আমার দুঃখে তোমার প্রাণ গলে না। হা নিষ্ঠুর হা পাষাণ।" আবার তখনি মেয়েটী তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল "ওগো আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে এমন করে বলার আমার কোন অধিকারই নাই। আমি পাগলের মত ছুটে এসে তোমার বাড়ীতে বসে তোমাকে এমন করে নিষ্ঠুর কথা শোনালাম কেন? আমার দুঃখে আমি পাগল হয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর"। এই কথা বলে মেয়েটী লিলির পায়ের কাছে বসে পড়ল। পায়ে হাত দেবার আগেই লিলি তাড়াতাড়ি হাতে ধরে তুলে পাশের সোফাতে বস্‌তে দিলে।

মেয়েটী না বসে হাত যোড় করে বল্লো—"তুমি আমাকে দয়া কর। আমার স্বামীকে জেল থেকে বাঁচাবার সাহায্য কর। আমার খোকাখুকীর পথে দাঁড়াবার দায় হতে রক্ষা কর। তোমার কত টাকা কত জিনিস আছে আমাকে ভিক্ষা দাও।" এই বলে মেয়েটী আঁচল পাতলো। লিলি গলা থেকে সোনার হার, হাতের সোনার চুড়ী খুলে দিল, কাণের হীরের দুল খুলে দিল—বল্লো "এতে পাঁচ হাজার টাকা হবে না। আর কি দেবো—কি কর্ব্বো" বলে ঘরের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। শেষে পাশের ঘরের লোহার আলমারি খুলে আরো হার বালা আংটী চেন ঘড়ি সোনার ডিবে যেখানে যা পেল সব কুড়িয়ে মেয়েটীর আঁচল ভরে দিল। অনেক গুলো পুরাণো মোহর ও গিনি ছিল তাও দিয়ে দিল। মেয়েটী আঁচল মুড়ে নিয়ে বল্‌ল "বাঁচালে তুমি আমাকে। আমি অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবুডাবু খাচ্ছিলাম, কিনারা পাচ্ছিলাম না, তুমি দয়া করে উদ্ধার করেছ"—এই কথা বলে মেয়েটী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে চাইতে এসে একখানি ভাড়াটে গাড়ীতে উঠে চলে গেল। লিলি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শরীর মন কি এক অবসাদে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ পায়ের শব্দে চেয়ে দেখে সুরেশ নেমে আসছে। সুরেশ এসেই বল্‌ল "আমি সব দেখেছি! আমার আর কিছু বাকী নাই। আমার জন্যে কি না আমার কমলা—আমার সোনার কমল—তোমার পায়ে ধর্‌ল! ছি ছি আমি কি জঘন্য হয়েছি! আমি কত অতলেই ডুবেছি!" এই বলে ছুটে সুরেশ রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল। লিলি এ কথারও কোন উত্তর দিতে পার্লো না অথবা প্রবৃত্তি হলো না। তেমনি অভিভূতের মত—সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কি এক অপরিসীম রিক্ততা ও অভূতপূর্ব্ব ব্যর্থতা যেন তার জগৎ সংসার ও সারাজীবন আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল।

শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী

ফাল্গুনে

বসন্তের রাজনীতি—প্রথা দাঁড়াইয়াছে যে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে রাজনীতির ও রাজনীতি-ঘেঁষা বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু রাজনীতির নামে একই খাড়া-বড়ি-থোড় কত উল্টাইব পাল্টাইব? দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বে-সরকারি সদস্যেরা আর একবার আর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে মত জানাইয়াছেন; যদি সারা দেশের সকল লোকে গবর্ণমেণ্টের বিধানকে সমস্বরে অন্যায় বলে, তবুও উহা উল্টাইবার নয়,—কারণ "দায়ী" শাসন-কর্ত্তারা বুঝিয়াছেন যে, ঐ ব্যবস্থা না হইলে চলিবেনা। এ অবস্থায় এই বসন্তের আগমনে—বঙ্গবাণীর নূতন বর্ষের আরম্ভে, একটুখানি রাজনীতি ভুলিয়া,—একটা কাব্যের কথা শুনাইয়া পাঠকবর্গকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বহুকাল হইতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত আর্ম্মেনিয়া দেশের এক ভাগ তুর্কীর অধীনে ও আর এক ভাগ রুসের অধীনে থাকায় দেশের লোকেরা বিষাদে মলিন হইয়াছে; যুদ্ধের পরের নূতন ব্যবস্থায় দুঃখ ও বিষাদ ঘুচিবার মত কিছু হয় নাই। এদেশের কবি ইশাহকিয়ান্ সম্প্রতি ইউরোপে খ্যাতি পাইয়াছেন; ইউরোপীয় ভাষায় ইঁহার কবিতার অনুবাদ ভাল চলে না;—তবুও কবির বীণার নূতন ধরণের ঝঙ্কারে লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে। দুঃখের এত মর্ম্মস্পর্শী আঘাত বড় কেহ দিতে পারে না, আর কোথাও দুর্ব্বলতার কিছুমাত্র আর্ত্তনাদ না থাকিলেও ইঁহার কবিতায় কবির বিষাদের গভীরতা দেখিয়া পাঠককে চমকিতে হয়। আমরাও জানি যে পরের কাছে কাঁদিয়া দুঃখের নিবেদন করিলে কেবল নিজেকে খেলো হইতে হয়,—পরে কিছু করে না; অসারের ও অক্ষমের তর্জ্জন-গর্জ্জন যে বৃথা, তাহাও জানি। জানিয়াও, চরিত্রের অগভীরতার ফলে আমরা বাচাল হইয়া থাকি। দুঃখ যেখানে যথার্থ,—অর্থাৎ দুঃখ অনুভব করিবার মত জীবনী-শক্তি যেখানে প্রচুর, সেখানে যেভাবে জীবনের কাব্যে বিষাদের কাহিনী ফুটিয়া ওঠে ও মানুষকে ধীরপদে কর্ম্মের পথে টানে, সেই ভাবেই এই কবির কাব্য বিকসিত হইতেছে। বিজ্ঞানে বলে যে, ফুলের পরীক্ষায় গাছ চেনা যায়; কবিতার পরীক্ষাতেও সেইরূপ জাতির পরিচয় মেলে। নববর্ষে,—এই বসন্তের সমাগমে নূতন কবির পরিচয় দিয়া পাঠকদিগকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

গ্রামের উন্নতি—যাহারা নিজে হাতে মাটি আঁচড়াইয়া বসুমতীর দান মাথায় করিয়া আনে, তাহারা ছাড়া অন্য কেহ পারতপক্ষে গ্রামে বাস করিতে চায় না, কেন না নানা স্থানে না গেলে জীবিকা লাভের পথ হয় না। যাঁহারা সকলকেই পল্লীতে থাকিতে উপদেশ দেন, সেই সহরবাসীরা, হয় কবি, না হয় বোকা। একালের সভ্যতার প্রকৃতিই এই যে, সহর বাড়িয়া চলিবে; তবে ব্যবসায়

বাণিজ্যের মূল মহাজনেরা বিদেশী বলিয়া, অন্য দেশের মত এদেশে লাভবান্ মহাজনদের টাকায় ও দয়ায় পল্লীর শ্রী রক্ষিত হয় না। সামর্থ্য হইলেই চাকুরেরা পল্লীর ভিটা ছাড়িয়া সহরে বাস করিবে,—কেহ উহার অন্যথা করিতে পারেন না। পল্লীর উন্নতির প্রধান কথা যে, পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি, তাহা আমরা জানি ও সে বিষয়ে বক্তৃতাও করিয়া থাকি; পল্লীতে রোগ বাড়িলে যে পরে সহরগুলিও মরিবে, তাহা হয়ত আমরা সকলে বুঝি না। আমরা দেশের উন্নতির নামে স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা কি ভাবে ভুলিয়া যাই, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দেশের উৎপন্ন সামগ্রী যে বিদেশীয় মহাজনেরা বেশীর ভাগ সংগ্রহ করেন তাঁহারা ১৮৮২ হইতে এই ৪০ বৎসর ধরিয়া এই বুদ্ধি আঁটিতেছেন যে, কি উপায়ে জলপথে সোজাভাবে একটা বড় কেনাল্ করিলে খুব সস্তায় ও সুবিধায় বাণিজ্য চলে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, দেশের মাঝামাঝি পথ দিয়া Grand Trunk Canal খুঁড়িতে হইবে। স্বীকার করি যে, এইরূপ canal হইলে রেলপথ অপেক্ষা যাতায়াতের ও বাণিজ্যের সুবিধা অধিক হইবে। কিন্তু যে ভাবে ঐ কেনালের পাড় না বাঁধিলেই চলিবে না, তাহাতে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর আরও বহুগুণে বাড়িবে। এ দেশের শাসন-নীতির মূলমন্ত্র হইল—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ; কাজেই সরকার এ প্রস্তাবের পক্ষপাতী।

আমরা যদি এ প্রস্তাব দমাইতে পারি ভালই, নইলে এই কেনাল্ কি ভাবে করিলে দেশের স্বাস্থ্যে বাধা না ঘটিতে পারে, তাহা কঠোর পরিশ্রমে বুঝিয়া লইয়া একটা কিছু মন্দের ভাল করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। যদি মহাজনদের জিদ রক্ষা হয়, তবে কেবল অভিমান বা রাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে ফল নাই। রোগে এদেশের চাষা মরিলে অন্য স্থানের লোক আসিয়া নিশ্চয়ই চাষ করিবে,—কারণ জমি কখন পড়িয়া থাকিবে না। সে বুদ্ধি লইয়া আমরা এ দেশের চাষ চালাইতে পারিব না।

দেশের উন্নতি সম্বন্ধে সি, আর, দাশ প্রভৃতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সারা দেশের লোককে নিদান পক্ষে ৩।৪ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে দেশ রক্ষার কাজ লইতে হইবে; সরকারের কাছে, উহার সাহায্যে কিছু পাওয়া যাইবে মনে হয় না। এ কাজ অল্প পরিমাণে একটি জেলার হাতে নিতে গেলেও অনেকগুলি এমন লোকের নেতৃত্বের প্রয়োজন, যাঁহারা স্বাস্থ্য বিধানের বিষয়ে ও ইঞ্জিনিয়ারিতে বিশেষ অভিজ্ঞ। এ কাজ চালানর অর্থ একটি গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আর একটি গবর্ণমেণ্ট খুলিয়া দেওয়া; কাজেই বহু টাকা চাই, বহু অভিজ্ঞ নেতা চাই ও বহু কর্ম্মচারী চাই। সখের হিতৈষী দিয়া বক্তৃতা চলে, কিন্তু কাজ চলে না।

গ্রামের উন্নতি বিধানের প্রসঙ্গে ত্রিপুরার আগরতলা হইতে শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকার জন্য যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল একটি কথাই উল্লেখযোগ্য। সেই জন্য প্রবন্ধটি না ছাপিয়া সেই কথাটিরই উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, সারা দেশের

হিতের জন্যে যে কাজের অনুষ্ঠান হইবে তাহা কোন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের দলের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত নয়। এ শ্রেণীর কাজ যদি রাজনীতির আবর্ত্তে পড়ে, তবে ফল ভাল হইবে না স্বীকার করি। যেভাবে কাজ পরিচালকদের দল গড়া হইতেছে, তাহাতে মনে করা যায় না যে, উদ্দিষ্ট কাজটি কোন রাজনৈতিক দলের কর্ত্তৃত্বে বা নামে চলিবে। যাঁহারা রাজনীতির ধার ধারেন না তাঁহারাও যখন এরূপ কাজের পক্ষপাতী; তখন নিশ্চয়ই এ কাজের উপর একটা দলের চাপ পড়িবে না। এ বিষয়ে আমরা সকলকে আশ্বস্ত করিতে পারি।

কাজটির উদ্যোগে টাকা উঠিতেছে, সেটা ভাল কথা। গোড়াতেই কিন্তু একটা কাজ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে ; কোন একটা ছোট জেলা বা জেলার অংশে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কি কি উদ্যোগ করিতে হইবে ও সেইগুলির জন্যে কত টাকা ব্যয় হইবে, তাহা বিশেষজ্ঞদিগকে দিয়া স্থির করিতে হয়, ও কিরূপভাবে কি স্থির হইল তাহা সকলের অবগতির জন্য মুদ্রিত করিতে হয়। এই কাজ যদি দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-শাসিত স্থানে করা হয়, তবে সারা দেশের উন্নতির ব্যবস্থা কি ধরণে ও কত ব্যয়ে হইতে পারে, সে সম্বন্ধে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে। এইরূপভাবে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ধারণা না জন্মিলে লোকের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও টাকা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহারা কাজ চালাইবেন, তাঁহারাও এইরূপভাবে পরীক্ষার কাজ করিলে নিজেদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কতখানি, তাহা বুঝিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন। এরূপ কাজের উদ্যোগে কেহ বলিতে পারেন না যে, যত টাকা ওঠে তাহারই মত কাজ করা যাইবে। কাপড় দেখিয়া কোট্ ছাঁটিবার যে ইংরাজি প্রবচন আছে, তাহা কোন বড় কাজের বেলাতেই খাটে না ; অল্প কাপড়ের হিসাবে যদি পুতুলের গায়ের মত কোট হয়, তবে সে কোটে কাহারও উপকার নাই। যে সকল কাজের প্রস্তাব চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য কত খরচ পড়ে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া ধরা যাইতে পারিবে। তখন দেখা যাইবে যে নিদান পক্ষে গোড়ায় কত টাকা না তুলিলে ও পরে অনুষ্ঠান রক্ষার জন্য কত টাকা না পাইলে অনুষ্ঠান বিশেষকে চালাইতে পারা যায় না। কম পক্ষে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের জন্য যত টাকা চাই তাহা না তুলিলেই চলিবে না।

* * *

দেবকুল ও মঠের সম্পত্তি—১৮৮৬ খৃঃ অব্দে যখন এদেশে প্রথম কংগ্রেস বসে তখন মাদ্রাজের আনন্দ চার্লু মহাশয় কংগ্রেসের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। এই চার্লু মহাশয় কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সভায় মঠ ও দেবকুল প্রভৃতির চিরস্থায়ী সম্পত্তির অসদ্ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য যখন প্রস্তাব তোলেন তখন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা সে বিষয়ে কিছু করা সঙ্গত মনে করেন নাই। পরে ১৮৯৩ সনে চার্লু মহাশয় মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিষয়ে একখানি আইনের খসড়া পেস্ করেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট ঐ আইনকে তখন গ্রহণ বা সমর্থন করেন নাই ; যে সম্পত্তির

একটি পয়সাও গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য নয়, যাহার অপব্যবহারে গবর্ণমেন্টের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে গিয়া বিনা লাভে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মের গায়ে হাত দেওয়ার দুর্নাম কুড়াইতে গবর্ণমেন্ট স্বীকৃত হন নাই। ইংরেজের আমলের আগে ঐ সকল সম্পত্তির পূজারী বা মোহান্তেরা কুচরিত্র বা অপব্যয়ী হইলে দেশের লোকের হাতে সংশোধনের উপায় ছিল, কিন্তু এখন ইংরেজের আইনে স্বত্ব অর্জ্জনের ও রক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে পূজারী মোহান্ত প্রভৃতিকে তাড়ান যায় না, আর কালোচিত প্রয়োজন ধরিয়া দান-খয়রাতের নূতন ব্যবস্থা চালান যায় না। এই অবস্থার ফলেই আংশিকভাবে পঞ্জাবে অকালীদের আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এবারে অনেক কষ্টে মান্দ্রাজের আইন সভায় সে প্রদেশের মঠাদি সম্পত্তি রক্ষার আইন পাস্ হইয়াছে, কিন্তু এ আইনে দেশের লোকের সুগঠিত সভার হাতে মঠ মন্দির প্রভৃতির সংস্কার হইবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। পাঞ্জাবের জন্যে কি আইন হইবে, তাহা জানা নাই। এ সকল বিষয়ে প্রাদেশিক আইন পাস্ না করাইয়া একেবারে ভারতের জন্য আম আইন পাস্ হওয়া উচিত। স্যর্ হরি সিং গৌর এই লক্ষ্য ধরিয়া ভারত ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিল উপস্থাপিত করিতেছেন। বিলখানির খস্ড়া যাহাতে সকল অবস্থা বুঝিয়া করা হয় তাহার জন্য এ বিষয়ের সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উচিত যে তাঁহারা ডাক্তার গৌরকে বিল রচনায় পরামর্শ দেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিবাদ তুলিবার লোক আছে অনেক, কিন্তু সুবিবেচিত ব্যবস্থা রচিবার লোক বড় অল্প।
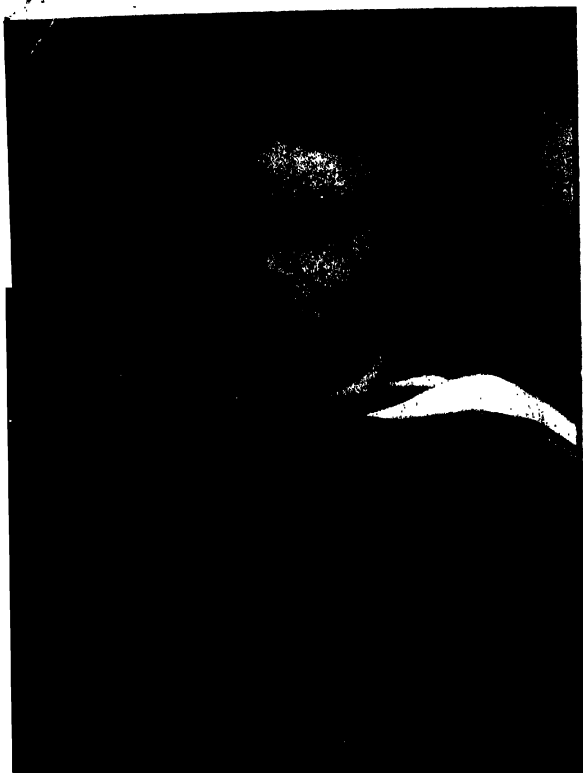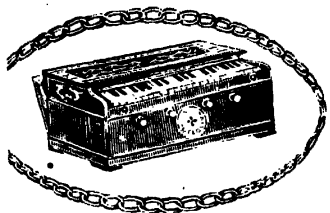
Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

বঙ্গবাণী

সম্পাদক

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

কার্য্যালয়

৭৭ নং রসারোড নর্থ,

ভবানীপুর।

বার্ষিক ৪৸০ প্রতি সংখ্যা।৵০

মা ও ছেলে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ ১৩৩১-'৩২ | চৈত্র | প্রথমার্দ্ধ ২য় সংখ্যা

বাতাস

গোলাপ বলে, "ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝ্‌তে কেবা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে ?"
বাতাস বলে, "ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি তুমি কা'রে খোঁজো ;
সেই তোমার ঐ আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম,
হে মোর কুসুম ॥"

পাখী বলে, "ওগো বাতাস, কি তুমি চাও বুঝিয়ে বল মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে ?"
বাতাস বলে, "ওগো পাখী, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি তুমি কা'রে খোঁজো ;—
সেই আকাশে জাগ্‌লে আলো, আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী ॥"

নদী বলে, "ওগো বাতাস, বুঝ্‌তে নারি কি যে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।"
বাতাস বলে, "ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি তুমি কা'রে খোঁজো ;—
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে॥"

অরণ্য কয়, "ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি।"
বাতাস বলে, "হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝো বা নাই বোঝো,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজো ;
সেই বসন্ত আসে পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি॥"

শুধায় সবে, "ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কি যে
বলো মোদের, কি চাও তুমি নিজে ?"
বাতাস বলে, "আমি পথিক, আমার ভাষা নাই বা কেহ বোঝো,
আমি বুঝি তোমরা কা'রে খোঁজো।
আমি শুধু যাই চলে' আর সেই অজানার আভাষ করি দান,
আমার শুধু গান॥"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২শে অক্টোবর, ১৯২৪
ষ্টীমার "এণ্ডিস্"।

রাম গোপাল ঘোষ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

["ভারতবর্ষে" প্রকাশিত]

[বঙ্গাব্দ ১২২১ সাল ৬ই কার্ত্তিক রামগোপাল ঘোষ জন্ম-গ্রহণ করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীর নিকট বাগাটি গ্রামে তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্রের বাস ছিল। পিতামহ মুখ্য কুলীন ছিলেন। তিনি সেই গ্রামেরই মিত্র পরিবারে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ ভূম্যাদি লাভ করেন ও পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া সেইখানেই বাস করেন। গোবিন্দচন্দ্র কলিকাতার বেচু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট্ নিবাসী রামপ্রসাদ সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পিতার ন্যায় ভূসম্পত্তি লাভ করেন। গোবিন্দচন্দ্র কলিকাতাতেই বাস করিতেন। রামগোপাল মাতুলালয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন।

রামগোপালের পিতা সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন; চীনা বাজারে তাঁহার একখানি সামান্য দোকান ছিল, ইহা ব্যতীত তিনি কুচবিহার রাজের এজেন্ট বা মোক্তারের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে সামান্য জমিজমাও ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের উপর্য্যুপরি চারিটি কন্যার পর রামগোপাল ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার পর, তিনি আর একটি কন্যা লাভ করেন।

রামগোপাল দেখিতে গৌরবর্ণ ও সুকান্তি ছিলেন। শিশুকালে তিনি সাহসী ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। প্রথমে ঠনঠনিয়ার এক পাঠশালায়, তারপর শারবোর্ণের (Sherbourne) স্কুলে বিদ্যারম্ভ করেন। কলিকাতার চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্ম সমাজের বাটীর নিকট শারবোর্ণের স্কুল ছিল। দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি নব্যবঙ্গের খ্যাতনামা বহু ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। শারবোর্ণের স্কুল হইতে তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগে ভর্ত্তি হন। তখন তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর, ডি, য়্যানস্লেম (D. Anslem) তখন হিন্দু কলেজের হেডমাষ্টার। রামগোপালের নাম প্রথমে "গোপালচন্দ্র" ছিল, এই ভর্ত্তি হইবার সময় তিনি ডি, য়্যানস্লেমের কথা বুঝিতে পারেন নাই। সাহেব ভর্ত্তি বহিতে "রামগোপাল" লিখিয়া লন, তদবধি বিদ্যালয়ে ও সাধারণে তিনি "রামগোপাল" নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন, সেই সময়ে ডি রোজিও ইংরাজী ও ইতিহাসের সহকারী শিক্ষকরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইনিই হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। তিনি সাহিত্য, নীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদিগের মধ্যে বক্তৃতা করিতেন ও ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করিতেন। এই সূত্রে য়্যাকাডেমিক্ য়্যাসোসিয়েসন (Academic Association) নামে একটি সম্মিলনী গঠিত হয়। ডি রোজিও ইহার সভাপতি হন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ; রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা ছিলেন, ও রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত যুবকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ভবিষ্যৎ ডেপুটি গভর্ণর মিষ্টার বার্ড, কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ন, গভর্ণর জেনারলের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্ণেল বেন্‌সেন, য়্যাডজুটেণ্ট জেনারল বীটসন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন।

বিলাতী খানা ও সুরাপান তখন কুসংস্কার ভঞ্জনের প্রধান উপায় ছিল; ডি রোজিওর ছাত্রদিগের মধ্যে এই দুইটির প্রচলন হইল। ছাত্রদিগের অভিভাবকেরা ভাবিয়াছিলেন যে, ডি রোজিও তাঁহাদের সন্তানদিগের মতিগতি বিপথগামী করিতেছে, সেইজন্য তাঁহারা ডি রোজিওকে কর্ম্ম ত্যাগ করাইতে বাধ্য করেন। কিন্তু গুরু ও শিষ্যদিগের মধ্যে যে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বিরল। এই সময়ে বিস্তর ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, রামগোপাল ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে যোসেফ নামক এক ইহুদির আফিসে তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠনঠনিয়ানিবাসী ভোলানাথ মিত্রের কন্যা প্যারীমোহিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

যোসেফের আফিসে থাকিতে থাকিতেই তিনি কুসুমফুল সংগ্রহ করিবার জন্য ঢাকা ও রেশম প্রভৃতির জন্য মেদিনীপুর গমন করেন। তখন নৌকাই বাঙ্গালা দেশে যাতায়াতের একমাত্র যান ছিল। পথে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পর যোসেফ তাঁহার হস্তে সমস্ত আফিসের কার্য্যভার দিয়া বিলাত গমন করেন। রামগোপাল যোসেফের ব্যবসার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন, ইহাতে যোসেফ বিশেষ আনন্দিত হন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে যোসেফ কেলসেলাকে অংশীদার গ্রহণ করেন। কিন্তু উভয় অংশীদার অচিরে পৃথক হইয়া উভয়ে ভিন্ন কুঠি খুলেন। উভয়েই রামগোপালকে লইতে ইচ্ছা করেন। তিনি কেলসেলের মুচ্ছুদ্দি হন। মতিলাল শীল ব্যবসা সূত্রে এই সময়ে কেলসেলের কুঠিতে যাতায়াত করিতেন। তিনি রামগোপালের কার্য্যপটুতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "রবার্ট" ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিবে। রামগোপাল তখন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে "রবার্ট" নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতি শনিবার হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক স্পীড্ সাহেবের নিকট হইতে শ্রুতিলিপি গ্রহণ করিতেন। য়্যাকাডেমিক য়্যাসোসিয়েসনের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। Epistolary Association, Circulating Library প্রভৃতি স্থাপন করিয়া লিপিলিখন ও পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনার যাহাতে সুবিধা হয় তৎবিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার" সৃষ্টিকল্পে তিনি ও আর চারিজন উৎসাহী যুবক একখানি অনুষ্ঠান পত্র স্বাক্ষর করিয়া সাধারণের সমক্ষে ইহার উদ্দেশ্য নিবেদন করেন। অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসনের সভ্যেরাই পরে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পথপ্রদর্শক হন।

এদিকে কেলসেলের মুচ্ছুদ্দিরূপে তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করেন। এই সময়ে তিনি পুরাতন ভিটার সংস্কার করিয়া বারমাসে তের কীর্ত্তির ব্যবস্থা করেন। গঙ্গার তীরে কামারহাটি কুঞ্জে বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আহারাদি ও আনন্দে অতিবাহিত করেন।

তিনি যে বৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করেন সেই বৎসরই "জ্ঞানান্বেষণ" পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক রাজা দক্ষিণারঞ্জন, শেষ সম্পাদক রামগোপাল। প্রথমে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয়, পরে উহা বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। Civis নাম স্বাক্ষরিত করিয়া তিনি ইহাতে রাজনৈতিক ও দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতেন। 'জ্ঞানান্বেষণের' পর Bengal Spectator নামে আর একখানি দ্বিভাষিক পত্র প্রচার করেন, কিন্তু উহা বেশীদিন চলে নাই।

শিক্ষা বিষয়ে নানা উপায়ে তিনি ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতেন; কাহাকেও পদক, কাহাকে বা পুস্তকাদি উপহার দিয়া ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন। একবার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত তিনি একটি সোনার ও আর একটি রূপার পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই পরীক্ষায় (মাইকেল) মধুসূদন দত্ত সোনার

ও ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রূপার পদক প্রাপ্ত হন। আর একবার কোন বিশেষ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য একটি ছাত্রকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছাত্রদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করেন ও কলেজ পুস্তকাগারে কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক উপহার দেন। এই দানের উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন শিক্ষা পরিষদ (Council of education) বড়লাটের প্রাপ্তি স্বীকার জ্ঞাপন করেন।

কেলসেলের আফিসে আসিয়া ক্রমশঃ তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন, নানা কার্য্যে তাঁহার যশ ও লাভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেলসেল তাঁহাকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া কেলসেল এণ্ড ঘোষ নাম দিয়া কার্য্য চালাইতে থাকেন। কিন্তু রামগোপালের স্বাধীন ব্যবসা করিবার ইচ্ছা চিরকাল অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি অচিরে তাঁহার ন্যায্য অংশ বুঝিয়া লইয়া কেলসেলের কুঠি ত্যাগ করেন। ত্যাগ করিবার সময়ে উভয়েই অশ্রু-বর্ষণ করেন, কেলসেল কতকগুলি উপহার দেন।

তাঁহার নূতন কুঠি খুলিতে কিন্তু অত্যন্ত দেরী হয়। তিনি ইতাবসরে ব্যারিষ্টার হইবার কল্পনা করেন কিন্তু অবশেষে সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার "লোটাস্" নামক লৌহের ষ্টিমারে করিয়া ল্যান্ডুর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসেন।]

জর্জ্জ টমসন ও রামগোপাল ; Chakrabartti Faction.

নবীন রাজনৈতিক দল যখন শিক্ষা ও দেশহিতৈষণার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত জর্জ্জ টমসন কলিকাতায় আগমন করেন। ইনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লিভারপুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে লইয়া লণ্ডন নগরে আগমন করেন। পিতার অবস্থা মন্দ ছিল বলিয়া টমসন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুবিধা পান নাই ; তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা নিজ চেষ্টায়। যৌবনে তিনি দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন ও সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আমেরিকায় গমন করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতহিতৈষী ক্ষুদ্র দলের সহিত মিলিত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাত যান ; তথায় অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ভারতীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের কিম্বদন্তীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ড ও ইউরোপে তাঁহাকে সকলে "প্রিন্স" বলিয়া অভিহিত করিত। ভারতবাসীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি জর্জ্জ টমসনকে সঙ্গে লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। টমসনের বক্তৃতায় একটি বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল, যাহারা শুনিত তাহারা উন্মাদিত হইয়া উঠিত। লর্ড ব্রুম (Brougham) তাঁহার বাগ্মিতার বিশেষ প্রশংসা করেন।

রামগোপালের মুদ্রিত* পত্রাবলীর মধ্যে ১৮৩৮ সালে ১২ই আগষ্ট তারিখে লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা অবগত হই যে, তিনি বিলাতে সাধারণ লোকদিগের নিকট ভারতবর্ষের রাজ-

* A general Biography of Bengal Celebrities by Ram Gopal Sanial, Vol 1. Published 1889.

নৈতিক অবস্থা জানাইবার জন্য, বিলাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম নামক এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। এই ব্যক্তির পুরা নাম Rev. William Adam. তিনি কোন খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই, তবে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নাম মরকত দ্বীপ বা আয়ারল্যাণ্ড। তিনি বিলাত হইতে বাজকসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছান। সুরাটে মিশন কার্য্যে তাঁহার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে কার্য্যের কোন স্থিরতা না থাকায় তিনি শ্রীরামপুরে মিশনারীদিগের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বাজক সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার মনে আদৌ সংকীর্ণতা স্থান পাইত না। রাজা রামমোহন রায় ইহাঁকেই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাজার চরমপত্রে অ্যাডাম এবং তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে ১৮৩৪ সালে যে অনুসন্ধান হয় ভারত গভর্ণমেণ্ট মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে তাঁহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অ্যাডামের বিবরণীতে তদানীন্তন সময়ের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। বিলাতে ফিরিয়া গিয়া ভারতের দাসত্ব প্রথার সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাডভোকেট (British India Advocate) নামক লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সাময়িক পত্রের সম্পাদকতা করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের মধ্যে 'Enquiry into the theories of History' নামক পুস্তক বিশেষ পরিচিত।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাডভোকেট পত্রে ভারতবাসীর সংগৃহীত স্বদেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য রামগোপাল চেষ্টা করেন। এ দেশীয়দিগের দ্বারা ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, ভারতবাসীর আবেদন নিবেদন সকলই কতকগুলি ইংরেজের কার্য্যমাত্র; ভারতবাসী তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিষয়ে উদাসীন। নবযুগের পাঠক ইহা বোধ হয় অনুমান করিতে পারিবেন না, আমরা তথা-কথিত কালা আইন শীর্ষক পরিচ্ছেদ এ বিষয়ে উল্লেখ করিব। তাঁহার উক্ত পত্রে উল্লিখিত কতকগুলি প্রস্তাবের নাম আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। পুলিসের প্রকৃত অবস্থা, আবকারী প্রথার উন্নতির উপায়, বাঙ্গালায় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধীয় অনিচ্ছার কারণ নির্দ্দেশ ও উন্নতির জন্য উৎসাহের উপায় উদ্ভাবন, লোক সংখ্যা, দেশের লোকের সুখ ও দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত বা হ্রাস হইতেছে ইহাদের কারণ নির্ণয়, সহর ও পল্লীগ্রামে হিন্দু ও মুসলমানদিগের নৈতিক উন্নতি বা অবনতির ফলাফল এবং সে ফল গভর্ণমেণ্টের কোন রাজনীতি বা ব্যবস্থা অনুসারে, বা জনসাধারণের প্রকৃতি বা অনুষ্ঠান অনুসারে সাধিত হইতেছে তাহার মীমাংসা, খৃষ্টান মিশনারীদিগের কার্য্যের প্রকৃত ফল ও এদেশবাসী তাহাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখে প্রভৃতি। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া উল্লিখিত বিলাতী পত্রে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি লিখেন যে আবেদন ও সাধারণ সভাগুলির

দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী ফল লাভ হয় না, তাহার কারণ এ সকলই কয়েকজন ইংরাজ আন্দোলনকারীর কার্য্য বলিয়া বিদিত। কিন্তু ইংলণ্ডবাসী যখন দেখিবে যে, ভারতবাসী আপনাদের কষ্ট মোচন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন বিলাতে সাধারণ অভিমত এবং সেই সঙ্গে পার্লামেণ্ট মহাসভার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া এমন একটি প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইবে যে তাহা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট তাচ্ছিল্য করিতে পারিবেন না। এরূপ যতদিন ঘটিতেছে না, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে উন্নতিজনক ব্যবস্থাদির আরম্ভ হইবে না। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে বিশ্বাস করিতেন, সেইজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এ বিষয়ে আরও অধিক লেখার আবশ্যক আছে কি?

"Petitions and Public meetings do not produce their desired effects, only because it is known to be doings of a few English agitators, but when they will see that the natives themselves are at work, seeking to be relieved from the grievances under which they labour, depend upon it, the attention of the British public and consequently of the Parliament will be awakened in such a manner that the reaction upon the local Govt. will be irresistible. We will then and not till then see active measures of amelioration put into operation. Need I say to convince you of the usefulness, nay the necessity of what is proposed to be done ?"

তিনি পূর্ব্ব হইতেই ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির নিমিত্ত পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণের অভিমত ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। সেই পার্লামেণ্টের সভ্য টমসন যখন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন, তখন রামগোপাল তাহা জানাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন টমসন কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত সোৎসাহে জাহাজে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এই নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়টি সাধারণ অধিবাসীদিগের মুখ্যপাত্রস্বরূপ ছিলেন, সেইজন্য টমসন প্রথমেই সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জনী সভায় আগমন করেন। এই সভার নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনের বক্তা বা প্রবন্ধপাঠককেও সভায় নিমন্ত্রিত কোন কোন ব্যক্তিকে সভাস্থ সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারী তারিখে এই সভার যে অধিবেশন হয় টমসন তাহাতে প্রথম উপস্থিত হন। এই অধিবেশনে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রবন্ধপাঠক ছিলেন, তিনিই সাহেবকে সকলের সহিত নিয়মানুমত পরিচয় করাইয়া দেন। টমসনের ন্যায় পার্লামেণ্টের সভ্য, সুবক্তা, রাজনীতিবিশারদ ও ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর আসেন নাই। তাঁহার তেজোপূর্ণ বক্তৃতায় ও সহৃদয়তায় নব্যবঙ্গের যুবকদল মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ডি রোজিওর শিষ্যেরা যাহা এতদিন চেষ্টা করিতেছিলেন, টমসন তাহাতে একটি মহতী শক্তি প্রদান করিয়া, সকলকেই উৎসাহিত করিলেন। রামগোপালের

আহ্বানে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে টমসন একটি বক্তৃতা করেন। পরে তিনি আরও কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বিলাতে ভারত সম্বন্ধে যথাযথ অভিমত গঠন করিবার জন্য রামগোপাল অ্যাডামকে নানাবিধ সংবাদ ও আপনা হইতে অর্থাদি প্রেরণ করিতেন; দূরস্থিত অ্যাডামকে লেখনীমুখে জ্ঞাপন করা অপেক্ষা নিকটস্থ টমসনকে স্বমুখে জ্ঞাপন করার অধিকতর সুযোগ তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইজন্য টমসন তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেন। নয় বৎসর বয়সে মিথ্যা বর-ঠকান প্রশ্নে কৌলবটির যে বাগ্মীর প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন তাহা তর্কসভার নানা বক্তৃতায় অনুশীলিত হইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে এই দলটি একটি নূতন নামে আখ্যাত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজ হলে "জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা"র একটি অধিবেশনে (রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালত ও পুলিসের তদানীন্তন অবস্থা (Present condition of the East India Company's courts of judicature and Police under the Bengal Presidency) শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন শাসননীতির কঠোর সমালোচনা করেন। জর্জ্জ টমসন ও হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধ যখন অর্দ্ধেক পড়া হইয়াছে তখন ক্যাপ্তেন সাহেব সেই সময়ে বিচলিত হইয়া উঠিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, যদিও রাজনৈতিক মতে তিনি একজন whig (উদার নৈতিক দলভুক্ত) তথাপি দক্ষিণারঞ্জন বাবুর প্রবন্ধ তিনি উদ্দাম বলিয়াই মনে করেন। বিশেষতঃ যে গভর্ণমেণ্ট হিন্দু কলেজ সৃষ্টি করিয়াছেন ও যাঁহারা সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা আদৌ উপযুক্ত নহে। তারপর তিনি বলেন যে, এই বিদ্যার মন্দির তিনি রাজদ্রোহের মন্ত্রণাগারে পরিণত হইতে দিবেন না। তারানাথ চক্রবর্ত্তী এই সভার সভাপতি ছিলেন, এই সময় তিনি বলেন যে, ক্যাপ্তেন সাহেবকে তাঁহাদের মধ্যে কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন মাত্র, সেজন্য তিনি তথায় আগন্তুকরূপে উপস্থিত আছেন। সুতরাং এ অধিবেশনে প্রতিবন্ধক করিবার বা কলেজ হল হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। হিন্দু কলেজ কমিটির নিকট হইতে তাঁহারা হলটি ব্যবহার করিবার যে অধিকার পাইয়াছেন তাহাতে ক্যাপ্তেন সাহেবের ব্যক্তিগত চেষ্টার কোন অংশই ছিল না। সুতরাং হল ব্যবহার করা-না-করা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ক্যাপ্তেন সাহেবের ব্যবহার তাঁহারা হিন্দু কলেজের কমিটিকে জানাইবেন, আর প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্টের কাছেও নিবেদন করিবেন, এই বলিয়া তিনি উক্ত সভার সভাপতিরূপে সাহেবকে তাঁহার মন্তব্যের প্রত্যাহার করিতে বলেন। প্রথমে তিনি ইহাতে রাজী হন নাই, পরে দক্ষিণারঞ্জন যখন তাঁহার অর্দ্ধ সমাপ্ত প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিলেন, তখন ক্যাপ্তেন সাহেব তাঁহার মন্তব্যের প্রত্যাহার করেন। এই সময়

হইতে "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" পত্রে এই সভার নাম Chakrabartty Faction বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে।

যাহা হউক ক্যাপ্তেন সাহেবের ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, সকলে একমত হইয়া সভাটিকে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগানে উঠাইয়া লইয়া যান। এই বাগানে ফেব্রুয়ারী মাসে যে তিনটি সভা হয়, তাহাতে লোকের জনতা অত্যন্ত অধিক হয়, শেষের দিন অনেকের ভিতরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ঘরের বাহিরে দাঁড়াইতে হয়। এই অধিবেশনে জর্জ্জ টমসন এ সভার একটি স্থায়ী অধিবেশনাগারের জন্য অনুরোধ করেন। ইহার পর আর একবার এইখানে সভার অধিবেশন হয়, ৬ই মার্চ্চ হইতে ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় দ্বারকানাথ গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর মিত্র মহাশয়ের ডিস্‌পেন্সারি-বাটী ভাড়া লইয়া ঐ স্থানে অধিবেশন হইতে আরম্ভ হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

রাজ যোগ

(১)

যিনি দেহে শ্বাস প্রশ্বাস আকর্ষণ বিকর্ষণ করচেন—তিনি "জীব"। যিনি, একটী ক্ষুদ্র দেহকে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করে বার্দ্ধক্যে পরিণত করচেন—তিনি "জীব"। যিনি আপন অখণ্ড স্বরূপ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সুখী হতে চান না—তিনি "জীব"। যিনি পরমাত্মার সহিত মিলন ব্যতীত কিছুতেই আনন্দ লাভ করেন না—তিনি "জীব"।

যিনি পার্থিব ভোগ্য বস্তু পেয়ে আনন্দ করেন, না পেয়ে দুঃখ করেন, নিরানন্দ হন—তিনি "জীব" নন—"মন"। যিনি রাগ করেন, হিংসা করেন, গর্ব্ব করেন, ঘৃণা করেন, লোভ করেন, কামোন্মত্ত হন—তিনি "জীব" নন—"মন"। যিনি শুচি অশুচি ভাবাপন্ন হন—তিনি "জীব" নন—"মন"। এই মন জীব সান্নিধ্য থেকে শক্তি লাভ করে—শান্তি অশান্তি সৃষ্টি করচে। আর যিনি "জীব"—তিনি তাঁর আপন অখণ্ড স্বরূপ, সেই অব্যক্তকে পাবার জন্য সদাই কাতর। হে গুরো! হে ভব পারাবারের কর্ণধার! তোমার কৃপা ব্যতীত তাঁকে জানতে পারা যায় না।

সৎগুরু কে? যিনি, সৎকে দেখিয়ে দেন, চিনিয়ে দেন, পরিচয় করিয়ে দেন। সৎগুরু "আনন্দব্রহ্ম"। হে গুরো! আমি "জীব"—আমি তোমায় ভূমি বিলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। তুমি আনন্দ স্বরূপ, জীবকে আনন্দ ধামে নিয়ে যেতে একমাত্র তুমিই সাথি। তোমার রাতুল চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত। জ্ঞানঘন মূর্ত্তি তুমি,—চিৎঘন মূর্ত্তি তুমি—আনন্দঘন মূর্ত্তি তুমি, আমি তোমায় মানসে পূজা করি। সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব ভাব তোমাতে নাই—তুমি গগন সদৃশ, সীমা শূন্য, তুমি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমভাবে আছ। তুমি স্থির,

অচঞ্চল, অবিকৃত, তুমি পুরাণ শাশ্বত। শ্রুতি "তত্ত্বমসি" তোমাকেই বলেন। তুমি ভাবাতীত, গুণাতীত, তুমি আপন মহিমায় অনন্ত বিভক্ত, হয়ে সর্ব্ব জীবের জীবন রূপে বিরাজ করচ। তোমা হতে আনন্দ-কণা ত্রিভুবনে অহর্নিশ ক্ষরিত হচ্চে। হে গুরো! হে আনন্দ ব্রহ্ম! তোমায় নমস্কার।

(২)

গীতোক্ত রাজযোগই সম্পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ। ইহাই জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে তার সকলগুলিই এই গীতা-কেন্দ্রের শাখা স্বরূপ। আপনারা যদি একটু বিচার বুদ্ধিপরায়ণ হয়ে শ্রীগীতা পাঠ করেন—তা হলে দেখবেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এই পূর্ণেরই অংশ বিশেষ। এই পূর্ণকে সম্পূর্ণ রূপে না দেখা পর্য্যন্ত পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ব্যস্ত। কিন্তু যিনি পূর্ণ,—তিনি পরম শান্ত। আজ শ্রীগীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্মটী আপনাদের সম্মুখে বিজ্ঞাপন করতে উদ্যত।

একবার এই বিশাল অনন্ত জগতের দিকে চেয়ে দেখুন—কি দেখবেন? যা কিছু সৃষ্ট বস্তু তার কোন না কোন ধর্ম্ম আছে। অনন্ত জড় রাশিরও ধর্ম্ম আছে, আবার অনন্ত চেতনেরও ধর্ম্ম আছে। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম তাঁর কোন ধর্ম্ম নাই—তিনি নিঃসঙ্গ—তিনি সৃষ্ট বস্তু নন। মায়ার শক্তি প্রভাবে এই জড় চেতনের সংমিশ্রণে অনাত্মার ধর্ম্মটী পরমাত্মায় অধ্যাস হয় মাত্র; ক্রমান্বয়ে এই অধ্যাস হয় বলে লোকে পরমাত্মাকে প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত জড়িত দেখে। পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ যিনি না জানেন—তিনিই, নিঃসঙ্গ পরমাত্মাকে ধর্ম্মী বলেন। যেমন একটী আর্শির সম্মুখে একটী জবাফুল থাকলে জবাফুলটী আর্শিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং আর্শি নির্লিপ্ত থাকলেও যেমন জবা ফুলের সহিত জড়িত বলে মনে হয় পরমাত্মায় অনাত্মার ধর্ম্মটী অধ্যাস হওয়ায় পরমাত্মাকে প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত জড়িত বলে অনুমিত হয় মাত্র।

বেদ উপনিষদ আদি সমস্ত গ্রন্থে দেখতে পাই যে, প্রাণের কম্পন হতেই এই বিশাল বিশ্ব রচিত হয়েচে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম"—শ্রুতি। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে কম্পন ব্যতীত কোন বস্তুরই সৃষ্টি হতে পারেনা। যদি দীপ্তিশালী অগাধ, অসীম, কিছু থাকে তা হতে কম্পনের মত কিছু উঠবেই উঠবে। উদাহারণ স্বরূপ ধর—এক এক খণ্ড বড় হীরক তা হতে যে ঝলক উত্থিত হয়—দেখলেই মনে হয়, যেন, একটী কম্পনবিশিষ্ট ঝলক উত্থিত হচ্চে। সেইরূপ সেই অসীম, অগাধ অচঞ্চল পরম শান্ত নীলমণি হতে যে কোটী সূর্য্য সমপ্রভ ঝলক কম্পন উঠার মত এক প্রকার বোধ হয় তা হতেই এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েচে—তিনিই সেই ব্রহ্মশক্তি বা প্রাণ।

জগতের জীবের দিকে চেয়ে দেখুন—তারা এই মায়িক কম্পনের ফলস্বরূপ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই কয় বিষয় লয়েই উন্মত্ত। ভগবান গীতায় দেখাচ্চেন যে, এমন কার্য্য-প্রণালী

আছে—যার দ্বারা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই সাধারণ কর্ম্মকে জীব আপন বসে আনতে পারে।

এই গ্রন্থেই প্রমাণ সহ দেখিয়েছি যে, মানুষের মূল শক্তি স্থান একটী—মূলাধারে প্রাণ শক্তি। এই প্রাণ শক্তিই জীবদেহে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন রূপে প্রকাশিত হচ্চে—এই ত্রিশক্তিকে চালনা করে, মূলাধারস্থিত প্রাণ শক্তির সহিত মিলিত করে, সেই পরম কারুণিক, অচঞ্চল, পরম শান্ত, স্থির স্বরূপ পরব্রহ্মে সংরক্ষিত করাই শ্রীগীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। কারণ জগতের প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু এমনকি এই জগৎটাই সর্ব্বদা পরিণামশীল—চঞ্চল। "মন"ও স্বভাবতঃ চঞ্চল—চঞ্চল, চঞ্চলের সহিত যুক্ত হলে কখনও স্থির হাতে পারেনা, বরং চঞ্চলতার বৃদ্ধিই হয়ে থাকে। ব্রহ্মই একমাত্র স্থির বস্তু—অতএব সিদ্ধগুরু কৃপায়, ব্রহ্মকে দেখে জেনে তাতে চঞ্চল মনকে সংযোগ করলে স্থিরতা লাভ করা যায়। ইহা ব্যতীত স্থির করবার আর কোন উপায় নাই।

আত্মজ্ঞানহীনতার নামই—"মৃত্যু"—এই মৃত্যুই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপে মনের ঠিক উপরেই অহঙ্কারের (তমের) মধ্যে বাস করে। যে কার্য্যপ্রণালীদ্বারা এই মৃত্যুকে জয় করা যায় তার নাম রাজযোগ। মৃত্যুঞ্জয় হওয়াই গীতোক্ত ধর্ম্ম।

(১) শ্রীগুরু কৃপায় জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দেখে জানার নাম জ্ঞান।

(২) যে উপায়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করা হয় তার নাম যোগ।

(৩) জানার পর মন যখন সর্ব্বশক্তির আধার সেই বিরাটকে ছাখে, তখন মনের মধ্যে এক প্রকার ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম ভাবের উদয় হয়—তার নাম ভক্তি।

(৪) সেই ভক্তি যখন পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মন গলে যায়—তার নাম প্রেম। মহাত্মা রজনীকান্ত সেনের একটী গান ঠাকুর প্রায়ই গেয়ে থাকেন :—

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে।
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হলে ॥
অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মত
কল কলে অবিরত জয় জগদীশ বলে,—
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে মোহ পাড়ি ভাঙ্ সমূলে,
চেওনা কোন কূলে শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে ॥
সে জলে নাইবে যারা থাকবেনা মৃত্যু জরা
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে।
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে
তাদের টেনে নে যাও একেবারে
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও সেই পরিমাণ সিন্ধু জলে ॥

(৫) এই জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও প্রেমে মন যখন মাতোয়ারা হয়ে উঠে—তখন সে দেখে ভগবান কি করে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করচেন—অর্থাৎ সৃষ্টি কোথা হতে এল, কোথায় আছে এবং প্রলয়ান্তে কোথায় যাবে, এবং এই সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে ও বাহিরে তাঁহার অবস্থিতি অথচ তিনি নির্লিপ্ত—তার নাম বিজ্ঞান।

এই অখণ্ডই রাজ যোগের সাধ্য বস্তু—ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, ইনিই সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য, অনন্ত, অচঞ্চল, অগাধ পরম শান্ত। ইনিই সকল বস্তুর সকল জীবের ভিতর বাহির এক করে মহাসমুদ্রের মত অবস্থিত ; তাই যোগী অষ্টাবক্র বল্‌ছেন—

"একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহির্বস্তর্যথা ঘটে ॥
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে গণে তথা ॥"

যিনি অব্যক্ত তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম—আর যিনি সকল সময় আপনাতে আপনি থেকেও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। এই সগুণ ব্রহ্মই বহুভাগে বিভক্ত হয়ে প্রাণ বা জীবাত্মা নামে প্রতিভাত হন।

এখন আমরা দেখলাম, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ চঞ্চলতাহীন, পরম শান্ত—তিনি ব্রহ্ম। আর যিনি কম্পনশীলা—তিনি শক্তি।

যিনি ব্রহ্ম—তিনি স্থিতি, জ্ঞান,
যিনি শক্তি—তিনি গতি, অজ্ঞান।

শ্রীগীতার সাধন এই গতি হতে পরম স্থিতিতে যাওয়া। কিন্তু তোমরা হয়ত বলতে পার, স্থিতিতে গতি কিরূপে সম্ভব ? জ্ঞানে অজ্ঞান থাকা কিরূপে সম্ভব ? যিনি এই সকলের হেতু, যিনি অনন্ত শক্তিমান তাঁতে সকলি সম্ভব। তাই বেদ শক্তিকে ইন্দ্রজাল কুহক বা মায়া বলেন।

যিনি ব্রহ্ম তিনি আপন মহিমায় শক্তির কুহককে নিবৃত্ত করে সর্ব্বদাই অধিকৃত অবস্থায় অবস্থিত।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্ সত্যং পরম ধীমহি।"

এই গীতোক্ত সাধ্যবস্তুকে পাবার যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তারই নাম রাজযোগ।

(৩)

এই সেই পবিত্র ভারতভূমি—যেখানে জ্ঞানের আলোক সর্ব্ব প্রথম উদিত হয়েছিল ; এই সেই পবিত্র ভারত ভূমি—ব্রহ্মজ্ঞান যাকে নিজ আবাস ভূমি বলে আলিঙ্গন করেছিল ; এই সেই পবিত্র ভারতভূমি—যেখানে বিশাল অভ্রভেদী হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হয়ে ভারতের চির জ্ঞান সমুন্নত শির উন্নত রেখেচে, যার স্নেহ অঙ্কে বসে সিদ্ধ, তপস্বী, মুনি, ঋষি, যোগিগণ প্রভৃতির তত্ত্বমসি নিনাদে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করেছিলেন। এই সেই পবিত্র ভারত ভূমি—যে স্থান সেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণের চরণ ধূলিতে সঞ্জীবিত। এই সেই পবিত্র ভারত ভূমি—যেখানে অন্তর্জগৎ রহস্য

উদ্ঘটনের প্রথম চেষ্টা হয়েছিল। এই সেই পবিত্র ভারতভূমি—যেখানে মানব মন আত্ম স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হয়েছিল। এই সেই পবিত্র ভারতভূমি—ধর্ম্ম ও দর্শনের কেন্দ্রস্থল—যেখান হ'তে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ উত্থিত হয়ে সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত করেছিল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের মূল বীজ যাতে নিহিত আছে, সেই অনাদিকালসিদ্ধ অপৌরুষেয় বাণী-স্বরূপিণী শ্রুতি মাতার ন্যায় যে ভারতকে কল্যাণ পথ দেখিয়ে থাকেন—যে ভারতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বৃষকেতু আদি বালক, যে ভারতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি কুলাঙ্গনা, যে ভারতে জনকাদি গৃহস্থ, যে ভারতে শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি রাজা; যে ভারতে বেদব্যাস বাল্মিকী আদি গ্রন্থ রচয়িতা; যে ভারতে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল আদি বক্তা; যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণ বশিষ্টাদি উপদেষ্টা; যে ভারতে সিদ্ধ সংকল্প শুকদেব তপস্বী—আজ সেই ভারত জ্ঞানহীন। সে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মিলিত শিক্ষা কই? আজ কালকার যা শিক্ষা তাতে মানুষ গড়া হয় না, হয় ভাঙ্গা,—আর প্রাচীন শিক্ষায় মানুষকে ভাঙ্গা হত না, হত গড়া। সে শিক্ষায় মানুষ প্রকৃত জ্ঞানী হত, মানুষ হত, আর আজকালকার শিক্ষায় কতকগুলি কথার ঝুড়ি পুঁজি ছাড়া আর কিছুই হয় না। কতকগুলি কথা শিখলে যদি জ্ঞানী হত, ঋষি হত, তাহলে বড় বড় লাইব্রেরী, বড় বড় অভিধান প্রভৃতি জ্ঞানী ও ঋষি হত। গ্রন্থকীট হলে যদি দার্শনিক হওয়া যেত, তাহলে সে রূপ দার্শনিক বহু আছে; পুঁথি মুখস্ত করা আর পুঁথিতে লিখিত বিষয় একই কথা।

যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তুচন্দনস্য ॥

চন্দন ভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই বোঝে, গুণ বুঝতে পারে না, তদ্রূপ তোতা পাখীর মত মুখস্ত বিদ্যায় কোন ফলোদয় হয় না। যদি বেদের প্রকৃত রহস্য বোধ না হল যদি উপনিষদের প্রকৃত তত্ত্ব বোধ না হল, যদি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে উহার প্রকৃত অর্থবোধ না হল—তখন সে পড়ায় না পড়ায় সমান কথা। পণ্ডিত বলি কাকে, যাঁর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আছে—অর্থাৎ প্রকৃত বেদরহস্য যিনি জানেন। পুথি পড়া বিদ্যা দেখলে আমার মনে হয়—

"বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥"

পণ্ডিতগণ আমাদের জন্য নানা প্রকার বাক্য বিন্যাসের দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, মুক্তির জন্য নয়, কারণ তাঁরা মুক্তির স্বরূপ জানেন না। তাঁদের দ্বারা জগতের কোন উপকার হতে পারে না। যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার এই চরাচর বিশ্ব ব্যেপে অবস্থিত সেই পরম পুরুষকে দেখিয়ে দেন, চিনিয়ে দেন, তিনিই প্রকৃত বেদরহস্যবিদ্, উপনিষদ তত্ত্বজ্ঞ।

এই বেদ বা উপনিষদের ভাষ্য বোঝা বড় কঠিন। কারণ, নানা ভাষ্যকার নানা প্রকার মতের উপর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন—অতঃপর যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা সেই স্বেচ্ছাধৃত

বিগ্রহ গোবিন্দ নিজে আবির্ভূত হয়ে গীতা প্রচার দ্বারা দুর্ব্বোধ্য শ্রুতির অর্থ বুঝালেন ;—শ্রীগীতাই বেদের জীবন্ত ভাষ্য। ভারত আধ্যাত্মিক জ্ঞানরত্নে চিরকালই ধনী ছিল, আজই বা তা না হয় কেন ? ভারতের রত্ন ভারতেই বিতরিত হউক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই সব ব্যাখ্যাতাগণ ভগবানের বাক্যের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু শ্রীগীতায় শ্রুতির তাৎপর্য্য এরূপভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি যাতে করে কলহ সৃজন করে।

ভগবান বল্‌ছেন, এ সব সত্য জীবাত্মা ধীরে ধীরে জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করে, তাঁর চরম লক্ষ্য সেই পূর্ণের দিকে অগ্রসর হচ্চে। এমন কি কর্ম্মকাণ্ডরূপ স্থূল সোপান গীতায় বিবৃত হয়েচে—উহা সত্য, মূর্ত্তি পূজাও সত্য এমন কি সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপও সত্য। গীতার উপদেশের লক্ষ্য চিত্ত শুদ্ধি ; যদি মন পবিত্র হয়, শুদ্ধ হয়, কপটতাশূন্য হয়, তবেই মূর্ত্তি পূজা বা অন্যান্য ক্রিয়া সত্য হয়। মন যখন অকপট হয় তখন হয় শুদ্ধ—সেই শুদ্ধ মনে, সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মা স্ব-মহিমায় প্রতিভাত হন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য
ন মেধয়া ন বহুনা, শ্রুতেন।

অনেক বাক্য ব্যয়ের দ্বারা, অথবা বুদ্ধিবলে বা বহু শাস্ত্র পাঠ করে আত্মাকে জানা যায় না। এই আত্মাকে জান্‌তে হলে সৎগুরুর কৃপা চাই। বিনা গুরু কৃপা এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করতে পারা যায় না। এই সৎচিৎ আনন্দঘন জ্ঞান গুরু হ'তে শিষ্যে সংক্রামিত হয়। বিনা আত্মজ্ঞান বেদের প্রকৃত রহস্য বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হ'লে আমাদের চাই কি ?

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥"

আমাদের চাই—মনুষ্যত্ব—মানুষ জন্ম, কারণ মানব দেহই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। তারপর চাই মুমুক্ষুত্ব, মোক্ষের জন্য এই সুখ দুঃখের বাহিরে যাবার প্রবল ইচ্ছা। যখন ভগবানের জন্য এই প্রবল ব্যাকুলতা হবে, তখনই তুমি জানবে তুমি ভগবানকে পাবার প্রকৃত অধিকারী হয়েছ। তারপর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়—গুরুলাভ, অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক। তবে কাকে তুমি গুরু করবে ?

"শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥"

যিনি বেদের রহস্যবিদ্, যিনি অবৃজিন নিষ্পাপ, অকামহত যিনি অহেতুকী দয়াসিন্ধু—অর্থাৎ যিনি কোনরূপ লাভের বা যশের প্রত্যাশা না রেখে অপরকে ত্রাণ করেন, যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ

ভাবে জানেন, যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ দেখেছেন ও শিষ্যকেও দেখাতে পারেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য তিনিই বেদরহস্তবিদ্।

যিনি বেদ পড়াবেন তিনি শিষ্যকে সেই অতীন্দ্রিয় অনন্ত সত্বাকে দেখাচেন—তাকে অনুভব করবার শক্তি দেবেন যাকে—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

সত্য সত্যই সূর্য্য প্রকাশ করতে পারে না—সূর্য্যই তাঁহতে আলোক পেয়ে তবে পৃথিবীতে আলো দিচ্ছেন—চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি এরাও তাঁ হ'তে আলোক পায়, তাঁর দীপ্তিতেই সকলই দীপ্তি পাইতেছে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগগচ্ছতি ॥"

মন সেখানে যেতে পারে না কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে আসে; বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে অক্ষম—তাইত বলি দর্শনশূন্য দর্শনশাস্ত্র পাঠের প্রত্যক্ষ অনুভুতিশূন্য বেদ উপনিষদ পাঠের সার্থকতা কি? উপনিষদ বলচেন—"ঈশাবাস্তমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ"। ঈশ্বর দিয়ে সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর—যিনি ঈশ্বরকে না দেখেচেন তিনি এর প্রকৃত অর্থ কি বুঝবেন? আমি তাঁদের বলি আপনাদের পাঠের স্বার্থকতা করুন——

"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ"।

বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করুন, একমাত্র আত্মাকে অবগত হন; এই আত্মাকে অবগত হলে আপনাতে শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, সাধুত্ব আসবে, পবিত্রতা আসবে—তখন বেদ, উপনিষদ, গীতার, প্রকৃত অর্থ বোধ হবে।

"সমং সর্ব্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং
বিননাৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং ॥"

তখন আপনিই সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে বিনাশশীল সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত দেখবেন, ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করে হিংসা বর্জ্জিত হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হবেন।

শ্রীনির্ম্মলানন্দ স্বামী

অসুন্দর

মন সুন্দরের দিকে ফিরে ফিরে চায় অসুন্দরের দিক থেকে বারে বারে সরে আসে এই জানা কথা বেশি করে জানানো নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যারি থেকে মন সরে পড়তে চায় তাই অসুন্দর নাও হতে পারে--হয়তো আমাদের নিজের দেখার ভুলে চোখের সামনে থাকতে সুন্দরকে চিনতে পারলেম না এমনো হওয়া বিচিত্র নয়। সুন্দরে অসুন্দরে একটা পরিষ্কার ভেদাভেদ নির্ণয় করে দেওয়া কঠিন ব্যক্তিগত রুচি ও অরুচির হিসেবে দেখে চল্লে।

বাইরে থেকে মনের মধ্যে সুন্দর যে পথে আসছে অসুন্দরও সেই পথ ধরেই আনা গোনা করছে—বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগে আবার বসন্ত রোগ সেও গায়ে লাগে—দুয়ের বেলাতেই শরীরে কাঁটাও দিয়ে ওঠে, কিন্তু মন বিচার করে বলে এটা সুন্দর ওটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী। দাঁতের বেদনা সুন্দর অবস্থা কেউ বলে না এখানে ব্যক্তিগত রুচি নিয়ে কথাই উঠে না, কিন্তু দাঁত গুলি কেমন তার বেলা রুচিভেদে তর্ক ওঠে।

চলিত কথায় মনের উপরে সুন্দর অসুন্দরের ক্রিয়া ভারি সহজে বোঝানো হয়েছে—সুন্দরের বেলায় বলা হল—জিনিষটি কি মানুষটি মনে ধরলো, আর অসুন্দরের বেলায় বল্লেম—মনে ধরলো না! প্রথমে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় পরে মনের বিষয় হয়ে মনে রয়ে গেল সুন্দর, অসুন্দর বাইরের বিষয় হল কিন্তু মনে তার স্থান হল না, পরিত্যক্ত হল মন থেকে অসুন্দর, মন মনে রাখতে চাইলে না অসুন্দরকে, এই হ'ল নিয়ম।

মনের প্রহরী পাঁচ ইন্দ্রিয় সুতরাং প্রহরীর ভুলে অনেক সময় সুন্দর দরজা থেকে ফিরে যায় আর অসুন্দর চলে যায় সোজা বাসর ঘরে! এটা ঘটতে দেখা গেছে—দরোয়ান দূর করে দিলে পরম বন্ধুকে আর সোজা পথ ছেড়ে দিলে চাঁদা ওয়ালাকে!

"হীরা হিরাইলরা কিঁচড়মে।"

হীরা কাদার মধ্যে হারিয়ে রইলো চোখে পড়লো ঝক্‌মকে কাঁচটা এমন ঘটনাও ঘটে তো? এবং যাই ঝক্‌ঝকে তাই সোনা নয়—একথাও বলতে হয়েছে রসিকদের যারা সুন্দরের সম্বন্ধে অন্ধ রইলো তাদের শুনিয়ে।

অসুন্দরের মধ্যে একটা ভাণ থাকে, সুন্দরের কোনরূপ ভাণ থাকে না এইটে লক্ষ্য করা গেছে। মিথ্যার আবরণে অসুন্দর নিজেকে আচ্ছাদন করে আসে, সুন্দর আসে অনাবৃত—সত্যের উপরে তার প্রতিষ্ঠা।

আর্ট যা তা সুন্দর ও সত্য ভাণ যা যা তা অসুন্দর এবং অসত্য। আর্ট বস্তুর ও ভাবের সত্যটাই প্রকাশ করে যা ভান তা শুধু বাহিরের জিনিষটা দিয়ে ধোঁকা দিয়ে যায়, এই জন্যে একে

বলি সুন্দর অন্যকে বলি অসুন্দর, একেকে বলি সত্য অন্যকে বলি অসত্য। এমনি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে নানা মতামত রয়েছে দেখা যায়।

মতামত জিনিষটা সময়ে সময়ে খুব কাযে লাগে কিন্তু তার একটা দোষও আছে সে দুর্গ-প্রাকারের মতো ভারি শক্ত বস্তু এবং ভারি সীমাবদ্ধ করে দেখায়, সুন্দর অসুন্দর সব জিনিষকে, মতগুলো ছোট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করে দেখায় বলেই মন সেখানে গিয়ে ধাক্কা খায়। তর্ক সৃজনের বেলায় মতামত কাযে আসে রস সৃষ্টি সুন্দর কিন্তু সৃষ্টির বেলা মত ধরে চল্লে চলে না। অসুন্দর ধোঁকা দেয়, অসুন্দর ভ্রান্তি জন্মায়, অসুন্দর অমঙ্গলের কারণ ইত্যাদি প্রচলিত মত সত্বেও আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে 'সন্দেহালঙ্কার' এবং 'ভ্রান্তিমৎ অলঙ্কার' দুটি অলঙ্কারের উল্লেখ রয়েছে—চলিত কথায় যার নাম ধোঁকা দেওয়া এবং উল্টো বুঝিয়ে দেওয়া—মতামত ধরে চল্লে এর মধ্যে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল তিনের একটিও থাকতে পারে না—কিন্তু আর্ট যার গোড়ার কথা হল সুন্দরকে দেখা ও দেখানো তার সব উপকরণ প্রকরণ ভ্রান্তি উৎপাদন করেই চলেছে। মায়াপুরী সৃজন করে চলেছে সুর দিয়ে কথা দিয়ে রং দিয়ে, নশ্বরে করছে অবিনশ্বরের আরোপ! খুব পাকা যাদু-করের চেয়ে আর্ট বেশি ভ্রান্তির সৃজন করছে—বিনা বীজে গাছ ফুল পাতা ফুটিয়ে ধরছে, চাঁদকে করে দিচ্ছে মানুষ, মানুষকে করে দিচ্ছে চাঁদ! সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের পক্ষে যেগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাধা তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার সিঁদ দিচ্ছে এরা মতামতের দেয়ালে যে কাঠিটি দিয়ে তার মুখে কালির মতো লেগে আছে এই মতবিরুদ্ধ যা কিছু তা!

ছেলে একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলতে বসেছে সত্যিকার ঘোড়ার রং চং গড়ন পিটন সমস্তই এখানে বাদ প'ড়ে গেল অথচ ছেলে বুড়ো সবাই দেখছে সেটিকে নিছক, সুন্দর। ছেলে ঘোড়াটা পেয়ে খেলছে সংসারের জিনিষ নয়-ছয় করছেনা হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গছেনা এটাকে বলতে পারি ঘোড়াটি মঙ্গলের কারণ কিন্তু সত্য তাকে তো ঘোড়ার মধ্যে কোথাও ধরা যাচ্ছে না, ছেলের কাছে যে সেটা সত্যি ঘোড়া তারও প্রমাণ পাচ্ছিনে কেননা শুনছি ছেলেই দিচ্ছে খেলনাটার নাম 'বাঘামামা'! মতের বাঁধন অস্বীকার করে খেলার ঘোড়া অসুন্দর হল না সুন্দরই ঠেকলো ছেলেরও ঠাকুরদাদার চোখে।

সুন্দর সে শুধু শুধুই সুন্দর এ কারণে সে কারণে সুন্দর নয় এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি অসুন্দর সে অসুন্দর বলেই অসুন্দর।

"নরা গজা বিশে শয়
তার অর্দ্ধ বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা
তার অর্দ্ধ বরা পাগলা।"

এর মধ্যে সত্য অনেক খানি রয়েছে—মঙ্গলের কারণও এটার মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যমান কিন্তু সুন্দর কবিতা তো এটা হ'ল না।

দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি কুড়ি সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বারো, শুক্র শনি চৌদ্দ তেরো।
হাঁচি জেঠি প'ড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।

পূর্ণ মঙ্গলের আবির্ভাব এখানে এ কথা অস্বীকার করতে চাইনে, সত্যও আছে ধরে নিলেম কিন্তু সুন্দর তাঁর তো দেখা নেই বলতে হল।

এইবার একটি সুন্দর বচন শোনাই—

"ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা
উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা।

উষার সহজসুন্দর বর্ণনা, এর মধ্যে কতটা সত্য কতটা মঙ্গল এসব মাপতে গেলে এর রস ভঙ্গ হয়। বেদেতেও উষার বর্ণনা আছে, সে আর এক ভাবের সুন্দর অথচ এই খনার বচনের মধ্যে যেমন উষা কতক সত্য ঘটনা ধরে বর্ণনা করা হল ঠিক তেমন ভাবে ঋষিরা উষার বর্ণনা করলেন না, সেখানে সত্য ও কল্পনা মিলে মিশে সুন্দর হয়ে দেখা দিলে। সুতরাং মতামত তর্ক-বিতর্ক করে সুন্দর অসুন্দরের ধারণা হওয়া আমার তো মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার। ফোটা ফুল গন্ধ নিয়ে সুন্দর, না তার পাপড়িগুলির যথাযথ বিন্যাসটি নিয়ে না তার ফোটার আস্তস্ত রহস্য দিয়ে সুন্দর এ তর্কের তো শেষ নেই যাকে বলতে চাই অসুন্দর তার বেলাতেও এই কথা ওঠে কেন অসুন্দর।

দীপশিখা সে যেমন ভয়ঙ্কর সত্য তেমনি ভয়ঙ্কর সুন্দর কিন্তু যেখানে সে ছেলের হাত পোড়ালে ঘরে আগুন ধরালে সেখানে সুন্দর বলে গৃহস্থ তাকে মনে করলে না। শান্তিনিকেতনে এমনি একটা লঙ্কাকাণ্ড দেখে আমার একটী ছাত্র এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একটি চমৎকার সুন্দর ছবি পরদিনের ডাকেই আমার কাছে এসে পড়েছিল। যদি আর্টিষ্টের নিজের ঘরে এই কাণ্ডটা ঘটতো তবে তিনি নিশ্চয় সুন্দর দেখতেন না অগ্নিকাণ্ডটি। এখানে দেখলেন সুন্দর তিনি অমঙ্গলের রাজবেশ ধরে দেখা দিলেন আর্টিষ্টকে, আর এ কথাওতো মিথ্যা নয় এই 'রাজবৎ উদ্ধত দ্যুতি' অগ্নিশিখাগুলি তার কাছে সে রাত্রে ভারি অসুন্দর ঠেকেছিল যার ঘর দ্বার পুড়ে ছাই হচ্ছিল। একের পক্ষে যা অসুন্দর হল তার স্বার্থে ঘা দিচ্ছে বলে অন্যের পক্ষে তাই সুন্দর হয়ে দেখা দিলে স্বার্থে ঘা দিলে না বলে, অগ্নিকাণ্ডের ছবিখানা কিন্তু এই দুই মানসিক অবস্থার বাহিরের জিনিষ

হয়ে তবেই সুন্দর ছবি হল যাদের ঘর পুড়লো যাদের ঘর নাও পুড়লো তাদের কাছে। প্রকৃতির মধ্যে আসল ঘর পোড়ার সময়ের যে অমঙ্গলের আশঙ্কা মনকে বিমুখ করছিল ছবির অগ্নিশিখার লেলিহান উজ্জ্বল ছন্দটি থেকে সেটি বাদ গেল রইলো শুধু দৃশ্যটির সৌন্দর্য্য ও রস কাজেই সুন্দর ঠেকলো ছবিটি। এইভাবে আর একটি সত্য জবাই করা মোরগের ছবি ভয়ঙ্কর সত্যরূপে এঁকে এনেছিল আমার সামনে আমার আর এক ছাত্র। ভারি বিশ্রী ঠেক্‌লো সে ছবি, আমার সইলো না মনেও ধরলো না চোখের কাছে এসেই ঠিকরে পড়লো মাটিতে অত্যন্ত ঠিক ছবিটা—। এখন যদি বলা যায় এ ছবি নিশ্চয় সুন্দর ঠেকবে অন্যের কাছে এর জবাব কি দেবো ?—হাঁ সুন্দর ঠেকবে এই কথাই বলতে হবে না কি ? আমাকে যে ভাবে ছবিটা পীড়া দিলে সে ভাবে অন্যকে দুঃখ দিতে নাও পারে সুতরাং আমার অসুন্দর অন্যের সুন্দর এটা বলা চল্লো।

বিশ্বের কতকগুলো জিনিষকে মানুষের মন বিনা তর্কে সুন্দর বলে মেনে নিয়েছে কতকগুলো জিনিষকে বলে গিয়েছে অসুন্দর। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কতক জিনিষ সুন্দর বলে প্রশংসা পেয়েছে কতক জিনিষ এ পরীক্ষায় এখনো উত্তীর্ণ হয়নি সেগুলো রয়ে গেছে অসুন্দর। হয়তো দেখবো এই সব অসুন্দর হঠাৎ একদিন পরীক্ষা পাস হয়ে গেছে—ওস্তাদের এবং কারিগরের হাতে পড়ে তারা সুন্দর হ'য়ে উঠেছে—ধূলো মুঠো হয়ে গেছে সোনা মুঠো !

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে দুটি তিনটি কারিগর রয়েছে এক ওস্তাদের তাঁবেদার, তারা সকালে আসে সন্ধ্যায় আসে দিনে আসে রাতে আসে আলো অন্ধকারের অধিবাসের ডালা নানা সাজসজ্জার উপকরণে ভরে নিয়ে সৃষ্টির জিনিষকে নূতন নূতন সুন্দর সাজে সাজিয়ে চলাই তাদের কায। কোনদিন অবেলায় আফিস ঘরে চুপিচুপি ঢুকে দেখলে দেখা যায়—সেখানে এসেও এই কারিগর কজন অতি অসুন্দর দোয়াত কলম খাতাপত্র টেবেল আর চেয়ার এমন কি বেহারার ঝাড়নটাকে পর্য্যন্ত চমৎকার আলো নয়তো চমৎকার ছায়া দিয়ে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দিয়ে গেছে সেই আলো অন্ধকারের রহস্য, তার মাঝে কাল যে হতভাগা রকমের বেরাল ছানাটাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেম সে এসে ঘুমিয়ে আছে অপূর্ব্ব সাজ ধরে রূপ কথার বেরাল-রাজকন্যাটির মতো।

যার মধ্যে দিয়ে কোনো রহস্য গতাগতি করছেনা যার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য পলকে পলকে বদল ঘটাচ্ছেনা এমন জিনিষ যদি কোথাও থাকে ত সেইটিই অসুন্দর একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। যা চরিত্র-বিহীন তা অসুন্দর। চরিত্র বিষয়ে একেবারে নিঃস্ব এমন কি জিনিষ আছে তা খুঁজে পাইনে, এটুকু বলা যায় যা তার চারিদিকের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের স্বাদ দেয় না কোন—কটু কি মধু—তাই আমাদের কাছে থেকেও নেই ! বিস্বাদ যা তারও একটা স্বাদ আছে, যার চরিত্র নেই একেবারেই যা কোন স্বাদই দেয়না এমন কিছু থাকেতো তাকেই বলি অসুন্দর। এর চেয়ে পরিষ্কারভাবে অসুন্দরকে দেখানোই শক্ত, কেননা জগতে সুন্দর অসুন্দর একটা পরিষ্কার ব্যবধান নিয়ে বর্ত্তমান নেই, সুন্দরে অসুন্দরে মিলে এখানে লীলা চলেছে দেখি।

যার কোনো শ্রী নেই তা বিশ্রী এটা ভারি সহজ কথা, কিন্তু একেবারে চরিত্রহীন স্বাদহীন

শ্রীহীন তাকে কোথায় খুঁজে পাই তাকি কেউ বলে দিতে পারে ? আমি কিছুদিন আগে অসুখে পড়ে আবার আস্তে আস্তে সেরে উঠলেম, সেই সময়ে আমার এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বন্ধু এসে আমার কায কর্ম্ম ছবি আঁকা বই লেখা. গান বাজনা গল্প গুজব সমস্ত বন্ধ করে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন বিস্বাদ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে উপদেশ দিলেন শুনে আমার বুকের রক্ত তার সব রং হারিয়ে হোমিওপ্যাথি অষুধের একটি কোঁটাতে পরিণত হবার যোগাড় হল দেখলেম ভারি বিশ্রী সেই মনের অবস্থা—এর চেয়ে অসুন্দর কোনো কিছুকে বোধ করিনি আর কোনো দিন।

এই ভাবের অবিচিত্র জীবনযাত্রা অনেক মানুষকে যে নির্ব্বাহ করতে হচ্ছে না তা নয়। একটা কায করতে করতে কায করার স্বাদ ক্রমে ক্ষয় হয়ে গেল তখন কলের মতো কায করে চল্লো জীবন্ত মানুষ—আফিসে যায় সংসারের ভার বয় ছবি কবিতাও লেখে কিন্তু কোন কিছুরই স্বাদ পায় না মন রসনা! ছেলেগুলো নিত্য পাঠশালায় যে যেতে চায় না তার কারণ পড়তে যাওয়া আসার সঙ্গে পড়ারও স্বাদ পাচ্ছে না ছেলেগুলি সেই সময়ে তাদের মন উড়ু উড়ু করতে থাকলো এমন যে দেবতার কাছে নানা অসুন্দর ও অশুভ কামনা জানায়—নিজে হঠাৎ বুড়ো হোক, বুড়ো মাষ্টার হঠাৎ মরুক ইত্যাদি ইত্যাদি—যে কটি অসুন্দরকে দেখে বুদ্ধদেবও ডরিয়েছিলেন, তাদের ভারি সুন্দর দেখলে ছেলেগুলি। শুভ যা তা সুন্দর অশুভ যা তা অসুন্দর, এমনি একটা মত আছে। যখন দেখছি কোন একটি পতঙ্গের কাছে রাত্রির অন্ধকার ভাল ঠেকলোনা সে গিয়ে আত্মবিসর্জ্জন করলে আগুনের কাছে দুঃখ করে বলি সে আগুন পোড়ায়নি কিন্তু সোনার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিয়েছিল তার দুখানি ডানা প্রেমের সেই অগ্নিশিখা নয় সে যে সুন্দর অগ্নিশিখা এযে অসুন্দর মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা সেটা বোঝারও সময় পেলে না পতঙ্গটি এমনি হতভাগ্য ; কিন্তু সতী দাহর বেলায় একথা কোনোদিন কেউ বলেনি বরং ওটা দর্শনীয় বলেই দেখতে ছুটতো লোকে। রুচি অনুসারে একই জিনিষ সুন্দর বা অসুন্দর আস্বাদ দেয়। চীনে বাড়িতে গিয়ে দেখলেম এক সুন্দর কাচের বাটিতে ছেলেরা শুটকি মাছ খাচ্ছে বাটিটা সুন্দর লাগলো, আহার্য্যের গন্ধটা কিন্তু চীনা নয় বলেই আমার নাকে ভারি অসুন্দর ঠেকলো। এই ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি ইত্যাদির উপরে যে রচনা উঠতে পারলে তাই যথার্থ সুন্দর হয়ে উঠলো এ আর একটা মত—মানুষ যখন নিজেই একটি ব্যক্তি তখন এই ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি লোপ করে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষভাবে কিছু রচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব, রচনার বিষয় নির্ব্বাচন সেও রুচি অনুসারে করে চলে মানুষ, যে চা নিজের জন্য প্রস্তুত করা গেল সে আমার রুচি অনুসারে চিনি দুধ না দিয়ে যেমন তেমন পাত্রে খেলেও কারো কিছু বলবার নেই কিন্তু পরকে যেখানে নিমন্ত্রণ দিচ্ছি সেখানে পরের মুখ অনেকখানি চেয়ে কাযটি নিষ্পন্ন করতে হয়, না হলে ব্যাপার পণ্ড হতেও পারে। ঘরে মেয়ে যেমন তেমন সেজে বেড়াচ্ছে কারো দৃষ্টি পড়ে না সেদিকে ঘরের মধ্যে একটি বাইরের লোক আসার খবর আসুক তখন মেয়েটাকে সুন্দর করতে তার ঝুটি ধরে টানাটানি পড়ে যায় মেয়েটা সেজেগুজে

মুখ দেখাতে চলেছে এমন সময় কাঁচি দিয়ে যদি তার বেনে খোঁপাটি কেটে নেওয়া যায় তবে যদি মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী হয় তবে একটু কাণাভাঙ্গা সুন্দর পেয়ালাটির মতো চোখেই পড়েনা তার রূপের এই সামান্য খুৎ কিন্তু শুধু সাজের দ্বারাই যে সুন্দর দেখাচ্ছে তার পক্ষে বেণীসংহারের মত এমন দুর্ঘটনা আর কিছু হতে পারে না। মেয়েরা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন পুঁথি পড়ে না অথচ তাদের হাতে দেখি সাজাবার ও দেখাবার সুন্দর এবং আশ্চর্য্য কৌশল সমস্ত কেমন করে এসে গেছে আপনা হতেই।

সব সুন্দর কাল রচয়িতা আপনাকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে। ফুল কতখানি সুন্দর হয়ে ফোটে তা সে নিজেই জানে না, প্রজাপতি জানে না যে কতখানি সুন্দর তার গতাগতি, শামুক জানে না যে তাজমহলের চেয়ে আশ্চর্য্য সুন্দর সমাধি গড়ে যাচ্ছে সে! যেকাজে রচয়িতা কেমনটা বানিয়েছি এই টুকুই প্রকাশ করে গেল সে কায অসুন্দর হল এর নিদর্শন আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটি—সেখানে প্রত্যেক পাথর কি কৌশলে একের পর আর এক স্তূপাকার করে তোলা হয়েছে এইটেই দেখা যায়—কারিগর তার তোড়জোড় নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে বুক ফুলিয়ে কিন্তু তাজমহল সেখানে কারিগর কেমন করে পাথরগুলো কোন খানে কোনো খানে জুড়েছে তার হিসেবটিও যতটা সম্ভব মুছে দিয়ে তার সৃষ্টিটাকে এগিয়ে আসতে দিয়েছে সামনে। কাযের থেকে এতখানি আপনাকে লোপ করে দিতে যে না পারলে সে অসুন্দর কায করলে। বাড়ীর কর্ত্তা যেখানে অভ্যাগতকে আসন দিলে না নিজেই গট হয়ে জায়গা জুড়ে বসলো সেখানে উৎসব তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিলে না এই ভাবের অপূর্ণতা ভারি বিশ্রী জিনিষ। বিয়ের রাতে বর কনেকে উত্তম আসন দিয়ে গুরুজনেরাও নিম্ন আসনে বসেন সুন্দর রসের নায়ক নায়িকার স্থান অধিকার করে বলেই তারা দুটিতে বরেণ্যদেরও বরেণ্য হয়ে বর্ত্তমান হয় সে রাতে।

বিশ্বের তাবৎ জিনিষের সংস্থানের মধ্যে এই উত্তমাধম বিচারের নিদর্শন স্পষ্ট ধরা যায়। যে আলো দেবে তার স্থান হল উচ্চে যে সেই আলো পেয়ে সুন্দর হবে তার স্থান হল নীচে। সকল দেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে ফুটলাইট এখন উঠে যাচ্ছে যে তার একটা কারণ নীচের আলোতে অভিনেতাদের মুখ ভারি অসুন্দর ঠেকে, সত্যই চোখে পীড়া দেয় ও সৌন্দর্য্য হানি ঘটায়। তাই আলোককে উত্তম স্থান দিতে চাচ্ছেন অভিনেতারা। প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে এই উত্তমাধম ইত্যাদির সম্বন্ধে বিচারের ভুল দুএকজায়গায় ঘটতে দেখা যায়। সূর্য্য যখন আপনাকে খুব অনেকখানি সরিয়ে রেখে জল স্থল আলোকিত করছেন তখন বিশ্বরচনা একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও সুষমা নিয়ে চোখে পড়ছে কিন্তু নদীর জলে সূর্য্য যখন নিজকেই প্রখরতর করে ফোটাচ্ছেন তখন চক্ষের পীড়া উৎপাদন করছেন তিনি। চাঁদ সুন্দর আলো ফেলতে জানে জলে স্থলে বলেই কখন এমন ভুলটা করে না। প্রদীপের আলো তারার আলো এরা জানে নিজকে অপ্রধান রেখে আলো দেওয়ার

রহস্য, বিদ্যুতের আলো যাকে মানুষ ঘরে আনলে সে এ রহস্য জানে না—চক্ষের পীড়া, দেখতে দেখতে জন্মে দেয়—কাযেই সেই অসুন্দর আলোকে সুন্দর দেখাবার জন্যে মানুষ তার উপরে নানা রকম ঘোমটা পরিয়ে দিয়ে চলেছে। 'বাজারে ছবিগুলির রং চং ও কায়দা কানুন ছবিটাকে পিছনে ঠেলে ফেলে এগিয়ে আসে সেই কারণে আর্টিষ্টের কাছে ভারি অসুন্দর ঠেকে সেগুলো, কালোয়াতি আসলে গান সুর ইত্যাদিকে ঠেলে কালোয়াৎটিকেই ঘাড়ের উপরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে সেই জন্যেই তা অসুন্দর। পাতাটি ফুলটি গাছ থেকে খসে পড়েছে তারা নিজের পড়ার ছন্দটি বাতাসের ছন্দে লুকিয়ে রেখে পড়ছে তাই সুন্দর ঠেকে তাদের গতি, গাছের তাল বাতাস ছিঁড়ে ধুপ করে পড়ে জানাচ্ছে আমি পড়লেম তাই ভারি অসুন্দর ও বেতালা তার ছন্দ। জলের মধ্যে ঢিলটা পড়লো ঢিলটার কেউ খোঁজ রাখে না কি সুন্দর ছন্দে জল দুলে চল্লো তাই দেখে লোকে। বায়স্কোপের মধ্যে দিয়ে ফুল ফোটার ফুলের ঘুমের ফুলের জাগরণের ছবি দেখেছি ভারি বিস্ময়কর দৃশ্য—কি সহজে প্রত্যেক পাপড়ি একটির পর একটি খুল্লো বন্ধ হল, কত সহজে শিকড়গুলি দৌড়ে চল্লো জলের সন্ধানে সুন্দরী নর্ত্তকীর মতো চমৎকার তার হাব ভাব, সবই ভাল লাগলো কিন্তু আসল ফুল ফোটানোর বেলায় ঝরাণোর বেলায় সে গুলো গোপন রইল সেই চলাচল ও কৌশল-গুলোই বেশী করে পড়লো বায়স্কোপের মধ্যে দিয়ে চোখে কাযেই আর্ট হিসেবে অসুন্দর ঠেকলো সমস্তটি আমার কাছে!

বিশ্ব রচনার মধ্যে দেখতে পাই সুন্দর আছে অসুন্দরও আছে—ওদিকে কাকচক্ষু নির্ম্মল জল এ দিকে পানা পুকুর। মানুষ এ দুটাকে আলাদা করে দেখে বলেই তুলনায় দেখে একটা সুন্দর অন্যটা অসুন্দর কিন্তু বিশ্বরচয়িতা তিনি এ দুটিকেই সৌন্দর্য্য ফোটানোর কাযে লাগাচ্ছেন—রূপদক্ষদের কারবার দেখি সুন্দর অসুন্দর দুইকে নিয়ে। গত বছরে গ্রহণের দিনে শান্তিনিকেতনের পূর্ণিমা উৎসব ফেলে একা চলে আসছি, রসিকের হাতে ধরে সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলোনা মনে এই দুঃখ বাজছে সারা পথ, কিন্তু যিনি কবিরও কবি তিনি হঠাৎ এক সময়ে চাঁদের আলোয় রেলের ধারে ধারে যতগুলি খানা ডোবা ছিল সবাইকে চাঁদের আলোর সাড়ি পরিয়ে আমার চোখের সামনে উপস্থিত করলেন, এই বিস্ময়কর ঘটনা অসুন্দরকে কেমন করে সুন্দর করে তুলতে হয় তা আমাকে এক মুহূর্ত্তে শিখিয়ে গেল, তারপর দেখলেম আর্টিষ্ট তিনি চাঁদের মুখের সমস্ত আলো মুছে নিলেন—ধরিত্রীর আঁধার করা ঘরে দেখলেম তাঁর কত কালের হারানো কন্যা ফিরে এল—সূর্য্যের দেওয়া আলোময় সাজ ছেড়ে—শ্যামাঙ্গিনী সেই ঘরের মেয়েটির দিকে চেয়ে রয়েছেন দেখলেম চুপ্ করে অন্ধকারে আমাদের জননী যিনি তিনি, সুন্দর অসুন্দরে রাসলীলার এই মুহূর্ত্তগুলি কি অপূর্ব্ব স্বাদই রেখে গেল মনে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবত্র

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে কয়েকমাস পরেই তাহার পরীক্ষা, তবু মীরা পড়ায় মন দিতে পারিতেছিল না, তাহার দাদা তাহার বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া মেজ মামিমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা যে ঠিক্ করিয়াই ফেলিয়াছে তাহা মেজ মামিমার বাপের বাড়ীর "ছানাপোনা খুদে পিঁপড়ে" হইতে হোম্‌রা চোম্‌রাদের পর্য্যন্ত বহুবার দেখা তাহাকে নূতন করিয়া দেখিতে আসার ধূমে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। মা জেঠিমাকে বহুবার মীরা সগর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার দাদা আসিয়া তাহার যে ব্যবস্থা করিবে তাহাই সে মাথা পাতিয়া লইবে, এখন সেই দাদারই এই কাণ্ড দেখিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিতেছিল। এ সবও এতদিন সে এক রকমে সহিয়াছিল কিন্তু ভাবী বর যেদিন ময়ূরছাড়া কার্ত্তিকের বেশে সাজিয়া-গুজিয়া তাহাকে দেখিতে আসিল সেই দিনই সে ইলাকে জানাইল যে, বাড়ীতে থাকিলে তাহার এবার পাশ হইবার আশা নাই, সে ইলার নিকটে বোর্ডিংয়েই যাইবে।

ইলা মৃদু হাসিয়া বলিল—"সে বুঝি শুনিস্‌নি? এই ডিসেম্বরে বোর্ডিংয়ের বাস উঠিয়ে আমায় বাড়ী আসতে হবে, বাবা এই আদেশ দিয়েছেন। বাড়ী থেকেই আমার কলেজ করা সম্ভব হবে এখন, আমি এই বড়দিনের বন্ধের সঙ্গেই তল্পিতল্পা নিয়ে বাড়ী আস্‌ছি যে।"

"হঠাৎ এ হুকুম কেন বাবার? এর কারণ?" মীরা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ইলার পানে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

"তোমারও যে কারণে বাড়ী ছাড়তে ইচ্ছে হচ্চে, আমারও সেই কারণে বাড়ী আসতে হচ্ছে।"

"বিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার আবার কোথায় যোগাড় হচ্চে?"

"নতুন মা'র এক বোন্‌পোর সঙ্গে, তাঁদের নাকি আমায় খুব পছন্দ।"

"এই বোন্‌পো আর ভাইপোরা তো বড় জ্বালালে! তুমি সেই পছন্দের প্রত্যাশায়ই বাড়ী আসতে রাজী হলে?"

ইলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বাবার মত, পড়ার সুবিধা আরও নানা রকম সুবিধা পেয়ে সেখানে ছিলাম, এখন বাবা যখন বাড়ী থেকেই পড়তে বল্‌ছেন, তাই করতে হবে।"

"তারপরে? মায়ের বোন্‌পো?"

"সে পরের কথা। আমার তো তোর মত ভাই দশ বারো হাজার টাকা জুগিয়ে দিচ্চে না। তাতে এই থেড়ে কনে; আশা করি, বোন্‌পো বেশী দূর আর এগুবেন না।"

"তাকি ঠিক বলা যায় ভাই। ধর যদি সে মেজ মামিমাদের বাপের বাড়ীর মত টাকার প্রত্যাশী না হয়।"

"সে পরের কথা পরে বোঝা যাবে ; এখন তোর কি বক্তব্য তাই আগে বল্‌তো শুনি।"

"আমার বক্তব্য আমি তাহলে বাড়ীই পালাই। পড়াটাও ঠিক করা হবে, আর—"

"মা জেঠিমার সঙ্গে কোঁদল করাও হবে—না ?"

"ঠিক্ আন্দাজ করেছিস্ ভাই! দাদা এত টাকার জোগাড় কি করে কর্‌লো তাই ভাবছি। সেদিন আমাকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা বন্ধ ক'রে ফেল্‌লে। আমার ঠিক্ যেন মনে হ'ল জেঠিমার গলার হার-চুড়ি এই সব তারমধ্যে রয়েছে। দাদা আমার মা জেঠিমার যা স্ত্রীধন আর জেঠামণির যে টাকা ব্যাঙ্কে তার্ নামে ছিল সবগুলি নষ্ট কর্‌বার ফন্দীতে আছে। আচ্ছা এমনি ক'রেও কি এই মেয়ের বিয়ে তাঁদের দিতেই হবে ? আমাদের জন্য অন্য চিন্তা করা যেন পাপ। আমাদের মাত্র এই এক পথ, কেমন ?"

ইলা মৃদু হাসিলমাত্র—উত্তর দিলনা।

মীরা আরও চটিয়া বলিল, "কি তুমি হাস ইলাদি,—রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্চে। যাচ্চি আমি তাঁদের কাছে। তাঁদের কারও বিয়ের দরকার নেই, কেবল দরকার আমাদের বেলা ? দাদা বিয়ে করুক আগে, অরুণ বাবু করুণার বিয়ে দেন, তবে আমায় সেকথা বল্‌তে পাবেন তাঁরা।"

"শুনেছিস্, সনৎ দা আর অরুণ বাবু সেখানে খুব কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। অরুণ বাবু তাঁর ন্যায়শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে নিজ হাতে দা নিয়ে নাকি বন কেটে বেড়াচ্চেন, কোদাল পাড়ছেন। মেয়ে ইস্কুল ক'রে করুণাকে নাকি তাদের মাষ্টার কর্‌বার ঠিক্ করছেন, জেঠিমার যে সব কাজ বাকি ছিল সে সব তাঁরা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন,—গ্রামের স্কুল, আরও কি কি—"

"শুনেছি লো শুনেছি।" মীরা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আপনারই চোখ্ ফুটিয়ে দেওয়ার এ বুদ্ধি এসেছে তাঁদের। কেবল আমার পড়াটির যাতে দফা রফা হয় সেই ফিকিরে দাদাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ইলা ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "নারে, তোর পড়া নষ্ট হবেনা। তোর একজামিনের পরে সেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেই তারা রাজী। চাই কি তুই যদি আরও পড়িস্ তাও হয়ত তারা বাধা দেবেনা শুনেছি।"

"বলিস্ কি ? এযে একেবারে অতিভক্তির কথা! এতেই যে বেশী অবিশ্বাস হচ্চে। যাক্ আমি চলে যাচ্চি ভাই দাদার সঙ্গে, নৈলে এখানে থাক্‌লে এই জ্বালাতনে পড়াতো মোটেই হবেনা।"

ইলা হাসিয়া বলিল, "আর সেখানে সকলকে জ্বালাতন করেও যে বেশী কিছু করতে পারবে তাও আমার মনে হয়না। তবু—যেতে চাস্ যা।" মীরাও একটু হাসিয়া ফেলিল :

বাড়ী আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত একটা ঘরে নিজেকে প্রায় আবদ্ধ করিয়াই মীরা

একজামিনের পড়ায় মন দিল। মা জেঠিমা দাদা এমন কি করুণার সঙ্গেও দুটা কথা কহিবার তাহার অবসর দেখা গেলনা। তাহার প্রয়োজনগুলি জেঠিমাই নিঃশব্দে সম্পাদন করিয়া দিতেন, তাঁহার তো নিষ্প্রয়োজনে কথা কহা স্বভাবই নয়। মীরার মা মেয়ের ভাব দেখিয়া সংসারের কাজের অছিলায় দূরেই রহিলেন।

দিন চারি পাঁচেই মীরার বিরক্তি ধরিয়া গেল। সে একদিন মুখভার করিয়া জেঠিমাকে বলিল—"দাদা কোথায় ?"

অরুন্ধতী উত্তর দিলেন, "সে তো তার খদ্দরের কাজে চ'লে গেছে।"

"বেশ ছেলেত! আমায় এরই জন্য বুঝি বাড়ী নিয়ে আশা হয়েছে ?" বলার সঙ্গে সঙ্গেই মীরার মনে হইল এবারে তাহাকে তো কেহ বাড়ী আসিতে সাধে নাই। জেঠিমাও হয়ত তাহা জানেন। তিনি নিশ্চয়ই হাসিতেছেন—ভাবিয়া মীরা অপ্রস্তুত ও উদ্ধতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল তিনি সমান প্রশান্ত মুখেই উত্তর দিতেছেন—"কাজ পড়েছিল তাই গেছে।"

"ভারি তাঁর কাজ! কেন এখানেও তো তাঁরা কত কাজ ফেঁদেছেন শুনছি, ঘরের কাজ বুঝি কাজ নয় ?"

"যা যার ভাল লাগে।"

তিনি কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলে মীরা নিজ কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা পাইল, মন বসিল না। উঠিয়া একেবারে করুণার সন্ধানে তাহার জেঠিমার ঘরের সম্মুখের দালানে উপস্থিত হইয়া দেখিল করুণা সম্মুখে একটা চরকা রাখিয়া খানিকটা তুলা লইয়া পিঁজিতেছে ও তাহার কৈবর্ত্ত পিসির ভাইঝি নাত্‌নি ও আত্মীয় কন্যায় গুটি পাঁচ ছয় মেয়ে প্রথম ভাগ হাতে করিয়া তাহার নিকট হইতে বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতেছে। একটু দূরে বাড়ীর পুরোহিত কন্যা টেঁপি গম্ভীরমুখে একখানি দ্বিতীয় ভাগে মনোনিবেশ করিয়া নিজ পদমর্য্যাদার উপযুক্ত স্বরে 'বক্র, বিক্রয়, ক্রূর, ক্রোধ', প্রভৃতি দুরূহ বানানের অক্ষর বিশ্লেষণ করিতেছিল। মীরা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিতেই করুণা মুখ তুলিয়া মীরাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে চাহিল। মীরা তেমনি হাসিমুখেই ভ্রূকুটি করিয়া করুণাকে বলিল, "বক্রের পরের অবস্থায় যে ক্রূর ও ক্রোধ তা বেশ বোঝা যাচ্চে, কিন্তু 'বিক্রয়'টা এর মধ্যে কেন এল বল দেখি পণ্ডিতানি ?"

করুণা মূঢ়ের মতই চাহিয়া রহিল দেখিয়া মীরা তখন তাহার নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বলছি এই যে যাঁর নাম সাক্ষাৎ করুণা তিনিও আমার ওপরে বক্র হয়েছেন কেন ? আমার অপরাধ কি এতই গুরুতর ?" তবুও করুণা সেই ভাবেই চাহিয়া রহিল।

এইবার মীরা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "কি যে বোকার মত চেয়ে থাকিস্ ? আমাকে তোরা একঘরে করেছিস্ কেন ? কি করেছি আমি, দিনান্তে একবারও কেউ আমার কাছে যাস্‌না যে ?"

করুণা এতক্ষণে পথ খুঁজিয়া পাইয়া স্বস্তির একটু নিশ্বাস ফেলিয়া লইল। তার পরে আনন্দের হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া উত্তর দিল, "তুমি যে পাশের পড়া পড়্‌ছ ভাই! অন্যমনা করলে যে তোমার ক্ষতি হবে। জেঠিমা আমাদের চরকাই ওদিকের ঘর হ'তে নিজের ঘরের সাম্‌নে আনিয়ে দিয়েছেন, পাছে শব্দেও তোমার কিছু অসুবিধা হয়।"

"তাই ব'লে দিনরাত মানুষ অন্ধকূপে ব'সে থাক্‌বে না কি? দেখিতো তোর চর্‌কা—" বলিয়া মীরা চর্‌কার হাতলটা ধরিয়া জোরে জোরে ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, আর করুণা প্রফুল্লমুখে মীরার কাজ দেখিতে লাগিল। মীরার এই স্ফূর্ত্তির দরুণ উল্টা পাল্টা পাকে কাটা সূতার না-জড়ানো অংশ টুকুতে বেশ জট্‌ পাকাইতে লাগিল তবু করুণা ক্ষুণ্ণ হইল না। কলিকাতায় সে মীরার স্নেহব্যগ্র হৃদয়ের বিরুদ্ধে চলিয়া তাহার জেদটুকুর যে সম্মান রাখিতে পারে নাই সেজন্য করুণা মীরার নিকটে কুণ্ঠিতই ছিল। মীরাও সেইটুকু মনে রাখিয়াই গতবারে বোধ হয় তাহার সঙ্গে বাড়ী আসিয়া আর বেশী মেলামেশা করে নাই। এবারেও পড়ার অছিলায় মীরা গৃহ মধ্যেই আবদ্ধ রহিল দেখিয়া করুণা তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। আজ মীরাকে স্বেচ্ছায় তাহার নিকটে আসিতে দেখিয়া আনন্দে করুণার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বুঝিল মীরা তাহার দোষ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে অথবা ক্ষমাই করিয়াছে।

নিজের আনমনা ভাবটা কাটিয়া গেলে মীরা দেখিল মেয়েগুলা পড়া বন্ধ করিয়া অবাক্‌ ভাবে তাহাকেই কিম্বা তাহার কাজটাই দেখিতেছে। "কি হাঁ করে দেখ্‌ছিস সব,—পড়না?" বলিয়া তাড়া দিয়া উঠিতেই সকল থতমত খাইয়া নিজ নিজ কার্য্যে মন দিল। টেঁপি নিজের মুলতুবী বানান্‌টী আবার ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল—"কয়ে র ফলা ওকার—আর ধ—ক্রোধ!"

করুণা একটু হাসিয়া মীরাকে বলিল, "আমিও জিজ্ঞাসা করি আমার ওপরেও ঐ জিনিষটা নেই তো আর ভাই?"

মীরা একটু চকিতভাবে বলিল "আমায় বল্‌ছিস্‌?"

"হ্যাঁ।"

"কেন আমার ক্রোধের কি কারণ হবে?"

করুণা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, যদিও মীরা সেকথা ভুলিয়াই থাকে, কেন আর নূতন করিয়া তাহাকে জাগাইবে।

"আচ্ছা করুদি, এমন সুন্দর সূতো কাট্‌তে কবে শিখ্‌লি?"—অন্যমনস্কভাবে মীরা প্রশ্ন করিল।

করুণা উত্তর দিল, "তাঁদেরই কাছে। যমুনা যে কি সুন্দর আর কত শীগ্‌গির কাটে যদি দেখ্‌তে তো বুঝ্‌তে।"

"তারি সময়ের জন্য দেখা তাই তার সূতো কাটাও দেখ্‌তে যাব। আবার যখন দেখা হবে

দেখে নেব না হয়, তোর সূতো ভাল কি তোর যমুনার ভাল! কিন্তু আদার ব্যাপারী আমি—আমি কি তোদের সূতোর ধার ধারি যে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ চিন্‌তে পার্‌ব? হুঁ! যারে তোরা বাড়ী যা আজ, আমি একটু গল্প কর্‌ব।"

মেয়ে ক'টি একটু খুসি হইয়াই তাহাদের "পান্তাড়ি" গুটাইয়া বাড়ী চলিল।

মীরা সহসা প্রশ্ন করিল—"যমুনা তোকে চিঠি লেখেনা?"

করুণা মুখ নামাইল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মীরার পুনঃ প্রশ্নে শেষে অগত্যা উত্তর দিল "একখানা লিখেছিল উত্তর না পেয়ে আর লেখেনি"!

"কেন, শ্রীমতী করুণা কি ধান ভেনে আর সূতো কেটে 'দাদু'র শেখানো মত বিদ্যেটুকুও সেই সঙ্গে এম্‌নি কেটে কুটে ফেলেছেন যে, একখানা চিঠির উত্তরও দিতে পারেন নি?"

করুণা উত্তর দিল না। তাহার উত্তরোত্তর পাংশু মুখের দিকে চাহিয়াও মীরা ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "অকৃতজ্ঞ! কি ভালই বাসতেন তাঁরা তোমায়, তা এরই মধ্যে ভুলে গেছ?"

তবুও করুণা উত্তর দিল না।

তখন মীরা বলিল "দেখি তার চিঠি, কি লিখেছিল সে?"

"ছিঁড়ে ফেলেছি" করুণার ক্ষীণ কণ্ঠ অতি কষ্টে এই টুকু যেন উচ্চারণ করিল।

"কেন?" উত্তর নাই। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মীরা বলিল "তাঁদের যেদিনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিলাম যদিও তা ভাগ্যে ঘটলো না, তবু একবার তাঁদের এখানে আনালে কি ক্ষতি? আমি—"

"না মীরা—না" সত্রাসে পাণ্ডুমুখী করুণা যেন চীৎকার করিয়াই উঠিল "না না, তাঁদের এসে কাজ নেই ভাই, ওকথা বলোনা জেঠিমাকে কি আর কারুকে—"

"কেন—তাতে কি দোষ?"

"না—না ভাই তোর পায়ে পড়ি।'

অধীরভাবে করুণা সত্যই মীরার পায়ে হাত দিবার জন্য তাহার কাছে সরিয়া যাইতেছিল। মীরা একটু ধাক্কা দিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত করিল, তার পরে একটু তীক্ষ্ণ হাসির সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন, তোদের যে কোন বিকারই নেই, শান্ত সহিষ্ণু তোরা, তোদের আবার দুঃখ কিসের?"

করুণা উত্তর দিলনা, কেবল তাহার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া খানিকটা জল ঝরিয়া গেল।

মীরা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিল, "তারা বুঝি মনে ক'রে আছে যে, এখানে এসেই দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে হ'য়ে গেছে? তাই তাদের কাছে এত লজ্জা, না?"

সরস্বতী আসিয়া মীরাকে ডাকিলে করুণা যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল্। মীরাও

মায়ের ডাকে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সরস্বতী বলিলেন "মেজবৌ যে বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছে মীরা, তুই এই সময়ে বাড়ী এলি ?"

"মেজ মামি কিজন্য ব্যস্ত হয়েছেন মা ?"

"তার বড় ভাই ভাজ দেশে এসেছে, তোকে দেখতে চায় ! তা চল্‌না আমিও একবার যাব মনে করেছি কল্‌কাতায়। অরুণকে বলেছি, সে আমাদের কালই রেখে আস্‌তে পারে।"

মীরা বেশী কিছু কথা কহিল না, নিঃশব্দে একটুক্ষণ মায়ের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে "জেঠিমা কোথায়" এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল। শুনিল তিনি অরুণের সঙ্গে 'দেবত্রের' আয় ব্যয়ের হিসাব মিলাইতেছেন। মীরা একেবারে তাঁহার নিকটে গিয়া ডাকিল, "জেঠিমা !"

অরুন্ধতী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। "তোমার সব ছেলে মেয়েরই নিজের সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে, আমার নেই কেন ?"

মেয়ের আক্রমণের ধারা শুনিয়া অরুন্ধতী নিঃশব্দপ্রশ্নে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, অরুণ আস্তে ব্যস্তে খাতাপত্র গুটাইতে লাগিল।

মীরা বলিয়া চলিল, "আমি সেখানের গোলমালে পড়া হচ্চিল না ব'লে বাড়ী এসেছি, তুমি আমায় আবার এখনি সেখানে যেতে বলেছ ?"

"তোমার মার ইচ্ছা মীরা।"

"মার ইচ্ছা—তোমার ইচ্ছা তো নয় ?"

"আমাদের ইচ্ছার কথা থাক্—তোরই কি ইচ্ছাটা স্পষ্ট ক'রে বল দেখি !"

"মীরা মুখটা একটু নত করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "আমি এখন পড়াশোনা করব— অন্য কোন কথা আমায় যেন কেউ না বলে।"

"বেশ, এখানে যতদিন তুমি থাক্‌বে কেউ কোন কথা বল্‌বে না, কিন্তু এখান থেকে যখন অন্যত্র যাবে তখনকার দায়ী কে হবে বলত ?"

মীরা উত্যক্তভাবে বলিল "আমি যাবই না ওরকম করলে এখান থেকে, এবার না হয় পরীক্ষাই দেবনা। কিন্তু অন্যত্র থাকার সময়ের কথা যা বল্‌ছ, তারও দায়ী আমার সেই দাদামণিটি, যিনি আমার জেঠামণির আর বাবার যেখানে যা ছিল জড় করে মায় তোমার গয়না পর্য্যন্ত হাতিয়ে এইসব ক্যাঙলাদের ডেকে এনেছেন। তুমি কি অন্য গায়ের গয়নাগুলো পর্য্যন্ত দাদাকে দিয়েছ বল দেখি, এখন যে বড় দায়ী নও বল্‌ছ ?"

অরুন্ধতী মীরার কথার উত্তর না দিয়া সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাদের লিখে দে ছোটবৌ, তারা এ রকম তাড়াহুড়ো যেন না করে। ওর পরীক্ষা হয়ে যাক্ পরে যা হয় হবে, এ সময়ে ওকে বারে বারে এমন বিরক্ত করলে চল্‌বে কেন ?"

"কিন্তু দিদি তাহলে তারা—"

"কি করবে তারা শুনি ? এমন যদি করতো আমি আর যাবই না তোমাদের কলকাতায় ! জেঠিমা, সকলের বেলায় তোমার কোন দৌরাত্মি নেই, কেবল আমার বেলায়ই তুমি যদি এই রকম পক্ষপাত কর তাহলে—কেন তুমি দাদাকে অত টাকা দিয়েছ বল দেখি ? তাই সে যা খুসি করছে মার পরামর্শে ভুলে ! আমি——"

অরুন্ধতী মীরাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "একটু ঠাণ্ডা হ তুই আর তোর অমতে কিছু হবে না, চুপ কর, আমায় হিসাব শুনতে দে, ওকি অরুণ কখন উঠে গেছে ?"

সরস্বতী বিরক্তভাবে বলিল "আর কখন ? মেয়ের রণমূর্ত্তি দেখে তখনি ! দিদি তুমিও ওর আবদার শুনে—"

বাধা দিয়া অরুন্ধতী বলিল "তাই শুন্‌তে হবে এখন, ছোটবৌ এখন বিরক্ত হলে চলবে না ত ! তুই কেন ব্যস্ত হচ্চিস সাফকথা লিখে দে কিচ্ছু অন্যায় হবেনা তাতে।"

"সনৎ কবে বাড়ী আস্‌বে ? সে এলে যে বাঁচি" বলিতে বলিতে অসন্তুষ্টভাবে সরস্বতী অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

তাঁহার অধীর প্রতীক্ষা সফল হইলনা, সনৎ ত আসিলই না, কেবল তাহার এক পত্র আসিল। সে ও তাহার বন্ধু প্রমথ পি সি রায়ের কাছে না গিয়া গ্রামে গ্রামে পিকেটিং করিয়া খদ্দর প্রচারের জন্য ঘুরিতেছিল, পুলিশ প্রভু তাহাদের এবম্বিধ স্বাধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া এমন কতকগুলি কারণ ঘটাইয়াছেন যাহাতে তাহাদের কিছুকালের জন্য হাজতে বাস অনিবার্য্যই হইল, ইহার পরে শ্রীঘরে না পাঠাইয়াই যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইবেন এমন আশা করাই অন্যায়। অতএব সে এরই মধ্যে আবার তাহাদের সকলের নিকট হইতে কিছুদিনের মত বিদায় লইতেছে। মা তো তাহার উপরে কোন প্রত্যাশাই রাখেন নাই, কেবল কাকিমারই ভাবনা সে যে সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারিল না এই তার একটু দুঃখ ! তবে মাও যখন ইহাতে সংশ্লিষ্ট আছেন তখন সে আশা করে যে তাহার জন্য ইহাতেও এমন কিছু আটকাইবে না। সনতের কৃত্য অরুণকে দিয়াই মা শেষ করাইতে পারিবেন। মাকে কাকীমাকে প্রণাম, বোনটিকে ভালবাসা, করুণার জন্য আশীর্ব্বাদ এবং অরুণদার জন্য খানিকটা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সে এখন কিছুদিনের মত সকলের কাছে বিদায় হইল।

এই সংবাদ প্রথমবারের অপেক্ষাও এবারে সকলের পক্ষে যেন সাংঘাতিক হইয়া দেখা দিল। সরস্বতী তো গৃহতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অরুণের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গেল, সনৎ মাত্র কয়দিন গ্রামে থাকিয়া তাহাকে যে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে—নূতন জীবনে নামাইয়া দিয়াছিল ! সনৎ আবার জেলে যাইতেছে এ সংবাদে অরুণ একেবারে জড়ের মত হইয়া গেল। মীরা নির্ব্বাক নিস্তব্ধ যেন প্রস্তরের প্রতিমা। কেবল অরুন্ধতী যথাসাধ্য সকল দিকের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে

একবার সকলকে যেন প্রবোধ দিবার জন্যই বলিলেন "আমি জানি সে বাবার এ সংসারের জন্য তৈরী হয়নি তাই এ রকম ব্যবস্থাও হয়েছে। একবার একথা ভুলে যাওয়ায় করুণাকে শুদ্ধ তার সঙ্গে জড়ায়ে ফেলেছি, আমার সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করুকে দিয়ে হচ্চে। আমি জানি সে আমাদের জন্যে হয়নি।"

সরস্বতী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জায়ের কথার পোষকতাস্বরূপ বলিলেন "এই ছেলের কি বিয়ে দিয়ে একটা পরের মেয়ের প্রাণবধ করতে আছে? ওর যে বিয়ে দেবনা বলেছ, দিদি, সে ঠিকই করেছ।"

"প্রাণবধ যার হবার তার বিধিলিপি কি কেউ খণ্ডন করিতে পারে ছোটবৌ?" বলিয়া অরুন্ধতী অরুণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অরুণ সেবারের মত বৃথা চেষ্টায় আর ছুটোছুটি করতে যেওনা, সে এ ঘরে আর থাকবে না, —যেখানে তাদের ঘর চিনেছে সেইখানেই তারা এখন বারে বারে ছুটে যাবে, বৃথা কষ্ট পেওনা। সে ত সর্ব্বসাধারণের যা গতি তা ছাড়া অন্য সুবিধাও নেবেনা, এটা সেবারেই দেখেছ ত। ঠাকুর তাকে তাঁর সংসারের কর্ত্তব্য থেকে খালাসই করে দিয়ে গেছেন। যাদের বেঁধে রেখে গেছেন—তারা যেন তাঁর কাজ আর না ভোলে।"

দিন দুই তিন পরে অরুণ যখন শুষ্ক মুখে "দেবত্রের" কার্য্যে নিযুক্ত ছিল মীরা আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। এমন অসম্ভব ব্যাপারে একটু চকিতভাবে অরুণ তাহার দিকে চাহিতেই বুঝিল কোন একটা বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞা লইয়াই মীরা আজ এ ভাবে তাহার নিকটে আসিয়াছে! তাহার সেই প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়সঙ্কল্পউদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিতে অরুণের আজ কিছুমাত্র কুণ্ঠা আসিল না। অরুণ তাহার মুখের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে বুঝিয়া মীরাও কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। অকুণ্ঠস্বরে বলিল "অরুণবাবু আপনি কি করবেন মনে করেছেন?"

মীরার প্রশ্ন বুঝিতে অরুণের একটুও বাঁধিলনা সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল "ঠিক করতে পারছিনা।"

"ঠিক করতে পারছেন না? এতবড় অন্যায়ের পরে কি কর্‌তে হবে এও কি ঠিক কর্‌তে দেরী হবার কথা? নিশ্চয়ই আপনি ভেবেছেন তা।"

অরুণ নতনেত্রে বলিল "আপনি বলুন—"

"বেশ আমি বল্‌ছি। যে জন্য আমার দাদাকে, আমার দাদুর বংশের তিলককে, এমন অত্যাচার সহ্য করতে হচ্চে আমরা সপরিবারে সেই কাজই করব। আমাদের গ্রামের লোককে সেই কাজ করিতে শেখাব—দেশের সকলকেই সেই দলভুক্ত করব, বুঝ্‌ছেন?"

অরুণ সশ্রদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নীরবে তাহার কথার অনুমোদন করিল।

মীরা অরুণের এই নিঃশব্দ সহানুভূতি পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের ভাবে কহিল, "তবে আর ভেবে সময় নষ্ট করবেন না, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করুন। গ্রামে দেবত্রের যে সব ভাল ভাল জমি আছে তাতে ভাল তুলো যাতে হয় তারই চেষ্টা করুন। সেই তুলোতে সুতো কাটা হোক্। তাঁতি এনে তাঁত বসান, খদ্দর বোনা হোক, আর সেই খদ্দর গ্রামে গ্রামে বিকানোর ব্যবস্থা করুন।"

অরুণ নতমস্তকে বলিল, "তাই হবে।"

"একদিনও দেরী করতে পারবেন না. আজই আরম্ভ করুন।"

মীরার উত্তেজিত দেহ পশ্চাৎ হইতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অরুন্ধতী সস্নেহে বলিলেন "পাগলী, ভাল কাপাসের বীজ আনাতে হবে, জমি ভালরূপে চাষ করাতে হবে, তারপরে এই কাজ চালাবার মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ উৎসাহী কাজের লোক জনকতক যোগাড় করতে হবে, নৈলে—"

"কেন অরুণবাবু আছেন তুমি আছ—"

অরুন্ধতী মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ক্ষোভসূচক হাসিমুখে আবার কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়াই মীরা এবার দ্বিগুণ অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি করব। আজ থেকে আমি আর পড়বনা। কি হবে ওতে যাদের জীবন এত বিড়ম্বনাভরা ; যাদের ইচ্ছামত একটু কিছু করিতেও সামর্থ্য নেই, বিদ্যে তাদের সব আগের দরকারী জিনিষ নয়। ' অরুণ দাদা তুলো তৈরী করে দেন, তাঁতের ব্যবস্থা করিয়ে দেন, আমি আর করুণা চরকা কাটব আর চরকা কাটার মানুষ এই গ্রাম থেকেই তৈরী করব। এর জন্যে আজ থেকেই আমি অন্য সব ছাড়লাম।"

অরুন্ধতী আবার তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন "আজ থেকে বাবার 'দেবত্র' সার্থক হ'তে চললো মীরা, আশীর্ব্বাদ করছেন আজ বাবা তোকে।"

মীরার চক্ষু হইতে এতক্ষণে আগুনের মত খানিকটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে নত হইয়া জেঠিমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

অরুণের পানে চাহিয়া জেঠিমা বলিলেন, "তুমিই যেন মীরার এই নির্ভর, এই সম্মান রাখতে পার অরুণ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।"

অরুণও তাঁহার পায়ের গোড়ায় মাথাটা নামাইয়া দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

দুদিক্

সৌরভে ভোরে ঝরে যাই　　　　গৌরব ভরে মরে যাই
আমি চারু, সুকোমল ফুল।
ধরাকে শাসিয়া নেচে যাই　　　　জরাকে নাশিয়া বেঁচে যাই
আমি বজ্র, কঠোর অতুল॥

ভোগ না বৈরাগ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দুর cultureএর ইতিহাসে দেখি যে যিনি সমগ্র সুষমার আধার, বিরাট বিশ্বের প্রাণ ও আনন্দের যিনি উৎস, কাম্যকামনার যিনি আদিমূল—সেই অনন্ত প্রেমময় রসরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভোগের ভিতর দিয়াই নিত্য সুখভরা কামনায় অমিয় মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ ও পরিচিত করে নিখিল চিত্তে আনন্দের অক্ষয় অনাবিল ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। মথুরার রাজ-বিলাসের মধ্যেও মানবতার মহাতীর্থ—পুণ্যশ্লোক, ব্রজের প্রেমলীলায় সুখস্মৃতি সেই গোপিকাগণের প্রাণবল্লভ রাধারমণকে অধীর করিয়া তুলিত। রূপরাণী রাই কিশোরীও ভোগের তন্ময় অনুরাগে গত অনাগত একেবারে ভুলিয়া গিয়া উৎসুক যৌবনের মুক্তহৃদয়তায় নিরুদ্বেগে কুলশীল জাতি-মান তুচ্ছ করিয়া, "সতী বা অসতী তুমি মোর পতি, তোমার গরবে গরবিণী আমি, রূপসী তোমার রূপে" এই বলিয়া দেহ, মন, প্রাণ রসময় মদনমোহন শ্যামসুন্দরকে সমর্পণ করে দিয়া-ছিলেন এবং বসন্তবিলাসী বনস্পতির জ্যোছনা-বিছানো বুকে সোহাগের শ্যামল হিল্লোলে সহস্র বাহুর আশ্লেষণে লতিয়ে উঠা—ভূরি প্রস্ফুটিতা, কুসুমরাগপ্রমত্তা লীলাময়ী লতিকা বধূর মত সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সেই ধীরললিত প্রেমিককে নিবিড়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া কান্তাভাবাসক্তির পূর্ণাঙ্গ আত্মনিবেদন সম্ভূত হর্ষপ্রেমগৌরবে জীবন ভরিয়া তুলিয়াছিলেন। স্বতঃপবিত্র সহস্র নির্ঝর-প্রসূত গোমুখী-নির্গত রবি শশীর নয়ন প্রসন্ন শুভ্রসুশীতল সলিলধারাসম রজত নিঃসারে প্রবাহিত চিরন্তন নরনারীর সনাতন সৌন্দর্য্যানুভূতি ও প্রেমচর্চ্চার প্রাণারাম অমিয় কাহিনী বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাভাবময়ী রাধারাণীর যে অমৃতস্রাবী রূপ বর্ণনা ও সেই কৃষ্ণপ্রিয়ার তদ্গতচিত্ত অনুরাগ লীলার যে সুরভি প্রলাপ (যাহা শুনিতে না শুনিতে "খুলে যায় মনের দুয়ার") তাহা আতট উচ্ছ্বসিত ভরাযৌবনের ভোগদীপ্তি ভাস্বর উদ্বেল ভাবের বিলোল লহরীমালা। এই শোক তাপ দগ্ধ সংসারের মরুদাহ শান্তির জন্য সেই প্রেমলীলার প্রতি কথা—রূপ রস গন্ধ স্পর্শের লাগিয়া মনের সেই অভিসার গাথা—ভোগানুরাগের স্বচ্ছ শুভ্র স্নিগ্ধ শীতল মাধুর্য্যরসে সুসিক্ত।

ভোগ বলিলেই তরুণ প্রাণের তরল চাপল্য বা উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস বুঝায় না। জীবনের সার্থকতার জন্য (অন্ততঃ বিফলতা নিবারণার্থ) সংসারের কর্ম্মাবর্ত্তে মর্ম্মের মায়াটানে নরনারীর চাহিবার দীপ্ত উদ্দীপনা ও প্রাপ্তির শান্ত তৃপ্তি এবং পাইবার অক্ষয় প্রত্যাশা তথা পরস্পর জানা ও জানানোর ঘনীভূত সরসতার ভিতর দিয়া প্রেমপ্রীতিস্নেহব্রতা শোভনা কল্যাণী নারীর প্রেম ও সৌন্দর্য্য—তার হাসিরূপ গান—নরের চিরকাম্য ও সনাতন সাধনার ধন হলেও—সেদিক থেকেও ভোগকে নিন্দা করা যায় না। "যেখানে যা কিছু আছে সব আপনার করিবার ইচ্ছামূল" ভোগে

ইন্দ্রিয়ানুভূতির গন্ধ থাকে বলে কেহ কেহ ভোগের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বুদ্ধিতে বুঝা যায় বটে—কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যতীত এই জাগ্রত জগৎমাঝে নান্যঃ পন্থা জানায়।

পরের পাপকে যাঁরা বড় করে দেখেন সেই Puritan Rigoristরা যাই বলুন ভোগের সহিত পাপপুণ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই এমন কি কামের সেবার ও moral senseএর কোন বিরোধ নাই।

ভোগের সুবিধাবাদের অবাধ প্রচারে ও প্রাবল্যে সমাজধর্ম্মের হানি হতে পারে; কিন্তু ভোগের বিস্তারেই যে ধর্ম্মের সঙ্কোচ হয় একথা ঠিক নয়। তা ছাড়া সমাজধর্ম্মও নিত্য বস্তু নয়। প্রত্যুত হিন্দুর বিশ্বাস ভোগ বিশ্বেশ্বরের বিভূতি। সেই জন্য রূপে ও গানে উদ্বুদ্ধচিত্ত রাধারাণী মানবতার গোপনতা ঘুচাইয়া অজেয় কামের অনন্ত তৃষ্ণাকে নিরবদ্য প্রেমের মঙ্গল মধুর আলোকের মাঝে মুক্তি দিবার প্রয়াসে সারা প্রাণ ঢালিয়া শ্যামসুন্দরকে ভজনা করেছিলেন। আজও ভারতের অনেক জায়গায় হিন্দুর দেবদ্বারে নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর বিশ্বের পরম বরেণ্য সেই সত্য শুভ সুন্দরের সম্যক অর্চ্চনার জন্য—"ভজন পূজন সাধন আরাধনার" মাঝেও হাবভাব লীলাময়ী নৃত্যগীত পরায়ণা রঙ্গপ্রিয়া কলকণ্ঠী তরুণী সুন্দরী দেবদাসী হাসিরূপ গানের পশরা লইয়া বর্ত্তমান।

ভোগ তাদেরই ভয়ের বস্তু যারা মর্ম্মে মর্ম্মে বিধি নিষেধের দাস—যারা নিজের মন দিয়া চিন্তা করে না, নিজের বুদ্ধি দিয়া বিচার করে না। রসলোলুপ চিত্তের অনুবর্ত্তনে রূপকে তৃপ্তির বিষয়ীভূত করে রূপসীর তরুণ তনুর লাবণ্যের অমিয় লীলা যদি কেহ নিমেষালস চক্ষু ভরিয়া দেখিতে ও সেই লীলার পুলক স্পন্দন প্রাণ ভরিয়া পাইতে চায়, মাধুর্য্যের প্রেরণায় যদি কেহ রসের লালসায় আকুল হয়, কণ্ঠাশ্লিষ্ট সুকুমার বাহুডোরের শিরীষ সুকোমল স্পর্শ পুলকের সুবর্ণোজ্জ্বল স্মৃতির আনন্দোৎসুক্যে পুনরায় দেহ প্রাণ ভরিয়া সেই "পুলক বিবশ পরশ" লাভের জন্য যদি কেহ ব্যগ্র হয় এবং তাহারই ভাবহিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া জীবনের সংকল্প ও সাধনার সাফল্য চায় তাহলে সেই জীবন জুড়ানো মানবিকতাতে দোষ কি? জীবনপথে আলো আঁধারের আবর্ত্তন ও সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে মাধুর্য্যের আশ্রয়, রূপে অকৈতবে আত্ম নিবেদন করে যদি কেহ তৃপ্তি চায় ও পায় তাহাতে দোষ কি? পারলৌকিকতার দিক দিয়া দেখিলেও সুন্দরকে ভালবাসাই চিরসুন্দরের পাদপীঠতলে পৌঁছিবার পথ।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে যাঁহারা অতৃপ্তির অপ্রসাদের অজুহাতে জ্ঞানের ও প্রাণের যথাসম্ভব সমন্বয়সাধক ভোগের সৌকুমার্য্যকে জীবন থেকে নির্ব্বাসনের সরাসরি ব্যবস্থা করেন তাঁহারা আত্মশক্তির উন্মেষক এই অতৃপ্তির—এই যে "আরো আরো" রব ইহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ। মানুষ যে পরিণত বয়সে জীবনের ক্লান্ত গোধূলীতে আবার অরুণরাঙা প্রভাতের অতৃপ্তির দিনগুলা নব-চেতনার নবীন আলোকে ফিরিয়া চায় তাহার কারণ সুন্দরকে

সুন্দরতর মধুরকে মধুরতর ভাবে পাইবার প্রবল ইচ্ছাতেই অতৃপ্তির আত্মবিকাশ। তৃষ্ণা না থাকিলে যেমন স্বাদু সুগন্ধি তুষারশীতল জলও অনর্থক তেমনি এই অতৃপ্তি না থাকিলে জগতে কোন বস্তুরই মূল্য থাকে না। সুখের ব্যথাই এই অতৃপ্তির উদ্দীপনা। বেদনার দান হলেও ইহাতে ক্ষোভ, নৈরাশ্য বা চিত্তবিক্ষেপ নাই। আছে শুধু আশা—আশার আলোক ও স্মৃতির সৌরভ। সেইজন্য ইহার পারিভাষিক নাম রসোদ্গার। বস্তুতঃ একটু সমঝে দেখিলে বুঝিতে আর বাকী থাকেনা যে তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি ভাল। শক্তির অপচয়দ্যোতক উদাস তৃপ্তি আসে ক্লান্তি থেকে অবসাদ হেতু। সেইজন্য তৃপ্তির শ্রান্তিতে মনের আলস্য জন্মে, মন ঘুমিয়ে পড়ে। অতৃপ্তির অক্ষয় প্রত্যাশা মনকে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রাখে এবং জগতের যাবতীয় সম্পদ মনের এই জাগ্রত অবস্থার ফল। জগতে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য অতৃপ্তির উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। তৃপ্তিতে কাম্য আর কিছু থাকেনা বলিয়া শ্রান্তির শিথিল অবসাদে চাহিবার শক্তিরও অভাব ঘটে। পাওয়া যার সব হয়ে গেছে—আশা করিবার, চাহিবার যার আর কিছু নাই সে বাঁচে না, তার বাঁচিবার কোন কারণই নাই। রসকলাকোবিদ বৈষ্ণব কবি এই অতৃপ্তির একাগ্রতা ও সমগ্রতাতেই আমাদের অনুভূতির আধার আলোড়িত করিয়া গাহিয়াছিলেন :—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।

নব্যতন্ত্রের নীতিবাদী কেহ কেহ মনের বেলাতটে মদির অধীরতায় উচ্ছ্বসিত রূপ-লালসার এই কূলহারা তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে চিরপ্রিয় অথচ চিরনিন্দিত কামের আক্ষেপ—"মদন তরঙ্গ"—বলে নিন্দা করেন। তাঁরা ভুলে যান যে আসক্তি না থাকিলে সৌন্দর্য্য থাকে না এবং আনন্দের উদ্বোধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে কামনার কূলে উপকূলে এই যে অতৃপ্তির অনন্ত উচ্ছ্বাস, ইহার মূলে সার্থকতা লাভের জন্য আসক্তির ক্রন্দন। হতে পারে ইহার প্রেরণা "অন্তের মাঝে অনন্তের স্পর্শন"—হতেও পারে ইহার প্রেরণা প্রেম। যাই হোক ইহা যে শক্তির কথা দীপ্তির কথা সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকা সম্ভব নয়।

বৈদিকযুগে, রামায়ণের আমলে মহাভারতের দিনে যখন মানুষ সত্যকে অন্তরের মধ্যে মানিত তখন যে শিক্ষা দীক্ষা আমাদের দেশে চলিত—তা ছিল অখণ্ড ভোগমূলক সজাগ সরস সক্রিয় শিক্ষা দীক্ষা। পুরাণের দেবদেবীর চিত্ত ও ভোগ লালসায় বেশ আচ্ছন্ন। সংস্কৃত সাহিত্য ও যৌবনের ভোগ-বিলাসের ছবিতে ভরা। তাই সে সাহিত্যে ত্যাগী সিদ্ধার্থ বুদ্ধের কথা তত বেশী নাই কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক বৎসরাজ ভোগী উদয়নের কথায় তাহা ভরপুর, তাই সে সাহিত্যে অশোক ফোটে রূপসী তরুণীর রাঙা কোমল পাদস্পর্শে আর বৈশাখী বকুল

বিকশিত হয় তাহার কুটিলকুন্তল শ্রীমুখের মদির মধুস্রাবে। প্রাচীন যুগের সে শিক্ষা দীক্ষা সে সমর্থ-সতেজ কর্ম্মৈষণা ঘুচাইয়া দিলেন বুদ্ধদেব বাক্য মনের অগোচর নিঃস্ব নির্ব্বাণের লোভ দেখাইয়া। তার পর যে টুকু বাকী ছিল সেটুকু শেষ করে দিলেন শঙ্করাচার্য্য, সংসারকে—সংসারের কেন্দ্র কনককে এবং সংসার ফণীর মণিমন্ত্র মহৌষধি কান্তাকে মায়ার ফাঁদ অতএব হেয় ও ত্যাজ্য জ্ঞান করিতে শিখাইয়া ও ভোগকে ভোগের জয়শ্রীকে মুক্তির অন্তরায় বলিয়া বুঝাইয়া। দীন দুঃখী অনাথ আতুরের অশ্রুজলে অভিষিক্ত ভগবান তথাগত বোধিদ্রুমতলে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন—সন্ন্যাসী শঙ্কর পরাগতি পাইলেন; কিন্তু ভারত বৈরাগ্যকে অভয় জ্ঞান করার ফলে লাভ করেছে জড়তা ও নিজ্জীবতা এবং কূর্ম্মবৃত্তি বশতঃ তার দুঃখেরও আর অবধি নাই। ভোগের পথে অন্তরের বহির্মুখী যাত্রা বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতের লক্ষ্মীছাড়াভাব স্থায়ী হয়ে গেছে।

আধুনিক ইতিহাসেও দেখি যে জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাবুদ্ধি ঋদ্ধি সিদ্ধি শৌর্য্য বীর্য্য কাব্যকলা ঐশ্বর্য্যবিলাসে উন্নতিশীল জাতি সমূহ ভোগের ধ্যানধারণায় আত্মবিনিয়োগ করিয়া জাতীয় সাধনার বিবিধ বিভাগে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং বিশ্ব আলোড়ন করিয়া ভোগোপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক মহা কল্যাণে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। আর চক্ষুকর্ণের অগোচর, ভাষার অতীত, অজ্ঞাত অজ্ঞেয় নিঃশ্রেয়সের লোভে আত্মপ্রত্যয়ের অখণ্ড ধারণা, স্বানুভূতির অভ্রান্ত প্রেরণা অগ্রাহ্য করিয়া দৈন্যকে অযথা ঐশ্বর্য্যের সম্ভ্রম দিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত শাকান্নে তৃপ্তিপ্রয়াসী ভারত অর্জ্জনমূল মমত্ববোধময় ভোগে উদাসীনতার অধর্ম্মের ফলে ভবের হাটে সব হারানো পথের ভিখারী। জীবনটাকে "নেতি, নেতি" বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিতর আপনাকে পাইতে গিয়া শোচনীয় হীনতা দীনতার চোরাবালির মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে। ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না যে জাতি যখন উঠেছে ভোগের জন্যই কাম্য লাভের চেষ্টায় উঠেছে এবং টিঁকেছে যতদিন ভোগের শক্তি বজায় রাখতে পেরেছে এবং তার অধঃপতন হয়েছে যে দিন ভোগের তপস্যায় অবহেলা করিয়া ভিক্ষুর ধর্ম্ম—ভিখারীর ধর্ম্ম-বৈরাগ্যের অসংখ্য বন্ধনকে বরণ করিয়াছে—তা ইচ্ছা করিয়াই হোক বা কথামালার সেই নিরাশ নিরুপায় অশক্ত কাজেই সংযমী জীবটীর মত শক্তি ও যোগ্যতার অভাবেই হোক। এ বিশ্বে যার জীবন পথে লক্ষ্মী কার্ত্তিকেয়ের চরণ ধূলি পড়ে না সেই হৃদয়কে ঠকিয়ে মনকে "চোখ ঠারিয়া" "নিরীহ" বৈরাগ্যে সুখ ও শ্লাঘা বোধ করে এবং ক্রমে ক্রমে ধনে, শক্তিতে, স্বাস্থ্যে ফতুর হইয়া কালচক্রীলের অন্তরালে ডুবিয়া যায়।

আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে চিরব্যগ্র সুস্থ অখণ্ড সহজ মানবের ভোগপরায়ণ চিত্ত থাকিবে তাহার মর্ম্মতল কাঁপানো স্মৃতি ও আশা থাকিবে, ভোগায়তন দেহ থাকিবে, ভোগের পারিজাত সুবাস থাকিবে অথচ ভোগকে কাছে আসিতে দিবনা, ইহা সম্ভব নয়। জ্ঞানকে শাস্ত্র কারাগার থেকে মুক্তি দিয়া ভোগে, ও ভোগের জয়শ্রীতে সত্যের জ্যোতিঃ দেখিয়া ও দেখাইয়া রূপরসগন্ধ গানের

উদ্ভাসিত আলোর নির্ব্বারিত স্রোতে নানা চরিতার্থতায় নিজকে ভাসাইয়া দেওয়াই যুক্তিবাদী উদার মানবধর্ম্মের সার কথা।

এরূপ অবস্থায় ভোগ আমাদের অন্তরে বাহিরে লক্ষ্য হউক, গতি হউক, পরিণতি হউক, আশ্রয় হউক, নির্ভর হউক, কামনা হউক, সাধনা হউক। বসন্তের আনন্দের মত ভোগানুরাগ ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচারে উৎসবে, সাহিত্যে সমাজে শিল্পে কলায় আমাদের নিত্য নিরন্তর নেতা ও নিয়ামক হউক. "আত্মনঃশিবায় জগদ্ধিতায় চ।"

সমাপ্ত

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়

স্যাঙ্গাতো

(গল্প)

(১)

তখন আমি মেসে থাকিয়া বি, এ, পড়ি। সেবার গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে আমাদের পুরাতন ঠাকুর বাড়ী যাইবে বলিয়া একটি নূতন ঠাকুর আসিল। বয়স তাহার আঠার উনিশ হইবে। দেখিতে সে কালো বটে, কিন্তু তা'তে একটা বিশেষ শ্রী ছিল। দেখিলেই মনে হইত, কেহ যেন তাহাকে পাথর কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। আমাদের পুরাতন ঠাকুর সেই ছোট ঠাকুরটির হাত ধরিয়া আমাদের নিকট আনিয়া কহিল,—'বাবু, এ খুব ভাল ঠাকুর, পণ্ডিতবংশ'। শুনিয়া আমার হাসি আসিল, বলিলাম—'হাঁ, সে ত' বটেই, নইলে কি আর হাঁড়ি ঠেলতে আসে!' দেখিলাম ছোট ঠাকুরটির চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সে ভাঙ্গা বাংলায় উত্তর দিল—'হাঁ বাবু, মোর বাপ্প বড় পণ্ডিত থিলা। তাঁকর কেতে্তা পুস্তক অছি।' শুনিয়া আমি অবিশ্বাস করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর কিছু বলি নাই।

তাহার নাম ছিল বনমালী। আমারও নাম যে বনমালী তাহা সে জানিত না। একদিন কলতলায় স্নান করিতেছি, এমন সময় শশধর বলিয়া উঠিল—'বনমালী বাবু, আপনার একখানা চিঠি এসেছে।' আমি কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, ঠাকুর বনমালী আমাকে বলিল—'বাবু, আপঙ্কর নাম কঁড় বনমালী? তল হউছি, মু তোমর স্যাঙ্গাতো। বাবু মোর স্যাঙ্গাতো হব? মোর আউ কোন স্যাঙ্গাতো নাই।' ইহার উত্তর আর আমায় দিতে হইল না। মেসের উহারাই চীৎকার করিয়া উঠিল —'হাঁ হাঁ, হব না কাঁহি?' বলিয়াই আমাকে কহিল—'বনমালী বাবু, আপনি তা'হলে ওর স্যাঙাত

হলেন।' সেই মুহূর্ত্তে সেই কাল বনমালীর মুখ উৎসাহে যেরূপ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি অনেক দিন ভুলিতে পারি নাই।

ইহার পর হইতে কাজে অকাজে সে—'ও স্যাঙ্গাতো, ভল অছ ত?' বলিয়া যে হাসি হাসিতে আরম্ভ করিত, তাহার আর কূল কিনারা থাকিত না। সেদিন ত' সে আমাকে রীতিমত জ্বালাতন করিয়াই তুলিল। 'স্যাঙ্গাতো, তোমার বাড়ী কোন্ জিলা? বাড়ীরে আউ কোন অছি? মু তোমর দেশকু যিম।' তাহার এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার ঘৃণাবোধ হইত। মেসের উহারাই আমার হইয়া, তাহার এই সব বেয়াদব প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাকে খুসী করিত।

একদিন রাত্রি প্রায় এগারটার পর খাইয়া দাইয়া শুইবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় বাহির হইতে বনমালী চীৎকার করিয়া উঠিল—'স্যাঙ্গাতো, মু আসিলা।' সে আর কোন কথা না বলিয়া সত্যনারায়ণের সিরনির মত খানিকটা আটা গোলা, নারিকেল কোরা ও খান কয়েক বাতসা আমার সামনে রাখিয়া বলিল—'হরিপূজা হই গলা স্যাঙ্গাতো; মু প্রসাদ আনিলা। তোস্তে বাঁটি নিঅ।' সেদিন আমার বাস্তবিকই রাগ হইয়া গিয়াছিল। এই খানিক আগে খাইয়া দাইয়া শুইবার যোগাড়ে আছি, ইহার পরে কি আর ছাই পাঁশ খাওয়া চলে? আমি বলিলাম—'না, বনমালী, তুমি ওসব নিয়ে যাও। ও সব আমি খেতে পারব না।' সে আতঙ্কে দুইবার 'নাড়ায়ণ!' 'নাড়ায়ণ!' করিয়া উঠিল। পরে অনুনয় করিয়া বলিল—'টিকে নিও স্যাঙ্গাতো। ঠাকুর গোঁস্সা করিব।' কি জ্বালাতন রাত দুপরে! এ' কি সহ্য হয়? তাহার সেই প্রসাদ লইয়া, ছুঁড়িয়া তাহার গায়ে ফেলিয়া দিলাম। সে ব্যাগ্রভাবে সেটা কুড়াইয়া লইয়া, হাতশুদ্ধ আমার কপালে আমার বাধা সত্বেও একরকম জোর করিয়াই ছোঁয়াইয়া দিল। আমিও রাগের মাথায় তাহাকে ধু'কা দিয়া বিদায় করিলাম। সে কিন্তু তেমন রাগ করিল না; আপন মনেই কেবল একবার বলিয়া উঠিল—'স্যাঙ্গাতঙ্কর আজিরে মন ভাল নাই।'

(২)

গ্রীষ্মের বন্ধের পর কলেজ খুলিলে আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের পুরাতন ঠাকুর ফিরিয়া আসায় সে চলিয়া গিয়াছিল। বি, এ, পাশ করার দুই বৎসর পরে আমি চাকুরীর প্রত্যাশায় সাহেব সাজিয়া একদিন একজন সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলাম। সবে কেবল ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ছাড়াইয়া ওয়েলেসলীতে পা দিয়াছি এমন সময়ে দেখি—কোথা হইতে বনমালী ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। সে আসিয়া বিনা দ্বিধায় আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —'স্যাঙ্গাতো, ভল অছ ত? বাড়ীরে সব ভল?' চীর-পরিহিত নোংরা ঠাকুরের এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ক্রোধে আমার বাকরোধ হইয়া গেল। পরক্ষণেই তাহাকে মারিবার জন্য বিলাতী কায়দায় ঘুঁসী পাকাইয়া উঠিলাম। সে একটুও নড়িল না, শুধু হাসিয়া বলিল—'ইমিতি

হউছি কাঁই স্যাঙ্গাতো ? মো সাঙ্গেরে কঁড় দঙ্গা করিব ? পারিব না স্যাঙ্গাতো, পারিব না। তোমর লাগিব।'

আমি তাহাকে একটি ঘুঁসি মারিতেই, সে আমার হাত ধরিয়া কহিল—'স্যাঙ্গাতো, গোঁস্‌সা করিছু কাঁই ?' পরক্ষণেই মধুর স্বরে বলিল,—'ঘর পাকু যাইথিলা, দেশেরে সব ভল ত ? মা ভল ? স্যাঙ্গাতো, মোর মা বাপ্প সবো মরি যাউচি। তোর মা পাখেরে মু যিবি। নেই যিব ত স্যাঙ্গাতো ? মু তোর ঘরকু রহিবি, পাক সাক করি খাইকিরি, মা ভাই ভউনী নেই কিরি মজ্জা করিমি।' সে হাসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—'স্যাঙ্গাতো, তোমর বাহা হউচি ?'

কি জানি কেন হঠাৎ আমার রাগ পড়িয়া গেল। 'তোর মুণ্ডু হয়েছে' বলিয়া আমি তাহার হাত ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চতুর্দ্দিকে তখন লোক গিস্ গিস্ করিতেছে। যাইতে যাইতে শুনিলাম সে চীৎকার করিতেছে—'হাঁ হাঁ, মোর স্যাঙ্গাতো সাব হউচি, হাকিম হউচি। ভল হউচি। মু তাঁকর পাটীরে যিমি। মোর স্যাঙ্গাতো—হাঁ হাঁ—।' তাহার এই প্রলাপ শুনিতে শুনিতে আমি চলিয়া গেলাম। ইহার পর হইতে আমি প্রায়ই তাহাকে সেইখানে দেখিতে পাইতাম। সে প্রতিদিন একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিত ও মাত্র একটি প্রশ্ন করিত—'স্যাঙ্গাতো, ভল ত ?' তাহার এই বিরক্তি আমার সহ্য হইয়া আসিয়াছিল। আমি কোনও দিন তাহার এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম, কোনও দিন বা উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইতাম। তাহাতে কিন্তু তাহার কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে শুধু প্রশ্ন করিয়াই খুসী হইত ও তাহার স্যাঙ্গাতের গুণ বর্ণনা করিয়া সকলকে শুনাইয়া স্যাঙ্গাতের গর্ব্বে নিজের গৌরব মনে করিত।

(৩)

ইহার পর দশ বারো বৎসর আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই। আমি নিত্য-নিয়মিত এখন ওয়েলেস্‌লীর ঐ একই পথে যাতায়াত করি। আমার এই দশ বারো বৎসরের মধ্যেই অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছে। আফিসে যাওয়া আসা—নিত্যকার ঐ একঘেয়ে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই সময়ে সময়ে অসহ্য বর্ত্তমান ছাড়িয়া মন অতীতে উড়িয়া যায়। ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের কাছে আসিলেই মনে পড়ে, সেই উড়ে ঠাকুরটীকে। সেই কেবল একা আমায় বড় বলিয়া জানিত ও মানিত ; কারণে অকারণে আমার সকল তাতেই গর্ব্ব অনুভব করিত। সেই আমি আজ 'বাহা' করিয়াছি, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, চিন্তা বাড়িয়াছে ; আর তার মত সদা হাসিভরা মুখ একটি ঠাকুরের কামনাও মনের মধ্যে কত বার উঁকি দিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর তাহাকে পাই নাই।

সেদিন রাত্র দশটার পর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। কন্যার বিবাহের একটি পাত্র অনেক চেষ্টায়ও স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণমনে একাকী পথ বাহিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের কাছে আসিতেই দেখি—দুইজন লোক আমার অনুসরণ করিতেছে। তাহারা যে ভাল লোক নয়, গুণ্ডা, তাহা কলিকাতাবাসী আমার বুঝিতে একটুও দেরী হইল না। কিন্তু ভয়ে

তখন আমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। সহসা তাহাদের হাতে ছোরা চক্ চক্ করিয়া উঠিল। আমি ভয়ে চোখ বুঁজিলাম। হঠাৎ ধস্তাধস্তির শব্দে চাহিয়া দেখি—কোথা হইতে একটি নধরকান্তি যুবক তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া তাহাদিগের সহিত লড়িতেছে। আমার মনে হইল আমার তাহাকে সাহায্য করা উচিত। তজ্জন্য অগ্রসর হইতেই সেই কালো লোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল—'পড়া স্যাঙ্গাতো পড়া; ইয়ে ডাকু ধরিছে, পড়া।'

পুলিশের আগমনে গুণ্ডা দুইজন পলাইয়া গেল। বনমালীর গায়ে তখন রক্তধারা বহিতেছে। তাহার শরীরের দুই স্থানে ছোরার গভীর আঘাত লাগিয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় সে কহিল—'সাত রাত করি কিরি ইমিতি বাহারকু যিব নেই স্যাঙ্গাতো' পরে সুর টানিয়া পুনরায় বলিল—'স্যাঙ্গাতো, কালিরে আসিব ত? খুব ভল হউচি স্যাঙ্গাতো, খুব ভল হউচি। যদি আউ টিকে দেরী হই থান্তা—তু' ত' মরি যাইথান্ত। জগড়নাথ রাখিলা।'

সেখানে সে কেমন করিয়া আসিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, এমন সময়ে সে পুনরায় কহিল—'স্যাঙ্গাতো, মু আউ তুমকু ছাড়িবি না। এত বরষ ধরিকিরি মু ঘরকু থিলা মন ভাল থিলা নেই। কালি রাত্তিরে মু রেল চড়ি বসিলা, আজি রাত্তিরে এঠিরে আসি জমা হইলা। ভল হউচি স্যাঙ্গাতো, ভল হউচি, জগড়নাথ রক্ষাকর্ত্তা।'

সে বলিতে বলিতে ক্ষতের বেদনায় শ্রান্ত হইয়া কহিল—'মু ভল হইকিরি তোমর সাঙ্গেরে রহিমি—আউ তোমকু ছাড়িমি না।'

পরদিন হাসপাতালে গিয়া দেখি সে অনেকটা ভাল। জিজ্ঞাসা করিলাম—'সাঙ্গাতো, তুমি আমার জন্য এই বিপদে মাথা দিলে কেন?' সে উত্তর দিল—'কাঁইকি পচারিছ? তুম্ভে যে মোর স্যাঙ্গাতো।'

ইহার পূর্ব্বে তাহাকে আর কোনও দিন স্যাঙ্গাতো বলিয়া ডাকি নাই। ডাকিতে প্রবৃত্তিও হয় নাই। সেইদিন আমি প্রথম তাহাকে স্যাঙ্গাতো বলিয়া ডাকিলাম। তার পরে সে ভাল আছে ভাবিয়া দুইদিন দেখিতে যাই নাই। তৃতীয় দিন গিয়া শুনি সে আর নাই। হঠাৎ টঙ্কার হইয়া এক দিনের মধ্যেই মারা গিয়াছে।

* * *

তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এখনও ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের ধারে আসিলেই আমার কাণ খাড়া হইয়া উঠে ও আমি বেশ দেখিতে পাই একটি কালো ছোট্ট উড়িয়া ঠাকুর হাসিমুখে আমায় বলিতেছে—'স্যাঙ্গাতো ভাল আছ ত?'

শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফরাসী শিক্ষা-বিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"উদার-শিশুশিক্ষার" প্রণালী-সমূহ লোক-শিক্ষার কার্য্যে কিরূপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ফ্রান্‌স এই সমস্যাটির সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নূতন সমস্যা :—পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীতে সমবেত শিক্ষাকার্য্যে একটা প্রামাণিক পদ্ধতি ভিন্ন চলিত না, এমন কি শিশু-শিক্ষা সংক্রান্ত উপন্যাসেও ব্যক্তি বিশেষকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। কঠিন সমস্যা, কেননা একটা ক্লাস্‌কে "সঙ্কেতের দ্বারা, বেত্রের দ্বারা শাসন করা যদি সহজ হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার মূলতত্ত্ব ও সমবেত জীবনের প্রয়োজনীয়তা এই দুয়ের মধ্যে একটা অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না কি ? Emeleগণের ক্লাস সম্বন্ধে কি কোন ধারণা করা যায় ? যে সব শিশুকে স্বাধীন মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহ, তাহাদিগকে কিরূপ শাসনের অধীন করিবে ? এই যে সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছে ইহার গৌরবের ভাগী ফরাসী বিপ্লব ; এবং এই সমস্যার কঠিনতায় পশ্চাৎপদ না হইবার গৌরব তৃতীয় রিপব্লিকের।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সভাগুলা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, আত্মশাসনের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিলে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ভার অগত্যা গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল সভ্য এই সম্বন্ধে নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আহূত হয় তাহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত হইয়াছিল। রাষ্ট্রতন্ত্র ফরাসীদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছিল। এই স্বাধীনতা আইনের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইল। কিন্তু শিক্ষাই স্বাধীনতার গোড়ার কথা গোড়ার নিয়ম ; রীতিনীতির মধ্যে যাহাতে স্বাধীনতার ভাব প্রবেশ করে, এই উদ্দেশে রাষ্ট্রের জনসমূহকে জ্ঞানালোক প্রদান করা আবশ্যক। তাছাড়া প্রকৃত শিক্ষাই প্রকৃত রাষ্ট্রজনিক একতার গোড়ার কথা এবং লোক-ধর্ম্মনীতির একটা উপাদান। এই মূলতত্ত্বগুলি স্থাপিত হইলে, বড় বড় রাষ্ট্রবৈপ্লবিকেরা নিজ নিজ মানসিক প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার এক একটা প্রণালী কল্পনা করিলেন। Condarcet শিক্ষাকার্য্যের একজন প্রতিষ্ঠাতা ; তিনি বিভিন্ন ধাপের পাঠশালায়, বিস্তৃত জাল দেশময় প্রসারিত করিয়াছিলেন—(প্রাথমিক পাঠশালা, মধ্যমিক পাঠশালা, 'ইন্‌ষ্টিটিয়ুট্' 'লিসিয়ম্' শিল্পবিজ্ঞানের জাতীয় সম্মিলনী)।

তিনি বিদ্যালয়ের পাঠাবসানে উত্তরকালীন শিক্ষা, ব্যবসায়িক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা—যাহা পুরুষ শিক্ষারই ঠিক অনুরূপ—এই সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। Lakanal একজন শিক্ষা প্রবর্ত্তক। তিনি প্রণালীর উপর বেশী জোর দেন। তিনি সহজ প্রত্যয় (intuition) ও প্রত্যক্ষ তাথ্যিক (conerete) শিক্ষার পক্ষপাতী ; তিনি শিক্ষক গঠন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন—"Normal School"এর কল্পনা ও নামের জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। কিন্তু এই সব কল্পনার খুঁটিনাটি ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে কিছু আসিয়া যায় না, আসল কথা এই যে, এই

কল্পনাগুলা গণতান্ত্রিকভাবে অনুপ্রাণিত ও অরাজকীয়। তৃতীয় নৈর্থন্ত্রিক আমলের সমস্ত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রচনার অঙ্কুর রাষ্ট্রবিপ্লবিক লোকদিগের কার্য্যবিবরণে নিহিত আছে।

এই অঙ্কুর গজাইয়া উঠিবার পূর্ব্বে, প্রায় এক শতাব্দী কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফরাসী শিক্ষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ অনুর্ব্বর ছিল। সাম্রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, পুরাতন পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরন্তন প্রথায় আবার ফিরিয়া আসিল। এবং "পুনরাবির্ভাবে"র (Restoration) আমলে অন্য কোন আদর্শ ছিল না। যে জনসমাজ বৈপ্লবিক জনসমাজের বিরুদ্ধে কাজ করিতে চাহে, সে জনসমাজ মনোরাজ্যের নূতন কোন পথপ্রদর্শক অন্বেষণ করে না। অতীতের পথপ্রদর্শকই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। পূর্ব্বোল্লিখিত ম্যাডাম নেকেরের গ্রন্থে দেখা যায়, Mme de Genlis, Mme Campan, Mme de Remusat, ও Mme Guizot.—ইঁহারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অতীব হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর আসিল একটা মানসিক 'গঞ্জনের' যুগ। আবার রাষ্ট্রবিপ্লবিক ধারণাগুলার পুনরাবির্ভাব হইল। প্রত্যেক 'সোসিয়ালিষ্ট' সম্প্রদায়ের শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে এক একটা নিজস্ব মতবাদ ছিল।

Consederant, উত্তম Fourier-শিষ্যেরই মতো, "স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক" এক শিক্ষা প্রণালী বিবৃত করিলেন। তাহাতে আলোচিত হইল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, এবং বিপ্লবতন্ত্রের অন্তর্গত শিশুশিক্ষা প্রণালী। Dupawloup প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তি এই শিশুশিক্ষা পদ্ধতির প্রতিবাদ করিলেন; Mechelet ও Quenet প্রভৃতি কেহ কেহ কতকটা উহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। Mechelet, "মানুষের স্বাভাবিক সাধুভাব" সম্বন্ধে রুসোর সন্দর্ভ পুনঃ গ্রহণ করিয়া, যাজক-মণ্ডলীর অনুমোদিত শিশুশিক্ষা পদ্ধতির প্রতিবাদ করিলেন, এবং উন্মত্ত আগ্রহের সহিত, মাতৃক্রোড় হইতে আরম্ভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের অনুক্রমণিকা বিবৃত করিলেন। Quenet পরম্পরাগত শিশুশিক্ষা পদ্ধতি এবং আধুনিক জনসমাজের মতামত—এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাইয়া, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটা গভীরতর সংস্কার করিতে চাহিলেন এবং সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়িক মত বিশ্বাসের বহির্ভূত স্বতন্ত্রভাবে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে চাহিলেন।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিদ্যামন্দিরসমূহের মধ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Guizot ভোটের দ্বারা একটা আইন পাশ করাইলেন যে, ফ্রান্সের প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে এক একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং একটি সুন্দর "পত্রে", প্রতিষ্ঠাতাদিগের নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ একই সচিব আমাদের উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষার কল্পনা করিয়াছিলেন এবং গুরু তৈরী করিবার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে Victor Duruy আরও নূতন উন্নতি সাধন করেন। স্ত্রীশিক্ষার সৃষ্টি হইল। পুরুষদিগের মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর ক্লাসিক সাহিত্যের পাশাপাশি

একটা "বিশেষ" শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল; এখন যে শিক্ষা কত দেশে সতেজে চলিতেছে সেই আধুনিক শিক্ষা বা "বাস্তব" শিক্ষাই এই বিশেষ শিক্ষার মূলাদর্শ। Duruy পাঠ্যের অনুক্রমণিকা (programme) বাড়াইলেন। কোন এক প্রবল প্রভুত্বশালী গভর্ণমেণ্ট, স্বাধীন আত্মা গঠনে সন্দেহ করিয়া যে দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাসকে আমাদের বিদ্যামন্দিরসমূহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, সেই দর্শন ও ইতিহাসকে Duruy পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি প্রাথমিক পাঠশালায় ঐতিহাসিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিলেন। অর্থাৎ তিনি শিক্ষককে শুধু লিখন পঠন ও অঙ্কের শিক্ষক বলিয়া মনে করিতেন না; তিনি মনে করিতেন, শিক্ষক ফরাসীদিগকে রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী শিক্ষা দিবে। এইরূপে বড় বড় সচিবের কৃপায় বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলা গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে মুখ ফিরাইল। সেই সময় বড় বড় লেখকেরা এই আদর্শের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

রৈপব্লিকের আবির্ভাবে এই আদর্শ শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। ১৮৭০-র যুদ্ধের পরেই, রাজনীতিজ্ঞ রাজপুরুষ ও বিদ্বজ্জনেরা আমাদের সকল ধাপের স্কুলগুলাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সকল নব প্রতিষ্ঠান ও নব সংস্কারের খুঁটিনাটির বিবরণ আমরা বলিতে চাহি না। আমরা শুধু উহার মর্ম্মভাবটা ইঙ্গিত করিব।

এটা কি বলা আবশ্যক যে, যে-মর্ম্মভাব উচ্চতর শিক্ষা সংস্কারের পরিচালক ছিল, সেই মর্ম্মভাব স্বাধীনতার মর্ম্মভাব ছিল কি না? কোন বৈজ্ঞানিক কার্য্য স্বাধীনতা ব্যতীত নির্ব্বাহিত হইতে পারে বলিয়া কি কল্পনা করা যায়? উচ্চতর শিক্ষার প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যাহারা স্বাধীনতার দাবী কম করে, তাহারাই যে কম উদার প্রকৃতির লোক হইবে তাহা নহে। অতএব, দুই শিশুপাঠ পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল, এই বিষয়ে ইতস্ততঃ করিবার পক্ষে কোন কথা উঠিতে পারে না; সেই সংস্কারটাই সব চেয়ে ভাল, যে-সংস্কার বৈজ্ঞানিক উদ্যমাগ্নির প্রভূত খাদ্য ও আহুতি যোগাইয়াছে। ইহাই ১৮৯৬ অব্দের আইনের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলা বিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া মুমূর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাবিভাগের পরিবর্ত্তে আরও সারবান বিদ্যাবিভাগ গঠিত হইল, উহাদিগকে স্বাধীন গবেষণার জ্বলন্ত চুল্লি করিয়া তোলা হইল।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেই প্রামাণিক শিশুশিক্ষার পরম্পরা যারপর নাই জেদের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ উহার তেজ কমিয়া আসিল। যাহা লোকে মনে করে ক্লাসিক সাহিত্য চর্চ্চার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র, তাহা আসলে সেই উন্নতি-পথের অনুসরণ, যে পথ দেকার্ত্ত, Part Royal, এমন কি Bossuet পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ল্যাটিন পদ্য যে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহা ল্যাটিন বলিয়া নহে, পরন্তু যুবকদিগের উপর এক কৃত্রিম ও অনুর্ব্বর ভার চাপানো হয় এই জন্য। ঐ একই কারণে Bossuet তাঁহার ছাত্রদিগের সহিত কথোপকথনের সময় ল্যাটিন ভাষা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে সব অভ্যাসে কেবল একটা শাব্দিক

নৈপুণ্য ও স্মৃতিমূলক যান্ত্রিক দক্ষতা উৎপন্ন হয়, তাহা সেই সব অভ্যাসের স্থান অধিকার করে, যাহার দ্বারা মানসিক কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। সংস্কারের এই মূল সূত্রটিই ১৮৮০-র কাছাকাছি কোন সময়ে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, আবার ইহাই ১৯০২ অব্দের সংস্কারের মূল সূত্র। আমাদের বিদ্যামন্দিরে শুধু নূতন বিভাগ, নূতন পাঠক্রম, নূতন ধরণের বি-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করাই যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা নহে, পরন্তু বিশেষ করিয়া নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করাও উদ্দেশ্য ছিল; যথা, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষায় হস্ত ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নির্দ্দিষ্ট সময় এবং উৎকৃষ্ট লেখকদিগের গ্রন্থ পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় আরও বৃদ্ধি করা হইল, সাহিত্যিক ইতিহাসের ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম রহিত করা হইল। এই সকল উপায়ে যুবকেরা যাহাতে সাক্ষাৎভাবে, বৈজ্ঞানিক সত্যের সংস্পর্শে ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার সহিত ১৭ ও ১৮ শতাব্দীর বড় বড় শিক্ষকের মতসাম্য পরিলক্ষিত হয়। এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই উদার শিক্ষার ভাবে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিয়মতন্ত্রের সংস্কার সংসাধিত হয়।

এই উদারনৈতিক শিশুশিক্ষার ভাবে প্রাথমিক শিক্ষারও নিয়ম-কানুন গঠিত হয়। বলিতে গেলে, তৃতীয়-রেপাব্লিকের দ্বারাই এই শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্ট হয় এবং ভারাক্রান্ত প্রাচীন প্রথা পরম্পরা ইহার উন্নতির অন্তরায় হয় নাই। ইহার বিপরীতে, শিক্ষাপ্রবর্ত্তকদিগের শিক্ষা প্রণালী হইতে যে সকল নূতন সমস্যা সমুত্থিত হইল, এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে শিক্ষাপ্রবর্ত্তকরা একটু মুস্কিলে পড়িলেন। ধর্ম্মমত-নির্ব্বিশেষে সকল শিশুদেরই জন্য এই প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত থাকায়, ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই ঠিক বলিয়া মনে হইল। অতএব ধর্ম্মমত বিশেষের দৃষ্টিভূমি হইতে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা অসম্ভব হইল। Jules Ferry-র বাক্য অনুসারে, সকল দেশের ও সকল কালের সজ্জনদিগের ধর্ম্মনীতিই শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শুধু সার্ব্বভৌমিক পরম্পরার দোহাই দেওয়া নহে, যাজকেতর শ্রেণীর উপর একটা আইনও জারি হইল। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে ইহা একটা মস্ত বিপ্লবের ব্যাপার:—ইতিহাসের মধ্যে, এই সর্ব্বপ্রথম কোন এক জাতি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া, নব্যবংশীয় যুবকদিগের শিক্ষা যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর স্থাপন প্রতিষ্ঠিত করিল।

শুধু নৈতিক শিক্ষার সম্বন্ধেই যে শিক্ষাপ্রবর্ত্তক এইরূপ যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়াছেন তাহা নহে। সমস্ত নিয়ম শাসনের মধ্যেও এই প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে; স্মরণ শক্তিকে অবহেলা করা হয় নাই। শিশুর বয়স যত কম, স্মৃতিশক্তির প্রয়োগ ততই বেশী করা হইয়াছে। কিন্তু স্মৃতির কোথাও একাধিপত্য নাই,—এমন কি মাতৃ পরিচালিত পাঠশালাতেও নাই। যাহা কিছু টুলোধরণের সমস্তই "মাতৃ পাঠশালা" হইতে শিক্ষাদাত্রীগণ নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। যতদিন শিশুগণ পুস্তক ও 'কপি-বুক' ব্যবহার করিবার বয়সে উপনীত না হইবে, ততদিন তাহাদিগের জন্য এরূপ স্বাস্থ্যময় উপাদেয় ও আনন্দপ্রদ পারিপার্শ্বিক গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে শিশু স্বাধীন

ভাবে বিবসিত হইবে, নিজের-চোখ্ ও নিজের হাত ব্যবহার করিতে পারিবে, ভৌতিক ও নৈতিক কতকগুলি ভাল অভ্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে। রুসো ১২ বৎর বয়সের পূর্ব্বে শিশুদিগকে মানসিক শিক্ষা দিতে চাহিতেন না—কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়ি। আমরা বলি, অন্ততঃ ৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুদিগকে মানসিক শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে—কোন কেতাব-ঘটিত সরঞ্জামের সংস্পর্শে তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। এই বয়সে, শিক্ষা ও লেখার ভিতরে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা যায় না।

যে পরিমাণে শিশু বাড়িতে থাকিবে, সেই পরিমাণে বিদ্যালয়ে তাহার মানসিক শিক্ষা অধিকতর আবশ্যক হইবে। কিন্তু শিক্ষায়, উদার নীতি রহিত হইবে না। আমাদের মতে, সেইরূপ ছাত্রের 'ক্লাস্' উৎকৃষ্ট ক্লাস নহে, যে ক্লাসে নিশ্চেষ্ট শিশুরা, নিজে হাতে কলমে কিছু না করিয়া শুধু শিক্ষকের কথা লিপিবদ্ধ করে এবং শিক্ষকের আদর্শে উহা পুনঃ প্রকাশ করে। আমরা চাই যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে প্রশ্ন উত্তরের অবিরাম আদান প্রদান হয়—যাহাতে করিয়া শিশুর মন জাগিয়া উঠিতে পারে।

এই জীবন্ত ধরণের ক্লাসে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়? যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। বিশ্বকোষিক ধরণের না হইলেও বাহ্য দৃষ্টে ইহার অনুক্রমণিকা (pragramme) বিশাল বিস্তৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কতকগুলি গোড়ার জ্ঞান ছাড়া উহার ভিতরে আর কিছুই নাই; ধর্ম্মনীতি ও রাষ্ট্রীয়জনের শিক্ষা উপযোগী শিক্ষা; পঠন ও লিখন; ফরাসী ভাষা; ফ্রান্সের ইতিহাস ও ভূগোল, এবং অন্য দেশ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা; অঙ্ক ও অবশিষ্ট সাধারণ পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান। সকল শিক্ষাই, এমন কি যে শিক্ষা খুব সূক্ষ্মতাত্ত্বিক তাহাও Intuitive অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বুদ্ধি প্রণালী অনুসারে দেওয়া উচিত। "পদার্থ জ্ঞানের উপদেশ" বিনা-পদার্থে দেওয়া উচিত নহে। প্রতি ক্লাসে, একটা ম্যুজিয়ম থাকিবে যেখানে, নানাপ্রকার পদার্থ রক্ষিত হইবে—পাঠকালে শিশুদের চোখের সামনে সেই সকল পদার্থ স্থাপিত হইবে। অঙ্কের সমস্যাগুলির ভিতর যদৃচ্ছা রকমের তথ্য থাকিবে না, পরন্তু চলিত জীবনক্ষেত্রে বাস্তব কার্য্যসকল তাহার ভিতর থাকিবে। ভৌগোলিক শিক্ষা অব্যবহিত সাক্ষাৎ পারিপার্শ্বিক হইতে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং বর্ণিত দেশগুলার সম্বন্ধে চিত্র ও নক্সা ব্যতীত কখনও শিক্ষা দেওয়া হইবে না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ এবং পুরাকালের ও আধুনিক কালের জীবনযাত্রা প্রণালী ও সভ্যতা যেমন যেমন তাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হইবে,—সেই সঙ্গে তাহাদিগকে তৎসংক্রান্ত প্রচুর চিত্রও দেখাইতে হইবে। ব্যাকরণের শিক্ষাতেও সূক্ষ্মতাত্ত্বিকতা দূরীভূত করিবে। আগে দৃষ্টান্ত, তাহার পর নিয়ম আসা উচিত। ভাল ভাল গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে শিশুকে মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

———

বিসর্জ্জন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রশস্ত কক্ষে পালঙ্কের উপরে রোগ-শয্যায় শায়িত বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু হইতে মৃদু মৃদু মুক্তাবিন্দু শীর্ণ গণ্ড বহিয়া মস্তকোপাধানটি ভিজাইতেছিল।

নিকটে বসিয়া সুরেশ পিতার রোগ-যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছিল। পালঙ্কের পার্শ্বে একখানা ক্ষুদ্র টুলের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ও একটি কাচের গ্লাস রহিয়াছে।

সুরেশ হাতঘড়ীটি দেখিয়া, অগ্রসর হইয়া একটি শিশি হইতে সেই ক্ষুদ্র গ্লাসটিতে এক ডোজ ঢালিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা!"

গাঙ্গুলী মহাশয় চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। সুরেশ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "ওষুধটুকু খেয়ে ফেলুন।"

"আর কেন বাবা, এই মহাযাত্রায় আর কেন এত বাধা বিঘ্ন!"

সুরেশ কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া পরে আবার ধীরে ধীরে বলিল, "খেয়ে ফেলুন বাবা।" বলিয়া সুরেশ ঔষধের গ্লাসটি পিতার মুখের নিকটে ধরিল।

গাঙ্গুলীমহাশয় ঔষধ খাইলেন। সুরেশ একখানা তোয়ালে দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিল।

গাঙ্গুলীমহাশয় কিয়ৎক্ষণ নীরবে শুইয়া রহিলেন। সুরেশও নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে গাঙ্গুলী মহাশয় গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "সুরেশ!"

"বাবা?"

"আমার এই কথাটি সত্যই তুমি রাখবে না?"

"কি কথা বাবা?"

"তোমায় অনেকদিন বলেছি, বড় বৌমাকে আবার এঘরে নিয়ে এস। সেই আমার মত গৃহস্থের ঘরের লক্ষ্মী। ভুলক্রমে তাকে যে অন্যায় শাস্তি দিয়েছি, তাই যথেষ্ট হয়েছে। এখন তাকে আবার এখানে এনে গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত কর।"

সুরেশ নীরব। তাহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল। বৃদ্ধ খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার বলিলেন, "আমার কথাটি রাখবে না বাবা?"

সুরেশ নতবদনে জড়িতস্বরে বলিল, "আপনার কথা ত আমি কখনো অবহেলা করি নি বাবা।"

"হাঁ, তাই ত নিঃসঙ্কোচে বলতে পারছি। অন্নদার দিকেও একটু দৃষ্টি রাখা তোমার কর্ত্তব্য। সংসারের কাজ করে, আমার শুশ্রূষা করে, দেখছ ত সে যেন নিশ্বাস ফেলবার সময়ও পায় না।"

"বাবা, কিছুদিনের জন্য চারুকে এখানে আনাব?"

"না না, সে এখন আসতে পারবে না। তাকে আর কেন বাবা? সে আমার মেয়ে হলেও এখন পরের বৌ,—পরের জিনিষ। তাকে আর এখন টানাটানি করা উচিত নয়। তুমি আমাদের ঠিক নিজের একটি জিনিষ, এখানে নিয়ে এস। তা হলেই সব দুঃখ ঘুচবে।"

সুরেশ আবার নীরব। তাহার দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ। গাঙ্গুলী মহাশয় বহুক্ষণ অবধি তাহার কোন ভাবান্তর না দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি যে ক'টা দিন বেঁচে থাকি, অন্ততঃ সে ক'টা দিনের জন্যও তাকে এখানে আনাও।"

সুরেশ অনেকক্ষণ ভাবিয়া, পরে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য বাবা।"

শুনিয়া গাঙ্গুলীমহাশয় হর্ষগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, এবার যেন তুমি শান্তি পাও।"

শুনিয়া সুরেশ ক্ষুদ্র বালকের মতই পিতার বুকে মস্তকটি রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "শান্তি পাব কি? কে—"

গাঙ্গুলীমহাশয় শীর্ণ হস্ত দ্বারা পুত্রের গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "পাবে বৈ কি বাবা। তাকে তুমি এখনো চেননি। আমি এই শেষ সময়ে চিনতে পারছি।"

সুরেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "দোয়াত কলমটা নিয়ে এস বাবা, আমার নামে বড় বৌমার কাছে একখানা চিঠি লিখে দাও; আর, কাউকে দিয়ে নিবারণকে এখানে ডাকাও।"

সুরেশ শ্লথপদে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। গাঙ্গুলী মহাশয় উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুরেশ কর্ম্মচারী নিবারণ ঘোষকে লইয়া আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। হস্তের দোয়াত, কলম, কাগজটা নিবারণের নিকটে রাখিয়া নতমুখে পিতার নিকটে বসিয়া পড়িল।

নিবারণ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দোয়াত কলম দিলেন যে? কি লিখতে হবে?"

সুরেশ অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "একটা চিঠি।" গাঙ্গুলি মহাশয় বলিলেন, "না বাবা তুমি নিজ হাতেই লিখে দাও। তা না হলে হয় ত চক্কোত্তিমশায় দিতে আপত্তি করবেন। তিনি নাকি মেয়েকে নিয়েই কলকাতা চলে যাওয়ার ইচ্ছে করেছেন।"

নিবারণ এতক্ষণ বিস্মিতভাবে বসিয়াছিল। এইবার ব্যাপারটা একটু অবগত হইয়া সে বলিল, "হাঁ, চক্কোত্তি মশায়ের কথা বলছেন। বুড়ী মারা গেছেন কিনা, তাই মেয়েকে একা ত

রেখে যেতে পারেন না, সে জন্য সঙ্গে করেই নিয়ে যাবেন শুনেছি। তাদের যাওয়ার দিন নাকি কাল।"

"কাল ? তা হলে ত আজই এখনি তোমায় সেখানে যেতে হবে। এই চিঠিখানা নিয়ে যাবে, যদি তাঁরা কোন আপত্তি না করেন, তবে পাল্কী করে, বৌমাকে এখানে নিয়ে আসবে। বুঝেছ ?" বলিয়া ব্যস্তভাবে গাঙ্গুলী মহাশয় সুরেশের দিকে চাহিলেন।

সুরেশ কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছিল না। তাহার শরীরটি যে কাঁপিতেছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। নিবারণ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে উভয়ের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। আজি কেন যে হঠাৎ তাহা বড় বধূর প্রতি এতদূর সদয় হইল, তাহাই তাহার বিস্ময়ের কারণ।

গাঙ্গুলী মহাশয় সুরেশকে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আর কেন দেরী করছ বাপু ? সন্ধ্যে হয়ে এল যে। আঁধারে রাত—"

সুরেশ ত্বরিত হস্তে কলমটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখতে হবে বলুন।"

যাহা যাহা লিখিবার গাঙ্গুলিমহাশয় তাহা বলিয়া গেলেন। সুরেশ কম্পিত হস্তে তাহা লিখিতে আরম্ভ করিল। বহুকষ্টে চিঠি লেখা শেষ করিয়া সে তাহা নিবারণের হস্তে দিয়া দিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় তাহাকে কি কি করিতে হইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

পিসিমা সেখানে আসিয়া বলিলেন, "এখন কেমন আছ দাদা ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি ?"

গাঙ্গুলি মহাশয় যেন কি ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "উঁহু।"

পিসিমা সুরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ?"

সুরেশ নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ।" আবার একটু পরে আর এক ডোজ খাওয়াতে হবে।"

"তা, আমি খাওয়াতে পারব। তুই এখন একটু জিরিয়ে নে দেখি। দিন রাত এ ভাবে বসে থাকিস্, এতে কি আর শরীরটা থাকবে ?"

গাঙ্গুলী মহাশয়ও বলিলেন, "হাঁ বাবা, একটু বিশ্রাম কর।" সুরেশেরও আজ বিশ্রামের জন্য একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাই সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

আসিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিল। মনের ভিতর কত কথার ঝড় তুফান চলিতে লাগিল। একদিন সে যাহার প্রেম নিবেদনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করিয়াছে, আজ সে তাহারই কাছে উপকার প্রার্থী হইয়া, পথের পানে চাহিয়া আছে। তাহার এই লজ্জাকর স্বার্থপরতা দেখিয়া, হৃদয়ের এতখানি দুর্ব্বলতা দেখিয়া কি সে ঘৃণাভরে বিদ্রূপের তীব্র হাসি হাসিবে না। তাহার সেই বিদ্রূপ হাস্য যে তাহার পক্ষে অসহ্য। ছি, ছি, তাহাপেক্ষা যে তাহাকে না ডাকাই উচিত ছিল।

আবার মনে হইল, না, ইহাও তাহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য নয়। ইহা যে তাহার পিতার আদেশ। সে সব সহ্য করিতে পারিবে, তবু পিতার এই অন্তিম আদেশটি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিবে কি? বুঝিবে কি যে, ইহা তাহার পিতারই আহ্বান অন্য কাহারও নহে?

কিন্তু ইহাই লজ্জার বিষয় হইল, যে সে নিজ হস্তে চিঠি খানা লিখিয়া দিয়াছে। তাহারা হয় ত মনে করিবে যে, সে ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে আবার ডাকিতেছে। ছি, ছি, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা!

ভাবিতে ভাবিতে সুরেশের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। চিত্তটা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। বাম হস্তে ললাটের ঘর্ম্মগুলি মুছিতে লাগিল। আর কেবলই মনে হইতে লাগিল, ছি ছি, না জানি সে কি ভাবিবে!

* * * * * * * *

আগামী কল্য কলিকাতা যাওয়ার দিন। তাই আজ হইতেই ছায়া জিনিষ পত্র গুছাইয়া রাখিতেছে। নিকটে বসিয়া রমানাথ তামাক টানিতে টানিতে সঙ্গে যাহা যাহা লওয়া আবশ্যক, ছায়াকে তাহা বলিয়া দিতেছেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। নিবারণ ঘোষ বহির্ব্বাটী হইতে রমানাথকে ডাকিলেন। রমানাথ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই একেবারে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। ব্যাপার কি, আজ এমন সময় তাহার এই গৃহে আগমনের কারণ কি?

রমানাথ বিস্ময়কম্পিত পদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। নিবারণ তাঁহার হস্তে চিঠিখানা দিয়া বলিল, "কর্ত্তা দিয়েছেন। বোধ হয় জানেন যে তিনি অনেকদিন থেকেই খুব রক্তামাশয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। পড়ে দেখুন না, সব লেখা রয়েছে।"

রমানাথ ধীরে ধীরে কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; নিবারণ তাঁহার দিকে চাহিয়া মুখ ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল। পত্র পড়া শেষ হইলে রমানাথ তাহাকে বসিবার জন্য বলিয়া নিজে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ছায়া নিবারণ ঘোষকে আবার এখানে আসিতে দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। হস্তের কার্য্য হস্তে লইয়াই সে লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। রমানাথ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "ছায়া!" ছায়া চমকিত হইয়া নীরবে তাঁহার দিকে চাহিল। রমানাথ সমান গম্ভীর স্বরেই বলিলেন, "একটা চিঠি।"

ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, "কার বাবা?"

"পড়ে দেখ্।" বলিয়া রমানাথ চিঠিখানা ছায়ার হস্তে দিলেন। ছায়া চিঠিখানা লইয়া কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেল। রমানাথের সম্মুখে পড়িতে তাহার যেন সাহস হইতেছিল না।

রমানাথ সেখানে দাঁড়াইয়াই নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। ছায়া গৃহের কোণে যাইয়া পত্রখানা খুলিল। হস্তাক্ষর দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। কম্পিত হস্ত হইতে ধীরে ধীরে কাগজখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। এই কি! এতদিন পরে এই কিসের জন্য! ছায়া আবার কম্পিত হস্তে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। লক্ষ্যহীন নেত্রে আরও একবার চিঠিখানার উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। উপরেই দেখিল, সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "কল্যাণীয়া বউমা।"

দেখিয়া ছায়ার একটু ভরসা হইল। ভাবিল তবে তাহার লিখিত পত্র নয়। তবে কে লিখিল? বোধ হয় পিসিমা লিখিয়াছেন। ভাবিয়া ছায়া চঞ্চলনেত্রে নিম্নলিখিত নামটির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দেখিল, লেখা রহিয়াছে, "আশীর্ব্বাদক—তোমাদের বাবা।" তবে তিনি লিখিয়াছেন?

ছায়া স্পন্দিত হৃদয়ে চঞ্চল নেত্রে চিঠিখানা ভাল করিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সে পত্রের সারোদ্ধার করিয়া জানিতে পারিল যে, পীড়িত শ্বশুর তাহাকে ডাকিতেছেন।

সে শশব্যস্তে গৃহের বাহিরে আসিল। দেখিল, রমানাথ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ছায়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

রমানাথ চমকিত ভাবে বলিলেন, "কি, বল্ না। চিঠি পড়েছিস্?"

ছায়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাঁ পড়েছি।"

"এখন তোর কি ই'চ্ছে, তাই বল।"

ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা বাবা।"

"আমার ইচ্ছা! আমি বলি, তারা যখন টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল, তখনও যাতে তাদের সে উপকার আমরা নেইনি—"

ছায়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "সে কথা আর এ কথাত সমান নয় বাবা।"

"তা বুঝি ছায়া, কিন্তু গত কথাগুলি ভেবে দেখ দেখি! সে সব কথা মনে যে আর দিতে ইচ্ছেই হয় না। দরকার নেই, যাস্‌নে। তারা যখন সে দিনই সকল সম্বন্ধ কেটে দিতে পারলে, তখন—"

ছায়া লজ্জাবনতমুখে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "অন্য কারও ডাকে আমি যাচ্ছিনে বাবা, শুধু বৃদ্ধ শ্বশুরের,—" বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, "আসবার সময় তিনি যে আমায় আশীর্ব্বাদ দিয়েছিলেন বাবা। আমি তাঁকে যে একবার শেষ প্রণাম না করে থাকতে পারব না।"

শুনিয়া রমানাথ স্তম্ভিতভাবে ছায়ার দিকে চাহিলেন। ছায়া লজ্জারক্ত মুখে ঘরের

ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল। রমানাথ তাহাকে বাধা দিয়া বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তবে যাওয়াই তোর ইচ্ছে!"

ছায়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রামানাথ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পরে বলিলেন, "আচ্ছা তবে যাস্। কিন্তু আজ ত আর হবে না। কাল সকালে গেলেই হবে। আর আমিও অমনি বিকেলে কলকাতার দিকে রওনা হবো। কি বলিস্?"

ছায়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, সেই বেশ হবে। আবার কয়েকদিন পরে এসে আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, তা হলে আজ তাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলি।" বলিয়া রমানাথ বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। ছায়া চিন্তাকুল চিত্তে সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া তপনদেব দিগ্‌বধূর সুন্দর আরক্ত মুখের দিকে উঁকি মারিল। অসঙ্কুচিতা দিগ্‌বধূ নিজের স্বর্ণাঞ্চল মেলিয়া লুব্ধ দিবাকরকে নিজের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখাইতে লাগিল। মুগ্ধ দিবাকর দিগ্‌রাণীকে ধরিবার নিমিত্ত নীল সাগর সন্তরণ করিয়া পরপারে যাইতে লাগিল।

গ্রাম্য সুচিক্কণ রাস্তা দিয়া, শিবিকা স্কন্ধে লইয়া, বাহকেরা দ্রুতপদে চলিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে যথাস্থানে আসিয়া তাহারা ধীরে ধীরে শিবিকাখানি ভূমির উপর রাখিল।

কিন্তু শিবিকারোহী ব্যক্তি শিবিকা হইতে অবতরণ করিতেছে না দেখিয়া, সঙ্গের ব্যক্তি নিবারণ বলিল, "নেমে আসুন না।" শুনিয়া ছায়ার বুকটা সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। পা দুইখানি যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

বহু চেষ্টায়ও সে শিবিকা হইতে নামিতে পারিতেছিল না। পিসিমা শিবিকার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "নেমে এস না বড় বৌমা।"

ছায়া অতিকষ্টে কম্পিতপদে নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। পিসিমা বলিলেন, "তোমার শ্বশুরের ঘরে যাও মা।"

ছায়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সেখানে আর কে আছে?"

"সুরো আছে। অন্য কেউ নেই। এস মা, আমার সঙ্গে।" বলিতে বলিতে পিসিমা অগ্রসর হইলেন। ছায়া ধীরে ধীরে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল।

পিসিমা বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিলেন। এইবার ছায়া লজ্জা রক্ষোটটাকে একটু দূরে সরাইয়া দিয়া ধীরপদে তাঁহার সঙ্গে চলিল।

কিন্তু সেই কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়াই তাহার পা দুখানি আবার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে যে ভিতরে প্রবেশ করিবে, এমন শক্তি যেন তাহার রহিল না।

রোগ শয্যায় শায়িত বৃদ্ধ গাঙ্গুলীমহাশয় স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "এস মা আমার কাছে। লজ্জা কি মা, এ ত তোমারই ঘর। আর আমি যে তোমাদের বাবা।"

ছায়া অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে একবার চোখ তুলিয়া শ্বশুরের স্নেহসিক্ত মুখের প্রতি চাহিল। চাহিবামাত্রই তাহার লজ্জা সঙ্কোচ যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল।

সে আর একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার পদতলে দাঁড়াইল। যেন নিজের অজ্ঞাতে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "বাবা।"

গাঙ্গুলীমহাশয় সস্নেহনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "এস মা, আমার এ পাশে এসে বস।"

ছায়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদতলেই বসিয়া পড়িল। বসিয়া সে একবার চকিত নেত্রে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, অদূরে নতমুখে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে সুরেশ বসিয়া রহিয়াছে।

দেখিয়া তাহার মুখ আবার রক্তিম রাগে রঞ্জিয়া উঠিল। আবার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে একটু স্থির হইয়া বসিল।

গাঙ্গুলীমহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুরেশ!" সুরেশ মুখ তুলিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কি বলুন।"

"আমার কাছে এস।" সুরেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া পিতার এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াল। গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার এক খানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা, আমার এ পাশে এস।"

ছায়া কোনও রূপে যেন পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া তাঁহার অপর পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। গাঙ্গুলী মহাশয় দক্ষিণ হস্তে ছায়ার হাতখানা ধরিয়া সুরেশের হাতের উপর রাখিয়া অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আজ আবার তোমাদের পরস্পরের হাতে পরস্পরকে বেঁধে দিলাম। আশা করি এ বাঁধা আর ছিঁড়বে না।"

উভয়েরই হাত দুইখানি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সুরেশ হাতখানা সরাইয়া লইয়া পিতার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল। ছায়া মৃদু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, যে এ সম্ভব নয়। গত কথাগুলি—"

গাঙ্গুলীমহাশয় অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কিছুই ভুলিনি মা। সে সব কথা যে ভুলবার আর যো নেই। তাইত এমন অনুতাপ হচ্ছে।"

শুনিয়া ছায়ার চক্ষুতে একবিন্দু অশ্রু উছলিয়া উঠিল। সে ত্বরিত হস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আর কেঁদ না মা, যে ভুল হয়েছে, তাতে যে আমাদেরই কাঁদা উচিত।"

ছায়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আপনি কেন বৃথা মনে কষ্ট করছেন বাবা। আপনার দোষ কি ?"

"আমারও একটু দোষ আছে বৈ কি মা। তা না হলে কি এমন অনুতপ্ত হতুম।"

সুরেশ সেই বিষয়ে যেন কোন কথা শুনিতে পারিতেছিল না। তাই সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। ছায়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দোষ কারই নয় বাবা, সকলই বিধির বিধান।"

বৃদ্ধ সজলনেত্রে বধূর পানে চাহিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মা, সে সব কথা এখন যেতে দাও, এই মাত্র আমার অনুরোধ। আমি যে কটা দিন বেঁচে থাকি, অন্ততঃ সে কটা দিনও এমন ভাবে চলো, যেন কিছুই হয় নি। তা দেখে আমি যেন একটু শান্তি পেতে পারি।"

ছায়া নিঃশব্দে স্বচ্ছনেত্রে শ্বশুরের পানে চাহিল। সেই বিশ্বস্ত দৃষ্টি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সে ইহাতে অস্বীকৃত নয়। বুঝিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় একটু পরিতৃপ্ত হইলেন। গভীর স্নেহভরে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তুমিই আমার মা, এ ঘরের লক্ষ্মী।"

একটা কথা জানিবার জন্য ছায়ার মনে যেরূপ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, এখনই সে কথাটা জানিবার উদ্দেশ্যে সে কুণ্ঠিতমুখে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "ভুল বল্‌ছেন বাবা, এ ঘরের লক্ষ্মী ত ঘরেই আছেন"।

"না মা, তাহলে কি আর এত দুঃখ হ'ত! যাকে গৃহলক্ষ্মী জ্ঞানে এ ঘরে ভুলে আনা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি যে নিতান্তই এই গৃহস্থের ঘরের অনুপযুক্তা"।

শুনিয়া ছায়া চমকিত হইল। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে শ্বশুরের দিকে চাহিয়া আবার লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিল। প্রকৃত বিষয়টা অবগত হইবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইতে লাগিল। কিন্তু সে তাহা দমন করিতে চিরাভ্যস্ত। তাহার চিরাভ্যস্ত সংযত চরিত্রে মুহূর্ত্তের জন্য ও সে অসংযতের কালিমা লাগাইতে ইচ্ছা করিল না।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ছায়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় কখন বাবা ?"

"সময় যে হয়ে গেছে। সুরেশ কোথায়, কোন্ ওষুধটা খেতে হবে, তা জানিনে ত।" বলিয়া গাঙ্গুলীমহাশয় বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, হাত ঘড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে অতি ধীরে ধীরে সুরেশ সেই দিকে আসিতেছে।

ছায়াও বাহিরের দিকে চাহিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে একটু জড়সড় হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। গাঙ্গুলী মহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে যে বাবা।"

সুরেশ নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, এই যে দিচ্ছি।" ছায়া অগ্রসর হইয়া ঔষধের গ্লাসটি হাতে লইয়া নতমুখে স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ওষুধটা দিতে হবে, আমি দিচ্ছি।"

সুরেশ বিস্ময়চকিত নেত্রে ছায়ার দিকে চাহিল। সে এখনও যাহার সঙ্গে একটি কথাও বলে নাই, সে যে কেমন করিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত কথা বলিতে পারিল, তাহাই তাহার বিস্ময়ের কারণ।

কিন্তু গাঙ্গুলী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালনার্থই বধূর এই নিঃসঙ্কোচতা। বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

সুরেশ আস্তে আস্তে একটি শিশি দেখাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ওটার থেকে দিতে হবে।"

ছায়া স্থির হস্তে ঔষধ ঢালিয়া তাহা শ্বশুরকে দিতে গেল। সুরেশ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ছায়া শ্বশুরকে ঔষধ পান করাইয়া, সুরেশের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া বলিল, "কোন ফল টল নেই? বেদানা বা আঙ্গুর—"

সুরেশ নতনেত্রে বলিল, "বেদানা আছে।" বলিয়াই সে আলমারী হইতে একটি বেদানা বাহির করিয়া ছায়ার হস্তে দিবে, না নীচে রাখিবে, তাহা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ছায়া তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নীচে রাখুন।"

সুরেশ একবার তাহার দিকে চাহিয়া, বিব্রতভাবে বেদানাটি নীচে রাখিয়া সেই কক্ষ হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কিন্তু তখনই পিসিমা সেখানে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কিরে বাপু, বড়বৌ আসতে না আসতেই তার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে পালাচ্ছিস্ কেন? তাকে একটু ছুটি দেনা। ততক্ষণ তুই এখানে থাক। এস, বড় বৌমা, এখন একটু ওদিকে চল।"

ছায়া বেদানাটি ছাড়াইতে ছাড়াইতে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, এই যে আসছি।"

গাঙ্গুলী মহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "যাও মা, আর দেরী কর না। সুরেশ, বেদানাটা তুমি ছাড়িয়ে দাও।"

সুরেশ লজ্জাটাকে একটু দমন করিয়া ছায়ার হস্ত হইতে বেদানাটি লইয়া অবিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তুমি যেয়ে বিশ্রাম করে নাও।"

ছায়ার শরীরটা আবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে সংযত হইয়া ধীরে ধীরে পিসিমার সঙ্গে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীচপলাবালা বসু

প্রচেতা

হে বরেণ্য, হে বিরাট, হে বরাঙ্গ, বারীন্দ্র বরুণ,
চাহে 'সৃষ্টি' তব দৃষ্টি স্নিগ্ধ, শান্ত, প্রসন্ন, করুণ।
উগ্রতপ করে মরু তব কৃপাকণার ভিখারী,
মেরু, তব পুঞ্জীভূত হাস্যকলধৌতের ভাণ্ডারী।
তব বিশ্বরূপ-দেহে নদনদী,—শিরা উপশিরা
বহে রসধারা মৃতসঞ্জীবনী বারুণী-মদিরা।
তাপদগ্ধ জীবলোক তব কৃপাভৃঙ্গারে স্নাতক,
রসগঙ্গাধর, তব শুষ্ক ধরা প্রসাদ-চাতক,
ঢালো ঢালো আশীর্ব্বাদ প্রস্রবণে, প্রপাতে, সরিতে
গিরিগাত্র বিদারিয়া মৃত্তিকার তৃষার্ত্তি হরিতে।

ঝঞ্ঝাপ্রভঞ্জনোদ্ধত ঘনপুঞ্জ তব কেশ পাশ,
ধূসরে শ্যামল করে সঞ্জীবন তোমার নিশ্বাস।
কণ্ঠে দুলে মীনমাল্য, শিশুমার তুলে জয়ধ্বনি
রক্ষে তিমি তিমিঙ্গিল, তিমিরান্ধ তব রত্নখনি।
সিংহাসন রচে হংস, পাদপীঠ মকরমকরী;
দিগ্‌বধূরা শঙ্খনাদে পূজে তোমা দিবস-শর্ব্বরী।
পুষ্পিত ও পুণ্যদৃষ্টি কুবলয়ে, কুমুদে, কহ্লারে,
বাণী তব বিদ্যুদ্দামে সংরটিত দীপকে মল্লারে।
মরুদ্বর্গ সেবে কাশ-শৈবালের চামর ঢুলায়ে,
গরুড় মৈনাক সেবে সুধাসিক্ত পক্ষাগ্র বুলায়ে,
পুষ্কর ধরেছে ছত্র জলস্তম্ভে সন্ধ্যাভ্র স্বপনে,
পর্জ্জন্যের হস্তে উড়ে ইন্দ্রায়ুধ-ধ্বজা দিগঙ্গনে।

দাতা, ত্রাতা, হে প্রচেতা বিধাতার বিসর্গ-সচিব,
তপ্ত-নিসর্গের বুকে রাখ স্নিগ্ধ চরণ রাজীব।
ছড়াইয়া মুষ্টি মুষ্টি লাজসম মুক্তা মণিশিলা
তোমার বিক্রম-কুঞ্জে লক্ষ্মীমা'র শৈশবের লীলা,
অচ্যুতে আর্পিলে তারে সঙ্গে দিলে কৌস্তভ যৌতুক,
গঙ্গাধর জটাজালে দিলে হাসি কৌমুদী-কৌতুক।

উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,—উপায়ন দিলে আখণ্ডলে,
দিলে সুধা-মধুপর্ক পারিজাত বিবুধমণ্ডলে।
নিঃস্ব বিশ্বনরগণে অন্নজল দাও মাতামহ,
হয়' তার, করস্পর্শে দাবদাহ দারুণ দুঃসহ।
স্রোতে স্রোতে তত্ত্ব লও প্রেরি' শুভ'বাসনা তোমার,
পোতে পোতে ভরি' দাও আশীর্ম্ময় পণ্যের সম্ভার।
তটে তটে অন্নকূট গড়ি' দাও অকুণ্ঠিত স্নেহে
ঘটে ঘটে প্রাণরস পাঠাইয়া দাও গেহে গেহে।
কূপে কূপে উৎসারিয়া বাৎসল্যের শীতল যতন,
চুপে চুপে রক্ষা কর সৃষ্টি তব হে ভূতভাবন।
নদে নদে প্রেম-বাষ্প-গদগদ সান্ত্বনা তোমার
হ্রদে হ্রদে পদ্মপাণি বরাভয় করুক বিস্তার।
ডুবে ডুবে মীনসম, খুঁজি তব শরণ্য চরণ,
শুভে ধ্রুবে সগৌরবে আনি মোরা করি আহরণ।

প্রণমি 'যাদসাংপতি' রুদ্ররথী, নমি তব পায়
শিবরূপে প্রেয় দাও, শ্রেয়ঃ দাও তব চণ্ডিমায়।
ঊর্ম্মিরথে যাত্রা তব, উপপ্লব রথ-বল্গাধর,
ছুটে সিন্ধুবাজি-রাজি, উৎক্ষেপিয়া ফেনিল কেশর,
সীমারেখা হারাইয়া একাকার অষ্ট চক্রবাল
দিগ্বিজয় অভিযানে, পাশায়ুধ মহাদিক্‌পাল!
চূর্ণ করো অবিদ্যার সমারোহ দুর্দ্দম উন্মদে
উদ্যান অটবী ক্ষেত্র গিরিদরী পুরজনপদে
কল্পান্ত প্রলয় সম ত্রস্ত ধ্বস্ত করি সৃষ্টি লীলা,
নক্রধ্বজ রথ চক্রে, গলাইয়া শৈলমনঃশিলা,
বিজ্ঞানের বালুবন্ধ ভেঙে ছুটে প্লাবনের স্রোত
দুর্ব্বাদর্ভ খণ্ড সম ডুবে তায় কতশত পোত।
তব বলি-পুষ্পপ্রায় ভাসি মোরা উল্লোল কল্লোলে
এ বিশ্ব প্রহ্লাদসম মত্ত দন্তিশুণ্ডে যেন দোলে।
তোমার দিগ্‌নাগ শিরে মগ্নপ্রায় মিহির সংঘাতে
ধ্বক ধ্বক গজমুক্তা শিরোজ্জ্বল ময়ূখসম্পাতে,

বিরচে নূতন সূর্য্য। অভ্রভেদি' ঊর্দ্ধবহ্নি জ্বলে,
দ্বীপব্যূহ সেতুস্তম্ভ জতুগৃহ সম তায় গলে।
অবিচ্ছিন্ন অগ্নি-অব্দ যায় ধূম্র তমিস্রায় ঢেকে
বারুণী-সেবনমত্ত গ্রহতারা টলে কক্ষ থেকে।

ভৈরব ভীষ্মতা মাঝে আছে তবু প্রচ্ছন্ন আশ্বাস,
এ মূর্ত্তি হেরিয়া তব, দাহদৈত্য পেয়েছে সন্ত্রাস।
তোমার যাত্রার পথে, বিদলিত ধূলির বাহিনী
লুণ্ঠিতে শ্যামল ঋদ্ধি ঢেকেছিল যাহারা মেদিনী।
ভৌমযজ্ঞদ্রোহী শোষ-মরীচিকা রাক্ষস রাক্ষসী,
সোম-স্রুক চরুভাণ্ড ফেলি' বাঁচে রসাতলে পশি'।
প্লাবন-উর্ব্বরা উর্ব্বী করে পুন গর্ভাধান-স্নান,
মুক্তাগর্ভা শুক্তিসমা ভ্রূণে ধরে নব নব প্রাণ।
এ বিগ্রহ ধরি তুমি, দূর কর নির্ম্মোক জীর্ণতা
তোমার নিগ্রহে পাই নবোদ্ভব সৃষ্টির বারতা;
যুগে যুগে চূর্ণ করি পূর্ণরূপে গড়ো বিশ্বভূমি
শ্রীতারুণ্য স্বাস্থ্যে 'নব কলেবর' দাও তারে তুমি।
প্রজাপতিগণ বিশ্বকল্যাণার্থে আ-নাসাগ্র ডুবে'
"সম্বর' সম্বর' রোষ, অম্বুরাজ" উচ্চারে ত্রিষ্টুভে।
তব ভীম তাণ্ডবের বিশ্বগ্রাসী চণ্ডিমার মাঝে
ধ্রুবের শাশ্বতমন্ত্র কল্পশেষে বজ্রতূর্য্যে বাজে।
কল্পে কল্পে ধ্বংস করি অধ্রুবের ব্যর্থ আয়োজন
অনিত্যমোহান্ধবিশ্বজ্ঞাননেত্র কর উন্মোচন।

ভীমকান্ত, ঋষিস্তুত, শ্রুতিখ্যাত রসব্রহ্মরূপ,
এ নেত্রে প্রেমোৎস কর, চিত্তে মোর কর রসকূপ।
রস সরস্বতী মোর রসনায় হো'ন সমাসীনা
এই বাগ্‌যন্ত্র তাঁর হোক রসমূর্চ্ছনার বীণা।
তোমার মঙ্গল ঘটে করো মোরে নারিকেল সম
রসগর্ভ, হোক্ তায় রসালের শাখা ছন্দ মম।
নির্ব্বাণেপ্সু জীবনের ধূপভস্ম লও বেদীমূলে
মরণের অর্ঘ্য নিও চিতাভস্মে জাহ্নবীর কূলে।

শ্রীকালিদাস রায়

[কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে] তুষারকিরীটী গৌরীশঙ্কর।

কলিকাতা মিউজিয়'ম সৌজন্যে]

চিরতুহিনাবৃত গিরিশ্রেণী (দার্জিলিং হইতে)

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনাম্‌চা

(১)

" দ্রৌপদী, ও দ্রৌপদী, দ্রৌপদী, দোর খোল, দ্রৌপদী।"

"দ্রৌপদী নেই, গদাহস্তে স্বয়ং ভীম।" এই বলিয়া পাশের ছাত্রাবাস হইতে একজন যুবক দ্রৌপদী-দর্শন-প্রার্থী এক প্রৌঢ়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক প্রকাণ্ড মুগুর ঘুরাইতে লাগিল। রাত্রি তখন এগারটা। রাস্তায় ভিড় ও কোলাহল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ ছাত্রাবাস বহুপূর্ব্বে বারাঙ্গনা বারাক ছিল। তাহাদের একজনের নাম ছিল দ্রৌপদী। প্রৌঢ় তখন যুবক ছিলেন। এতদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া তিনি পূর্ব্ব-স্মৃতির আকর্ষণে ঐ বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া ঘন ঘন কড়া নাড়িলেন এবং মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "দ্রৌপদী, ও দ্রৌপদী, দ্রৌপদী, দোর খোল দ্রৌপদী।"

এখন সে ইন্দ্রপ্রস্থও নাই, দ্রৌপদীও নাই—আছে ছাত্রাবাস। তথায় ভীমচন্দ্র পাকড়াশী নামক এক ভীমকায় ছাত্র মুগুর ভাঁজিত এবং নানা প্রকার কসরত করিত। ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ এবং ঘন ঘন দ্রৌপদী সম্বোধন শুনিয়া ভীমচন্দ্র আরক্ত নয়নে মুগুর হস্তে সেই প্রৌঢ়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ভীম গর্জ্জনে রাস্তায় ভিড় জমিয়া গেল।

পুনর্ব্বার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এমন সময় শুনিলাম, আমাদের সদর দরজার নিকট কে বালকণ্ঠে গাহিতেছে,—

শিব শঙ্কর সঙ্কটহারী।
শোক-দগধ-চিত্ত শ্মশান বিহারী॥
ত্রিলোক ঈক্ষণে ত্রিনয়ন ঘূর্ণিত,
মঙ্গল বাদনে ব্যোম নিনাদিত,
ভব-হলাহল পানে আনন্দিত,
স্মর-গরল-নাশন প্রলয়কারী॥*

কিয়ৎক্ষণ পরে দরোয়ান একটী বালক সন্ন্যাসীকে আমার নিকট লইয়া আসিল। সে আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, এই গভীর রাত্রে বিপন্ন হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। শুনেছি আপনি দয়াময়ী! আমার মাকে বাঁচিয়ে দিতে হবে।"

* ধাম্বাজ—কাওয়ালি।

বালকের নিকট রোগিণীর বর্ণনা শুনিয়া বুঝিলাম 'প্লেসেন্টা প্রিভিয়া' হইয়াছে। অত্যধিক রক্তস্রাববশতঃ রোগিণী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখন গর্ভের অষ্টম মাস। পোনর দিন পূর্ব্বে একবার খুব রক্তস্রাব হইয়াছিল। তখন প্রসব করাইলে রোগিণীর এই বিপদ আসিত না। কিন্তু গর্ভাবস্থায় এলোপ্যাথিক ঔষধ নিষিদ্ধ মনে করিয়া হোমিওপাথী ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে। মূলেই ভুল। এই রোগে ফুল ঠিক জায়গায় থাকে না। জরায়ুর নীচ ভাগে থাকে। সুতরাং গর্ভের মাস যত বাড়ে এবং জরায়ুর নীচ ভাগ প্রসারিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফুল ছিঁড়ে ও রক্তস্রাব হয়। প্রসব না করাইলে, রক্তস্রাবের দরুণ প্রসূতি মারা যায়। তাই একজন ভাল ডাক্তার সঙ্গে করিয়া ঐ গভীর রাত্রে চলিলাম।

(২)

মাণিকতলার পোল পার হইয়া রাস্তার বামপার্শ্বে একটী সরু গলির মোড়ে গাড়ী দাঁড়াইল। বালক সন্ন্যাসী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না, রাস্তাটা বড় খারাপ; একটু কষ্ট ক'রে হেটে যেতে হবে। অপেক্ষা করুন, আমি লণ্ঠন নিয়ে আস্‌চি।" সেই অন্ধকার রাত্রে আমরা তোড় জোড় হাতে লইয়া বালকের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। গলির দুধারে খড়ের ঘর; দেয়ালের মাটী স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে, এবং বাঁশের পাঁজরা বাহির হইয়াছে। দুএক খানা পাকা বাড়ী আছে; চুণ বালি খসিয়া ইট বাহির হইয়া পড়াতে মনে হইল তাহারা যেন দাঁত খিচাইয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে। রাস্তায় কাদা; স্থানে স্থানে বাড়ীর ময়লা জল রাস্তার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমার পায়ে জুতা নাই, সুতরাং বেপরোয়া চলিতেছি। ডাক্তার বাবু পঙ্কমগ্ন জুতা টানিয়া টানিয়া চলিলেন। সম্মুখে এক আটকোণা বা অষ্টদল পদ্মের ন্যায় পুষ্করিণী। পাড়গুলি ভাঙ্গিয়া এক একটা কোণ প্রস্তুত করিয়া জল বস্তির দিকে চলিয়াছে। পারে উপস্থিত হইবামাত্র কুকুর প্রহরীবৃন্দের ঘেউ ঘেউ শব্দে শঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইলাম। ডাক্তার বাবু আমার কুকুরাতঙ্ক দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, আপনারা সাহেব-ঘেঁশা, সুতরাং কুকুরাতঙ্ক দেখিয়া হাসিতে পারেন। কিন্তু আমি জলাতঙ্ক অপেক্ষা কুকুরাতঙ্কটাই পছন্দ করি।" সেই বালকটী কুকুর তাড়াইয়া দিলে আমরা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটী টিনের ঘরের নর্দ্দমা একটী ছোট ডোবায় পরিণত হইয়াছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখিলাম সেই ডোবার জলের উপরে যেন বড় বড় মুক্তা ভাসিয়া উঠিয়াছে। বিস্মিত হইয়া যখন নিকটে গেলাম, দেখিলাম নীচ হইতে বুদ্বুদরাশি উপরে উঠিতেছে এবং লণ্ঠনের আলো প্রতিফলিত হওয়াতে ভুড় ভুড়ি গুলি মুক্তার মতন দেখাইতেছে। তাহার পরে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। ইহার পশ্চিম পাড় ভাঙ্গিয়া জল খোলার ঘরের দাওয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেই দাওয়ার উপরে আবর্জ্জনারাশি ফেলিয়া পথ করা হইয়াছে। ইহার উপরে উঠিতেই মনে প্রশ্ন উঠিল,

"আমি আগে পড়ি কিম্বা দাওয়া আগে পড়ে।" পড়িলেই প্রতিমা বিসর্জ্জন। অতি কষ্টে সেই বিপদসঙ্কুল পুষ্করিণীসঙ্কট পার হইয়া রোগিণীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মাণিকতলা মুন্সীপাল-দিগের প্রশংসা করিতেছি এমন সময় বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ঐ মুন্সীপালদের কথা বলচ, মুন্সী-পাল ছোট লোক—তেলী; তাদের রুচি মাফিক হলো না বলে কি না আমার নূতন পাইখানা ভেঙ্গে দিয়ে গেল।"

(৩)

রোগিণীর বয়স প্রায় আঠার বৎসর। তাহার বিছানা রক্তে ভাসিতেছে এবং স্থানে স্থানে রক্তের চাপ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রসব বেদনার নাম মাত্র নাই। চোক মুখ ঠোঁট শাদা হইয়া গিয়াছে; নাড়ীর অবস্থা মন্দ। সূতিকাগারের এক বারান্দায় দুইজন গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী। একজন 'কারণ' পানে মত্ত; আর একজন করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া চিন্তায় নিমগ্ন। আমাকে দেখিয়া দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা দয়াময়ী, এসেছ? আমার স্ত্রীকে রক্ষা কর মা। কালী তোমার মঙ্গল করুন। আমি আর তোমায় কি দিব মা? দিতে পারি আশীর্ব্বাদ, আর কতকগুলি অবধৌতিক ঔষধ প্রস্তুত করবার প্রণালী।"

সেই স্যাঁতসেতে মেজের উপর একখানা তক্তপোষ পাতাইয়া ডাক্তারবাবু পোয়াতিকে প্রসব করাইলেন এবং সেলাইন্ প্রভৃতি ইঞ্জেক্ট করিয়া দুটী প্রাণীকেই রক্ষা করিলেন। দক্ষিণা—সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ এবং প্রসূতির সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত। শিশুটী অপূরন্ত। তাহাকে একটী তুলার বাক্সে রাখিয়া তাহার দুইপাশে গরম জলের বোতল রাখা হইল। এই সমুদয় ব্যবস্থা করিতে করিতে কাক ও কুক্কুট উষার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিল। একে একে প্রতিবাসিবৃন্দ উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "এঁকে সকলে টোষ কোম্পানী ব'লে ডাকে। এঁর কারখানার নাম 'পেরি টোষ এণ্ড কোং (Parry Tosh & Co)'। বাঙ্গলা নাম পরিতোষ মুখোপাধ্যায়। বড়ই পরোপকারী। সর্ব্বদা আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন।" আমাকে দেখে "গুড্ মর্ণিং মেডেম্" বলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মেডেম্, মেনি মেনি থ্যাঙ্ক্স্; আপনারা পব্লিক্ গুড্সের জন্য সোল্ ডিভোর্ট (devote?) করেছেন। আপনি একজন বিখ্যাত পব্লিক্ উওমেন্। ওয়াল্ড্ হোয়াইট্ (world-wide?) রিপিটিশন্ (reputation?); ওঃ, কি ডেঞ্জার থেকে এঁদের ডেলিভার (deliver?) করেছেন। সমস্তদিন কেবল ব্লডী—ব্লডী—ব্লডী। পল্স্ একেবারে নট্ (নাই)। চোক একেবারে সিট্ ডাউন্ (বসে গিয়েছে)। আপনি না এলে একেবারে ড্রাউনিং উইথ্ ড্রম্ (ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন) হত। আচ্ছা লিট্ল্ চাইল্ড্-এর পেটে অনেক ডার্টি থিং আছে। কেষ্টার ওয়েল দেবে কি?"

আমি। 'না মশাই কিছুই দিতে হবে না। ভগবান সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। দু'তিন দিন ছেলের পেটে এক রকম জিনিস থাকে—তাই তার আহার। জোলাপ দিলে সেই খাবার

বেরিয়ে যায়, ছেলে ক্ষিদেয় কাঁদে ; তাকে ঢোকা দুধ গিলয়। এতে পেটের অসুখ হয় ; অনেক ছেলে মারাও যায়।

টোষ। মেডেম্, একে কি মিল্ক্ খাওয়ান হবে না ?

আমি। না মশাই, দুধ দিতে হবে না। ঠিক সময়ের প্রায় দুমাস আগে ছেলেটী পৃথিবীতে এসেছে। এই দুই মাস কি মায়ের পেটে একে কেউ গরুর দুধ যুগিয়েছে ? এখন কেবল গরম জলে মিশ্রি ফুটিয়ে খাওয়ালেই হবে।

টোষ। মেডেম্, খাওয়াতে হবে কি পার্ল মাদার (ঝিনুক ?) দিয়ে ?

আমি। তার চেয়ে ভাল উপায় আছে। একটা ফোঁটা ঢালবার নল (ড্রপার) নিয়ে, নল মিশ্রির জলে ভর্ত্তি করে, নলের মুখে রবারের বোঁটা পরাতে হয়। ঐ বোঁটা ছেলের মুখে দিলেই ছেলে ঐ জল টেনে খাবে।

টোষ। ব্রেভো মেডেম্! আপনি কি গুড্ সেন্সুয়েল্ (Sensible ?) লেডি! দেখুন, ইংলিস্ না শিখ্লে—বুদ্ধি ওপ্ন্ (open) হয় না (খোলে না ?)। আমি ঢাকায় ট্রেডিং উপলক্ষে গিয়েছিলাম। ট্রেডিং করব কি মেডেম্, বড্ড লস্ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকার খুব দামি দামি ক্লথ্ আর সেল্ (শাঁখা) ওয়াইফের জন্য পাঠিয়েছিলাম। ওয়াইফের পার্সেলটা মিস্কেরেজ্ (miscarried ?) হয়ে গেল। সে কথা থাক্—ফোরহেড্, মেডেম্ ফোরহেড্। সেখানে শুনেছিলাম ডাক্তার বেলী বলে একজন খুব কনিং (বুদ্ধিমান ?) ডাক্তার ছিলেন। এক রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল। হেডে হরিব্ল্ বাইট্ ; পেন্ এত যে ফুল (পাগল) হয়ে যায়। ডাক্তার করাত দিয়ে সি স সি স (see saw)। মাথার খুলির উপরটা খুলে গেল। দেখা গেল একটা লার্জ্ কোলা ফ্রগ্ বসে ব্রেণ খাচ্চে। ফ্রগ্কে যদি টানেন, ব্রেণ চলে আসবে। তিনি এক বাটী ওয়াটার এনে ফ্রগের কাছে ধরতেই ফ্রগ্ ভেরি ভেরি গ্লাড্—হপ্ হপ্ হপ্—এক জম্পে বাটীর ভিতর এসে সুইম্ সুইম্ সুইম্। খুলী সেলাই হয়ে গেল। পেসেণ্ট্ মেনি মেনি থ্যাঙ্ক্স্, আর ক্যাস্ কাইন্ড্ হাণ্ডেড্ দিয়ে লাফিং লাফিং বাড়ী চলে গেল। ইংলিশ্ শিখেছেন বলে আপনিও খুব কনিং হয়েছেন। গড্ গিভ্ ইউ লং লাইফ্।

শ্রীযুক্ত পরিতোষ মুখোপাধ্যায়—শ্রীবিষ্ণু, মিষ্টার পেরি টোষ মহাশয়ের অদ্ভুত ইংরাজী বাক্যবিন্যাসপরিপূর্ণ গল্প শেষ হইলে শিশু ও প্রসূতির শুশ্রূষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

(৪)

একদিন বৈকালিক ভ্রমণের উত্তোগ করিতেছি এমন সময় দেখি সেই মাণিকতলার সন্ন্যাসী উপস্থিত। তাঁহার সেই গেরুয়া বসন, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশ অন্তর্হিত হইয়াছে। বসিয়াই তাঁহার ইতিহাস আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা বৈদ্য। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। কিছুদিন স্বামী স্ত্রীতে সুখে সংসার করিতেছিলেন। একটী পুত্র সন্তানের মুখ দেখিয়া উভয়ের কত আনন্দ! শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুধের ও পরিচ্ছদের ব্যয়, বাড়ী ভাড়া, সংসার খরচ—৫০৲ টাকায় ত কুলায় না। তাঁহার বন্ধু একজন কেরাণী বলিলেন, "ভাবনা কি? রেস্ খেল্‌লে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া যায়।"

রামকান্ত। টাকা কোথায় পাব?

বন্ধু। ভাবনা কি? আজকে আমি ধার দিচ্চি। আঃ, সাহেব বেটা কি পাজি! শনিবার, তিনটে বাজিয়ে দিলে। চল চল, ট্যাক্সি ক'রে যাওয়া যাক্।

ঘোড় দৌড়ের মাঠে নেশা ক্রমশঃ জমিতে লাগিল। স্ত্রীর নিকট গহনা চাহিয়া লইয়া বলা হইত, "এ ওল্ড্ ফ্যাসানের গহনা, নূতন ফ্যাসানে গড়াইতে হইবে"। সে গহনা আর ফিরিত না। এইরূপে সমস্ত গহনা বিক্রি, মহাজনের ঘন ঘন তাগাদা, মুদির চাল ডাল দেওয়া বন্ধ, ঝি চাকরদের কর্ম্মত্যাগ, স্ত্রীর অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত কঠিন রোগ ও মৃত্যু, এই সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে রামকান্তের দুই চক্ষে শত ধারা বহিল।

"মা, আপনি জানেন না, ঘোড়দৌড় বাজীর কি নেশা! রাস্তার এক কোণে বসে তিন তাস খেল্‌চে। পুলিশের বাবুরা তাকে ধ'রে নিয়ে জেলে পুরচেন। কিন্তু ঐযে সভ্য জুয়োখেলা, যার দরুণ বাড়ী ঘর দোর বিক্রী—এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত হয়েছে, তার প্রশ্রয় দেবার জন্য বড় বড় রাজ-পুরুষেরা ঘটা করে মাঠে যাচ্চেন। বাহবা সভ্যতা! মাঠে ঢুকতে হলে পাঁচ টাকার টিকিট চাই। চাঁদা করে টিকিট কেনা হয় এবং প্রথমে একজনকে ঢুকিয়ে, পরে পরে সকলেই একবার ঢুকে মানব জন্মটা সার্থক করে নেয়।

"স্ত্রী যখন আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন, ছেলের বয়স তখন দশ বৎসর। কুলীন বৈদ্য। শ্মশান ঘাটেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে গেল। একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। একদিন হঠাৎ মনে হল সংসার সর্ব্বৈব মিথ্যা; ছেলেকে সঙ্গে করে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম, সেতুবন্ধ ঘুরে কাশীতে ফিরে এসে এক সিদ্ধপুরুষের দেখা পেলুম। ছেলে সঙ্গে থাকাতে ভিক্ষার অভাব হয় না। দুচারিটী ছেলেকে গেরুয়া পরিয়ে ভিক্ষার পাত্র হাতে দিয়ে বের করলে ভিক্ষা পাত্র পূর্ণ হ'তে বিলম্ব হয় না। সিদ্ধ পুরুষের কাছে থেকে সিদ্ধি লাভ ক'রে ছয় বৎসর পরে যখন কাশী মিত্রের ঘাটে এসে আসন পাতলুম, লোকের ভিড় থামে না।"

"বাবা, এই পোড়ারমুখী মেয়েটার কিছু উপায় কর। ঘরে লোক ঢোকেই না। কি ক'রে চল্‌বে্ বাবা?"

"এই নে বেটী এই বিল্বপত্র; ধুইয়ে দুবেলা জল খেতে দিবি আর মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে এই শ্মশানেশ্বরের পূজার জন্য ।/০ পাঁচ আনা পয়সা দিবি।"

"বাবা, তোমার বিল্বিপত্রে সেই আঙুরের বড্ড উপকার হয়েছে। এই মেয়েটার স্বামী একমাস থেকে আসে না। এর জন্য কিছু করতে হবে বাবা।"

"এই নে বেটী 'আকর্ষণী মন্ত্র' কবচ। গঙ্গা স্নান ক'রে পূর্ব্বমুখী হ'য়ে এই মাদুলী ধোয়া জল খাবে; তার পর লাল ফিতে পরিয়ে ঐ মাদুলী কণ্ঠে ধারণ করবে। এর মানুষ যেখানেই থাক না কেন, সাত দিনের ভিতরে ছুটে এসে এর পায়ের কাছে লুটপুটি খাবে।"

"পিতা পুত্র দুজনে গাঁজা খেয়ে সমস্ত রাত জেগে থাকতাম। ছেলেকে বল্‌তাম "ঐ দেখ্, গঙ্গাঘাটের ফাটাল দিয়ে পিল্ পিল্ ক'রে ছোট বড় ইঁদুরটা বিড়ালটা কুকুরটার মতন কি বেরুচ্চে দেখ্‌চিস্? এ গুলো গঙ্গা পিশাচ।" মশারি খাটিয়ে শুইয়ে আছি, ভূত এসে উপদ্রব আরম্ভ কর্‌লে, মশারির দড়ি ছিঁড়ে দিলে। বসে সাতবার যোগিনী মন্ত্র উচ্চারণ করবা মাত্র কোথায় সব ভূত পালিয়ে গেল। যক্ষ্মারোগী গঙ্গা যাত্রা ক'রে এসেছে। মন্ত্র প'ড়ে এক ফোঁটা জল খাইয়ে দিয়েছি; রোগী উঠে বসে বলেছে 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।' এক মাড়োয়ারী তার বাড়ী বাঁধবার জন্য নিয়ে গেল, সে এক অদ্ভুত গল্প।"

(৫)

"দোহাই প্রভু, আমাকে তাড়াবেন না; আমি কারু কিছু অনিষ্ট করব না।"

"তুই কে রে? শীগ্‌গির বল্, নইলে মারণ মন্ত্রে তোকে এখনি বিঁধে ফেল্‌ব।"

বাঁশ তলার বাড়ী কিনে একজন মাড়োয়ারী বাড়ী 'বাঁধবার' জন্য আমাকে নিয়ে গিয়েছে। মন্ত্র সাতবার প'ড়ে বাড়ী বাঁধবামাত্র দেখি একজন কে ঘুর ঘুর করে এঘর থেকে ওঘর ঘুরে বেড়াচ্চে। আমাকে দেখে বল্‌লে 'দোহাই প্রভু আমাকে তাড়াবেন না।"

"জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লে 'আমি রমানাথ মিত্র নামে খ্যাত ছিলাম। বিষয়ের লোভে আমার জামাই ও মেয়ে দুজনে মিলে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল এই বাড়ীতে। বিষয় পেয়ে খুব ধুমধাম ক'রে শ্রাদ্ধ করলে। বড় বড় টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, লম্বা বিদায় পেয়ে বল্‌লে, 'ধন্য হেমনাথ বসু! কলিকালে এমন নিষ্ঠাবান হিন্দু দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। শ্বশুরের শ্রাদ্ধ এমন ঘটা ক'রে কজন করতে পারে?' প্রভু, কলিকাল হলেও চন্দ্র সূর্য্য আছেন, দেবতারা আছেন। মেয়েটা বড়ই লোভী ছিল। শ্রাদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবার পর একদিন রাত্রে তার রাবড়ী খাবার সাধ হ'ল। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে রাবড়ী খেলে। দোকানীর বাড়ীতে ওলাউঠায় একটী লোক মারা যায়। দোকানী তার সেবা ক'রে এসে ঐ হাতে রাবড়ী দিয়েছিল। পর দিন স্বামী স্ত্রী দুজনের কলেরা—দুদিন পরে অক্কা। কোথায় রইল বাড়ী ঘর, আর কোথায় রইল ধন সম্পদ! এখন খাও বাবা-ধন আর মা-ঠাকরুণ, যম-বাবার লোহার ড্যাঙ্গশ্। সন্ন্যাসী মহাপ্রভু, আমি কিন্তু বাড়ীর মায়া ছাড়তে পারি না, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দোহাই প্রভু,' আমাকে

তাড়াবেন না, আমি কারুর কিছু অনিষ্ট করবো না। নেহাত্ বাড়ীর ভিতরে রাখতে না চান, বাড়ীর বাহিরে একটা গম্বুজ করে দিন, আমি এই গম্বুজের ভিতরই থাকব।"

"মা, আপনি বাঁশতলায় গেলে দেখবেন বাড়ীর বাহিরে ছোট একটী গম্বুজ আছে। সেই গম্বুজে রমানাথ মিত্রের ভূত আমার হুকুমে বাস করচে।"

"এই রকম মা, যাকে যা বলেছি, তাই হয়েছে। একদিন গুরু এসে বল্লেন, 'তোর সমস্ত গুণ আমি হ'রে নেব যদি তুই তোর স্ত্রীকে না নিস্।' আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম। আবার ঐ ভবযন্ত্রণা! কি করব? গুরুর আদেশ। পরদিন সকাল বেলা খুড়ো শ্বশুর মশাইকে গিয়ে নমস্কার করতেই বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। 'জামাই বাবু এসেছেন, জামাই বাবু এসেছেন,' তার পরেই ঘরকন্না, আবার চাক্রী, আবার ভবযন্ত্রণা। কি বিপদ আপনি উদ্ধার করেছেন, তা আপনিই জানেন। তখনও গেরুয়া ছিল।"

আমি। গেরুয়া ছাড়লেন কেন?

সন্ন্যাসী। গল্প বল্‌ছি শুনুন।

(৬)

"আমার আর কিন্তু ভাল লাগ্‌চে না। ঐ দুঘণ্টা ধরে বিড়্‌বিড়্‌ শোনা, দু ঘণ্টা ধরে চোক বুজে থাকা। চোক খুলেই কার কি বেশভূষা তারির আলোচনা, তারপর কাকস্ত পরিবেদনা।"

"কেন, আমার ত বেশ ভাল লাগে। পবিত্র পরমেশ্বরের আরাধনা; আচার্য্যের অমূল্য উপদেশ; পৌত্তলিকতা কুসংস্কারের নামগন্ধ নাই। এসব তোমার ভাল লাগবে কেন? ভাল লাগবে সেই মদো মাতালদের 'কালী কালী' ডাক, গ্রাম্য জটলা, ম্যালেরিয়ার কাতরাণি, আর পাঁকের দুর্গন্ধ!"

শ্রীসুন্দরমোহন দাশ

পিপাসা

প্রাণপাত্রে গ'লে পড়, সারা ধরা—অরণ্য, পর্ব্বত।
নিঃশেষেতে এক ঢোকে গিলে খাই পেয়ালা-সরবৎ।
কি বলিস্ রে রাক্ষস! অগস্ত্য যে ভয়ে মরে যায়।
কি করি, উপায় নাই,—কণ্ঠ ভরা পিপাসা বেজায়।

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা——শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(সপ্তম গীত)

নাচওয়ালীগণ।

লুটা দিয়া মেরে যোবন্‌কী লাখোঁ বাহার্‌—
মেরি লাখোঁ সিঙার্‌, অব্‌ জিন্দিগী ক্যায়সে করুঁ গুজার্‌!
সীনেমেঁ্য উঠা তূফান্‌, কিয়া বেচ্যয়োন্‌ মেরে দিল্‌-ও-জান্‌,—
অব্‌ দিল্লগী ছোড়্‌কর্‌ দিল্‌ লগাবো, আবো মেরে দিল্‌দার্‌!
মেরে নয়নোঁ কা পানী, হোঠোঁ কী লালী—
প্রীত্‌-প্রেম্‌কী ফুলোঁকী ডালী—
তুঝে দিয়া, হো হো পিয়া হমারে! ভরোসা কিয়া তুহার্‌—
তোহে বিনু অঁধিয়ার্‌, পিয়া ম্যাঞ্‌ ডুব্‌ গয়ী মঝ্‌ধার্‌॥

সুর——সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।
স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

মিশ্র——কার্ফা।

স্থায়ী।

	০			০	••	১´		০	
II {	সঃ	পা	পঃ |	পা	দপা I	মপা	মমা |	রগা	-মপা I
	লু	টা	দি	য়া	মেরে	যো॰	বন্‌	কী॰	••

I মঃ	জ্ঞা	রঃ |	সা	-রা I	(-সা	-া |	া	া)} I
লা	খোঁ	বা	হা	•	•	র্‌	•	•

I -সা -া I -া সসা I { সরা -জ্ঞজ্ঞা | জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা I
০ র্ ০ মেরি লাখোঁ ০শি কা র্ অ ব্

I জ্ঞপা মমা | জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞমা -জ্ঞমা | (পপা সসা)} I
জিন্ দিগী ক্যায় সে কর্ ০ও জার্ 'মেরি'

| পা -া I I
জা র্

১ম অন্তরা।

II { সঃ সা ন্ঃ | প্ঃ ন্া ন্ঃ I (সা -া | জ্ঞজ্ঞা জ্ঞরা)} I
সী নে মেঁ উ ঠা তু ফা ন্ আরে মেরে

I সা -া | -া -া I { জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা | জ্ঞা -া I
ফা ন্ ০ ০ কিয়া বেচ্য রো ন্

I রজ্ঞা মমা | (সা -া)} I মমা জ্ঞমা I { পপা পপা |
মেরে দিলো জা ন্ জান্ অব্ দিল্ লগী

| পপা পপা I মপঃ -জ্ঞা মঃ | মপঃ -মঃ পা I
ছোড়্ কর্ দি০ ল ল গা০ ০ বো

I মপা মপা | -া জ্ঞরা I (জ্ঞপা মমা | -া জ্ঞমা) } I
আ॰ বো॰ ॰ মেরে দিল্ দার্ ॰ 'অব্'

I জ্ঞপা মমা | -া -া I I
দিল্ দার্ ॰ ॰

২য় অন্তরা।

II { সরা জ্ঞজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা I সঃ জ্ঞা জ্ঞঃ | জ্ঞমা মা I
নয়্ নৌকা পা নী হো ঠোঁ কী লা॰ লী

পদা -দপা | -দপা মপা I জ্ঞঃ জ্ঞা রঃ | জ্ঞপা মা } I
প্রী॰ ত্প্রে ॰ম্ কী॰ ফু লোঁ কী ডা॰ লী

I { মমা -পপা | পা -া I পদা পদা | পদা -পমা I
তুঝে ॰দি য়া ॰ হো॰ হো॰ পিয়া ॰হ

I পণা ণা | -া -া I দদা পা | মঃ জ্ঞা রঃ I
মা॰ রে ॰ ॰ ভরো সা কি য়া তু

I সা -া | া া } I { সসা সনা | সঃ রজ্ঞঃ জ্ঞজ্ঞা I
হা ম্ ॰ ॰ তোহে বিন্ জঁ ধি॰ য়া র্

I ণণা দপা | মমমা জ্ঞরা I জ্ঞমা পপা | া া } II II
পিয়া ম্যেক্ ডূ॰ব্ গয়ী ম ধ্ ধার্ ॰ ॰

নিবেদন।

১। পরিচয়ার্থ রাগিণীর নামকরণ সম্বন্ধে ১ম গীতের নিম্নে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। তব্‌লার নিম্ন লিখিত ঠেকা সহযোগে গানখানি গেয় :—

ধেনে	নাতে	নেতে	নাক্ I	ধেনে	নাতে	নেতে	নাক্ I	
লুটা	০ দি	য়া ০	মেরে	যো০	বন্	কী ০	০ ০	
লাখোঁ	০ বা	হা ০	০ ০	০ ০	০র্	০ ০	০ ০	ইত্যাদি।

৩। বাঙ্গালা বর্ণমালাতে উর্দ্দূ ভাষা শুদ্ধ উচ্চারণে লেখা প্রায় অসম্ভব। কারণ মানবীয় কণ্ঠের নানা প্রকার সাধারণ শব্দ উচ্চারণ করিতে উর্দ্দূ বর্ণমালার যতটুকু সাধ্য আছে, বাঙ্গলা বা দেব্‌-নাগর বর্ণমালার ততটুকু ক্ষমতা নাই। প্রথম উদাহরণ স্বরূপ 'জিন্দিগী' কথাটি। বাঙ্গালা বা দেব্‌-নাগর অক্ষরে ঐ 'জ'-র উচ্চারণ ঠিক যেন ইংরাজী 'Ginger' কথার 'G'-এর উচ্চারণ। উহা অশুদ্ধ। 'জিন্দিগী' কথাটির 'জ'-এর শুদ্ধ উচ্চারণ ঠিক্ ইংরাজী 'Zebra' কথার 'Z'-এর মতন। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক 'অব্‌' কথাটিকে, যাহার অর্থ 'এখন'। আমরা বাঙ্গালাতে প্রায় প্রত্যেক অক্ষরকেই যেন গোল্ আকারে উচ্চারণ করিয়া থাকি; তাই বাঙ্গালাতে 'অব্‌' কথার 'অ' অক্ষরের উচ্চারণ ইংরাজী 'Orphan' কথার 'O'-র মতন গোল্। হিন্দী বা উর্দ্দূতে কিন্তু 'অ'র উচ্চারণ ইংরাজী 'Ugly' কথার 'U'র মত। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে, কতকটা একরকমের আওয়াজের জন্য একটীমাত্র অক্ষর ধার্য্য করিয়া, মানুষ সে অক্ষরটীকেই সে আওয়াজের বাকী বিভিন্ন টানের প্রতিনিধি-স্থলীয় করিয়া রাখে; যথা উল্লিখিত 'এখন' কথার 'এ' অক্ষর সম্বন্ধে বলা চলে। আমরা ঐ 'এ' অক্ষরকে ইংরাজী 'ate' কথার 'a'র উচ্চারণের জন্য আবার ইংরাজী 'action' কথার 'a'র উচ্চারণের জন্যও প্রতিনিধি করিয়া রাখিয়াছি, ইংরাজেরাও তাহাই করিয়া রাখিয়াছেন। উচ্চারণের কথা ছাড়া, উর্দ্দূ বা হিন্দীর এবং আমাদের বাঙ্গালার মধ্যে ব্যাকরণগত কতক্ প্রভেদও আছে। যথা, বাঙ্গালাতে 'গাড়ী এল' অশুদ্ধ নয়। কিন্তু উর্দ্দূ বা হিন্দীতে 'গাঢ়ী আয়া' অশুদ্ধ, কারণ ঐ ভাষাদ্বয়ে 'গাঢ়ী' কথাটি স্ত্রীজাতীয়। কাজেই স্ত্রীজাতীয় সংজ্ঞার জন্য স্ত্রীজাতীয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার হওয়া চাই। সুতরাং 'গাঢ়ী আয়ী' বলিতে হইবে। সেই নিয়মে 'নয়নোঁ কি পানী' কথা ভুল। 'নয়নোঁ' কথা পুংজাতীয় বলিয়া পুংসম্বন্ধবাচক অব্যয় 'কা' ব্যবহার্য্য। অর্থাৎ 'নয়নোঁ কা পানী' ঠিক, কারণ 'কী' স্ত্রীসম্বন্ধবাচক অব্যয়। উল্লিখিত এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ আমি এ উর্দ্দূ গানখানির মূল বানান অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়াছি, এই উদ্দেশ্য লইয়া—যাহাতে গানখানির উর্দ্দূ উচ্চারণ যতদূর সম্ভব বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বারা শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারা যায়। 'দিল্' মানে 'মন,' 'ও' মানে 'এবং', আর 'জান্' মানে 'প্রাণ'। সুতরাং 'দিলো-জান্' হইবে না, হইবে 'দিল্-ও-জান্'—অর্থাৎ 'মন্ ও প্রাণ'। অবশ্য মাত্রার সমতা রক্ষার্থ স্বরলিপিতে 'দিলো-জান্' কথাই অন্তর্গত করা হইয়াছে।

—লেখিকা।

৺লোহারাম শিরোরত্ন ও "মালতী-মাধব"।

এককালে (সেও খুব অধিক দিনের কথা নহে), ৺লোহারাম শিরোরত্নের নাম বাঙ্গালা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলেরই কাছে সুপরিচিত ছিল। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ আজ অন্যূন ৭৫ বৎসর হইতে বাঙ্গালী ছাত্রেরা পড়িয়া আসিতেছে। এখনও তাহা একেবারে লোপ পায় নাই। এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনেও অনেক স্থলে লোহারামের ব্যাকরণ পঠিত হইয়া থাকে।

কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, শিরোরত্ন মহাশয়, মালতী-মাধব নামক একখানি গদ্য গ্রন্থেরও প্রণেতা। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত সংস্কৃত মালতী-মাধব নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া ঐ গ্রন্থখানি বিরচিত। ঐ গ্রন্থের মুখপত্রে যে বিজ্ঞাপনটি আছে, তাহা এইরূপ :—

"বিজ্ঞাপন।"

"মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মালতী-মাধব নাটকের উপাখ্যান-ভাগ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। কোন কোন স্থলে মূল গ্রন্থের বর্ণনারীতির ব্যতিক্রম করিয়াছি, কোন কোন স্থলের কোন কোন ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত মিলাইলে অনেক ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইবে। সংস্কৃত মালতী-মাধব পাঠ করিলে যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, ইহাতে তাহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; তথাপি বঙ্গ-ভাষানুরাগী মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক এক একবার পাঠ করিলে, আমার সমুদয় প্রযত্ন সফল হয়। এই পুস্তকের রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।"

কৃষ্ণনগর।
২রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১৭।

শ্রীলোহারাম শর্ম্মা।

সংবৎ ১৯১৭, খৃষ্টাব্দ ১৮৬০। তখন বাঙ্গালা-গদ্যের নিতান্ত শৈশব-অবস্থা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "শকুন্তলা" মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। "সীতার বনবাস" তখনও প্রকাশিত হয় নাই। অথচ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে বসিয়া লোহারাম পণ্ডিত মহাশয় যেরূপ গদ্যে "মালতী-মাধব" গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও বাক্যবিন্যাসপ্রণালী সীতার বনবাসের সহিতই তুলনীয়।

গ্রন্থারম্ভে যে "কবি-বৃত্তান্ত" টুকু আছে, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল।—

"ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে পদ্মনগর নামে এক নগর ছিল। কাশ্যপবংশীয় কতিপয় বেদপারগ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাঁহারা নিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকাতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিয়ত যাগযজ্ঞাদি এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন ঐ শ্রোত্রিয়

ব্রাহ্মণেরা তত্ত্ব বিনিশ্চয়ের নিমিত্ত নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, যজ্ঞ ও খাতাদি কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেন, অপত্য উৎপাদনার্থ দার পরিগ্রহ করিতেন এবং তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত পরমায়ুর যত্ন করিতেন। ঐ বংশে ভট্টগোপাল নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়, নীলকণ্ঠ নামে অতি পবিত্রকীর্ত্তি তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরসে জাতুকর্ণীর গর্ভে মহাকবি ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন। ভবভূতির অপর নাম শ্রীকণ্ঠ।

"মহাকবি ভবভূতির সহিত নটদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ থাকাতে তিনি এই নানা গুণালঙ্কৃত নাটক প্রস্তুত করিয়া নটদিগকে সমর্পণ করেন। ঐ নাটকের বিষয়ে কবি লিখিয়াছেন—'যে ব্যক্তিরা এই সংস্কৃত নাটককে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাঁহারা কিছু বিশেষ জানেন না, তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমার এ প্রয়াস নহে। তবে, কালও নিরবধি, পৃথিবীও বিশালা, যদি আমার সমানধর্ম্মা কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, বা কোন স্থানে থাকেন, তাঁহারই পরিতোষার্থ এই নাটক রচনা করিতেছি। আর বেদাধ্যয়নই হউক, বা সাংখ্য, উপনিষৎ এবং যোগশাস্ত্রের জ্ঞানই হউক, নাটকে তাহার বর্ণনায় কোন প্রয়োজন বা ফলোদয় নাই; নাটকে যদি বাক্যের পরিপক্কতা ও ঔদার্য্য থাকে এবং অর্থের গৌরব থাকে, তবেই নাটক রচনায় পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্য।'

"সেই মহাকবি ভবভূতি এই মালতী-মাধব নাটকের প্রণয়ন করেন। ঐ দেশে কালপ্রিয়নাথ নামে এক মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তদীয় যাত্রা মহোৎসবপ্রসঙ্গে নানা দিগন্ত-বাসী জনগণ সমবেত হইত। তথায় তাঁহাদিগের অনুমোদনক্রমে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।"

এখন গ্রন্থের ভিতর হইতে একস্থল—মাধবের শ্মশান ভ্রমণ,—উদ্ধৃত করিতেছি :—"মাধবের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার নাই। তিনি ঈদৃশ রজনীতে একাকী অনায়াসে শ্মশান দেশে প্রবেশিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শবমাংসোপজীবী জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত ভয়ানক শ্মশান স্থল। কোন স্থানে চিতা-জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে নিকটস্থ অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, কিন্তু পরভাগ ভয়াবহ তমঃপুঞ্জে আবৃত। কোন প্রদেশে ডাকিনী যোগিনীগণ মিলিত হইয়া কিল কিল শব্দে কোলাহল করতঃ কেলি ও চীৎকার করিতেছে। কোন স্থানে বেতাল ভৈরব ভূত প্রেতগণ ভীমনাদে গর্জ্জন করতঃ নরমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত। কোথা বা বিকটাকার শব সকল ভূতাবিষ্ট হইয়া সহাস্য আস্যে নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা নরকপালের ঠণ্ঠন ধ্বনি, কোথাও বা হুপ্ হাপ্ দুপ্ দাপ্ ইত্যাদি শব্দ, কোথাও বা মার্ মার্ ধর্ ধর্ ইত্যাদি রব। মধ্যে মধ্যে শিবাগণের ঘোর বিরাব। উল্কামুখেরা ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, তাহাদিগের মুখ আকর্ণ-বিদীর্ণ ও বিকট দশন পঙ্‌ক্তিতে পরিপূর্ণ, ব্যাদান মাত্র অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিদ্যুজ্জ্বালার ন্যায় তাহাদিগের লোচন, তিমিরে কেহ লক্ষ্য, কেহ বা অলক্ষ্য হইয়াই শবমাংস অন্বেষণ করিতেছে। কোন ভাগে পুতনাগণ অবিরত নরমাংস গ্রাস করিতেছে, আবার বৃকদিগকে বুভুক্ষু ঘর্ঘর রবে কাঁদিতে দেখিয়া গ্রস্তমাংস উদ্গারণ পূর্ব্বক শান্ত করিতেছে। তাহাদিগের খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় জঙ্ঘা, শরীরাস্থি সমুদায় গ্রন্থিধারা বদ্ধ ও

কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে আবৃত। দেখিতে কি ভয়ানক! কোন দিকে দেখিলেন, বিকটাকার পিশাচগণ, সহজেই বিবর্ণ ও দীর্ঘকায় বলিয়া ভয়ানক, তাহাতে আবার বিশাল-রসনা-সঙ্কুল মুখ-কুহর প্রসারিত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর হইয়া আছে। সম্মুখে আরও এক বীভৎস কাণ্ড দেখিলেন। এক দরিদ্র পিশাচ বহুকালের পর এক শব পাইয়া প্রথমতঃ তাহার চর্ম্মসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তুলিল, স্ফীত ভূয়িষ্ঠ পূতিগন্ধিসুলভ মাংসরাশি ব্যগ্রতা সহকারে ভোজন করিল, পরে শ্রান্ত হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্থির হইল। অনন্তর সেই শব ক্রোড়ে লইয়া বিকট দশন বিস্তার করিয়া সন্ধিগত মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কোন প্রদেশে চিতাগ্নি ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছে। জ্বলন্ত মৃতদেহ হইতে নানাবর্ণ জল বিনিঃসৃত, মাংস সকল প্রচলিত, অস্থিসকল সন্ধিস্খলিত, বশারাশি বিগলিত ও বেগে মজ্জধারা প্রসারিত হইতেছে। প্রেতভোজীরা চিতা হইতে ঐ সকল ধূমপরিব্যাপ্ত অংশ লইয়া পরমানন্দে খাইতেছে। পিশাচাঙ্গনাদিগের প্রাদোষিক প্রমোদ কি ভয়ঙ্কর! শবের অন্ত্রই তাহাদের মঙ্গলমালা, শবহস্তই কর্ণকুণ্ডল, শবহৃৎপিণ্ডই পুণ্ডরীকমালা এবং শোণিতপঙ্কই কুঙ্কুমলেপ হইয়াছে। তাহারা স্ব-স্ব কান্ত সমভিব্যাহারে নরকপাল পান-পাত্রে মজ্জা-শোণিত সুরাপান করিয়া প্রীত হইতেছে। মাধব অকুতোভয়ে তাদৃশ ভীষণাকার শ্মশানে পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে পুরোবর্ত্তী তত্রত্য নদী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কুঞ্জ কুটীরস্থিত পেচককুলের চীৎকার ও জম্বুক কাদম্বের প্রকাণ্ড চণ্ডরব দ্বারা নদীর তটভাগ অতীব ভয়াবহ। প্রবাহ মধ্যে শীর্ণ ও গলিত শবকঙ্কালে বারিসংরোধবশতঃ ঘোর ঘর্ঘররবে স্রোতোনির্গম হইতেছে।”—ইত্যাদি।

উপরে উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মালতী-মাধবের ভাষা সীতার বনবাসের ভাষারই অনুরূপ। অথচ ইহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বা তাহারই কিছু পূর্ব্বের রচনা,—যে কালে বাঙ্গালা গদ্য ছিল অনুস্বার-বিসর্গ-হীন সংস্কৃতের মত দীর্ঘ সমাসবহুল. জটিল ও দুর্ব্বোধ।

শিরোরত্ন মহাশয়ের পরলোক গমন করার কিছু পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক আত্মীয় মালতী-মাধবের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। তারপরে বহুকাল হইতে এই দ্বিতীয় সংস্করণও বাজারে অপ্রাপ্য। বহুকাল ধরিয়া প্রচার-অভাবে লোহারামের “মালতী-মাধব” এখন কেবল পাঠকসমাজে নয়, সাহিত্যিক সমাজেও বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্মৃতি বা অনুসন্ধানের ত্রুটি বড়ই দুঃখের বিষয়। আজ ৭০।৭৫ বৎসরের অধিক কাল যাঁহার ব্যাকরণ বাঙ্গালাদেশের ছাত্রবৃন্দ পড়িয়া আসিতেছে, শুধু সেই ব্যাকরণের জন্যই তাঁহার নাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকা উচিত। তাহা ছাড়া, শিরোরত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালেই যেরূপ গদ্যে মালতী-মাধব গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সেকালের একজন উৎকৃষ্ট গদ্যলেখক বলিয়া গণ্য করিতে

হইবে। এজন্যও তাঁহার নাম বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবার কথা। কিন্তু সাহিত্যের কোন ইতিহাসেই তাঁহার নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, "ভিক্টোরিয়া যুগের বঙ্গ-সাহিত্য" লেখক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত ইঁহাদের কেহই লোহারামের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে মালতী-মাধবের অনুবাদক শিরোরত্ন মহাশয়কে বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সুপ্রকাণ্ড বিশ্বকোষেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন এই উৎকৃষ্ট গদ্য-লেখকের নাম স্থান পায় নাই। সরল বাঙ্গালা অভিধানে অভিধানাংশে লোহারামের নাম ও পরিচয় নাই। উহার পরিশিষ্টাংশে সংস্কৃত মালতী মাধব গ্রন্থের পরিচয় দিয়া অবশেষে আছে,— "লোহারাম শিরোরত্ন কৃত ইহার একখানি পদ্যানুবাদ আছে।" অভিধানকার মহাশয় নিশ্চয়ই লোহারামের "মালতী-মাধব" স্বচক্ষে দেখেন নাই বা ঐ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা হইলে মালতী-মাধবকে 'পদ্যানুবাদ' বলিতেন না। সেকালের একজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত, বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণেতা এবং সাধু গদ্যে মালতী-মাধবের অনুবাদক হইয়াও লোহারাম বঙ্গ-সাহিত্যে বিস্মৃত ও অবহেলিত হইয়াছেন।

শিরোরত্ন মহাশয়ের পুত্র ললিতবাবু এখনও বিদ্যমান্। তিনি কলিকাতায় থাকেন। তাঁহারই যত্নে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ব্যাকরণখানি এখনও মুদ্রিত হইয়া থাকে। তিনিও কি তাঁহার পিতৃ-কীর্ত্তি "মালতী-মাধব"কে বিস্মৃত হইলেন? তিনি একটু উদ্যোগী হইয়া শিরোরত্ন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাৎকালিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের অবস্থা সম্বলিত ভূমিকার সহিত মালতী-মাধবের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজ ও পাঠক পাঠিকাবৃন্দ তাহা সমাদরে গ্রহণ করিবেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল

গোপন

[বঙ্গবাণীর জন্য প্রেরিত শ্রীযুক্ত বেনোয়ার একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ দেওয়া গেল।]

তোমার বালা জড়িয়েছিলাম আমার বাহুপাশে,
বক্ষমাঝে রেখেছিলাম একটি দিনের তরে,
সাক্ষী শুধু চন্দ্র তারা অনন্ত আকাশে।
গোপন এ প্রেম প্রকাশ তবে হল কেমন করে?

আকাশ হতে সেই যে তারা নেমেছিল জলে
দেখ নি কি? সেই বলেছে নদীর কানে ধীরে;
নদীর কাছে শুনে নৌকা,—দাঁড়ের ছলছলে
জানিয়েছিল এই কথাটি ধীবর আরোহীরে।

ধীবর যখন নদী হতে উঠ্‌ল মাটির দেশে
প্রিয়ার কাছে জানাল এই প্রণয়-ইতিহাস
সখীর মেলায় ধীবর-পত্নী বল্‌ল হেসে হেসে
—শোন্‌গো একটা গোপন-কথা, শুনতে যদি চাস্।

এমনি করে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল কথা,—
আমার এমন ভাগ্য শুনে গ্রামের যুবক দল
ঈর্ষ্যাকাতর প্রাণে তাদের পেল বড় ব্যথা!
হাস্‌ল কিন্তু মুখের হাসি!—এতও জানে ছল!

শ্রীসুনীতি দেবী

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল ও সহজ প্রচারের কারণ

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল ও সহজ প্রচারের কারণ বুঝিতে গেলে তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মের অবস্থা না বুঝিলেই নহে। এই ধর্ম্মই বরাবর মনুষ্য সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং এই ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত বা স্খলিত হইয়া সমস্ত বিষয়েই আমরা সময়ে সময়ে অবনতি লাভ করিয়াছি। ভারত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য।

যখন অন্যান্য সমস্ত দেশ অজ্ঞান-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, তখন সরস্বতী তীরে আর্য্যেরা প্রথম জ্ঞানালোক সবিতৃদেবের মত গায়ত্রী মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন।

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,
কেন প্রাণ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি ॥"

কাহার ইঙ্গিতে এই মন বিষয়ে নিপতিত হইতেছে, কাহার প্রেরণায় এই প্রাণ নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে, কে এই জনসমূহকে বাক শক্তি দিল, কেইবা এই চক্ষু কর্ণকে স্ব স্ব ব্যাপারে পরিচালিত করিতেছে।

"ন যে দিহা বেদীম্মহতী বিনষ্টিঃ"

যাঁহাকে এখানে না জানিতে পারিলে মহাবিনাশ মনে করিয়া ব্যাকুল অন্তরে যাঁহারা শৈলশিরে, অরণ্যে, গিরিগুহায়, নদীতটে ঘুরিয়াছিলেন, এবং এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাঁহার সাড়া পাইয়া যাঁহারা আনন্দ বিহ্বল চিত্তে বলিয়াছিলেন—

"ওঁ যো দেব অগ্নেই যো অপ্সু
যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ
যো ঔষধীষু বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমঃ।"

তখন তাঁহাদের এই ভক্তি প্রণত চিত্তের ভাষা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্যে কখনও তাঁহারা মুগ্ধ, কখনও বিস্মিত ও চকিত হইতেন। ব্রহ্মের সহিত আমাদের কত নিবিড় যোগ ইহা তখনও বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে মোহে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিতেন। তাঁহার তুষ্টির জন্য সযত্নে বলি সংগ্রহ করিয়া নিবেদন করিতেন। কখনও কখনও দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, জলকেই পরম দেবতা বোধে স্তব করিতেন। কিন্তু যাঁহারা তপস্যা ও ধ্যান ধারণায় তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিতেন 'তোমরা কাহার পূজা

করিতেছ ?' তিনি যে তোমারই মধ্যে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচহি বাচং অট প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ।"

"সত্যেন লভ্য স্তপষা দোষ আত্মা
সম্যক জ্ঞানেন ব্রহ্মচার্য্যেন নিত্যম্।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়াহি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যত্রয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ॥"

এইরূপে ক্ষীণ পাপ ও ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, চিদাকাশে পরমাত্মার বরণীয়রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন এই পরমাত্মাই আনন্দরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা।
আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি॥"

কখনও তাঁহারা মায়া নাট্যযবনিকা উত্তোলন করিয়াও ব্রহ্মের অরূপ সত্ত্বায় মনপ্রাণ নিমেষে নিমজ্জিত করিয়া ধ্যান করিতেন—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।" কখনও "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" "রুদ্রং যত্র দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"—এই রুদ্রমূর্ত্তির ধ্যানে স্তব্ধ হইতেন। কখনও যেন সেই অজ্ঞাত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বদিত্বাতি মৃত্যু মেতি নান্যঃ পন্থা
বিদ্যতে অয়নায়।"

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকলে শোন—আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।

কখনও প্রেমে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া হৃদয় দেবতাকে হৃদয়ের মধ্যেই লাভ করিয়া বলিতেন—"শ্রেয়ো পুত্রাৎ, শ্রেয়ো বিত্তাৎ"—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা—" "রসোবৈসঃ—"। তখন এই তরুলতা পুষ্প শোভিতা অরণ্যখচিতা শ্যামল ধরণী, নদনদী, শৈলমালা, বিহগকাকলীমুখরিত কুসুমিত কুঞ্জ সমস্তই অপূর্ব্ব সুষমার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মহিমায় ভরিয়া উঠিত।—"মধুবাতা বাতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব—" সর্ব্বত্রই মধুময় হইয়া উঠিত।—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন যাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

কেননা তাঁহাদের "ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—" বিশ্বজগতে যাহা কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত দেখিতে হইবে।

কিন্তু বহুদিন গেল, ক্রমে এই আত্মার যোগ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, যজ্ঞধূমসমাচ্ছন্ন পশুশোণিতলিপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর পড়িয়া এই ব্রাহ্মজ্যোতিক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মনেরা যখন এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে নিমগ্ন—কেননা তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছিলেন যে তপস্যা যোগ যাগ ক্রিয়া কর্ম্ম কৌশল মাত্র নহে—কেননা—

"ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো
দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভূবঃস্বর্ব্রহ্মৈতদুপাসৈতৎ তপঃ।"

"ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, এবং ভূর্লোক ভুবর্লোক ব্যাপী এই যে ব্রহ্মা ইহাঁর উপসনাই তপস্যা।"—তখন রাজর্ষি-ক্ষত্রিয়েরা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সেই ব্রহ্মের অপূর্ব্ব জ্যোতির ধ্যানে মগ্ন হইতেন, এই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইতেন। উপনিষদ তাহারই ফলে। সেই সময় ব্রাহ্মণদের অল্প অল্প অবনতি ঘটিতেছিল এবং ক্ষত্রিয়েরা পরমার্থ চর্চ্চায় অল্প অল্প অগ্রসর হইতেছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনক রাজা শ্বেতকেতু অরুণেয়, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকে অগ্নিহোত্র কি করিয়া করিতে হয় জিজ্ঞাসা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বহু কষ্টে তাহার উত্তর দেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ) পাঞ্চাল সভায় শ্বেতকেতু অরুণেয়কে ক্ষত্রিয় প্রবাহন জৈবালী প্রশ্ন করিয়া একেবারে নিরুত্তর করিয়া দেব। তিনি ফিরিয়া আসিয়া পিতৃদেবকে বলিলেন আমি পাঁচটার একটী প্রশ্নের ত উত্তর করিতে পারি নাই—রাজন্য কিনা আমার অপমান করিল। (ছান্দোগ্য উপনিষদ) পিতা গৌতমও ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া পরে ক্ষত্রিয়-প্রবাহণ জৈবালীর নিকট হইতে এ প্রশ্নর মীমাংসা করিয়া লন। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে আর একটী গল্প আছে। একদা পঞ্চ ব্রাহ্মণ পরমার্থতত্ব জানিবার জন্য উদ্দালক আরুণির নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া এ প্রশ্ন মীমাংসার জন্য অশ্বপতি কেকয়ের নিকট লইয়া যান তবে তাঁহারা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। কৌষিতকি উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ আর একটী গল্প আছে। গার্গবালকী এবং কাশীরাজ অজাতশত্রুর সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক বহু আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয়। ইহাতে বালকী পরাস্ত হইয়া সমিধ হস্তে অজাতশত্রুর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি মহাশয়ের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। অজাতশত্রু বলিলেন ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত নহে। তবে আমি জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে সমস্তই বলিতেছি। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের অবস্থা এইরূপ ছিল। বশিষ্ঠ দেবের অনুশাসন হইতে ইহাঁদের অবনতি আরও সুস্পষ্টরূপে জানিতে পাওয়া যায়। যথা :—

"যে সকল ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা না করে ও যাঁহাদের গৃহে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত না থাকে "তাহারা শূদ্রের সমান।" "যেথানে ব্রাহ্মণেরা বেদানভিজ্ঞ ক্রিয়াবিমুখ ও ভিক্ষাপরায়ণ রাজা সেই গ্রামকে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিবেন কেননা তাহারা দস্যু ও তস্করের সমান।"

"বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দারা হস্তী ও চর্ম্ম মৃগের তুল্য তাহাদের নাম মাত্র সার।" "যে সমস্ত জনপদে মূর্খেরা বসিয়া বসিয়া জ্ঞানীর অন্ন গ্রহণ করে সেখানে জলকষ্ট ও মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই জাতি ছিল। আর্য্য জাতির ভিতর বিশেষ ভেদাভেদ ছিল না। পরস্পর বিবাহ ও আদান প্রদান চলিত। ক্রমে আর্য্য জাতির চারিবিভাগ সুস্পষ্ট হইতে লাগিল, বিবাহও একরূপ নিষিদ্ধ হইয়া গেল এবং একজাতি যদি অন্য জাতীয় স্ত্রী পুরুষের পাণি-গ্রহণ করিত, তাহা হইলেও সে বিবাহও স্বতন্ত্র হইত এবং শঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি ঘটিত। ক্রমে জাতিভেদ আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। তবে তখনও এতটুকু স্বাধীনতা ছিল যে সমাজ আশ্চর্য্যরূপ প্রতিভা দেখিলে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ কোন ব্যক্তিকেও উচ্চশ্রেণীর করিয়া লইতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিদেহরাজ জনক পরমার্থতত্ত্বে অপূর্ব্ব পারদর্শিতা দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ)। দাসী পুত্র ইলুষা তনয় কাবাস ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন (আত্রেয় ব্রাহ্মণ)। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবালের বিবরণও এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা-প্রদ। সত্যকাম ব্রহ্মচারী হইতে ইচ্ছুক হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা কোন জাতি ?" মাতা উত্তর করিলেন "বৎস! দাস্যাবস্থায় তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি তুমি কোন বংশ জানি না ; তুমি সত্যকাম, আমি জাবাল, তুমি সত্যকাম-জাবাল বলিয়াই পরিচয় দিও।" তিনি গৌতমকে ইহা জ্ঞাপন করিলে গৌতম বলিলেন "এরূপ সত্য আচরণ ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব, তুমি সমিধ আনায়ন কর আমি তোমাকে দীক্ষা দিব।" ইহা হইতে বুঝা গেল যে প্রতিভা থাকিলে অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিও তখন ঋষিত্ব গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু এ সকল কদাচ কাহারও কাহারও পক্ষে ঘটিত মাত্র।

এইরূপে ধীরে ধীরে সমাজের ভিতর পবিবর্ত্তন ঘটিতেছিল জাতিভেদ প্রথা ক্রমে দৃঢ়তর হইতেছিল। ব্রাহ্মণের ক্রিয়া ক্রমে যজ্ঞের ভিতর দিয়া বিলোপ পাইতেছিল ও ক্রমে ব্রহ্মমূর্ত্তি ও আত্মার যোগ অস্পষ্ট হইতেছিল। অথচ জ্ঞানের চর্চ্চা পরমার্থ তত্ত্ব তাঁহারাই করিতেন। শৌর্য্য বীর্য্য রাজ্যশাসন লইয়া ক্ষত্রিয়েরা থাকিতেন ; ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া বৈশ্য জাতিরা থাকিত কিন্তু ধর্ম্ম ও ভাবের উৎস উপরে রুদ্ধ হওয়াতে নিম্নে সমস্ত জাতির ভিতর তাহা কলুষিত হইতেছিল। শূদ্রেরা অস্পৃশ্য বলিয়া সমাজের এক পার্শ্বে উপেক্ষিত হইতেছিল। ষড়দর্শন উপনিষদ মীমাংসা প্রভৃতির কত পরে এইরূপ হইল বলা সুকঠিন। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা মোটের উপর ব্রাহ্মণের যন্ত্র-চালিত হইয়া চলিতে লাগিল। তবে তখনও পর্য্যন্ত নানা বাহ্যিক আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াও ধর্ম্মের অতি ক্ষীণ রশ্মি অল্প অল্প দেখা দিতেছিল।

তারপরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্ব খৃষ্টের অবস্থা অতি শোচনীয়। ধর্ম্ম নাই, যাগ যোগ্য ক্রিয়া কলাপ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ক্রিয়া কার্য্যাদি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

তাঁহাদের বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনা ইত্যাদির অধিকার নাই। বৈদিক ও উপনিষদ যুগের সময় যে স্ত্রীজাতি নানারূপে পুরুষের সহায় হইয়া চলিতেন, সেই স্ত্রীজাতি এক্ষণে শুধু পুরুষের লালসা বহ্নি পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কোন কাজেই লাগিত না; যে স্ত্রীজাতির মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতীর ন্যায় বিদুষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীজাতিই এক্ষণে লাঞ্ছিত অপমানিত ও পরিত্যক্ত। "নারী নরকের কীট নামে অভিহিত।"

সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ আইন কানুনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শূদ্রেরা যদিও আর্য্যদের আশ্রয়ে বাস করিত, কিন্তু কেহ তাহাদের যে বড় একটা শিক্ষা দীক্ষা দিত, তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিত, তাহাদের আত্ম মর্য্যাদাকে জাগরুক করিত এরূপ বোধ হয় না। তাহারা সমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইয়া একেবারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিয়াছে। সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি এইরূপ তখনকার অবস্থা।

ঠিক এই সময় বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। বিম্বিসার তখন মগধের সম্রাট। ইহার পূর্ব্বে অঙ্গরাজ্য—চম্পানগর তাহার রাজধানী। গঙ্গার উত্তরে প্রসিদ্ধ লিচ্ছবী বংশের রাজধানী বৈশালী নগর। দূর উত্তর পশ্চিমে কোশলরাজ্য শ্রাবস্তী তাহার রাজধানী ছিল। দক্ষিণে কাশীরাজ্য। কোশলরাজ্যের পূর্ব্বে রোহিণী নদীর দুই তীরে শাক্য ও কল্যাণবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। এই শাক্য রাজা শুদ্ধোদন কল্যাণবংশীয় দুই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহারই ঔরসে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনচরিত কে না অবগত আছেন? গৌতমের সত্য অন্বেষণে রাজ্যসুখ ও গৃহ, যুবতী স্ত্রী ত্যাগ, মায়াপাশ ছেদন, পৃথিবীর জরা মৃত্যুদুঃখে বিগলিত করুণহৃদয় মানব কল্যাণের জন্য চির সমর্পণ, ইহা কেনা জানে?—বুদ্ধদেব সমস্ত সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মগধরাজ বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে আসিলেন। অদূরে তপোবন ছিল, শৈলমালার গুহায় উদাসীন সন্ন্যাসীরা পরমার্থ চিন্তা করিতেন। বুদ্ধদেব আসিয়া আলাঢ় ও উদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সমস্ত হিন্দুশাসন ও শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু জ্ঞানে শান্তি আসিল কই? তখন তিনি সমস্ত প্রকার ব্রত, নিয়ম, তপস্যা করিতে লাগিলেন। যদি ইহাতে তাঁহার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হয়। তিনি বুদ্ধগয়ার নিকট ছয় বৎসর উরুবিল্ব অরণ্যে এইরূপ তপস্যা করিলেন। ইহাতে তাঁহার নাম যশ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বিস্তর শিষ্য সেবকও জুটিল। একদিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, লোকে মৃত মনে করিল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর হতাশ হইয়া তিনি ইহা ত্যাগ করিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া দিকে দিকে বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল। সংসারে একাকী বুদ্ধদেব নিরঞ্জনা নদীতীরে গ্রামবাসিনী সুজাতার নিকট পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া বটমূলে ধ্যানে বসিলেন। কত মার মূর্ত্তি, কত প্রলোভন, কত পাপ তাঁহাকে বিপথগামী করিতে চাহিল। সংসারের সুখের ছায়া মনের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কি করিবেন? আবার ঘরে ফিরিয়া যাইবেন? স্নেহময় পিতামাতা, প্রেমময়ী পত্নী, প্রাণাধিক পুত্র—তাঁহাদের কাছে

ফিরিয়া যাইবেন? কিম্বা এই মহাকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন;—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—কোন্‌টি করিবেন? শেষটাই স্থির করিলেন এবং আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে মোহ ও সন্দেহ বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের বিমল দ্যুতি তাঁহার চক্ষে পড়িল। জ্ঞান যাহা তিনি দেখিলেন—"পবিত্র জীবন ও সর্ব্বজীবে দয়া" ইহাই মুক্তির উপায়। তিনি এই জ্ঞানলাভ করিয়া কাশীধামে পূর্ব্ব শিষ্যদের নিকট ইহা প্রচার করেন। উপাক পথিমধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য মুখজ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি কোন্ আশ্রমবাসী—"? উত্তর "আমি সমস্ত বাসনা বিনাশ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি—কাশীরাজ্যে এই অমৃতের বারতা প্রচার করিতে চলিয়াছি।"—উপাকের মনঃপূত না হওয়ায় সে অন্যপথে চলিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে পাঁচ মাসে ষাট্‌জন শিষ্যলাভ করিলেন। ক্রমে উরবিল্বের প্রসিদ্ধ কাশ্যপ ভ্রাতারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে তিনি রাজগৃহে আসিলেন। সেখানে বিম্বিসার কাশ্যপ ভ্রাতাদের শান্তিলাভ করিতে শুনিয়া ও যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও সমাদরে তাঁহাদিগকে আপন প্রাসাদে আহ্বান করিলেন।

বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া তাঁহার সহজবোধ্য ও সহজ সাধ্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা:—অহিংসা ও সর্ব্বজীবে দয়া, পবিত্র জীবন ও বাক্যে কার্য্যে ও মনে পবিত্রতা যাজন, চৌর্য্যবৃত্তি, হত্যা, মিথ্যাকথা, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা ত্যাগ; ও অজ্ঞতা, অপরের প্রতি ঘৃণা, কুবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা মন হইতে দূরীকরণ করা ইত্যাদি।—ইহার মধ্যে অহিংসা ও সর্ব্বজীবে দয়া এবং পবিত্র জীবন যাপনই প্রধান।

যাগ যজ্ঞ ও বাহ্যিক ক্রিয়া আড়ম্বরাদির মধ্যে পড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের যে সরলতা ও স্পষ্টতা ছিল তাহা এক্ষণে মলিন, জটিল ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এই সরল সহজ অনুশাসনগুলি আবার নূতন করিয়া সেই মলিনতা, জটিলতা ও পঙ্কিলতা বিদূরিত করিয়া এক অভিনব সুর আনয়ন করিল। আবার ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইয়া নূতন আলো দেখা দিল।

ক্রমে রাজা বিম্বিসার এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। দেশের রাজা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না সে ধর্ম্ম কি জানিবার জন্য তাঁহার প্রজাবর্গ উৎসুক হইয়া উঠিল। সমাজের অধঃপতিত জাতিরা যাহাদের ব্রাহ্মণেরা অবহেলা করিয়া এককোণে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল ও স্ত্রীলোকেরা যাহাদের ব্রাহ্মণেরা সকল অধিকার হইতে দূরে ফেলিয়াছিল এক্ষণে তাহারা মহোল্লাসে এই জাতিবিচারশূন্য মহাধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অল্পদিনের মধ্যে বহু নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠিল। ক্রমে অশোক রাজা হইয়া সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের নানা অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া ও নানা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া এই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ইহা গ্রহণ করিয়া ইহার বহুল প্রচারে দিকে দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রেরণ করেন। তিনি নিজপুত্র কুণাল প্রভৃতিকে দেশে দেশে ইহার প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। রাজা অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম

ভারতময় বিস্তৃত হয়। ক্রমে রাজা কনিষ্কের সময় এই ধর্ম্ম সুদূর চীন পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় ও পরে ইহা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামরাজ্য, নেপাল, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া ও জাপানে একাধিপত্য বিস্তার করে। এই সময় জ্ঞানালোক দেশে দেশে বিচ্ছুরিত হয়, ইতিহাসের বর্ত্তিকা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং ভাবরাজ্যে আবার বসন্ত আগমন করে, গ্রামে গ্রামে বিহার ও মঠ নির্ম্মিত হয়।

সুতরাং দেখা গেল দেশের রাজার সাহায্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অত্যাচারে লোকের সে ধর্ম্মের প্রতি বিমুখতা ও বুদ্ধদেবের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার সহজ ও সরল পালি ভাষায় জনসাধারণের সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য অহিংসা ও সর্ব্বজীবে দয়া এবং পবিত্র জীবনযাপন এই বাণী স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিচারে অধিকার ভেদাভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচার করাই তদানীন্তন মনুষ্য সমাজের প্রাণে গিয়া সাড়া দিয়াছিল। এতদিনের বিক্ষোভ ও অত্যাচার জর্জ্জরিত সমাজ যে একটা পরিবর্ত্তন চাহিতেছিল তাহা সে পাইল, তাই ইহা সহজেই গ্রহণ করিতে একটুও দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করিল না।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আয়

আয় আনন্দ উছ্‌লে ছুটে, গড়িয়ে পড়ে' শিলায় লুটে,
ঝরণা জলের বেগের মত।
উড়বে খেয়াল পাখা মেলে, উদাস পথে, লক্ষ্য ফেলে,
শরৎ কালের মেঘের মত॥
আনমনা গান গাইব হেলায়,— হিমালয়ে দুপুর বেলায়
ঝাউএর সোঁ-সোঁ রবের মত।
বিজনপুরের শৈলে, বনে, স্মৃতি উড়ে পড়বে মনে
অতীত কালের "কবে"-র মত॥
আয় প্রমত্ত, গভীর, গাঢ়! শূন্য বুকের ফাঁকে বাড়,
পাহাড়-তলার নদীর মত।
উৎসাহ আয় আবার ফিরে আমার বেড়ে, সৃষ্টি ঘিরে,
ক্রুদ্ধ ঝড়ের গতির মত॥

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

চোর।

গল্প

জনার্দ্দন তর্কতীর্থ যেদিন চোর বলিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িল—সেদিন সহরময় একটা মহা 'হৈ-চৈ' পড়িয়া গেল। কতক লোক বলিল—"পাণ্ডিত্য-কাণ্ডিত্য কিছুই নয়—ও হচ্ছে রীতের দোষ।" কেহ বা কহিল—"নামটা ঠিকই রাখা হয়েছে—জনার্দ্দন ত' জনার্দ্দনই।"

দীন পণ্ডিত হাজতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—ইহাই প্রাক্তন ?

যথা সময়ে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে পণ্ডিত নীত হইল কৃতকার্য্যের জবাবদিহি করিতে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি চুরি করেছ ?"

"না।"

"তবে পুলিশ তোমাকে ধর্‌ল কেন ?"

"চুরির সংশোধন করতে চেষ্টা করেছিলাম বলে।"

"কি রকম ?"

"চুরি করেছিলাম—কিন্তু হজম কর্‌তে পার্‌লাম না।"

"তুমি জানো আমি কে ?"

"হাঁ, জানি—ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

"আমার কাছে অপরাধ স্বীকার কর্‌লে—কি হবে ?"

"জেল।"

"জেনে শুনেও কবুল দিচ্ছ ?"

"কি কর্‌ব ? বিবেকের কশাঘাত আরও বিষম। সহ্য কর্‌তে না পেরে অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ বিদ্রূপের হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি তাঁর পরিহাস-শাণিত কণ্ঠে কহিলেন—"বিবেকের যদি এত টন্‌টনে জ্ঞান—তা' হ'লে ওকাজ কর্‌তে যাওয়া কোন্ বিবেকের প্রেরণায় ?"

পণ্ডিতের চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যত্নে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল—"আজ আপনি বিচারাসনে—আমি বিচারাধীনে। আমাকে পরিহাস—বেত—চড়—লাথি, সবই আপনি দিতে পারেন। কিন্তু এ কথাটা ভুলবেন না, যে—চোরেরাও মানুষ। তাদেরও বিবেক আছে। তবে তারা অভাবের তাড়নায় সে শাসন মান্‌তে পারে না—এই টুকু তফাৎ। বিবেককে অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌লে এখানে আমাকে আস্‌তে হ'ত না। নির্ব্বিবাদে বাড়ী বসে থাক্‌তে পার্‌তাম।"

"Shut up"—ম্যাজিষ্ট্রেট্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আমি তোমার বক্তৃতা শুনতে চাইনে। আসল কথা বলো।"

পণ্ডিত বলিতে আরম্ভ করিল—"আমি ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত। যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম, ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত হচ্ছি, দেশের শ্রেষ্ঠ বিদায় পাব রাজার হালে কাটিয়ে দেব। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে দেখলাম—সব ভূয়ো। শ্রেষ্ঠ বিদায় দূরে থাক্—আজকাল বড় একটা কেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আহ্বানও করে না।

"কিন্তু তাই বলে ত আর পেট শোনে না। দুটো খেতে হবে। তার উপর সোনায়-সোহাগা! গুটিকতক মেয়েও হয়েছে। আপনি জানেন, কারণ, আপনিও ত বাঙ্গালী, বাংলা দেশে মেয়ের বাপ হওয়া কত বড় পাপের কত বড় প্রায়শ্চিত্ত! আবার চিরন্তন সংস্কারও ত্যাগ করতে পারি নে'—মেয়ের বিয়ে না দেওয়া পাপ। নিজের দুর্দ্দশা দেখে যার তার হাতে মেয়ে দিতেও পারি নে'। কাজেই ভাল ছেলে খুঁজ্তে হ'ল।

"ভাল ছেলে আবার ভাল চায়। যজমানিতে আজকাল আর পেট ভরে না। পূজার নামে পয়সা খরচ হয়ে দাঁড়িয়েছে—বামুনগুলোর বুজরুকি! আর ঠাকুর-দেবতা কি ঘুঁষ-খোর। শিষ্যও দু'চার ঘর আছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, গম্ভীর ভাষায় তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—"অ্যাঁ? গুরুতাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ?—তোমার এই কাজ?"

"হাঁ, আমার এই কাজ"—জনার্দ্দন অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—"শুনুন! আপনার যা' বলবার, তা' আপনি রায়ে বলবেন। আমি উকিল দিই নি'। আমার মকদ্দমা চলবেওনা। কেবল স্থির হয়ে আমার জবানবন্দি শুনুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ উত্তর দিলেন—"বলো।"

পণ্ডিত বলিল—"শিষ্য আছেন বটে। এখনও অবশ্য দয়া করে দু'চার জন বার্ষিকও দেন। কিন্তু আমার একটা মহৎ দোষ আছে। আমি বুজরুকি মানি নে'—ঢং জানি নে। যা' বলি তা' দিনের আলোর চেয়েও স্পষ্ট। যোগের ভান দেখাইনে'; কাজেই তাঁরাও আমাকে পছন্দ করেন না! কিন্তু কি করব—একেত' দেবতা নিয়ে ব্যবসা'—তাতে আবার ফাঁকি। তা' আমি পারলাম না।

"বলব কি, অতি শিক্ষিত—তাঁকে আমি যথার্থ শ্রদ্ধা করি—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী—তিনি যখন আমার শিষ্যত্বের বার হোয়ে গেলেন—অবশ্য দণ্ডীর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন—তাঁকে আমি বুজরুক বলছি নে'—কিন্তু ত্যাগ করার আগে আমি বা আমাদের মত যারা আছেন—তাঁদের মধ্যে কিছু আছে কি না—সে খোঁজ নিয়েছেন কি? এ ত্যাগে কি তাঁর আমাদের অপমান করা হয় নি'। যাক্ বাজে কথা। কাজেই আমার পেট চলে না। শেষে চাকরি

করতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু পড়েছি সংস্কৃত! কাজ পাব কোথায়? ইস্কুলের পণ্ডিত—ইংরাজি জানি না। আর আজকাল বি-এ পাশ করেও ইস্কুলের পণ্ডিতের উমেদার।

"ভাল আর দিতে পারি নে'। ভাল ছেলে সব একে একে হাত ফস্কে যায়। উপায় নেই" কি করি?

"সেদিন আস্‌ছি। ষ্টেশনে নামতেই দেখ্‌লাম তারিণীকে। সে এই ষ্টেশনের মালবাবু। রাজসাহী এক টোলে পড়তাম—ও দু'বার ন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না। পড়া ছেড়ে দিল। তখন আমি করুণা নেত্রে ওর পানে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই হল—ওর সুগ্রহ। তারপর এণ্ট্রেন্স থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ে সে রেলের মালবাবু। আজ এই জীবিকা-সমস্যার দিনে ওই আমার পানে সকরুণ নেত্রে চাইবে।

"তারপর সে তার বাসায় নিয়ে গেল। বল্‌ল, এই শীতে সে মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়েকে 'হেন' দিতে হবে—'তেন' দিতে হবে। মেয়ের জন্যে যে সকল গহনা সে গড়িয়েছে—তাও দেখাল'। আমার চোখ ঝল্‌সে গেল—মন বিষিয়ে উঠ্‌ল। কিসে সে এত বড় হয়—মাইনে ত' তিরিশ টাকা মাত্র! হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আমারি এক শিষ্য আমাকে তিন মণ কলাই পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু আমি যখন পেলাম—তখন তার তিরিশ সের কম। মণে দশ সের। এ চোরদের দণ্ড হয় না ম'শায়।

"প্রবৃত্তি ও বিবেকে গোল বাধাল। কিন্তু তখনও বিবেকের কণ্ঠ চেপে তাকে নিঃশেষে শেষ করে দিতে পারি নি'। প্রবৃত্তিকেই হার স্বীকার করতে হল।

"আমার একজন—আমার ঠিক নয়—আমার বাবার একজন শিষ্য ছিলেন—তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

একটা ক্রূর হাসিতে আসামীর চোখ মুখ ভরিয়া গেল। "হুঁ, গেলাম—তাঁর কাছে ভিক্ষার জন্যে। ভিক্ষার জন্যে বৈ কি? কারণ দাবী ত' তাঁর কাছে বিশেষ কিছু নেই। প্রার্থীর প্রার্থনায় তাঁর প্রাণ দয়ায় পরিপূর্ণ হোয়ে গেল। তিনি পথ নির্দ্দেশ করে দিলেন—বেশ সাদা ভাষায়—'ভিক্ষের চেয়ে চুরি করাও বরং ভাল।'

"মগজে শয়তান গর্জ্জে উঠ্‌ল—"হাঁ, তাই করতে হবে। কিসের ধর্ম্ম—কিসের বিবেক! চোরাই ধনে তৈরী-মাল চুরি করতে হবে।

"তারপরে কেমন করে চুরি করলাম, তা' ঠিক বলতে পারব না। সে অদ্ভুত প্রেরণা, শয়তানের উত্তেজনা কিনা? কিন্তু যখন সেই অলঙ্কারের বাক্‌স হাতে করে পথে এসে দাঁড়ালাম—তখন গা কাঁপ্‌ছে। কেমন একটা ভয়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়্‌লাম। কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল—অন্যায়! —বড় অন্যায়! এখনও কেউ টের পায় নি'। যাই—যেখানকারের জিনিষ সেখানে আবার রেখে আসি। কিন্তু শয়তান মনের মধ্যে রুখে উঠ্‌ল। তবুও বুকের মাঝে তোলপাড় করতে লাগ্‌ল।

"ঠিক কি করব ভেবে না পেয়ে ফের যখন পথের উপরে এসে দাঁড়ালাম—তখন বুকের রক্ত তরল হোয়ে গেছে। মুহূর্ত্ত! হাঁ—মুহূর্ত্তের মধ্যে একি করে বস্‌লাম। সেই রাতের অন্ধকারের ভিতরেও শিউরে উঠ্‌লাম।

"সত্যি! দোষ কার? আমারই কি? ভয়ে হাত পা অসাড় হোয়ে এল। নিজের বুকের ভিতর থেকেও কোন আশার বাণী শুন্‌তে পেলাম না।

"গেলাম—সেই অবস্থায় অলঙ্কারগুলি ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু সেবার যে প্রেরণায় অনায়াসে পাঁচিল টপ্‌কে যাতায়াত করেছিলাম—এবার সে প্রেরণা কোথায় উড়ে গেল। বুক কেঁপে উঠ্‌ল। পা পিছ্‌লে পড়ে গেলাম। তারপরই বুঝ্‌তে পারছেন—লোক জেগে উঠ্‌ল আমি ধরা পড়্‌লাম। সকলে বল্লে আমি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। কিন্তু আমি জানি—আর সত্য জানেন—আমি চুরি করে ঠিক পালিয়েছিলাম—কিন্তু চোরাই মাল ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়েছি। এ জগতে সত্যের মূল্য নাই। সত্যের যদি কোনও মূল্য থাক্‌ত তা'হলে আপনি আজ আমার বিচার করতে পারতেন না। চিন্তে পারছেন না—একদিন এই ভিক্ষুককেই বলেছিলেন — 'ভিক্ষার চেয়ে চুরিও ভাল'। মনে পড়ে?"

তীব্র কটাক্ষে পণ্ডিত ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের পানে চাহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের মাথাকে কিছুতেই উঁচু করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

আঁধারে

আলোর চেয়ে ভাল তুমি ঘন কাল অন্ধকার।
রৌদ্রে তপ্ত ক্ষিপ্ত তৃষা বুকে বাড়ায় দ্বন্দ্ব তার॥
অমানিশায় বহে ধারা অন্ত-হারা মাধুরীর;
অঙ্গে সে যে সদাই শীতল, কণ্ঠে সে যে স্বাদু নীর।

উদাস্-করা নিশির বাঁশি,—আঁধারে তার জমে সুর;
আঁধার আমার পান্থ-নিবাস, স্নিগ্ধ ছায়া নমেরুর।
অন্ত্যলীলার অন্তরালে মহাকালের রহস্য
আলিঙ্গিয়া আছে আমার সুহৃৎ সখা বয়স্য॥

বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পশ্চিম-এসিয়ার কর্ম্ম

বার্লিনে ভারতীয় কমিটি সংস্থাপনের পর তাঁহারা দেখিলেন যে পশ্চিম-এসিয়ায় ভারতীয়দের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ পশ্চিম-এসিয়া ভারতের দ্বার-স্বরূপ। এইজন্য তাহারা পরিচিত ইরাণী বৈপ্লবিক নেতাদের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিবার জন্য জর্ম্মান গভর্ণমেণ্ট আহ্বান করিলেন। ফলে ভারতীয় কমিটির ন্যায় পারস্যবাসীদের একটি কমিটি স্থাপিত হইল। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ সময়ে জার্ম্মান সাহায্যে পারস্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রুশ ও ইংরাজ-আধিপত্য দেশ হইতে বিনষ্ট করা। এই পরামর্শ অনুসারে বৈপ্লবিক যুবকদের তাঁহারা স্বদেশে পাঠাইলেন। তাঁহাদের সাথে কতিপয় ভারতীয় বৈপ্লবিককেও বার্লিন কমিটি পারস্যে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইরাণ দিয়া ভারতের রাস্তা পরিষ্কার করা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চে ভারতীয়েরা তুর্কিতে আসিয়া পৌঁছান ও একদল ইরাণের পথে বাগদাদে ও অন্য দল সুয়েজ কানালের পথে ডামাস্কাসে যাত্রা করেন।

যাঁহারা Syriaতে গমন করিলেন তাঁহারা Jerusalemএর হিন্দি-তাকিয়ার (হাজিদের জন্য অতিথিশালা) অধ্যক্ষ—যিনি একজন ভারতবাসী-মুসলমান—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মরুভূমির দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা কতিপয় মাস ঐ অঞ্চলে অবস্থান করেন। ইহার অধিক আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, কারণ এইস্থলে সুয়েজ খালের কিনারায় চর এবং ঐস্থানে ইংরাজ সৈন্য পাহারা দিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে গুলিও চলিতেছিল। বৈপ্লবিকদের এইস্থানে উপস্থিত হইবার অগ্রে এই ভারতীয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দেশী সৈন্যশ্রেণীর মধ্য হইতে ১৯ জন মুসলমান সিপাহী "জেহাদের" ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুর্কীর ছাউনিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তুর্কিরা তাহাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তথায় তাহারা সুলতানের শরীর-রক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। বৈপ্লবিকেরা কান্তারায় আসিয়া সিপাহীদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করেন। কতিপয় বদ্দুঃ (Bedawin) আরবদের দ্বারা খালের পরপারের সিপাহীদের সহিত আলাপ করিবার প্রচেষ্টা হয়। শেষে ঠিক্ হয় যে পর-পারে অর্থাৎ মিশরে গিয়া ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে দেশভক্তির দ্বারা ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে "জেহাদের" ঘোষণার দ্বারা বিপ্লব প্রচার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে কথায় কথায় গুলী চলিতেছে সেই শত্রুপুরীর মধ্যে এ অসম সাহসিক কর্ম্মে কে যাইবে? একজন তরুণ বাঙ্গালী তৎক্ষণাৎ এ কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত

হইল। এ যুবক রাত্রে সুয়েজ খাল সন্তরণ করিয়া মিশরে উপস্থিত হইয়া তথায় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে প্রস্তুত! তাহার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া তামিলভাষী এক যুবকও তাহার সঙ্গে এই বিপদে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে মৃত্যু স্থির জানিয়া অন্য সঙ্গীদের নিষেধে ইহা স্থগিত হয় ও সিপাহীদের সঙ্গে অন্য উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সিপাহীরা বলে যে, তাহারা সব ব্যাপারই বুঝে কিন্তু তাহারা নিরুপায়! হিন্দু সিপাহীরা মুসলমান ধর্ম্মীয় অজ্ঞাতপরিচয় তুর্কের দিকে পলায়নে অনিচ্ছুক অথচ সেস্থানে কিছু করিবার সাহস নাই; মুসলমানেরাও সেই প্রকার নিরুৎসাহ, তাহা ছাড়া যাহারা বিদ্রোহভাবাপন্ন তাহাদের পশ্চাতের দিকে পাঠাইয়া নজরে রাখা হইয়াছে! ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বৈপ্লবিকদের কাস্তারা হইতে বোগদাদে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য কুতালামারার (Kut-el-amara) আত্ম-সমর্পিত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লব প্রচার করা।

যাঁহারা পারস্যে যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্য অতি বিপদসঙ্কুল ছিল। তাঁহাদের পদে পদে ইংরাজের লোকের সহিত লড়িতে হইত। কোন কোন স্থলে শত্রুরা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিত, কখনও তাঁহাদের শত্রুর উপর আক্রমণ করিতে হইত। খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই হইত। ইঁহাদের ইরাণে আগমনের অগ্রে আমেরিকার গদর দলের প্রেরিত দুইজন বৈপ্লবিক কারমাণে (Kerman) ছিলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশে ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে গিয়া অস্ত্রাদি ভারতের দিকে প্রেরণ করিতেছিলেন। তদ্‌ব্যতীত যুদ্ধের অগ্রেই যে সব ভারতীয় বৈপ্লবিক সে দেশে ছিলেন তাঁহারাও বার্লিন হইতে প্রেরিত বৈপ্লবিকদের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কর্ম্ম করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ইরাণের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত যোগ স্থাপন করা ও সুবিধা হইলে একটী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যের দল গঠন করিয়া ভারত আক্রমণ করা। কিন্তু তাহাদের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল, শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য তাহাদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিতে হইল। ছদ্মবেশে ক্রমাগতই তাঁহাদের ঘুরিতে হইত। এক কথায় জীবন তাহাদের হাতে করিয়া চলিতে হইত। ইহাদের পারস্যে অবস্থান কালে সিরাজের ইংরাজ কন্‌সালেটের (consulate) ভারতীয় সিপাহীরা ইংরাজের খয়েরখাঁগিরি করে এবং বৈপ্লবিকদের ভুলাইয়া ইংরাজের হস্তে ধরাইয়া দেয়। এই প্রকারে ২২ বৎসরের বালক কেদারনাথ শত্রুর হস্তে ধরা পড়েন। তিনি যে স্থলে ছিলেন সে স্থলে ইরাণী ডাকাতের আক্রমণ হইলে তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করেন। রাস্তায় ভারতীয় সিপাহীদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের শিবিরে অতিথি হইতে বলে। তখন কেদারনাথ মরুভূমি দিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিতেছেন, রাস্তায় স্বদেশী লোকদের বাক্যের প্ররোচনায় সেই পরামর্শ সমীচীন মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে আসিলেন। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উচ্চ অফিসারের হস্তে তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। এই ব্যাপারে কেদারনাথ বলেন যে, "আশ্চর্য্যের বিষয়

অর্থের লোভে তোমরা আমার স্বদেশবাসী হইয়াও শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলে, অর্থের কথা আমায় বলিলে আমি কত অর্থই না তোমাদের দিতে পারিতাম।"

কেদারনাথ ধৃত হইলে মেসিদে আনীত হন ও তথা হইতে কেরমানে চালান হন এবং তথায় অন্যান্য বৈপ্লবিকদের সাথে ইংরাজ কর্ত্তৃক নিহত (shot) হন। চৈতসিংহ বলিয়া আর একটি যুবক যিনি বার্লিন হইতে বাগদাদ অঞ্চলে প্রেরিত হন ও পরে ইরাণে যান তিনিও এই সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হন। চৈতসিংহ যুদ্ধের অগ্রে জার্ম্মাণিতে অর্থোপার্জ্জনে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে কমিটি তাঁহাকে তুর্কিতে পাঠাইয়া দেয়। ইনি মেসোপোটেমিয়াতে ইংরাজ বাহিনীর মুরচার (trench) নিকট যাইয়া সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক পুস্তিকা ইত্যাদি ছুঁড়িয়া বিতরণ করিতেন। তাঁহার তৎকালে অসমসাহসিকতার জন্য সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু Lahore conspiracy caseএতে ইঁহার নামে পড়া যায় যে তথায় ইনি সাক্ষীরূপে আনীত হইয়াছেন।

এই সময়ে বসন্তসিংহ ও কেরসাস্প (Kersasp) নামক আর দুইজন বৈপ্লবিক কেরমান (kerman) আফগানিস্থানের সীমানায় ধৃত হন। তাঁহারা কাবুলে ভারতীয় মিশনের সন্ধান ও অর্থ পৌঁছিবার জন্য আফগানিস্থানে প্রেরিত হন। তাঁহারা আফগানিস্থান হইতে ফিরিবার কালে ধৃত হন। উঁহারাও উক্ত প্রকার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। শুনা যায় ইঁহাদের কাপড় দিয়া চক্ষু বাঁধিয়া গুলি মারা হইয়াছিল। কেদারনাথ ও বসন্তসিংহ দুইজন পাঞ্জাব প্রদেশী তরুণ যুবক। আমেরিকা হইতে বার্লিনে বৈপ্লবিক কর্ম্ম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কেদারনাথ ছাত্র ছিলেন; বসন্তসিংহ, যদিও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু তিনি একজন অতি উচ্চদরের খাঁটি স্বদেশভক্ত কর্ম্মী ছিলেন। ইনি উৎসাহী ভারত প্রেমিক ছিলেন এবং ইনিই প্রথম পার্শি যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহিদ হইয়াছেন। তৎপরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ অম্বাপ্রসাদকে পারস্য গভর্ণমেণ্ট সিরাজ হইতে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করে। তাহার ফলে তাঁহার ফাঁসি হয়। ইনি অতি প্রাচীন কর্ম্মী ছিলেন এবং পাঞ্জাব ও পারস্যে তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। আর বাকী যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা যখন উত্তর হইতে রুশ ও দক্ষিণ হইতে ইংরাজের সৈন্য আক্রমণ করিল তখন পলাতক হইয়া পাহাড়ের জাতিদের (tribes) মধ্যে ১৯০৬—১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লুকাইয়া ছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আশুতোষের জীবনচরিত

মহাপুরুষদিগের জীবন কথার আলোচনায় মানুষের সর্ব্বকালে সমান আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। কেমন করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যে ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মে, ঐকান্তিকতায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়, কথায় ও মতে, দূরদর্শিতায় ও জনহিতকামনায় অসাধারণত্ব প্রদর্শন করেন, মানবসাধারণ অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে আপনার মনোমধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে—মানুষ তাহাই পর্য্যালোচনা করিতে ভালবাসে। বহু সুখ দুঃখ, বাধাবিঘ্ন ও কৃতকার্য্যতার অবশ্যম্ভাবী ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্যজীবন। ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্রোতে নিয়ন্ত্রিত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সেইজন্য এই সকল অপ্রত্যাশিত অসুবিধা ও জ্বালা যন্ত্রণায় ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, ইহাদের ভিতর দিয়া যিনি আপনার স্থির লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন, তিনিই জনসাধারণ ও জনসমাজে বরেণ্য। ঝটিকাসংক্ষুব্ধ অন্ধকারময় সাগরবক্ষে পোতাধ্যক্ষ যেমন দূরস্থিত আলোকস্তম্ভের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিয়া পোতের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি অশেষ দুঃখদুর্দ্দশাপূর্ণ সংসার-সাগরে মানুষ যখন নানা বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া জ্ঞানহারা হইয়া যায়, তখন মহাপুরুষদিগের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া প্রাণে বল পাইয়া থাকে। কেমন ধীরস্থিরভাবে তাঁহারা বাধাবিঘ্নরাশি সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত পদবিক্ষেপে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন ও পরিশেষে কীর্ত্তিমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় আপনাদের গৌরবমণ্ডিত বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া লোকসমাজের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, ক্রমে কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। অসাফল্যের দুঃখ তাঁহাকে ধরাশায়ী না করিয়া বরং দ্বিগুণবলে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবমান হইতে উৎসাহিত করে। পুরাণ ইতিহাস এই বার্ত্তা বহন করিয়া অমর, কাব্যনাটকাদি উজ্জ্বলবর্ণে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া আদৃত।

বঙ্গমাতার ক্ষণজন্মা সন্তান আশুতোষ আধুনিক যুগের একজন মহাপুরুষ ছিলেন। বিদ্যায়, বিদ্যোৎসাহে, কর্ম্মশক্তিতে, গুণগ্রাহিতায়, আত্মসম্মানজ্ঞানে, দেশাত্মবোধে, স্বদেশপ্রীতিতে সকল বিষয়েই তিনি যুগন্ধর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা, তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতা বাঙ্গালী জাতিকে জগতের চক্ষে সম্মানিত করিয়া দিয়াছে। তিনি যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। কোন বিপদের বিভীষিকাই তাঁহার নির্ভীক বলশালী হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত না। এ যুগে সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, এমন সময়েও তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ও আশ্রিতবাৎসল্য অতুলনীয়। বিপন্ন ও উপায়বিহীন ব্যক্তি কাতর হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, তাহাকে কখনও বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত না। পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় সর্ব্ববিষয়েই

আশুতোষের পিতৃদেব

স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (প্রৌঢ়ে)

জন্ম ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৩৬ ; মৃত্যু ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯ ।

তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যপ্রার্থীর জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। যাঁহাদের তাঁহার সহিত মিশিবার বা কথা কহিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহারা এ জীবনে কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না।

নীলাম্বুদশ্যামল অরণ্যানীমধ্যে বৃহৎ বনস্পতি তুঙ্গশীর্ষে সূর্য্যালোক গ্রহণ করে ও তাহা স্বকীয় মহিমায় মন্দীভূত করিয়া সহনক্ষমভাবে চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষাবলীতে ও তলদেশস্থ শষ্পরাজিকে বিতরণ পূর্ব্বক তাহাদের নয়নাভিরাম শ্যামলতা বৃদ্ধির হেতুভূত হয়। এই বিশালদ্রুম যেমন বনপ্রদেশের শোভা সম্পাদন করে, তেমনি ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষনিচয় ও নিম্নদেশস্থ তৃণগুল্মাদিও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহার গাম্ভীর্য্যের সহায়তা করে। মহাপুরুষগণ তদ্রূপ সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হইতে সমুন্নত হইলেও, তাহারাও তাঁহার অসাধারণত্ব প্রতিপাদনের প্রধান সহায়। সাধারণ মানব তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আলোচনা করে ও যতদূর সম্ভব নিজের জীবন সেই আদর্শে গঠিত করিতে সচেষ্ট হয়। সেইজন্য কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হন, সেই সময় সেই জাতির পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বা অতীব সুসময়। উহা সেই মহাপুরুষের ভাবে, চিন্তাশক্তিতে ও কর্ম্মপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যল্প সময় মধ্যে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়, এবং অচিরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির দৃষ্টি ও লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

যে জাতির পণ্ডিতমণ্ডলী একসঙ্গে মিলিত হইলে মাতৃভাষায় আলাপ বা তর্ক করা অশোভন মনে করিতেন, যে জাতির প্রধান ব্যক্তিগণ মাতৃভাষাকে একটা ভাষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না, পরন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলাই লজ্জাকর মনে করিতেন, যে জাতির ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কোন বিশিষ্ট সভায় কেহ যোগদান করিতে সাহস করিতেন না, আশুতোষ সেই অবজ্ঞাত বঙ্গভারতীর পাদপীঠ বহু রত্নরাজিতে সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, এবং তাচ্ছল্যের সহিত দৃষ্ট সেই ধুতি চাদর পরিধান করিয়া বহু সমিতি, ও রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী জীবনের প্রত্যেক জিনিসকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এবং তাহা লইয়া গৌরব করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এই সর্ব্বদাভীত কর্ম্মবিমুখ জাতিকে তিনি স্বীয় দৃঢ়চিত্ততা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব দ্বারা বিশ্বমানবের সম্মুখে উন্নত করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষের গুণগ্রাহিতা ও বিদ্যোৎসাহের কথা চিন্তা করিলে সেকালের বিশ্রুতকীর্ত্তি নরপতি বিক্রমাদিত্যকে মনে পড়ে। এমন শত্রুমিত্রনির্ব্বিচারে গুণবানের গুণের আদর আর কোথায়ও হইয়াছে বা হয় বলিয়া শুনিতে পাই না। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশনের সভ্যরূপে সমগ্র ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যেখানে যে অধ্যাপকের বিদ্যাবত্তা বা অধ্যাপনার খ্যাতি শ্রবণ করিয়াছেন, প্রায় সকলকেই তিনি তাঁহার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের উন্নতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। আশুতোষ

স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কখনও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আশা ছিল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্ররূপে গঠিত করিবেন, তাঁহার অধ্যাপকগণের মৌলিক গবেষণা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধির হেতুভূত হইবে, এবং দেশবিদেশ হইতে বিদ্যার্থিসমূহ নবনব জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনীত হইয়া ও অধ্যয়ন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবে। যে সকল যুবকের কখনও নিজের অর্থে বা চেষ্টায় বিলাতে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া, সাহস দিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার চিরপোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষ করিয়া আনিয়াছিলেন। বালক বয়সের যাঁহার মৌলিক গবেষণা সম্বলিত প্রবন্ধগুলি কেম্ব্রিজের বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, যিনি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীকে অনেক নূতন জ্ঞান দিয়া সমৃদ্ধ করিতে ও নিজে চিরযশস্বী হইতে পারিতেন, যাঁহার যৌবনের প্রবন্ধ মধ্যে দুইচারিটি আজিও গণিত-শাস্ত্রের আদিস্থান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভূত হইয়াছে—তিনি সে গৌরবময় পথ দেশবাসী শিক্ষিত যুবকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, স্বয়ং পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদিগকে আশা, সাহস ও অর্থ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর হইতে অবিশ্রান্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। নিজের দেশের তরুণ যুবকগণের নিমিত্ত এ মহান্ স্বার্থত্যাগ আশুতোষকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

উত্তরকালে ইঁহাদের ভিতরে কেহ কেহ স্বার্থ-চিন্তায় জ্ঞানশূন্য হইয়া আশুতোষের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে নিমিত্ত তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির এক পরম মঙ্গল ও গৌরবময়ী কল্পনা আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত হইল, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষম অর্থাভাব। এই উপলক্ষে এক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বাঙ্গালী ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের অদূরদর্শিতার সাক্ষীস্বরূপে চিরদিন অপ্রিয় সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকিবে। এই অর্থাভাব যে তাঁহার শেষ জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছিল এবং অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই—ইহা চিন্তা করিলে হৃদয় দুঃখ ও শোকভারে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালীর এখনও আশুতোষকে সম্যক্‌রূপে বুঝিবার সময় আসে নাই। তাঁহার কৃত, অনুষ্ঠিত ও প্রারব্ধ কর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিবে ভবিষদ্‌বংশীয়েরা—তাঁহারা ঘাটে ঘাটে ঠেকিবেন ও অশ্রুচক্ষু হইয়া আশুতোষকে স্মরণ করিবেন।

আশুতোষের কার্য্যের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও সংযম। সাধক যেমন জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধপূর্ব্বক মনকে একলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া ঈপ্সিত ফললাভ করেন, আশুতোষ তেমনি যখন যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেন, একান্ত আগ্রহে, একান্ত যত্নে ও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে তাহার সাধনা করিতেন। বৃথা চিন্তা বা অযথা ভয় রেখামাত্র তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না।

শব্দ তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইয়া শক্তিযুক্ত হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতে তাঁহার
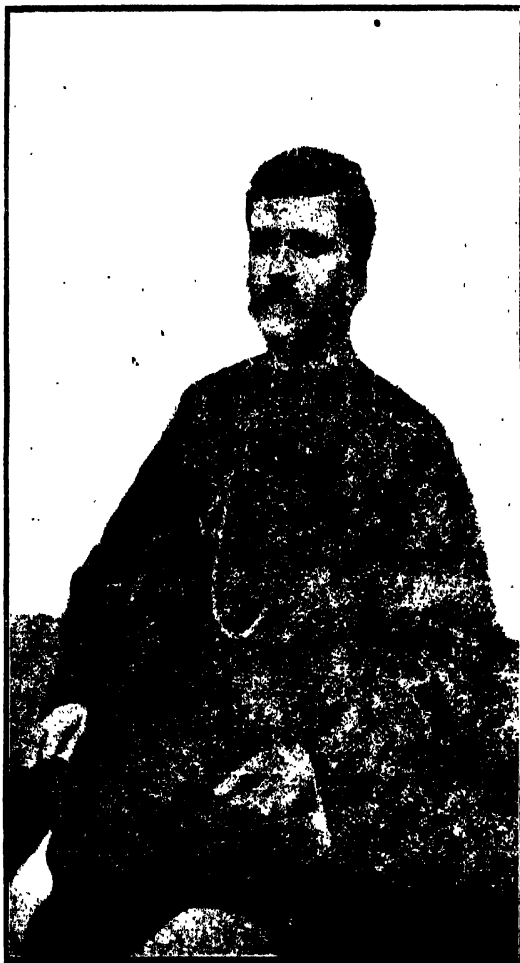
স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (যৌবনে)

মুখোচ্চারিত একটী শব্দ-প্রভাবে কত বক্তা বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তন্মুহূর্ত্তে বসিয়া পড়িতেন। তাঁহার একটী বাণীতে ব্যথিতের, উৎপীড়িতের ও উপায়বিহীনের হৃদয়ে নিরাশার মেঘে আশার বিজলী খেলিত। তাঁহার মুখে সম্মতিসূচক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য কত যুবক প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

বলিতে গেলে গত পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পক্ষপুটে আবৃত রাখিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন ইহার প্রাণ, তিনিই ছিলেন ইহার মস্তক, তিনিই ছিলেন ইহার কর্ম্মশক্তি। যতদিন ইহার বর্ত্তমান জীবনী-ধারা প্রবহমান থাকিবে, ততদিন আশুতোষ তাহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী জাতির জীবনকে প্রকৃতপথে চলিতে অনুপ্রাণিত করিবেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রাঙ্গণে যখন আসন্নপ্রলয়ের বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ দুইখানি মেঘের মত কুরু-পাণ্ডবদল বিবিধ নরঘাতী আয়ুধহস্তে একে অন্যের প্রতি লক্ষ্যপূর্ব্বক কেবল সৈন্যাধ্যক্ষের শঙ্খনির্ঘোষের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবীকে ভগবান বাসুদেব উপদেশ দিয়াছিলেন—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥"

গীতা, ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

——'ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাববলাদি দ্বারা অতিশয়িত যে কোন বস্তু তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশসম্ভূত জানিবে।' অর্থাৎ যাহা কিছু শ্রীমান্, যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যময়, যাহা কিছু তেজোময়, সমস্তই আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। বাস্তবিক, ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্নতা, এমন ঐশ্বর্য্য, তেজ ও জ্যোতির একত্র সমাবেশ ও প্রকাশ কি সম্ভবপর? এমন বিরাট শৌর্য্য ও ধৈর্য্য, এমন তেজোদৃপ্ত বিক্রান্ত মূর্ত্তি, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ, এমন সার্ব্বজনীন সমভাব, এরূপ পরদুঃখে কাতরতা ও তন্নিবারণে অক্লান্ত প্রয়াস মানবীয় ইতিহাসে বিরল। এই মহৎ গুণসমূহ আশুতোষকে চিরদিন বাঙ্গালী জাতির আদর্শ পুরুষ করিয়া রাখিবে।

জন্ম কথা

বলাগড়ের মুখোপাধ্যায় বংশের পূর্ব্বনিবাস ছিল দিকসুই গ্রামে। এই দিকসুই গ্রাম হুগলি জিলায় অবস্থিত। আশুতোষের পিতামহ বিশ্বনাথ, তথা হইতে আসিয়া জীরাট-বলাগড়ে বাস করিতে থাকেন। গ্রামপ্রান্তবাহিনী পূতসলিলা ভাগীরথীতে তাঁহারা অবগাহন করিতেন, আর সরলমনে প্রসন্নচিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বৎসরব্যাপী অভাব ও দুঃখদুর্দ্দশা অথবা নিদারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর—যাহা নরশোণিতপায়ী হিংস্র পশুর মত সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটাকে

স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে—এ সকলের প্রাদুর্ভাব তখন ছিল না। সুতরাং গ্রামবাসীরা সুখেই কালাতিপাত করিতেন। যদি কখনও কোন দুঃখের কারণ উপস্থিত হইত, গঙ্গাশীকরবাহী শীতল সমীরণ সে জ্বালা জুড়াইয়া দিত। অভাবের জ্ঞান যাহার নাই, সে কুটীরে বসিয়াই রাজা; মন যদি সন্তুষ্ট থাকিল, তবে ধনবানই বা কি, আর দরিদ্রই বা কি?

এইরূপে সুখে যাঁহাদের দিন কাটিত, তাঁহাদের একজনের ঘরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে শিশু গঙ্গাপ্রসাদ এক গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পিত হইলেন। এই গুরুমহাশয়েরা কি শ্রেণীর জীব ছিলেন, তাহা অনেক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় যে যে স্থানে একটু একটু কালীর দাগ দিলে মানুষের সহজ মুখাকৃতি বীভৎস আকার ধারণ করে, লেখকগণের অলক্ষিতে সেই সকল স্থান মসীচিহ্নিত হইয়া থাকিবে। গুরুমহাশয়েরা সারস্বত-মন্দিরের বাহিরের প্রহরী ছিলেন। তাঁহাদের হাত দিয়া সকলকেই আসিতে হইত—সেই সময়ে তাঁহারা অনেককে গড়িয়া পিটিয়া দিতেন। গঙ্গাপ্রসাদের গুরুমহাশয় কি শ্রেণীর লোক ছিলেন তাহা জানিতে না পারিলেও, তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বালক ছাত্রের মনে যে অতৃপ্ত জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা ও অদম্য উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। গঙ্গাপ্রসাদ শিশুকাল হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়শীল। এই সকল গুণ যাঁহার থাকে, কেহ তাঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। পরিণামে তাঁহার সকল কামনা জয়যুক্ত হয়।

স্বগ্রামে গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠ শেষ করিবার পর বালক গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতা আসিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান শোভাসম্পদসৌন্দর্য্যময়ী মহানগরী কলিকাতার একটা অস্পষ্ট আভাস মাত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজিকালি যাহা এসিয়ার প্রধান সহর বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার গৌরবশ্রী বিশেষ কিছু ছিল না। বহুকষ্টে, ব্যাধিপীড়ায় ভুগিয়া, স্বহস্তে রাঁধিয়া আহার করিয়া, দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া—নানাবিধ অসুবিধায় কেবল অর্থোপার্জ্জনের আশায় বা নেশায় লোকে তখন কলিকাতা থাকিত। বালক গঙ্গাপ্রসাদও এই সকল যে কতক কতক না শুনিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি ক্লেশের সম্ভাবনায় মুহ্যমান্ না হইয়া, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে কলিকাতা আসিলেন। সেকালে আর এক অসুবিধা ছিল এই যে সমস্ত সহরে দুই তিনটির বেশী ভাল স্কুল ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদ বহু চেষ্টায় ও অনেক ক্লেশ সহিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার বৎসরই, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। গঙ্গাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

সেকালে যাঁহারা বি, এ, পাস করিতেন, তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। দেশের লোকের নিকটও তাঁহারা প্রচুর সম্মান পাইতেন, গবর্ণমেন্টও তাঁহাদের মান রাখিতেন। সুতরাং গঙ্গাপ্রসাদ

ইচ্ছা করিলে অনেক বড় সরকারী কার্য্য করিতে পারিতেন। সে যুগে যাঁহারা বি, এ, পাস করিতেন, আধুনিক কালের অতি লোভনীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের গৌরবময় পদ তাঁহাদের বিশেষ আয়াসলভ্য ছিল না। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ সমস্ত দিক পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তখন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, সোমবার, অতি প্রত্যূষে বৌবাজার মলঙ্গা লেনস্থ এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে মেডিকেল কলেজে পাঁচবৎসর পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। পাঁচ বৎসর পরে ছাত্রগণ পরীক্ষা দিয়া এল্, এম্, এস্, উপাধি পাইতেন; ইঁহাদের ভিতরে যাঁহারা 'অনার' লইয়া পাস করিতেন, তাহারা এম্. বি. উপাধি পাইতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপ্রসাদ এম, বি, পরীক্ষায় অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম দুই বৎসর শিশু আশুতোষ অনেক সময় তাঁহার মাতার সহিত কাঁসারিপাড়ায় মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তাঁহার মাতুল পণ্ডিত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় তৎকালে সংস্কৃত কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকরূপে কাটাইয়া গিয়াছেন। শৈশবে আশুতোষ বড় রুগ্ন ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। জননী বহু যত্নে লালন পালন করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

এম্, বি, পাস করিবার পর গঙ্গাপ্রসাদ অনায়াসেই গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। তিনি আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নিজের কর্ম্মক্ষেত্র নিজে গড়িয়া লইবেন এই সঙ্কল্প করিলেন।

যে দেশে একটী কি দুইটী কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন শত শত আবেদন আনয়ন করিয়া কর্ম্ম-দাতাকে বিব্রত করিয়া ফেলে, ও তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের চাকরিপ্রিয়তা ও সর্ব্ববিধ দৈন্যের নগ্নচিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া একটা বীভৎস রসের আবির্ভাব করে—সে দেশে স্বাবলম্বনপ্রিয় ও বলিষ্ঠহৃদয় নিরাকুলিত-চিত্ত গঙ্গাপ্রসাদের চরিতালোচনায় সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। কেমন করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হয় বাঙ্গালীর এখন তাহাই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অনেক বিবেচনা ও পরামর্শের পর গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতার দক্ষিণভাগে ভবানীপুরে অবস্থান করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও বিদ্যার খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার সদয় ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে রোগীর মন তাঁহাকে দেখিলেই পুলকে ও আশায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সুচিকিৎসায় অনেক রোগী নানারূপ দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিৎস্য রোগমুক্ত হইতে লাগিল।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুরে প্রথমতঃ রসারোডে অবস্থান করিতেছিলেন, কিছুদিন পরে

তথা হইতে পদ্মপুকুর রোডে উঠিয়া গেলেন। এই স্থানে তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি সবিশেষ বিস্তীর্ণ হইল এবং তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তিনি তখন স্বোপার্জ্জিত অর্থে রসারোডের উপর বর্ত্তমান বাটী (৭৭নং রসারোড নর্থ) নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, বাঙ্গালা ১লা বৈশাখ, নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আশুতোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমারের জন্ম হয়। হেমন্তকুমার শৈশবে এমন শোভনদর্শন ও নবনীত কোমল ছিলেন যে তখন তাঁহাকে যিনি দেখিতেন তিনিই আদর করিয়া কোলে করিতেন। সেই দিব্যকান্তি বালগোপাল মূর্ত্তি দেখিয়া পরিচিত অপরিচিত সকলেই মুগ্ধ হইতেন এবং এই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত শিশুকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। আশুতোষ দেখিতে অত সুন্দরও ছিলেন না এবং বয়সেও বড় ছিলেন—সুতরাং সকলেরই আদর যত্ন হেমন্তকুমারেরই সম্পূর্ণ প্রাপ্য হইয়া উঠিল। আশুতোষ ইহার কিছু অংশই পাইতেন না। দেখিয়া দেখিয়া মাথায় তাঁহার এক দুর্ব্বুদ্ধি ঢুকিল। একদিন দুপুরবেলা এক লোহার মোটা শিক আগুনে পোড়াইয়া টকটকে লাল করিয়া আনিয়া হেমন্তকুমারকে বলিলেন, এইটে খুব চেপে ধরত। হেমন্তকুমার দাদার কথামত সেই উত্তপ্ত লৌহদণ্ড ধরিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে বাড়ীর লোক, 'কি হইল' 'কি হইল' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখে সর্ব্বনাশ হইয়াছে—ছোট খোকার হাত পুড়িয়া গিয়াছে। কোনও ক্রমে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, 'কোথায় গেল সে হতভাগা, তাকে আজ মেরেই ফেল্‌ব'। বহু যত্নে হেমন্তকুমারের দগ্ধ স্থান ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তিনি কিছুদিন ইহাতে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এদিকে আশুতোষ যেমনি বুঝিলেন এক ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন, অমনি একেবারে পলায়ন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের গাড়ী বাড়ীতেই থাকিত। আশুতোষ তাঁহার বসিবার স্থানটী (seat) উঁচু করিয়া তাহার নীচে লুকাইলেন। হেমন্তকুমারকে স্থির করিবার পর আশুতোষের খোঁজ পড়িল। তিনি কোথায়ও নাই। বাড়ীর কোথায়ও তাঁহাকে পাওয়া গেল না; এক্ষণে সকলে তাঁহার জন্য ভীত হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর গাড়ীর বসিবার সিটের নীচে তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেল। আশুতোষ ঘুমাইয়া আছেন, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে—তখন তাঁহাকে তুলিয়া আনা হইল। এই সময়ে আশুতোষের বয়স প্রায় ৫ বৎসর হইয়াছিল। যদিও শৈশবে খেলিতে খেলিতে এমন একটা ব্যাপার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার জন্য আশুতোষ চিরদিন দুঃখিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্নেহপ্রবণ হৃদয় দুর্লভ। তিনি হেমন্তকুমারকে ও একমাত্র ভগিনী হেমলতাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের কর্ম্ম করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার যখন খুব নামডাক, তিনি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যাইয়া দেখিতেন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহেও মেয়েরা স্বাস্থ্যরক্ষার

সাধারণ নিয়মগুলি পর্য্যন্ত জানেন না। কোথায়ও একটী ক্ষুদ্র শিশুর সামান্য অসুখে সকলকে একেবারে অধীর হইতে দেখিতেন, কোথায়ও বা মৃত্যুর ছায়া যে রোগীর মুখে প্রকট তাহারও অবিলম্বে আরোগ্য লাভের আশায় সকলকে উৎফুল্ল দেখিতে পাইতেন। গঙ্গাপ্রসাদ দেশবাসীর এই শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে এই অভাব পরিপূরণে যত্নশীল হইলেন এবং সর্ব্বদা বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও বাঙ্গালী জাতির অশেষ কল্যাণের নিমিত্ত "এনাটমি অর্থাৎ শারীরবিদ্যা" ও "চিকিৎসা প্রকরণ" নামক পুস্তকদ্বয় সহজ ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। আজিকালি বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন পুস্তক লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের "চিকিৎসা প্রকরণ" প্রভৃতি গ্রন্থ আদরণীয়। তাঁহার "মাতৃশিক্ষা" শিক্ষিত সমাজে এখনও পর্য্যন্ত সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে।

"প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যারম্ভঞ্চ কারয়েৎ" এই মনুবাক্যের নিয়মে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু পঞ্চম বৎসরে আশুতোষকে "চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে" ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। আশুতোষের অসাধারণত্ব ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যেই প্রতিভাত হইত। তিনি দুই বৎসর এই শিশুবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য ছাত্রগণের যাহা ছয় বৎসরের পাঠ্য, তাহাই শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

"শিশুবিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ অমনিই আশুতোষকে কোন ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন না। স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতেন "স্কুলে নানারকম ছেলে পড়ে, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া খারাপ হইবারই সম্ভাবনা বেশী। আর অল্পমেধা ছাত্রদের সঙ্গে পড়িলে, আশুতোষের অনেক বিলম্ব হইবে।" ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিজে প্রতিবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।"*

আশুতোষ এই সময়ে খুব ভোরে উঠিতেন। ক্রমে তাঁহার প্রত্যূষে উঠা এমন অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, তিনি গৃহের সকলের পূর্ব্বে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। পিতা উঠিলে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়া আসিয়া পড়িতে বসিতেন। এই প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যাস তিনি চিরজীবন পালন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, কখনও তাহা পরিত্যাগ করিতেন না।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বাছিয়া বাছিয়া সুশিক্ষকগণ আশুতোষের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন সুশিক্ষক কোমলমতি বালকগণের যেরূপ উপকার করিতে সমর্থ, অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। কুম্ভকার যেরূপ কর্দ্দম দ্বারা মনোভিরাম দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল গঠিত করে, সুশিক্ষক তেমনি বালক বালিকাগণের সুকোমল অন্তঃকরণে সুশিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে নরদেবতারূপে গঠিত করিতে পারেন। তাঁহারা বিদ্যার্থিগণের

* আশুতোষের ছাত্রজীবন, তৃতীয় সংস্করণ (চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা) পৃষ্ঠা ১০।

মানসনয়নের সম্মুখে কৃতীপুরুষদিগের সার্থক জীবনের কল্যাণকর ঘটনাবলী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, ছাত্রসম্প্রদায়ের অনুচিকীর্ষু মন আশায় আগ্রহে ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্রূপ হইতে চেষ্টিত হয়। বক্তৃতা দ্বারা অথবা আন্দোলনে সমগ্র দেশ প্রকম্পিত করিয়া যে ফললাভের আশা করা যায় না, সুশিক্ষক প্রকৃত শিক্ষাদান দ্বারা অনায়াসে তদপেক্ষা বহুগুণ সুফল উৎপন্ন করিতে পারেন। কিন্তু ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষকগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। অবসর পাইলেই তাঁহাকে পড়াইতেন। দিবসে তিনি এদিক-ওদিকে রোগী দেখিতে যাইতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গৃহে আসিয়া দেখিতেন ছেলে কি করিতেছে। গঙ্গাপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় সুন্দর ম্যাপ আঁকিতে পারিতেন এবং অনেক ম্যাপ আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত একখানি ম্যাপ আদর্শ হিসাবে অনেকদিন পর্য্যন্ত হেয়ার স্কুলে টাঙান ছিল। তিনি এক্ষণে আশুতোষকেও ম্যাপ আঁকা শিখাইলেন। আশুতোষও অনেক সুন্দর ম্যাপ আঁকিয়াছেন। এই সময়ে বালক আশুতোষ ইংরাজ কবি ক্যাম্বেলের Pleasures of Hope নামক কবিতার তিন শত লাইন এক নিশ্বাসে বলিতে পারিতেন। পড়াশুনার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেও পিতা তাঁহাকে রাত্রে পড়িতে দিতেন না। আশুতোষ অল্পদিন মধ্যেই বিবিধ বিষয়ের পুস্তক সকল শেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি যখন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি এক প্রবল অন্তরায় তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার বক্ষঃস্পন্দন পীড়া হইল। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের সুবিখ্যাত ডাক্তার চার্লসের নিকট লইয়া গেলেন, ডাক্তার সাহেব কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিলেন। পড়াশুনা পরিত্যক্ত হইল। পিতার ডাক্তারখানায় যাইয়া একটু আধটু কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পীড়ার কোনই উপশম হইল না। একটু কঠিন কাজ করিতে গেলেই বুক ধড় ফড় করিয়া উঠিত। বায়ু পরিবর্ত্তনে উপকার হইবে আশা করিয়া গঙ্গাপ্রসাদ পূজার পরে আশুতোষকে, তাঁহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী হেমলতার সহিত, পশ্চিমে মথুরায় প্রেরণ করিলেন। মথুরায় তাঁহার বন্ধু "সোনার তালগাছের" প্রতিষ্ঠাতা শেঠ বাবুদের ম্যানেজার বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন। তাঁহার নিকট পীড়িত পুত্রকে প্রেরণ করিলেন।

নূতন স্থানে আসিয়া আশুতোষের মনে খুব স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি কোনও ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। দৈনিক তিন সের দুগ্ধ ও কিছু মাখন, ইহাই তাঁহার পথ্য ছিল। আশুতোষ মনের আনন্দে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া সময় কাটাইয়া দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইল।

আশুতোষের পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি সুদৃশ্য জুড়িগাড়ী ছিল। দুইটী বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব সেই গাড়ীখানি লইয়া যখন বহির্গত হইত তখন তাহার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত

সহিসদ্বয় পশ্চাৎ হইতে 'সামনেওয়ালাগণকে' 'খবরদার' হইতে বলিত। তাহারা একপদ পা দানের উপর রাখিয়া ও অন্য পদ শূন্যে স্থাপিত করিয়া এমন একটা চমৎকার অভিনয় করিতে করিতে বহির্গত হইত যে তখন তাহা দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দেখিয়া দেখিয়া আশুতোষেরও একদিন ঐরূপ একপদ শূন্যে রাখিয়া সহিস হইয়া গাড়ী লইয়া বহির্গত হইতে একান্ত সাধ হইল। তিনি অন্যের অলক্ষিতে একদিন ঐরূপ করিয়া যেমনি বহির্গত হইয়াছেন, অমনি হঠাৎ নিম্নে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত পাইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। সেই আঘাত এমন নিদারুণ হইয়াছিল যে, তিন ঘণ্টার পূর্ব্বে আশুতোষ চক্ষুরুন্মীলন করেন নাই। তাঁহাকে লইয়া সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়াছিলেন। আশুতোষ ইহাতে কয়েকদিন বেশ কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তাঁহার বহুকর্ম্মচঞ্চল জীবনে তিনি এইরূপে অনেক কষ্টই সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি প্রাণটার জন্য তিনি কখনও বিব্রত হইতেন না। প্রাণের মায়া যাঁহার নাই, তাঁহার পক্ষে কোন কার্য্যই কঠিন নহে। এইরূপে সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে পৌষমাস পর্য্যন্ত সকলে মথুরায় থাকিলেন। এই তিন মাসেই আশুতোষের শরীর এত মোটা হইয়া পড়িল যে অসুখের সময় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সহসা দেখিয়া চিনিতেই পারিলেন না। পাছে আরও স্থূলকায় হইয়া পড়েন, এই ভয়ে তখন ব্যায়াম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষমাসে সকলে ভবানীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মথুরা হইতে কাশী হইয়া ফিরিবার পথে মোগলসরাই ষ্টেশনে দেশপূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালক আশুতোষের সহিত কথা কহিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তৎপরে কলিকাতা পৌঁছিয়া থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর পুস্তকের দোকানে পুনরায় সাক্ষাতের দিবস তাঁহাকে একখানি সুন্দর "রবিনসন্ ক্রুশো" কিনিয়া উপহার দেন। মহাপুরুষের নামস্মারক এই বইখানি আজিও তাঁহার গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক

জাতিভেদ—স্বদলে

গোড়ায় যাহারা ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁধিয়া নিঃসম্পর্কিত হইয়া বাড়িয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ জন্মিয়াছে—ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্মে ও নানা বিষয়ের রুচিতে, আর হয়ত বা চেহারায়; সে স্থলে পরস্পরের মধ্যে পাকা জাতিভেদ ঘটিবেই। একই দলের লোকের মধ্যে কি কারণে শ্রেণী-বিভাগ ঘটে, আর সেই শ্রেণীগুলির মধ্যে কি কারণে জাতিভেদ জন্মিয়া লোকেরা পরস্পরে সামাজিক ব্যবহারে নিঃসম্পর্কিত হয়, তাহাই এখন আলোচ্য।

যে সকল দলের লোকেরা সংখ্যায় খুব অধিক নয়, আর নিজেদের প্রভাব ও প্রসার অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া নানা ধরণের শিল্প ও ব্যবসায় সৃষ্টি করিতে পারে না—নানা রকম ভাগ করিয়া লোকেদের পক্ষে যেখানে নানা শ্রেণীর কাজে লাগিতে হয় না, সেখানে স্বদলের লোকেদের মধ্যে জাতিভেদ হয় না। মানুষের মধ্যে ক্ষমতার আধিক্যের হিসাবে প্রাকৃতিক ভাবে পদমর্য্যাদা জন্মে; এই পদমর্য্যাদার প্রভেদ অতি ছোট দলেও আছে, তবে সে প্রভেদে এমন ভেদ জন্মে না যাহাতে জাতিভেদ ঘটে।

একটি স্বাধীন ছোট দলের নেতা বা মোড়ল বা মাঝি বা রাজা সমাজে সম্মানিত হইলেও তাহাকে নিজের অধীনের বা বশবর্ত্তী লোকেদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেই হইবে, আর অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ লোকেদের মত তাহাকে উপার্জ্জনের ও ঘরকন্নার কাজ না করিলেই চলিবে না। শুধু এখনকার কতকগুলি অনার্য্যদলের লোকেদের অবস্থার দিকে তাকাইয়াই এ কথাটা বলি নাই। অনেক লুপ্ত ও বিস্মৃত সমাজের সামাজিক অবস্থার বর্ণে চিত্রিত রূপকথায় বা উপকথায় রাণীদের পক্ষে অতি সাধারণ ঘরকন্নার কাজের বিবরণ শুনি। পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন গল্পেই এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। হোমরের ইলিয়দ্ মহাকাব্যে আছে, যে এক রাজা যখন ক্ষেতে লাঙ্গল চালাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় মেনেলসের পক্ষের দূত তাঁহাকে ট্রয়ের অভিযানে জুটিবার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন। এদেশের অনার্য্যদের দলপতিরা নিজে লাঙ্গল চালাইয়া সম্মান হারান না। সংখ্যাবৃদ্ধির অভাবে ও সামজিক প্রসারের অভাবে এক দলের ছোট বড় সকলেই প্রায় একই শ্রেণীর শিক্ষায় ও কাজ-কর্ম্মে জীবন কাটায়।

উল্টাদিকের প্রভাবশালী বহু প্রসারিত সমাজের সামাজিক বিচিত্রতার ও জটিলতার দৃষ্টান্ত দিয়া কথা বাড়াইব না। বহু জনের বহু প্রসারিত সমাজে নানা কাজ করিবার জন্য যে নানা সম্প্রদায়ের ভাগ হয়, ও যাঁহারা ক্ষমতার হিসাবে পদ-গৌরব পান তাঁহারা যে পদ-গৌরব বিশিষ্ট অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া থাকিবার সুবিধা পান, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তবে এই বিচিত্রতায় কাজ কর্ম্মের শ্রেণী জন্মিলে ব্যবসায়ীর শ্রেণী ও পদ-গৌরবধারীদের শ্রেণী জন্মে কেন, ও সেই শ্রেণীগুলির মধ্যে স্থায়ী জাতিভেদ জন্মে কেন, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

সমাজরক্ষার জন্য অর্থাৎ মানুষের স্থিতির জন্য যে সকল কাজ অবশ্য কর্ত্তব্য, লোকেরা তাহার কোনটিকে ছোট, কোনটিকে বড়, কোনটিকে হেয়, কোনটিকে পূজ্য মনে করে কেন? আবার অন্যদিকে ক্ষমতার প্রভেদে এক সময়ে লোকেরা যে যে কাজ করে, তাহাদের বংশধরেরা ক্ষমতার বিনা বিচারে পূর্ব্বপুরুষদের সেই সেই কাজ করিয়া বিভিন্ন কার্য্য করিবার শ্রেণী বাঁধিতে বাধ্য হয় কেন, আর সেই শ্রেণীগুলি স্থায়ী হয় কেন? এ প্রশ্নের খাঁটি উত্তর পাইবার আগে গোটাকতক ছোট ছোট জানা-শোনা প্রাকৃতিক অবস্থা স্মরণ করিবার প্রয়োজন।

(১) বুদ্ধির বলে কাজ চালাইবার নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারে অত্যন্ত অল্প লোকে, আর অনুকরণ করিয়া কাজ করে বহুলোকে ; বুদ্ধিমানেরা স্বতঃই বাহাবা পাইয়া সমাজে সম্মানিত হইবেই। (২) মানুষেরা আপদে-বিপদে যাহার ক্ষমতায় ও কৌশলে রক্ষা পায়, সে ব্যক্তি সমাজে অধিক আদর পাইবেই। (৩) মানুষের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা, সে যাহাতে শরীরকে অধিক ক্লান্ত না করিয়া প্রয়োজনের কাজ হাসিল করিতে পারে ; যে তাহা পারে, পরিশ্রমে কাতরেরা তাহাকে উঁচু মনে করিবেই। (৪) যে অনেক উপার্জ্জন করিতে পারে ও কাজেই যে অনেককে রক্ষা ও পালন করিতে সমর্থ, সে ব্যক্তি সমাজে পূজিত হইবেই। (৫) যে ব্যক্তি শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগকে না তুষিয়া পুষিতে পারে, অর্থাৎ যাহার এমন সম্পদ আছে যে, সে শিল্পী ও শ্রমজীবীদের তৈরি জিনিষ কিনিয়া ভোগ করিতে পারে, সে সাধারণ লোকের কাছে পদগৌরব পাইবেই। (৬) যে কাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের সেবা, অর্থাৎ যে কাজ একদিকে স্বাধীনভাবে নিজের ঘরে বসিয়া করিয়া মূল্য আদায় করা চলে না ও অন্যদিকে যে কাজ করাইবার জন্য বিশেষজ্ঞ কৌশলী বা শিক্ষিতকে খুঁজিতে হয় না, সেই কাজ ও সে কাজের লোক নীচু বলিয়া বিবেচিত হইবেই। এই ছয়টি কথা অতি জানা-শোনা ছোট কথা হইলেও, তর্কের সময়ে ও তত্ত্বের অনুসন্ধানের সময়ে লোকে এগুলি ভুলিয়া যায়।

মানসিক প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়মের ফলে কোন কাজ বা বড়, আর কোন কাজ বা ছোট বিবেচিত হইবেই ; তবে একজনের এক সময়ের করা কাজ তাহার বংশবদ্ধ হয় কেন ? একটা "মতবাদ" আছে যে, সহজে সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধির জন্য ও রক্ষার জন্য মানুষের মধ্যে "শ্রম-বিভাগ ও শিল্প-বিভাগ" করা হইয়াছিল। ইউরোপের এক শ্রেণীর অবৈজ্ঞানিক লেখকদের কাছে কেহ কেহ জাতিভেদের মূলে এই division of labour ও উহার economic reasons-এর হেতুবাদ শিখিয়াছেন। জাতিভেদটি যে মানুষে বুদ্ধির কৌশলে গড়িয়া পিটিয়া সৃষ্টি করে নাই, আর মানুষেরা যে কাজ বিশেষকে অপেক্ষাকৃত ছোট বা হেয় জানিয়াও উহা বংশবদ্ধ করিবার জন্য বরিরা লয় নাই, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যেভাবে জাতিভেদে শ্রম ও শিল্পের বিভাগ হয়, তাহাতে যে কাজের উন্নতি না হইয়া অবনতিই ঘটে ; তাহা পরে দেখাইব। যে কারণে সমাজের কোন একটি কাজ করিবার জন্য একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, ও সেই শ্রেণী পাকা জাতি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত দিব পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাস ধরিয়া।

পূজ্য ঠাকুরের ও পূজারি ঠাকুরের ইতিহাস অতি অল্প কথায় সূচিত করিব ; ১৩১৯এর 'প্রবাসীতে' ঐ বিষয়ের স্বতন্ত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে মানুষের

পুরোহিত জাতির উৎপত্তি

উৎপত্তির প্রথম যুগেই মানুষের মনে এই ভাবটি আব্‌ছায়ার মত ফুটিয়াছিল, যে, প্রত্যক্ষ পৃথিবীর মূলে বা সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা আছেন যিনি অদৃষ্ট ও অনন্ত। এই ভাবের ফলে অনুন্নত মানুষের মনে একটা হেঁয়ালি-ঘেরা বিস্ময় জাগিয়া-

ছিল, কিন্তু দুর্বোধ্য স্রষ্টাকে তুষ্ট করিবার জন্য পূজার প্রবৃত্তি জাগে নাই। আদি জন্মদাতাকে কেহ রুষ্ট ভাবে নাই, তাই তাঁহাকে তুষ্ট করিতে চায় নাই। এখনকার সকল বর্ব্বর সমাজেই এই মনের ভাব সুস্পষ্ট। কোল জাতীয় মুণ্ডারা আদিম স্রষ্টারূপে যে শ্রেষ্ঠ "বোঙ্গা"কে মানে তাহাকে পূজা করে না, কেননা তাহারা বলে যে ঐ শ্রেষ্ঠ বোঙ্গা কাহারও অনিষ্ট করেন না। হিন্দুদের নির্গুণ ব্রহ্মের মত ইনি বিস্ময়ে স্বীকৃত মাত্র। হঠাৎ (বর্ব্বরের বিবেচনায় বিনা কারণে) ঝড়-তুফান ওঠা দেখিয়া, অনাবৃষ্টি দেখিয়া, রোগ ও মহামারী প্রভৃতি নানা বিপদ দেখিয়া, জড় প্রকৃতির শরীরে হিংস্র বাঘ, ভালুক প্রভৃতির মত যে সকল অশরীরী আত্মা বা ভূত কল্পিত হয়, সেই সকল ভূতরূপী বোঙ্গাদিগকে খাদ্য দিয়া ও মন ভুলাইবার মন্ত্রে ঠাণ্ডা করিয়া পূজা করিবার বিধি আছে। সকল বর্ব্বর সমাজেই এইরূপ ভূতের ওঝা বা দেব-পূজারি আছে। কি পদ্ধতিতে এই পূজা ও পূজারি জন্মে, তাহা অল্প কথায় বলিতেছি।

আমাদের জীবনের মূল যে জৈবনিক পদার্থ, তাহার প্রাকৃতিক গুণ বা ধর্ম্মই এই, সে মরণ এড়াইয়া বৃদ্ধি ও প্রসার চায়। জীবনের ভিত্তির সেই মৌলিক ধর্ম্মে সোজা বুদ্ধির সকল মানুষই জীবনকে অমর ভাবিয়া সুখী হয় ও যাহা তাহার সুখের নিদান তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। হয়ত এই প্রাকৃতিক বিশ্বাস খাঁটি সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু উহার বিচার এখানে হইবে না।

একেত বর্ব্বরেরা বালকের মত সকল পদার্থকেই নিজেদের মত চেতন-প্রাণবিশিষ্ট মনে করে ও সেইরূপ প্রাণবিশিষ্ট পাথর ও মাটি প্রভৃতিকে অক্ষয় ও অমর দেখে, তাহার উপর আবার অস্পষ্ট ভাবে তাহার মনের তলায় নিজের অমরতার আকাঙ্ক্ষা স্থির থাকে; কাজেই নিজের বিশ্বাসের ও প্রবৃত্তির অনুকূলে কোন উপমা বা দৃষ্টান্ত পাইলে তাহার বিশ্বাস সুস্পষ্ট ও সবল হয়। উপমা বা দৃষ্টান্ত ভ্রান্ত রকমের হইলেও মৌলিক বিশ্বাসটিকে হয় ত অনেকে ভুল বলিতে চাহিবেন না। সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিসের উপমায় অমর আত্মায় বিশ্বাস স্পষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিতেছি।

বর্ব্বর যখন একটুখানি চিন্তা করিতে শিখিবার পর এ যুগের একটি শিশুর মত আপনার ছায়া দেখিয়া চমকিয়া ছিল, জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, এবং প্রস্তররুদ্ধ পর্ব্বতগুহার মধ্যে ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্নে আপনাকে বনে পাহাড়ে ছুটিতে দেখিয়াছিল, তখন সে আপনার মধ্যে আর একটা 'আমি' আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহার পর সাধ্য-সাধনায় যদি কাহারও মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে দেখিয়াছিল, তখন সে সহজেই প্রতীতি করিয়া লইয়াছিল যে, মূর্চ্ছিতের লুকান মানুষটা যে দরজা বন্ধ থাকিলেও রাত্রে মৃগয়া করিতে যায়! কোথাও ছল করিয়া পলাইয়া ছিল, আবার আসিয়াছে। মৃত্যুকেও যখন বর্ব্বর প্রথমে মূর্চ্ছা ভাবিয়াছিল, তখন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া পলায়নপর আত্মাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; আহার্য্য সামগ্রী প্রভৃতি দিয়া শ্রাদ্ধের পিণ্ডজলের সূত্রপাত করিয়াছিল; কিন্তু ভিতরকার মানুষ বা আত্মা ফিরে

নাই। জলাশয়ের তীরে ও পাহাড়ে তাহাকে ডাকিয়া প্রতিধ্বনি শুনিয়া চমকিয়াছিল, এবং তাহাকে তৃপ্ত করিবার জন্য অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিল।

স্বপ্নে যখন বর্ব্বরেরা বীর দলপতিকে বা বুদ্ধিমান্ উপকারী ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল ও তাহার সঙ্গে স্বপ্নে কথা কহিয়া উপদেশ পাইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছিল, তখন প্রথমে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে মৃতের আত্মা আকাশে বা বাতাসে যেখানেই থাকুক, ইচ্ছা করিলে সূক্ষ্ম শরীর ধরিয়া দেখা দিতে পারে, আর সেই সঙ্গে বুঝিয়াছিল যে প্রেতাত্মাকে শুভক্ষণে স্বপ্নে টানিয়া আনিতে পারিলে অনেক জ্ঞানের উপদেশ পাওয়া যায়। যাহারা আকাশে বাতাসে থাকে তাহারা নিশ্চয়ই ঝড়ের, মহামারীর বা অন্য আপদের কারণ বা প্রতীকার বলিতে পারে; এই বিশ্বাসে স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া ভূত নামাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল আর সেই প্রথা এখনও পৃথিবীময় অনেকস্থানে দেখা যায়। এইখানে হইয়াছে পুরোহিত সৃষ্টির গোড়া পত্তন।

দশের সমাজে বুদ্ধিমান্ যেমন অল্প, কৌশল করিয়া ভূত ধরিবার লোকও সেইরূপ অল্প ছিল ও আছে। বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে বিশুদ্ধ উপযুক্ত পাত্রকেই অনুগৃহীত করিয়া ভূতেরা দেখা দিতেন। ভূত ডাকাটি সকলের সাহসে কুলাইত না। উপযুক্ত ও বিশুদ্ধ মিডিয়ম হইবার উদ্যোগে উপবাস করিয়া (পেটে খাদ্য না রাখিয়া ও ময়লা জমিতে না দিয়া) যখন কৃত্রিম উপায়ে স্বপ্ন সৃষ্টি করিত, তখন ওঝাকে নাকের ডগায় দৃষ্টি রাখিয়া অথবা অন্য রকমে শারীরিক প্রক্রিয়ায় হাত পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরাইয়া ও মাথা ভোঁ-ভোঁ করাইয়া স্নায়বিক বিকার ঘটাইতে হইত। এই সাধনায় ভূতের সঙ্গে যোগ হইত, অর্থাৎ যোগ সাধন হইত। এইরূপে যাহারা ভূতের অর্থাৎ দেবতার অনুগ্রহ পাইত তাহারা হইত সমাজে বিশেষ উপকারী, কারণ বুদ্ধি করিয়া সহজ মানুষে হিতের উপায় পাইতে পারে, কিন্তু দৈববলে দেবতা বশ করিয়া হিতের অমোঘ উপায় ধরিবার লোক দুর্লভ। রাজাদিগকে বেশি করিয়া এই দলের লোকের স্মরণ লইয়া আপদ এড়াইতে হইত ও জয়লাভ করিতে হইত।

যে ব্যক্তি দেবতার কৃপায় বিশুদ্ধ, তাহার রক্তেই বিশুদ্ধ মানুষ জন্মিতে পারে, ইহা ছিল সর্ব্বজনব্যাপী বিশ্বাস। সমাজের হিতের জন্য এই ওঝা দলের পবিত্রতা রক্ষার দিকে লোক-সাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল। ওঝাদের সঙ্গেই ওঝাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত; কাজেই সমাজের ইচ্ছা ও আগ্রহে একটি হিতকর উঁচু দলকে সাধারণের ছোঁয়ার অতীত করিয়া বাড়ান হইয়াছিল। অল্পসংখ্যক পুরোহিতের দল জোর করিয়া সমাজের মাথায় পা দিয়া বসিতে পারে নাই।

বৈদিক প্রকৃতি পূজার পূর্ব্বে যে পিতৃ পুরুষের ভূতের পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বৈদিক আখ্যানে সুস্পষ্ট থাকিলেও এখানে একটির অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া চলিবে না। দেবতাদেরও ঊর্দ্ধলোকে পিতৃলোক স্থাপিত। ঋভুদের পূজায় দেখিতে পাই যে ঋভুরা দেবতা হইলেও এক সময়ে অঙ্গিরার সন্ততি ছিলেন; কাজেই উপাসকদের জ্ঞাতি মনুষ্য ছিলেন। ঋভুদের প্রকৃতি

সম্বন্ধে বেদে অনেক সুস্পষ্ট উক্তি আছে; এখানে কেবল সায়নের যে টিকাটি প্রাচীন যাস্ককে ধরিয়া, তাহার উল্লেখ করিতেছি। সায়ন লিখিয়াছেন—ঋভবোহি মনুষ্যাঃ সন্তঃ, তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।

ব্যাখ্যাটিতে "তপসা" আছে; তপস্যাতেই হউক অথবা প্রাকৃতিক কল্পনাতেই হউক, পিতৃপুরুষেরাই যে আগে দেবতা হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত। ঋষিরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা; অর্থাৎ দেবতার কাছে দেব-বশ করিবার যে মন্ত্র লুকাইয়া থাকিত, তাহাই যে শুভক্ষণে দেবতার কৃপায় পাইয়া তাঁহারা বংশের বিশিষ্টতার ফলে মন্ত্র রচিতে পারিতেন ও সেই মন্ত্রে আধি ব্যাধি দূর করিতে পারিতেন, একথা সকল বৈদিকগ্রন্থে স্বীকৃত।

এ প্রবন্ধকে আর দীর্ঘ করা চলে না। রাজা কি করিয়া আলাদা জাতির লোক হইলেন, ও যে সকল জাতির মধ্যে পুরোহিতদের মত পবিত্রতা রাখার কথা নাই, তাহারা কি করিয়া আলাদা আলাদা জাতি হইল, পরে তাহার আভাষ দিয়া এই সম্পর্কের আরও কয়েকটা বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা পরে লিখিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

তিলক চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

তিলকের পূর্ব্বের মহারাষ্ট্র

নিউ ইংলিশ স্কুল স্থাপনের সময় হইতে তিলকের সার্ব্বজনিক জীবনের আরম্ভ হইলেও, তাহার কার্য্যাবলী বুঝিতে হইলে তৎপূর্ব্বের মহারাষ্ট্রের খবর রাখা আবশ্যক। তিলক কলেজে প্রবেশ করেন ১৮৭২ সালে, তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৯২০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭২ সালের কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পেশবা রাজ্যের পতন হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বরাজ্য লোপ হইয়াছিল আর শেষের পঞ্চাশ বৎসরে সেই নষ্ট স্বরাজ্য পুনরায় হস্তগত না হইলেও তাহার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। শেষের পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয় আমরা এক মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা উপলক্ষে প্রদান করিব আর আগের পঞ্চাশ বৎসরের সমগ্র মহারাষ্ট্রের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১৮১৮ সালে বাজীরাও সাহেব পুণা হইতে প্রস্থান করিলেন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাহার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পেশবা পরিবারের কোন শাখার কোন পুরুষ পুণায় আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন নাই। ১৮৬১ সালে বাজীরাও পেশবার কুলগাঁও প্রাসাদ সাড়ে

সাত হাজার টাকায় নীলামে বিক্রয় হইল, শনিবার প্রাসাদে নূতন কাছারি বসিল, বুধবার প্রাসাদে পুণাবাসিগণ সংবাদ পত্র হইতে বিলাতী খবর আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল। বাজীরাওর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল উত্তর ভারতে এবং দত্তক শাখার আত্মীয়েরাও থাকিতেন উত্তর ভারতে। বাজীরাওর সহিত প্রথম অনেক লোক দক্ষিণ হইতে ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়াছিল, কিন্তু পেশবার আয়ব্যয় ত দুইই তখন সীমাবদ্ধ, সুতরাং দক্ষিণ হইতে আর সেখানে বেশী লোক যায় নাই, পুণা ও ব্রহ্মাবর্ত্তের সম্পর্ক ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছিল। নানাসাহেব রাওসাহেব প্রভৃতি পেশবা বংশের তরুণগণ সেখানেই মানুষ হইয়াছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর তাহাদের নামমাত্র অবশেষ রহিল। বাজীরাওর কন্যা অনেক বৎসর অন্তর কখনও কখনও পুণায় আসিতেন, কিন্তু কেহ তাহার প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। স্বয়ং বাজীরাওর পরলোক গমনের সংবাদ দক্ষিণে আসিলে জ্ঞানপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রে তৎসম্বন্ধে আট দশ লাইনের বেশী লিখা হয় নাই। সে ক্ষেত্রে তাঁহার কন্যার খবর কে লইবে? জীব ও মানুষের অভাবে পেশবা পরিবারের কোন কোন পুরুষ বা নারীর কেবল নকল মূর্ত্তি পুণায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ইংরাজী আমলের প্রারম্ভে দ্বিতীয় মাধবরাওর পত্নীর নকল মূর্ত্তি পুণাবাসিগণ দেখিয়াছিল, আর সেই প্রাক্‌মিউনিসিপাল-যুগের অন্ধকার রাত্রিতে যদি শনিবার প্রাসাদের পূর্ব্ব অধিবাসিগণের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি কেহ কখনও প্রাকারের উপর অথবা তোরণের শিরোভাগে বিচরণ করিতে দেখিয়া থাকে তবে বিস্ময়ের কারণ নাই। ইংরাজী আমলের প্রথম যুগের সুশিক্ষিত লোকদিগের লেখা হইতে অথবা সেকালের জনসাধারণের মত হইতে পেশবার পতনে যে কেহ প্রকৃত দুঃখ বোধ করিয়াছিল এরূপ মনে হয় না। সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তার নর্ম্মদার এ পারে বেশী হয় নাই। স্বয়ং নানাসাহেবই জবরদস্তীতে পড়িয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন; তাঁহার সামন্ত ও সর্দ্দারগণের চিত্তে বিদ্রোহের উৎসাহ কোথা হইতে আসিবে? কোহ্লাপুর রামদুর্গ, জামখিণ্ডী প্রভৃতি সামন্ত রাজ্যে কোথাও বা সামান্য বিদ্রোহ হইয়াছিল, কোথাও বা বিদ্রোহের সংশয় মাত্র দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশেষত্ব কিছুই ছিলনা। গোয়ালিয়র রাজ্য ছিল একেবারে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থানে, কিন্তু তথাকার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজা স্যার দিনকর রাও রাজগড়ে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহ হইতে দেন নাই।

পেশোবা রাজ্য নষ্ট হওয়ার পর সাতারার সিংহাসন ত্রিশ বৎসর কাল বজায় ছিল। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই অনেক গোলযোগ হইয়া শেষে ১৮৪৮ সালে সাতারা রাজ্য ইংরাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল এবং সামান্য বৃত্তি ছাড়া শিবাজীর এই বংশধরের আর কিছুই রহিল না। নষ্ট রাজ্য উদ্ধারের জন্য আইনসঙ্গত উপায়ে বহু আন্দোলন হইয়াছিল। সাতারার মহারাজার প্রতিনিধি রঙ্গো বাপুজী বিলাত গিয়াছিলেন, মহারাজার প্রীতিভাজন অনেক ইংরাজকে বশে আনিয়াছিলেন, কোর্ট অব ডিরেক্টর সভায় বাদবিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছুই

হয় নাই। সকলেই স্বীকার করিলেন যে প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা, তাহার প্রমাণ মিথ্যা, কিন্তু রাজ্য ফিরাইয়া দিবার হুকুম পাওয়া গেল না। তারপর সাতারার বংশে দুই পুরুষ হইয়া গেলেও তাহাদের প্রতিপত্তি একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা পুণায় কখন আসেন নাই, সাতারাবাসিগণের পক্ষেও তাহাদের দর্শন দুর্লভ হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসনের কিছুমাত্র অধিকার না থাকাতে অন্যান্য সামন্ত রাজাদের মত প্রসঙ্গ বিশেষেও তাহাদের নাম কখনও জাহির হইবার সম্ভাবনা রহিল না। শেষে ঋণের দায়ে বৃত্তি ও জমিদারীর আয়ও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহের বংশধর নাকি ভিক্ষান্নে ব্রহ্ম দেশে উদর নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেকেরই এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে শিবাজীর বংশধরেরও কি শেষে সেই অবস্থা হইবে? কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই।

গোয়ালিয়ার ও ইন্দোরের রাজাদের ক্ষমতা সাতারার মহারাজার ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইংরেজের অধীন হইলেও নিজ রাজ্যের সীমানার মধ্যে তাহারা সর্ব্বাধিকার সম্পন্ন আর্থিক হিসাবে গোয়ালিয়ার রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৫৭ সালে রায়জাবাই সিন্ধিয়া যে বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা পড়িলে অহল্যাবাই হোলকারের কথা মনে পড়ে। শত শত মাইল দূর হইতেও এই যজ্ঞের দক্ষিণা লাভের আশায় দক্ষিণ হইতে ভিক্ষুকগণ ছুটিয়াছিল। জয়াজীরাও সিন্ধিয়া জনসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রসিকতা ও মনুষ্য চরিত্রের জ্ঞান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। একবার মাত্র তিনি পুণায় আসিয়াছিলেন কিন্তু সেবার তিনি পুণাবাসীদিগকে তেমন খুসী করিতে পারেন নাই। পুরাতন খবরের কাগজে দেখা যায় যে তাঁহার লোকদিগের সঙ্গে পুণার লোকদের ঝগড়া বিবাদ হইয়াছিল। দক্ষিণে যে তাঁহার ইনাম ও জায়গীর ছিল তাহার বদলে তিনি উত্তরে ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে জমি পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ মহাদজী সিন্ধিয়ার সমাধি-মন্দির পুণার অনতিদূরে বানবড়ী গ্রামে অবস্থিত। কিন্তু এই মন্দিরেরও সিন্ধিয়া সরকার যথোচিত যত্ন করেন নাই। ইন্দোরের একালের নরপতিগণের মধ্যে তুকোজী রাওর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ইংরাজ সরকারের সহিত ব্যবহারে তিনি তেজ ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া মহারাষ্ট্রে তাঁহার খ্যাতি ছিল; সিন্ধিয়া অপেক্ষা দক্ষিণের সঙ্গে তিনি সম্পর্কও অধিক রাখিয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে তুকোজী রাও যখন পুনায় আসেন তখন তিনি সার্ব্বজনিক সভাকে চারি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তিনি পুণাবাসিগণের বিশেষ প্রীতিভাজনও হইয়াছিলেন। সেকালের একজন শাহির কবি একটি গাথায় তুকোজী রাও সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

দেবের দয়ায় চক্ষু পেয়ে ইন্দোরের রাজ
রাও তুকোজী দেখতে পেলাম, ধন্য আমি আজ।
অনেক রাজা হিন্দুস্থানে অনেক তাদের ধন,
তুকোজী চরিত্রে তাদের উচিত দেওয়া মন।

বরোদা রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির এলাকার মধ্যে এবং সেখানে অনেক মহারাষ্ট্রীয়ের বাস বলিয়া এই রাজ্যটিকে মোটেই আলাদা বলিয়া মনে হয় না। সেখানকার দরবারের সকল খুটিনাটির রহস্য মহারাষ্ট্রবাসীরা সহজেই বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ মহল্লাররাও মহারাজের বিরুদ্ধে যখন রেসিডেণ্ট কর্ণেল কেয়ারের প্রতি বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উপস্থিত হয় তখন এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মহারাষ্ট্রবাসীরাই অধিক লক্ষ্য দিয়াছিল। বাজীরাও পেশবার মত মহল্লারাও-ও জনসাধারণের প্রকৃত সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে জুলুম জবরদস্তির অভাব ছিল না। ১৮৭৩ সালে যখন তাঁহার শাসন প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হয় তখন তাঁহার অনেক দুর্ব্যবহার প্রমাণিত হইয়াছিল। তিনি শিলেদার ও সরদারের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন, ইনাম ও বংশপরম্পরা গত অধিকার লোপ করিয়াছিলেন, ব্যবসায়ীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে মোটা রকমের নজর আদায় করিবার রীতি তাঁহার আমলেই বিশেষভাবে প্রচলিত হয়, বিচারালয়ে পর্য্যন্ত ন্যায়ান্যায়ের প্রভেদ রহিত হয়, মহারাজের খাস খানসামা ও মোসাহেবের দল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং শীলবতী নারীদিগকেও জোর করিয়া রাজবাড়ীর বাঁদীতে পরিণত করা হয়। কমিশনের তদন্তে তাঁহার বিরুদ্ধে এতগুলি গুরুতর অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। অতিরঞ্জন ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে সত্যের অংশ নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের হাতে মহল্লাররাও অত্যন্ত নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দাদাভাই নৌরোজী অল্পদিনের জন্য বরোদার দেওয়ান হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ণেল ফেয়ারের বনিবনাও না হওয়াতে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দেন। কর্ণেল ফেয়ারের দুরাচরণের কথা সরকার পক্ষও অস্বীকার করেন নাই এবং কর্ণেল সাহেবকে বরোদা হইতে বদলী করাও হইয়াছিল কিন্তু এই সময়ে বিষপ্রয়োগের মামলা হয় এবং সেই মামলার বিচারের জন্য কমিশন নিযুক্ত হয়। বরোদার শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ইংরেজ সরকার ইতিপূর্ব্বেই জারী করিয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ দাবী করিয়া বসিল যে মহারাজার বিচার সামান্য লোকের দ্বারা না করিয়া তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের দ্বারা করিতে হইবে এবং বিচার কার্য্যে উৎকৃষ্ট ব্যবহারাজীবের সাহায্য লইতে হইবে। সাধারণের এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস্ স্যার রিচার্ড কৌচ, মহিশূরের চীফ কমিশনার স্যার রিচার্ড মিড্, পাঞ্জাবের কমিশনর মেলভিন, গোয়ালিয়রের মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা ও রাজা স্যার দিনকররাও বিচার-কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন এবং সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন নামক ব্যারিষ্টার মহারাজের পক্ষসমর্থন করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হন। মহারাজের অপরাধ সম্বন্ধে বিচারকগণ একমত হইতে পারেন নাই, সিন্ধিয়া মহারাজের মতে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই, জয়পুরের মহারাজ ও রাজা দিনকর রাও সিন্ধিয়ার মতের সহিত ঐক্য প্রকাশ করেন। কিন্তু

ভারত গবর্ণমেণ্ট অভিযোগ সত্য বলিয়া ধরিয়া মহ্লররাওকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহার নিজের ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের সমস্ত দাবী ও অধিকার একেবারে লোপ করিয়া মহারাণী জমনাবাই সাহেবাকে গাইকুবার বংশের একটি বালককে দত্তক দিয়া তাঁহার নামে শাসন কার্য্য চালাইবার সঙ্কল্প করেন। মহ্লাররাও মহারাজ যখন প্রথম বন্দী হন এবং যখন তিনি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন তখন তাঁহার আরব সিপাহী ব্যতীত আর কেহ কোন গোলযোগ করিবার চেষ্টা করে নাই। মহারাজাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথোচিত সুযোগ দেওয়া হউক,—জনসাধারণের পক্ষ হইতে এইটুকু দাবী করিবার অতিরিক্ত সহানুভূতি মহারাজের প্রতি তখন কাহারও ছিল না। বরোদার নবীন ব্যবস্থা চালাইবার জন্য স্যার টি মাধবরাও দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। তাহার যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার খ্যাতি থাকিলেও তিনি এই সামন্ত রাজ্যের সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার রক্ষার দিকে কতদূর মনোযোগী হইবেন সে সম্বন্ধে সাধারণের প্রথম হইতেই সন্দেহ ছিল এবং পরে দেখা গিয়াছে যে এই সন্দেহ অপ্রকৃত নহে। নবীন মহারাজ নাবালক, সুতরাং নামে সামন্ত রাজ্য হইলেও পরিশেষে বরোদায় প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রকারে ইংরাজ সরকারের শাসন আরম্ভ হইল।

বড় বড় রাজা রাজড়াদের কথা ছাড়িয়া দিলে সামান্য সামন্ত ও সর্দ্দারদিগের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। বড় রাজাদিগের অন্ততঃ আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু জায়গীরদার, সরদার, ইনামদার প্রভৃতির বিত্ত ত গোষ্পদের জল, সুতরাং তাহাদের বড়মানুষী না কমাতে সে সম্পত্তিও হ্রাস হইতে লাগিল। লস্করী পেশা ও তাহার টাটকা রোজগার তখন ত আর ছিলনা, নির্ভর কেবল জমির আয়ের উপর। জমিও আর তাঁহারা নিজেরা চাষ করিতেন না সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত ভরসা কৃষকদের প্রদত্ত খাজানা। দিন দিনই এই আয় অধিক অনিশ্চিত এবং অল্প হইয়া পড়িতে লাগিল। যাহাদের খাজানা আদায়ের অধিকার নিজ হাতে ছিল এবং যাহাদের পুরাতন দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকার লোপ হয় নাই, তাহাদের খাজানা আদায় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু যাহাদিগকে খাজানা আদায়ের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হইতে হইত তাহাদের দুরবস্থার একাশেষ হইল। ব্রাহ্মণ জায়গীরদারদের মধ্যেই যখন অলসতা, অজ্ঞতা ও আরামপ্রিয়তা ঢুকিয়াছে তখন মারাঠাদিগের মধ্যেও যে তাহা দেখা যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

১৮৪৯ সালে গোপাল রাও হরি একটি প্রবন্ধে সেকালের সরদারদের সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে সেকালে যে সকল সর্দ্দার বাজীরাওর প্রতি বিরক্ত হইয়া ইংরাজ পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজ রাজা হইলে আর পেশবার তাবেদারী ও নোকরী করিতে হইবে না আর বসিয়াই খাওয়া জুটিবে। এইজন্যই তাঁহারা ইংরেজ প্রণীত জায়গীরের ব্যবস্থা মান্য করিয়াছিলেন। পরে যখন সেই বিধি অনুসারেই জায়গীর বাজেয়াপ্ত

হইতে লাগিল তখন তাঁহারা কপালে হাত দিয়া বসিলেন। গোপাল রাও হরি লিখিয়াছেন—"সরদার কাছে বসিলেই প্রথমই পেন্সনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, এখন উপায় কি? ইংরাজের শাসন বড় খারাপ, আমাদের সরঞ্জাম গেল! কেহ বলেন আমার পেন্সন গিয়াছে, আমি প্রথম ভাবিয়াছিলাম যে বংশানুক্রমে চালাইবে, কিন্তু এখন বড় বিশ্রী আইন হইয়াছে..................এতগুলি সরদার আছেন কিন্তু ইঁহাদের একজনও কোন কাযে লাগিবার মত নহে। পঁচিশ বৎসর বয়সেই ইহাদের বার্দ্ধক্য আরম্ভ হয়। কাহারও কাহারও চল্লিশ বৎসর বয়সে হাত ধরিয়া নিতে হয়। লিখিতে পড়িতে কেহই জানেন না। সকলেরই উকিল অথবা দেওয়ান চাই। যাঁহার উকিল অথবা দেওয়ান নাই তাঁহারও দরবারে যাইবার দিন একজন লোক জুটাইয়া লইতে হয়, কারণ নিজের আলাপ করিবার যোগ্যতা নাই। উঠিবার সময় হইলেও বলিয়া দিতে হয়—হুজুর এখন চলুন। কারকুন যদি বলেন—আজ সাহেব খুব খোস মেজাজে ছিলেন, আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছেন, এত দীর্ঘকাল কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন না; তখন হুজুরের মনে হয় আমার দেওয়ানজী খুব বুদ্ধিমান! ঘরের অবস্থা—দরবার অপেক্ষাও উত্তম। দোকান-বাকী আর মহাজনের ঋণ সুদের হার শতকরা পঁচিশ! সরকারী কর্ম্মচারী আর নিজের চাকর দুইজনে মিলিয়া ইঁহাকে (সরদার) ঠকায়। কোন সংবাদ ইনি রাখেন না, যোগ্যতা কিছুরই নাই, ব্যবসায়ে কিছু বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, চাকরী করিবার শক্তি নাই। কেবল জীবিত আছেন মাত্র। কিন্তু এই জীবনও এক লাঞ্ছনা ও লজ্জা নহে কি? ইঁহাদের উচিত এখন সরঞ্জাম ও পেন্সনের আশা ত্যাগ করিয়া নিজেদিগের অবস্থার সংস্কারে অবহিত হওয়া। সর্দ্দারেরা এখনও সাবধান হইলে মানুষ হইতে পারিবেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

জীবন-যাত্রা

(১)

পত্রখানা একবার পড়িয়া হরময়ের ভাল বিশ্বাস হইল না। আবার মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্তে যখন বুঝিলেন সংবাদটা নিদারুণ হইলেও সত্য, তখন আর কিছু ভাবিতে না পারিয়া পাশের ফরাস-পাতা চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। খোলা পত্রটা পাশে পড়িয়া রহিল, যেন তাহার কালো লেখাগুলো বিদ্রূপভরেই হরময়ের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির আশে পাশে উঁকি মারিতে লাগিল।

সংবাদটা নানা সূত্রে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কানে আসিয়াছিল বটে যে, তাঁহার প্রবাসীপুত্র ব্রজকিশোর নাকি কোন্ এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এবং এক অজানা লেখকের পত্রে এমনও সংবাদ আসিয়াছিল যে, ব্রজকিশোর নাকি সেই রমণীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে,—এমন কি দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। হরময় এ সকল উড়ো খবরে ততটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বয়স্ক পুত্রের বিবাহ না হওয়ার দরুণ সম্ভবাসম্ভব দুশ্চিন্তাকে একেবারে মন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। এজন্য পূর্ব্বের স্থিরীকৃত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধটা আর একবার ঝালাইয়া লইয়া তিনি পুত্রকে কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিতে লিখিলেন।

কিছুদিন পরে ব্রজকিশোরের উত্তর আসিল মা'য়ের নিকট। এখন ছুটি পাওয়ার সম্ভবহীনতা দেখাইয়া সে নানা প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সুদীর্ঘ চার পাতা ধরিয়া যাহা লিখিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম হইতেছে যে, সে একটি তরুণীকে নিজের ভবিষ্যৎ-পত্নীরূপে মনোনীত করিয়াছে,—ইহাতে জাত, কুল বা গৌরবে আট্‌কাইবে না,—কন্যা খুব সুন্দরী ইত্যাদি।

পত্র পড়িয়া হরময় ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বিনা ভূমিকায় পুত্রকে জানাইয়া দিলেন যে, এ বংশে কেহ কোন দিন এরূপ স্বেচ্ছাচারী হয় নাই এবং সে যদি এই বংশ-নীতি পালন করিতে নিতান্তই অসমর্থ হয়, তবে যেন গৃহের সহিত আর কোন সমন্ধের আশা না রাখে।

ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর কোন পিতা পুত্রকে জানাইতে পারেন না। তথাপি এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা নির্ব্বিবাদে ঘটিয়া গেল। পুত্রের আগমনের পরিবর্ত্তে পত্র আসিল যে, পুত্র পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে।

হরময় পত্রটা তুলিয়া লইয়া আর একবার পড়িলেন। পাঠান্তে সেটাকে লইয়া ভিতরে গেলেন। গৃহিণীর পায়ের নিকট পত্রটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখো তোমার ছেলের কাণ্ড।

আনন্দময়ী এইবার স্বামীর প্রতি চাহিলেন, একবার ভূপতিত পত্রটার প্রতি চাহিলেন; আশঙ্কায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

হরময় পুনরায় বলিলেন, এর চেয়ে যদি খবর আস্‌তো আমার ছেলে ম'রে গেছে, তা' হ'লে ভাল হ'ত। আর কিছু না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যে স্বরে তিনি এই কয়টি কথা বলিলেন, সে স্বরে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা বলা সম্ভবপর হয় না।

আনন্দময়ী প্রবাসী পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় মনে মনে দুর্গানাম করিলেন। বিহ্বলভাবে পায়ের নিকট হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইলেন, এবং খানিক অংশ পড়িয়াই নিতান্ত অবশভাবে বসিয়া পড়িলেন। পত্রের শেষের অংশে ব্রজকিশোর এই অন্যায়-সাধনের জন্য পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। ক্ষমাপ্রার্থনার সুদীর্ঘ আবেদনটুকু পড়িবার সামর্থ্য আর আনন্দময়ীর ছিল না।

ঘরের আল্‌নায় একটা লাল রঙের চেলী পাট করা ছিল। সেইদিকে চাহিয়া আনন্দময়ীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিতেছিল; কালই একজন প্রতিবাসিনীকে এই কাপড়টা দেখাইয়া তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ বরবেশের আলোচনা করিতেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে নমস্কারির কিরূপ জোড়ের চেলী তিনি পাইতে পারেন তাহারও আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্রজকিশোর; তাহার বিবাহে কিরূপ ধূম-ধাম এবং আমোদ-প্রমোদ হইবে, এই বিষয় লইয়া রাত্রিকালে স্বামীস্ত্রীতে কতবার বিবাদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। বর যাত্রাকালে বাজনাটা অপব্যয় কিনা, তাহার মীমাংসা আজও আনন্দময়ী স্বামীর সহিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত সমস্ত আশা আনন্দটুকুকে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া বেদনার দূতস্বরূপ এই পত্রটি আসিল। একমাত্র পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল,—কোন আত্মীয়স্বজন জানিল না, পিতামাতা জানিল না, পাড়ার লোক জানিল না,—কেহ দেখিলনা, শুনিল না।

আনন্দময়ীর মেয়ে বিভা মা'কে কি বলিতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মায়ের চোখে জল দেখিয়া তাহার আর কিছু বলা হইল না। এদিক ওদিক চাহিয়া মায়ের ক্রন্দনের কারণ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(২)

গ্রীষ্মের এক মধ্যাহ্নে ব্রজকিশোর বাড়ীর সম্মুখ গাড়ী হইতে নামিল, এবং ক্ষণপরেই কপাল অবধি ঘোমটা-দেওয়া স্ত্রীকে হাত ধরিয়া নামাইল। উপরে দৃষ্টি পড়িতেই ব্রজকিশোর মা'কে জানালায় দেখিতে পাইল; তাঁহাকে দেখিয়া তাহার চিন্তা-মলিন শুষ্ক মুখ মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী কিন্তু আর এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার সাধের পুত্রবধূ আসিল,—কেহ হাত ধরিয়া নামাইতে গেল না, একটি শঙ্খের ধ্বনি উঠিল না, উলুর সাড়া পড়িল না, সামান্য একটু চাঞ্চল্য কোথাও প্রকাশিত হইল না। তিনি জানালার ধার হইতে সরিয়া আসিয়া দেওয়ালে টাঙান দেবীর মূর্ত্তির নীচে মাথা ঠেকাইয়া রহিলেন। কোন প্রার্থনা করিলেন না, তাঁহার অন্তরে যে বিপ্লব উঠিতেছিল, তাহা যেন নিঃশব্দে দেবীর পায়ে ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিভা ঘরে আসিয়া বলিল, মা দাদা এসেছে।

আনন্দময়ী কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, বৌমাকে নিয়ে আয়।

বিভা সমস্তই শুনিয়াছিল। এই হুকুমই সে প্রার্থনা করিতেছিল, আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া সে সানন্দে নীচে নামিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে হরময় বসিয়াছিলেন। বিভাকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, কোথা যাচ্ছিস্‌?

বিভা একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, মা বৌদিকে নিয়ে যেতে বল্লে।

হরময় ধমক দিয়া বলিলেন, শীগ্‌গীর ওপরে যা।

বিভা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু উপরে না গিয়া খিড়কীর দরজা দিয়া তাহার নবাগত বৌদিদিকে দেখিতে লাগিল। তাহাকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখা গেল, তাহাতে বিভা বুঝিল তাহার বৌদিদি বেশ সুন্দরী।

ব্রজকিশোর তখন গাড়ীকে বিদায় দিয়া কি করিবে ভাবিতেছিল। ক্ষণকাল অপেক্ষার পর সে নিজেই অগ্রসর হইল।

হরময় তখন খবরের কাগজে ভাল করিয়া মনোযোগ দিয়াছেন। সস্ত্রীক ব্রজকিশোরের দিকে চাহিলেন না। ব্রজকিশোর ক্ষণ-কয়েক যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং যখন উপলব্ধি করিল যে ঠিক্ তাহার পিছনেই আর একজন দাঁড়াইয়া আছে, যাহার একমাত্র ভরসা সে, তখন সে অগ্রসর হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। হরময় কাগজ ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজকিশোরের নবপরিণীতা বধূ যখন প্রণাম করিল তখন তিনি তাড়াতাড়ি দুই পা পিছাইয়া গেলেন। ব্রজকিশোর লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

খুট্ করিয়া পাশের দ্বারে একটু শব্দ হইল। ব্রজকিশোর ফিরিয়া মা'কে দেখিয়া তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া যেন লুটাইয়া পড়িল। তাহার আশার মধ্যে ছিল সুধু এই দুইখানি পা। অনেক লাঞ্ছনার এবং গঞ্জনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু শান্তি এবং সান্ত্বনার এই আশ্রয় স্থলটি ধ্রুবতারার মত অনুক্ষণ সে দেখিয়া আসিয়াছে।

বধূ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া উদ্গত অশ্রু দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বধূর হাত ধরিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতেই হরময় বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াও।

আনন্দময়ী দাঁড়াইলেন।

কি ভাবিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা যাও।

তিনি বধূকে লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রজকিশোর একা পিতার সম্মুখে হেঁট-মুখে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। যে চিত্র সমস্ত পথ সে বারবার কল্পনা করিয়া আসিয়াছে, সে চিত্রের অভিনয় কি করিয়া আরম্ভ করিবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পর্য্যন্ত সে পারিতেছিল না।

হরময় এককালে সচকিত হইয়া ব্রজকিশোরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, এখানে তোমার স্থান হবে না। গাড়ী এনে তোমার বৌকে নিয়ে যাও। একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার বৌকে ভেতরে যেতে দিলুম ব'লে ম'নে ক'র না যে সেখানে তার স্থান হবে। তুমি গাড়ী না আনা পর্য্যন্ত সে ভেতরে থাক্‌তে পাবে মাত্র।

ব্রজকিশোর উত্তরও দিল না, নড়িলও না।

কথা একবার উপরে উঠিতে থাকিলে, কথার ধারা সহজে নামে না। হরময় হঠাৎ ক্রুদ্ধ

হইয়া বলিলেন, আমি তোমার মুখ বেশীক্ষণ দেখ্‌তে চাই না। গাড়ী আন্‌বে ত' আনো, না হয় ত' আমাকে অন্য ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

ব্রজকিশোর হয় ত' এরূপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার আর সহ্য হইল না। সে পিতার দিকে চাহিয়া সোজা বলিল, অন্য ব্যবস্থা কর্‌তে হবে না, আমি গাড়ী আন্‌ছি।

তৎক্ষণাৎ সে গাড়ী আনিতে বাহির হইয়া গেল।

হরময় দাঁড়াইয়াছিলেন, ফরাসের উপর হেলান্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

একটু পরে গাড়ী আসিল। বধূ শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, বিভাকে আলিঙ্গন করিয়া বাহিরে আসিল। সেখানে শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীর সহিত গাড়ীর নিকট গেল। ব্রজকিশোর তাহাকে গাড়ীতে চড়াইয়া, একবার বাড়ীটার দিকে চাহিতে দেখিল, আনন্দময়ী জানালায় দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছেন। সে সেখান হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, হাঁকাও। গ্রীষ্মের দুপুরে বিনা বিশ্রামে, অনাহারে বাড়ীর ছেলে নিতান্ত আপদের মত ধূলা পায়েই বিদায় হইল।

গাড়ী যখন সশব্দে চলিয়া গেল, তখন হরময় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজায় আসিলেন,—গমনশীল গাড়ীর প্রতি চাহিয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শুইলেন।

উপরে আনন্দময়ীর মনের উপর একটা বিস্মৃতির স্বপ্ন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। বিভা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, মায়ের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া দু' তিন বার 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিল। কোন সাড়া না পাইয়া মা'কে ধরিতে গেল; তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহটা বিভার হাতের উপর লুটাইয়া পড়িল। বিভা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

চীৎকার শুনিয়া হরময় উপরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই আনন্দময়ীর চেতনা আসিল। তিনি স্বামীর দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনা দোষে অতটুকু মেয়েকে উপোষ রেখে তাড়িয়ে দিলে? ছেলেটাকে একটু জল খেতে দিলে না? তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলেন।

(৩)

পূর্ব্বের ইতিহাস বেড় বশী নহে। বি, এ, পাশ করিবার পর দিল্লীতে মোটা মাহিনাতে ব্রজকিশোরের কাজ জুটিয়া গেল। পাশ হইবার পরই হরময় পুত্রবধূ খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, ব্রজকিশোর ধনুকভাঙ্গা পণ করিয়া বসিল, আয় করিতে আরম্ভ না করিলে বিবাহ করিবে না। অগত্যা হরময় একটি সম্বন্ধ ভবিষ্যতের জন্য স্থির করিয়া রাখিলেন।

যখন হঠাৎ চাকুরী পাওয়া গেল, তখন বিবাহ করিবার অবসর ব্রজকিশোর পাইল না। এই স্থির হইল, পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া শুভ-পরিণয় সম্পন্ন করিবে। তার পর নানা কারণে সম্বন্ধটা প্রায় এক বৎসর যাবৎ পর্য্যুষিত হইতে চলিয়াছিল।

দিল্লীতে আসিয়া ব্রজকিশোর অনেক বন্ধু পাইল। বড় দরের কাজ করিত, কাজেই অনেক বড় ঘরের সহিত আলাপ হইতে বেশীদিন লাগিল না। একদা সান্ধ্যভ্রমণে ব্রজকিশোরের সহিত মায়ার দাদা নরেনের আলাপ হইল।

আলাপ প্রবাসে শীঘ্রই ঘনিষ্ট হইয়া উঠে। ব্রজকিশোরের সহিত নরেনের আলাপ ক্রমেই ঘনিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। যেদিন নরেন শুনিল ব্রজকিশোরের আহারের কষ্ট হইতেছে, সেদিন সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, ব্রজ তুমি আমাদের বাড়ী থাক্‌বে চল।

ব্রজকিশোর সম্মত হইল না। ইতিমধ্যে নরেনের বাড়ীতে ব্রজকিশোরের যাতায়াত চলিতেছিল। নরেনের অনুরোধে সে প্রায়ই বিকালের জলখাবারটা তাহাদের বাড়ীতে সম্পন্ন করিত। সেই সূত্রে ব্রজকিশোরের সহিত মায়ার পরিচয় হইল।

এই মেয়েটির প্রতি ব্রজকিশোরের স্বভাবতঃই করুণা হইল। পিতা বা মাতা কেহই নাই, ভাইয়ের নিকট রহিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালীঘরের মেয়ের যা গুণ থাকে, মায়ার তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল বলিয়া বলা যায় না, ছেলেবেলা হইতে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় ব্রজকিশোর তাহাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

ক্রমে যাতায়াতের পরিমাণটা বাড়িতে বাড়িতে ব্রজকিশোরের দৈনন্দিন কার্য্য হইয়া পড়িল—আফিস ফেরৎ নরেনের বাড়ী যাওয়া এবং রাত্র অবধি তাহাদের সহিত কালযাপন করা। কোন দিন সকলে বেড়াইতে যাইত, কোন দিন বা গল্পেই কাটিয়া যাইত।

বাধাহীন চিত্তবৃত্তির গতি দ্রুত হইলেও ধ্রুব এবং ধীর। এত ধীর যে, মানুষ বুঝিতে পারে না কোন দিক দিয়া ভবিষ্যতের কি রূপ সে গড়িয়া তুলিতেছে। যে মুহূর্ত্তে দূরস্থিত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হইয়া উঠে সেই মুহূর্ত্তে সে ভাবিতে চেষ্টা করে কি করিয়া এতখানি গড়িয়া উঠিল,—যাহার উপর তাহার জীবনের অনেক সুখ বা দুঃখ লুকান থাকে। মায়া বা ব্রজকিশোর ভবিষ্যতের জন্য কি গড়িয়া তুলিতেছিল, কোন দিন দেখিবার চেষ্টা করিল না, বা করিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এককালে আসলরূপটি প্রকাশিত হইল। তখন ব্রজকিশোর একটু বিচলিত হইল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল ফিরিবার পথ নাই। তখন মা'কে সমস্ত জানাইয়া পত্র লিখিল।

পিতার পত্র পাইয়া ব্রজকিশোরের মাথা ঘুরিয়া গেল। পরিচিতের মধ্যে সর্ব্বত্র তখন রটিয়া গিয়াছে, ব্রজকিশোর মায়াকে বিবাহ করিবে।

একদিন মায়াকে একান্তে পাইয়া ব্রজকিশোর বলিল, বাবা লিখেছেন এ বিয়েতে তাঁর মত নেই।

মায়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

ব্রজকিশোর নরেনকে পিতার পত্র দেখাইয়া বলিল, এখন তুমি কি কর্‌তে বল?

নরেন বিব্রত হইয়া বলিল, আমি আর কি বল্‌বো, এখন তোমার ওপর সব নির্ভর কর্‌ছে। সকলেই জানে তোমার সঙ্গে মায়ার বিয়ে হবে। আর মায়াও তোমায় ইয়ে—

ব্রজকিশোর বলিল, এ চিঠির পরও তুমি তোমার বোন্‌কে আমার হাতে দিতে পার্‌বে?

এত শীঘ্র মিটিবে বলিয়া নরেন আশা করে নাই। পাত্রের মাহিনা বেশ উঁচু, ছেলে দেখিতে ভাল; এখন পাত্র সম্মত হইলে পাত্রের পিতার অসম্মতিতে কিছু আসে-যায় বলিয়া নরেনের মনে হইল না। সে আনন্দিত ও উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, তাতে কি? নো অব্‌জেক্‌সন্। যেখানে লভ্ আছে, সেখানে কোন বাধাই টিক্‌তে পারে না।

ভালবাসার শক্তি সম্বন্ধে উপদেশ শুনিবার ইচ্ছা ব্রজকিশোরের ছিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি চল্লুম্।

নরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, সে কি? বেড়াতে যাবে না?

ব্রজকিশোর বলিল, বেড়াতে? না, আজ যাবো না।

নরেন সেজন্য আর অনুরোধ করিল না। দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে দিতে ইংরাজী বাংলায় মিশাইয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রকৃত ভালবাসায় বাধা থাকেই, সেখানে খুব সাহস অবলম্বন না করিলে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হয় না।

মায়া একদিন ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দাদার নিকট কথাটা পাড়িতেই নরেন বলিয়া উঠিল, এ সম্বন্ধ সব দিক দিয়েই ভাল। এতে অমত কর্‌বার কিছু নেই। পরে ঠাট্টা করিয়া বলিল, সেই বুড়োকেই বুঝি তোমার বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে আছে? পাড়ার একজন ভদ্রলোক দুইবার স্ত্রীবিয়োগের পর মায়াকে তৃতীয়বার গৃহলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। নরেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথা তুলিয়া মায়াকে ঠাট্টা করিত।

মায়া দাদাকে কিছু বলিতে চাহিয়াছিল, একথার পর তাহার আর কিছু বলা হইল না। ব্রজকিশোর আসিলে নরেন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত,—তাহাকেও কিছু বলিবার সুযোগ মায়া কিছুতেই পাইতেছিল না।

আশা-নিরাশা, ভয়-ভাবনার মধ্য দিয়া ব্রজকিশোর ও মায়ার বিবাহ হইয়া গেল। নরেন কন্যা সম্প্রদান করিল, এক অপরিচিত পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিল।

(৪)

পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ব্রজকিশোর দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া সস্ত্রীক নিজের ভাড়া বাড়ীতে উঠিল। যে কয়দিনের ছুটি লইয়াছিল, সাহেবকে বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া লইয়া কাজে যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিনে ব্রজকিশোর একটু সকালে আফিস হইতে ফিরিল। নীচে কোথাও মায়াকে দেখিতে না পাইয়া ছাদে গিয়া দেখিল মায়া পশ্চিমের আলিসার ধারে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে

চাহিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে এত অন্যমনস্ক হইয়াছিল যে, ব্রজকিশোর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টেরও পাইল না। তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ব্রজকিশোরের অনুতাপ হইল। আজ তিন দিন হইল সে মায়ার সহিত নিতান্ত সাংসারিক আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা কহে নাই। পিতৃগৃহের সদ্য-শোকটি ভুলিবার জন্য যে মধুর সঙ্গ প্রতি রমণীই নব-গৃহে পাইয়া থাকে,—যে মধুর কৌতুকময় আলাপ প্রতি রমণীই সম্ভোগ করে, তাহা হইতে বঞ্চিতা এই নারীর পক্ষে এই তিনটি দিন কত কষ্টে কাটিয়াছে তাহা একটু বুঝিয়া ব্রজকিশোর আদরে স্বরে মায়ার নাম ধরিয়া ডাকিল।

মায়া অতি সামান্য চকিত হইয়া ফিরিল এবং মাথার কাপড়টা সামান্য একটু তুলিয়া দিল।

সন্ধ্যায় অনেকগুলি করুণ সুর থাকে। আবছায়া আলো, গাছে পাখীর কোলাহল, মানুষের সম্মিলিত অর্থহীন কোলাহল,—এ সমস্তই যেন করুণ বলিয়া বোধ হয়। কাছেই কে নমাজ পড়িতেছিল, তাহার স্বর ধূলি-ধূসরিত বায়ুকে যেন নাচাইয়া নাচাইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল।

ব্রজকিশোর মায়ার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, তোমার মনে খুব দুঃখ হচ্ছে, না ?

মায়া প্রত্যুত্তরে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেচারীর হাসির সমস্ত প্রচেষ্টাটুকু অশ্রুতে পরিণত হইল।

(৫)

তাহারা জীবন পথে যাত্রা আরম্ভ করিল, কিন্তু এই বন্ধুর স্থানে পথ-প্রদর্শক কেহ রহিল না। ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের জন্য সাবধান করিয়া দিতে কেহই রহিল না।

জীবন-যাত্রার প্রারম্ভেই একটি ছোট ঘন-কালো মেঘ তাহাদের মাথার উপর অলক্ষিতে ঝুলিতে লাগিল। একটি গোপনতা এই দম্পতী জীবনের মাঝখানে একটি আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রজকিশোর মায়ার নিকট হইতে বাড়ীর জন্য দুঃখ, ভাবনা, চিন্তা, সমস্ত গোপন রাখিল; মায়া নিজের ভবিষ্যতের নানা অনির্দ্দিষ্ট শঙ্কা গোপন রাখিল। ব্রজকিশোর প্রায়ই বাড়ীর কথা ভাবিত, অনেক কল্পনা করিত, কিন্তু মায়া নিকটে আসিলেই সে নিজেকে সহজ দেখাইবার চেষ্টা করিত। মায়া সব বুঝিত, কিন্তু স্বামী যাহা বলিতে চাহেন না, তাহা প্রশ্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা তাহার হইত না। অথচ স্বামীর এই ভাবনা আশ্রয় করিয়া তাহার মনে নানা অমূলক শঙ্কা আসিত, সে সকল স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত না।

একদিন আহারে বসিয়া ব্রজকিশোর বলিল, এই তরকারীটা মা বেশ্ সুন্দর রাঁধতেন।

মায়া যেন অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিল।

কথাটা হঠাৎ ব্রজকিশোরের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। বলিবার পর সে আশা করিল মায়া নিশ্চয়ই তাহার মায়ের সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু প্রশ্ন করিবে, কিন্তু সে যখন কিছুই বলিল না,

তখন মনে মনে হঠাৎ সে মায়ার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। যেখানে স্ত্রীর নিকট সে সহানুভূতি আশা করিতেছে, স্ত্রী সে কথাটা একবার মুখেও আনিতেছে না! পাতে অনেক ভাত পড়িয়া রহিল, ব্রজকিশোর উঠিয়া পড়িল।

মায়া বলিল, আর খেলে না?

ব্রজকিশোর বলিল, আর পার্‌বো না।

ব্রজকিশোর আফিসে চলিয়া গেলে মায়া ঝিকে ভাত দিয়া হাঁড়ি তুলিয়া ফেলিল। এই রান্নার কাজটা সে স্বহস্তে লইয়াছিল।

ঝি একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভাঙ্গা-বাঙলায় বলিল, মায়ি, তোম্ খাবে না?

নেই, বলিয়া মায়া বাহির হইয়া আসিল।

সেদিন বেশ চাঁদের আলো হইয়াছিল। ব্রজকিশোর মায়াকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে আজ গান শোনাইতে হইবে। মায়ার রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি বলিল, রান্না আছে যে!

ব্রজকিশোর বলিল, রান্না থাক্‌গে।

মায়া হাসিয়া বলিল, থাক্‌লে খাবে কি?

ব্রজকিশোর বলিল, আজ গান খেয়েই থাক্‌বো।

মায়াকে জোর করিয়া ব্রজকিশোর ছাদে লইয়া গেল। মায়া গান গাহিল। তাহার গলা ছিল ভাল, এবং কালবিশেষে গানও বেশ্ জমিল।

গান শেষ হইলে ব্রজকিশোরের মনে পড়িল, এম্‌নি এক চাঁদিনী রাত্রে সে, আনন্দময়ী ও বিভা বাড়ীর দক্ষিণ-দিককার ছাদে বসিয়াছিল, বিভা স্কুল হইতে একটা গান শিখিয়াছিল, সেটা সে গাহিতেছিল। মা'য়ের জন্য ব্রজকিশোরের প্রাণটা একবার কেমন করিয়া উঠিল। সে মায়াকে বলিল, আমি এখুনি আস্‌ছি—বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মায়া চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল ব্রজকিশোর ফিরিল না। মায়া নীচে নামিয়া গিয়া দেখিল ব্রজকিশোর খাটে শুইয়া আছে। সে দ্বার হইতে একবার ব্রজকিশোরকে দেখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

পরদিন আফিসে ব্রজকিশোর মা'য়ের নিকট হইতে একটি পত্র পাইল। বহুদিন পরে মা'য়ের নিকট হইতে এই লিপিখানি পাইয়া তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিল। পত্রে তিনি বেশী কিছু লেখেন নাই। লিখিয়াছেন, সে যদি মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, তবে হরময় আর কোন কথা কহিবেন না। আশীর্ব্বাদ জানাইয়া পত্রশেষ করিয়াছেন।

ব্রজকিশোর বেশ বুঝিল, পত্রখানি তাহার পিতার কথামত লেখা হইয়াছে। সেটা ভাঁজ করিয়া খামে মুড়িয়া সে শূন্যে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতে লাগিল।

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর দিল। মা'কে প্রণাম জানাইয়া লিখিল যাহাকে একবার

স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না; পিতৃমাতৃহীনা নারীটির প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত অনেক কথাই লিখিল।

ইহারই একদিন পরে মায়ার সহিত ব্রজকিশোরের তুমুল ঝগড়া বাধিল। ইহার উৎপত্তি সামান্য লইয়া, কিন্তু পরিণতি বহুদূরে গিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ব্রজকিশোর তীক্ষ্ণস্বরে মায়াকে বলিল, জান্‌বে যে তোমার জন্যে আমাকে বাপ্‌, মা, সব ত্যাগ কর্‌তে হ'য়েছে। সে হয় ত' আরও কিছু বলিত, বাহিরে জুতার শব্দে থামিয়া গেল। ক্ষণপরেই নরেন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ব্যাপার কি? রাস্তায় লোক জমে যাবে যে।

মায়া মুখ ফিরাইয়া নিজেকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রজকিশোর পাশ কাটাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নরেন মায়ার প্রতি চাহিয়া বলিল, কি হ'য়েছে? মায়া ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, বামুন ছাড়িয়ে দিয়েছি ব'লে ঝগড়া কর্‌ছেন। এই বলিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

নরেন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, ওসব কিছুই নয়, ছেলেমানুষী। আমি কতবার ব্রজকিশোরকে বল্লুম আমাদের বাড়ীতে একসঙ্গে থাক, তা কিছুতেই রাজী হ'ল না। এখানে কেবল ছেলেমানুষী কর্‌বে আর,—যা হ'ক আমি একবার ব্রজকিশোরকে ঠাণ্ডা ক'রে আসি। বলিয়া সশব্দে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

ব্রজকিশোরকে মিনিট দশেক বক্তৃতা শুনাইয়া যখন নরেন মনে মনে বুঝিল যে, ব্রজকিশোরকে সে তাহার বক্তব্য উপলব্ধি করাইতে পারিয়াছে, তখন আসল কথা পাড়িল। বলিল, তোমাকে এত ক'রে বল্‌ছি, তুমি ত' কিছুতেই আমাদের কাছে থাক্‌বে না। যা' হ'ক এক সপ্তাহের জন্যে মায়াকে পাঠিয়ে দাও। সেপারেশন্ না হ'লে জীবনে রস থাক্‌বে না।

ব্রজকিশোর বলিল, হ্যাঁ, তোমার বোনকে নিয়ে যাও। কবে নিয়ে যাবে?

নরেন বলিল, যবে বল, কাল?

ব্রজকিশোর বলিল, বেশ কাল দুপুরে নিয়ে যেও। তোমার ত' আর আফিস্ নেই।

নরেন সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, অল্ রাইট্।

নরেন মনে করিল, সে মস্ত চালাকী খেলিল। তাহার অভ্রান্ত ধারণায় বুঝিয়াছিল, মায়াকে লইয়া গেলে দুই দিনের মধ্যে ব্রজকিশোরকেও তাহাদের বাড়ীতে আসন গাড়িতে হইবে।

রাত্রে ব্রজকিশোর মায়াকে বলিল, আমাকে এতদিন বল্লেই হ'ত, আমিই তোমাকে ভায়ের কাছে রেখে আস্‌তুম্।

মায়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। কোনও প্রশ্ন করিল না।

ক্ষণকাল পরে ব্রজকিশোর পুনশ্চ বলিল, তোমাকে আমি ধ'রে রেখে দিই নি। যা হ'ক

নরেনকে বলে দিয়েছি, কাল দুপুরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। সে ভাল, করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

মায়া জানালার গরাদে মাথা ঠেকাইয়া বাহিরের অলস অন্ধকারের প্রতি চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরের স্তব্ধ অন্ধকারের মত সেও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে তাহার দুই চোখ হইতে গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মায়া যখন আসিয়া শুইল, তখন ব্রজকিশোর জাগিয়াই ছিল, কিন্তু নিদ্রার ভান করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

পরের দিন আফিসের কাজে ব্রজকিশোরের মন বসিল না। সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঝিয়ের নিকট শুনিল মায়া চলিয়া গিয়াছে। ঝি বলিল ও-বাড়ীর বাবু তাহাকেও সেখানে যাইতে বলিয়াছে।

ব্রজকিশোর নিজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে জুতার শব্দ শুনিয়া বুঝিল, নরেন আসিয়াছে।

নরেন আসিয়া বলিক, ব'সে ভাব্ছো কি ? চল।

ব্রজকিশোর বলিল, কোথায় ?

নরেন বলিল, কোথায় আবার ? আমাদের বাড়ীতে ; মায়া কিছুতেই যেতে চাচ্ছিল না, বলে যে তোমার খাওয়া হবে না। শেষে অনেক কষ্টে তাহাকে বুঝোতে পার্লুম যে তুমি আমাদের বাড়ীতে না শোও' ত' অন্ততঃ খাবে।

ব্রজকিশোর ঠোঁটের এক কোণ বাঁকাইয়া চেষ্টাকৃত একটু হাসি দেখাইল।

নরেন বলিল, চুপ্ ক'রে রইলে যে ?

ব্রজকিশোর বলিল, না আমার পুরোনো বামুনকে আজই ডেকে আন্‌বো।

ব্রজকিশোরের ইহা ছেলেমানুষের উক্তি মনে করিয়া নরেন বলিল, সে পরের কথা ; এখন ত' চলো।

ব্রজকিশোর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এখন যাবো না।

নরেন যখন কিছুতেই ছাড়িল না, ব্রজকিশোর তখন এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিল যে, আধঘণ্টা পরে সে যাইতেছে।

নরেন চলিয়া গেলে সে গভীর ভাবনার মগ্ন হইল। ক্রমে তাহার মুখে ক্রূর উল্লাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বাহিরে গিয়া আফিসে একমাসের ছুটির দরখাস্ত লিখিল। সেটাকে লইয়া সেই বেশেই একটা ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আফিসে দরখাস্তখানা দিয়া ষ্টেশনে গেল। পরের ট্রেণে টিকিট কাটিয়া চাপিয়া বসিল।

গাড়ী যখন ছাড়িল, তখন সে একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, একবার যতদূর রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল, একবার দুটী ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টির কথা ভাবিত,—পরে [illegible] হইয়া বসিল।

বাড়ীতে ব্রজকিশোর বেশ আদর-অভ্যর্থনা পাইল। পূর্ব্বে যে একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহার লেশ মাত্র সূত্র কোথাও কাহারও ব্যবহারে পাওয়া গেল না। মায়ার কথা কেহ একবার প্রশ্নও করিল না, ব্রজকিশোরও মুখে তাহার কথা একবার আনিল না।

হরময় প্রত্যহই গৃহিণীকে সাবধান করিয়া দিতেন, পূর্ব্বের যেন কোন কথা পুত্রের নিকট উত্থাপন করা না হয়। আনন্দময়ী কোন দিনই স্বামীর কথার অবাধ্য হন নাই, চিরকালটাই একগুঁয়ে স্বামী ভালমন্দ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, করিয়া আসিয়াছেন। সুধু তিনি প্রথম দিন হরময়কে বলিয়াছিলেন, বাপ্-মা হারা মেয়েটাকে বিনা দোষে জন্মের মত তাড়িয়ে দেবে?

উত্তরে হরময় মুখটা যথাসম্ভব বিকৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাড়িয়ে দেবে না ত' কি ক'রবে? যত সমস্ত গিয়ে পাজীর ফন্দী। ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেটাকে বিয়ে করিয়েছে। অতঃপর তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, উহাদের জাত বা জন্ম কিছুই নাই।

আনন্দময়ী স্বামীকে চিনিতেন। এ সম্বন্ধে কোনদিন আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু দিনের পর দিন পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। দু একদিন এ বিষয়ে হরময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলে তিনি হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, ওসব ভাবনা দুদিনেই চলে যাবে। স্বামীর এ কথায় আনন্দময়ী আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, মনে মনে অনুক্ষণ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হরময় পুত্রের জন্য একটা নূতন সম্বন্ধ স্থির করিতেছিলেন। একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, বিদেশের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশে একটা চাকরী দেখো।

ব্রজকিশোর নিরুত্তরে রহিল। পরের দিন আফিসে কর্ম্মত্যাগের আবেদন পাঠাইয়া দিল।

ক্রমে হরময়ের চেষ্টার কথা ব্রজকিশোর শুনিল। শুনিয়া সে হাঁ, না, কিছুই বলিল না।

মৌনভাই সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া হরময় দ্বিগুণ উৎসাহে পাত্রীর সন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

একদিন রাত্রে প্রায় দুইটার সময় আনন্দময়ী দেখিলেন, ব্রজকিশোর ও-পাশের ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি স্বামীকে ডাকিয়া দেখাইলেন। পরে ঘরে গিয়া স্বামীকে বলিলেন, যদি পূর্ব্বেকার বধূকে না আনা হয়, তবে তিনি গলায় দড়ি দিয়া মরিবেন। সে রাত্রে হরময় অনেকক্ষণ ভাবিলেন।

পরের দিন ব্রজকিশোরের নামে এক পত্র আসিল। খুলিয়া দেখিল, লেখক, নরেন। নরেন যাহা লিখিয়াছে তাহা পড়িয়াই ব্রজকিশোরের মাথা ঘুরিয়া গেল। মায়ার বাঁচিবার আশা নাই, সে একবার ব্রজকিশোরকে দেখিতে চাহিয়াছে,—যদি ইচ্ছা হয় ত' সে যেন একবার যায়।

পুনশ্চ করিয়া নীচে লিখিয়াছে মায়ার অনুরোধে এতদিন কোন খবর পাঠানো হয় নাই। পাশের বাড়ীর ছাদে একটা চিল বসিয়াছিল, তাহাকে কয়েকটা কাক কেবলই বিরক্ত করিতেছিল। সেই-দিকে ব্রজকিশোর চাহিয়া রহিল। তাহার গণ্ড বাহিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আনন্দময়ী ঠাকুর-ঘরে বসিয়াছিলেন, ব্রজকিশোর গিয়া তাঁহার পায়ের গোড়ায় বসিল। আনন্দময়ী বলিলেন, কিরে? ব্রজকিশোর পত্রটা তাঁহাকে দিয়া বলিল, এই চিঠি এসেছে। আনন্দময়ী তাহা পাঠ করিলেন। পরে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কবে যাবি?

ব্রজকিশোর বলিল, কবে যাবো মা?

আনন্দময়ী বলিলেন, আজ আর গাড়ী নেই?

ব্রজকিশোর বলিল, আছে।

আনন্দময়ী বলিলেন, তবে আজই যা।

ব্রজকিশোর বলিল, আচ্ছা। পরে মুখ না তুলিয়াই বলিল, বাঁচ্‌বে ত' মা?

আনন্দময়ী অন্তরের মধ্যে আকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাঁচ্‌বে বৈকি বাবা।

একটু পরে ব্রজকিশোর চলিয়া আসিল। আনন্দময়ী এত বৎসর পরে স্বামীর অনুমতি না লইয়াই পুত্রকে তথায় যাইতে বলিলেন, একটু ভাবিলেন না।

হরময় যখন সব শুনিলেন, তখন বলিলেন, যদি সম্ভব হয় ত' ব্রজ যেন তাকে নিয়ে আসে।

ব্রজকিশোর সেইদিনের গাড়ীতে দিল্লী যাত্রা করিল।

(৬)

নরেনের সহিত ব্রজকিশোর মায়ার রোগশয্যার পাশে গেল। শীর্ণ, পাণ্ডুর, শুষ্ক, অস্থিসার মায়াকে দেখিয়া ব্রজকিশোর চম্‌কাইয়া উঠিল। নরেনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এ কি দেখ্‌তে এলুম্ নরেন? বলিয়া সে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল।

নরেন ব্রজকিশোরকে অনেক রূঢ় কথা শোনাইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে আরও শোনাইবে বলিয়া ঠিক্ করিয়াছিল। কিন্তু ব্রজকিশোরের অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণে একটু দয়া হইল। কি বলিবে ঠিক্ না পাইয়া বলিল, ব'স।

ব্রজকিশোর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না, মায়ার এক পাশে বসিয়া পড়িল। নরেন বাহির হইয়া গেল।

মায়ার তন্দ্রা আসিয়াছিল, ব্রজকিশোর বসিতে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়া স্বামীকে দেখিয়া একটু অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই সাম্‌লাইয়া লইল। ব্রজকিশোরকে সে ক্ষীণস্বরে বলিল, তোমায় বড্ড রোগা দেখাচ্ছে।

ব্রজকিশোর এতক্ষণ কোন কথা কহিতে পারে নাই। এই কথা ইতঃপূর্ব্বে সে কতবার

মায়ার নিকট শুনিয়াছে। যেদিন সে কর্ম্মক্লান্ত হইয়া আফিস্ হইতে ফিরিত, সেইদিনই মায়া বলিত, আজ তোমায় বড্ড রোগা দেখাচ্ছে।

ব্রজকিশোর নিজেকে আর সংযত করিবার চেস্টা করিল না। পাগলের মত মায়ার একটা রোগশীর্ণ হাতে কপাল ঠেকাইয়া বার বার বলিতে লাগিল, মায়া মায়া, আমি বড় পাপী, আমায় ক্ষমা কর।

দাম্পত্যজীবনে ক্ষমা চাওয়ার মাধুর্য্য চিরনূতন থাকে। মায়া নিশ্চেষ্ট হইয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল, এবং তাহার মুদিত চোখের কোণ বাহিয়া সরু ধারে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে ব্রজকিশোর শান্ত হইল, হাতে করিয়া মায়ার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

ডাক্তার লইয়া নরেন প্রবেশ করিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগী হঠাৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে সকলকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়া গেলেন।

বাহিরে আসিয়া ব্রজকিশোর ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ডাক্তার-বাবু, বাঁচ্‌বে ত'?

ডাক্তারী চালে তিনি বলিলেন, চেষ্টা শেষ পর্য্যন্তই কর্‌বো। তবে রাত্রের ডেঞ্জারটা কেটে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রাত্রের বিপদ আর কাটিল না। বিপদ তাহার চূড়ান্ত বুঝিয়া লইয়া সরিয়া গেল। সকলের সাবধানতার ফাঁক দিয়া মৃত্যু গোপনপদে আসিয়া উপস্থিত হইল;—সকলের ইচ্ছা, চেষ্টা, ডাক্তারের ঔষধ, কেহই, কিছুই, মায়াকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রজকিশোর মায়ার একটা হাত ধরিয়া ছিল,—তাহার উষ্ণ কম্পিত মুঠির মধ্যে সে হাতটা হিম-শীতল হইয়া উঠিল। ঘরের বায়ু যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য মায়া প্রাণপণে টানিয়া লইল,—তারপর আর টানিল না। সব শেষ হইয়া গেল। মৃত্যু নিজের ছায়া তাহার মুখের উপর ছড়াইয়া দিল,—কিন্তু সে কালো ছায়ার উপর একটি করুণ স্নিগ্ধতা ফুটিয়া রহিল।

ডাক্তার বিদায় লইলেন। নরেন চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রজকিশোর কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। পরে মায়ার প্রাণহীন দেহটা সবলে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিতে লাগিল, মায়া, মায়া!

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

শোক সংবাদ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়োগ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়োগে আমরা একজন সংযতেন্দ্রিয়, ধীরবুদ্ধি, চিন্তাশীল, বহুশ্রুত, বহুগুণান্বিত দক্ষ সাহিত্যিককে হারাইলাম। মহর্ষিনামে আদৃত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পিতা, অথবা জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এই পরিচয় তাঁহার বংশ গৌরবের পরিচয়; আশা করি এই পরিচয়ে তাঁহাকে বঙ্গদেশে চেনাইতে হইবে না; কারণ, তাঁহার সাহিত্যিক কীর্ত্তি, সঙ্গীতাদি শিল্পকলায় পারদর্শিতা ও সমগ্র জীবনব্যাপী সাধুতা বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে

সৌন্দর্য্য জীবনের বিকাশে ও মঙ্গল-বিধানে অচঞ্চল সহায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহারই অনুধ্যানে থাকিয়া, আত্মজারির দিকে কখনও দৃষ্টি না দিয়া, কর্ত্তব্যনিরত ছিলেন বলিয়াই হয়ত বা শ্রেণী বিশেষের কাছে তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

যৌবনের প্রথম উন্মেষের দিন হইতে ৭৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি গভীর অনুরাগে ও নিষ্কাম সাধনায় সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার সরোজিনী নাটক মুদ্রিত হয় ও উহার অল্প সময় পরেই যখন তাঁহার অশ্রুমতী প্রকাশিত হয়, তখন এদেশের পাঠকদের দৃষ্টি নূতন সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখন দু-চারিটি বিলাতি গানের সুর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে বঙ্গের সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে, কিন্তু এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে পথপ্রদর্শক তাহা অনেকে জানেন না। বিদেশের সঙ্গীতের মধ্যে যে আমাদের গ্রহণীয় পদার্থ আছে, তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অশ্রুমতী নাটকের একটি গানে প্রথম বুঝাইয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি কত ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তিনি কখনও কোন গুরুর কাছে চিত্রবিদ্যা শিখেন নাই, কিন্তু মানুষের প্রতিরূপ আঁকিবার বিষয়ে তাঁহার মত দক্ষ ব্যক্তি পাওয়া দুর্লভ। যাঁহাকে আদর করিতেন, তাঁহারই মুখখানি নিজের একখানি খাতায় পেন্সিলের গোটা কতক টানে তুলিয়া লইতেন; এই চিত্র যে ফটোগ্রাফ্‌কে পরাভূত করিত, সে বিষয়ে এই মন্তব্য-লেখক নিজে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য-সাহিত্যে যতগুলি প্রসিদ্ধ নাটক, প্রকরণ, সট্টক প্রভৃতি আছে তাহার সকলগুলিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতার বলে তিনি সেই সাহিত্য হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে উপহার দিয়াছেন তাহা অতিশয় হৃদ্য ও শিক্ষাপ্রদ। কল্যাণকর সৌন্দর্য্যকে আপনার অনুধ্যানের সামগ্রী করিবার জন্য রাঁচির একটি পাহাড়ের উপর তিনি যে একটি মন্দির ও আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় ও এদেশীয় সৌন্দর্য্যবোদ্ধাদের আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়সে,—প্রৌঢ় হইবার বহু পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছিলেন; অমন কাঁচা বয়সে পত্নী হারাইলে মানুষে (বিশেষ ভাবে ধনী মানুষে) যে বিবাহ করে না, তাহা বড় দেখা যায় না। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যিনি ছিলেন বিপত্নীক ও একাকী, তাঁহার প্রফুল্লতা, কর্ম্মপরায়ণতা ও লোকানুরাগ এত অধিক ছিল যে, সকলেরই মনে হইত যে সংযতেন্দ্রিয় হইবার পথে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কঠোর সাধনা করিতে হয় নাই।

"বঙ্গবাণী" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী। এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র ইহাকে তিনি সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, ও পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকজন লেখকের লেখা বিশেষভাবে পড়িতেন, ও আমাদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহা লইয়া আলোচনা করিতেন। একদিনের জন্যও তাঁহাকে এ পত্রিকার জন্য কিছু লিখিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে হয় নাই; তিনি নিজে বরং সতর্ক হইয়া ভাবিতেন যে বেশি লেখা পাঠাইয়া বঙ্গবাণীকে পীড়িত করিতে না হয়। প্রকাশের প্রয়োজন আছে, এই ইঙ্গিত পাইবামাত্রেই তিনি তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ আমাদিগকে পাঠাইয়া দিতেন।

স্বদেশী জিনিষ থাকিতে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করা অন্যায় ভাবিয়া যিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত ৫০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বকাল হইতে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারে তৎপর ছিলেন, অথচ জ্ঞানস্পৃহায় যিনি সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যকে মাথা পাতিয়া লইতেন, এবং কোনরূপ উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া মানসিক ধীরতা না হারাইয়া হিতৈষণার বুদ্ধিতে সুদৃঢ় ছিলেন, সেই চিরপ্রফুল্ল চিরকর্ম্মনিষ্ঠ সাধুচরিত্র সাহিত্যিককে আমরা এ বৎসরের বসন্তকালে ফাল্গুনের ২১শে তারিখে হারাইলাম।

প্রতিধ্বনি

বিকাশ-উল্লাসে কবে অজন্মার চেতনা-স্পন্দনে
জাগিল আকাশ-সিন্ধু, খাঁ-খাঁ পথে তরঙ্গ-নর্ত্তনে ?
তরঙ্গ-বিজুলী-গর্ভ, উদ্ভেদিল কবে পরমাণু
বিবর্ত্তে জন্মিল যাহে শূন্য কেন্দ্রে কোটি কোটি ভানু ?
সঙ্কোচে প্রসারে কবে অফুরন্ত গতির পীড়ন
শ্বসিল অমুর প্রাণে এক সাথে বিরহ-মিলন ?
দুঃখের উৎসব তরে কবে পরে দুন্দুভি নাদিল ?
জ্বলন্ত চলন্ত ধরা সে সঙ্গীতে আকাশে ভাসিল ?

শীতলিতে ধরণীর দাহময় বিজন অন্তর
ঢালিল প্রতপ্ত ধারা করুণায় গলিয়া অম্বর।
ধরা তার উষ্ণ শ্বাসে বিন্দু ছেড়ে মহাসিন্ধু চায় ;
উপজি সাগর তাহে আলিঙ্গনে বেড়িল ধরায়।
প্রেমের উচ্ছ্বাসে সিন্ধু উছলিয়া প্রাণে দিল নাড়া ;
ভূকম্পে চিরিয়া বক্ষ সে আহ্বানে ধরা দিল সাড়া।
ফাটায়ে পাষাণ প্রাণ দুঃখ-ধূম উদ্গারিল ধরা ;
সে বেদনে গর্জ্জে সিন্ধু। জীবন কি এত দুঃখ ভরা !

বাড়িল প্রগল ঝঞ্ঝা, প্রতিধ্বনি গহনে মিলায় ;
রুদ্রের নর্ত্তন-ধ্বনি নিনাদিল শিলায় শিলায় ;
তরল অগ্নির নদী শৈলের শিখর ভেদি' ঝরে।
প্রেমের চুমায় আর চিতার ধুঁয়ায় ঘেরাঘরে
মানবের আর্ত্তনাদ ধূপগন্ধে ছাইল আকাশ ;
পূজার উৎসব জাগে আকুলিয়া ভবের আবাস।
উষ্ণ নিশ্বাসের বিষে অভিষেক লভিল অবনী ;
আগ্রহের প্রার্থনায় দূরে দূরে সরে প্রতিধ্বনি।

জাগাইল জল-স্থল উদ্বেলিত মিলন-বেদনে
চৈতন্যে চপল প্রাণ কোটি শিশু, বিশ্ব নিকেতনে।
বিকাশ-উৎসবে জেগে নরনারী গায় নব গান,—
"দুঃখ দিয়া প্রাণ কেন গড়িয়াছ, ওগো ভগবান্ ?
অফুরন্ত দুঃখে-গড়া ধরামাঝে কোথা তুমি রহ ?"
উত্তরিল প্রতিধ্বনি, "আমি প্রাণে, বাড়ি তোমা সহ ;
উদ্বোধিব সারা জড় যেই দিন চৈতন্য-আধানে,
বুঝিবে কেন এ দুঃখ, কোথা আছি বিশ্বজোড়া প্রাণে।"

নিঙাড়িয়া জড়পিণ্ড, নিছনিয়া বিকাশ দীপন,
সিঞ্চিয়া দুঃখের রস, কে গড়িলে চেতন-জীবন ?
দুঃখের উছল ঢেউ, অবিরাম কূলে কূলে লাগে ;
অঙ্গে-গাঁথা প্রাণ তায় অফুরন্ত বাসনায় জাগে।
দুঃখ আনে বক্ষে প্রীতি,—আনে তার পিছু পিছু ক্ষয় ;
ভস্মে যার হয় শেষ, পরমেশ ! সে কি কিছু নয় ?
অগ্নি কহে :—দাহ অন্তে চলন্ত আমার লীলা রহে।
প্রতিধ্বনি আরবার ফুকারিল :—নহে নহে নহে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

পুস্তক পরিচয়

খাদ্য ও স্বাস্থ্য—প্রণেতা শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। খাদ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক অনেক কথা লেখা হইয়াছে। সব কথাই যে সকলে মানিয়া লইবে তাহা নহে, তবে পাঠক ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅরবিন্দের গীতা।—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের Essays on the Gita পুস্তকের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়। অরবিন্দের গীতা-বিশ্লেষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদও বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহা গীতা বুঝিবার পক্ষে বেশ সাহায্য করিবে। স্থানে স্থানে যে ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হইল আশা করি তাহা ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধিত হইবে। এখানি গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র। বি. ভ

মুক্তির পথ—প্রণেতা শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বি, এ,। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধমালা। গ্রন্থকারের মত স্থানে স্থানে সাবেকী ধরণের হইলেও সেই মত স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার সাহস তাঁহার আছে। যাঁহারা হুজুগে মত্ত তাঁহারা পুস্তকখানিতে অনেক চিন্তার বিষয় পাইবেন। গ্রন্থকার প্রাচীন ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অনেকস্থানে ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক হইলেও তাঁহার স্বাধীন চিন্তা প্রশংসনীয়। বি. ভ

ম্যালেরিয়া—শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত। পুস্তিকাখানি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। জলনিকাশ, জঙ্গলকাটা প্রভৃতি মশা নিবারণের উপায়, কুইনাইন সেবন ইত্যাদি কথা ত আছেই, তাছাড়া পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতির দ্বারা জীবনীশক্তির বর্দ্ধনে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ যে কতদূর নিবারিত হইতে পারে গ্রন্থকার, তাহা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে পল্লী সমিতি সংগঠন, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদিও আলোচিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রন্থ কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদ বিস্তর। বি. ভ

মাণিক যোড়—উপন্যাস, শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকারের লিখন ভঙ্গী আছে কিন্তু তিনি উপন্যাস জিনিষটা মোটেই জমাইয়া তুলিতে পারেন নাই। সম্ভ্রান্তশালী প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে ব্যাকরণের অঙ্গেও বেশ কশাঘাত করিয়াছেন। বি. ভ

সাধন-প্রসঙ্গ—শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিত। ১২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। এই বইখানি পড়িয়া সুখী ও উপকৃত হইয়াছি। যাহাতে সাধুতা লাভের দিকে, কর্ম্মনিষ্ঠার দিকে, লোক-সেবার দিকে ও বিশ্বনিয়ন্তারদিকে মানুষ উন্মুখ হয়, তাহার জন্যই বইখানি লিখিত হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলিব। যাহা হিতকর বা কল্যাণ-প্রদ, তাহা যখন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে উপযোগী, তখন সম্প্রদায়-বিশেষের নামে এবং সম্প্রদায় বিশেষের লোকদিগকেই আহ্বান করিয়া এসকল রচনা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষেরা দলাদলির বুদ্ধিতে দল বিশেষের ছাপ দেখিয়া ভাল কথাকেও পরিহার করিয়া থাকেন।

সত্যের সন্ধান—শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। এই গ্রন্থে যে এগারটি প্রবন্ধ আছে সেগুলি বঙ্গাব্দের ১৩১২ হইতে ১৩৩০ পর্য্যন্ত "বান্ধব" "মানসী" ও "ভারতী" পত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্যের সন্ধান প্রবন্ধটি লেখকের শেষ প্রকাশিত, ও ঐটির নামে গ্রন্থখানি নামাঙ্কিত। সমস্ত প্রবন্ধেই গ্রন্থকার সহজ ভাষায় জীবনের কতকগুলি হেঁয়ালির দার্শনিক আলোচনা করিয়াছেন।

বিচার—শ্রীহরিদাস দে প্রণীত। ৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তিকাখানির "বিচার" নামের তলায় আছে—"একাত্ম-বিজ্ঞান বা অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিচার" আর বিষয়গুলি রচিত হইয়াছে পদ্যে। অতি গুরুপাক দার্শনিক তত্ত্ব এই পদ্য-রচনায় লঘু পথ্য হইয়াছে কি না তাহা তত্ত্বপ্রিয় পাঠকেরা পরীক্ষা করিতে পারেন। এ দেশের বৈদ্যশাস্ত্রে যখন পাচনের ব্যবস্থাও পদ্যে পাই, তখন "আমিত্ব" ও "ত্রিতাপের" কথা পদ্য-রচনায় অদ্ভুত না হইতে পারে।

নির্ম্মাল্য—(কবিতার বই) শ্রীবিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। ইহাতে ৩৩টি ছোট ছোট কবিতা আছে। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন বইখানির ভূমিকায় লিখিয়া দিয়াছেন, "কবিতাগুলির মাঝে মাঝে বেশ উচ্চাঙ্গের ভাবুকতা ও কবিত্ব আছে"।

দক্ষিণা—(কবিতা), শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত। ৮৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ।।৵০ আনা। ধর্ম্মবিষয়ের এই কবিতার বইখানি সম্বন্ধে রচয়িতা লিখিয়াছেন যে তিনি ইহার মূল উপাদান একটি পারসী গল্প হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের উপযোগী করিবার জন্য হিন্দু পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মনোহর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা বিফল হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য—গদ্যে ও পদ্যে দুই খণ্ড, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ধর প্রণীত ও ইউ, এন্, ধর কর্ত্তৃক ৫৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত—যথাক্রমে ২০০ ও ১১৫ পৃঃ—মূল্য যথাক্রমে ১৲ ও ।।৵০ মাত্র।

ইহা স্কুলপাঠ্য পুস্তক এবং আধুনিক ও পুরাতন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনাপূর্ণ। পুস্তকের শেষে সংক্ষেপে টীকা দেওয়া আছে।

গীতারসামৃত—২য় সংস্করণ—শ্রীনকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক জেলা ত্রিপুরা—বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত—২২৭ পৃঃ—মূল্য ।।৵০ দশ আনা মাত্র।

মূল ও কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও মাহাত্ম্য সহ সরল পদ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অনুবাদ সরল ও সহজ—গীতা পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার পক্ষে ইহা একখানি সুন্দর পুস্তক।

শ্রীদুর্গার দকারাদি সহস্রনাম স্তোত্রং—শ্রীঅন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদ, লালগোলা হইতে প্রকাশিত—২০ পৃষ্ঠা—মূল্য ।৵০ মাত্র—ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রকাশক কর্ত্তৃক অনৈক দণ্ডী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত ৭৮২ সালের হাতের তালপাতার পুঁথি হইতে মুদ্রিত। ভাষা সুললিত ও সুপাঠ্য।

স্যর আশুতোষ—শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি প্রণীত—৫০ পৃষ্ঠা—মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

পুস্তকখানি স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র জীবন-কথা। প্রায় সমস্তই "বঙ্গবাণী"র আশুতোষ সংখ্যা হইতে গৃহীত, কিন্তু কোথাও গ্রন্থকার তাহা স্বীকার করেন নাই।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার বাঙ্গালী সম্মিলনী—মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রদেশের বাঙ্গালীগণের গতবৎসর রায়পুরে যে সার্ব্বজনিক সম্মিলনী হয় ইহা তাহার মুদ্রিত বিবরণী। ইহাতে সভাপতি শ্রীতড়িৎকান্তি বক্সী মহাশয়ের অভিভাষণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ ও সার শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অভিভাষণ আছে।

ছেলেদের চট্টলভূমি—শ্রীআশুতোষ চৌধুরী প্রণীত—৭৫ পৃঃ—মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

পুস্তকের নামেই প্রকাশ যে ইহা ছেলেদের জন্য লিখিত চট্টগ্রাম জিলার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ।

বিধবা-বান্ধব—শ্রীনকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত—ও জেলা ত্রিপুরা বোয়ালিয়া হইতে শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৩৭ পৃঃ —মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

মামা ও ভাগিনেয়ের কথোপকথনচ্ছলে বিধবার কর্ত্তব্য, সমাজে স্থান, শিক্ষা, আহারবিহার, ও চালচলন সম্বন্ধে উপদেশ। পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য।

ব্যথিতা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা প্রণীত ও ৮৩ নং টালিগঞ্জ রোড্ হইতে শ্রীমতী প্রীতি-অঞ্জলি সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১১৩ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৲। উপন্যাস।

পুস্তকখানির লভ্যাংশ অনাথ-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে বলিয়া লিখিত। কিন্তু ইহাতে অনাথ-ভাণ্ডার কতদূর উপকৃত হইবে তাহা অনুমান করা সুদুঃসাধ্য।

ভগবৎ প্রসঙ্গ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, প্রণীত। ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ সিকা।

ব্রহ্ম, জগৎ, পরলোক প্রভৃতির আলোচনায় এই গ্রন্থে ১৮টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলিতে সুস্পষ্ট সূচিত হয় যে গ্রন্থকার পড়িয়াছেন অনেক, আর তাঁহার ভাষা সরল ও সুবোধ্য। সরল ভাষায় গুরুবিষয়ের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিবার ক্ষমতা বিশেষ গুণের কথা, তবে গ্রন্থকারের বিচার পদ্ধতিতে তীক্ষ্ণতা না থাকায় তাঁহার আলোচনা অনেক স্থানে মলিন হইয়াছে। অমুক তত্ত্ব চিন্তা ও বুদ্ধির অগম্য, অতএব অমুক নামজাদা গ্রন্থে যাহা আছে তাহা সত্য,—অথবা অমুক মতবাদ জ্ঞানের বিচারে কাঁচা মনে হইলেও মানিয়া লইতে হইবে, কেননা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছায় কি না করিতে পারেন,—এই ধরণের বিচারই গ্রন্থখানিতে সর্ব্বত্র। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে আলোচনা আছে, সে প্রবন্ধটির মর্ম্ম গ্রন্থকার আদপে ধরিতে পারেন নাই মনে হইল, ও সেই প্রসঙ্গে কেবল অপ্রাসঙ্গিকভাবে শক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা অগভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ও সুলেখক, কিন্তু সুবিচারক ন'ন্।

ছিটে-ফোঁটা

উদ্দেশ্য

ফুরায় না সে অরূপ-কথা, মুড়ায় না সে নটের গাছ;
সমানে তার বয়স কাঁচা, সেই পুরাতন খেলার কাজ।
কাজের ফাঁকে, ছিটে-ফোঁটা জিরেন্ কাটের রসের ধার;
হাঁড়ি ভরা নয় সে তাড়ি, মত্তজনের পিপাসার।
নয় নবেলের রোমান্স বা দার্শনিকের তত্ত্ব-কল;
ঠোঁটের বোঁটায় একটু হাসি, চোখের কোঠায় একটু জল।
হয় সে মিষ্ট, না হয় তিক্ত, না হয়ত বা একটু ঝাল,—
ছিটে-ফোঁটা বইত সে নয়! কেউ তাহে না দিও গাল।

বারমেসে

মানুষে পায় ধরা-বাসে বারমাসই শাস্তি,
তবুও মানি—ভগবানই ন্যায়বান অসৃতি।
ভেজে-পুড়ে ঘেমে-চেমে সারা মোরা গ্রীষ্মে ;
কোন ক্রমে আমে-জামে টিকে থাকি বিশ্বে।
পরে,—শব্দ দমাদম্, ঝমাঝম্ বর্ষা ;
মেলে নাক কোন ফল,—শঁসা শুধু-ভরসা।
বর্ষা-ধারে ওঠে বেড়ে তাল-পাকান ভাত্‌রে।
চচ্চড়ে রোদ্দুরে ঘুরে মাথা ফাটে ভাদ্রে।
আশ্বিনটি ছুটির মাস,—দাঁড়ায় না দু'দণ্ড ;
স-ডাক্তার মেলেরিয়া কার্ত্তিকে প্রচণ্ড।
অঘ্রাণেতে আবার আফিস্, ঘরে কাঁদে বৌ সে ;
শূলের ব্যথা পেটে-পিঠে, খেয়ে পিঠে পৌষে।
মাঘে বিষম মাগ্‌গি পশম, খদ্দরকেই আঁক্‌ড়াই ;
তাই যদি ছাই সস্তা হ'ত কমলা লেবু কাঁকড়াই।
বসন্তেতে ভন্‌ভনানি বাড়ায় মাছি মচ্ছর ;
ঢাকের কাঠির চোটে কাটে বারমাসের বচ্ছর।

সদ্ব্যয়

সুবুদ্ধিতে বুঝিলেন কুবের ধনেশ,—
দেশরক্ষা হ'লে ত বাঁচিতে পারে দেশ।
অন্ন পাবে অন্য সবে cipher-পাশ্,—
সৈন্যে পাবে নানা খাদ্য খাইবার পাশ্।
নেচে যায় হুর্‌রে রবে গুর্খা-শিখ-Tommy ;
কৈলাসের পতি ক'ন্ :—বেড়ে economy।

চৈত্রে

পরাধীনের রাজনীতি—সম্প্রতি পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারত-শাসনের মেরামতির বিচারের সময়ে দুইজন বড় সদস্য অতি স্পষ্ট ভাষায় এদেশের রাজনীতির খাঁটি মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন ; তাঁহারা বলিয়াছেন—ব্রিটিশেরা এদেশকে দখলে রাখিবেই, এক ইঞ্চ হটিয়াও কোনও ইংরেজ এদেশ ছাড়িয়া যাইবে না, এবং ভারত-শাসন সম্বন্ধে যে নীতিই অবলম্বিত হউক না কেন, তাহাকে ওই মূল নীতির অনুযায়ী করিতেই হইবে। এই স্পষ্ট সত্য কথার বদলে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কপট বাণী শুনাইয়া যাঁহারা এদেশে কয়েকজন বোকাকে নাচাইয়া রাজনীতির অভিনয় করান, তাঁহাদিগকেই আমরা ভারত-বন্ধু বলি। যে দুইজন সদস্যের কথা বলিলাম, তাঁহাদের সত্য উক্তির সঙ্গে একটা মিথ্যা উক্তিও ছিল ; মিথ্যা উক্তিটি এই যে—এদেশের আন্দোলনপর শিক্ষিতেরা লোক সাধারণের প্রতিনিধি নহেন বলিয়া শাসনভার পাইবার অনুপযোগী।

বক্তারা নিশ্চয়ই জানিতেন যে বিলাত হইতে যে অল্প কয়েকজন লোক শাসনের ভার পাইয়া আসেন, তাঁহারা যদি দিব্যদৃষ্টিতে জনসাধারণের হিত বুঝিয়া শাসন করিতে পারেন, তবে এদেশের শিক্ষিতেরা কাহারও নির্ব্বাচিত ব্যক্তি না হইলেও ইংরেজদের অপেক্ষা দেশের অবস্থা অনেক অধিক বুঝিয়া কাজ চালাইবার অধিকতর উপযোগী। সত্য কথা বলিবার পর ঐ দম্বাজির কথাটা না বলিলেই ভাল হইত; যে কারণে এদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয়েরা শাসনে অধিক উপযুক্ত, তাহা ত' মূলমন্ত্রেই রহিয়াছে। এই মূলমন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াই আমাদের সরকার বাহাদুর স্তর আবদর রহিমকে গবর্ণর করিতে পারেন নাই; সকল দিক্ রক্ষা করিবার কৌশলে স্তর্ আবদর রহিমকে জেনেভায় "উচ্চতর" কাজে পাঠাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা কাজে পরিণত হইলে কোন কৈফিয়তের বালাই থাকিত না।

উক্ত খাঁটি নীতিটির দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি, কি জন্য শাসন-মেরামতির অনুসন্ধানে মুডিমান্ সাহেবের অপূর্ব্ব রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন প্রচলিত বিধি অনুসারে সরকারি পক্ষের লোকেরা কোন অন্যায় বা ত্রুটি করিলে হাইকোর্টে তাহা সংশোধন করাইবার উপায় ছিল, সেইজন্য আইন দুরস্ত করিবার সুপারিসে আছে যে কাউন্সিলের কোন সরকারি কাজের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মকদ্দমা চলিবে না; মিনিষ্টার নিয়োগ ও তাঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থার সুপারিস হইয়াছে যাহাতে ঐ বিষয়ে কাউন্সিলের সদস্যদের অবাধ কর্ত্তৃত্ব না থাকে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাকেই বলে মেরামতের কেরামৎ। শীতের উৎপাতের পর বসন্তের বাতাসের প্রসঙ্গে হাস্যরসের কবি লিখিয়াছেন,—"সে যে ছিল ভাল, এ যে ঘেমে মরি"; মেরামত যত বাড়িবে সুখের তাপ তত বাড়িবে মনে হয়।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রিটিশারেরা জানেন যে রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িক সদস্য নির্ব্বাচন অতি দোষের; তবে ইংরেজেরা একটা সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত না হইতে পারিলে মূলনীতি বজায় থাকে না বলিয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিশেষ উপযোগিতার কথা বলা হইতেছে। এ প্রসঙ্গে একটি মজাদার ব্যবস্থার সুপারিস হইয়াছে এই যে, এ দেশের লোকেরা যদি কোন প্রদেশে ছ' মাসের অধিক স্থায়ী না হয়, তবে তাহারা ভোট দিতে বা সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না, কিন্তু ইংরেজেরা এক মিনিটের জন্য কোন প্রদেশে পদার্পণ করিলেই সকল অধিকার পাইবেন। এ সকলের আসল যুক্তি এই যে রাষ্ট্রনীতির পাঁঠাটিকে লেজে কাটিয়া দেওয়া হইবে ও আমরা আমাদের ভাগে পাইব সেই লেজটুকু, কারণ পাঁঠাটি কাটিবার লোকের।

* * *

মিনিষ্টার নিয়োগ—স্থির হইয়াছে যে রত্নপ্রসূ ময়মনসিং এবারে মিনিষ্টাররূপে দুইটি রত্ন দিবেন ও উপযুক্ত বেতনে অন্য সদস্যদের চারিজনকে উঁহাদের সহায়রূপে সেক্রেটারি বা মুন্সি করা হইবে। মিনিষ্টার শব্দটির তর্জ্জমায় অমাত্য শব্দটি চলিলে ভাল হয়; কারণ শব্দটির প্রাচীন বৈদিক অর্থ এই যে, যিনি এক পরিবারের অন্তর্গত অথবা রাজার সহচর, ও যিনি নিজে কোন কর্ত্তৃত্ব চালাইবার অধিকার পান না, তিনি অমাত্য। এইজন্য প্রাচীন সংস্কৃতে "অমাত্য" অর্থে ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে বুঝায়। যাহাই হউক আমরা নব মনোনীত অথবা নিযুক্ত অমাত্যদ্বয়ের মঙ্গলকামনা করিতেছি; তাঁহারা দেড় বৎসরের পরিশ্রমে যদি সরকার বাহাদুরকে দিয়া কিছু স্থায়ী উপকারের কাজ করাইতে পারেন, তবে এত আন্দোলন সার্থক হয়। শ্রীযুক্ত নবাবালি চৌধুরী মহাশয় যে কর্ম্মদক্ষ পুরুষ আমরা পূর্ব্বে একবার তাহার পরিচয় পাইয়াছি, আশা করি সন্তোষের জমিদার মহাশয়ও তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিবেন।
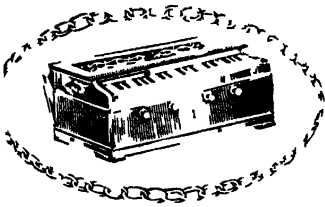
Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

ভবানীপুর।

কলহ

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩২

বৈশাখ

প্রথমার্দ্ধ
৩য় সংখ্যা

গ্রামের কথা

আমাদের দেশটা কৃষিপ্রধান। সুতরাং কৃষকের ভালমন্দের উপরই দেশের—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের ভালমন্দ প্রধানতঃ নির্ভর করে। পল্লীশিল্পও অগ্রাহ্য নহে; তবে এদেশে গ্রামের কথা আলোচনা করিতে গেলেই আগে দেখিতে হইবে কৃষককুলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতেছে।

একটু খোঁজ নিলেই দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বঙ্গদেশের পল্লীতে খুব সুলভ জিনিষ নহে। দুবেলা পেট ভরিয়া উপযুক্ত খাদ্য খাওয়া যেন বিলাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কৃষক অপেক্ষাও যাঁহারা গ্রামবাসী "ভদ্রলোক", যাঁহারা হস্তপদের ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ও যাঁহাদের মস্তিষ্কের ব্যবহার দেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়।

মহাজনের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত একটা নিত্য ঘটনা। যাঁহাদের লোক-হিতৈষণা বক্তৃতায় খুব প্রকট তাঁহারা মহাজনের উপর মধুর বাক্যবর্ষণে কখনই বিরত নন। কিন্তু সুদের হার দেশে খুব বেশী হইলেও এটা অস্বীকার করিবার যো নাই যে মহাজনই অসময়ে কৃষকের বন্ধু। আমাদের গ্রামবাসী যে এতটা ঋণগ্রস্ত সে দোষ মহাজনের কি খাতকের তাহার বিচার ততটা সহজ নহে। আজ যে খাতক কাল সেই মহাজন হইতে পারে এবং অনেক স্থলে তাহার মহাজনত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবটাও গুরুতররূপে মহাজনী হইয়া দাঁড়ায়। আবার আজ যে সামান্য মহাজনী করে সে স্থানে কা'ল হয়ত তাহাকেই খাতকের স্থানে নামিতে হইবে। বিহার ও উত্তর-

পশ্চিম প্রদেশে যাহাই হউক, বঙ্গদেশে—বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে—গ্রাম্য মহাজন সাধারণতঃ "বেণিয়া" জাতীয় কোন স্বতন্ত্র জীব নহে। মহাজন ও খাতকের যে সম্বন্ধ তাহা অর্থনীতির বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমাজের শ্রেণিবিশেষের নষ্টামির উপর নহে। আবার এই অসভ্য দেশে মহাজনও ঠিক সভ্যদেশের Shylock হইতে পারে নাই, তাহার শরীরেও সময়ে সময়ে একটু মায়ামমতা দেখা যায়।*

কিন্তু মহাজন ভাল হইলেও খুব স্পৃহনীয় জীব নহে। এ দেশে কৃষক যখন তখন তাহার দ্বারস্থ হয় এবং তাহার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। ফরিদপুর সেট্‌লমেণ্টের সময়ে জেলার ঋণভারের একটা হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অল্প সময়ের জন্য শস্য বন্ধক রাখিয়া যে ঋণ দেওয়া হয় তাহা এই তালিকাভুক্ত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৫৫ জন মাত্র ঋণমুক্ত।† সমগ্র জেলার হিসাবে দেখা যায় গড়ে প্রত্যেক পরিবার ৫৯৲ টাকা ঋণভারগ্রস্ত। এই হইল বঙ্গপল্লীর স্বাভাবিক অবস্থা।

দেশের এই ঘোর দৈন্য নিবারণের উপায় কি? "সুজলা, সুফলা", শস্যশালিনী মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার হইতেছে কই? গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে স্থানে স্থানে সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঋণদান পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে বুদ্‌বুদমাত্র। আমাদের মনে হয় কৃষক অধিকতর আত্মনির্ভরশীল না হইলে তাহার ও তাহার দেশের উদ্ধারের উপায় নাই। বঙ্গের কৃষক সাধারণতঃ নিরক্ষর—দলাদলি ও স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে উত্যক্ত। প্রাচীন প্রণালী ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যকে উন্নত পথে চালিত করিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য তাহার নাই। দুর্গতির এই মূল কারণ নিবারণ করিতে না পারিলে, তাহার মতিগতির পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, যে কেহ শীঘ্র দেশের কিছু করিতে পারিবেন এমন মনে হয় না। বাহির হইতে কয়েক লক্ষ টাকা আনিয়া কেহ হয়ত কোন স্থানে জঙ্গল পরিষ্করণ বা জলনিকাশের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কিম্বা কয়েকটা পাঠশালাও স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু কেবল এরূপ বদান্যতার জোরে দেশের চেহারা ফিরাইতে পারিবেন এমন যিনি মনে করেন তাঁহার স্থান বহরমপুর বা রাঁচির স্থানবিশেষে।

বঙ্গের কৃষিজীবী সাধারণতঃ ভারতের অন্য প্রদেশের কৃষক অপেক্ষা বুদ্ধিমান। অভাব অনেকস্থলে তাহার স্বাস্থ্যের আর প্রধানতঃ তাহার শিক্ষার। বর্ণশিক্ষার কথা বলিতেছি না, কার্য্য-করী শিক্ষারই বিলক্ষণ অভাব। স্বাস্থ্যও অনেকটা এই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। বর্ণজ্ঞান আবশ্যক কিন্তু তাহা প্রধানতঃ কার্য্যকরী শক্তির বিকাশের জন্য। এখানে সমবায়নীতির কার্য্যক্ষেত্র

---

* "To western eyes it may seem utopian to expect Shylock to forego some of his pound of flesh; but in India it is no uncommon experience"—Economic life of a Bengal District by J. C. Jack.

† Ibid P. 97.

বিশাল, আশা অসীম। এই নীতির রীতিমত অনুসরণ করিতে পারিলে বঙ্গীয় কৃষক কৃষিবাণিজ্য ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে। সমবায়নীতি ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক জগতে স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্যকরী পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু এ ক্ষুদ্র স্বার্থ নহে, যে স্বার্থ প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আপনি বড় হইতে চায় এ সে স্বার্থ নহে। সমবায়নীতি দশের স্বার্থের সমতা প্রদর্শন করিয়া দশজনকে এক সূত্রে গ্রথিত হইতে বলে, দ্রব্যের উৎপাদন ও বিনিময়ে ব্যাপৃত বিবিধ শ্রেণীর লোককে অহি-নকুল সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া সহযোগী হইতে বলে।

দ্রব্যোৎপাদকই জাতির মেরুদণ্ড। উকিল বল, ডাক্তার বল, জমীদার বল, হাকিম বল সকলেই তাহার খাইয়া মানুষ। আর বাঙ্গালায় প্রধান উৎপাদক কৃষক। অন্য কেহ তাহার কাছে সমাজের জীবনীশক্তিদানের হিসাবে ঘেঁসিতে পারে না। এই কৃষক মানুষের মত মানুষ হইলে দেশটা আর এক রকম হইয়া যাইতে বাধ্য।

যাহাতে অল্পায়াসে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহাতে স্বভাবজ পদার্থের উপযুক্ত ব্যবহার হয়, যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তৃতি ও বিনিময় বিধিসঙ্গত উপায়ে সঙ্ঘটিত হয়, অর্থনীতি শাস্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। ইহার প্রত্যেকটীর সহিতই কৃষক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, অথচ এ দেশে সে যেন সর্ব্বত্রই নিরুপায়।

দ্রব্যোৎপাদনের জন্য যাহা আবশ্যক—শ্রম ও স্বভাবজ উপকরণ অথবা ভূমি, শ্রম ও মূলধন—ইহাদের কোন না কোনরূপ সমবায় আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। রাজা বা জমীদারের অধিকৃত ভূমি, সঞ্চয়শীল ব্যক্তির ধন এবং সাধারণের শ্রম মানুষের ব্যবহার্য্য দ্রব্য যোগাইয়া দিতেছে কিন্তু অধিকাংশস্থলেই এই তিনের মিলন ঠিক মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হয় নাই, তাই আধুনিক সভ্য দেশে এত অন্তর্বিপ্লব, এত সামাজিক সঙ্ঘর্ষ। যেখানে ভূমি, মূলধন ও শ্রম বিভিন্ন হস্তে, সেখানে সহযোগিতা একটু কষ্টকর হইবারই কথা। যেখানে ভূমি ও ধন এক হস্তে, সেখানেও শ্রমজীবীর হস্তপদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি অস্বাভাবিক নহে। যেখানে শ্রম ও মূলধন একত্র, সেখানেও ভূম্যধিকারীর আশ্রয় ভিক্ষা সব সময়ে খুব প্রীতিকর ব্যাপারে পরিণত হয় না। বঙ্গের কৃষক প্রধানতঃ শ্রমজীবী ও কিয়ৎপরিমাণে ভূস্বামী। অভাব তাহার মূলধনের। এ অভাব সে পূরণ করিতে জানে না। যে ভাবে সে ইহা পূরণ করিতে অগ্রসর হয় তাহাতে প্রায়ই তাহার হস্তপদ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যিনি ভূম্যধিকারী ছিলেন এখন তিনি প্রধানতঃ করের অধিকারী। ভূমির প্রকৃত অধিকারী—দ্রব্যোৎপাদনের জন্য ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারী—এখন প্রজা। আইনের দৃষ্টি অনেক দিন হইতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন, আরও প্রসন্ন হইবে বলিয়া সে আশা করিতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশের সহিত এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ প্রভেদ। ধনীর খাসদখলে বিশালায়তন

শস্যক্ষেত্র, দলে দলে গৃহহীন শ্রমজীবী কলকারখানার সাহায্যে তাহাতে কার্য্যে নিযুক্ত—এ দৃ বাঙ্গালার বা ভারতের নহে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজীবী নিজের অনেকটা সুবিধা করিয়া লইতে পা সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু শ্রমজীবী লইয়া একটা বড় রকমের আন্দোলনের সময় এখনও এ দে উপস্থিত হয় নাই। এখনও এ দেশে যাহারা প্রধানতঃ শ্রমজীবী তাহারা নিজের গৃহে বসি নিজের উৎপাদিত অন্ন দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে যথাসম্ভব সুখে খায়। তবে সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে লোকসংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে অভাবের প্রকার ও পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে, ভিন্ন দেশের সহিত আদান-প্রদান এখন নিত্য ব্যাপারে পরিণত। কাজেই কৃষকের পক্ষেও এখন আর সনাতন প্রথা কতকটা ছাড়িয়া না দিলে চলে না। বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি ব্যতীত আধুনিক জগতে এখন আর কেহ মানুষের মত মানুষ বলিয়া গণ্য হয় না। কৃষক এদিকে উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে তাহার সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিলে দেশের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অন্য শ্রমজীবীরা শিল্পজীবী বা শিল্পবাণিজ্যপরায়ণ ব্যক্তি কিছু করিতে পারে না এমন নহে। কিন্তু যে দেশে কৃষকই সমাজের মেরুদণ্ড, যে দেশের তের আনা লোক কৃষির আয়ের উপর বাঁচিয়াছে এবং শীঘ্র ব্যবসায়ান্তরের উপর বাঁচিয়া থাকিবে এরূপ লক্ষণ দেখাইতেছে না, সে দেশে কৃষকের কার্য্যের হিসাবটাই ভাল করিয়া লইতে হয়।

কথাটা আর একটু বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য এখন কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন পাট। পাটের ব্যবসায় পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশ এখনও প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। চট, থ'লে, গায়ের কাপড় ইত্যাদি অনেক রকমে পাটের ব্যবহার নানা দেশে প্রচলিত। শীঘ্র কেহ বাঙ্গলার এই ক্ষেত্রোৎপন্ন জিনিষটার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কৃতকার্য্য হইবে এমন মনে হয় না। কিন্তু এই সুযোগ আমাদের কৃষক কতদূর কাজে লাগাইতেছে? সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী কতকটা জায়গা বাদ দিলে পাটের চাষে অল্লাধিক পরিমাণে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের সকল কৃষকই অভ্যস্ত—মধ্য বঙ্গেরও বহু কৃষক। কিন্তু কয় স্থানে এই আবাদ ও শস্য সংগ্রহের সুচারু ব্যবস্থা আছে? কয় স্থানে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত চেষ্টা আছে? মহাজনের ঋণ পরিশোধ ও উদারান্ন সংস্থানের জন্য অকালে কৃষকের পাট তাহার হস্ত হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং কৃষক যে ভাবে তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহাতে উপযুক্ত মূল্যের অংশ মাত্র তাহার নিজস্ব হইয়া দাঁড়ায়। যদি প্রত্যেক গ্রামে অথবা গ্রাম ছোট হইলে দুই তিন গ্রাম লইয়া একটী সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়, যদি এই সমিতিতে সুসময়ে সঞ্চিত কৃষকের মূলধন গচ্ছিত থাকে এবং তাহা হইতে অল্পসুদে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত সমিতির প্রণালীতে দুঃস্থ কৃষককে কৃষিকার্য্যের জন্য—অপব্যয়ের জন্য নহে—মূলধন দিবার বিধান থাকে, যদি এই সমিতি কর্ত্তৃক উপযুক্ত বীজ সংগ্রহ ও কৃষিবিষয়ক জ্ঞানবিতরণের ব্যবস্থা থাকে, তবে কৃষক ক্রমে মহাজনের আশ্রয়ভিক্ষা না করিয়াও অভিষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয় এবং কালে বৃহৎ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ

করিতে পারে। কৃষক একটু ধৈর্য্য, একটু ব্যয়সংক্ষেপ, কিছুদিনের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে শিখিলে, কুসীদজীবীকে শীঘ্রই ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিতে হয়! যে পর্য্যন্ত উৎপন্ন দ্রব্য ঠিক জায়গাতে না পৌঁছে সে পর্য্যন্ত কৃষকের সহিষ্ণুতা অবলম্বন চাই। যেখানে কৃষককে একাকী তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হয়, সেখানে নিকটবর্ত্তী হাট বা গ্রাম্য "ফ'ড়ে"ই তাহার একমাত্র অবলম্বন। উল্লিখিতরূপ সমিতির সাহায্য পাইলে কৃষক হাটের "ব্যাপারী"কে উপেক্ষাকরতঃ বড় মহাজনের নিকট অধিকতর মূল্যে তাহার দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা পায়। এইরূপ কয়েকটী সমিতি একত্র হইয়া সমবেতভাবে কার্য্য করিতে শিখিলে স্থানীয় ক্রেতার দ্বারস্থ হইবার একেবারেই আবশ্যকতা থাকেনা। সমিতিভুক্ত ব্যক্তিগণের সমবেত দ্রব্য একেবারে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শিল্পালয়ে উপস্থিত হইতে পারে এবং কৃষকের লাভের অংশও তাহাতে বাড়িয়া যায়। সমবায়ের পরিসর আরও বৃদ্ধি পাইলে সমিতিগুলির চেষ্টায় ভূমিজ পদার্থ হইতে শিল্পজ পদার্থ উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। পাট হইতে চট অথবা আরও উচ্চশ্রেণীর দ্রব্য সমবেত কৃষকমণ্ডলীর নিজের শিল্পাগারে প্রস্তুত হওয়ার আশা কি একেবারেই আকাশকুসুম স্থানীয়! জগতের আর্থিক অভিযান কিন্তু এই পথেই এখন অগ্রসর। বেতনের স্থান লভ্যাংশ ক্রমে বেশী পরিমাণে অধিকার করিবেই। আরও উন্নতি লাভ ঘটিলে এই শিল্পজ দ্রব্যের খরিদদারগণ পর্য্যন্ত সমবায় সমিতির অঙ্গীভূত হইতে পারে। যাহার হস্তে ভূমিকর্ষণ-যন্ত্র তাহার সহিত পট্টবস্ত্রের ক্রেতার লাভের অংশ বিভাগ সমবায়নীতির উপাসকগণ কবিকল্পনার বিষয়ীভূত মনে করেন না। অনেকে হয়ত বলিবেন ইহাতে মানব চরিত্রের উপর এতটা আস্থা স্থাপন করিতে হয়, যাহা বাস্তব জগতে দুর্ঘট। হইতে পারে, কিন্তু যতটা অগ্রসর হওয়া যায় ততটাই লাভ। এটা ঠিক যে লোকসংখ্যা ও জীবনসমস্যার বৃদ্ধি সত্বেও দেশটা চিরকাল কৃষকের দেশ থাকিতে পারে না। কৃষির সহিত শিল্প জড়িত হইবেই। সেটা যেরূপেই হউক—অবশ্য কার্য্য-ক্ষেত্রের এইরূপ বিস্তৃতি সময়সাপেক্ষ। এক স্তর দৃঢ় স্থাপিত না হইলে অপর স্তর স্থাপনের চেষ্টাও নিরাপদ নহে! তবে আকাঙ্ক্ষা অত্যুচ্চ হইলেই যে পতন অবশ্যম্ভাবী এ কথা অগ্রাহ্য। বরং দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিলেই লক্ষ্যচ্যুতির সম্ভাবনা। আটলাণ্টিক মহাসাগরের পার নাই মনে করিলেই আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কথায় কথায় বেশীদূর গিয়া পড়িয়াছি। এদেশে কৃষকের ও গৃহশিল্পীর একটা প্রধান অন্তরায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অভাব। কৃষকের পক্ষে দুই কারণে এই অভাবের দূরীকরণ খুব কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—১ম, মূলধনের অভাব, ২য়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড লইয়া চাষ। ১ম কারণ দূর করিবার উপায় আমরা বলিয়া আসিলাম, দ্বিতীয় কারণটী আরও গুরুতর। কিন্তু এখানেও সমবায়ের কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। কতক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সমিতির সম্পত্তি হইলে বর্ত্তমান আকমাড়া কলের ন্যায় কৃষক তাহা পৃথক্‌ভাবেও ভাড়া দিয়া ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু আর কতক

আছে যাহা বিস্তৃত ক্ষেত্র না পাইলে একেবারেই কাজে লাগান যায় না। আমাদের উত্তরাধিকার আইনের বলে ভূমিখণ্ডগুলি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, বৃহত্তর হইবার সম্ভাবনা কমিতেছে বই বাড়িতেছে না। দুই প্রকারে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতে পারে—প্রথম, ভূমির বিনিময় দ্বারা, দ্বিতীয় কাগজপত্র ও নক্সার সীমার চিহ্ন ও জমির পরিমাণ ঠিক লিপিবদ্ধ রাখিয়া ক্ষেত্রগুলির একত্র চাষের ব্যবস্থাদ্বারা। কোন কোন স্থানে এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের সমবায় দ্বারা বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। চেষ্টা যে খুব ফলবতী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কৃষকের শিক্ষা ও নীতিজ্ঞান খুব বাড়িয়া না গেলে যে বিশেষ ফলবতী হইবে এরূপ মনে করাও দুরাশা মাত্র। যাঁহারা ভূমি বিতরণের মালিক তাঁহারা যদি মনে রাখেন যাহাতে ভূমি হইতে বেশী পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে সেইরূপ বিতরণই তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাহা হইলে ভবিষ্যতে কতকটা সুফল আশা করা যায়। কিন্তু ভবিষ্যতে বিতরণের ভূমি বঙ্গদেশে খুব কমই আছে এবং বর্ত্তমানে যাহা অপরিহার্য্য তাহা লইয়া বেশী গোলমাল করিয়াও লাভ নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও কেমন করিয়া তাহার ব্যবহার দেশে প্রচলন করা যায় তাহা গবর্ণমেণ্টের ও কৃষি-বিশারদ ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুধাবনার বিষয় আর আমাদের প্রস্তাবিত সমিতিগুলির কর্ত্তব্য তাঁহাদের চিন্তিত ও পরীক্ষিত প্রণালীর কার্য্যক্ষেত্রে প্রচলন।

এদেশে কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থার উল্লিখিতরূপ সমিতি স্থাপন যে খুব সহজ ব্যাপার তাহা বলিতেছি না। ইহাও শিক্ষার উপর নির্ভর করে, আবার শিক্ষাও অনেকটা সমবায়ের উপর নির্ভর করে। গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দৃষ্টি প্রাথমিক শিক্ষার উপর আরও অনেক বেশী পরিমাণে পড়া উচিত, আর যাহাতে এইরূপ দৃষ্টি পড়ে তাহার জন্য দেশের লোকের—বিশেষতঃ কৃষক সমাজের—বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। কোথাও সমবায়-সমিতি স্থাপিত হইলে তাহা দ্বারা এইরূপ চেষ্টা চলিতে পারে। ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির সাহায্যলাভ এরূপ সমিতির পক্ষে যতটা সহজ, ব্যক্তিগত চেষ্টায় ততটা নহে। যাহা একের দ্বারা হয় না, দশের পক্ষে তাহা সুসাধ্য। কিন্তু অনেক স্থলে একও পথপ্রদর্শক হইতে পারে। বাঙ্গলার কোন কোন স্থানে—বর্দ্ধমান বিভাগের কথা বিশেষরূপে বলা যাইতে পারে—কৃষিকর্ম্ম কতকটা উচ্চবর্ণের হস্তে। কতকটা বলিতেছি, কারণ, ক্ষেত্রস্বামী এস্থলে নিজহস্তে হলচালনা করেন না—তাঁহার 'কৃষাণ' ও শ্রমজীবীর প্রয়োজন হয়। হইলেও তাঁহাকে ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতে হয়। হইলেও তাঁহাকে ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতে হয় এবং অনেক কার্য্যে ভগবদ্দত্ত হাতও লাগাইতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ভালরকম চাষই আছে এবং তাঁহারা চাষের উন্নতিবিধান জন্য চেষ্টা করিলেই—অন্ততঃ কয়েকজনে মিলিয়া—যন্ত্রাদির সাহায্য লইতে পারেন। মূলধনের হিসাবে তাঁহারা নিতান্ত হীনাবস্থ নহেন, সুতরাং কাজটা ইঁহাদের পক্ষে অনেকটা সহজসাধ্য।

এই উপলক্ষে আমাদের অল্প বা অধিক শিক্ষিত ভদ্র যুবকগণকে একবার দেশের 'কৃষি-শিল্পের

দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি। বঙ্গমাতা ইঁহাদের নিকট অনেক আশা করেন। চাকরী পাওয়া যে আজ কাল কত সহজ এবং চাকরীতে যে কত সুখ তাহা ইঁহাদের অনেকেই এখন বুঝিতেছেন। মরীচিকার পশ্চাদনুসরণ না করিয়া ইঁহারা যদি চক্ষুকর্ণ ও হস্তপদাদির উপযুক্ত ব্যবহার করেন তাহা হইলে দেশের অন্নসমস্যা এতটা বিকট আকার ধারণ করিতে পারে না। ইঁহাদের অনেকেরই "দেশে" কিছু না কিছু জমী জায়গা আছে। ম্যালেরিয়ার ভয়ে ভীত না হইয়া, বৈদ্যুতিক আলো ও বায়স্কোপবিহীন জীবনযাপনই ক্লেশকর এই ভ্রান্ত সংস্কারকে মনে স্থান না দিয়া যদি ইঁহারা নিজের ও দেশের কাজে 'দেশের' মধ্যে লাগিয়া যান তবে বঙ্গমাতার মুখশ্রী ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাহার ভয়ে "দেশ"কে তাহার অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই অমানুষের কাজ। অবশ্য সহর হইতে শিক্ষা লইয়া ভদ্রযুবক তাঁহার পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে গিয়া একেবারেই লাঙ্গল হাতে করিবেন এ দুরাশা কেহ মনে পোষণ করিতে পারে না। কিন্তু লাঙ্গল হাতে না লইলেই যে দেশের আর্থিক জীবনের কিছু করা হইল না তাহাও নহে। লাঙ্গল ধরার লোক অনেক আছে। আজকাল পল্লীসংস্কারের একটা ধূয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এটা মনে রাখা আবশ্যক যে দূর হইতে কৃষকের উপর মুরুব্বিয়ানা দেখান দেশোদ্ধারের প্রকৃষ্ট পথ নহে। এরূপ মুরুব্বিয়ানার মূল্য পল্লীবাসী বোঝে এবং এত দুরবস্থাসত্বেও সে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মধ্য হইতেই নেতা বাছিয়া লয়। পল্লী সমাজের মধ্যে গিয়া না পড়িলে, তাহার সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, সম্পদ বিপদের সহিত জড়িত হইয়া না পড়িলে সে সমাজ কাহাকেও আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তোমার শিক্ষা যদি শিক্ষার মত হইয়া থাকে, তোমার জ্ঞান যদি কার্য্যকর পথে নিজের অস্তিত্ব দেখাইতে প্রস্তুত থাকে, তোমার বাসনা যদি মঙ্গলময়ের রাজ্যে সার্থকতার দিকে ধাবিত হয়,—তবে যাহাদিগকে লইয়া দেশ তাহাদের সহিত মিলিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হও ও অপরকে সেই পথ দেখাও।

যাঁহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরেন না, তাঁহাদের অনেকের জমী বর্গা বা ভাগচাষে আবাদ হওয়ার বন্দোবস্ত আছে। অনেক তথাকথিত অর্থনীতিবিৎ বর্গার নামে খড়গহস্ত। তাঁহারা মনে করেন ইহাতে প্রকৃত কৃষকের নিকট খুব বেশী আদায় করা হয় এবং উৎপন্ন শস্যের উপর কৃষকের নিজের আংশিক মাত্র অধিকার থাকায় জমীর চাষও ভাল রকম হয় না। অবশ্য নিজের জমীর চাষে কৃষক যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, অপরের জমীতে আংশিক শস্যের লোভে সে ততটা ইচ্ছুক হয় না। এটা মানুষের প্রকৃতি। তবে বর্গা-চাষ যে সব অবস্থায়ই খারাপ এ-মত পক্ষপাতদুষ্ট। নিজের জমী নাই অথবা নিজের যথেষ্ট পরিমাণ জমী নাই এরূপ লোক কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিরল নহে। যাহার জমী আছে সে নিজ হস্তে চাষ করিতে পারে না বলিয়া জোর করিয়া সেই জমীর উপর অপরের স্বত্ব চাপাইয়া দেওয়া 'বল্‌সেভিক' নীতির অনুবর্ত্তনকারী দিগের মধ্যেই শোভা পায়, প্রকৃত ব্যবস্থা ভূমি, শ্রম ও মূলধনের উপযুক্ত

সমবায়। বর্গাদারের স্থান ভূমির অধিকারী ও সাধারণ শ্রমজীবী এ দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। ভূমির অধিকারীকে চাষবাসের কাজ নিজহস্তে লইতে বাধ্য করিলে কতকগুলি শ্রমজীবীকে বর্গাদারের পদ হইতে বঞ্চিত করা হয়, আবার শ্রমজীবী তাহার লাঙ্গল গরু লইয়া জমীতে হাত দিলেই তাহার জমীর উপর স্থায়ী অধিকার জন্মিবে এ ব্যবস্থায়ও সাবেক স্বত্বের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করা হয়। তবে সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত ভূমি কোন মানুষ সৃষ্টি করে নাই। ভগবান্ ইহার পরিমাণও সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বতন স্বত্ব যাহাই থাকুক সেই সত্বের সদ্ব্যবহার না করিলে, যাহার উপর পৃথিবীর সমস্ত লোকের নির্ভর তাহা হইতে সমগ্র প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা না হইলে যদি সমাজ পূর্ব্বতন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহারও বেশ একটা কৈফিয়ৎ আছে। জমীর কৃষক অধিকারী নিজের জমীতে যত্নশীল হইলেও, সে সাধারণতঃ মূলধনশূন্য ও অশিক্ষিত। বর্গাদারের উপরিস্থ অধিকারী যদি মূলধন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ের প্রয়োগদ্বারা বর্গাদারের সহিত সমবেত ভাবে কার্য্য করেন তবে কৃষির কতকটা উন্নতি না হইবে কেন? ইটালীতে বর্গাপ্রথা (Metayer system) ভালরূপ কার্য্য করিতেছে। শিক্ষিত যুবকদিগের অন্য দেশের নিয়ম পদ্ধতি জানা ও স্বদেশে উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহার প্রবর্ত্তন একটা প্রধান কর্ত্তব্য। যে দেশ ইহা না করে সে দেশ বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কখন উঠিতে পারে না। যাহার উপর সকলের জীবন নির্ভর করে তাহা কখন হেয় কার্য্য নহে। শিল্প বল, বাণিজ্য বল, কৃষিক্ষেত্রের সহায়তা না পাইলে কিছুরই উন্নতি নাই! আর পশুপালন ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আজ যে গোদুগ্ধের অভাব কেবল সহরে নহে, পল্লীতে পল্লীতে অনুভূত, যাহা এত শিশুকে হীনবল ও অকালে পরলোকের অধিবাসী, এত লোককে স্বাস্থ্যহীন করিতেছে, তাহার দূরীকরণ কি শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেষ্টার বহির্ভূত? যাঁহারা পাল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া সহরে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে ওকালতী ও কেরাণীগিরিই উন্নত মানব জীবনের লক্ষ্য নহে। আজকাল কেহ কেহ কারবারের দিকেও ঝোঁক দিতেছেন, কিন্তু যে ব্যবসায়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় না, তাহাতে ব্যবসায়ীর যাহাই হউক, দেশের ও দশের বিশেষ লাভ নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কার্য্যকর জ্ঞান পল্লীকৃষকের শ্রমের সহিত মিলিত হইয়া মূলধনের অন্বেষণ আরম্ভ করিলে মূলধন ধরা দিতে বাধ্য। ইহাদিগের সহযোগিতায় সামাজিক কুসংস্কার ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য। ইহাদের উদ্যোগ ও চেষ্টা সমবেত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যত মন্থরগতিতেই হউক দেশে দেখা দিতে বাধ্য। পল্লীশিল্প ইহাদের সহিত এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে এই সমবায়ের সার্থকতা তাহার উপর প্রতিফলিত না হইয়াই পারে না। গবর্ণমেণ্ট যে ভাবেই গঠিত হউক, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ কখনই এদিকে সাহায্যের হস্ত অগ্রসর না করিয়া পারিবেন না। তোমার আমার পাঁচজনের টাকা লইয়াই ত গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট এই টাকার সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য। প্রজা সাধারণের মত বাস্তবিক প্রবল হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার উপেক্ষা অসম্ভব।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এরূপ সমবায়ের ফল কি তাহার বিস্তৃত আলোচনার সময় এখন না হইলেও কল্পনার নেত্রে যে কতকটা না দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমান সমস্যা পল্লীগ্রামে এখনও ততটা উৎকটভাব ধারণ করে নাই। এখনও সেখানে হিন্দু মুসলমান এক রৌদ্রে ধান শুকায়, এক পুকুরের জল খায়, এক রাস্তা দিয়া হাঁটে, এক স্কুলে পড়িতে যায়, এক সঙ্গে বসিয়া গ্রাম্য সুখদুঃখের আলোচনা করে। শিক্ষিত লোকের সহযোগিতা এই সম্বন্ধ খারাপ করিয়া না দিয়া কি আরও ভাল করিয়া দিতে পারিবে না ?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কামনা

কুসুমের বুকে পরাগ যেমন
ফলেতে যেমন রস,
শিশুর মুখের সরলতা আর
সুজনে যেমন যশ,
ধরণীর বুকে তটিনী যেমন
স্ব স্ব ভাবে বহমান,
কৃপণের যথা সঞ্চিত ধন
দাতার যেমন দান,
নব পল্লবে রক্তিমা যথা
আপনা আপনি জোটে
তরুণ আননে প্রেম লাজারুণ
যেমন আপনি ফোটে,
মলয় সমীরে উন্মাদনা সে
চাঁদের যেমন সুধা
বদ্ধ জীবে সে মৃগমরীচিকা
ভোগীর যেমন ক্ষুধা

ত্যাগীর যেমন বিবেক বিরাগ
পরমানুরাগ প্রাণে
কবি সে যেমন আপন ভোলা গো
খেয়াল খেলার গানে
বিটপী যেমন ছায়া বিস্তারে
স্বভাব নিহিত গুণে
কুসুম-ধন্বা শোভিত যেরূপ
মোহন পুষ্প তূণে !
উদারের বুকে পতিত যেমন
মহতের বুকে ক্ষমা,
বীরের হৃদয়ে সাহস যেমন
নিত্য রয়েছে জমা !
তেমনি আমার ক্ষুদ্র হিয়ায়
তোমার প্রেমের স্মৃতি
থাকে যেন নাথ চির উজ্জ্বল
অফুরাণ্ নিতি নিতি !

শ্রীলীলা দেবী

সাগরিক ও নাগরিক

খবর এসেছে, দেবতা আসছেন। নগরে মহা হৈ চৈ, দেবতাকে বরণ করে নিতে হবে।

সবাই জানে দেবতা তাঁর ঝাঁপিতে ভরে বর নিয়ে আসছেন। তাঁর সে ঝাঁপি উজাড় করে নিতে হ'বে, নগরের যার যা অভাব আছে নিঃশেষে পূরণ করে' নিতে হ'বে। তাঁর পূজার জন্য হ'চ্ছে তাই বিরাট আয়োজন।

নগরবাসীর মুখে আর অন্য কথা নেই। দেবতা এলে কত কি যে হবে! গরীব বলছে দারিদ্র্য আর থাক্‌বে না, ধনী বলছে ধনের ভাণ্ডার ছাপিয়ে উঠবে। দুঃখী বল্‌ছে দুঃখের এই শেষ, সুখী বল্‌ছে সুখের আর সীমা থাক্‌বে না। বন্দী বল্‌ছে মুক্তি নিয়ে আস্‌ছেন দেবতা, মুক্ত বল্‌ছে শক্তি দিয়ে তিনি আমাদের ধন্য কর্‌বেন। দাস বল্‌ছে দাসত্ব আর থাক্‌বে না, প্রভু বল্‌ছে দাসে আমার ঘর ভরে যাবে! নারী বল্‌ছে এবার নারীর মর্য্যাদা বাড়বে, পুরুষ বলছে নারী আরও বেশী বশীভূত হ'বে, নারীর মোহিনী শক্তি বেড়ে উঠবে। সবাই স্বপ্ন দেখছে, সবাই আনন্দে বিভোর।

একটা কথা নিয়ে তর্ক হ'ল কোথায় দেবতার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হ'বে। একজন বল্লে, "দেবতা আসবেন সাগর থেকে, সাগরতীরে তাঁকে আমরা বরণ করে নেব, সাগর মন্দিরে তাঁর পূজার আয়োজন কর্‌বো।"

আর একজন বল্লে, "আমাদের নগরের দেবতা এই নগরের ভূমি থেকে বেরোবেন, সাগর হ'তে তিনি আস্‌তে পারেন না। নগর মন্দিরেই তাঁর বরণ হ'বে, সেখানেই তাঁর পূজার আয়োজন ক'র্‌তে হবে।

তর্ক বেধে গেল। ক্রমে কথার ঝাঁঝ বেড়ে উঠ্‌লো; দল বাঁধলো, নগরের পথে ঘাটে সাগরিক নাগরিকে ঝগড়া লেগে গেল। সাগর মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে নগর মন্দিরের পুরোহিতের প্রায় হাতাহাতি হ'য়ে গেল।

তার পর একটা ভীষণ বিপ্লব লেগে গেল। নগর মন্দিরের পুরোহিত নাগরিকদের ডেকে বল্লেন, "ওই সাগরিকদল ফিকির করে দেবতাকে তাড়াবার চেষ্টা কর্‌ছে। সাগর থেকে দেবতা আসবেন সে কথাটা একদম ভুয়ো। ওদেরকে দূর কর্‌তে না পার্‌লে ওরা দেবতাকে ভয় খাইয়ে দেবে। অতএব ওই সাগরমন্দিরের পুরোহিতকে বধ কর্‌তে হ'বে।"

একজন নাগরিক বল্লে, "কিন্তু সে বড় শক্তিমান। তা ছাড়া তার অনেকগুলো জোয়ান জোয়ান দারোয়ান আছে। তাদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠ্‌বো না।"

"পারবে, যদি তোমরা দল বেঁধে এক যোগে আক্রমণ ক'রতে পার।"

"তাতে সময় লাগতে পারে। দেবতার আসবার লগ্ন যদি ব'য়ে যায়, যদি তাঁর পূজার আয়োজন হ'য়ে না ওঠে।"

"সব হ'য়ে উঠবে, তোমরা কোনও চিন্তা করো না। সব ভাবনা চিন্তা আমার হাতে দিয়ে তোমরা এগোও, নইলে ওরা এসে তোমাদের সব আয়োজন পণ্ড করবে, দেবতার অর্ঘ্য সাজাতে বাধা দেবে।"

নাগরিকদল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে এগিয়ে গেল। হৈ হৈ শব্দে তারা সাগর মন্দিরে আক্রমণ করলে।

সাগর মন্দিরের পুরোহিত দেবতার পূজার অর্ঘ্য সাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মন্দির আক্রমণ হ'তে উঠে পড়লেন। তিনি তাঁর হাজার হাতিয়ার ও দু হাজার পালোয়ান নিয়ে লড়াই করতে ছুটলেন। রইল প'ড়ে তাঁর বরণডালা, পড়ে রইলো অর্ঘ্যের আয়োজন। তুমুল যুদ্ধ লেগে গেল। সাগরিকের দল ছুটে এসে সাগর মন্দিরে জমায়েৎ হ'ল।

*　　*　　*　　*

নাগরিক পুরোহিত দূর থেকে দেখে বল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে তোমরা এসেছিলে! দেখছো ওরা গোমাংস দিয়ে অর্ঘ্য সাজাচ্ছিল। আমাদের দেবতার অর্ঘ্যে গোমাংস! এ দেখলে কি আর দেবতা এদিকে ভিড়বেন!"

নাগরিকের দল ক্ষেপে উঠলো, ভীষণ আক্রমণ হ'ল সাগর মন্দিরের দেউড়িতে—দেউড়ি আর টেঁকে না।

সাগরিক পুরোহিত বল্লেন, "সাবধান বাছারা! আজ যদি তোমরা ছেড়ে যাও তবে দেবতার পূজা আর হ'বে না। দেখছো তো ওই নাগরিকদের কাণ্ড, দেবতার সম্বর্দ্ধনার জন্য ওরা মাথা মুড়িয়ে টিকি বাড়িয়ে ত'য়ের হ'য়েছে। ওই খোঁচা খোঁচা টিকির বন দেখলে দেবতা আমাদের ভয় পেয়ে পালাবেন—ওই টিকিশুদ্ধ মাথাগুলো না নামিয়ে ফেলতে পারলে আর উপায় নেই।"

সাগরিকের দল ক্ষেপে উঠলো। দেউড়ীর উপর মরিয়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভারী ভারী পাথর ফেলতে লাগলো নাগরিকদের উপর।

দুপক্ষে ভীষণ লড়াই চল্লো। দিনের পর দিন তারা যুদ্ধ করতে লাগলো। হতাহতে হাঁসপাতাল ভরে' গেল।

*　　*　　*　　*

সাগরিক একজনের ছিল একটা পাঠশালা। নাগরিকদের ছেলেরা সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। নাগরিকদের ছিল একটা কাপড়ের কারখানা, সাগরিক কারিগর সব সেখান থেকে পালিয়ে এলো। নাগরিকদের ছিল পাটের ক্ষেত, নাগরিকেরা তাতে আগুন লাগিয়ে দিলে।

নাগরিকদের ধানের ক্ষেত সাগরিকেরা বোমার মুখে উড়িয়ে দিলে। চাষ আবাদ বন্ধ হ'য়ে গেল, কলকারখানা থেমে গেল, পড়া শুনা চুকে গেল, পূজো পাঠ তাকে তোলা রইলো।

যুদ্ধ পূরোদমে চলতে লাগ্‌লো।

নাগরিকের দল যেদিন সাগর মন্দিরের একটা চূড়া তাদের কামান দিয়ে ভেঙ্গে দিলে, সেদিন নাগরিকেরা ধুমধাম করে' উৎসব কর্‌লে, নগর মন্দিরে তিনশো পাঁটা বলি হ'য়ে বিরাট ভোজ হ'ল। নাগরিক পুরোহিতের একখানা পা যেদিন একেবারে কেটে দুখানা হ'য়ে গেল, সেদিন সাগর মন্দিরে রোশনাই জ্বলে উঠ্‌লো।

* * * *

লগ্ন বয়ে গেল। দেবতা এলেন না। কারো খেয়াল হ'ল না সে কথা—যুদ্ধ চল্‌তে লাগ্‌লো।

শেষে একদিন নাগরিক পুরোহিত স্থির ক'র্‌লেন যে তাঁর জয় হ'য়েছে। সাগর মন্দির অবশ্য দখল হয় নি, তার পুরোহিতও এখন অক্ষত অনাময় অবস্থায় তাঁর মন্দিরে বিচরণ ক'র্‌ছেন; তবু জয় হ'য়েছে, কেন না সাগর মন্দিরের সবগুলি চূড়া ভেঙ্গে গেছে—মন্দিরটা দেখ্‌তে একেবারে নেড়া বোঁচা হ'য়ে গেছে।

পুরোহিত হুকুম দিলেন, "আজ বিজয়োৎসব কর্‌তে হ'বে।" কেউ সাড়া দিলে না। হঠাৎ পুরোহিত দেখতে পেলেন তাঁর পাশে কেউ নেই।

ভয়ানক চটে উঠে তিনি গেলেন নগরের ভিতর। বাড়ী বাড়ী ঘুরলেন, তাঁর উৎসবের আয়োজন করতে। কিন্তু লোক পাওয়া গেল না। কতক লোক জখম হ'য়ে ঘরে পড়ে ছিল, তারা উঠতে পারে না। কতক বল্লে তাদের উৎসবের পোষাক নেই। কতক বল্লে তারা খেতে পায় না, উৎসব করবার শক্তি নেই তাদের। অনেকগুলি বাড়ীতে দেখতে পেলেন তিনি, তাঁর যজমান স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে অনশনে মরবার মত হ'য়ে পড়ে র'য়েছে, ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে তারা কোনও মতে লজ্জা নিবারণ করছে।

তিনি বেরিয়ে গেলেন নগর মন্দিরে—এদের খাইয়ে পরিয়ে উৎসবের জন্য ত'য়ের ক'রবেন ব'লে। দেখলেন মন্দিরের ভাণ্ডার শূন্য। ধানের গোলা খালি প'ড়ে আছে, বস্ত্রের ভাণ্ডারে কাপড় নাই; মুহুরীরা কাজের অভাবে অবসর নিয়েছে।

পূজার ঘরে গিয়ে দেখলেন, পূজার কোনও আয়োজন নাই, ষোড়শোপচারের কোনও উপচারই নাই। হঠাৎ তার মনে পড়লো দেবতার কথা—তাঁর অর্ঘ্য তো প্রস্তুত হয় নি, বরণডালা তো সাজান হয় নি।

তার পর মনে পড়লো যে দেবতার আসবার লগ্ন তো ব'য়ে গেছে!

মাথায় হাত দিয়ে ঠাকুর বসে' পড়লেন।—তার পর মনের দুঃখে তিনি বনে চলে গেলেন।

সাগর মন্দিরের পুরোহিত যখন দেখতে পেলেন যে নাগরিকের দল তাদের ছাউনি তুলে নিয়েছে তখন তিনি দুয়ার খুলে গেলেন তাঁর যজমানদের বাড়ী। তারা ছিল, বেশীর ভাগ, সওদাগর। দেশের রকম সকম দেখে তারা কারবার বন্ধ ক'রে যার যার নৌকায় চড়ে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে গেছে, যারা পড়ে' আছে তাদেরকেও ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

মন্দিরে পূজার বেলা বয়ে গেছে, পূজার কোনও জোগাড় নেই। পুরোহিত মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ব'সলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল দেবতা আসবার কথা ছিল—তার লগ্ন ব'য়ে গেছে। লজ্জায় ঘৃণায় পুরোহিত বনে চলে গেলেন।

* * *

নগরের বাইরে বনের ভিতর তার ভাঙ্গা কুটীর—সে বড় গরীব। নগরে যায় সে, দুই বেলা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মেগে বেড়ায়—সবাই তার দিকে কট মট করে তাকায়—হেলায় অশ্রদ্ধায় কেউ বা তাকে দুমুঠো খেতে দেয়—কেউ বা চোর বলে তাকে গলাধাক্কা দেয়। তার নাম দীনদাস।

সে কেঁদে কেঁদে ব'লে যায় "ওগো খেতে দেও আমায়, বাঁচতে দেও আমায়, বাঁচলে আমি রত্নে তোমাদের ঘর ভরে'দেব।" কেউ তাকে বিশ্বাস করে না, জুয়াচোর বলে' তাকে কোটালের কাছে ধরে দিতে চায়।

সে তাদের কাছে কেঁদে বলে আমার চোখের জল মুছিয়ে দেও ভাই, হাসতে দেও আমায়। আমার হাসিতে যে মুক্তা ঝরে—সে মুক্তায় তোমাদের ঘর ভরে যাবে। তারা দেখে তার চোখের জলে রূপোর ধারা বয়ে' যায়, তাকে তারা মারে আর চোখের জল থেকে রূপো কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

ঘরে ঘরে সে কাজ করে' ফেরে। আঁস্তাকুড়ের ময়লা সে পরিষ্কার করে, ধানের বোঝা পিঠে বয়ে গোলায় নিয়ে যায়, সোণার দানা পাতাল থেকে কুড়িয়ে আনে, সাগর থেকে মাণিক ডুব দিয়ে তোলে সে। তারা সব তার কাছে বুঝে নিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

ভালবাসার কাঙাল সে, কেউ তাকে মিঠামুখে কথা বলে না। সে বলে, "ওগো তোমরা একবার আমায় তোমাদের বুকে জড়িয়ে ধর।" তারা বলে "বেটা পাগল!" কেউ বলে, "পাগল নয় নেকা।" সে যদি কারও পায় হাত দেয় তবে তারা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি স্নান করে শুদ্ধ হয় তারা।—সাগরিক নাগরিক, সবাই তার গায় থুথু দেয়।

বনের ধারে জীর্ণ কুটীরে সে থাকে, ধনীর প্রাসাদ থেকে দূরে, পূজার মন্দির থেকে দূরে, উৎসবের নৃত্যশালা থেকে দূরে, বিলাসীর প্রমোদাগার থেকে দূরে। একলা থাকে সে আর কেঁদে চোখ ফুলিয়ে দেয়।

ঝড় এলো। নাগরিক পুরোহিত ব্যস্ত হ'য়ে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে এসে ঢুকলেন দীনদাসের কুটীরে। দীনদাস কৃতার্থ হ'য়ে উঠে তাকে সম্বর্দ্ধনা করলে। তার ছেঁড়া কম্বল খানা ঝেড়ে বিছিয়ে দিলে। আরাম করে ব'সে পুরোহিত চোখ লাল করে' বল্লেন, "বড় ছেঁড়া তোর কম্বলটা দীনদাস। অবশেষে এতে এনে বসালি আমায় ?" দীনদাস মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

পুরোহিত বল্লেন, "যা' হোক এতেই চলে যাবে। তা' আমি এখন জপ করবো, তুই বেরো ঘর থেকে। নইলে আমার মন্ত্র অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে।"

দীনদাস বাইরে গিয়ে নিঃশব্দে দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো, তার গায়ের উপর জলের ঝাপটা লাগতে লাগলো।

সাগরিক পুরোহিতও আশ্রয় নিতে এলেন তার কুটীরে। দীনদাস বিনীতভাবে তাঁকে কুটীরে প্রবেশ করতে বল্লে। পুরোহিত বল্লেন, "কিন্তু তোর পাশ দিয়ে যাই কেমন করে' ? তোর হাওয়া লাগলে যে আমার তপস্যা নষ্ট হ'বে—তুই দূরে সরে' যা আমি প্রবেশ করি।"

দীনদাস মাথা নীচু করে' সরে গেল দূরে, ঝড়জলের ভিতর তার এতটুকুও আওতা রইলো না, মুক্ত আকাশের তলে কাল বৈশাখীর ঝড় তার উপর তার সম্পূর্ণ প্রতাপ প্রকাশ করলো।

পুরোহিত কুটীরে প্রবেশ করলেন।

* * *

কুটীরের ভিতর দুই পুরোহিতে মল্লযুদ্ধ লেগে গেল।

তাদের তাণ্ডবে ব্যস্ত হ'য়ে দীনদাস আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো।

তখন দুই পুরোহিত তাদের রক্তচক্ষু তার উপর ফিরিয়ে একসুরে বল্লেন, "হতভাগা, তুই আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করলি ? তোর বাতাস আমাদের গায় লাগিয়ে আমাদিগকে কলুষিত করলি। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর।" দুজনে দণ্ড তুলে তার মাথায় লাগালেন ঘা। দীনদাস রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মরণের মুখে দীনদাস হঠাৎ উদাত্তস্বরে ডেকে উঠল, "পুরোহিত !"

দুজনে চমকিত হ'য়ে তার দিকে চাইলেন। চেয়ে দেখলেন, দিব্য দেহ ধারণ করে দীনদাস তাঁদের দিকে চেয়ে আছে। তাঁরা নতজানু হ'য়ে সমস্বরে চীৎকার করে' বল্লেন, "দেবতা ?"

"হাঁ। আমার অর্ঘ্য কোথায় পুরোহিত। বরণ ডালা কই ?"

দুজনেই মাথা নীচু করে রইলেন। অনেকক্ষণ পর সাগরিক পুরোহিত বল্লেন, "দেব, সাগরের পথে আমরা আপনার আগমন প্রতীক্ষা ক'রছিলাম।"

নাগরিক পুরোহিত বল্লেন, "নগর মন্দিরে প্রভুর প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা।"

দেবতা হেসে বল্লেন, "সাগর মন্দিরেও গিয়েছিলাম আমি, নগর মন্দিরেও গিয়েছিলাম, কই অর্ঘ্য নিয়ে তো আমায় বরণ কর নি !

"লগ্ন বয়ে' গিয়েছিল তবু আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় বসে' ছিলাম।

"তোমরা এলে, কিন্তু অপূর্ব্ব অভিনন্দন দিলে আমায় !"
হেসে তখন দেবতা অন্তর্দ্ধান হ'লেন।
দুই পুরোহিত কেবল পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কর্ণিকার

আজি,—বৈশাখে অই শাখে শাখে বনে ফুটিয়া উঠেছে সোনার খনি
মাটীর তলে সব সোনা আজি কাঙাল তরুরে করেছে ধনী।
চারু-পল্লব, শ্যাম-বৈভব, ফল-গৌরব ছিল না তার
একেবারে সে যে হয়েছে কুবের বহিতে পারে না সোনার ভার ॥
আজিকে নিঃস্ব বনভূর লাগি স্বর্ণসূত্র খুলিল কে রে ?—
দৃষ্টি ভোজের মহা-উৎসব, নয়ন যে আর ফেরে না হেরে।
কাশী মহীশূর অমৃতসরের সকল গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া
ইন্দ্রনীলের মন্দিরে আজি কে গড়িল ওই কনক চূড়া ?
শ্যামের পার্শ্বে কে মিলাল ওই কনক-বরণী রাধারে আনি ?
অথবা ও কি ও নীলাচল গায় গোরার কনক প্রতিমাখানি।
নব বরষের বরণের লাগি প্রকৃতি কি আজ সালঙ্কারা ?
নবাভিষিক্ত বৈশাখ-শিরে কনকছত্র ধরেছে কারা ?
নভোগঙ্গার স্বর্ণধারাটি নামিল হোথা কি তরুর শিরে ?
সোণার স্বপনে বনবনান্ত দিগ্‌দিগান্ত ভরিল কিরে ?

মাটীর তলের সোনারি মতন এ সোনাও ভবে দুদিন রয়,
ধাতুরাজ তবু রাজ শৌর্য্যেও পারেনি ইহারে করিতে জয়।
জড় কি কখনো জীবনে জিনিবে ? দ্যুতিরে কি কভু জিনিবে ক্ষিতি ?
হিরণ-কুসুমে হোথা পুষ্পিত রবির কিরণ, সোমের প্রীতি।
কুক্ষি চিরিয়া চোরে যাহা হরে ধরা তা যে দেয় ইচ্ছা সুখে
মরু পঞ্জরে সে যে কণা কণা, এ যে অজস্র তরুর বুকে।
এর লাগি শত ডুবিবে না পোত, সহিবে না কেহ মনঃপীড়া,
অনশনে, রোগে, শ্রমে, শ্বাসরোধে মরিবে না যত সন্ধানীরা।

এর লাগি দেশে ছুটিবে না অসি, বাজিবে না ভেরী দানব মোহে,
পীতিমা ইহার হবে নাক রাঙা রঞ্জিত হয়ে মানব লোহে।
এত জাগাবে না দেশ-বিদ্রোহ অসূয়া হিংসা জিগীষা রোষ
বিশ্বাসহানি ভ্রাতৃবিরোধ জায়াবিচ্ছেদ রক্তশোষ।
ধন দস্যুরা কতই হরিবে, কত আছে সোণা ঘরের কোণে ?
ধনী, দীন, হীন, সবারি লাগিয়া হেথা অজস্র ফুটেছে বনে।

কানে গুঁজে নে'রে রাখাল বালক, চুলে গুঁজে নে'রে ব্যাধের মেয়ে,
বনবালাগণ মালা গেঁথে পর, কে আছিস্ কোথা আয়রে ধেয়ে।
কৃপাণের জোরে লুটিয়া 'কঠোরে' রজনী জাগুক্ কৃপণপ্রাণ,
'ললিত কোমলে' পাবি মুঠাভরে নিয়ে যা মায়ের স্নেহের দান।
নিষ্কলঙ্ক অম্লান তাজা যত নিবি তুই তত‌ই পাবি,
যত নব নব গড়্‌না গহণা লাগিবে না এতে কুলুপ চাবি।
হেম-মৃগ পাছে ছুটে মূর্খেরা, হারাক সকলি পরুক ফাঁসি,
তা দে' ধিক্কার টিটকারি দিয়ে নেচে বেড়া তোরা বাজিয়ে বাঁশী।
মাটীর সোনারে হারায়ে অভাগা জীবন ভরিয়া মরুক কেঁদে ;
অঞ্জলি তোর বর্ষে বর্ষে ভরে দিবে ধরা আপনি সেধে।

শ্রীকালিদাস রায়

রামগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উচ্চপদ ও ভারতবাসী

বিলাতে জন সুলিভ্যান (John Sullivan) নামে স্বত্বাধিকারী সভার (Court of Proprietor) একজন সভ্য ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত সনন্দে ৮৭ ধারায় লিখিত মন্তব্যটির সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি যদিও প্রতিগ্রহণ করিতে হয়, তথাপি ভারতবাসীর পক্ষে তিনি যে চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সুলিভ্যান মান্দ্রাজে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন, পরে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বত্বাধিকারী সভায় প্রবেশ করেন।

তদানীন্তন সময়ের ৮৭ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"That no natives of the said territories, nor any natural born subject of his Majesty, resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office or employment under the said company." এই ধারায় যে কোন ভারতবাসী তাহার বর্ণ, জন্ম, জন্মস্থান বা ধর্ম্মের জন্য কোম্পানীর অধীনে যে কোন পদে নিযুক্ত হইবার অধিকারে বঞ্চিত হইবে না, লিখিত ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা ঘটিত না। ইহারই প্রতিবাদ করিবার জন্য রামগোপাল যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

কিঞ্চিদধিক দেড়শত সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয়গণের সহি করিয়া সুলিভ্যানকে একখানি ধন্যবাদ পত্র প্রেরণ কল্পে একটি সভা সমাহূত করিবার জন্য, সেরিফের নিকট একখানি দরখাস্ত পাঠান হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল এই উদ্দেশ্যে টাউন হলে কলিকাতাবাসীর একটি সভা হয়। কতকগুলি ইউরোপীয়ান ও অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান সমেত সভায় প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্মিথ (Adam F. Smith) তখন হাই সেরিফ, তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একপার্শ্বে ল কমিশনের (Law Commission) ইলিয়ট (Daniel Elliot) ও অপর পার্শ্বে জর্জ টমসন উপবেশন করেন। চারি ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া ব্যতীত এই সভায় ছয়টি মন্তব্য প্রবর্ত্তিত ও সমর্থিত হয়, তন্মধ্যে রামগোপাল প্রথম মন্তব্যটি ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেন। (মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম মন্তব্যটির প্রস্তাব করেন। মন্তব্যটি এইরূপ ছিল :—এই সভার অভিমত এই যে অসামরিক শাসন বিষয়ে দেশীয়দিগকে অধিকতর অধিকার প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সুলিভ্যান সাহেব যে চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষরূপে ধন্যবাদার্হ। ইহার সমর্থনে রামগোপাল একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

তিনি লোক সমাগম দেখিয়া প্রথমে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে বিলাতে ভারতের মঙ্গলের জন্য কোন প্রশ্ন হইলে, সে সংবাদ এখানে পৌঁছাইত না, যদি কখন আসিত তাহাতে এ দেশবাসী আদৌ কর্ণপাত করিতেন না, যাহা হউক সেদিনকার লোক সমাগম তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য ত্যাগের পরিচায়ক বটে। ইংলণ্ডবাসী এক্ষণে ভারত শাসনের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেছেন, ভারতবাসীর তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন, কেননা অকৃতজ্ঞতা-অপবাদ অসহনীয়। যাঁহারা আমাদের উপকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা বিফল হইলেও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক, তাহা না হইলে মানুষের কমনীয় বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বিজিত জাতি নিম্নতম ও হেয় পদগুলি ভিন্ন অন্য পদের উপযুক্ত নয়, এই অভিমতের

পৃষ্ঠপোষক এখন আর নাই, সেইজন্য তিনি আশা করেন যে ভারতবাসীদিগকে উচ্চপদ দিবার উদারনীতি বোধ হয় অতি সত্বরই প্রবর্ত্তিত হইবে। আদিমবাসীরা তাহাদের অধিকৃত স্থানগুলিতে ভগবান ভিন্ন আর কাহারও স্বত্ব স্বীকার করে না, স্বদেশে বাসের জন্য যাহা কিছু সুবিধা সে সকলই তাহাদের জন্ম-স্বত্ব। ভগবানের ইচ্ছায় ও সমাজ সৃষ্টির জন্য, কালক্রমে এই স্বত্বগুলি পরস্পরের সমান সুবিধা ও উপকারের জন্য শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। সুতরাং প্রজাশাসন পিতার উপযুক্ত (Paternal Government) হওয়া কর্ত্তব্য। অল্পের হিতের জন্য বহু ব্যক্তির অহিত ইহা স্পষ্টতঃ অন্যায্য; আরও, কতকগুলি বিদেশীর সুবিধার জন্য সমস্ত স্বদেশবাসীকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত। সেইজন্য তিনি বলেন যে দায়িত্বপূর্ণ ও অধিক বেতনের সমস্ত পদগুলি যে জেতারা একচেটিয়া করিবেন এই অন্যায় অভিমত পৃথিবীর মধ্যে উদারমতাবলম্বী কোন খৃষ্টান জাতিই পোষণ করিবেন না। ন্যায় ও স্বত্ব সম্বন্ধে মূল অভিমত ত্যাগ করিলেও ইউরোপীয়ানরা যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব শাসকদিগের সম্মুখে এদেশীয় পদনিয়োগ সম্বন্ধে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, এ সামান্য তৃপ্তিও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ইংরেজ চরিত্রের উপাসক, সেইজন্যই বলিতে লজ্জিত হন ও হীনতা বোধ করেন যে তুলনা করিলে খৃষ্টানরা মুসলমানদিগের নিকট এ সম্বন্ধে খর্ব্ব হইয়া যান। মুসলমান সম্রাটেরা দেশীয়দিগকে পদপ্রদানে অধিকতর উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখাইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে এদেশীয়েরা সামরিক ও অসামরিক উচ্চতম পদগুলিতে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় জমীদার রাজস্ব আদায় করিতেন (Revenue Collectors) এবং গ্রামশাসন করিতেন (Magistrates), কাজী বিচার করিতেন। ইদানীন্তনের অবজ্ঞাত ও বিজিত জাতি তখন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এ প্রথা কিরূপ চলিত সে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং কিছু অভিমত ব্যক্ত না করিয়া বলেন যে অবশ্য সে সময় বিস্তর অত্যাচার ও অবিচার সংসাধিত হইত বটে, কিন্তু সুপরিজ্ঞাত ও বিচক্ষণ লেখকেরা বলিয়াছেন যে সাধারণ লোকে তখন অধিক সমৃদ্ধিশালী ও ধনবান ছিল এবং অপেক্ষাকৃত ভাল আহার ও ভাল বসন পরিধান করিত ও উত্তম স্থানে বাস করিত। তাহাদের সাধুতা ও নৈতিক চরিত্র এখনকার অপেক্ষা অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বলিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর বিখ্যাত সিভিলিয়ান (Holt Mackenzie) মেকেঞ্জি যে (Minute) মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা উদ্ধৃত করেন। মেকেঞ্জী সে সময়ের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার স্বরূপ বলেন যে, অসামরিক শাসন বিভাগে অধিকতর দেশীয় নিয়োগে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

তৎপরে তিনি তদানীন্তন সময়ের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, আদালতে বিশেষতঃ দেশীয় আমলাদিগের মধ্যে অর্থ-লোলুপতা ও উৎকোচ গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করেন। সময়ে সময়ে অবশ্য উৎকোচ গ্রহণ ও বিচার বিক্রয়ের যে ঘটনা সাধারণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে অতি নিম্ন পদ ভিন্ন অন্য পদে

দেশীয়দের বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, তদবধি সামান্য দাসদাসীর মাহিনায় তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া কেমন করিয়া লোকে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সময়ের অভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভেণ্টদিগকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য দেশীয়দিগের হস্তে অর্পণ করিতে হয়, সকল অবস্থাতেই কার্য্যের প্রত্যেক খুঁটিনাটির জন্য তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতেই হইবে, কেননা তাহাদের প্রভুদের অপেক্ষা তাহারা দেশীয় ভাষা ও দেশীয় চরিত্র সমধিক অবগত। এইরূপে তাহারা যথেষ্ট শক্তি ব্যবহার করে, আর সেইজন্যই স্বভাবতঃ তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে কতকটা সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এরূপ কর্ম্মচারীকে সামান্য ১০৲ কিম্বা ৫০৲ মুদ্রা বেতন দেওয়া হয়। সাধারণ বিজ্ঞাপনীতে দেখা যায় যে ৫০৲ মুদ্রা বেতনের খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষের জন্য ৩০ হইতে ৫০ সহস্র মুদ্রা জামিন চাওয়া হয়, ইহাতে আবার ব্যক্তিগত জামিন গ্রাহ্য নহে। ন্যায়পণ্যের বিক্রয়ের জন্য ইহা দোকান খোলা মাত্র। এরূপ সামান্য বেতনে লোকে যে সাধু হইবে তাহা আশা করা যায় না। মানুষ অবস্থার দাস ; যে কোন জাতি, যে কোন সময়ে এরূপ অবস্থায় পড়িলে এইরূপ ফলই প্রকাশ পাইত। অতঃপর তিনি বলেন যে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রাক্কালে ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও এই দোষে দূষিত ছিলেন, তাঁহাদের যদি এরূপ ঘটে, তাহা হইলে অল্প শিক্ষিত বহুকালাবধি স্বাধীন অনুষ্ঠানাদির স্বাস্থ্যকর প্রভাব বঞ্চিত দেশীয় আমলার বিশেষ দোষ কোথায় ? বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে, দেশীয়দিগের জন্য সেই ব্যবস্থা করা হইলে, নিশ্চয়ই সেইরূপ সুফল পাওয়া যাইবে। এ দেশীয়দিগের অনেক স্বাভাবিক সুবিধা আছে, কার্য্যের ইচ্ছা আছে, তদ্ব্যতীত তাহারা দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি-নীতি, ব্যবহার ও চরিত্রের সহিত সম্যক পরিচিত শুধু তাহাদিগের প্রধান অভাব তাহাদের সাধুতা ও উচ্চশিক্ষা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া এই দুইটি গুণের অনুশীলনের জন্য উৎসাহ দেন, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে এক সম্প্রদায় দেশীয় কর্ম্মচারীর সৃষ্টি হইবে, যাঁহারা অচিরে কোম্পানীর ও তাঁহাদের জাতীয় গৌরব বলিয়া গণ্য হইবেন। যাহা হউক অল্প অল্প করিয়া এই প্রবর্ত্তনের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। তিনি সেই সভাতে যাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন পরীক্ষার ফলে তাহাই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ডেপুটি কলেক্টর, মুনসেফ, সদর আমিন, প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন, সাব অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন প্রভৃতির পদ মুক্ত করিয়া দিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড অকল্যাণ্ড সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সরকারী রিপোর্টে তাঁহাদের চরিত্র ও যোগ্যতা সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। Court of Requests (ছোট আদালত) উচ্চ পদের কার্য্য সম্মান ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে। তিনি বলেন এ সকল কার্য্যে সফলতা হইয়াছে তাহার কারণ উচ্চ বেতনের সহিত অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ কাউন্সিলে বা সদরবেঞ্চে স্থান না হউক, দেশীয়দিগের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর কিম্বা

অন্ততঃ জজের পদ মুক্ত করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বোচ্চ পদগুলি ব্রিটিশদিগের জন্য রাখা হউক, তবে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশীয় বুদ্ধি ও প্রতিভা পরিস্ফুট করুক। এই সূত্রে তিনি সনন্দের ৮৭ ধারার উল্লেখ করিয়া বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টই সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে এই মহাসভা যখন দেশীয়দিগকে যে কোন পদে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে তখন ভারতবাসীকে উচ্চপদে অনিয়োগের কারণ কি? তৎপরে তিনি (Leaden Hall Street বা) ডিরেক্টরদিগের নিয়োগ ব্যাপার সম্বন্ধে কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে ইহাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমুদয় সাধারণ বিভাগ নষ্ট করিতেছে; ইঁহারাই লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের অপকার করিয়াও বন্ধু, আত্মীয়, পোষিতবর্গকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ও প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ইংরাজ চরিত্রের কি এইরূপ ব্যবহার উপযুক্ত, যে জাতি সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা কি এইরূপ সংকীর্ণ ও অন্যায় প্রথা পোষণ করিবেন? যে জাতি তাঁহাদিগের উন্নত জ্ঞান, তাঁহাদিগের শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চপদগুলিতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্য না লইয়া একটী বিশাল রাজ্যশাসনের অন্যায় ব্যবস্থার কখনই প্রশ্রয় দিবেন না। তিনি অর্থনীতির দিক হইতে এ প্রসঙ্গে কিছু বলেন নাই, কিন্তু উহার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিলে অবশ্য এই বিষয়ের যৌক্তিকতা আরও সুস্পষ্ট হইবে। তাঁহার ন্যায় দ্রুত গঠিত বক্তৃতায় এরূপ অনেক বিষয়ই বাদ পড়িয়া যাওয়া সম্ভব যাহা হউক তিনি আশা করেন যে অন্য বক্তারা সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন। তারপর তিনি সুলিভ্যানের ন্যায়পরায়ণতার উল্লেখ করিয়া ভারতবাসীর পক্ষ হইতে মন্তব্যটির সমর্থন করেন। সভায় উহা একবাক্যে গৃহীত হয়।

চতুর্থ মন্তব্যটি (রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন ও চন্দ্রশেখর দেব উহার সমর্থন করেন। এই মন্তব্যে পূর্ব্ব মন্তব্যের সারাংশ লইয়া সুলিভ্যানকে একটি আবেদন প্রেরণ করা হয় ও তাঁহাকে অনুরোধ করা হয় যে সেই আবেদন প্রাপ্তির পর স্বত্বাধিকারী সভার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে যেন উহা প্রদত্ত হয়। অতঃপর রামগোপাল উঠিয়া বলেন যে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এ দেশীয় যোগ্যব্যক্তিদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ও প্রমাণ দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞ, সেইজন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের দ্বারা উক্ত আবেদন পাঠাইলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোর্ট অফ প্রোপ্রাইটার দিগের সহিত সরাসর কোন আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে পারেন না, সুতরাং আবেদনটি স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে না দিয়া সুলিভ্যানকে প্রেরিত হয়। তিনি বলেন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই এ দেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন অভিযোগ নাই। অভিযোগ নিয়োগ-প্রথা লইয়া, সেইজন্য ডিরেক্টারদিগের সহিত যুদ্ধ প্রয়োজন।

লর্ড টমসন ইহার আমূল সমর্থন করেন ও বলেন যে দেশীয়দিগকে চাকুরী হইতে বাদ দিবার কারণ এই যে, তাহারা অযোগ্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। চাকুরী দিবার ক্ষমতা থাকায় নিমিত্তই ডিরেক্টারদিগের পদ এত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়, আর সেই কারণেই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যে বলিয়াছেন যে ৮৭ ধারার কোন ফল পাওয়া যায় না, তাহা সত্য। সেই প্রথার পরিবর্ত্তনের জন্য নিয়ত আন্দোলনের প্রয়োজন, নতুবা তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রিয় যুবককে চাকুরী দিবার প্রলোভন কোন ডিরেক্টারই সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এই মন্তব্য অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তাহাতে রামগোপাল, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের অন্য সভ্য গ্রহণ করিবারও ক্ষমতা ছিল।

রামগোপালের সাধারণে ইহাই প্রথম বক্তৃতা। "বেঙ্গল হরকরা" পত্র ইহার প্রশংসা করেন, কিন্তু "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" বিরক্তি প্রকাশ করেন। মুসলমান ও ইংরেজ শাসনের তুলনাটি সম্পাদক মার্শম্যান একটু ভুল বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে মুসলমান শাসন যে ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ কথা বলা ও প্রাচীন কালের বিলাতী স্যাক্সন witena-gamot (বিজ্ঞসভা) নব্যযুগের পার্লামেণ্ট অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ, এ কথা উভয়ই সমান। রামগোপাল উভয় শাসন সময়ে উচ্চপদে দেশীয় নিয়োগ প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, শাসন প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রযুক্ত নহে, পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির যখন সৃষ্টি হয় তখন তিনি তাহা পুনরায় বুঝাইয়া দেন। তারপর "ভারতবন্ধু" বলেন যে উচ্চ ও বিশ্বাসযোগ্য পদের জন্য দেশীয়েরা এখনও উপযুক্ত হয় নাই, কোম্পানী ক্রমশঃ দেশীয়দিগকে উপযুক্ত পদ প্রদান করিবেন বলিয়া আশা দেন, তবে স্বীকার করেন যে "লিডেন হল ষ্ট্রীটে যে পদ নিয়োগ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং যাহার বিরুদ্ধে রামগোপাল বাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।" কিন্তু পদ নিয়োগের জন্য অবশ্য কাহাকেও রাখিতেই হইবে ; এ ভার যদি বিলাতে মন্ত্রীসভার হস্তে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও এ ক্ষমতা পার্লামেণ্টে ভোটের আনুকূল্য করিয়া তাঁহাদের দলের প্রতিষ্ঠা ও সুবিধার জন্য ব্যবহার করিবেন। আর তদানীন্তন দলটাকে উল্লেখ করিয়া বলেন যে কলিকাতাস্থ বাবুদিগের হস্তে দিলেও তাঁহারাও দেশের মঙ্গল ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব দিগকেই রাইটারশিপ (Writership) গুলি দিয়া ফেলিবেন। তখন সিভিলিয়ানদিগের চাকুরীর নাম Writership ছিল, তাহাদের নাম হইতেই (Writers buildings) রাইটারস্ বিলডিং নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত-বন্ধু বলেন, মানুষ এতই দুর্ব্বল যে এ বিষয়ে কোন সহজসাধ্য উপায় উদ্ভাবন করা দুরূহ। অবশ্য রামগোপাল বাবু যে প্রথা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন, তাহাতে এদেশে কতকগুলি নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তি আসিয়া পড়িয়াছে বটে, তবে সাধারণত এই প্রথার দ্বারা একটি সাধু, বুদ্ধিমান ও সম্মানিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক ১৮৫৩ খৃঃ যখন পুনরায় সনন্দ গৃহীত হয়, সেই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষার প্রবর্ত্তনে এই পদনিয়োগ প্রশ্নের নিরাকরণ হয়।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার উদ্দেশ্য এই সময় পরিবর্ত্তিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বে রাষ্ট্রীয় উন্নতি যে আন্দোলনের উপর নির্ভর করে ইহা রামগোপাল প্রথম হইতে বুঝিতে পারিয়া পত্রাদির দ্বারা বিলাতে ভারত সম্বন্ধে অভিমত গঠন, সংবাদ পত্র প্রচার, রাজনৈতিক সভার সৃষ্টি প্রভৃতি নানা উপায়ে ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে "হিন্দু পেট্রিয়টে" লিখিত হইয়াছিল "Full of English notions Babu Ram Gopal realised the truth that agitation was the soul of success in the political amelioration of a country, particularly under the British rule" বিদ্যানুশীলন ও আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে যে জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা এখন একটি নূতন সভায় পরিণত হইবার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার কার্য্য শেষ হইয়াছিল, রামগোপাল, তারাচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি অনুশীলনের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাই জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার ভিত্তির উপর দেশের মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। ইহাই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। এই সভাটি ঐ নামের বিলাতী সভার অনুকরণে গঠিত হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠান ও তজ্জনিত সাধারণ সমৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সুখ, দেশবাসীর, বিশেষতঃ বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ও তদানীন্তন সময়ের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রভৃতি নানা প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য এ সভাটির সৃষ্টি হয়। সর্ব্বদেশেই শিক্ষিত সম্প্রদায়, তুলনায় অশিক্ষিতের অপেক্ষা অল্প হইলেও তাহাদের চিত্ত মার্জ্জিত ও বুদ্ধি পরিণত, সেই জন্য তাহারাই দেশের প্রকৃত নায়ক, ইহারাই তাই নানা বিষয়ে অশিক্ষিতের শিক্ষাদান করে। দেশবাসী দেশের মঙ্গল চেষ্টা না করিলে দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নয়, আবার দেশের মঙ্গল একজনের দ্বারা সম্ভব হয় না, সমবেত শক্তির প্রয়োজন। সেই সমবেত শক্তি কেন্দ্রীকৃত করিয়া বাঙ্গালার সাধারণ লোকের হিতচেষ্টা প্রথম এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভ্যেরাই করেন, সেইজন্য ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় উন্নতির জাতীয়শিল্প গৃহে ইহার স্থান নিতান্ত সংকীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ইউরোপের অধিকাংশেই এক একটি প্রদেশে এক প্রকার ভাষাই প্রচলিত ছিল, যখন সেখানে নূতন প্রথায় শাসন হইয়াছে, দেশবাসী তখন তাহা সম্যক বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, আর সময় স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিপ্লব বা বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সম্মুখে পুরাতন ও নূতন প্রণালীগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুসময়ে যে শাসন প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধযুগে তাহা নানারূপে পরিণতি লাভ করিয়া যখন মুসলমান যুগে আসিয়া পড়িল তখন তাহার বিধি-নির্দ্দেশ, আইনকানুনের ভাষা এত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল যে নিরীহ প্রজা তাহা বুঝিতে সক্ষম হইল না। রীতি, নীতি আচার পদ্ধতি সকলই বদলাইয়া গেল। তাহারা শঙ্কিতচিত্তে সে ভাবের অর্থ উপলব্ধি করিবার আয়াস হইতে বিরত

হইয়া, আপনার ন্যায্য স্বত্ব করগ্রাহীর কঠোর হস্তে তুলিয়া দিল। তারপর চারিশত বৎসরের আবেষ্টনের দুর্নিবার্য্য প্রভাবে যাহা কিছু তাহাদের মনের উপর অঙ্কিত করিল, তাহা পুনরায় নূতন ভাষার নূতন প্রবর্ত্তনের সহিত, তাহাদিগের শঙ্কার মাত্রা ভয়ে পর্য্যবসিত করিয়া, এবার তাহাদিগকে দৃপ্ত করগ্রাহীর সম্মুখে একেবারে আসামীর কাট-গড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল। তাহারা বুঝিল না, কেহ তাহাদিগকে বুঝাইল না যে রাষ্ট্র বিপ্লবে তাহারা কি হারাইল, কি লাভ করিল। ভারতবাসী দেবতার গভীর মৌনের নীরব ভাষা বুঝে, কিন্তু দ্রুত উচ্চারিত নূতন ভাষা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। স্বদেশে তাহারা বিদেশীর অপেক্ষা যে অজ্ঞতা লাভ করিল, তাহা বোধ হয় মানব-ইতিহাসেও বিরল। প্রতি বার বিজাতীয় ভাষা জাতীয় অভিজ্ঞতার অন্তরায় হইয়া ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় জ্ঞান অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল। রাষ্ট্রীয় জ্ঞান না হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তি জাগরিত হয় না, ভারতবাসী তাই একেবারে আপনাকে আত্মবিস্মৃত হইল। নানা কারণের মধ্যে রাজভাষার অজ্ঞতা ও ভারতবাসীর সাধারণ শক্তির অভ্যুদয়ের একটি বিষম অচলায়তন। এই অবস্থায় ভারতবর্ষীয় কৃষক সম্প্রদায় নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লাঙ্গলের পশ্চাতে দেবতার দিকে মুখ তুলিয়া সিক্ত চক্ষে যুক্ত করে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের অবস্থা নব্যবঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছিল; সেইজন্য শুধু কর্ষণ নয়, যাহাতে অর্জ্জন ও সঞ্চয় হয়, যাহাতে তাহারা অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ই তুলনা করিয়া ভবিষ্যতে আপনারা উন্নত হইতে পারে সে বিষয়ে তাহারা চেষ্টা করেন। কোম্পানী তখনও সর্ব্বতোভাবে রাজ্যশাসন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেইজন্য কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা তাহাদিগকে জানাইয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্য বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি চেষ্টা করেন। বঙ্গদেশে দেশের কথা সাধারণ দেশবাসীকে জানাইবার জন্য ইহাই প্রথম সমবেত উদ্যোগ। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল এই সমিতির সৃষ্টি হয়।

ইহার প্রথম মন্তব্যে লিখিত ছিল যে সকলেরই দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি ও দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন, দ্বিতীয়টিতে একটি সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে সমিতিতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই ভারতবর্ষের উন্নতি ও বিট্রিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিষয়ে চেষ্টা করিবে। তৃতীয় মন্তব্যটির দ্বারা সমিতির নামকরণ হয়; প্রচলিত আইন অনুষ্ঠানাদি ও দেশের নানা সমৃদ্ধির মূল নির্ণয় ও ভারতবাসীর তদনীন্তন সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার, শান্তিপ্রদ ও আইন অনুমোদিত সর্ব্ববিধ উপায় দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন ও সর্ব্ব শ্রেণীর ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী ও স্বত্ব বৃদ্ধি করা, এইগুলি সমিতির উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

চতুর্থ মন্তব্যটি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সুলিভ্যানের ধন্যবাদ সভায় রামগোপাল তদনীন্তন সময়ে পদনিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক সমালোচনা হয়; এই মন্তব্যটির প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি

সেই অন্তায় সমালোচনা বন্ধ করেন। মন্তব্যটি এইরূপ ছিল ;—যাহাতে ব্রিটিশ্ রাজ ও রাজপ্রতিনিধি-বর্গের প্রতি আমাদের ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে ও যাহাতে দেশস্থ আইন-কানুন মানিয়া চলা যায়, এরূপ কার্য্যের ভার সমিতি গ্রহণ করিবে বা অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবে। রামগোপাল বলেন যে দু'এক দিবস মধ্যে তিনি ও তাঁহার সহযোগীদিগের সম্বন্ধে ইংরেজরাজ প্রতি রাজভক্তি বিষয়ে যে অযথা বিবরণ প্রচারিত হইয়াছে সেই কারণে এই মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে মুসলমান ও ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তবে মুসলমানেরা যে দেশীয়দিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেন, তাহা যে তাঁহাদিগের উদারতার পরিচায়ক ইহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন ; যাহা হউক প্রথম হইতেই রাজভক্তি প্রকাশ ও প্রচলিত আইনাদি মানিয়া চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা উত্তম। তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজভক্তি ও দেশের মঙ্গলের জন্য আইন অনুমোদিত ও শান্তিপ্রদ কার্য্য সম্পূর্ণ একত্রে সম্ভব। তিনি কল্যাণকর সংস্কারের বন্ধু, কিন্তু ব্রিটিশ প্রাধান্যের একান্ত অনুরক্ত সুহৃদ, আর এমন ঘটনা যদি ঘটে যদ্দারা দেশবাসী ও ব্রিটিশরাজের সহিত সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা তিনি বিশেষ আক্ষেপের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

পঞ্চম মন্তব্যটি এইরূপ ছিল ঃ—ছাত্র ভিন্ন যে কোন পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি যিনি উক্ত সমিতিতে চাঁদা দিবেন ও উপর্য্যুক্ত মূল নিয়মগুলি যথোচিতরূপে পালন করিবেন তিনিই সভ্য হইবার অধিকারী। প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার প্রবর্ত্তন করেন। রামগোপাল ইহার সমর্থন করেন ও বলেন যে ছাত্রদিগকে এই সভার সভ্য হইতে নিবারণ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্যই তিনি ইহার সমর্থন করেন! হিন্দু ও মেডিকেল কলেজে এমন অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র আছে যাহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দসহকারে তিনি শিক্ষালাভ করিতে প্রস্তুত; তথাপি তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করেন যে অধুনা দুটি বিশেষ কারণে এই সভার কার্য্যের দায়িত্ব হইতে ও সভার কার্য্যাদি হইতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ছাত্ররূপে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে তথাকার অমূল্য শিক্ষালাভের জন্য তাহাদের সমস্ত সময় নিয়োগ করা প্রয়োজন ; এককালে বিদ্যালয় ও এই সমিতির উভয়েরই ন্যায্য কর্ত্তব্য সাধন করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, সভার প্রকৃতি অনুসারে অনেক সময়ে তদানীন্তন শাসন অভিমতের অল্পবিস্তর বিরুদ্ধে অনেক কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে, সেই সময়ে গভর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে যাহারা অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হইতেছে, হয় তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে, না হয় তাহাদিগকে সে সময়ে সভা ত্যাগ করিতে হইবে। তখন গভর্ণমেণ্ট কলেজে যাহারা পড়িতেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের সহিতই তাঁহার বিশেষ পরিচয় থাকার নিমিত্ত অনেকেই তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল। তিনি ছাত্রদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত উক্ত মন্তব্যটি এরূপ আকারে গ্রহণ করিবার জন্য সমর্থন করেন, ও ভরসা করেন, এই বিশিষ্ট কারণে সকলেই ইহার উপযুক্ত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহার ন্যায্য আবশ্যকতা

উপলব্ধি করিবেন। রামগোপাল তখন শিক্ষিত সমাজের অধিনায়ক। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রামগোপাল তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের "এজুরাজ" (uncrowned king)।" 'এজু' কথাটি educated (শিক্ষিত) ইহারই সংক্ষেপ মাত্র।

এই সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হইতে থাকে। ইহাতে জর্জ টমসন কতকগুলি তেজোপূর্ণ বক্তৃতা করেন, সে গুলি ভারতে রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রথম সামগান। এই শাসন-প্রণালী-সম্মত (constitutional) প্রথম আন্দোলনে ডিরোজিওর যুবক ছাত্রদল সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়া আবেষ্টনটিকে দেশাত্মবোধের নূতন আলোকে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "জর্জ টমসন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজিওর শিষ্যদল তাঁহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টমসনের ও রামগোপালের রব বজ্রনির্ঘোষে উত্থিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন শ্রীরামপুরস্থ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' একবার লিখিলেন "এখন দুইদিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে।" 'ভারতবন্ধু' অবসর পাইলেই এই ক্ষুদ্র দলটির প্রতি ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িতেন না। এই সময়ে 'ফিল্ড' নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র কলিকাতা সমাজের প্রিয় ছিল, ইহার সম্পাদক ব্যারিষ্টার হিউম লেখনী চালনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেন। "ফিল্ডে" এই সমিতির সভ্যদিগের প্রতি প্রায়ই বিদ্রূপ বর্ষিত হইত, কিন্তু বিদ্রূপস্থলেও হিউম রামগোপালকে "the mighty Ramgopal" (প্রভূত শক্তিশালী রামগোপাল) বলিয়া বিশেষিত করিতেন।

সেই বৎসর জুন মাসের প্রথমে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সমীপে দিল্লীর বাদসাহের অভিযোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য জর্জ টমসন সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতন ও পাথেয় লইয়া কলিকাতা হইতে দিল্লী, পরে দিল্লী হইতে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ইহাতে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভ্যেরা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বরং বিপুল উদ্যমে তাঁহাদের নূতন অনুষ্ঠানে মনোযোগ দেন। এই সময় হইতে রাজনৈতিক সমস্ত বিষয়েই সভাটি সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠিল। রামগোপাল ইহার মুখ্যপাত্র হইয়া দেশাত্মবোধ ও মঙ্গলের পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে লাগিলেন।

'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র নানা কার্য্যের মধ্যে কতকগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন পাস হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালতে জজেরা কি ভাষায় রায় দিবেন, সামান্য চুরির অপরাধে শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা প্রভৃতি আইন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া এই সভার মন্তব্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। কলিকাতা ও সুয়েজ (Suez) যোজক এই দুই স্থানের সহিত সরাসর ষ্টিমার চালনার জন্য বিলাতে হাউস অব্ কমান্সের নিকট ও প্রস্তাবিত ছোট আদালতের সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে লিখিত ৮৭ ধারা

অনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তজ্জন্য কলিকাতাবাসী গৃহস্থদিগের দ্বারা যে আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল তাহার সমর্থন করিয়া এ দেশীয় শাসনে দেশীয়দিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ ও মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকার মুখবন্ধে মুসলমান সময়ে হিন্দুরা কোন্-কোন্ উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহার বিবরণ ও কোম্পানির সময়ে তাহারা কোন কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অধিকারী তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন পল্লীগ্রামে বিস্তর ভদ্রলোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমিতি ইহার কোন উত্তর পায় নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে বহু বিবাহের বিপক্ষে আলোচনা ও বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে অভিমত সংগৃহীত হইত। রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সভা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি করে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা শাস্ত্রীয় যুক্তি সংগ্রহ করিয়া ইহার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য ইহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পূর্ব্বে। স্ত্রীশিক্ষার পোষকতা করিয়া এই সমিতি কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করে। ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সমিতির কার্য্য বিবরণী হইতে উপর্য্যুক্ত বিষয় গৃহীত হইল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা পুলিস কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। Patton এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমরা এ পুলিস কমিটির রিপোর্ট দেখিতে পাই নাই। আমরা শুনিয়াছি রামগোপালের সহিত কমিটির মতদ্বৈধ হয়। পুলিশ কমিটি হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামগোপাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ পদ হইতে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন। সমিতির সৃষ্টি হইতে থিওবল্ড্ (Theobald) সাহেব এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নূতন সভাপতি নির্ব্বাচনে "বেঙ্গল হরকরা" পত্র সভাকে প্রশংসা করিয়া এই সূত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বোর্ডের চাকুরী ও রাজা রামমোহন রায়ের সেরেস্তাদারীর উপর কটাক্ষ করেন। "ভারতবন্ধু" এই সময়ে ২৭শে নভেম্বর তারিখের পত্রে লিখেন "রামগোপাল বোর্ডের চাকুরী বা সেরেস্তাদারী না করিয়া সম্মানজনক ও স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি একটি সমৃদ্ধিশালী সদাগর কুটির ইংরাজ অংশীদারগণের অন্যতম; তিনি শিক্ষা প্রচার ও তাহার উন্নতির পরিপোষক ও বন্ধু। আরও তিনি পরিশ্রমী ও সুরুচিসম্পন্ন, সেই জন্য আশা করেন যে রামগোপাল এই সমিতির কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

নীলমণি

কবে যশোদার মাতৃ-অঙ্ক ভরি
গভীর স্নেহের পাশে
দিয়েছিলে ধরা নীলমণি-রূপ ধরি
কি যে লীলা-অভিলাষে।
হয়ত তখন গোকুলের গোঠে খেলি
তব সাথী হয়ে আমিও করেছি কেলি,
তোমারে পেয়েছি হয়ত এবাহু মেলি
সখ্য-সরস-হাসে।
গভীর স্নেহের পাশে।
হয়ত তখন ছিলনা আকাশ নীল
শুধু ছিল আলো-রাশি,
সারাটা শূন্য ঝলিত গো ঝিল্‌মিল্‌
দশদিক উদ্ভাসি'।
দ্যুলোক গোলোক ছিল সব কাছাকাছি,
নর দেবতায় একঠাঁই যেত নাচি,
তোমার পরশে মৃত সখাগণ বাঁচি
পুন বাজাইত বাঁশী,
শুধু ছিল আলোরাশি।
তার পর হায়, লীলা তব সম্বরি'
কোথা চলে গেল দূরে,
তোমার আভাস শুধু এ বিশ্ব'পরি
বাজে বিরহের সুরে।
নিজ তনু হতে শুধু নীল রঙ্‌ ছাঁকি
আকাশে সাগরে গিয়াছ ছড়ায়ে রাখি,
নিজেরে হারায়ে মহারহস্য আঁকি
লুকালে সৃষ্টি জুড়ে।
কোথা চলে গেলে দূরে।

তুমি কোথা আর আজ কোথা আছি আমি,
পথ নাহি পাই খুঁজি,
আকাশে সাগরে চেয়ে রই দিবাযামী,
কি যে বুঝি নাহি বুঝি।
আজি এ সাগর এ যে নীল মরুভূমি
ধূ ধূ ধূ অকূল খেলে দিগন্ত চুমি,
এর মাঝে বুঝি ছায়াময় আছো তুমি,
শুধু নীল রঙ্‌ পুঁজি।
পথ নাহি পাই খুঁজি।
ওই যে আকাশ গম্ভীর সীমহারা,
ওযে নীল মরীচিকা,
নয়ন আমার ছুটে ছুটে হয় সারা;
নির্ম্মম প্রহেলিকা।
দ্যুলোক গোলোক কোথায় গিয়াছে চলি,
সব সন্ধান, সব জিজ্ঞাসা ছলি,
শুধু গ্রহতারা গুমরিয়া মরে জ্বলি
অর্থবিহীন শিখা।
ওযে নীল মরীচিকা।
হে নীলমাণিক, এমনি করিয়া মোরে
দিলে নিষ্ঠুর ফাঁকি,
উপরে নিম্নে অসীম নীলিমা-ঘোরে
আমারে ফেলেছো ঢাকি।
আজিকে তোমারে বক্ষে ধরিতে গিয়া
হাহাকার করি শুধু লুটি মুরছিয়া,
জীবন গোষ্ঠে একাকী শূন্য-হিয়া
সারাদেহে ধূলি মাখি।
তুমি দিয়া গেছো ফাঁকি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

সংস্কৃত-ভাষা-বিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব

ভারতবর্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি। প্রাচীন যুগে ভারতীয় মনীষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় আর্য্যপ্রতিভার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অভিনিবেশ, চিন্তাশীলতা, এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসার বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকি; তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, সাধনা এবং সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা অনায়াসেই নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব ও অসারতা উপলব্ধি করিতে পারি। বিশ্বতোমুখী প্রতিভার বলে তাঁহারা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের বহু গূঢ় রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। পদার্থের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য প্রতিভা-প্রদীপ্ত প্রাচ্য পণ্ডিতগণ যে প্রকার প্রগাঢ় অভিনিবেশ দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালীতে যে নবপ্রবাহ আনিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের বহু সূক্ষ্ম বিষয় বর্ত্তমানযুগে ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন জীবেরও আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে।

ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগ হইতে বহু চর্চ্চা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে "শব্দ-ব্রহ্মবাদ", "প্রণব-তত্ত্ব", "শব্দ-বিবর্ত্তরূপে জগতের সৃষ্টি", "নাম ও রূপের দ্বারা পদার্থনিচয়ের বিভাগ" প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে; শাব্দিকগণ 'শব্দের স্বরূপ' 'শব্দের উৎপত্তি', 'শব্দার্থ-সম্বন্ধ', 'নিত্য ও কার্য্যভেদে শব্দের বৈবিধ্য', "আজানিক ও আধুনিক-সঙ্কেত', 'শাব্দ-বোধ' এবং 'শব্দের শক্তি" প্রভৃতি শব্দশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও মূল সূত্রগুলি ধরিয়া যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিকগণও "শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার", 'শব্দের ক্ষণিকত্ব ও আকাশগুণত্ব', 'বীচিতরঙ্গ' বা "কদম্বকোরক" ন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি, "শব্দের শক্তি" ও 'স্ফোটবাদ' প্রভৃতি বিষয়ে আপনাদের অসাধারণ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রকারে সংস্কৃত ভাষায় শব্দতত্ত্ব বিষয়ে বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী ভারতবর্ষের এই গৌরবের কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে প্রাচীন ভারতে ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্বসম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলন হয় নাই। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান-বিদ্গণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন মিশর ও গ্রীস্ দেশেই প্রথমতঃ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কেবল ভাষাবিজ্ঞানের কথা বলি কেন, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও বিদেশীয়গণ নানাপ্রকার অযথা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ভাষাবিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আর্য্য দার্শনিক এবং বৈয়াকরণগণ কতদূর চিন্তা করিয়াছেন, এবং নানাপ্রকার মতের পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

বাক্‌শক্তি :—সর্ব্বনিয়ন্তা মানুষকে মনন, গতি, ধারণা ও বাক্ প্রভৃতি যত প্রকার

শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে দেখিতে গেলে "বাক্‌শক্তিই" সর্ব্বপ্রধান। বাক্‌শক্তির প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সরল কথায় বলিব যে, বাক্‌শক্তির অধিকারই মানুষকে ইতর জীবের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে। উপনিষদে প্রাণ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে* যেহেতু বাক্‌শক্তিহীন হইয়াও মূকগণ প্রাণশক্তির বলেই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়। আমরা কিন্তু বলিব যে, কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য বা চরিতার্থতা নহে; মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া যদি পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করিতে না পারিল, তবে তাহার মননশীল মনুষ্য হইবার সার্থকতা কোথায়? জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের হৃদয়ে যেই সকল ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, বিশ্বের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মানুষের মনে যেই আনন্দের সঞ্চার হয়—তাহা যদি ভাবপ্রকাশের অনুকূল শব্দের মধ্য দিয়া নিজকে অভিব্যক্ত করিতে না পারিত, তবে নিশ্চয়ই মানুষের চিন্তা করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়া যাইত; সুখদুঃখ বা হর্ষবিষাদের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের চিত্তবৃত্তির বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইত না এবং তাহার সৌন্দর্য্য বা রস উপভোগ করিবার সামর্থ্যও বোধ হয় অন্তর্হিত হইত। মনুষ্যজগৎ বাক্‌শক্তিহীন হইলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ কখনই সম্ভব হইত না। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, বাক্‌শক্তিই মানুষকে কবি, গায়ক, সাধক, ও প্রেমিক হইবার অনন্যসাধারণ অধিকার দিয়াছে। মন্ত্র, স্তুতি, কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি শব্দ-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়াই আমাদের কর্ণকুহরে মধুধারা বর্ষণ করে। বেদের যে সামগান ছন্দ, তাল ও লয়যোগে উদাত্তাদি স্বরে উচ্চারিত হইয়া প্রাচীন ভারতের পবিত্র আশ্রমগুলিকে একদিন মুখরিত করিত, তাহাও "মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশি" ভিন্ন আর কিছুই নয়; যেই ভক্তিরসাত্মক স্তুতিগান শ্রবণ করিয়া ভক্তের কোমলহৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়, তাহাও "শব্দসমষ্টি" মাত্র; বিশ্বের সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া কবিগণ শ্লোকমালা গ্রথিত করিয়া যেই অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিয়া থাকেন—তাহাও সুললিত শব্দরাশির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, বাক্‌শক্তি-প্রভাবেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাক্‌শক্তি বা শব্দ ব্যবহারের দ্বারায় ভাব অভিব্যক্ত করিবার যোগ্যতা মানুষের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করিয়াছে। শ্রুতি বলেন†,—পরম পুরুষের মুখনির্গত বাক্য হইতেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে; অমৃত বা মরণশীল পদার্থ মাত্রই শব্দের পরিণাম। বাক্‌শক্তি প্রভাবেই মানুষ অর্থনির্ণয় করিতে পারে, অন্যের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে। পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার কেমন করিয়া শব্দে উপনিবদ্ধ আছে তাহা ঐতরেয় আরণ্যকে‡ একটী রূপকের দ্বারা অতি

* প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ—ছান্দোগ্য, ৫, ১,

† "বাগেব বিশ্বা ভুবনানিজজ্ঞে"—

‡ বাক্‌তন্তির্নামানি দামানি—১-১-৬

সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে ;—"বাক্যরূপ তন্ত্রি ও নাম বা সংজ্ঞারূপ রজ্জু দ্বারা এই বিশ্বজগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।" বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি এই শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—সকল প্রকারের অর্থই সূক্ষ্মরূপে বাক্যে বা শব্দে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, * ইহাই লৌকিক জগতে শব্দ ও অর্থ বা বাচ্যবাচকরূপে বিভিন্নাকার ধারণ করে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, "বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপের সাহায্যেই ভগবান্ জাগতিক পদার্থনিচয়কে বিভক্ত করিয়াছেন" †। স্বরূপলক্ষণান্বিত নামরূপোপাধিবর্জ্জিত এক অখণ্ড, অদ্বয়, পরব্রহ্ম হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সিসৃক্ষা প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি নিজ ইচ্ছা বলে এক হইয়াও বহুরূপে নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য ‡। এক হইতে বহুর সৃষ্টি কেমন করিয়া সম্ভব হইল ? পদার্থ মাত্রের একটি স্বতন্ত্র রূপ বা আকৃতি এবং একটি স্বতন্ত্র নাম বা সংজ্ঞা আছে, যাহা দ্বারা ইহাকে তদিতর পদার্থ হইতে আমরা অনায়াসেই পৃথক্ করিতে পারি। পদার্থসমূহের পরস্পর বিভিন্নতার কারণ তাহাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ বিভিন্ন রূপ ও সংজ্ঞা ; রূপ ও নামের উচ্ছেদ হইলে বহুত্ব ঘুচিয়া একত্বেই পর্য্যবসান হইবে। বহুত্ব মায়া কল্পিত, একত্বই প্রকৃত সত্য। এখন, যে নামের দ্বারা আমাদের প্রতি পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান হয় উহা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কাজেই বাক্যপদীয়কার বলিয়াছেন যে, শব্দের দ্বারা সংজ্ঞা ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে বিশ্বসংসার একটি দুর্জ্ঞেয়, দুর্ব্বোধ্য ও অনভিধেয় পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, ব্যষ্টিভাবে কোন বস্তু বিষয়েই আমাদের পূর্ণজ্ঞান হইত না। একজাতীয় পদার্থের মধ্যেও যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হয় তাহার কারণ এই যে, প্রতি বস্তুই বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারায় ব্যপদিষ্ট বা অভিহিত হইয়া থাকে। হস্তসঞ্চালন, অক্ষিনিকোচ ও মুখভঙ্গী প্রভৃতি কায়িক প্রযত্নের দ্বারায় কোন কোনও ভাব সাধারণতঃ অভিব্যক্ত হইতে পারিলেও বস্তুর সংজ্ঞানির্দ্দেশ বা নামকরণ লৌকিকজগতে কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যেই যে কেন করা হয় তাহার সুস্পষ্ট কারণও ভারতের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আশঙ্কা করিয়া মহামুনি যাস্ক তদীয় নিরুক্তগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "যতপ্রকার § উপায়ে মনের ভাবপ্রকাশ করা যায়, তাহার মধ্যে শব্দ ব্যবহারই লঘুতম বা স্বল্পায়াস-সাধ্য উপায় ; এ জন্যই মনুষ্যলোকে ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল করসঞ্চালনাদি শারীরিক উপায় অবলম্বিত না হইয়া কেবলমাত্র শব্দের দ্বারাই পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়।" প্রত্যক্ষ দেখিতে গেলে অতি অল্পসংখ্যক ভাব বা পদার্থই আমরা করসঞ্চালনাদি শারীর চেষ্টার সাহায্যে অন্যের নিকট যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে পারি। আবার সে উপায়ে যাহা ব্যক্ত করিতে পারি তাহাও এত অস্পষ্ট ও ভ্রান্তি-জনক হয় যে, অনেক সময়েই শব্দ ব্যবহারের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধ হয় না।

---

* অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে—বাক্যপদীয় ১-১২৪

† নামরূপে ব্যাকরোৎ—

‡ তদৈক্ষত, একোঽহংবহুস্যাংপ্রজায়েয়—

§ অনীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে—নিরুক্ত—১-৫-১।

শব্দের স্বরূপঃ—প্রথমে শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করিয়া পরে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি এবং শব্দাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতানুসারে বিশদরূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব। মনুষ্য মাত্রের শব্দব্যবহার করিবার সহজ সামর্থ্য আছে বলিয়া শব্দের স্বরূপাবধারণের জন্য আমাদের মনে প্রশ্নের উদয় হয় না। জঠরাগ্নির দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য কি প্রকারে পরিপাক লাভ করে তাহা সম্যক্ না জানিলেও যেরূপ আমাদের পরিপাক ক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ শব্দ-তত্ত্ব যথার্থরূপে না জানিলেও বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহারে বা শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আমাদের কোনও গুরুতর বাধা উপস্থিত হয় না। শব্দের প্রকৃত স্বরূপ কি? শব্দ বলিতে আমরা কোন্ জিনিষটি বুঝিয়া থাকি? ভগবান্ পতঞ্জলি শব্দের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি হইতে শব্দ যে একটি স্বতন্ত্র বস্তু তাহা প্রতিপাদন করিয়া পরিশেষে "ধ্বনি"কেই শব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* তাঁহার মতে অর্থের প্রতীতিজনক ধ্বনিই শব্দ। সকল ধ্বনির শব্দ-সংজ্ঞা হয় না; যে সকল ধ্বনির অর্থপ্রত্যায়ন বিষয়ে যোগ্যতা বা সামর্থ্য আছে, কেবল তাহারাই লৌকিক জগতে শব্দ-শব্দবাচ্য। নৈয়ায়িকগণের মতে ধ্বনি ও বর্ণভেদে শব্দ দ্বিবিধ।† তন্মধ্যে কণ্ঠতালু প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণস্থান সমূহে অভিঘাতজনিত বর্ণবিশেষাত্মক ধ্বনিই প্রকৃত শব্দ। যাহা শঙ্খমৃদঙ্গাদির অভিঘাত হইতে উৎপন্ন হয় তাহা শুদ্ধ ধ্বনি; তাহাতে বর্ণ বিশেষের জ্ঞান বা অর্থবোধ হয় না। তাঁহারা শব্দকে শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশের গুণবিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমিতির ন্যায় শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও (উচ্চারণের পরক্ষণেই বিনষ্ট হয় বলিয়া) যুক্তিতর্কের বলে শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, শব্দের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই; শব্দ চিরন্তন ও নিয়ত স্থিতিশীল। অনিত্য বস্তুর যে দুইটি ধর্ম্ম (অর্থাৎ "উৎপত্তি" ও "বিনাশ") দেখিয়া নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, মীমাংসকগণ সেই উৎপত্তি ও বিনাশকে যথাক্রমে "অভিব্যক্তি" ও "অভিব্যঞ্জক কারণের অভাব" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'নিত্য' পদার্থের লক্ষণ এইযে, তাহা‡ কোনও 'কারণ' হইতে উৎপন্ন হয় না এবং তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব কখনও বিনষ্ট হয় না। মীমাংসক-সিদ্ধান্তেও শব্দের কারণ বা নাশ নাই; শব্দ স্বতঃসিদ্ধ, কার্য্য বা নাশ্য বস্তুর ধর্ম্ম ইহাতে নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে যেমন গৃহস্থিত ঘটপটাদি দ্রব্যের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু দীপালোক আনয়ন করিলেই সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ আমাদের মধ্যে শব্দ বা ধ্বনি নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও অভিব্যঞ্জক কারণের (অর্থাৎ বর্ণোচ্চারণের জন্য কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাত রূপ ব্যাপারের) অভাব

---

* তস্মাৎ ধ্বনিরেব শব্দঃ—মহাভাষ্য—১-১-১।

† "শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

‡ "সদকারণবন্নিত্যম্"—বৈশেষিক সূত্র।

বশতঃ শব্দের সর্ব্বদা শ্রবণ হয় না। কিন্তু বিবক্ষা বশে, যখনই বাগিন্দ্রিয়ে ব্যাপার বিশেষের উৎপত্তি হয়, তখনই শব্দের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। 'শব্দের নিত্যত্ব' মীমাংসা দর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য,—এই ভিত্তির উপরেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদক, আস্তিক দর্শনের প্রধান উপজীব্য, আর্য্যদিগের পরম শ্রদ্ধার বস্তু ও বিদ্যার অক্ষয় ভাণ্ডার—বেদের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া যাজ্ঞিক মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনিত্য বস্তু কখনই দৃঢ় প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না, পক্ষান্তরে নিত্য পদার্থই সর্ব্বত্র অখণ্ডনীয় প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্ট* বলিয়াছেন যে, বেদের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই এত যত্ন ও বিচার করিয়া মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। শব্দ নিত্য না হইলে, মন্ত্র-ব্রাহ্মণরূপ শব্দময়ী শ্রুতি কখনই নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিত না। প্রতিভার অবতার পতঞ্জলি শব্দকে 'ধ্বনি'মাত্র বলিয়াই বিরত হন নাই। ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি দার্শনিকতা বা সূক্ষ্মচিন্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কার্য্য ও নিত্যভেদে তিনি শব্দের দুই প্রকার 'রূপ' কল্পনা করিয়াছেন।† ধ্বনি বলিতে আমরা সাধারণতঃ কার্য্য-শব্দই বুঝিয়া থাকি এবং ব্যবহারিক জগতে কার্য্য-শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে; কার্য্য বা জন্যশব্দ উচ্চারণ স্থান হইতে উদ্ভূত হয় এবং বর্ণবিশেষের দ্বারায় স্থূলাকার পরিগ্রহ করিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়। এই স্থূলভূত কার্য্য-শব্দ বা ধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ স্ফোট বা নিত্য-শব্দের আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যাকরণ-দর্শনেই স্ফোটবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দার্শনিকগণ বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, বরং উহা খণ্ডন করিবার জন্যই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পতঞ্জলি প্রভৃতি 'সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র' বৈয়াকরণগণ নিত্যশব্দ বলিতে যেই অশ্রুতপূর্ব্ব স্ফোটের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার যথার্থ স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিতে হইলে স্ফোটবাদের বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। আমরা এখানে স্ফোট-লক্ষণ সামান্য ভাবেই পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব; সময়ান্তরে স্ফোটবাদের স্থাপন ও খণ্ডন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বিশদভাবে বলিবার চেষ্টা করিব। শব্দের দুইটি রূপ আছে—বাহ্য ও আভ্যন্তর; 'কার্য্য'শব্দ বাহ্য অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। নিত্যশব্দ দেহাভ্যন্তরস্থ, অতি সূক্ষ্ম এবং অনুমানগম্য। কুলকুণ্ডলিনীরূপে যেই চিৎশক্তি জীবদেহের মূলাধার চক্রে নিয়ত বিরাজ করে, সেই মূলাধার চক্রই নিত্য-শব্দের অখণ্ড ও অব্যয় আশ্রয়। প্রণব-ধ্বনিরূপে সেখানে সর্ব্বদাই শব্দের স্ফূরণ হইতেছে এবং এই সূক্ষ্ম নাদ বিন্দুই ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া কণ্ঠতালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানে

* তস্মাদ্বেদপ্রমাণার্থং নিত্যত্বমিহ সাধ্যতে—শ্লোকবার্ত্তিক

† ইহ দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ।

আহত হইয়া নানাবিধ বর্ণে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শব্দাভিব্যক্তি সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রন্থে এইরূপ আছে*—আত্মা বুদ্ধির দ্বারায় অর্থাবধারণ করিয়া অন্তঃকরণে সমুৎপন্ন ভাবগুলিকে প্রকাশ করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করেন। বিবক্ষাপ্রবণ মন দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নিতে আঘাত করে,বা স্পন্দন জন্মায়, উহা দ্বারা প্রেরিত এই বায়ুই নিম্নপ্রদেশ হইতে শরীরের উর্দ্ধভাগে উত্থিত হইয়া, কণ্ঠতালু প্রভৃতি বর্ণোচ্চারণ স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক,খ প্রভৃতি ভিন্ন .ভিন্ন বর্ণের আকার ধারণ করে। এখন আমরা দেখিতে পাই যে, কেবলমাত্র উচ্চারণ স্থান সমূহেই শব্দের উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি হয় না। বস্তুতঃ শব্দের সূক্ষ্মবীজ শরীরাভ্যন্তর হইতে আসিয়া থাকে। কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থান সকল তাহার অভিব্যঞ্জক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে পদার্থের উৎপাদক কারণ এবং অভিব্যঞ্জকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে; শব্দের চরম কারণ সূক্ষ্ম, অনাহত নাদবিন্দু. ইহা যোগিগণ সংবেদ্য এবং স্বপ্রকাশ হইলেও উহার স্থূলরূপ ধ্বনি বিশেষের দ্বারায়ই বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন†—বাহ্য জগতে অর্থের সহিত 'অবিভক্ত' এই সূক্ষ্ম নাদাত্মক শব্দই প্রকটিত হইয়া থাকে। শব্দ চিচ্ছক্তির বাহ্য আবরণমাত্র; অন্তঃ-সন্নিবিষ্ট চৈতন্যই অন্যের নিকট ভাবাভিব্যক্তির সময় শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আন্তর জ্ঞান বা চৈতন্যই যে কেমন করিয়া স্থূলরূপে পরিণত হয় ও শব্দের আকার ধারণ করে, সেই কথা 'বাক্যপদীয়কার' বিশেষভাবে বলিয়াছেন। বাহ্যধ্বনির অব্যক্ত কারণরূপী এই 'চিন্ময়' শব্দকেই শাব্দিকগণ "স্ফোট" আখ্যা দিয়াছেন। সকল প্রকারের অর্থ ইহা হইতে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়াই ইহার "স্ফোট" সংজ্ঞা। "চত্বারি বাক্‌পরিমিতাপদানি"‡ এই শ্রুতিতেও যেই চারি প্রকার বাক্যের উল্লেখ আছে, শব্দাভিব্যক্তির প্রক্রিয়াবর্ণন প্রসঙ্গে শাব্দিকগণ উহাকে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে একই নাদ-বিন্দুর বিভিন্ন ক্রম বা অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, ও বৈখরী নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রণিধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আন্তর বায়ুরূপে শরীরাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম শব্দ বীজই শারীর প্রযত্নের দ্বারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বস্থা ত্যাগ করিয়া, স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া, অবশেষে কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাতবশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য 'শব্দ'রূপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, ও বৈখরী এই চারি প্রকার শব্দই পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সেই এক, অবিনাশী, চিরস্থির 'নাদ বিন্দু'র বাহ্য অভিব্যক্তির ক্রম চতুষ্টয় মাত্র। এই জন্যই ভগবান্ পতঞ্জলি, নিত্য শব্দের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য, বলিয়াছেন,—"নিত্যশব্দ

* 'আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া। মনঃ কায়াগ্নি মাহন্তি সঃ প্রেরয়তি মারুতম্' ॥

† সূক্ষ্মামর্থেনাপ্রবিভক্ততত্ত্বামেকাং বাচ মভিষ্যন্দমানাম্—

‡ "চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি, তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি"—ঋগ্বেদ—

কূটস্থ, নিশ্চল, বিকারবর্জ্জিত, উৎপত্তি ও বিনাশরহিত" ইত্যাদি। এই 'নিত্য' শব্দ বা স্ফোটই সকল শব্দের মূলপ্রকৃতি; তন্ত্রান্তরে ইহাকেই বিভিন্নভাবে বলা হইয়াছে—ওঁকার মেবেদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতি দ্বারায় প্রণবকেই বিশ্বসংসারের প্রসূতি বলা হইয়াছে; বেদাদি শাস্ত্ররাশি গায়ত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গায়ত্রী আবার প্রণব হইতে সত্তালাভ করিয়াছে—এই প্রকারে সমুদয় বাঙ্‌ময় জগৎই সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে প্রণবের পরিণতিমাত্র। তান্ত্রিকমতে অকারাদি ক্ষকারান্ত সকল 'মাতৃকাবর্ণ'ই শক্তির কলা। প্রকৃতিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমানা শক্তিই বর্ণরাশির মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই জন্যই তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে বর্ণাত্মক বীজমন্ত্রের জপ ও সাধনাই মোক্ষ বা পরমপদ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শব্দাত্মক বীজমন্ত্রের রূপ ও অক্ষর-ভাবনা কেবলমাত্র তন্ত্রাদি শাস্ত্রেই যে উক্ত হইয়াছে তাহা নয়। উপনিষদে আমরা "শব্দ ব্রহ্মোপাসনা", "উদগাথোপাসনা"র কথা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। হিন্দুগণ শব্দকে ইন্দ্রিয়াভিঘাত-জনিত ক্ষণস্থায়ী, অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা শব্দকে ভগবানের সাক্ষাৎ 'প্রতীক' বলিয়া নিষ্ঠার সহিত একাগ্রচিত্তে 'প্রণব' বা অন্যান্য শব্দাত্মক বীজমন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। যোগদর্শনে প্রণবকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 'বাচক'* বলিয়া বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মপ্রতীক, উপাস্য, ধ্যেয় ও যোগজ-সমাধিজ্ঞেয়, নিত্যশব্দই "স্ফোট"। স্ফোট অখণ্ড ও অক্রম; শব্দান্তর্নিবিষ্ট বর্ণ সকলের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম আছে, তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু, স্ফোট সর্ব্বদাই অবিকৃত প্রকৃতি, অজ ও অব্যয়। ব্রহ্মে যেই সকল বিশেষণের প্রয়োগ হইয়া থাকে, ব্রহ্মও স্ফোটের তাদাত্ম্যবশতঃ অরূপ, অদ্বয়, অখণ্ড, অব্যয়াদি সমস্ত লক্ষণই স্ফোট সম্বন্ধেও যথাযথ প্রযুক্ত হইতে পারে। শব্দের বাহ্যাবয়ব ধ্বনি এবং আন্তররূপ স্ফোট। ইন্দ্রিয়দ্বারা ধ্বনির গ্রহণ হইয়া থাকে কিন্তু তদ্দারা স্ফোটের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় না। উচ্চারিত স্থূল শব্দ কেবলমাত্র তাহার আভাস দিতে পারে। বৈয়াকরণগণ শব্দের অর্থ-প্রতীতি বিষয়ে সহজ যোগ্যতা স্ফোটেই আরোপ করিয়াছেন এবং "স্ফোট"কেই শব্দের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই "স্ফোটবাদ" ব্যাকরণ চর্চ্চার চরম ফল; শব্দতত্ত্বালোচনার অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত। 'শব্দ কৌস্তুভ'কার দীক্ষিত একটি আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অপহৃত গাভার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন একজন দুর্লভ "চিন্তামণি" লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, সেইরূপ পতঞ্জলি প্রভৃতি তপোবল-সমন্বিত শাব্দিকগণ সামান্য শব্দের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে 'স্ফোট তত্ত্ব' নিরূপণ করিয়া শব্দশাস্ত্রকে পরমার্থদর্শনের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন; ব্রহ্মবিদ্যা ও শব্দচর্চ্চাকে এক করিয়াছেন। "স্ফোটবাদ" ভারতীয় বৈয়াকরণগণের নিজস্ব সম্পদ্, তাঁহাদের শব্দালোচনায় অমৃতফল এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। শব্দের স্বরূপনির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকভাবে যত প্রকার

---

* "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—যোগসূত্র।

মতবাদেরই সৃষ্টি হউক না কেন, শব্দকে মনুষ্যের ভাবপ্রকাশের কল্পিত উপায়মাত্র বলিয়া যতই ঘোষণা করা হউক না কেন, ভারতীয় বৈয়াকরণগণের অমোঘ সাধনার ফলস্বরূপ এই 'স্ফোটবাদ' চিরদিনই শব্দতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রকৃত মনীষাসম্পন্ন বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ

স্বর্গ-ভ্রষ্ট

কোথা আমি ? এ কি ধরা ভাসিতেছে আকাশ-সাগরে !
হে নিবস্ত অনুভূতি ! একবার জাগরে জাগরে !
কোথা হ'তে শূন্য পথে শ্যাম ধরা হইল উদ্ভূত ?
আকাশ-সিন্ধুর এ কি আনন্দের অমৃত বুদ্বুদ ?

এই শৈল, ওই বন, ওই নদী, ওই পারাবার,
প্রতিমূর্ত্তি যেন সবে আমার ধ্যানের—ভাবনার।
নাই অন্ধকার আলোক,—চিরস্থির দীপ্ত জাগরণ ;
ঊষা হাসে, সন্ধ্যা ভাসে, আনে নিশা স্নিগ্ধ আবরণ।

মৃদু কল্পনায় মোর রচিয়াছি যেন সারি সারি,—
ওই যে অশ্রু ও হাসি মিলাইয়া গড়া নরনারী
পুলকে ও বেদনায় বিচিত্রতা স্তরে স্তরে পাতা ;
মানস-আদর্শ মোর এইখানে প্রাণে প্রাণে গাঁথা।

স্বরের লহরী বহে আগ্রহেতে আকুলিয়া প্রাণ,—
নন্দনের বনে নয় অকম্পিত অনাহত গান।
স্বর্গে হেন ঋদ্ধি নাই, দিতে পারি এ উচ্ছ্বাস কিনে ;
হে ধরা, আমায় নাও, বাঁধা থাকি বিচিত্রের ঋণে।

কে গো করুণার মূর্ত্তি, অশ্রুসিক্ত ছায়া-স্নিগ্ধ ধামে ?
অজেয় অমর তুমি ? বিখ্যাত জগতে "মৃত্যু" নামে ?
কর তুমি দুঃখ নাশ ? হে অচেনা ! বুঝি না ও ভাষা।
করুণা কহেনা কথা,—আকাশে বাতাস করে সাঁ-সাঁ।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে মন্দিরে মন্দিরে পৃথ্বীপুরে ;
কহে নর স্তোত্রে তার :—ফেল দুঃখ ফেল মৃত্যু দূরে ;
দাও নিত্য সুখ-ধাম,—উত্তরিব এই ডাঙ্গা মোরা।
চমকিল স্বর্গ-ভ্রষ্ট,—ভেসে যায় স্বপ্ন ভাঙ্গা-চোরা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিসর্জ্জন

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দুষ্ট ব্যাধিতে গাঙ্গুলী মহাশয় ক্রমেই ক্ষীণ-তেজ হইয়া আসিতে লাগিলেন। বহু চিকিৎসকের বহু ঔষধাদি সেবন করিয়াও কোন ফললাভ হইল না। চিত্রগুপ্ত তাঁহার হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া, দ্বার খুলিয়া দিলেন।

ছায়া অক্লান্তভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, সুরেশ যেন কিছুই করিতে পারিত না। সে পিতার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া কেবল ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া থাকিত। আর ছায়ার সুনিপুণ হস্তের সেবা যত্নগুলি প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া দেখিত।

ছায়ার সেবা যত্ন দেখিয়া যে কেবল সেই মুগ্ধ হইত, তাহা নহে; সকলেই দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিত। দিনে রাত্রে সে স্নানাহারের সময় ছাড়া আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্বশুরের নিকট হইতে কোথাও যাইত না। তাহার শ্রম ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া সকলে অবাক হইত।

ছায়া এখানে আসিবার পরে পিসিমা একটি মহানিশ্চিন্ততা লাভ করিলেন। তাহার শান্ত মধুর ব্যবহারে তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার পক্ষপাতী হইয়া গেলেন। সবিতার প্রতি তিনি মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হইলেন। গুণের কাছে যে রূপের তুলনাই হইতে পারে না, সেই বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় মা বলিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। ছায়া নিজ হস্তে তাঁহাকে পথ্য সেবন না করাইলে, অথবা ঔষধ পান না করাইলে তিনি পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন না। ছায়াও নিজহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা না করিতে পারিলে নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত।

বৃদ্ধের এক পার্শ্বে সুরেশ ও অপর পার্শ্বে ছায়া দিবারাত্র বসিয়া কাটাইত। পিতার অনুরোধে সুরেশ কখনও তাঁহার পার্শ্বে শুইয়াই একটু ঘুমাইয়া লইত। কিন্তু ছায়ার চক্ষুতে যেন নিদ্রা ছিল না। বৃদ্ধ মাঝে মাঝে তাহাকে বলিতেন, "মা, একটু ঘুমিয়ে নাও, তা না হলে তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন আমার সেবা কে করবে?"

ছায়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "না বাবা, আমার অসুখ হবে না। আমার এ শরীরে সকলই সয়। এতে ত আমার কিছুই কষ্ট হয় না।" বলিয়া সে তেমনিভাবে বসিয়াই তাঁহার হস্ত পদ মস্তক টিপিতে থাকিত।

বৃদ্ধ বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেন না। তাই নীরবে থাকিয়াই বধূর সযত্ন সেবা উপভোগ করিতেন।

নিয়মিতরূপে আহার নিদ্রা না করায় ছায়ার শরীর ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠিল। কিন্তু

সে কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। নীরবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিল।

সে না বলিলেও সুরেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সর্ব্বদা ছায়ার সঙ্গে থাকিয়া, সুরেশের পূর্ব্বের সেই লজ্জা সঙ্কোচ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিত, এই দেবীর নিকট কিসের লজ্জা! ছায়ার প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই পূর্ব্বের ভাবটা তাহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণে একটা গভীর অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। ছায়ার শান্ত ক্লান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া একদিন সুরেশ তাহাকে বলিল, "আজ রাতটা অন্ততঃ তুমি বিশ্রাম নাও। তা না হলে বাঁচবে না। একবার দেখ ত তোমার চেহারাটা কেমন হয়েছে।"

শুনিয়া প্রথমতঃ ছায়া নীরবে রহিল। পরে বলিল, "কিন্তু তাতে বাবার ত কোন অযত্ন হবে না?"

"তা একটু নিশ্চয়ই হবে। আমি কি আর তোমার মত এতটা কর্‌তে পারব!"

"তবে আর বল্‌তে এস কেন? একটু বিশ্রামের চেয়ে একটা জীবন অনেক বেশী মূল্যবান।" বলিতে বলিতে হঠাৎ ছায়ার চক্ষু হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতি বাহির হইল।

তাহার সেই দৃষ্টির সম্মুখে সুরেশের মুখখানা একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। সে বিবর্ণ মুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। ক্ষণপরেই ছায়ার মুখ চক্ষু আবার স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। স্বামীর এই অসঙ্কুচিত সরল কথাটির প্রতি সে হঠাৎ এইরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করায়, নিজেই একটু লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল।

সে সেই কথাটি ঢাকিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে মৃদু কোমলকণ্ঠে বলিল, "আমি নিশ্চয়ই তোমার কথাটি রাখতুম। কিন্তু বাবার যদি সেবার কোন ত্রুটি হয়, তবে যে—" কথাটি পূর্ণ না করিয়াই ছায়া স্নিগ্ধ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিল। কিন্তু তবুও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেশের মৌনাবলম্বন দূর হইল না।

সেই রাত্রেই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল। ছায়ার আশঙ্কা হইতে লাগিল, বুঝি তাহার এই সেবা, যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া যায়। সুরেশের ম্লান মুখ ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। পিসিমা সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রোগীর নিকটে আসিয়া বসিলেন। ডাক্তার কবিরাজে কক্ষ পূর্ণ হইল, কিন্তু গাঙ্গুলী মহাশয়ের অবস্থার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

সশঙ্কিত চিত্তে অনিদ্র অবস্থায় সকলেই রাত্রিটি একরূপ বসিয়া কাটাইল। রাত্রিটি ভালয় ভালই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে গাঙ্গুলী মহাশয় পূর্ব্ব রাত্রি হইতে যেন একটু সুস্থ বোধ করিলেন। সকলের মনে আবার একটু আশার সঞ্চার হইল।

একটু আশান্বিতভাবে ছায়া শ্বশুরকে ঔষধাদি পান করাইয়া বিছানা পরিবর্ত্তন করিল। গাঙ্গুলী মহাশয় বধূর সঙ্গে দুই চারিটি কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেন। পুত্রকে, বধূকে যথোচিত সান্ত্বনা দিলেন। কথা বলিতে বলিতেই যেন ক্লান্তভাবে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পিসিমা নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ছায়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সুরেশ ছায়ার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া কম্পিত হস্তে পিতার পায়ে ধরিয়া দেখিল, তাঁহার হস্ত পদ শীতল হইয়া আসিয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসও খুব ঘন ঘন বহিতেছে। দেখিয়া সুরেশ বালকের ন্যায় "বাবা, বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পিসিমাও কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল।

ছায়া পাগলিনীর ন্যায় সুরেশের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "একটু,—একটু, ধৈর্য্য ধর। এখনও প্রাণটুকু আছে,—কিন্তু গোলমাল করলে, তাও থাক্‌বে না।"

সুরেশ একটু ধৈর্য্যধারণ করিল। তাহাদের চীৎকারে রোগীর নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না। তিনি অকাতরে গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন। কবিরাজ বারংবার রোগীর নাড়ী দেখিতে লাগিল। সুরেশ ভীতিবিহ্বল, নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাকভাবে একবার কবিরাজের মুখের দিকে, আবার পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ছায়া পাষাণ প্রতিমার মত নিস্পন্দভাবে শূন্যনয়নে শ্বশুরের মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে রোগীর অবস্থা চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মুমূর্ষু যেন তাড়িৎ স্পর্শে সসংজ্ঞ হইয়া বেশ পরিষ্কার কণ্ঠেই ডাকিলেন, "মা, তুমি কোথায়?" তাঁহার সেই স্বর শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিল। ছায়া শ্বশুরের এই চরম আহ্বানে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া, আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা!"

"আমি চলছি। এস, তোমাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাই। সুরো, বাবা, কাছে এসে বস।" সুরেশ শিশুর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার বক্ষের উপর পড়িয়া, দুই হস্তে তাঁহার কণ্ঠবেষ্ঠন করিয়া ধরিল। বহু চেষ্টায়ও তাহার মুখ হইতে কোন বাক্য নিঃসরণ হইল না। কেবল পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

গাঙ্গুলীমহাশয় শীর্ণ হস্ত পুত্রের মস্তকোপরি রাখিয়া বলিলেন, "কেঁদনা বাবা, ছি। সকলেরইত অমনি করে একদিন যেতেই হয়। আশীর্ব্বাদ করছি,—শান্তি পাও,—সুখে থাক, কৈ গো মা,—আমার কাছে এস, শেষ আশীর্ব্বাদ করে যাই।"

ছায়া অতিকষ্টে তাঁহার পদতল হইতে উঠিয়া, স্খলিতপদে তাঁহার বক্ষের নিকট আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সুরেশ যে তাহার অতি নিকটে রহিয়াছে, তখন তাহার সে লক্ষ্য রহিল না।

বৃদ্ধ পুত্র ও বধূর মস্তকোপরি দুই হস্ত স্থাপন করিয়া, মনে মনে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ

করিতে লাগিলেন। সুরেশ অজ্ঞানের ন্যায় তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল। ছায়াও প্রায় তদ্রূপই। পিসিমা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় পুত্র, পুত্রবধূকে, ও বিধবা ভগ্নীকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে অনিত্য শরীর ত্যাগ করিলেন। প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া, কোন্ অজ্ঞাতস্থানে উড়িয়া গেল।

সকলে সুরেশকে তাঁহার বুকের উপর হইতে টানিয়া উঠাইয়া দিল। তখন যেন সুরেশ একটু সচেতন হইল। পিতার সেই মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিল। ছায়া কিন্তু কাঁদিতে পারিল না, চক্ষু হইতে জল বাহির হইতেছিল না, ভিতরে বর্ষার মেঘের ন্যায় কতকগুলি জল জমাট বাঁধিয়া রহিল। তাই সে কেবল লক্ষ্যহীন নেত্রে স্তব্ধ পুত্তলিকার ন্যায় সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

যথারীতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের মৃতদেহ সৎকার হইয়া গেল। একমাত্র পুত্র সুরেশই পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন করিল।

যথাকালে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রাদ্ধে কিছুমাত্রও ক্রুটী হইল না। যথোপযুক্ত সমারোহের সহিতই কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। নবীনা গৃহিণী চারুবালা সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে পিতার ব্যারামের সময় আসিতে পারে নাই। কিন্তু এখন একবার তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপস্থিত না হইয়া পারিল না।

ছায়া পিসিমাকে বলিয়া নিবারণকে দিয়া সবিতার নিকট একখানা চিঠি লিখাইয়াছিল। তাহাতে শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া, বহু অনুরোধ করিয়া লিখা হইয়াছিল যে সে যেন অবশ্যই এখানে চলিয়া আসে। কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

চারু বহুদিন পরে পিত্রালয়ে আসিয়া সকলই উল্টা পাল্টা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সবিতার পরিবর্ত্তে ছায়াকে আবার এখানে দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। যাহা হউক, সে এইবার তাহার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিল না। মাত্র তিনদিন পিতৃগৃহে থাকিয়া, পরে মৃত পিতার মুখ স্মরণ করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে পুনঃ সে নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের মৃত্যুর পরে ও দেখিতে দেখিতে পনরটি দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যেও সুরেশ পিতৃশোকটা যেন ভালরূপ সামলাইতে পারিল না। সে শোকে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহার কোনদিকে কিছুমাত্রও লক্ষ্য ছিল না। সর্ব্বদাই মৃত পিতার সেই কক্ষটিতে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিত। শ্রাদ্ধাদির আয়োজনের দিকে পর্য্যন্ত তাহার লক্ষ্য ছিল না। সেই সকল উদ্যোগ আয়োজন ছায়া, পিসিমা, ও নিবারণই করিয়াছিলেন। ছায়া তাহাকে অনুরোধ না করিয়া খাওয়াইলে তাহার খাওয়া পর্য্যন্ত হইত না।

স্বামীর এতদূর শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ছায়া চিন্তিত হইল। সে নিজে ত এখানে আর বেশীদিন

থাকিতে পারিবে না। সে চলিয়া যাইবার পরেও যদি তাহার এইরূপ ভাবই থাকে, তাহা হইলে কি করিয়া চলিবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ছায়ার আরও কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সুরেশও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সাম্‌লাইল। এখন সে প্রায়ই ছায়ার নিকটে আসিয়া গল্পাদি করে। মাঝে মাঝে একটু আধটু হাস্যও করে। কিন্তু তাহা অন্য কাহারও নিকটে নহে, কেবল ছায়ার নিকটেই। ধীরে, ধীরে, অতিধীরে, দিনে দিনে, পলকে পলকে, সে ছায়ার সঙ্গকে অতি মধুর বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল, যতক্ষণ সে তাহার নিকটে থাকিত, ততক্ষণ যেন অন্য সকল চিন্তাই বিস্মৃত হইয়া যাইত। না বুঝিয়া, এই দেবীর প্রাণে সে ব্যথা দিয়াছে বলিয়া অনুতাপে হৃদয় জর্জ্জরিত হইত, লজ্জায় মস্তক নত হইত। সে যাহাতে সেই ভুলের সংশোধন করিতে পারে, সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করিত।

ছায়া প্রথমতঃ স্বামীর এইরূপ ভাব দেখিয়াও কিছু বলিত না। ভাবিত যে সে এইরূপে থাকিলে হয় ত কিছুদিন পরে পিতৃশোকটা পাশরিতেও পারে। তাই সে ইহাতে কোনরূপ কুণ্ঠিত না হইয়া বেশ সহজভাবেই চলিত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহাতে সুরেশের বেশী রকম বাড়াবাড়ি দেখিয়া সে একটু ভয় পাইল। মনের ভিতর একটা গোপন কথা জাগিয়া উঠিল। না জানি এ-কি! না জানি কি-ই ঘটিয়া বসে!

সে একবার ভাবিল যে তাহাকে বলিয়া দিবে, "তুমি দূরে দূরেই থাক, আমার এত নিকটে থাকিবার অধিকার তুমি আর রাখ নাই।" কিন্তু আবার ভাবিল, এইরূপ কঠিন কথা বলা বড়ই অকরুণের কার্য্য। এইরূপ কথা বলিলে তাহার শোকদগ্ধ হৃদয় হয়ত আরও জ্বলিয়া উঠিবে। না, প্রয়োজন নাই,—তাহাকে সে কিছুই বলিবে না, কিন্তু নিজে সতর্ক হইয়া চলিবে। আর চলিবেই বা কতদিন! তাহার কলিকাতা যাইবার দিন ত অতি নিকট।

এই সময় হইতে ছায়া একটু দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে লাগিল। পারত পক্ষে সে স্বামীর সম্মুখে আসিত না। তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া সুরেশ একদিন তাহার নিকটে গিয়া অভিমান-পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আজকাল একটু কথাবার্ত্তাও বল না। যদি নূতন কোন অপরাধ করে থাকি, তবে ক্ষমা ক'রো।"

তাহার কথা শুনিয়া ছায়া প্রথমতঃ একটু অনুতপ্ত ও ব্যথিত হইল। কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎই তাহার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। মুখের কাছে অনেকগুলি কথা ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু সে অতি কষ্টে ঠোঁট চাপিয়া কথা গুলিকে ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সুরেশ ছায়ার কোনও উত্তর না পাইয়া ক্ষুব্ধভাবে রহিল।

শোকোচ্ছ্বাসের বেগটা যখন সকলেরই একটু কমিয়া আসিল, তখন সহসা একদিন রমানাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আসিবার কারণ জানিয়া সকলেই দুঃখিত হইল।

পিসিমা ছায়াকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সে যেন এখনই না চলিয়া যায়। তাহা হইলে সংসারের কি গতি হইবে!

ছায়া সবিনয়ে তাহাকে বুঝাইল যে, সবিতা অভিমান করিয়া এখান হইতে চলিয়া গেলেও তাহার সেই অভিমান বেশীদিন টিকিবে না। সে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন ফিরিয়া আসিবেই। অতএব তাহার স্থলে অন্যায়রূপে সে বসিতে ইচ্ছুক নয়। তবে হাঁ, শ্বশুরের সেই অন্তিম আদেশ ত সে পালন করিয়াছেই। এখন তাহার এই স্থান হইতে সরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

একথা শুনিয়া পিসিমা বলিলে, "অন্যায় হল কি করে? সত্য ধরতে গেলে ত তোমারই সব। তার কি?"

ছায়া জিব কাটিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "অমন কথা বল না পিসিমা, তারই সব, সেই সর্ব্বাধিকারিণী। তাকেই ঠিক মনের থেকে বরণ করে এই ঘরে আনা হয়েছিল, সেই এই ঘরের শোভা। আমি কেবল তার বোন,—তোমাদের কাছে আমি যেটুকু পাচ্ছি, সেটুকু কেবল তার বোনের অধিকারে।"

শুনিয়া পিসিমা সাশ্চর্য্যে ছায়ার মুখের দিকে চাহিলেন। সতীনকে যে কেহ বোনের স্থলে অভিষিক্ত করিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণার অতীত।

ছায়ার চলিয়া যাইবার কথা শুনিয়া সুরেশ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। সে কিছু না বলিলেও ছায়া তাহার মনোগত ভাব বেশ বুঝিতে পারিল। সে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার শোকাচ্ছন্ন ম্লান মুখখানি যেন একেবারেই তমসাবৃত। সে যেন ছায়াকে কিছু বলিতে চাহিতেছে, অথচ মুখ হইতে তাহার যেন নিঃসরণ হইতেছে না।

ছায়া স্থিরনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বলবে কি?"

সুরেশ নিঃশব্দে রহিল। ছায়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল, "কিছু বলবার আছে?"

সুরেশ মুখখানা তুলিয়া ছায়ার ন্যায়ই স্থিরনেত্রে চাহিয়া, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, আছে।"

"কি,—বল না।"

"সত্যই তুমি চলে যাবে?"

ছায়া হাসিয়া বলিল, "একি ছেলেমানুষের মত কথা! তুমি কি আমায় এখানে থাকতে বল?" সুরেশ কিছুই বলিল না। ছায়া একটু থামিয়া পরে বলিল, "কিন্তু কেন থাকব বল ত?"

শুনিয়া সুরেশ চমকিয়া উঠিল, তাইত,—কিসের আশায় সে এখানে থাকিবে! তাহাদের সংসারে সুখ শান্তি দিবার জন্য! তাহাতে তাহার লাভ! ওঃ সে কি ভুল করিয়াছে, তাহাকে কেন সে একথা জিজ্ঞাসা করিল! এইরূপ জিজ্ঞাসার অধিকার সে ত আর রাখে নাই। সুরেশ দ্রুতপদে ছায়ার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। পিসিমা তাহাকে বলিলেন, "সুরেশ, তুই বৌমাকে থাকতে বল্ রে।" ইহার উত্তরে সে কিছুই বলিল না। শুধু জড়ের ন্যায় স্তব্ধভাবে কক্ষ কোণে বসিয়া রহিল।

যথাসময়ে ছায়া পিতার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। সে যখন সকলের সঙ্গে শেষ বিদায় সম্ভাষণ করিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার নেত্র পথে পতিত হইল, অদূরে,—সকলের একটু অন্তরালে দণ্ডায়মান সুরেশ—নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে যেন কি একটা জিনিষ ওতপ্রোতভাবে মিলান রহিয়াছে। সেই জিনিষটা কি ? তাহার নবীন বাসনাময় হৃদয় যাহা চাহিয়াছিল, এ কি তাহাই ? সে আজ কিছুদিন হইতেই সেইরূপ একটা ভাবেরই আভাষ পাইতেছে বটে। আজ এই অসময়ে, এমন অপ্রত্যাশিত অযাচিতভাবে কি তবে তাহাই আসিল! কিন্তু ছি, এখন আর কেন ? সে আপনার নূতন পথ নিজেই আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এখন আর ইহার কি আবশ্যক! ছায়ার হৃদয় সবেগে কম্পিত হইল।

সকলের সঙ্গে দেখা শেষ হইলে সে ভাবিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবে কি না। একবার ভাবিল, না,—করিব না। সেই নির্জ্জন স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাতের অধিকার তাহার নাই। সেও সেই অধিকার রাখে নাই। আবার ভাবিল, হয় ত এই শেষ। একবার দেখা করা দরকার। সে এখনও পিতৃশোকটা সামলাইতে পারে নাই। তাহাকে একটু প্রবোধ দিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এমন ভাবে না বলিয়া চোরের ন্যায় পালানটা নিতান্ত অকরুণের কার্য্য। মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্কের পরে দেখা করিয়া যাওয়াই স্থির করিল।

কিন্তু সেদিকে পা যেন উঠিতেছিল না। তবুও কোন রূপে এক পা, দুই পা, করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নয়ন ভূমিতে নিবদ্ধ ছিল বলিয়া সে দেখিতে পাইতেছিল না যে সুরেশ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় তাহার একখানি হস্ত চাপিয়া ধরিয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "সত্যই চললে ? একটু সামলাবার অবসরও দিলে না ?"

ছায়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, চক্ষুর অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া সে দেহমনে কাঁপিয়া উঠিল। এই ত,—এই ত সেই। সে যাহা ভাবিয়াছে, এই ত তাহাই। শুষ্কতরুমূলে কেন আর এই বারি সিঞ্চন!

ছায়া হস্তখানা মুক্ত করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, "হাঁ চলছি। আমার অনুরোধ আর এভাবে থেকো না। সংসারের দিকে একটু—"

"সংসারের দিকে ? আর কিছুর দিকেই নয়। পারব না,—পারব না ছায়া,—শুধু ভাবছি, তুমিও চললে ?" ইহার উত্তরে কি বলা যায়! ছায়া কাঁপিতে লাগিল, বুঝি সে এবার আর আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। তাহার চিরসংযত চরিত্র বুঝি আজ ইহার কাছে পরাজিত হইয়া গেল। সে কাঁপিতে কাঁপিতেই বসিয়া পড়িল। অদৃষ্ট-দেবতার এই কি বিদ্রূপ!

সুরেশ পাগলের ন্যায় আবার তাহার হাত ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যাও ছায়া, তা না হলে আমার সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ পাব না। কিন্তু এ টুকু বলে যাও, যে তোমায় 'আমার' বলবার অধিকার আমার আছে।

"তুমি আমায়—" সহসা ছায়া বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া, একটু দূরে সরিয়া স্থিরনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ ?"

"হাঁ ছায়া, পাগলই হয়েছি। যদি তুমি একান্তই চলে যাও,—তবে অন্ততঃ এটুকু বলে যাও,—যে হাঁ,—তোমার সেই অধিকার আছে।"

ছায়া গ্রীবা উন্নত করিয়া স্থির-নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "না, তোমার আর সে অধিকার নাই। তুমি কি জান না যে নিকটতম দূরে গেলে সব চেয়ে পর হয়ে যায় !"

"জানি,—তা জানি ছায়া। তবু—"

"এতে আর তবু নই। এমন অন্যায় শব্দ আর উচ্চারণ করো না। একদিন যাকে তুমি মনে প্রাণে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলে, আজ তার প্রতি তুমি কি করে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারছ ? যার হৃদয় এতখানি দুর্ব্বল, এমন অবিশ্বাসী—"

সুরেশ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আর বলো না, আর বলো না। শুধু সে কথাটির উত্তর দাও।"

"আগেই ত উত্তর দিয়েছি। এ ছাড়া এ কথার আর কি উত্তর থাকিতে পারে ! আমি জীবনটাকে সম্পূর্ণ অন্য রকমে গড়ে তুলেছি। গত কথা গুলি সব মন থেকে মুছে ফেলেছি,—আজ আবার কেন সে সব কথা জাগিয়ে দিচ্ছ ? একি তোমার ঠাট্টা !"

সুরেশ আহতভাবে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ঠাট্টা নয়,—সত্যই এ আমার অন্তরের কথা। তুমি কি তা বিশ্বাস কর না ?"

ছায়া নির্নিমেষ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস করলেও এখন আর সে কথা মনে স্থানও দিতে পারি নে। তার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি এখনই সারা হয়ে গেল ? এতটুকুই কি তোমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ ?"

"কর্ত্তব্য ? কর্ত্তব্যের কথা আর বলো না। তোমার উপরই বা আমি কতখানি কর্ত্তব্য পালন করেছি ? আমায় সে ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমায় একবার সে অধিকারের কথাই বলে যাও। আর কিছু না। আর কিছুর প্রত্যাশা করা আমি মনেও করতে পারি না।"

ছায়া বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিরদিন আত্মসম্বরণে অভ্যস্তা হইয়াও আজ যেন সে আর আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সুরেশ আবার তাহার নিকটে যাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বল,—শুধু ঐ টুকু বলে যাও। জানি আমি, আমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়,—তুমি আমায় মাফ করতে পার না,—তা আমি জানি। তাই—তা চাইতে আমার সাহস নাই। কেবল—

ছায়া আবার বসিয়া পড়িল। আর বুঝি রক্ষা নাই ! সুরেশ আবার তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "এতটুকু জান্‌বার অধিকারও কি নাই আমার ? তুমি কি এমনি পাষাণী ছায়া !—"

সহসা ছায়া উজ্জ্বল নেত্রে স্বামীর প্রতি চাহিয়া সতেজকণ্ঠে বলিল, "এ কথা মুখে আনতেও লজ্জা করে না! আজ তুমি আমার কাছে যা চাচ্ছ, একদিন সে বস্তুই যে আমি তোমায় দিতে এসেছিলাম। তুমি কি তা রেখেছিলে? একবার ভেবে দেখেছিলে কি সেই প্রথম তরুণ যৌবনের আকাঙ্ক্ষাময় উপহার ফিরিয়ে দিলে প্রাণে কত বড় ব্যথা বাজে? তখন কি তুমি খুব দয়ার কাজ করেছিলে! আমি এখন নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছি,—এখন আর কেন? কেন মিছে, একট ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আর একটা ভুল করে বসবে!"

সুরেশ বিবর্ণমুখে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "জানি, তা—" বাহির হইতে রমানাথ ডাকিলেন, "ছায়া!"

ছায়া সুরেশের হাত হইতে নিজের হাতখানা টানিয়া লইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আর সময় নাই। এখন তবে বিদায়। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তবে মাফ করবে।"

"কিন্তু ছায়া সেই—সেই,—আর কিছু না হয়,—একটু ক্ষমা,—"

"আর কিছু নয়। এ আমার অভিমানের কথা নয়, কর্ত্তব্যের কথা।" বলিয়া ছায়া সবেগে সেই কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে সুরেশ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "শোন,—ছায়া, একটু —"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তখন ছায়া বেশ স্থিরভাবেই চলিয়া আসিল। কিন্তু সেই গ্রামের সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইবার পরেই তাহার শূন্য হৃদয়টা গাড়ীর এঞ্জিনের মতই খাঁ খাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পথে নানা রকম দৃশ্য দেখিয়াও সে তেমন খুসি হইতে পারিল না। সমস্ত পথটা হৃদয়ে একটা দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া, সন্ধ্যার সময় কলিকাতা যাইয়া পৌঁছিল।

রমানাথ পূর্ব্বেই মাসিক আট টাকা ভাড়ায় একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছায়াকে লইয়া তিনি সেই বাড়ীতেই উঠিলেন।

আসিয়াই ছায়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতে লাগিল। এই সময়ে রন্ধনের অসুবিধা দেখিয়া রমানাথ খাবার ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গেলেন।

ছায়া ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া, জিনিষপত্রগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল। কল হইতে বাল্তি ভরিয়া জল তুলিয়া রাখিল। রমানাথও খাবার লইয়া ঘরে ফিরিলেন।

তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করিলে, পরে ছায়া সেই খাদ্য দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে খাইতে দিল। তাহা খাইয়া রমানাথ একটু সুস্থ হইলেন। ছায়া নিজে কিন্তু কিছুই খাইতে পারিল না। এক সঙ্গে অনেকগুলি কঠিন ধাক্কা খাইয়া সে যেন সামলাইতে না পারিয়া মুহ্যমানের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ ঠাকুরমার আকস্মিক মৃত্যুতেই সে প্রাণে একটা ভয়ঙ্কর আঘাত পাইয়াছে। তাহার উপর সেই আঘাতটা না সারিতেই আবার শ্বশুরের মৃত্যু। সর্ব্বোপরি স্বামীর সেই হৃদয় ভাব,—তাহার

প্রতি ভালবাসা প্রকাশ, কিন্তু পাষাণী তাহার সেই ভালবাসাকে অপমানিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যাহা চায়, সে সম্মুখে তাহা পাইয়াও স্বইচ্ছায়ই তাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এই ত্যাগ কাহার জন্য? এক জন পর হইতেও পর, অপরিচিতার জন্য বৈ ত নয়। সে অভাগিনী, ইহা হইতেও বেশী কি পাইবার আশায় এমন দানকে ফিরাইয়া দিল!

ছায়ার অনুতপ্ত চিত্ত যেন প্রবল অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া সে ভয় পাইল, এই অগ্নি না নিভাইলে তাহার বুঝি আর রক্ষা নাই।

সে তখনই মনকে শক্ত কষাঘাতে অন্যদিকে দৌড়াইয়া লইয়া গেল। ভাবিল, যাহার জন্য তাহার এই ত্যাগ, সে ত তাহার পর নয়। সে তাহার আপন ভগ্নী। আর ভগ্নীই হউক, অথবা পরই হউক, তাহার অধিকারের বস্তু দিয়া যদি একটি জীবন উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ত তাহারই গর্ব্বের কথা।—তাহাতে ত তাহারই আনন্দের কথা।

এইরূপ নানা কথা দিয়া ছায়া দগ্ধ প্রাণে একটু শান্তি বারি সিঞ্চন করিল। তাহাতে অগ্নির তেজটা একটু কমিল।

দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দিবাকর, নিশাকর, কাহারও পক্ষপাতী নহে, কাহারও মুখাপেক্ষীও নহে। স্বাধীনভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার অন্যথা হইতেছে না।

নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র সংসারটি লইয়া ছায়া কোনও রূপে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল। রমানাথও সমস্ত দিনের উপার্জ্জিত টাকা পয়সা যাহাই হইত, তাহাই আনিয়া ছায়ার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

রমানাথের সেই কার্য্যে বেশ উন্নতি হইল। ধীরে ধীরে তিনি ঋণগুলি পরিশোধ করিয়া দিতে লাগিলেন। সংসারের দুর্ভাবনা হইতে তিনি নিস্তার পাইলেন।

একদিন রমানাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "আর না ছায়া, এখন বাড়ী চল।"

ছায়া মৃদুস্বরে বলিল, "যেয়ে কার কাছে থাকব বাবা?" রমানাথ চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই ত ভাবনা।"

ছায়া নতমুখে বলিল, "এতদিন হল, এখানে এসেছি, এর ভিতর একবারও ত কালীঘাট যাওয়া হ'ল না বাবা।"

"কালীঘাট?—হাঁ,—কবে যেতে চাস্?"

"যেদিন সুবিধে হয়। কালীঘাট না দেখে বাড়ী যেতে ইচ্ছে হয় না।"

"হাঁ, যাবি সে জন্য কি! তবে রবিবারে গেলেই হবে। আজ কি বার?"

"আজ শনিবার। তা হলে ত কালই যেতে হবে।"

"হাঁ,—সেই বেশ কথা। না, কাছারীর সময় হয়ে গেছে, স্নান করতে যাই।" বলিয়া

রমানাথ অতি ক্ষুদ্র রান্নাঘরের পাশে জলের কলের নিকটে গেলেন। ছায়া ক্ষুদ্র শয়ন ঘর হইতে একখানি ধুতি, গামছা ও তৈলের বাটি আনিয়া, রমানাথের নিকটে রাখিয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল। রমানাথ স্নানাহ্নিক করিয়া আসিলেন। ছায়া তাঁহার অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িয়া দিল। তিনি আহারাদি করিয়া কাছারীতে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরেও ছায়া বহুক্ষণ নিঃস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। মনে স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। এখানে আসিয়াও তাহাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই থাকিতে হয়। কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া যে মনটাকে একটু হাল্কা করিবে, সেই উপায়ও নাই।

সে যেন দিন দিন কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। পূর্ব্বের সেই উৎসাহ, কার্য্যশীলতা ও মনের দৃঢ়তা যেন দিন দিনই হ্রাস হইয়া যাইতেছিল। নিজের মন ও শরীরের অবস্থা ছায়া নিজেই বুঝিতে পারিল, প্রতীকারেরও চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই যেন পারিয়া উঠিতেছিল না। সে কিছু ভাবিতেও চাহে না, অথচ নিজের অজ্ঞাতেই মনের ভিতরে এমন কতগুলি কথার ঢেউ উঠিতে থাকে, যে পরে তাহাকে সচকিতে ভাবিতে হয়, ছি, এই সব চিন্তা আর কেন? এইরূপ ভাবিলেও মনটা আবার মুহূর্ত্তেক পরেই পূর্ব্বের চিন্তাতেই লীন হইয়া যায়। এইরূপ কেন হইল, তাহা ভাবিতে ভাবিতে ছায়া স্নান করিতে কলের নিকটে গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়াও সে দাঁড়াইয়াই রহিল। মনের মধ্যে এমন কোন ভাবনাও ছিল না, অথচ কেমনই যে একটা অবসাদ,—হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তিও যেন তাহার নাই।

অনেকক্ষণ পরে ছায়া মনের অবসাদটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্নান করিবার জন্য কল খুলিল। কিন্তু তখন কলে জল ছিল না। তাই আর তাহার স্নান করা হইল না। ছায়া নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হইতে লাগিল। এ কি বিড়ম্বনা! কেন এমন হইল!

যখন সে রান্নাঘরে খাইতে গেল, তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিতেছিল। রমানাথ কাছারী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এত দেরীতে ছায়াকে খাইতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ছায়াও মনে মনে খুব লজ্জিত হইল।

সে কোনও রূপে দুই চার গ্রাস খাইয়া হাত মুখ ধুইয়া ঘরে আসিল। রমানাথ বলিলেন, "এত দেরী যে ছায়া?" ছায়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেমন যেন একটা লজ্জা হইতেছিল।

রমানাথ উদ্বেগপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত! তোর শরীরটা কি খুবই অসুস্থ বোধ করছিস্? এখানে এসেছি অবধিই তোর শরীরটা অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। এ যায়গা কি তবে তোর সহ্য হল না?"

শুনিয়া ছায়ার মুখ খানা একেবারে নত হইয়া গেল। অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমার ত কোনই অসুখ হয় নি। এ যায়গা ত আমার বেশ সহ্য হচ্ছে।"

"এর নাম কি সহ্য হওয়া বলে ? তুই যে দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিস্। আর হওয়ারও ত কথাই বটে। প্রায় এক সঙ্গে এমন দুটো শোক সহ্য করা ধৈর্য্যেরই ত দরকার।"

ছায়া নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রমানাথ একটু থামিয়া পরে আবার বলিলেন, "ছায়া, আজ একটা অপ্রীতিকর কথা জান্তে পেরেছি।"

ছায়া চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া ব্যগ্র-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "অপ্রীতিকর এমন কি কথা বাবা ?"

রমানাথ একটু কি যেন ভাবিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "জানিস্ ত, সুরেশ এই কলকাতায়ই বিয়ে করেছিল। কিন্তু কার মেয়ে বিয়ে করেছিল, তা এতদিন জানি নি। আজ জানতে পেরেছি।"

ছায়া নীরবে উৎসুকনেত্রে রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। রমানাথ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি যার অধীনে কাজ কর্‌ছি, তারই মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল। তারা বোধ হয় এ কথা জানে না। আমিও ত এতদিন জানি নি, কেবল আজ—"

ছায়া বিস্ময়রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি ?"

"হাঁ, তাইত বলছিলেম যে একটা অপ্রীতিকর কথা। তারই অধীনে আমি—সব জেনে শুনেও কাজ করবো ?"

ছায়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রমানাথ ব‍িতে লাগিলেন, 'কিন্তু কাজ ছাড়লেও ত না খেয়ে মরতে হবে। কি করবো, তাই ভাবছি। হুঁ !" বলিয়া রমানাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া পরে ছায়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,

" অন্য কোন সুবিধে না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে চুপ করেই থাকতে হবে বাবা।"

রমানাথ উগ্রকণ্ঠে "কেন ?" বলিয়া আবার তন্মুহূর্ত্তেই অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে বলিলেন, "হাঁ, তা থাকতে হবে বৈ কি। ভগবান যাকে বঞ্চিত করেন, তাকে চার দিক্ দিয়েই করেন।" বলিয়া রমানাথ একটি অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ছায়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তাহার অন্তরটা নীরবে থাকিতে পারিতেছিল না। রহিয়া, রহিয়া, বহিয়া, বহিয়া, কত কথার ঝড় তুফান তুলিতে লাগিল। তাহার বুকটাকে কম্পিত করিয়া প্রবল তুফান সবেগে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

রমাথাথ মাথা নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "শুধু কি তাই ? আরও এক কাণ্ড হয়েছে যে।"

ছায়া যেন অবোধ বালিকার ন্যায় ভীতিবিহ্বল ভাবে বলিল, "কি হয়েছে বাবা, কি কাণ্ড ?"

"কাল আর কালীঘাট যাওয়া হল না, আর কি। উকীলবাবু নিজে বলেছেন যে 'আমার

মেয়ের সাধোপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকে খাওয়াতে ইচ্ছা করি। কাল আপনার মেয়েকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন।' আমি তখন ঐ খবরটা না জান্‌তে পেরে খুসি হয়েই এতে সম্মত হয়েছিলেম এখন দেখছি তা অসম্ভব।—"

ছায়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "অসম্ভব কি বাবা?"

"অসম্ভব নয় কি? এ অবস্থায় কি,—আচ্ছা, তোর কি ইচ্ছা বল দেখি?"

ছায়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না গেলে কি ভাল হবে বাবা? তার উপর আপনি আগেই স্বীকার করে এসেছেন।"

"তাই ত, সে জন্যই ত ভাবছি। তোর যদি ইচ্ছে থাকে, তবে যেতে পারিস্ ছায়া।"

ছায়া নীরবে রহিল। একবার ভাবিল, বলিয়া দিবে, যে 'না'। কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইল না। অনিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দেখিবার জন্যও মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

রমানাথ ছায়ার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে আর কিছু বলিলেন না।

ছায়া কিয়ৎক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া পরে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে আসিল। তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। মহানগরী কলিকাতা আলোক-মালা গলে পরিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিয়াছে। ছায়া গৃহকোণ হইতে হ্যারিকেনটি বাহির করিয়া জ্বালাইয়া দিল। দেখিল, সে যে তখন আহার করিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে সকল জিনিষ সেই অবস্থায়ই পড়িয়া রহিয়াছে। পরিষ্কার করিতেও মনে নাই। মনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ছায়া নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হইতে লাগিল, এ কি এমন হইল কেন? তাহার সেই গর্ব্বিত হৃদয়ের বল কে হরণ করিয়া নিল! কিসের জন্য তাহার এই ক্লিষ্টতা জন্মিল! কি করিলে সে আবার আত্মস্থ হইতে পারিবে! এ কি বিড়ম্বনা! কি হইতে কি হইয়া গেল!

ক্রমশঃ

শ্রীচপলাবালা বসু

গোয়া

(কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে)

পুরাতন গোয়ার একটি গীর্জ্জা

কদমবাসের সময়ের গোয়া

মারমুগাঁও বন্দর

নূতন রাজধানী,—প্যাঙ্গিম।
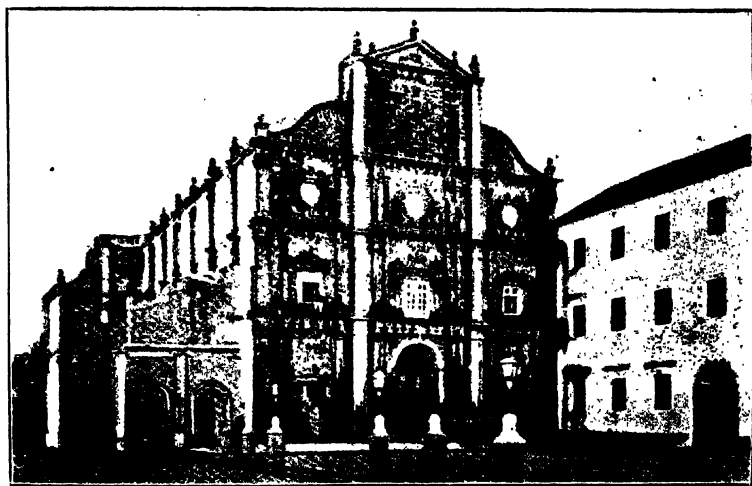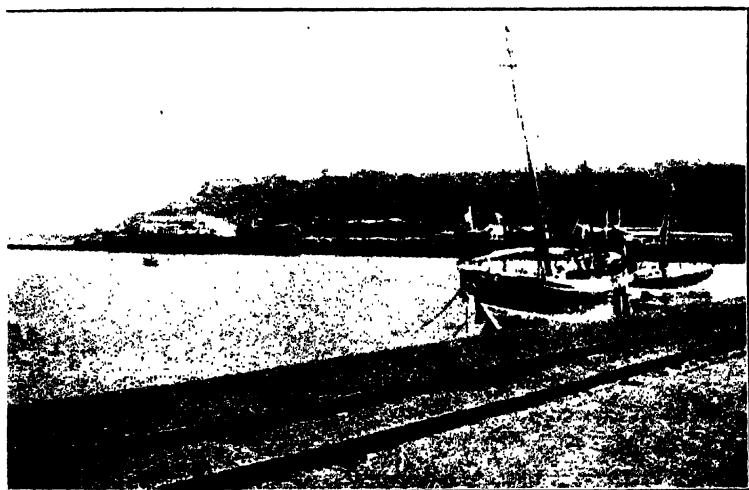
মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ

(মুখবন্ধ)

[আলোচনার সৌকার্য্যার্থে এই প্রবন্ধটীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :—(১) "অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন," (২) "জাতিভেদ", (৩) "গোরক্ষণ", (৪) "হিন্দুধর্ম্ম" এবং (৫) "বৈশ্য গান্ধী ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ—উপসংহার।"

'এমন যে বজ্রসমুৎকীর্ণ মণি তাহার ভিতরও সামান্য সূতাগাছ প্রবেশ করে'—এই ভরসায় ঈদৃশ কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উৎসাহ না পাইলে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিতে কখনো সাহসী হইতাম না। আচার্য্যদেব একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে হয়, যা' তা' ত আর বলা চলে না।"

আমার বিশ্বাস বৃদ্ধ বিজ্ঞান-সেবীর অবসর থাকিলে তিনি নিজেই এই সব বিষয়ে আলোচনা করিতেন। অক্লান্তকর্ম্মী চিরকুমার তপস্বীর মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম নাই। আজ প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের নিকট যাওয়া আসা করিতেছি কিন্তু সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কোন দিন তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা বসা দেখি নাই—এই কর্ম্মবীরের জীবনে কর্ম্মহীন দিন কেহই দেখেন নাই বোধ হয়। ইতি।—লেখক]

(১) "অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন।"

কংগ্রেসে ক্রমে মডারেট বা নরমপন্থীদের যুগ অর্থাৎ গোখেল-দাদাভাইনৌরজি আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের যুগ গেল; ক্রমে হোমরুলের যুগ আসিল। লোকমান্য তিলকপ্রমুখ ন্যাশনালিষ্ট পার্টির লোকেরা কংগ্রেস দখল করিয়া বসিলেন। এবং এই এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী নেতাদের আমলে কংগ্রেস এক মহাসত্যের সন্ধান পাইল। স্বাধীনতার উপাসক তিলক বলিলেন—Swaraj is our birth-right—স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার। স্বায়ত্বশাসন লাভ—ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের মুখ্য লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-প্রয়াসী এই রাজনৈতিক পাণ্ডারা স্বরাজের "মূলকথাটা আয়ত্ত" করিতে পারিলেন না। তাই এল্‌ফ্রেড রঙ্গমঞ্চ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝটপট্ করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।"

ইতিমধ্যে একজন সত্যাগ্রহী সন্ন্যাসী কংগ্রেসে ঢুকিলেন। এই সংযত সর্ব্বত্যাগী তপস্বী

কঠোর সাধনা, দুষ্কর তপশ্চর্য্যা দ্বারা সার সত্যের সন্ধান পাইলেন। তাই তিনি সর্ব্বাগ্রে "সামাজিক দাঁড়ের উপরে জড়ান পা দুটোর শক্ত শিকল" এক কোপে কাটিতে গেলেন। যে "মূল কথাটাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়," মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস মঞ্চ হইতে সেই মূল কথাটাই প্রচার করিলেন, এবং সাথে সাথে সংকীর্ণ ভেদাভেদ জ্ঞানে জর্জ্জরিত হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ নিজের জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া লইলেন।

সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ হইতে হিন্দু সমাজ অনেক অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ বর্ণভেদ তুলিয়া দিলেন, ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তি টলটলায়মান হইল। অথণ্ড প্রতাপশালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হিন্দু সমাজকে যে প্রবল ধাক্কা দিলেন,সে ধাক্কার গতিবেগ সামলাইতে—জ্ঞানী এবং ভট্ট কুমারিল গুরু আচার্য্য শঙ্করের তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও অসামান্য মনীষার আবশ্যক হইল। সাম্যবাদী উদার ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় সমস্ত হিন্দুস্থান প্লাবিত হইয়াছিল। 'সর্ব্বগ্রাসী' ইসলামের কবল হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কবীর, নানক ও চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিয়া উদার সাম্যবাদী ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। তারপর, খৃষ্টান মিশনারীরা আসিয়া হিন্দু সমাজকে আর একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের তরফ হইতে রাজর্ষি রামমোহন তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন—হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। দয়ানন্দ সরস্বতী "আর্য্য সমাজ" স্থাপন করিলেন, খৃষ্ট-পন্থী কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা দিলেন—হিন্দুধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের কবল হইতে কতক পরিমাণে অব্যাহতি পাইল বটে কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মিলেন, হিন্দুধর্ম্ম নবজীবন লাভ করিল; স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিসঞ্জীবনীমন্ত্রে নূতন প্রেরণায় নবভাবে হিন্দুসমাজ উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। জৈন, বৌদ্ধ, ইস্‌লাম, খৃষ্টান—কত ধর্ম্মের কত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া হিন্দুসমাজ আজও টিকিয়া আছে—সেই কথা স্মরণ করিলে হিন্দু সমাজের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া আইসে।

তবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে যথেষ্ঠ গলদ রহিয়াছে, এ কথাও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে হইবে।—বিরাট হিন্দুসমাজের এক পঞ্চমাংশ লোক আজ অস্পৃশ্য। এই অন্যায় অবিচারের পাপ—পঙ্কে হিন্দুজাতি বহুকাল হইতে আকণ্ঠ ডুবিয়া আছে। হিন্দুসমাজ আজ অচলায়তনের গণ্ডীবেষ্টিত—ঐ গণ্ডীর মধ্যে যুগযুগান্তরের আবিল আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া আছে। তাই মহাত্মা গান্ধী এই "অজিয়ান অস্তাবল" পরিষ্কার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন—আপনার অসামান্য তপস্যার আগুনে ঐ আবর্জ্জনারাশি পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে আজ তিনি বদ্ধপরিকর। "অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক" এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল কংগ্রেসমঞ্চ হইতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের বাণী দেশে দেশে প্রচার করিয়াছেন। স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ আর একটা

প্রবল ধাক্কা খাইয়াছে; শঙ্কর ও রামানুজের জন্মভূমি হয়ত সে ধাক্কা সহজে সামলাইতে পারিবে না; নানক দয়ানন্দ কিম্বা চৈতন্য-কেশবচন্দ্র-বিবেকানন্দের দেশও সে ধাক্কায় ঘুরপাক খাইয়া পড়িবে কি?

হিন্দু সমাজের সংস্কার-সমস্যা মান্দ্রাজ অঞ্চলে যেমন জটিল তেমন আর ভারতবর্ষের কোন দেশে না। মান্দ্রাজের অস্পৃশ্য 'পঞ্চম পেরিয়া' কূপের জল স্পর্শ করিলে, সে জল অশুচি ও পানের অযোগ্য হয়—এমন কি রাস্তা দিয়া হাঁটিলেও সে রাস্তা কলুষিত হয়, উচ্চজাতির সংস্পর্শে আসিতে পারা ত দূরের কথা, তাঁহাদের বাড়ীর চতুঃসীমায়ও প্যারিয়া পাও বাড়াইতে পারে না।—লম্বা টিকিওয়ালা, বড় বড় ফোঁটা তিলকধারী ব্রাহ্মণ যদি প্যারিয়ার ছায়াটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন তবে তাঁহাকে স্নান করিয়া ঐ কলুষ কালিমা ধুইয়া পবিত্র হইতে হয়—এমনই অশুচি মানুষের ছায়াটা! তাই প্যারিয়ার ব্রাহ্মণ-রাস্তায় চলাফেরা করিবার কোন অধিকার নাই। মানুষকে এমনতর অস্পৃশ্য করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আর কোন দেশের ধর্ম্মে বা ধর্ম্মতন্ত্রে দেখা যায় না।

কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশেও এই অস্পৃশ্যতার অনাচার যথেষ্ট আছে। সামান্য 'খাওয়া-ছোঁওয়া'র ব্যাপারেরও যে আমাদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। একজন নমঃশূদ্র বা মুসলমান আমাদের "হাইতনা"য় উঠিলে ঘটির জল 'মারা' যায়—কেহ কেহ হুক্কার জলও ফেলিয়া দেন—তাহাদের ছোঁওয়া জলটুকু প্রাণ অন্তেও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। অপর জাতির 'ছোওয়া' কোন খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করা ত মহাপাপ, উহা খাইলে 'জাতিপাত' হয়, সমাজে 'একঘরে' হইতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ঐ পাপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না! এই অযৌক্তিক আচারের বাড়াবাড়িতে হিন্দুয়ানি এখন 'ছুঁৎমার্গে' দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুর হিন্দুত্ব যে "ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসী"র ভিতর নয় এই মোটা কাণ্ডজ্ঞানটা কয়জন হিন্দুর আছে? এখন ত অধিকাংশ স্থলেই ভণ্ডামি এবং কপটতা চলে—যে সময়ে বরফ ও সোডা-লিমনেড খাই, সে সময় কে দিল, তাহা দেখি না, তাহার 'জাতি' তালাস করিনা—শুধু জলপান করিবার সময়ই দেখি পানিপাঁড়ে দিল কি পানি মিঞা দিল; এবং তদ্বারাই পানের যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হয়—এ জল শুচি ও স্বাস্থ্যকর কি না এ কথা আমরা কেহ বিবেচনা করি না। হোটেলে বা মেসে খাইবার সময় 'উড়ে বামুনে'র নাড়ী নক্ষত্রের খোঁজ লই না বটে কিন্তু আমরাই যখন 'সমাজে'র কর্ত্তা হই তখন আমাদের আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়—সমাজে "খাওয়া ছোওয়ার" ব্যাপারে আমরা ভয়ানক গোড়া হিন্দু হইয়া উঠি। ভণ্ডামী ও কপটাচারের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা ধোপা, যুগী, কৈবর্ত্ত অথবা নমঃশূদ্রদের ঘরে ঢুকিতে দেই না—এবং উহাদের অপেক্ষাও নির্দ্দয় ব্যবহার করি "অন্ত্যজ" 'ইতর' জাতির উপর। পতিত নীচ জাতি—স্বামী বিবেকানন্দ যাহাদের "Suppressed Class" বলিতেন—তাঁহাদের অবস্থা ত আমাদের সমাজে অতি শোচনীয়। হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর ইহাদের ছুঁইলে অপবিত্র হই; যাবৎ স্নান না করিব তাবৎ অশুচি থাকিতে

হইবে। ইহাদের স্পর্শ করিয়া জল ফোটা গ্রহণ করিলে হিন্দুর হিন্দুয়ানি লোপ পায়—সমাজের চক্ষে উহারা আজ এতই হেয় এবং ঘৃণ্য।*

অথচ যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই অমানুষিক নির্দ্দয় ব্যবহার করি, মানুষকে ইতর জন্তু অপেক্ষাও হেয় এবং নীচ বিবেচনা করি, সে ধর্ম্ম কিন্তু বলে যে, মানুষকে যে অশ্রদ্ধা করে তাহার অকল্যাণ হয়—আমাদেরই ধর্ম্ম বলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ' 'যত্র জীব তত্র শিব' সুতরাং মানুষকে অস্পৃশ্য-অপবিত্র মনে করা মহাপাপ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে "হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র।" তাই মহাত্মা গান্ধী যথার্থই বলিয়াছেন যে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম কোন জাতিকেই অস্পৃশ্য মনে করে না।

আমরা কথায় কথায় ধর্ম্মের দোহাই দেই বটে কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের কথা ত' আমরা শুনি না—আমরা মানি ঐ ধর্ম্মতন্ত্রকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "মনে রাখা দরকার ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়, মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।" বস্তুতঃ, শাস্ত্রের দোহাই দিলেও আমরা শাস্ত্র মানি না, শাস্ত্রের মর্ম্ম কথা বুঝি না, আমরা লোকাচারের বশীভূত, আমাদের সমাজে দেশাচারেরই প্রবল প্রতাপ। মনু-পরাশর আজ লোকাচার ও দেশাচারের চাপে পড়িয়া

---

* আচার্য্যদেবের নিকট শুনিয়াছি যে ডায়মণ্ডহারবার হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে ভজনা নামক স্থানে দুই তিন হাজার অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী গৃহস্থ আছে, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাদের "বড় হাঁড়ি" বলে। অন্ধ গোঁড়ামির বশে স্থানীয় স্কুলে তথাকথিত "বড় হাঁড়ি"দের ছেলেদের ঢুকিতে দিতে আপত্তি করা হয়, এই আপত্তির অজুহাতে উক্ত সম্প্রদায় নিজেরাই একটী স্কুল খুলিয়াছেন, তাঁহাদের সাদর অথচ সকরুণ আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া গত ফাল্গুন মাসে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাহাদের এক বিরাট্‌ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জানিতাম না,—আমার ধারণায় কুলাইত না যে আজও বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতার এহেন অনাচার, ঈদৃশ বাড়াবাড়ি, বিদ্যমান থাকিতে পারে! ট্রামে, রেল-ষ্টীমারে ত নানা জাতির লোক একত্র যাতায়াত করে, সে সময় "উচ্চ জাতি"দের ছুঁৎমার্গের বড়াই কোথায় থাকে?

আমাদের "বাঙ্গাল দেশে" নমঃশূদ্রের সংখ্যা নেহাৎ কম না। নমঃশূদ্রেরা "চণ্ডাল" না হইলেও, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদিগকে "চণ্ডাল" ভাবে—"চাড়াল" বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উঁহারা হিন্দুসমাজভুক্ত,—হিন্দুর দেবদেবী, হিন্দুর আচার-ব্যবহার,—"হিন্দুয়ানি"র সবই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, অথচ এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে হিন্দু নরসুন্দরেরা ক্ষৌরী করিতে নারাজ। নাপিতেরা মুসলমানদিগকে অসঙ্কোচে ক্ষৌরী করেন কিন্তু যত আপত্তি দেখা দেয় হিন্দু নমঃশূদ্রের ক্ষৌরী করিবার বেলায়!! মুসলমান—বাদশাহের জাতি, আর যে নমঃশূদ্র খৃষ্টান হইয়াছে সে-ত "রাজার জাতি," তাই তাঁহাকে ছুঁইলে কোন দোষ নাই!!!

কিন্তু হিন্দুসমাজের নমঃশূদ্রকে স্পর্শ করিয়া স্নান না করিলে যে ধর্ম্মলোপ পায়—হায়, হিন্দুর এমন সনাতন ধর্ম্মকে আমরা কি করিয়া ফেলিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা।"——লেখক।

গিয়াছেন, উঁহাদের আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই—যদি সে শক্তি থাকিত তবে এদেশে বিধবা বিবাহের মত অনেক অভিনব ব্যাপার বহাল হইয়া যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কত গভীর দুঃখেই না বলিয়াছিলেন—"হায়রে দেশাচার!"—তিনি দেশাচারের অসীম শক্তি শেষে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার প্রথমে ধারণা ছিল যে এ দেশের লোক শাস্ত্র মানিয়া চলে। কিন্তু পরে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার এ ধারণা তাহা মিথ্যা—এদেশে লোকাচারই প্রবল প্রভুত্ব করিতেছে, তিনি যদি একথা আগে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে বোধ হয় দিবারাত্র না-খাইয়া না-শুইয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিতে যাইতেন না। মনে পড়ে তিনি নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন—এ দেশের লোক শাস্ত্রের অনুশাসন মানে না ইহা আগে বুঝিলে, বিধবা বিবাহ যে হিন্দু শাস্ত্রের বিরোধী নয় বরং সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত—একথা তিনি প্রমাণ করিতে যাইতেন না।

মহাত্মা গান্ধীর কিন্তু গোড়ায়ই চমক ভাঙ্গিয়াছে; তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত শাস্ত্রের মায়া-পাশে আবদ্ধ হয়েন নাই। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি সেই মান্ধাতার আমলের জড়াজীর্ণ মনুপরাশর তুল্য প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় লয়েন নাই, আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে সার সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহারই বলে তিনি মনুপরাশরের প্রমাণ পায়ে ঠেলিয়া, তাঁহাদের বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, কংগ্রেস মঞ্চ হইতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের বাণী দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতেছেন। আহম্মদাবাদে 'পতিত জাতি'র সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "হয়ত, হিন্দুধর্ম্ম অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলিয়া মনে করে না। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া আমি কোন বাদ-বিতণ্ডা করিতে চাইনা, ভাগবত বা মনুস্মৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, অস্পৃশ্যতা যে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত নয়, একথা প্রমাণ করা আমার পক্ষে দুষ্কর বা দুঃসাধ্য হইতে পারে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছি বলিয়া আমি দাবী করি। অস্পৃশ্যতা অনুমোদন করিয়া হিন্দুয়ানি "পাপ কর্ম্মই করিয়াছে।"

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করেন যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের কোন অঙ্গ নয়। তিনি বলিয়াছেন যে অস্পৃশ্যতা যে-হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ সে-হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার জন্য নয়। 'অস্পৃশ্যতা' ধর্ম্মের অনুজ্ঞা হইতে পারে না, উহা শয়তানের কীর্ত্তি। যে ধর্ম্ম গোমাতার পূজার্চ্চনার বিধি দিয়াছে, সে ধর্ম্ম যে মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে হিংস্র পশুর মত বয়কট করিতে সম্মতি দিতে পারে, ইহা মহাত্মাজি বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর এই অস্পৃশ্যতা আমাদের যুক্তির বিরোধী; মানুষের অন্তরে দয়া, অনুকম্পা বা প্রেমের যে স্বাভাবিক বৃত্তি আছে তাহারও বিরোধী, মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে "ভগবান কতকগুলি মানুষকে অস্পৃশ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বলিলে ভগবানের নিন্দা করা হয়—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও

আশীর্ব্বাদ কোন জাতির এক চটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না। ভগবান আলোর আধার, অন্ধকারের ধার তিনি ধারেন না, ভগবান্ প্রেমময়, ঘৃণা বা বিদ্বেষের স্থান তাঁহাতে হয় না, ভগবান সত্যস্বরূপ, মিথ্যা তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারে না। ভগবান্ সর্ব্ব নিয়ন্তা—আমাদের অহঙ্কারের কি আছে? আমরা ত সব ধূলি কণা, ধূলায় মিশিয়া যাইব সুতরাং ভগবানের সৃষ্ট নিকৃষ্টতম প্রাণীরও সম্মান করা উচিত। ছিন্ন মলিন বস্ত্রধারী সুদামকেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান করিয়াছিলেন। তুলসীদাস বলিয়াছেন ধর্ম্ম বা ত্যাগের উৎস হচ্ছে প্রেম এবং এই নশ্বর দেহটাই অধর্ম্ম বা অহঙ্কারের মূল।" এবং এই অধর্ম্ম বা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ মানুষকে নীচ মনে করে, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করে। মহাত্মাজির ধর্ম্ম হচ্ছে সত্য, প্রেম ও অহিংসা। তাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক না কেন, তাহা যদি যুক্তি ও বিবেকের বিরোধী হয় তবে তিনি ঐ ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলিতে 'নারাজ'। মহাত্মাজি জানেন "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।" তাই তিনি বলিয়াছেন, "I reject any religious doctrine that does not appeal to Reason and is in conflct with Morality."

রবীন্দ্রনাথের মতই মহাত্মাজী বলেন যে যাহা আমাদের যুক্তির বহির্ভূত, যাহা আমাদের অন্তরাত্মা অনুমোদন করে না, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাত্মা গান্ধীও বিশ্বাস করেন যে অমুক মহাপুরুষ বলিয়াছেন, অতএব সত্য, এ ভাবে ত সত্যকে পাওয়া যায় না—সত্যকে লাভ করিতে হইলে, নিজে সত্যকে অনুভব করিয়া লইতে হইবে। এক্ষেত্রে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলিবে না। তাই মহাত্মা গান্ধী জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি কাজেই বিবেকের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখেন—নিজের যুক্তি বিচার ও বিবেকানুমোদনের উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দেন। বিগত কংগ্রেসে ভোট দিবার সময় প্রত্যেক সভ্যকে তিনি নিজ নিজ বিবেকানুযায়ী ভোট দিতে বলিয়াছিলেন। বিবেক অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠতর বন্ধু আর নাই, বেদের আজ্ঞাও যদি এই বিবেকের বিরোধী হয়, যুক্তি ও নীতিধর্ম্মের সঙ্গে খাপ না খায়, তবে মহাত্মাজী বেদও অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত। তিনি বলিয়াছেন যে বেদে যদি থাকে যে যজ্ঞে একটী অকলঙ্ক অশ্ব আহুতি দিতে হইবে তবে তিনি এ বেদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন,—বেদের এ অনুমোদন গ্রাহ্য করিয়া কস্মিনকালেও যজ্ঞে তিনি অশ্বাহুতি দিবেন না। কারণ মহাত্মা গান্ধী শাস্ত্র অপেক্ষা সত্যকেই বড় বলিয়া জানেন। শরৎবাবু লিখিয়াছেন," যা সত্য তাকেই সকল সময়, সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে, তাতে বেদই মিথ্যা হোক আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক্, সত্যের চেয়ে এরা বড় জিনিষ নয়। সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বশে হোক, মমতায় হোক, সুদীর্ঘদিনের সংস্কারে হোক, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।" সত্যগ্রাহী গান্ধীরও ঠিক এই কথা। সত্যকে সকলের সেরা মনে করেন বলিয়াই তিনি সত্যের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণ দিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধীর কাছে সত্যই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই সত্যকে ত্যাগ করিয়া

তিনি স্বরাজ বা স্বাধীনতাও চাহেন না। এইখানে লোকমান্য তিলকের কথা মনে পড়ে। তিলক বলিতেন যে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি না করিতে পারেন এমন কোন কাজ নাই—"I will sacrifice even Truth for the Freedom of my country" অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য এমন কি সত্যকেও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। আর মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে সকলের আগে চাহেন তিনি সত্যকে—সত্য বিবর্জ্জিত স্বরাজ বা স্বাধীনতা তিনি কামনা করেন না—"I am ready to sacrifice even Freedom for the sake of Truth"—সত্য ও স্বাধীনতার মধ্যে গান্ধীজি সত্যকেই আগে আলিঙ্গন করিবেন; স্বরাজের আগে তিনি সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন; এবং এইখানেই স্বাধীনতা মন্ত্রের উপাসক বালগঙ্গাধর তিলক ও সত্যাগ্রহী মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর সাধনাপ্রণালীর পার্থক্য বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে তিলক ও গান্ধীর মধ্যে কে বড় কে ছোট সে মীমাংসা করিতে যাওয়া আহাম্মকি। তবে মহাত্মা গান্ধী সত্যের উপর কত জোর দেন সেই কথাটাই বলিতেছিলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত এই সত্যাগ্রহী তাপসেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে "সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ" এবং "সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যা কখনও জিতিতে পারে না; সত্যবলেই দেবযান মার্গ লাভ হয়।" তাই মহাত্মা গান্ধী শুধু শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া চির-আচরিত অস্পৃশ্যতাকে আমল দিতে পারেন নাই। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, লৌকিক শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া বিবেকের বাণী অনুসারে তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। সব অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকাই ত সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র। গান্ধিজী বলিয়াছেন, "Satyagraha is Search for Truth" সত্যাগ্রহ হচ্ছে সত্যানুসন্ধান; এবং সত্যাগ্রহী গান্ধী হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতাকে অত্যন্ত অসত্য বলিয়া মনে প্রাণে বুঝিয়াছেন; তাই তিনি বলিয়াছেন—"I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism." "I consider untouchability to be a heinous crime against humanity" "Untouchability is not a sanction of religion, it is a device of Satan." মহাত্মা গান্ধী বুদ্ধ, খৃষ্ট, কবীর, নানক, বা চৈতন্যের মত সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ, সত্যকে পাইতে তাঁহার শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয় নাই—যখন তিনি বার বৎসরের বালক অস্পৃশ্যতার অন্যায় বোধ তাঁহার তখনই জন্মিয়াছিল—অস্পৃশ্যতা যে মহা পাপ এ ধারণা বার বৎসর বয়স হইতেই মহাত্মা গান্ধীর মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে। বাড়ীর মেথর অস্পৃশ্য "উকাকে" স্পর্শ করার নিষেধ সত্ত্বেও গান্ধিজী দৈবাৎ উকাকে ছুইয়া ফেলিতেন; মাতৃ আজ্ঞায় তখনই স্নান করিয়া শুচি হইতেন বটে; স্কুলে বসিয়া অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করিয়া, রাস্তার আগন্তুক মোছলমানকে ছুইয়া পিতামাতার বাধ্য ছেলে মোহনদাস ঐ অস্পৃশ্যতার দোষ খণ্ডাইতেন বটে; কিন্তু এই অস্পৃশ্যতা অন্যায়, অশাস্ত্রীয় অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইত্যাদি বলিয়া তিনি সর্ব্বদা তাঁহার মায়ের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেন। রামচন্দ্রকে যে পাটনী গঙ্গা পার করিয়াছিল, তাহার

বংশধরেরা আজ অস্পৃশ্য হয় কি প্রকারে? যে দেশে ভগবানের এক নাম "পতিত-পাবন" সে দেশে মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করা পাপ নয় কি? এই সব চিন্তায় তরুণ মোহনদাস গান্ধী বিভোর থাকিতেন।

সুতরাং মহাত্মা গান্ধী বাইবেল, রাস্কিন অথবা টলষ্টয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবর্ষে এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এ ভাবের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের বীজ গান্ধীর অন্তঃকরণেই নিহিত ছিল—বাইবেল বা খৃষ্টানের সংস্পর্শে আসার পূর্ব্বেই তিনি অস্পৃশ্যতার ভয়ানক বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি এই সামাজিক অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—মহাত্মাজি নিজেও বলিয়াছেন,—'বার বৎসর বয়সেই আমি অস্পৃশ্যতাকে পাপজনক মনে করিতাম।'

তিলকের মত অগাধ অসামান্য পাণ্ডিত্য গান্ধিজির নাই, লোকমান্যের মত মহাত্মাজি কথায় কথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া দৃষ্টান্ত দিতে পারেন না। গান্ধীজি সংস্কৃত জানেন বটে কিন্তু বেদ ও উপনিষদের তিনি অনুবাদই পাঠ করিয়াছেন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত না হইলেও শাস্ত্রার্থ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে মহাত্মা গান্ধী বৃথা বাগবিতণ্ডা ভালবাসেন না, তিনি জানেন ঝগড়া করিয়া কোন 'ফয়দা' নাই, তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিতে পারিলেই 'কেল্লা ফতে' হইবে না, 'কাজ হাসিল' করিতে চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস—অকপট আন্তরিকতা। তাই অস্পৃশ্যতা যে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে শাস্ত্র হইতে শ্লোক তুলিয়া একথা প্রমাণ করিতে যাওয়া মহাত্মা গান্ধী হয়তঃ পণ্ডশ্রম মনে করেন—এ বিষয়ে তাঁহার অসমর্থতার কথাও তিনি অস্বীকার করেন নাই। তবে এ কথাও তিনি বলিয়াছেন শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কি হইবে? "The devil has always quoted scriptures. But scriptures cannot transcend Reason and Truth They are intended to purify Reason and illuminate Truth," শাস্ত্রের ত কত কূট অর্থ হয়। ছলনা ও প্রলোভন যাহার সম্বল এমন যে শয়তান সেও ত সব সময় শাস্ত্র আওড়াইয়া আমাদের ভুলাইতে চেষ্টা করে। তবে শাস্ত্র মানুষের বিচারশক্তি—যুক্তি ও সত্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সত্য ও যুক্তিকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে না বলিয়া শাস্ত্রের মহিমার কিছু হানি হয় না, শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে সত্যকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করা, বিচার শক্তির জঞ্জাল দূর করিয়া তাহাকে শুচি এবং পবিত্র করা। শাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজিরও মত এই যে "The letter killeth, It is the spirit that giveth the light." মহাত্মাজি হিন্দুশাস্ত্রের ঐ 'Spirit' বা সারমর্ম্ম আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কোন জাতিকেই অস্পৃশ্য মনে করে না।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির আর একটী অভিযোগ এই—অস্পৃশ্যতা সমাজের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করে নাই। মনুষ্যত্বের অপমানকারী জঘন্য অস্পৃশ্যতা সমাজের লক্ষ লক্ষ লোককে

suppressed (পাতিত) করিয়া রাখিয়াছে—এই পতিত জাতিরা আমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন নয় বরং সমাজের বহু হিত সাধনে রত আছেন। যত শীঘ্র হিন্দুধর্ম্ম এই অস্পৃশ্যতা পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় ততই হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল হইবে।

যাহাদের আমরা এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অপমান করিয়া আসিয়াছি আজ অপমানে তাহাদের সমানই হইতে হইয়াছে। মহামতি গোখেল বলিতেন আমরা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পেরিয়া ('Pariahs of the Empire') হইয়া আছি তাহা আমাদেরই পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যাহাদের আমরা নীচে—পায়ের তলে চাপিয়া রাখিয়াছি, তাহারাই আবার আমাদিগকে পিছন হইতে টানিতেছে—যে অন্ত্যজ জাতিদের 'ইতর' বলিয়া আমরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, তাহারাই আবার আমাদিগকে Suppressed (পাতিত) করিয়া রাখিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দও একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই স্বামীজি এই পতিত পদদলিত অস্পৃশ্য জাতিদের টানিয়া তুলিবার জন্য—সমাজে তাহাদের মেলামেশার সমান অধিকার দিবার জন্য—প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাত্মা গান্ধীও "জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত"। ভারতের মৃত্তিকা যাহাদের স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ যাহাদের কল্যাণ, গান্ধীর মত স্বামীজিও ছিলেন তাহাদেরই একজন। তাই স্বামীজি বলিয়াছেন, "ভুলিওনা, নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই; হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি দেখিয়া স্বামীজি ব্যথিতচিত্তে বলিতেন, "হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর ধরে খালি বিচার কচ্ছে ডান হাতে খাব কি বাম হাতে খাব; ডান দিক থেকে জল নেব কি বাম দিক থেকে; কট্ কট্ ক্রাং ক্রাং হিং হিং ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র তাহাদের অধোগতি হবে না ত আর কাদের হবে?" মহাত্মা গান্ধীও বলেন খাদ্যাখাদ্যের বিচারে, কাহার সাথে খাব-না-খাব এই তত্ত্বের আলোচনায় হিন্দুধর্ম্ম যদি প্রকাণ্ড আচার পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে চায়, তবে হিন্দুত্বের সার ভাগ অচিরে লোপ পাইবার খুব সম্ভাবনা—হিন্দুরা কি শুধু বাহ্যিক আচারের খোসাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিবে? জল ও দুধ একত্র মিশ্রিত থাকিলে হংস যেমন তাহার মধ্য হইতে জল বাদ দিয়া কেবল দুধটুকু পান করে, আমাদেরও তেমনি শাস্ত্রের অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সার-ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামীজির মত মহাত্মাজিও বুঝিয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম্ম এখন 'ছুঁৎমার্গে' দাড়াইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে দুর্ভাগ্য বশতঃ আজকাল শুধু 'খাওয়া এবং না-খাওয়া'র মধ্যেই যেন হিন্দুর হিন্দুয়ানি পর্য্যবসিত। এখানেও শুধু স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে। স্বামীজি ও মহাত্মাজির মধ্যে "পতিত সমস্যা"র সমাধানে অতি আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে!!

হিন্দু সমাজের এই অস্পৃশ্যতা বহাল রাখিবার পক্ষে মহাত্মা গান্ধী ত কোনো যুক্তিই খুঁজিয়া

পায়েন না। তাই এই পাপ-প্রথা সমর্থন কল্পে সংশয়াচ্ছন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন না। যুক্তি তর্ক ও বিবেকবাণীর বিরোধী যে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত। যুক্তির সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত বাণী যখন মিলিয়া যায়, মহাত্মাজির মতে, তখন যদি শাস্ত্র যুক্তিকে পায়ে ঠেলিয়া, স্বীয়প্রাধান্য স্থাপন করে তবে শাস্ত্র শুধু আমাদিগকে পাপের পথে,—অবনতির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে লইয়া যাইবে।

তাই সত্যের আলোকে সমুদ্ভাসিত সত্যাগ্রহী গান্ধী আজ হিন্দু সমাজ হইতে এই মিথ্যা অন্যায় অবিচারকে দূর করিতে জীবন পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "I should be content to be torn to pieces rather than disown the suppressed classes" আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ মহাত্মাজি তাঁহার জীবনের একটী সর্ব্বপ্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গোজাতির রক্ষণ এবং অস্পৃশ্য পতিত জাতির মুক্তি সাধন—এই দুইটী প্রবল বাসনা লইয়াই মহাত্মাজি আজও জীবিত—যখন এই দুইটী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে তখনই স্বরাজ আসিবে, এবং তাহাতেই তাঁহার মোক্ষ হইবে।

স্বরাজ! "Swaraj is as unattainable without the removal of the sin of untouchability as it is without Hindu-Muslim unity" বিরাট হিন্দুসমাজের একপঞ্চমাংশ লোক অস্পৃশ্য, সমস্ত ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ত মোটে ছয় কোটী! তাই রাজনৈতিক হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অপেক্ষা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সমস্যা যে কোন অংশে ছোট বা তুচ্ছ নয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতে স্বরাজ লাভের পক্ষে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণেও মহাত্মাজি বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতা স্বরাজ লাভের পথে একটী প্রবল প্রত্যূহ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের মতন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণও স্বরাজ লাভের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়।" স্বরাজলাভের প্রোগ্রামে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনকে তিনি প্রথম স্থান দিতেও কুণ্ঠিত নহেন—হিন্দুসমাজ হইতে এই কলঙ্ককালিমা দূর না করিলে, স্বরাজ শব্দের কোন অর্থই হইবে না—সুতরাং স্বরাজলাভের পথে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন একটী প্রধান সম্বল।

আর শুধু ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার জন্যই নহে, সনাতন হিন্দুজাতির হিতার্থে, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে সমাজ হইতে আমাদের আজ অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে। আমরা স্বরাজ লাভ করি আর না করি, বৈদিক দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং উহাকে জীবন্ত সত্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে হিন্দুদের আপনাদিগকে আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে। এবং এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যাপারটী, মহাত্মা গান্ধীর মতে, হিন্দু-সমাজের উচ্চ জাতিদিগের তপস্যা বিশেষ, হিন্দুধর্ম্ম ও আপনাদের আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের এই তপস্যা করা কর্ত্তব্য। যাহারা অস্পৃশ্য তাহাদের ত শুদ্ধির কোন আবশ্যকতা নাই—শুদ্ধির দরকার এই তথাকথিত উচ্চ জাতিদের।

তথাকথিত ইতর অস্পৃশ্য পতিত জাতিরা আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, নিজেদের জন্মগত অধিকার দাবী করিতেছে, তাহাদের আর কোন মতে পায়ের তলে চাপিয়া রাখা যাইবে না; হিন্দুসমাজকে ভাবী বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, সময় থাকিতে থাকিতে সমাজের অন্যায়-অবিচার দূর করা উচিত ; সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন না করিলে, স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত "শূদ্র প্রধান্যে" সমাজসৌধ অনায়াসে ধ্বসিয়া পড়িতে পারে; তাই মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের আন্দোলন হিন্দুসমাজের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক বলিয়াই মনে হয়—তবে হিন্দুসমাজের গলদ অনেক—হিন্দুসমাজ মহাত্মার বাণী পালন করিবেন কি না কে জানে ?

আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের একটা অবিকল ছবি রবিবাবু আঁকিয়াছেন :—গাছ তলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে, সেই সত্যকে দেখিয়াছে" অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে বেটা সর্ব্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোপা নাপিত বন্ধ"—আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল—"বাবা বাঁচিয়া থাক।"

সংসারে আমাদের "ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে বিচারে যত সঙ্কীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তা" সব আজ দূর করিতে হইবে। নতুবা "কর্ম্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা, জড়তা, অপমান পদে পদে বাড়িয়াই চলিবে।"

আর একটা মোটা কথা এই—হিন্দুসমাজে আমরা যদি ঐ অস্পৃশ্য পতিত জাতিদের ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করি, তবে কোন্ মুখে স্বরাজ দাবী করিব, কোন্ মুখে রাষ্ট্র-ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবী করিব ? যে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে চায় না, সে কি স্বাধীনতা-লাভের যোগ্য ? আমরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যদি স্বরাজ বা স্বাধীনতা চাই, তবে আগে ঐ নিম্ন-শ্রেণীর পতিত জাতিদের অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া তাহাদের সামাজিক স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, মহাত্মা গান্ধীও সেই কথা বলিয়াছেন—অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন স্বরাজলাভের অগ্রদূত হইবে। হিন্দুরা কস্মিন্ কালেও স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত হইবে না কিম্বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না, যদি হিন্দু সমাজ হইতে এই অস্পৃশ্যতা কালিমা মুছিয়া ফেলা না হয়। মহাত্মা গান্ধী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে ব্রতী থাকিবেন—গান্ধীজি নিজে একটী অস্পৃশ্য জাতীয়া মেয়েকে আপন কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন—তিনি শুধু অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের উপদেশবাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই, যাহা প্রচার করিয়াছেন অক্ষরে অক্ষরে তাহা স্বয়ং প্রতিপালনও করিতেছেন—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখানো না যায়॥"

কর্ম্মবীর সত্যাগ্রহী গান্ধীজি এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাই মহাত্মাজির অস্পৃশ্যতা আন্দোলন সফল হইলেও হইতে পারে—ভবিতব্যের দ্বার কে উদ্‌ঘাটন করিবে?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আহম্মদাবাদে অস্পৃশ্যসম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন:—"আমি মোক্ষ কামনা করি—পুনর্জ্জন্মের আকাঙ্ক্ষা রাখি না, কিন্তু যদি আমার আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তবে যেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের ঘরে না জন্মিয়া অস্পৃশ্য, অতিশূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি—নেলোর (Nellore) বসিয়া ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করিয়াছিলাম। কারণ, অস্পৃশ্যের ঘরে জন্মিলে, অস্পৃশ্যজাতির দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, লাঞ্ছনা এবং অপমান সবই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া, নিজের এবং অস্পৃশ্যজাতির এই শোচনীয় অবস্থার মুক্তিসাধনে ব্রতী হইতে পারিব। আজিও আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যে কোন বাসনা ফলবতী হওয়ার পূর্ব্বে,—এই অস্পৃশ্যজাতির সেবা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, অথবা আমার হিন্দুধর্ম্মের সাধনা শেষ না করিয়া,—আমি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তবে যেন হিন্দুধর্ম্মের সাধনার সমাধান করিতে এই অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করি!"

হিন্দুসমাজের এই অধঃপতিত পদদলিত অস্পৃশ্য জাতিদের জন্য এত আন্তরিক টান, এত সুগভীর সহানুভূতি, এত বুকভরা, আপনা-ভোলা ভালবাসা স্বামী বিবেকানন্দেরও ছিল কিনা সন্দেহ।

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ

বসন্ত-প্রয়াণ

আমার বসন্ত এসে ফিরে গেছে সখা!
ডেকে ডেকে সারা হয়ে কোকিল যে মূক;
দখিণা বাতাস আজ কোথা পলাতকা,—
চপলা বাসনা ভরে দোলায় না বুক!
আমার মাধবী-কুঞ্জে ফোটে নাই ফুল,
ভ্রমরের গুঞ্জরণ নীরব সেথায়,
নব-প্রাণ-স্পন্দনেতে হইয়া আকুল
পাখীরা ললিত তান শোনাবে না হায়!
বসন্ত গিয়াছে,—গান থেমেছে পাখীর।
উদ্দাম প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া ধূলি
এসেছে পাগল ঝড় কাল-বৈশাখীর
বক্ষ মোর রুদ্র তালে উঠে তাই দুলি।
বসন্তের সাথে গেছে হাসি-গান-প্রীতি।
কণ্ঠভরা আছে শুধু জ্বালাময়ী গীতি!

শ্রীসুনীতি দেবী

আলোকের এই ঝরণা ধারায়

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল ; বিছানায় উঠে ব'সে পাশের জানালাটা খুলে দিলুম।

আজ ক'দিন হো'ল ক'লকাতার বদ্ধ আব-হাওয়া থেকে মুক্তি পেয়েচি, তাই ভোরের আলো-ভরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে আজ আমার ভারী ভালো লাগ্‌ল। ক'লকাতার ধূম-বিমলিন ভোর বেলা দেখ্‌লে আমার রাগ হয় ; কি করেচে মানুষ এমন সুন্দর জিনিষটাকে ? কেবল কি মানুষ সব বস্তু প্রয়োজনের নিক্তিতে মাপ করবে ?

জানালা খুলে দিলুম। ঘরে আলোর বন্যা এল। ভোরের এই সদ্য-জাগা আলো চারিদিক্ এমন একটী অপূর্ব্ব শুচিতায় সুষমায় ভ'রে দিয়েছে যাতে অবাক না হ'য়ে থাকা যায় না।

কিন্তু কেন অবাক হব ? কি জানি ! এমন অনেক জিনিষ পৃথিবীতে আছে যার কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ তাকে মনে মনে অস্বীকার ক'রে উপায় নেই।

তাই আমার ক'দিনের দেখে-অভ্যস্ত ঐ পাশের বাড়ীর মেয়েটীও আজ সকালে যেন আমার কাছে নতুন হ'য়ে দেখা দিলে। সবে মাত্র সে বিছানা ছেড়ে উঠেচে, তার দেহের জড়তা এখনও কাটেনি। দেওয়ালের পাশ দিয়ে যে শিউলি গাছটী তার বাঁকা দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারি তলে সে চুপ ক'রে। মনে হ'চ্চে যেন ওর কোনো কাজ নেই, কেননা কোনো রকম কাজের পরিচয় আমি দেখ্‌তে পাচ্চি না আমার এই গরাদের ফাঁক দিয়ে অল্প পরিচয়ের মধ্যে।

বাড়ীতে হয়তো ওর কাজ আছে, তবু সে অপলকে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ; ভোরের এই নবীনতা এই যা আমাকে এমন ক'রে বিহ্বল ক'রে তুলেচে সে হয়তো এই মেয়েটীর মনেও বিস্ময়ের ঢেউ তুলেচে। আজ হঠাৎ বুঝি তার মনে পড়েচে, চির পরিচিতের মধ্যে হঠাৎ এত রহস্য কোথা থেকে আত্ম প্রকাশ ক'রলে ?

আলো-ভরা পৃথিবী। কোন্ সুদূর থেকে আস্‌চে এই অনাবিল আলোক ধারা পৃথিবীকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিতে ; রোজই সে আসে তা'র আনন্দের বার্ত্তা নিয়ে, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সে যেন আমার মনের কোন্ ফাঁক্ দিয়ে আমার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ ক'রেচে। তাই আমার পৃথিবীকে আজ এত ভালো লাগ্‌চে।

কিন্তু ঐ যে ছোট ফুট্‌ফুটে মেয়েটী একলা দাঁড়িয়ে, ও কি ভাব্‌চে ? হয়তো ও কিছুই ভাবচে না, কেবল পুষ্প-কলিকার মতো অবাধ লীলায় আপনার অস্ফুট মনটী মেলে দিয়েচে,—প্রশ্ন তার মনে কিছুই নেই, কেবল সেখানে আছে অপার বিস্ময়। তার মন গ্রহণ করে সমস্ত আনন্দ, তার হেতু জান্‌তে ইচ্ছে হয় না তার, তাই আনন্দ অখণ্ড, পূর্ণ। আর আমরা তাকে শতধা বিভক্ত ক'রে হেতু খুঁজে বার করতে গিয়ে তাকে একে-বারে হারিয়ে ফেলি ; কেননা, আনন্দের মধ্যে খণ্ডতা নেই, ভাগ ক'রে তাকে পাওয়া যায় না, হয় একেবারে নাও না হয় নিওনা। সহজ বুদ্ধি ভুলে যখন তাকে

বিচার করতে বসি, তখনি সে অসীম শূন্যে আত্ম-গোপন করে ; সে চ'লে গিয়ে তখন জানিয়ে দেয় যে, সে এসেছিল। কিন্তু তখন বিলাপ ছাড়া আর আমাদের কিছু সম্বল থাকে না।

কিন্তু ঐ যে মেয়েটী, সে এই আনন্দকে বিচার ক'রতে চায়নি, সমস্ত মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করেচে, তাই তার বিস্ময়ের, পুলকের অবধি নেই। হয়তো বাড়ীর কাজে বিলম্ব হওয়ায় তিরস্কার সইতে হবে, তবু তার হুঁস্ নেই।

মেয়েটীকে অন্য সময়ে যখন দেখি, তখনো তাকে আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু আজ সে নিখিলের সুষমা-সম্ভারের সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়ে এক অপূর্ব্ব শ্রী-লাভ করেচে। সে যেন আর একা একটী ক্ষুদ্র মানবী নয়, সে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের একটী অপরিহার্য্য অংশ, যাকে বাদ দিলে ভোরের এই আলো একটু যেন কম সুন্দর হ'য়ে যেত।

কিন্তু এত যে সৌন্দর্য্য আমাকে এমন ক'রে মোহিত করেচে, এর মূলে তো আমিই। বাস্তবিক, মানুষের এই একটা মস্ত গর্ব্ব করবার জিনিষ যে, সৌন্দর্য্য জিনিষটা আসলে তারই সৃষ্টি ; মানুষের মন যদি না থাক্‌ত, তা'হলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য কোথায় থাক্‌ত ? মানুষ বলে,—আমার চোখে এটী ভারী ভালো লাগ্‌চে—তবেই না সেই বস্তুটী সুন্দর হ'ল। এবং মানুষের মনই আসলে সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ব'লে সৌন্দর্য্যের মাপ-কাঠি প্রত্যেকের বিভিন্ন। এই যে আজ আমি নবোদিত অরুণের প্রকাশকে এত ভালো ব'ল্‌চি, এ আলো আমি না থাকলেও পৃথিবীতে আস্‌ত কিন্তু তখন সে আস্‌ত কেবল কাজ ক'রতে, তাকে সুন্দর ব'লে অভিনন্দন কে দিত ? আমার মনে হয়, মানুষের হাজার দোষই থাক্, তার এই একটা মস্ত গৌরবের জিনিষ আছে যে, বিশ্বকে সে সুন্দর ক'রে তুলেচে।

তা' ছাড়া, মানুষ তার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দিয়ে নিখিলকে রমণীয় ক'রে তোলার সঙ্গে নিজেও সুন্দর হ'তে চলেচে। নইলে ওই ছোট মেয়েটী তার অপূর্ণ সৃজন শক্তি দিয়ে তার আপন কল্প-লোককে সুন্দর করতে গিয়ে নিজে এত সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌ল কিসে ? নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে এমন ক'রে হারিয়ে গেছে যে, আর তাকে আলাদা ক'রে চেনবারই উপায় নেই।

পুরুষের চেয়ে কিন্তু মেয়েদের মন আরো সজীব, তাই আরো সৃষ্টিনিপুণ। প্রত্যেক নারী তাই তার আপনার চারিধারে একটী ক'রে জগৎ সৃষ্টি করে, যা থাকে কেবল সৌন্দর্য্যে ভরা। আজকের ঐ ছোট মেয়েটীও তার পূর্ণ মন নিয়ে একটী এমনি সৌন্দর্য্য-লোক সৃষ্টি ক'রবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে.........

এই খানে পুরুষের মস্ত বড় পরাজয়, সে দু'দিনেই বাহিরের কোলাহলে আপনার সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, আর চিরকাল আক্ষেপ ক'রে মরে। পুরুষ তাই কখনোই নারীর মতো সুন্দর হ'তে পারে না।

ঘরে আমার আলোর জোয়ার ক্রমেই এগিয়ে আস্‌চে। সে যেন জীবন-কাঠি, এমন করে প্রাণকে ডাক দেয় যে, বিশ্ব তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না...............

স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছি।

দেখতে পেলুম একটী ছোট ছেলে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলে—দিদি!

মেয়েটী তার ছোট ভাইয়ের হাতে ধ'রে বল্লে—কি বল্‌চিস্?

অভিমান দেখিয়ে ভাই বল্লে—কেন তুই আমায় না ব'লে উঠে এলি?

দিদি ভাইকে আদর ক'রে বল্লে,—তুই যে ঘুমোচ্ছিলি ভাই!

ভারী চমৎকার দৃশ্য। চারিদিকে নিবিড় শান্তির সঙ্গে সুন্দর ভাবে সঙ্গত এই ছোট ঘটনাটী। কিন্তু ছোট ভাইয়ের এই ছোট দিদিটী কি সত্যিই ভাইয়ের ঘুমের ব্যাঘাত করতে চায়নি ইচ্ছা ক'রে, না সে ভুলেই গিয়েছিল তার কথা? আমার মনে হয়, এই ভুলে যাওয়াই ঠিক, কেননা, মন যদি একবার ছাড়া পায়, তখন তার মধ্যে অনন্ত চঞ্চলতা জেগে ওঠে, ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই এই মেয়েটীর আজ তার স্নেহের ছোট ভাইটীর কথা হয়তো মনেই ছিল না....................

একটা প্রশ্ন এইখানে র'য়ে গেল। যে-আনন্দের হিসাব অঙ্ক শাস্ত্রের বাইরে, সে আনন্দকে অপরের সঙ্গে ভাগ না ক'রে দেখ্‌লে তাকে সত্যি ক'রে উপভোগ করা যায় না। এই আনন্দকে যত ভাগ করা যায়, ততই সে বেড়ে ওঠে। একার আনন্দ বেদনারই নামান্তর মাত্র, এত খুসীর ভার মন সইতে পারে না। তাই যদি হয়, তবে ঐ মেয়েটী তার ছোট ভাইকে কেন তার সঙ্গে ক'রে আনে নি? হয়ত আনন্দের ব্যথায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে................

ভাই বোন চ'লে গেল।

আমি আমার ঘরে একা; মন আমার পূর্ণ হ'য়ে উপ্‌চে পড়চে............

নীচে থেকে ডাক এল,—চা খাবে এসো।

(২)

বিকাল বেলা। আমার ঘরের আলোর স্রোতে অনেকক্ষণ ভাঁটা সুরু হ'য়ে গেচে; দূরের ঐ তাল গাছটার ওপর যেন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আলোক তার বিদায়ের আগে একবার পৃথিবীকে শেষ দেখা দেখে নিচ্চে।

কোথাও ঘর থেকে বেরোইনি। জানালা আমার সারাদিনই খোলা, আর আমারো বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় এই গরাদের ফাঁকগুলির মধ্যে দিয়ে,—যতক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকি অবশ্য।

সহসা আমার ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল। আমার ছোট বোনের সঙ্গিনী মিলি ঘরে ঢুকেই বল্লে,—একি, সুধীরদা, আপনি চুপ ক'রে বসে?

বল্লুম,—কি আর করি......। মিলি কালো,—অন্ততঃ সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা কালো বলি। বয়স তার বারো কি তেরো।

আমার কথায় সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বল্লে,—কি আবার বল্বেন। সবাই যা করে।

—অর্থাৎ ?

—বেড়াতে যাওয়া।

মিলিকে আমার ভারী ভালো লাগে। সারা দেহ জুড়ে তার সজীবতা; কেবল মাত্র যেন একটা গভীর সুর তার কিশোর কালের হাল্কা রাগিণীর মাঝে অতি ক্ষীণভাবে বেজে উঠেচে, তাই সে সজীবতার মাঝে শৈশবের উচ্ছৃঙ্খলতা নেই; অথচ তার সমস্ত মাধুরীটুকু প্রতি পদে ধরা পড়ে।

বাস্তবিক্, কিশোরীর সৌন্দর্য্য এমন একটা শুভ্র, পেলব বস্তু যা কখনোই মনকে প্রলুব্ধ করে না, কেবল অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় ভ'রে দেয়।

মিলি কালো, কিন্তু আমার মনে হয় সে যেন নারী-রহস্যের একটা উন্মুখ শিখা, একদিন প্রজ্জ্বলিত হয়ে তার চারিদিক্ আলো ক'রে দেবে।

কিন্তু সকাল বেলা যে আলো দেখেছিলুম সে আলো আর এই আলো কি এক ? হয়তো তাই, কেননা সকালের সেই দীপ্ত আলো আর অপরাহ্ণের এই শান্ত আলো যখন এক, তখন বাড়ীর ঐ ফুট্‌ফুটে মেয়েটা আর মিলি আসলে এক বস্তু হবে না কেন ? আমরা বাইরের বিচারে বলি, অন্ধকার হ'য়ে গেল, কিন্তু সে একটা মস্ত ভুল, আসলে আলো রূপ পরিবর্ত্তন করে মাত্র, বস্তু একই থেকে যায়।

অন্ধকারের আলো নেই ? নইলে মানুষ নিজেকে চিন্‌ত কি করে ? দিনের আলো মানুষকে তার আপন থেকে ভুলিয়ে ঘরের বাহিরে টেনে আনে, আর অন্ধকারের আলো মানুষকে তার আপনার মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নইলে মানুষ মরেই যেত!

এই আমার পাশে দাঁড়িয়ে শ্যাম-কান্তি মেয়েটি যেন আমার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেচে—

মিলি অধীর হ'য়ে আঁচলের একটা প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে বল্লে,—আপনি যাবেন না তা' হ'লে ? বেশ, আমি মীরাকে গিয়ে ব'লে দিচ্চি যে, আমাদের আপনি বেড়াতে নিয়ে যাবেন না বলেচেন।

চলে গেল। আমার ঘরের স্তিমিত দিবালোকের সঙ্গে কি চমৎকার মানিয়েছিল ওকে। সকালে যেমন ও-বাড়ীর মেয়েটীকে আমার নতুন ক'রে ভালো লেগেছিল, এখন আবার আমার মিলিকে তেমনি ক'রে ভালো লাগ্‌ল। কিন্তু দু'য়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু পার্থক্য র'য়ে গেল,—ধরতে পারচিনে।

মানুষের ভালো-লাগা আর না-লাগার বাস্তবিক কোনো মাপকাঠি নেই, একথা আমার মনে হ'য়েছিল সকাল বেলা; কিন্তু এখন আমার মনে হ'চ্চে যে, কোনো মানুষের নিজের কাছেও তার

এ-সম্বন্ধে মাপকাঠি নেই। কোনো একটী বস্তু আমার ভালো লাগার দরুণ আমি আপন মন থেকে তাকে যে সুন্দর ক'রে তুলি তার মধ্যে কি সত্য আছে? কোনো জিনিষকে আমি এখন বলি—ভারী সুন্দর, আবার অন্য সময়ে সেইটাই হয়তো অসুন্দর হ'য়ে আমার কাছে দেখা দেয়। এবং কতকগুলি জিনিষ—যাকে আমি সব সময়েই ভালো বলি, তাঁদের সম্বন্ধেও এ বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই, হয়তো সেখানে আমি আর দশজনের প্রতিধ্বনি মাত্র! তবে সেখানে আমার এইটুকু সান্ত্বনা থাকে যে, সে বস্তুটীকে আর সবাই সুন্দর ক'রে তুলেচে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে; তবু মনের বিক্ষোভ থামে না।

মনে হয়, ভোরের আলো আর সাঁঝের আলোর রূপ ধ'রে ঐ যে দুটী মেয়েই আমার কাছে ভালো লাগল, আমার মন তাদের দু' জনকেই যা' দিয়ে সুন্দর ক'রে তুল্‌লে, সেই বস্তুটীর স্বরূপ ধরতে পারলেই আমি আমার নিজের বিচারের মাপকাঠি সম্বন্ধে জান্‌তে পারব।

কিন্তু এ আমার এখনো অজানা......

ডাক দিলুম,—মীরা!

মা নীচে থেকে জবাব দিলেন,—তুই বেড়াতে নিয়ে গেলিনে ব'লে মিলিকে সঙ্গে ক'রে মীরা তাদের বাড়ী চ'লে গেচে।

যাক্‌। বারান্দায় এলুম! অন্ধকার হ'য়ে এসেচে প্রায়। ও-বাড়ী থেকে একটা কলহাস্য আমার কাছে ভেসে এল; এ নিশ্চয়ই সেই ফুট্‌ফুটে মেয়েটীর গলা।

৺বিজয় সেনগুপ্ত

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা——শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(অষ্টম গীত)

বুলা।

কাল পাখীটা মোরে কেন করে এত জ্বালাতন?
দিবারাতি কুহু কুহু ভালতো লাগেনা মোর,
　　　　শোনেনা সে করিলে বারণ।
আমিতো আপন মনে ঘুমায়ে আছিনু গো
　　　　ভূমিতলে বিছায়ে আঁচল,—
চুপি চুপি আইল সে, অধরে ধরিল মোর
　　　　স্বরগের সুধামাখা ফল—
বারণ করিতে তারে শিহরি উঠিনু গো।—
　　　　সে যে মোরে করিল পাগল।
তাহে ওই কাল পাখী কুহু কুহু কুহুতানে
　　　　আমারে জ্বালায় অনুক্ষণ॥

সুর——সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।

স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

মিশ্র——খেম্‌টা।

স্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
II{ । । মা | মা মা মা I পধা -ণঃ -র্সাঃ | -পধা -পা ধা |
০ ০ কা ন পা খী টা০ ০ ০ ০০ ০ মো

০ ১ ২´ ৩
| পা । মা | পা গা মা I রা গা মা | মা পা -া } |
রে ০ কে ন ক রে এ ত আ না ত ন্

। । ধা | ধা ধা ধা I ধা ধা -পধণা | পা পা -া |
০ ০ দি বা রা তি কু হু ০০০ কু হু ০

০ ১ ২´ ৩
। ণা ণা | ণা ধা ণা I ণা -র্রা র্সা | -া -া ।
০ তা ন তো লা গে না ০ মো ০ র্ ০

০ ১ ২´ ৩
| । সা ণা | ধা পা মা I মা পধা -পর্সা | পা ধা -া } II
০ শো নে না সে ক রি লে০ ০০ বা র ণ্

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II{ । । সা | রা গা -া I গা রগা -মা | পা রা -া |
০ ০ আ মি তো ০ আ প০ ন্ ম নে ০

| । সা রা | গা গা গা I গা -রগমা মা | -া । মা |
০ ছু মা রে আ ছি নু ০০০ গো ০ ০ ছু

| মা মা মা | মা মা -গা I রা -া গা | (পা -া -া)} |
মি ত লে বি ছা • রে • আঁ চ • ল্

| পা -া মা | {পা ধা ধা | ধা ধা . ধা I ধা -া -া |
চ ল্ চু পি চু পি আ ই ল সে • •

| া া ধা | ধা ধা ধা | ধা ধা -পধণা I পা -া -া |
• • অ ধ রে ধ রি ল • • • মো • র্

| া া র্সা | পা ধা পা | মা রা -া I ণ্া ণ্া -া |
• • স্ব র গে র সু ধা • মা খা •

| (রা -া মা)} | রা -া রা | {রা -রগমা মা | মা মা -া I
ফ ল্ 'চু' ফ ল্ বা র ••ণ্ ক রি তে •

I মা মা -া | া া মা | মা মা গা | মা মা -ধা I
তা রে • • • শি হ রি উ ঠি নু •

I পা -া -া | া া পা | পা পা পা | পা পা -া I
গো • • • • সে যে মো রে ক রি •

I ধা -পা ধা | (ণা -া রা)} | ণা -া ণা | {র্রা র্রা -া |
ল • পা গ ল্ 'বা' গ ল্ তা হে ও ই

| র্সা র্রা র্জা I র্রা -া -া | া া র্সা | র্রা র্সা র্সা |
কা ল পা খী • • • • কু হ কু হ্

| ণা ণা -র্সা I র্সা ণা -ধা | পা পা -র্সা | ণা -া -ধা |
কু হু • তা নে • আ মা • রে • •

১ ২´ ৩
| পা মা -গা I রা -া গা | (পা -া ণা)} | পা -া -া IIII
আ লা য় অ • মু ক্ষ ণ্ 'তা' ক্ষ • ণ্

দ্রষ্টব্য।—রাগিণীর পরিচয় সম্বন্ধে যাহা ১ম গীতের নিম্নে এবং খেম্‌টা তাল সম্বন্ধে যাহা ২য় গীতের নিম্নে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহাই এ গীতের সুর ও তাল সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য।

——লেখিকা।

বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তুর্কিতে কর্ম্ম

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতীয় বিপ্লবিকদের স্তাম্বুলে আগমন হয়। তথায় তাঁহাদের একটি deputation এণ্ভার পাশা কর্তৃক গৃহীত হয়। জনশ্রুতি এই যে, deputationএর সভ্যদের সহিত কর মর্দ্দনের সময় প্রত্যেকেরই মুসলমান নাম শ্রবণ করিয়া এণ্ভার পাশা বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "তোমাদের মধ্যে কেহ হিন্দু নাই?" উত্তরে যখন শুনিলেন যে আমাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই হিন্দু, পাশের সুবিধার জন্য মুসলমানী নাম লইয়াছি তখন তিনি খুসি হইয়া নাকি বলেন যে, "ইহা শুনিয়া আমি খুসী হইলাম, আমি আমার ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিভিন্ন পকেটে রাখি" পরে যে দুই একজন ভারতীয় মুসলমানদের তিনি জানিতেন তাহাদের প্রতি অভক্তি জানাইয়া বলেন যে, "বাঙ্গলায় যে সব লোক বোমা ছুড়িতেছে তাহারাই কাজ করিবে" পরে ভারতীয়দের তুর্কিতে কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তুর্কির গভর্ণমেণ্ট হার্বিয়ার (সমর বিভাগের) অধীনে তস্‌কিলাত-ই-মাকসুসার (প্রাচ্য সম্পর্কীয়) আফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। ভারতীয়দের মধ্যে দু একজন স্তাম্বুলে থাকেন বাকী সকলে সিরিয়া ও বোগদাদের দিকে যাত্রা করেন। সিরিয়ায় যাহারা গমন করিয়াছিলেন তাহাদের কর্ম্ম পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বোগদাদে যাঁহারা গমন করিলেন তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া মেসো-

পোটেমিয়া আক্রমণকারী ভারতীয় সৈন্যদের সম্পর্কে আসিবার চেষ্টা করেন। তাহারা পুস্তিকা ম্যানিফেষ্টো, যুদ্ধের সংবাদের বুলেটিন ইত্যাদি মুদ্রিত করিয়া ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। চৈত্যসিংহ, হরদত্তসিংহ প্রভৃতিরা ইংরাজের মুরচার (trench) কাছে গিয়া কাগজাদি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। ফলে অনেক পলটন হইতে পলাতক (deserter) হইয়াছিলেন। এই প্রকারে ১০০ জন পালাতক সিপাহীদের একত্রিত করিয়া বৈপ্লবিকেরা একটি "ভারতীয় বৈপ্লবিক সেচ্ছাসেবকের পল্টন" (volunteer corps) গঠন করেন। কিন্তু এই প্রদেশের অধিবাসীদের বর্ব্বরতার জন্য বেশী সিপাহী পলাতক হইতে পারে নাই। হিন্দু পলাতক সিপাহীদের রাস্তায় আরব বন্দুরা "কাফের" বলিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে তুর্কীর সর্ব্বত্র তুর্ক অফিসারদের কর্ম্মে অজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতা ভারতীয় কর্ম্মের অন্তরায় হইয়াছিল। পরে নানা কারণে এই volunteer corpsকে ভস্ম করিয়া দিতে হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কুতালামার পতন হয়। ঐ স্থানে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য অবরুদ্ধ হওয়ায় সংবাদ শুনিয়া বার্লিন কমিটি মনস্থ করিয়াছিল যে, এই ভারতীয় সৈন্যশ্রেণী কয়েদ হইলে তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া যে সব লোক বৈপ্লবিকদের দলে আসিবে তাহাদের লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক বৈপ্লবিক সৈন্যশ্রেণী (army) গঠন করা হইবে। তদুপরি মেসোপোটেমিয়ায় অনেক ভারতবাসী হাজি ও অন্যান্য প্রকারের লোকও আছে; আর জার্ম্মানীতে কয়েদীরূপেস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচারের ফলে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরা অগ্রেই তুর্কিতে চলিয়া গিয়াছে, আর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত।

এই সব যুদ্ধের উপকরণ লইয়া একটি বৈপ্লবিক army গঠন করিয়া ইরাণের মধ্য দিয়া ভারত আক্রমণের অভিযান করাই এই প্লানের উদ্দেশ্য ছিল। সিপাহীদের অনেক অফিসার বলিতেন "বাবুজী আমাদের ৫০০০ লোক দিয়া পাঠাইয়াছেন; আমরা কোয়েটা (quetta) হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত কুচ্ করিয়া যাইব আর রাস্তায় ৫০০০ হইতে ৫০,০০০ লোক জুটিবে।" এ কথা অতি সত্য। কারণ প্রাচ্য দেশে কেহ সাহস করিয়া পতাকা হস্তে দাঁড়াইলে তাহার তলায় অনেকেই সমবেত হয়। বিপ্লববাদীরা বলেন কার্য্যের জন্য সাহসী লোকের প্রয়োজন। সে সময়ে আর সবই অনুকূলে ছিল। জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট এ প্লানে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিল।

কুতলামারার পতনের পূর্ব্বেই কমিটি তাহার স্তাম্বুলস্থিত শাখা হইতে জনকতক সভ্যকে উপরোক্ত কর্ম্মের পূর্ব্বারম্ভের জন্য বোগদাদে পাঠাইয়া দেয়। এই সময় জনকতক বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা কুতালামারার পার্শ্ববর্ত্তী জায়গা পরিভ্রমণ করিয়াছেন (ইহাদের মধ্যে জর্জ্জিয়ার বিপ্লবিক নেতা Prince Machavelli, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Von Luschan অন্যতম ছিলেন) কমিটির পরিচিত সভ্যদের বলেন যে, কুতলামারার আশপাশের যায়গায় কেবল ঘাসই পাওয়া যায়, কোন শস্য তথায় উৎপন্ন হয় না; খাদ্যদ্রব্য তথায় মিলে না। তোমাদের লোকেরা তুর্কিদের

হাতে পড়িলে কি খাইবে? রসদের কি বন্দোবস্ত হইতেছে? কমিটি এই সংবাদে উদ্বিগ্নচিত্তে জার্ম্মান ফরেণ অফিসে খবর পাঠাইতেই সেই অফিস উত্তর প্রদান করে যে উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, তুর্কি গভর্ণমেণ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি তথায় জমা করিয়াছে, ইংরাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিলে রসদাদি তৎক্ষণাৎ যোগান হইবে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে স্তাম্বুলে ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্ম্ম পাকারূপে স্থায়ী করা হয়। তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মের অনুকূলেই ছিল। শিক্ষিত তুর্কেরা ধর্ম্ম বিষয়ে উদার অথবা নাস্তিক। তবে 'Panislamism' তদানীন্তন নব্য তুর্কীয় গভর্ণমেণ্টের Imperialist policyর একটা আবরণ ছিল এবং এই হুজুগে নিজেদের উপকার সাধিত করিয়া লইত। সেই যুদ্ধের সময় তুর্কিতে Panislamismএর হুজুগের বড়ই সোর উঠিয়াছিল এবং তাহা দ্বারা অনেকেই কিছু কিছু রোজগারও করিয়াছিলেন। সে সময় অনেক ভারতবাসী মুসলমান স্তাম্বুলে অবস্থান করিতেছিলেন। সে তাহাদের মধ্যে কেহ বা হাজি কেহ বা তুর্কি গুপ্ত পুলিশের চর, কেহ বা ইংরাজের গুপ্তচর বলিয়া বদনামগ্রস্ত, কেহ বা ভবঘুরে (vagabond), কেহ বা Panislamist অর্থাৎ তুর্কির খয়ের খাঁ।

বার্লিন কমিটির লোক স্তাম্বুলে উপস্থিত হইলে, এই প্রকারের লোক যখন শুনিল যে ইহাদের পশ্চাতে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট আছে ও ইহাদের হস্তে টাকা আছে তখন তাহারা হঠাৎ বৈপ্লবিক হইয়া দাঁড়াইল এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ছিলেন তাঁহারা হিন্দুদের স্তাম্বুলে আগমনের ঘোর বিপক্ষে হইলেন। হিন্দু তুর্কিতে আসিয়া খাতির পাইবে ইহা ভারতীয়-মুসলমানের নিকট অসহ্য এরূপ ভাব তথায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। যাহাই হউক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকেই প্রথমে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাথে মিশিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তাহাদের সাথে কর্ম্মও করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তি দু একজন যাঁহারা ভারতবর্ষকে তুর্কির হস্তে সমর্পণ করাকেই ইসলামের কর্ত্তব্য পালন মনে করিতেন তাঁহারা বোধ হয় টাকার বখরা মারিবার জন্য ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সঙ্গে জুটিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন বার্লিনেও আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া জার্ম্মান ফরেণ্ অফিসে যাহার হস্তে ভারতীয় কর্ম্ম ন্যস্ত ছিল তাহার সহিত দেখা করিয়া হিন্দুদের গালি পাড়েন যে তাহারা একটি নীচ জাতি (Low race), মুসলমানেরা আবার ভারত শাসন করিবে, তিনি কেবল তুর্কিরই জন্য কাজ করেন, ভারতবর্ষের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই ইত্যাদি। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইত যে, যখন জার্ম্মান তুর্কির বন্ধু তখন Panislamismও তুর্কির ধ্বজা উড়াইয়া টাকার বখরা লইবার বিশেষ হক্ আছে। কিন্তু জার্ম্মান অফিসারটি উত্তরে বলেন যে, "তাহাদের হিন্দুমুসলমানের ঝগড়ায় আমাদের কোন স্বার্থ নাই, জগতে কখনও Panislamic সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, ভারতে মুসলমানদের হিন্দুদের সহিত মিলিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, যাও হিন্দুদের সহিত মিলিয়া কর্ম্ম কর।" ইনি জার্ম্মানদের নিকট হইতে দাবড়ি

খাইয়া অবশেষে কমিটির সহিত মিলিলেন কিন্তু বলিলেন যে উপস্থিত হিন্দুদের সহিত মিলিয়া ইংরাজ বিনাশ করিব, কিন্তু পরে হিন্দুকে কবরস্থ করিব। হিন্দুরাও তাহাতে তথাস্তু বলেন, কিন্তু এই সব লোকের নজর ছিল টাকার উপর। স্তাম্বুলে ফিরিয়া গিয়া জার্ম্মান টাকার উপর "আধা বখরা" মারিতে পারিলেন না বলিয়া এখন তিনি Panislamist দল পাকাইলেন। উদ্দেশ্য যাহারা মুসলমান নহে তাহাদের গালাগালি দেওয়া, এবং কমিটির বিরুদ্ধে ক্রমাগত কর্ম্ম করায় এবং কমিটির অন্যান্য মুসলমান সভ্যদের প্রস্তাবে অবশেষে কমিটির সভ্য-শ্রেণীর তালিকা হইতে তাঁহার নাম বাতিল করা হয়। স্তাম্বুলে যে তুর্কি অফিসারের জিম্মায় ভারতীয় কর্ম্মচারী ছিলেন তিনি বলিতেন এই ব্যক্তি রাজনীতি বুঝেন না কেবল অর্থলোলুপ (he is a greedy fellow)। এই লোকটির স্বার্থপরতার জন্য স্তাম্বুলে ভারতীয় কর্ম্মের অনেক ক্ষতি হয়। অনেক স্থলে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে "ব্যক্তিগত স্বার্থই" হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল। এই দল তাঁহাদের কাগজে প্রচার করিতেন যে ভারত মুসলমানের দেশ, হিন্দুরা কৃষ্ণকায় জাতি ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছত্রভঙ্গ হইয়া বাস করে, আর সুলতান মামুদও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ইত্যাদি। এই সব Panislamistদের কাজ ছিল তুর্কির টাকা খাইয়া তাহার গুণগান করা এবং এই প্রকারের লোকগুলাকে তুর্কি গভর্ণমেণ্টও এজেণ্টরূপে হাতে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল কারণ যখন বড় আশার "জেহাদ" ঘোষণাতে মুসলমানজগৎ কর্ণপাত করিল না তখন বিভিন্ন দেশের গোটাকতক লোক জেহাদের মুখ বাঁচাইবার জন্য হাতে রাখিতেই ত হইবে। ইহাদের মধ্যে উপরোক্ত হিন্দুবিদ্বেষী লোকটি যখন এন্ভার পাশার কাছে অর্থপ্রার্থী হইয়া যায় ও দুঃখ করিয়া বলে যে হিন্দুরা চারিদিকে কাজ করিতেছে, তাহাকেও টাকা দেওয়া হউক সেও কাজ করিবে। এন্ভার পাশা উত্তরে বলেন যে, "হিন্দুরা এসিয়ার জন্য কাজ করিতেছে ইহাতে আক্ষেপের কিছু নাই, তুমিও ইস্‌লামের জন্য কাজ কর উভয় কর্ম্মের গন্তব্য এক। এন্ভার, তালাত, সুখার, জাভিদ ইত্যাদি নব্য তুর্কির নেতারা Panislamismএর নামে কখন ভারতের উপর তুর্কির আধিপত্যের স্বপ্ন দেখিতেন না। কিন্তু জামালপাশা নাকি "স্পেন হইতে চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত এক Panislamic সাম্রাজ্য স্তাম্বুল যাহার কেন্দ্র স্থান হইবে" তাহার স্বপ্ন দেখিতেন কিন্তু ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত হইতেই হইবে ইহা সর্ব্ব তুর্কিতেই বলিতেন। ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যখন সিরিয়ায় কর্ম্ম করিতে গিয়াছিলেন তখন একজন মিসরি (Egyptian) যুবক যিনি তাঁহাদের কর্ম্মে সহযোগী ছিলেন তাঁহাকে জামালপাশা উপরোক্ত স্বপ্নের বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মেক্কার বড় সেরিফ (উপস্থিত তথাকার রাজা) যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন তিনি তুর্কির বন্ধু ছিলেন, সেই সময়ে জামালপাশার কাছে বলিয়াছিলেন যে, "মেক্কামে কাবা" দলের ভারতীয় মুসলমানেরা যাঁহারা মেক্কায় আসেন তাঁহারা ইংরাজের গুপ্তচর।

যাহা হউক জনকতক ধর্ম্মান্ধ ও স্বার্থপর লোকের জন্য স্তাম্বুলে ভারতীয়দের ক্ষতি হইয়াছিল।

ইহারা ধর্ম্মকে নিজেদের স্বার্থের আবরণস্বরূপ করিয়াছিলেন। ইহাদের ধর্ম্মান্ধতার দুটী দৃষ্টান্ত এইস্থানে বিবৃত করিব। স্তাম্বুলে কমিটির আফিস বাড়ীতে অনেক অস্ত্র থাকিত। একজন মুসলমান ভদ্রলোক, যিনি পাগলামীর জন্য কমিটির মুসলমান সভ্য দ্বারা কমিটি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন তিনি পুলিশে গিয়া গুপ্ত খবর দেন যে অমুক যায়গায় হিন্দুরা বিনা হুকুমে অনেক অস্ত্র রাখিয়াছে। এই খবর পাইয়া পুলীশ কমিটির বাড়ীতে খানাতল্লাসি করিতে উদ্যত হয় কিন্তু ভারতীয় কার্য্য তসৃকিলাত্-ই-মার্কমুসার অধীনে থাকায় সেই অফিস পুলীশকে এ কর্ম্মে মানা করে। এবং কমিটিকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিয়া বলে যে তোমাদের নিজের লোকই এই কর্ম্ম করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা আমাদের অফিসের দ্বারা পুলীশকে এক অস্ত্রের তালিকা প্রদান কর। এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভারতের বাহিরে মুসলমান জগৎ হিন্দু ও মুসলমানের প্রভেদ করে না, তাহাদের নিকট উভয়ই এক জাতীয়। ভারতীয়-মুসলমান মনে করেন যে, তিনি কোন মুসলমান দেশে যাইলে তথায় তাঁহার তথাকার বাসিন্দার ন্যায় সব কাজে তাঁহার সমান অধিকার হয় ও তিনি তথায় যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে জানি এবং যে ভারতীয় মুসলমানদের এ বিষয় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাঁহারাও সাক্ষ্য দিবেন যে ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ভারতের বাহিরে মুসলমান জগতে সর্ব্বপ্রকারের ভারতবাসীই হিন্দি। মুসলমান হইলেই হিন্দু অপেক্ষা তাহার খাতির ও বিশিষ্ট অধিকার ভোগ করিবার সুবিধা হয় না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত; বার্লিনে বৈপ্লবিক প্রচারের ফলে চারজন হিন্দু (তিনজন শিখ ও একজন ডোগরা সিপাহী) তুর্কিতে যায়। তাহাদের তৎসহহরস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের সহিত থাকিতে দেওয়া হয়, কিন্তু তথায় যে ভারতীয়-মুসলমানটী কমিটির বিরুদ্ধে পুলিশে খবর দিয়াছিলেন তিনি সেই ব্যারাকে গিয়া অন্যান্য সিপাহীদের (ভারতীয় মুসলমান ও তুর্ক) মধ্যে প্রচার করেন যে ইহারা হিন্দু অতএব ইহাদের কেবল শুষ্ক রুটী খাইতে দিবে, অন্য সর্ব্ব দ্রব্য হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিবে। এই ভদ্রলোকটি একজন জেহাদধর্ম্ম যুদ্ধের মুজাহারিন্, খিলাফতে হিন্দুর আগমনের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন সেইজন্য খেলাফতের জন্য যে হিন্দুরা প্রাণ দিতে গিয়াছিল তাহাদের নির্য্যাতন করিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের পবিত্রতা রক্ষা করেন। কিছুদিন বাদে এই চারজন সিপাহীরা নিরুদ্দেশ হয়। অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাওয়া গেল যে, পুলীশ তাহাদের কয়েদ করিয়াছে। তসৃকিলাত্-ই-মার্কমুসার খবর করিলে উত্তর পাওয়া যায় যে ইহারা ইংরাজের সিপাহী অতএব তুর্কির শত্রু সেইজন্য তুর্কি গভর্ণমেন্ট কেন তাহাদের ভরণপোষণ করিবে। এবং আরও সংবাদ পাওয়া যাইল যে উপরোক্ত মুজাহারিণ মহাশয় ও প্রথমে বিবরিত ভারতীয় Panislamistদের নেতা মহাশয় যিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি—ইহারা তুর্কির গভর্ণমেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠান যে এই চারজন লোক হিন্দু ও ইংরাজের সিপাহী ইহাদের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ ব্যারাকে থাকে ও খায়) তাহা হইতে যেন বঞ্চিত করা হয়। এই দরখাস্ত পাইবামাত্র তুর্কির

পুলীশ ইহাদের কয়েদ করে। তস্‌কিলাতের বড়কর্ত্তা বলেন যে ইহারা ইংরাজের সিপাহী তুর্কি গভর্ণমেণ্ট কেন ইহাদের খাওয়াইবে ? কিন্তু এ বিচার কেহ করিলেন না যে, যে প্রকারে ভারতীয় মুসলমান সিপাহীরা ইংরাজ পল্টন হইতে পলাতক হইয়া তুর্কের দিকে আসিয়াছে সেই প্রকারে এই হিন্দু সিপাহীরা তুর্কের হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু তুর্কিতে "হবচন্দ্র রাজা ও তাহার গবচন্দ্র মন্ত্রী" কাজেই এইটার জন্য যাহারা খেলাফৎএর স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের স্বদেশবাসীরা কয়েদ করিয়া খেলাফৎএর পবিত্রতা রক্ষা করিল। খালাসের উপায় তস্‌কিলাত্ বলিল যে যদি ভারতীয় কমিটি ইহাদের ভরণপোষণের ভার লন তবে ইহাদের মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। কমিটি তাহাতে স্বীকৃত হওয়ায় তাহারা মুক্ত হইল ও পরে হিন্দুকে দিয়া খেলাফৎএর লড়াই করানর সখ মিটাইয়া তাহাদের বার্লিনে পুনরাবর্ত্তন করা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পুলক-আলোক *

১

পিণ্ডি কতই চটকাবে আর! ওই রে ডাকে চণ্ডিকা!
চাক্‌-ভাঙা আজ মধুর সাথে পান করো লাল শুণ্ডিকা!
একটু খানিক থমকে দাঁড়াও জীবন্‌-মরণ্‌-সঙ্গমে!
দেখ্‌ছ না কি জয়্‌মালিকা পরায় জগৎ জঙ্গমে!
প্রাচ্য প্রতীচ ঘট্‌কালিতে জাগাও প্রাচীন রুদ্রতা!
নইলে হাজার হোঁচট্‌ খেয়ে আঁক্‌ড়ে র'বে ক্ষুদ্রতা!
ভুঁড়ির বহর দেখ্‌লে ভবি ভুল্‌বে কি আর ভণ্ডামি?
যুগের সাথে জোর দাপটে এগিয়ে চলো দিন্‌যামি!
নাক টিপে আজ বস্‌লে ধ্যানে ছিঁড়বে টুঁটি পশ্চাতে!
চট্‌কা যখন ভাঙ্‌বে তখন হবে ভীষণ পস্তাতে!

২

বাপ দাদাদের নামের জোরে মিল্‌বে কি আর অঞ্জলি?
বিরাম্‌বিহীন আঘাত পেয়ে উঠ্‌লো হৃদয় মন জ্বলি'!

* মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনের জন্য লিখিত।

আজ প্রকৃতি সেবাদাসী শক্তিশালীর শক্তিতে।
আগের মতো গল্‌বে না মন শাস্ত্র পুঁথির ভক্তিতে।
নানান্ ভাবের ভিড়ের মাঝে চলার পথে চল্ ঠেলে।
কলম্-করা ফলের গাছেই দ্বিগুণ মিষ্টি ফল মেলে।
জগৎ ভূতের ভয় করেনা, করুক্ দন্ত কিড়্মিড়ি।
রোগীর পথ্য পোকায়্-ধরা পুরাণ চাউল তিন্তিড়ী।
কে বলেছে রুগ্ন তুমি? ও-সব বাজে ফক্কিকা।
ফাঁক্‌তালে সব লুঠ্‌ছে মধু দেশ বিদেশের মক্ষিকা।

৩

ত্যাগের বুলি কপ্‌চালো দেশ বেজায় তামস অন্তরে।
স্যাঁৎসেতে প্রাণ তাত্‌লো না তাই, মাত্‌লো না ফুস্‌মন্তরে।
ঈর্ষা ঘৃণার যুগ কেটেছে, মিছাই তবু খাপ্ পাতে।
মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে কাজ চালাবে ধাপ্পাতে?
একটা বিরাট্ ক্ষতির ক্ষোভে ফোঁপায় পাপের কল্পনা।
সত্য পথেই চল্‌তে হবে, রাস্তা নেহাৎ অল্প না।
ছুট্‌তে হবে! ছুট্‌তে হবে বন্-বাদাড়ে জঙ্গলে।
বরণ করে নিতেই হবে মরণ্-জয়ী মঙ্গলে।
হাঁট্‌তে হলেই ফুট্‌বে কাঁটা, সেটা মোটেই মন্দনা।
অমঙ্গলের মধ্যে সদাই চল্‌বে শিবের বন্দনা।

৪

মনের মাঝে ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে সংসারে!
এই সুযোগে সবল জাতি ক্ষেপ্‌লো মানুষ সংহারে।
পরের মুখের গ্রাস কেড়ে তাই খাচ্ছে পরম গৌরবে।
ধ্বংসলীলার দীক্ষাগুরু ডুব্‌তে ডাকে রৌরবে।
বুকের মাঝে আগুন জ্বালায়, জল ঢালে ফের্ দম্‌কলে।
আজ পৃথিবীর শান্তি নাশি’ বাঁধ্‌লো লোহার শৃঙ্খলে।
এই দুনিয়ায় পীড়ন করে’ কে পেয়েছে সান্ত্বনা?
কেউ তো তখন খায় না চুমা, জগৎ অমন ভ্রান্ত না।
কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছে, গা মোড়া তায়্ ঝঞ্ঝাটে।
আত্মঘাতী না হয় যদি তবেই দুখের দিন কাটে।

৫

বোবার বেদন বুঝ্‌বে কে গো! খুল্‌বো কোথায় মন্‌খানি!
বুক পিঠে' তাই মর্‌ছি কেঁদে আম্‌রা সুধার সন্ধানী!
কেবল কথার মার্‌প্যাচে আজ চল্‌ছে বিরাট্‌ দম্‌বাজি!
সত্যপথে চল্‌তে মানুষ হোক্‌ না বেজায় কম রাজী!
আর তো সেদিন সুদূর নহে, সুখাশ্রু বয় উচ্ছ্বাসে!
জগদ্বাসীর সিংহাসনে বস্‌বে ভারত উল্লাসে!
অধঃপাতে আর যেওনা বৈরাগীদের সংযোগে!
বাঁচ্‌তে যদি চাও জগতে মাতো জীবন সম্ভোগে।
কান্তা কনক তুচ্ছ নহে, লও বরি' স্রক্‌ চন্দনে!
কাণ দিয়ো না! কাণ দিয়ো না "নেতি নেতি"র ক্রন্দনে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

জীবের নিত্যতা

যাহার জীবন আছে, সেই জীব। বৃক্ষেরও জীবন আছে, সেও জীব। অতএব উদ্ভিদ্‌ এবং প্রাণী উভয়ই জীব সংজ্ঞার অন্তর্গত। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের অভ্যন্তরের গঠন দেখিলে তাহা মধুচক্রের বিন্যাসের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাদের অভ্যন্তর কতকগুলি কোষের সমষ্টি। ঐ কোষ সমূহের কতকগুলিকে খালি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কোষগুলি নির্জীব হইয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তন হইতেছে না। অবশিষ্ট কোষগুলি সজীব এবং এক প্রকারের গাঢ় অর্দ্ধতরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। এই অর্দ্ধতরল পদার্থই জীবের জীবনের আধার। এই পদার্থকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বলে। প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ নিজ অবস্থানের জন্য একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া লয়। গৃহের প্রাচীরের উপাদান প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ হইতেই সংগৃহীত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহগুলিকে কোষ (Cell) বলে।

প্রোটোপ্লাজ্‌মের দুইটী অংশ—মধ্যাংশ বা সঞ্চয় কেন্দ্র (nucleus) এবং বহিরংশ বা তরলাধার (cytoplasm). তরলাধার দ্বারা সঞ্চয় কেন্দ্র সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত। সঞ্চয় কেন্দ্রের রাসায়নিক উপাদান ও গঠন—তরলাধারের উপাদান ও গঠন হইতে ভিন্ন। সঞ্চয় কেন্দ্রে রস ব্যতীত জালের ন্যায় একটী পদার্থ আছে, তাহাকে লিনিন (Lenin) বলে। লিনিনের মধ্যে যেখানে সেখানে আর একটী পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ক্রোমাটীন (Chromatin) বলে।

কোষের জীবনের জন্য সঞ্চয় কেন্দ্র এবং তরলাধার উভয়েরই প্রয়োজন। তাহাদের পদার্থের পরস্পর বিনিময় হয়। যত উদ্ভিদ্ ও প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই কোষের সমষ্টি। কোনো কোনো জীব, অর্থাৎ উদ্ভিদ্ বা প্রাণী, এত ছোট যে তাহাদের একটী মাত্র কোষ আছে। কোনো কোনো জীব দুই, চারি বা অধিক কোষ বিশিষ্ট। বড় বড় জীবে অসংখ্য কোষ বিদ্যমান। এই কোষগুলি কোথা হইতে আসিল? কোষের বিভাগের দ্বারা কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। যখন কোনো কোষ সাধারণ কোষ অপেক্ষা বড় হইয়া পড়ে, তখন উহার প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথমে সঞ্চয় কেন্দ্র, পরে তরলাধার (দুই ভাগই) পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। এক এক ভাগে কিছু সঞ্চয় কেন্দ্র ও কিছু তরলাধার থাকে। ইহার পর দুই ভাগের মধ্যে একটা পর্দ্দা পড়িয়া যায় এবং সেই পর্দ্দাটী কোষের প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়। তৎপরে উভয় খণ্ড পৃথক হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়। যত জীব আছে তাহারা প্রথমাবস্থায় এক কোষ বিশিষ্ট ছিল। পরে ঐ কোষের বারম্বার বিভাগ দ্বারা ছোট জীব বড় জীবে পরিণত হয়। কিন্তু কোনো কোনো জীব এক কোষ বিশিষ্টই থাকিয়া যায়।

সজীব কোষেরই বিভাগ হইয়া থাকে। সজীব কোষের লক্ষণ কি? যাহার মধ্যে সজীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ আছে তাহাই সজীব কোষ। প্রোটোপ্লাজ্‌মের সজীবতার লক্ষণ কি? সজীবতার লক্ষণ ক্রিয়াশীলতা। যাহাতে সর্ব্বদা পদার্থের রূপের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে তাহাই সজীব। প্রোটোপ্লাজ্‌মের পাঁচটী মুখ্য উপাদান—কার্ব্বন, হাইড্রোজন, অক্‌সিজন, নাইট্রোজন এবং গন্ধক। প্রোটোপ্লাজ্‌মে এই পাঁচটী মূল পদার্থ ব্যতীত আরও কয়েকটী মূল পদার্থের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সকল মূল পদার্থ হইতে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ মধ্যে নানা প্রকারের মিশ্র পদার্থ নির্ম্মিত হয়। কার্ব্বন, হাইড্রোজন্ এবং অক্সিজনের রাসায়নিক সংযোগে কার্ব্বো-হাইড্রেট (ষ্টার্চ, চিনি, সেলিউলোস্ ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। কার্ব্বন ও হাইড্রোজনের রাসায়নিক সংযোগ হইতে স্নেহ পদার্থ (তেল, ঘি, চর্ব্বি ইত্যাদি) নির্ম্মিত হয়। কার্ব্বন, হাইড্রোজন, অক্সিজন ও নাইট্রোজনের রাসায়নিক সংযোগে প্রোটীন (ডাল, মাংস ইত্যাদি) নির্ম্মিত হয়। যে সকল মূল পদার্থের নাম করা হইল তাহাদের পরমাণু (atom) সকলের বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রণ দ্বারা সাধারণ এবং উচ্চশ্রেণীর যৌগিক পদার্থের অণু (molecules) নির্ম্মিত হইতে পারে। জীবশরীরে বা শরীরের অংশে যে প্রকারের যৌগিক পদার্থ আছে, সেখানে সেইরূপ যৌগিক পদার্থই নির্ম্মিত হয়। জীব শরীরে খাদ্য, জল, অক্সিজন এবং উপযুক্ত উত্তাপের সাহায্যে ঐ সকল অণু নির্ম্মিত হয় প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যেই এই নির্ম্মাণ ক্রিয়া হইতে থাকে। এই নির্ম্মাণ ক্রিয়াকে মেটাবলিজ্‌ম্ (metabolism) বলে। যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বশতঃ জীবদেহে খাদ্য হইতে প্রাপ্ত সাধারণ যৌগিক পদার্থ দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত হইতে থাকে তাহাদিগকে এনাবলিজ্‌ম্ (anabolism) বলে, এবং যে সকল রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বশতঃ উচ্চ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া সাধারণ যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় তাহাদিগকে

ক্যাটাবলিজ ম্ (katabolism) বলে। এনাবলিজ ম্ দ্বারা জীব শরীরের পুষ্টি হয়, এবং ক্যাটাবলিজ ম্ দ্বারা ক্ষয় হয়। জীব শরীরে অনেক দূষিত পদার্থ ক্যাটাবলিজ ম্ দ্বারা উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দূষিত পদার্থ ঘাম, মূত্র ও মলাদিরূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। এনাবলিজ ম্ ও ক্যাটাবলিজ ম্ এই দুইটী ক্রিয়াই মেটাবলিজ ম্ ক্রিয়ার দুইটী বিভাগ। প্রোটোপ্লাজ মের মধ্যেই এই দুই প্রকারের পরিবর্ত্তন সমূহের প্রবাহের মিশ্রণ দৃষ্ট হয় এবং উভয় প্রবাহের মিশ্রণই জীবনের লক্ষণ। যখন ক্যাটাবলিজিম্ অপেক্ষা এনাবলিজম্ অধিক হয় তখন জীবের বৃদ্ধি হয়। যখন ইহার বিপরীত কার্য্য হইতে থাকে, তখন ক্ষয় হয় এবং শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে খাদ্যরূপে অজীব পদার্থ জীবদেহে প্রবেশ করে এবং সেখানে সজীব প্রোটোপ্লাজ মের শক্তিতে সজীব হইয়া যায়। পরে ঐ সকল সজীব পদার্থের কতকগুলি অজীব (অর্থাৎ দেহের অনিষ্টকারী) পদার্থে পরিণত হইয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। খাদ্য নিজের অন্তর্গত শক্তি জীবদেহে ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ শক্তিহীন হইয়া, দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। এই শক্তি প্রোটোপ্লাজ মের পরিবর্ত্তন বিষয়ে সাহায্য করে।

প্রোটোপ্লাজ মের সজীবতার তিনটী লক্ষণ পাওয়া যায়—(১) উত্তেজিত হওয়া, (২) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া এবং (৩) উৎপাদন করা।

(১) প্রোটোপ্লাজ ম্ দুই প্রকারে উত্তেজনা প্রাপ্ত হইতে পারে—(ক) দেহের বাহির হইতে এবং (খ) দেহের ভিতর হইতে। বাহিরের উত্তেজনা তাপ, শীতলতা, আঘাত ইত্যাদি হইতে আসিতে পারে এবং তাহা হইতে হঠাৎ মেটাবলিজ ম অর্থাৎ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু ভিতরে একটী পরিবর্ত্তন হইলেই সেখানে অন্য পরিবর্ত্তনের উত্তেজনা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অন্য পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। যে সকল পদার্থ দ্বারা প্রোটোপ্লাজ ম্ বেষ্টিত, এই উত্তেজনা বশতঃই তাহাদের সহিত উহার সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হয়; অর্থাৎ তাহাদের দ্রব্যের সহিত প্রোটোপ্লাজমের দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হয়, এবং বিনিময় হইয়া উহার পুষ্টি বা ক্ষয় হয়। ভিতরে যতগুলি উত্তেজনা উপস্থিত হইতে পারে তন্মধ্যে তাপ ও জলই প্রধান। ইহারাই মেটাবলিজ ম্ ক্রিয়ার সহায়ক।

(২) এখন জীবের বৃদ্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে একটী কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটী কোষ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে দুইটী হইতে চারিটী, চারিটী হইতে আটটী ইত্যাদি। অনেক জীব এককোষ এবং অনেক জীব বহুকোষ। জীব এককোষই হউক আর বহুকোষই হউক তাহাদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়,—এক অংশ দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ ও পরিপাক হয়, এক অংশ দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়া হয়, এক অংশ দ্বারা অনুভবের কার্য্য হয় এবং এক অংশদ্বারা মলত্যাগের ব্যাপার সাধিত হয়। বহুকোষ জীবে এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত কোষ সমূহের বিশেষ বিশেষ বর্গ বা সংস্থান রচিত হয়; যেমন উদ্ভিদ্ মূল দ্বারা রস গ্রহণ করে, পত্রের বিবর দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে, পুষ্পের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করে, ইত্যাদি। স্তন্যপায়ী

জীবেও এই সকল কার্য্যের উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোষগুলি সমাজবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, এবং জীবদেহে যতগুলি বিভিন্ন কোষসমাজ আছে তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিয়া জীবিত রাখে। যত বহুকোষ জীব আছে তাহারা প্রথমে এককোষ হইয়াই উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ সেই একটী কোষের বিভাগ দ্বারা তাহারা বহুকোষ হইয়া যায়। ভ্রূণের অবস্থা হইতেই বিভাগ কার্য্য চলিতে থাকে; এবং এই অবস্থাতেই কোষগুলি সমাজবদ্ধ হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন করে।

(৩) অতএব ইহা নিশ্চিত যে প্রত্যেক কোষ প্রাথমিক কোনো একটী কোষ হইতে এবং প্রত্যেক প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ প্রাথমিক কোনো একটী প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ কোথা হইতে আসিয়াছিল? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আরও কিছু বিচার আবশ্যক। উৎপাদন ক্রিয়া দুই প্রকারে হইতে পারে—(ক) একটী কোষের বিভাগ দ্বারা এবং (খ) দুইটী কোষের সংযোগ দ্বারা। (ক) এমন অনেক জীব আছে যাহাদের দেহের খণ্ড হইতে জীব উৎপন্ন হয়। গাছের এক প্রকারের কলম ডালের খণ্ড হইতে হয়। প্রবালের খণ্ড হইতে প্রবাল উৎপন্ন হয়। (খ) কিন্তু অধিকাংশ বহুকোষ জীবের কতকগুলি কোষ জননকার্য্যের জন্য বিশেষতা প্রাপ্ত হয়।

জননকার্য্যের জন্য যে সকল কোষ নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে বীজকোষ (gamates) বলে। বীজকোষ দুই প্রকারের—(ক) পুং-বীজকোষ এবং (খ) স্ত্রী-বীজকোষ। দুই প্রকারের দুইটী বীজকোষের সংযোগে একটী বিশেষ কোষ (zygote) উৎপন্ন হয়। তাহার বিভাগ দ্বারা ঐ জাতীয় একটী নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া যথাসময়ে পৃথক্ হইয়া পড়ে।

ঐ দুইটী বীজকোষের মিলনের সময় উভয়ের সঞ্চয়-কেন্দ্র ও তরলাধার যথাক্রমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং একই প্রাচীরের মধ্যে অবস্থান করে! সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে উভয়েই পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া যায়। এই বীজ হইতে একটী নূতন জীব উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক সজীব কোষ পূর্ব্বের কোনো সজীব কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। যদি অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে আমরা এমন কোনো সময়ের অনুমান করিতে পারি না যখন অজীব হইতে সজীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। সজীব হইতেই সজীবের সৃষ্টি অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জীবন ব্যতীত জীবনের সৃষ্টি হইতে পারে না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" এই বাক্য অজীব এবং সজীব উভয় পদার্থ সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। জীবনও সদ্বস্তু। জীবনের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। জরাগ্রস্ত শরীরের ধ্বংসে কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন এক দীপশিখা হইতে অন্য দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়, তেমনই সন্তানরূপে জীব নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়— "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।"

এক্ষণে জীবগণের ব্যষ্টির ভাব মন হইতে বিদূরিত করিয়া তাহাদের সামান্যতার প্রতি মনঃ

সংযোগ করুন। জীব বহু, কিন্তু জীবন একই। ব্যক্তি অনেক, কিন্তু তত্ত্ব একই। গীতা বলিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" কল্পনা করুন, জীবন এক মহাবৃক্ষ এবং তাহার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা। এই বৃক্ষের একটী শাখা বা প্রশাখার বিনাশ হইতে মূল-বৃক্ষের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না; অন্যান্য শাখা প্রশাখা সমানভাবে অবস্থিতি করে। জীবগণের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি (individual) বা জাতি (species) নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে জীব জগতের কিছু ক্ষতি হয় না। জীবনের দুই একটী ব্যক্তি বা জাতির আকারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু জীবনের নাশ হয় না। অনাদি কাল হইতে জীবনের এমন একটী পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, যাহা চিরকাল অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এক জীবন হইতে অন্য জীবন উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ হইতেছে এবং এইরূপই হইতে থাকিবে। এই প্রবাহের বিরাম নাই। এই প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইলে, জীবজগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অতএব জীবন সদ্বস্তু—"না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" এই প্রকারে প্রমাণিত হইল যে জীব অনাদি, অবিনাশী এবং নিত্য।

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

পথের দাবী*

(২৩)

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া ডাক্তার তাঁহার বোঁচ্‌কার উপরে চাপিয়া বসিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছেলেটি মস্ত মোটা একটা বর্ম্মা সেলাই টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া নাক-মুখ দিয়া অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্গীরণ করিয়া চুরুটটি ডাক্তারের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। ভারতীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন অনুভব করিয়া ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, অনেনি পেলে আমি সংসারে কিছুই বাদ দিতে ভালবাসিনে ভারতী। অপূর্ব্বর কাকাবাবু আমাকে যখন রেঙ্গুনের জেটিতে প্রথম গ্রেপ্তার করেন, তখন পকেট থেকে আমার গাঁজার কল্‌কে বার হয়ে পড়েছিল। নইলে, বোধ হয় ছুটি পেতাম না। এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী এ ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, সে আমি জানি, এবং হাজার ছুটি পেলেও যে ওটা তুমি খাওনা তা-ও জানি। কিন্তু এ বাড়ীটি কার দাদা?

আমার।

আর এই বর্ম্মি মেয়েটি, এবং শিশুগুলি?

---

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, না, ওঁরা আমার একটি মুসলমান বন্ধুর সম্পত্তি। আমারি মত ফাঁসি-কাঠের আসামি, কিন্তু সে অন্য বাবদে। সম্প্রতি স্থানান্তরে গেছেন, পরিচয় ঘটবার সুযোগ হবেনা।

ভারতী কহিল, পরিচয়ের জন্যে আমি ব্যাকুল নই; কিন্তু, সর্ব্বদিক থেকে তুমি যে স্বর্গ পুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছ, তার থেকে আমাকে বাসায় রেখে এসো দাদা, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসূছে।

ডাক্তার হাসিমুখে জবাব দিলেন, এ স্বর্গপুরী যে তোমার সইবেনা, সে তোমাকে আনবার পূর্ব্বেই আমি জান্‌তাম। কিন্তু, তোমাকে বল্‌বার আমার যত কথা ছিল, সে তো এই স্বর্গপুরী ছাড়া প্রকাশ করবারও আর দ্বিতীয় স্থান নেই ভারতী। আজ তোমাকে একটু খানি কষ্ট পেতেই হবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি শীঘ্রই আর কোথাও যাবে?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। উত্তর এবং পূর্ব্বের দেশগুলো আর একবার ঘুরে আস্‌তে হবে। ফির্‌তে হয়ত বছর দুই লাগ্‌বে। কিন্তু, আজ তুমি নানারকমে এত ব্যথা পেয়েছ বোন্‌, যে, সকল কথা বল্‌তে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু আজকের রাত্রির পরে আর যে সহজে তোমাকে দেখা দিতে পারবো সে ভরসাও করিনে।

কথা শুনিয়া ভারতী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি তা'হলে কালই চলে যাচ্চো?

ডাক্তার মৌন হইয়া রহিলেন। ভারতী মনে মনে বুঝিল ইহার আর পরিবর্ত্তন নাই। তারপরে এই রাত্রি টুকুর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়ায় সে একেবারে একাকী। খোঁজ করিবারও কেহ থাকিবেনা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, হাঁটা-পথে আমাকে দক্ষিণ চীনের ক্যানটনের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে। আর ও-পথে কর্ম্মসূত্রে যদি না অ্যামেরিকায় গিয়ে পড়ি ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো ঘুরে আবার এই দেশেতেই এসে আশ্রয় নেব। তারপরে আগুন যতদিন না জ্বলে, আমি এইখানেই রইলাম ভারতী। সহসা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন আর ফির্‌তে যদি না-ই পারি বোন, বোধ হয় খবর একটা পাবেই।

এই মানুষটির শান্তকণ্ঠের সহজ কথাগুলি কতই সামান্য, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর চেহারা ভারতীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, হাঁটাপথে চীনদেশে যাওয়া যে কত ভয়ানক সে আমি শুনেচি। কিন্তু তুমি মনে মনে হেসোনা দাদা, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি,—অতটুকু তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু, বেরিয়েই যদি যাও, এইখানেই আবার কেন ফিরে আস্‌তে চাও? তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?

ডাক্তার কহিলেন, তাঁরই কাজের জন্যে আমি এদেশ ছেড়ে সহজে যাবোনা। মেয়েরা এ

দেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম্ম তারা বুঝবে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জলছে দেখতে পাও, যেখানেই থাকো, ভারতী, এই কথাটা আমার তখন স্মরণ কোরো এ আগুন তোমরাই জ্বেলেচ। কথাটা আমার মনে থাকবে ত!

এ ইঙ্গিত ভারতী বুঝিল, কহিল, কিন্তু তোমার পথের পথিক আমি ত নই দাদা!

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন, তা' আমি জানি। কিন্তু পথ তোমার যাই কেননা হোক্, বড় ভাইয়ের কথাটা স্মরণ করতে ত দোষ নেই,—তবু ত দাদাকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে!

ভারতী নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, বড় ভাইকে মনে পড়বার আমার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু এমনি করেই বুঝি তোমার বিপথে মানুষকে তুমি টেনে আনো দাদা? আমাকে কিন্তু তা' পারবেনা। এই বলিয়া সহসা সে উঠিয়া পড়িল, এবং গুটানো সতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বল বালিশ প্রভৃতি পাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে শয্যা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, অপূর্ব্ববাবুর জাহাজের চাকা আজ আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছে, এ জীবনে সেই আমার একটিমাত্র পথ। আবার যেদিন দেখা হবে, এ কথা তুমিও সেদিন স্বীকার করবে।

ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হঠাৎ এ আবার কি সুরু করে দিলে ভারতী? ঐ ছেঁড়া কম্বল টুকু কি আমি নিজে পেতে নিতে পারতাম না? এর ত কোন দরকার ছিল না।

ভারতী কহিল, তোমার ছিল না বটে, কিন্তু আমার ছিল! যার জন্যে যখনই বিছানা পাতি দাদা, তোমার এই ছেঁড়া কম্বলটুকু আর কখনো ভুলব না। মেয়ে মানুষের জীবনে এরও যদি না দরকার থাকে ত কিসের আছে বলে দিতে পারো?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, এর জবাব আমি দিতে পারলাম না, বোন্, তোমার কাছে আমি হার মান্‌ছি। কিন্তু এত বড় কথা আমাকে কোন দিন কোন মেয়ে মানুষের কাছেই স্বীকার করতে হয়নি।

ভারতী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদির কাছেও কখনো না?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না।

শয্যা প্রস্তুত হইলে ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার আসন ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভারতী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া কহিল, যাবার পূর্ব্বে আর একটি কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ছোট বোনের অপরাধ মাপ করবে?

করব।

তবে বল সুমিত্রাদিদি তোমার কে? কোথায় তাঁকে তুমি পেলে?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও যে আমার কে এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু, যে দিন

ওকে চিন্‌তাম না বল্‌লেও চলে, সে দিন নিজেই আমি স্ত্রী বলে ওর পরিচয় দিয়েছিলাম। সুমিত্রা নাম আমারই দেওয়া —, আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।

ভারতী গভীর কৌতূহলে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি, ওর মা ছিল নাকি ইহুদি মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। প্রথমে সার্কেসের দলের সঙ্গে জাভায় যান, পরে সুরভায়া রেলওয়ে ষ্টেসনে চাকরি করিতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সুমিত্রা মিশনরিদের ইস্কুলে লেখাপড়া শিখ্‌তো, তিনি মারা যাবার পরে বছর পাঁচ ছয়ের ইতিহাস আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা সে হবে না, তুমি সমস্ত বল।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু জানি যে মা, মেয়ে, দুই মামা, একটি চীনে, এবং জন দুই মাদ্রাজী মুসলমানে মিলে এঁরা জাভায় লুকানো আফিঙ গাঁজা আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতেন। তখনও কিছুই জানিনে কি করেন, শুধু দেখ্‌তে পেতাম বাটাভিয়া থেকে সুরভায়ার পথে রেল গাড়ীতে সুমিত্রাকে প্রায়ই যাওয়া আসা করতে। অতিশয় সুশ্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল। এই পর্য্যন্তই। কিন্তু, হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়ে গেল তেগ ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে। বাঙ্গালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর পেলাম।

সুমিত্রা বলিল, সুন্দরী বলে আর সুমিত্রাদিদিকে ভুল্‌তে পারলেন না,—না দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, সে যাই হোক একদিন জাভা ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম ভারতী,—বোধ হয় ভুলেও গিয়েছিলাম,—কিন্তু বছর খানেক পরে অকস্মাৎ বেঙ্‌কুলান সহরের জেঠিতে দেখা সাক্ষাৎ। এক তোরঙ্গ আফিঙ, চারিদিকে পুলিশ, আর তার মাঝে সুমিত্রা। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে তার জল পড়তে লাগ্‌লো, এ সন্দেহ আর রইল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিঙের সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে তার পরিচয় দিলাম। এতটা সে ভাবেনি, সুমিত্রা চম্‌কে গেল। সুমাত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নামটাও আমারি দেওয়া। নইলে, তার সাবেক নাম ছিল, রোজ দাউদ। তখন বেঙকুলানের মাম্‌লা মকদ্দমা পাদাঙ সহরে হোতো, আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন পলক্রুগার, তাঁর বাড়ীতে সুমিত্রাকে নিয়ে এলাম। মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে, কিন্তু, সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, খালাস কোনদিন পাবেওনা দাদা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁদের দলের লোক খবর পেয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগ্‌লো, বন্ধু ক্রুগারও দেখতে পেলাম সৌন্দর্য্যে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চেন, অতএব তাঁর জিম্মাতে রেখেই একদিন চুপি চুপি সুমাত্রা ছেড়ে সরে পড়লাম।

ভারতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এদের মাঝে তাঁকে একলা ফেলে রেখে? উঃ—তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ অনেকটা অপূর্ব্বর মত। আবার বছরখানেক কেটে গেল। তখন সেলিবিস দ্বীপের ম্যাকেসার সহরে একটি ছোট্ট, অখ্যাত হোটেলে বাস করছিলাম, একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ঢুকে দেখি সুমিত্রা বসে। তার পরণে হিন্দু মেয়েদের মত তসরের শাড়ী, আর এই প্রথম আজ আমাকে সে হিন্দু-মেয়ের মতই হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি সমস্ত ছেড়ে চলে এসেছি, সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কাজে ভর্ত্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর তুমি আর পাবে না।

ভারতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে ?

ডাক্তার কহিলেন, পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ভারতী, সুমিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি। সে পারে না সংসারে এমন কাজ নেই। যে একুশ বছরের সমস্ত সংস্কার একদিনে মুছে ফেলতে পারে, তাকে আমি ভয় করি। কিন্তু, বড় নিষ্ঠুর।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেবলই ইচ্ছা করিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করে, হোক নিষ্ঠুর, কিন্তু, তাঁকে তুমি কতখানি ভালবাসো দাদা ? কিন্তু, লজ্জায় এ কথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। অথচ, ওই আশ্চর্য্য রমণীর গোপন অন্তরের অনেক ইতিহাসেরই আজ সে সন্ধান পাইল। তাঁহার নির্ম্মম মৌনতা, কঠোর ঔদাসীন্য—কিছুরই অর্থ বুঝিতে যেন আর তাহার বাকি রহিল না।

হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায় মুহূর্ত্তকালের জন্য যেন তিনি লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, ওই মুহূর্ত্তের জন্যই। সুদীর্ঘ সাধনায় দেহ ও মনের প্রতিবিন্দুটির উপরেই অসামান্য অধিকার এতদিন তিনি বৃথায় অর্জ্জন করেন নাই। পরক্ষণেই তাঁহার শান্ত কণ্ঠ ও সহজ হাস্যমুখ ফিরিয়া আসিল, বলিলেন, তারপরে সুমিত্রাকে নিয়ে আমাকে ক্যান্টনে চলে আসতে হ'ল।

ভারতী হাসি গোপন করিয়া ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, চলে না-ই আসতে দাদা, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল ? আমরা ত কেউ দিইনি !

ডাক্তার হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাথার দিব্যি যে ছিল না তা' নয়, কিন্তু, ভেবেছিলাম সে কথা আর কেউ জানবে না, কিন্তু, তোমাদের দোষ এই যে শেষ পর্য্যন্ত না শুনলে আর কৌতূহল মেটে না। আবার না বললে এমন সব কথা অনুমান করতে থাকবে যে তার চেয়ে বরঞ্চ বলাই ভাল।

ভারতী কহিল, আমিও ত তাই বলচি দাদা। ঐ টুকু তুমি বলে ফেল।

ডাক্তার কহিলেন, ব্যাপারটা এই যে সুমিত্রা আমার হোটেলেই একটা দোতলার ঘর ভাড়া নিলে। আমি অনেক নিষেধ করলাম কিন্তু, কিছুতেই শুনলেনা। যখন বললাম, আমাকে তাহলে

অন্যত্র যেতে হবে, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌লো। বল্‌লে, আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। পরদিনই ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই দাউদের দল দেখা দিলেন। জন দশেক লোক, একজন অর্দ্ধেক আরবি অর্দ্ধেক নিগ্রো, ছোটখাটো একটা হাতির মত, অনায়াসে সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে দাবী করে বস্‌লো।

ভারতী সহাস্যে কহিল, আবার তোমারই সাক্ষাতে! তোমাদের দুজনের বোধকরি খুব ঝগড়া বেধে গেল?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। সুমিত্রা অস্বীকার করে বারবার বল্‌তে লাগ্‌লো সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র! অর্থাৎ, তারা তাকে চোরাই আফিং বেচার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপ গুলোতেই এদের ঘাঁটি আছে,—এদের একটা প্রকাণ্ড দুর্বৃত্তের দল। এরা না পারে এ মন কাজ নেই। বুঝলাম সুমিত্রা কেন আমার কাছ থেকে যেতে চায়নি, এবং তার চেয়েও বেশি বুঝলাম যে এ সমস্যার সহজে মীমাংসা হবে না। তাদের কিন্তু বিলম্ব সয়না, সন্তসন্তই একটা রফা করে সুমিত্রাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিলাম, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব ভয় দেখালাম, তারা চলে গেল, কিন্তু রীতিমত শাসিয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে আজও কেউ নিস্তার পায়নি। কথাটা নেহাৎ তারা মিথ্যে বলে যায়নি।

ভারতী শঙ্কায় পরিপুর্ণ হইয়া কহিল, তারপরে?

ডাক্তার কহিলেন, রাত্রিটা সাবধান হয়ে রইলাম। তারা যে সদল-বলে ফিরে এসে আক্রমণ করবে তা জান্‌তাম।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, তখনি তোমরা পালিয়ে গেলে না কেন? পুলিশে খবর দিলে না কেন? ডচ্‌ গভর্ণমেণ্টের পুলিশ-পাহারা বলে কি কিছু নেই না কি?

ডাক্তার কহিলেন, না থাকার মধ্যেই। তা ছাড়া থানা-পুলিশ করা আমার নিজেরও খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, রাত্রিটা কিন্তু নিরাপদেই কাট্‌লো। এখানে সমুদ্রের কিনারা বয়ে যাবার অনেক ব্যবসা বাণিজ্যের নৌকা পাওয়া যায়, পরদিন সকালেই একটা ঠিক করে-এলাম, কিন্তু সুমিত্রার হল জ্বর,—সে উঠ্‌তে পার্‌লে না। অনেক রাত্রে দোর খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লাম হোটেল-ওয়ালা কপাট খুলে দিয়েচে, এবং জন দশ বারো লোক বাড়ীতে ঢুকচে। তাদের ইচ্ছে ছিল আমার দরজাটা কোনমতে আটকে রেখে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সুমিত্রার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ভারতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে? তোমরা পালালে কোথা দিয়ে?

ডাক্তার বলিলেন, তার আর সময় হল কই? কিন্তু তাদের আগেই আমি দোর খুলে উপরে যাবার সিঁড়িটা আট্‌কে ফেল্‌লাম।

ভারতী পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, একলা? তারপরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনাটা অন্ধকারে ঘট্‌লো, সঠিক বিবরণ দিতে পারব না। তবে নিজেরটা জানি। একটা গুলি এসে বাঁ কাঁধে বিঁধলো, আর একটা লাগ্‌লো ঠিক হাঁটুর নীচে। সকাল হলে পুলিশ এলো পাহারা এলো, গাড়ি এলো ডুলি এলো, জন ছয়েক লোককে তুলে নিয়ে গেল,—হোটেল-ওয়ালা এজাহার দিলে ডাকাত পড়েছিল। ইংরাজ রাজত্ব হলে কতদূর কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু, সেলিবিসের আইন-কানুন বোধ হয় আলাদা, লোক গুলোর নিশান দিহি যখন হল না, তখন পুঁতে টুঁতে ফেল্‌লে বোধ হয়।

বিবরণ শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল ভারতীর বাক্‌রোধ হইয়া রহিল, পরে শুষ্ক বিবর্ণ-মুখে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, পুঁতেটুঁতে ফেল্‌লে কি? তোমার হাতে কি তবে এতগুলো মানুষ মারা গেল না কি?

ডাক্তার কহিলেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। নইলে নিজেদের হাতেই তারা মারা গেল ধরতে' হবে।

আর ভারতী কথা কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার নিজেও কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, তারপরে কতক নৌকোয় কতক ঘোড়ার গাড়ীতে কতক ষ্টিমারে মিনাডো সহরে এসে পৌছলাম, এবং সেখান থেকে নামধাম ভাঁড়িয়ে একটা চীনা জাহাজে চড়ে কোনমতে দুজনে ক্যান্‌টনে এসে উপস্থিত হ'লাম। কিন্তু আর বোধহয় তোমার শুনতে ইচ্ছে করচে না? ঠিক না ভারতী? কেবলি মনে হচ্চে দাদার হাতেও মানুষের রক্ত মাখানো?

অন্যমনস্ক ভারতী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেনা দাদা?

এখনি যাবে?

হাঁ, আমাকে তুমি দিয়ে এসো।

তবে চল। এই বলিয়া তিনি মেঝের একখানা তক্তা সরাইয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া পকেটে লইলেন। ভারতী বুঝিল তাহা গাদা পিস্তল। পিস্তল তাহারও আছে, এবং সুমিত্রার উপদেশ মত সেও ইতিপূর্ব্বে গোপনে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু, ইহা যে মানুষ মারিবার যন্ত্র এ চৈতন্য আজ যেন তাহার প্রথম হইল। আর ঐ যেটা ডাক্তারের পকেটে রহিল, হয়ত, কত নরহত্যাই উহা করিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাই কেননা কর, তুমি ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। যতদিন না আমার মন ভাল হয় আমাকে তুমি ফেলে যেতে পারবে না দাদা। বল যাবে না।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে বোন্‌, তোমার কাছে ছুটি নিয়েই আমি যাবো।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কপালকুণ্ডলা

সমুদ্রের নিভৃত সৈকতে বনানীর স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে,
ফুটেছিলে কোন প্রান্তে, হে বিচিত্রে কপালকুণ্ডলে!
অরণ্যের কুরঙ্গী সকল,
ক্রীড়ারত সিন্ধু উর্ম্মিদল,
নবীন প্রবীণ রবি প্রভাতে সন্ধ্যার
গন্ধেভরা গন্ধবহ রজনীগন্ধার,
এই ছিল, চিরশিশু! তব সাথী এই ভূমণ্ডলে
হে বিচিত্রে কপালকুণ্ডলে।

তোমার নীলাব্জ নেত্র কতদিন সাগর উপরে
ভ্রমেছে কারণ বিনা, ফিরেছে সে দেখিয়া সুদূরে
নীলাম্বর নীলাম্বর সনে
চিরস্থায়ী অপূর্ব্ব মিলনে;
বোঝ নাই, বোঝ নাই কি অর্থ তাহার
—জগতের চিরন্তন একটী প্রথার।
দেখ শুধু কাপালিকে আর কালী নরমুণ্ডগলে
হে বিচিত্রে কপালকুণ্ডলে।

বসন্তের পুষ্পিত বসনে সুসজ্জিতা প্রকৃতি সুন্দরী
কতদিন ফাগুনের মাঝে হয়েছিল তোমার দুয়ারী।
শরতের সুনীল আকাশ
দিয়েছিল কিসের আভাষ?
বর্ষার অঝোর ধারা বরষে বরষে
গেয়েছিল আঙিনায় কিসের হরষে?
বোঝ নাই—চেয়েছিলে নির্নিমেষে, স্খলিত অঞ্চলে
হে বিচিত্রে কপালকুণ্ডলে।

কোন এক প্রদোষেতে অস্তমান সূর্য্যকান্তি হেরি
মুগ্ধা তুমি এলে চলে তীরোপান্তে সেই সমুদ্রেরি;
অকস্মাৎ দাঁড়ালে থমকি
কারে হেরে উঠিলে চমকি?
তারপর পথিকের জাগায়ে হরষে
ধীরে-ধীরে চম্পক-অঙ্গুলী পরশে
'গৃহভ্রান্ত' বলে পথ দেখালে গো কারে, ও চঞ্চলে
হে বিচিত্রে কপালকুণ্ডলে।

গৃহাগারে বন্ধ হয়ে ছিলে তুমি দিবস-শর্ব্বরী
তাই তব মুক্তপ্রাণ ক্ষণে ক্ষণে উঠেছে মর্ম্মরি;
চলে গেছে বনানীর মাঝে
পুরাতন বন্ধু যেথা রাজে;
চলে গেছে ছিঁড়িতে গো সকল বন্ধনে
দ্বিধাহীন একাকিনী বিপুল স্পন্দনে,
অর্পিয়াছ আপনারে তটিনীর চিরমুক্ত কোলে,
হে বিচিত্রে কপালকুণ্ডলে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী

জাতিভেদ—স্বদলে

রাজার সৃষ্টিতে পুরোহিতের উৎপত্তির বিশেষত্ব নাই, পুরোহিতের মত রাজা দৈব বিপদেরও অপহর্ত্তা নন, তবুও পৃথিবীর সকল স্থানেই রাজার জন্ম দেবতার অংশে বা বংশে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে বুদ্ধি ও দক্ষতায় রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন হয়, লোকেরা তাহা বিশেষভাবে দেবদত্ত মনে করিয়া আসিয়াছে। পুরোহিত জাতির রক্তের পবিত্রতা রক্ষা করার মত রাজাদের বংশের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্তেও রাজ্যের লোকের স্বার্থের আগ্রহ ছিল। অনুন্নত লোকেদের মধ্যে দোষ-গুণের বংশ-সংক্রমণ সম্বন্ধে যে শ্রেণীর অবৈজ্ঞানিক ধারণা আছে, তাহা অতি দৃঢ় বলিয়াই অতি গভীর আগ্রহে এইরূপ জাতিভেদ রক্ষিত হইয়াছে। এই বিশ্বাসটির প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি।

গুণ বা দোষকে অনুন্নতেরা এইরূপ একটা পদার্থ মনে করে, যাহা শরীরের মধ্যে প্রায় যেন রক্তের মত থাকে, আর সন্তানেরা বাপ-মায়ের সেই আস্ত-আস্ত দোষ-গুণগুলিকে যেন রক্তে বহিয়া জন্মে। এই বিশ্বাসের লোকেরা উড়া কথায় বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত—Heridityর নিয়মের দূর সংবাদ পাইয়া, নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিয়া থাকেন। সুয়ারাণীর প্রকোপে বনে জঙ্গলে দুয়ারাণীর ছেলে হইল, সেই নিরাশ্রয় শিশুকে সাপে ফণা মেলিয়া ছায়া দিল, সিংহী দুধ খাওয়াইল, আর শেষে কপালে রাজটীকা দেখিয়া রাজার পাগ্‌লী হাতী বনের শিশুকে আনিয়া রাজগদীতে বসাইল, প্রভৃতি গল্প সকল দেশ জোড়া। শিশুদের আকৃতি অনেকটা বাপ-মায়ের মত হয় বলিয়া শিশুরা বাপ-মায়ের অর্জ্জিত গুণগুলিও দখল করিয়া জন্মে, এইরূপ বিশ্বাস লোকের মনে উদয় হয়। শিশুরা জন্মের পরের শিক্ষায় নিজেদের ঘরের অনেক ধরণ-ধারণ আয়ত্ত করে বলিয়া ঐ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে অনুন্নতেরা জ্বর প্রভৃতি রোগকে শরীর-যন্ত্রের বিকার হইতে ভিন্ন একটা পদার্থের মত ভাবে; তাই তাহারা তুক্-তাক্ করিয়া শরীর হইতে ব্যাধি তাড়াইতে চায় ও জ্বর সারিয়া যাইবার পর জ্বর-প্রবণ দুর্ব্বল শরীরে জ্বর দেখা দিলে মনে করে যে, জ্বরটা ঔষধের তাড়ায় "জাপ্য" হইয়া শরীরে লুকাইয়াছিল।

মানুষের জীবনী-শক্তি ও তাহার অন্য গুণগুলি সারা শরীরে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া অনুন্নতেরা বিশ্বাস করে যে, ঐ ব্যক্তির নখ, চুল প্রভৃতিতেও সেগুলি আছে বলিয়া মনে করে; এমন কি গায়ের ছায়া ও পরিবার কাপড়েও ঐ গুণগুলি লাগিয়া থাকে, ভাবে। তাই যাদুবিদ্যার জোরে মারণ, উচাটন, বশীকরণ করিবার উদ্যোগে যাদুওয়ালারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নখ, চুল, কাপড়ের কোণা প্রভৃতি সংগ্রহ করে ও সেগুলিকে মন্ত্রপূত করিয়া উচাটন করিলে মূল শরীরে গিয়া উত্যক্ত অংশগুলির ঢেউ লাগিবে মনে করে। একজনের ব্যাধির বালাই যদি তুক্-তাক্ করিয়া কোন পদার্থে সংক্রামিত করা যায়, আর সেই পদার্থটি যদি তেমাথা রাস্তায় রাখিয়া দিলে কেহ উহা ডিঙ্গাইয়া যায়, তবে

ব্যাধির বালাই একটা আশ্রয়ের বাসা পাইয়া আর আগেকার মানুষের শরীরে ফেরে না ; এই বিশ্বাস বর্ব্বরদের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী। গুণ ও গুণের সংক্রমণ বিষয়ে অনুন্নতদের মনে এই শ্রেণীর যে বিশ্বাস জন্মে, তাহারই দৃঢ়ভিত্তির উপরে যে স্বদলের মধ্যে গোড়ায় জাতিভেদের সৃষ্টি, তাহা বিশেষভাবে বুঝিয়া লওয়ার প্রয়োজন। দুষ্ট লোকের চোখের দৃষ্টির সম্বন্ধে যে ভয় আছে, তাহাও যে এই বিশ্বাসের সঙ্গে গাঁথা, পাঠকেরা তাহা অনায়াসে ধরিতে পারিবেন। নীচ বলিয়া বিবেচিতদের ছোঁয়া যে কেন অনিষ্টকর কল্পিত হয়, আর উচ্চ বলিয়া বিবেচিতদের পায়ের ধুলা গায়ে লাগাইলে যে কেন মঙ্গলকর কল্পিত হয়, তাহা বর্ণিত বিশ্বাসটির প্রকৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। এরূপ বিশ্বাসের ফলে কেন যে কর্ম্মের উচ্চতার ও নীচতার বিচারে শ্রেণীতে শ্রেণীতে জাতির বেড়া পড়িবে, তাহাও হয়ত অধিক কথায় বুঝাইতে হইবে না। দোষ ও গুণের বংশ-সংক্রমণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের নির্দ্ধারণ কি, তাহা ১৯১১-১২ অব্দে প্রবাসীতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। পাঠকদের আগ্রহ হইলে এই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে সে প্রবন্ধগুলি আলাদা করিয়া ছাপিব।

নিজেদের বংশের রক্তের পবিত্রতা বজায় রাখিয়া বংশগৌরব বাড়াইবার ঝোঁক স্থানে স্থানে এত বেশি দেখা গিয়াছে যে, ঐ ঝোঁকে সমাজের অন্য সনাতন প্রথাকেও অনেকে লঙ্ঘন করিয়াছে। স্বগোত্রে বিবাহ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। গোত্রবিভাগের ইতিহাস যাহাই হউক, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষেরা স্বগোত্রে বিবাহ করে না ; মুসলমানদের মধ্যে ও ইউরোপের খৃষ্টানদের মধ্যে এই নিয়মের অনেকখানি ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অন্য সকলের মধ্যে এ নিয়ম খুব পাকা। প্রথাটি পাকা হইলেও মিশরের রাজবংশের রক্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ভাই-বোনে বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু কুলের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যে ঐরূপ বিবাহের অনেক আখ্যান আছে। জাতকের গল্পে রাম সীতার বিবাহের যে উপন্যাস আছে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, খাঁটি হিন্দু পুরাণ ধরিয়াই ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিতেছি। পুরাণের বংশ-তালিকায় পাই যে, রঘুর কুলের লোকেরা ও জনকের কুলের লোকেরা একই ইক্ষ্বাকু বংশের দুইটি শাখা,—অর্থাৎ উঁহারা সকলেই এক গোত্রের লোক। সীতাদেবীর জন্ম পৃথিবীর গর্ভ হইতে, কিন্তু উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির জন্ম সেরূপ নয় ; অথচ রামচন্দ্রের ভাইদের বিবাহ হইয়াছিল উঁহাদের সঙ্গে।

শিক্ষায়, আচারে বা অন্যরকম গৌরবে যদি একটি নির্দ্দিষ্ট জাতির লোকের মধ্যে গোটাকতক পরিবারের বিশেষত্ব জন্মে, তবে সেই বিশিষ্ট পরিবারগুলি যে কোন কোন স্থলে আপনাদের জাতির অন্যান্য অনুন্নত লোকদের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিয়া একটা নূতন উপজাতির সৃষ্টি করে, ও স্বগোত্রে বিবাহের বাধার কথা ভুলিয়া নূতন ক্ষুদ্র উপজাতির মধ্যে বিবাহাদি চালায়, এদেশে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যপ্রদেশে ও সম্বলপুর অঞ্চলে অনেক হিন্দুজাতির মধ্যে এইরূপ নূতন

উপজাতির সৃষ্টি, এই প্রবন্ধলেখক নিজে দেখিয়াছেন। যে জাতির লোকেরা নিজে হাতে চাষ করিয়া অথবা কোন পরিশ্রমের শিল্পে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি পরিবারের লোকেরা যখন ইংরেজি শিখিয়া কেরাণিগিরি প্রভৃতি কাজ পাইল, আর জামা জুতা পরিয়া "ভদ্রলোক" হইল, তখন ঐ "ভদ্র" পরিবারগুলি নিজেদের জাতির লোক হইতে আপনাদিগকে আলাদা বলিয়া প্রচার করিল, ও ক্ষুদ্র উপজাতিটির মধ্যেই বৈবাহিক সম্বন্ধ চালাইতে লাগিল। এইরূপ উপজাতি সৃষ্টির পর মূল জাতিতে ও উপজাতিতে আহারাদি পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির মধ্যে যাহা লক্ষ্য করা গিয়াছে অনেক অনার্য্যদের মধ্যেও তাহা দেখা গিয়াছে। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে গোণ্ড্ জাতীয় লোকেদের মধ্যে এইরূপ উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আগে গোণ্ড্ জাতির রাজারা আপনাদের জাতির যে কোন লোকের বাড়ীতে বিবাহ করিতেন, কিন্তু এখন হয়ত "উচ্চ" গোণ্ড্দের সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া "রাজগোণ্ড" নামে স্বতন্ত্র উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

ঋদ্ধি বাড়াইবার কৌশলে শ্রমের বিভাগ করিয়া বুদ্ধিমানেরা যে জাতিভেদ সৃষ্টি করেন নাই, তাহা একটু বুঝাইবার প্রয়োজন। অল্প কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক যে দশজনের কাছে তাহাদের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় হিতের কারণ বুঝাইয়া অথবা জোর করিয়া উচ্চ-নীচের দল বাঁধিয়া দিতে পারেন না, আর সামাজিক প্রথা যে গাছে ফুল ফুটিবার মত প্রাকৃতিক নিয়মে অলক্ষ্যে জন্মে ও বাড়ে, তাহা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রমের ভাগ করিয়া জাতি গড়িলে যে, বিদ্যা ও কৌশল না বাড়িয়া ক্ষয়ের দিকে যায়, তাহা অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। এ বিষয়ে সকল যুগেই মানুষের অল্লাধিক অভিজ্ঞতা থাকিলেও, গুণের বংশ সংক্রমণের দৃঢ় বিশ্বাসে যে মানুষ সামাজিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেয় নাই, তাহাও ঐ দৃষ্টান্ত কয়েকটিতে পরিস্ফুট হইবে।

সকল দেশেই দেখা যায় যে যাঁহারা ধর্ম্মযাজক শ্রেণীতে পড়েন, তাঁহারা স্বাধীন বুদ্ধিতে নিজেদের বিশ্বাসের দেববাদকে সমালোচনা করিতে পারেন না, ও নূতন তথ্য উদ্ভাবন করিতে পারেন না ; তাঁহারা পারেন টীকা, টিপ্পনী ও ব্যাখ্যার বিস্তৃতি করিয়া সনাতন বিশ্বাসকে লোকের কাছে প্রিয় করিতে, অথবা দুর্ব্বোধ্য জটিল ব্যাখ্যায় প্রাচীন বিশ্বাসকে লোকসাধারণের ভয় ও ভক্তির পদার্থ করিতে। ইউরোপেও যেমন দেখিবেন যে পাদ্রীরা কেবল বাইবেলের তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন, ও সময়ে সময়ে সুবিধা পাইলে গোটাকতক ভাঙ্গাচোরা বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা দিয়া বাইবেলের তত্ত্বকে দৃঢ় করিতে বসেন, এদেশে ও অন্যদেশেও ঠিক তাহাই দেখিতে পাইবেন। খাঁটি পুরোহিতের দলের লোকেরা বেদের ব্যাখায় বিপুল আয়তনের ব্রাহ্মণ রচনা করিয়াছেন, যজ্ঞবিধির খুঁটিনাটির বিচার করিয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন নূতন মতের অবতারণা করিয়াছেন অন্য লোকে। যাঁহারা কেবল জাতি মাত্রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ খাঁটি-পুরোহিতবর্গের লোক নহেন, অথবা যাঁহারা স্বাধীনচেতা ক্ষত্রিয়, তাঁহারা যখন নিজেদের বুদ্ধিতে নানাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তখনই উপনিষদ, দর্শনশাস্ত্র ও

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে। বেদের সকল বিভাগের জ্ঞানে পরিপক্ক ব্রাহ্মণ ঋষিরা ক্ষত্রিয়দের কাছে যে নূতন ধরণের ব্রহ্মবিদ্যার কথা শিখিলেন, ইহা উপনিষদের অনেক স্থানে আছে। দর্শন-শাস্ত্রগুলি ও চিকিৎসাদি বিদ্যার গ্রন্থ যাঁহাদের নামে পাই, তাঁহারা জ্ঞানের জোরে ঋষি ও মুনি নাম পাইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা যাজকদের অন্তর্ভুক্ত ন'ন্। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁহাদের ভাষায় "যুক্তি" শব্দের অর্থ স্বাধীন বিচারের লজিক্ নয়; শাস্ত্রের অমুক স্থলে অমুক কথা আছে, অন্যস্থলে অপর কথা আছে, প্রভৃতি ধরিয়া যাঁহারা তর্কের "যোজনা" করিতে পারেন, তাঁহারাই "যুক্তি" দিয়া থাকেন। খাঁটি পুরোহিতের মনে উদ্ভাবনের ক্ষমতা জন্মে না।

যাহারা জাতিনিষ্ঠ ব্যবসায় চালায়, তাহাদের ঘরের ছেলেরা জাতীয় ব্যবসায়টি বিদ্যালয়ে গিয়া শিখে না; বাল্যকাল হইতে আপনাদের ঘরে পরিচালিত কাজগুলি দেখিতে দেখিতে ও কিছু কিছু করিতে করিতে আয়ত্ত করে। ইহার ফলে একই লাঙ্গল, একই ঢেঁকি, একই রকমের চিত্রপট সে কালে একালে চলিতে থাকে। আমাদের দেশের কৌশলী সেক্‌রারা মুসলমানের আগমনের আগে পর্য্যন্ত সেই অতি প্রাচীনকালের বৈদিক যুগের অলঙ্কার গড়াইয়াই আসিতেছিল; নূতন লোকের নূতন অলঙ্কার যখন দেখিয়াছে, তখন তাহার হুবহু অনুকরণ করিয়াছে ও করিয়া চলিতেছে, কিন্তু নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তিতে নূতনত্ব বাড়াইতে পারে নাই। যেকাজ যাহার বংশের নয়, সে কাজের দিকে যদি কাহারও আকর্ষণ হয়, তবে সে যেরূপ উৎসাহে ও বুদ্ধিতে সেকাজ করিবে, জাতির লোকের পক্ষে সেরূপ হওয়া সুসাধ্য নয়। সমাজের প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে কাজ শিখিয়া প্রতিযোগিতায় কাজ করিতে গেলে যে ভাবে বুদ্ধি বাড়ে ও নূতনের সৃষ্টি হয়, তাহা জাতিনিষ্ঠ ব্যবসায়ে হয় না। নানা কারণে এদেশে প্রয়োজনের বৈচিত্র্য জন্মে নাই; সে কথা পরে বলিতেছি। মানুষেরা ব্যবসায়ের ও কৌশলের উন্নতির পথ অনেক সময়ে দেখিতে পাইয়াছে, কিন্তু বংশসংক্রমণের বিশ্বাসে যাহা জাতির ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মভয়ে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

যে নিয়ম দেশ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র চলিয়াছে, জাতিভেদ সৃষ্ট হইবার যে নিয়ম পৃথিবীর সকল স্থানেই দেখা যায়, তাহারই আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীর সকল দেশেই যদি প্রাকৃতিক নিয়মে জাতিভেদ জন্মিতে পারে, তবে ভারতবর্ষের মত ইউরোপে এক একটি জাতি চিরস্থায়িরূপে বংশবদ্ধ হয় নাই কেন? প্লেটোর লেখায় দেখিতে পাই যে, এক সময় গ্রীকদের মধ্যে উচ্চ-নীচ প্রভৃতির বিচারে জাতিভেদের কড়া প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তবুও সেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বংশগত হইল না কেন? একথা সত্য নয় যে, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের সাম্যবাদ প্রচারিত হইবার পরেই ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিভেদ নষ্ট হইয়াছে। যে কারণে প্রাচীনকাল হইতেই ইউরোপে জাতিভেদ পাকা হইয়া চিরস্থায়িরূপে বংশবদ্ধ হইতে পারে নাই, তাহা বিশেষ আলোচনার সামগ্রী।

জাতিভেদে ভারতের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা ; এদেশের লোকেরা বিদেশে নানা পণ্য বিলাইয়াছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের তাড়নায় আহার্য্য সংগ্রহের জন্য দল বাঁধিয়া অন্য দেশে ডাকাতি বা অন্য রকমের রোজ্‌গার করিতে যায় নাই। যাহারা প্রাচীন কালে বহির্ভারত প্রভৃতি বিদেশে গিয়াছিল, তাহারা সেই দেশে গিয়াই চিরকালের মত বাসা বাঁধিয়াছিল, নিজেদের আগেকার দেশে ফেরে নাই। অর্থাৎ ভারতের কোন একটি জাতিবিশেষ আপনাদের জাতির লোক লইয়া দল বাঁধিয়া আহারের জন্য অথবা দেশ জয় করিয়া আপনাদের সমাজের প্রসারের জন্য স্থায়ী উদ্যোগ করে নাই। অন্য পক্ষে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা আপনাদের ছোট ছোট দেশগুলির স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার জন্য, পাইরেট্‌ সাজিয়া (উন্নততর যুগে বণিক সাজিয়া) অন্যের দেশ হইতে আহার্য্য সংগ্রহের জন্য নিজের দেশের সকলের সহকারিতায় নিরন্তর দল বাঁধিয়া একসঙ্গে "দেশের কাজ" করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশের লোকের সকলের সমান স্বার্থে এইভাবে নিরন্তর কাজ করিতে গেলে সকল শ্রেণীর লোককে নানা প্রভেদ ভুলিয়া একসঙ্গে মিলিতে হয়, ও সেইভাবে মিলিত হইতে হইতে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীগুলির মধ্যে যে সকল ঘৃণার ভাব থাকে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। বদ্ধমূল ঘৃণার ভাব না থাকিলে, নীচ শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষা প্রভৃতিতে উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক সমতা পাইলে, উচ্চে নীচে মিলনের বাধা ঘটে না।

আমাদের দেশে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি ভৌগোলিক সীমার একটি "জাতির" সকল লোকের সঙ্গে অন্য ভৌগোলিক সীমার জাতিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্যোগে, সকলের স্বার্থের তাড়নায় কখনও দল বাঁধিতে হয় নাই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠারা যখন একসঙ্গে জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন মহারাষ্ট্র দেশে সকল শ্রেণীর মধ্যে অনেকখানি সমতা আসিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। যে জাতির লোকই হউক না কেন, তাহারা যখন একসঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে, তখন আহারাদিতে জাতিভেদ থাকিবে না,—রামদাস প্রভৃতি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া কাজ করিবার সেই স্বার্থের তাড়না যেদিন চলিয়া গেল, সেইদিন হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পুরাতন পাকা পার্থক্য দেখা দিল।

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ ; রুসদের দেশ বাদ দিলে বাকি সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে বড় নয়। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষে বহু জাতির লোক আপনাদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিয়া অন্যের সঙ্গে বিনা বিবাদে বাঁচিয়া থাকিবার মত আহার্য্য পাইয়া আসিয়াছে। এদেশে ইউরোপীয় ধরণের দেশ জয়ের অভিনয় হয় নাই। পালি সাহিত্যে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায়, যাহাতে দেখা যায় যে অন্নের অভাব না থাকায় এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের বিবাদ ঘটে নাই। বিমাতাদের কুচক্রে অনেক যুবরাজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনে গেলেন, আর সেই বনপ্রদেশে তাঁহারা ছোটখাট নূতন রাজ্য রচনা করিলেন ; রাজাদের মৃত্যুর পর বনপ্রদেশের লোকেরা যখন নির্ব্বাসিত যুবরাজদিগকে পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিবার জন্য উত্তেজনা দিতে

গেলেন, তখন যুবরাজেরা উত্তর দিলেন যে, অরণ্যভূমির নূতন রাজ্যই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। দেশময় সকল লোকের স্বার্থে উদ্দীপ্ত হইয়া একটি দেশবিশেষের "একটি জাতির" লোকেরা এক লক্ষ্যে দল বাঁধিয়া কখনও "জাতীয় গৌরব" প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় নাই; কাজেই নীচ জাতির লোকদের মূল্য ও আদর বাড়িয়া উচ্চ ও নীচের মধ্যে প্রভেদ ভাঙ্গিবার পথ হয় নাই।

জাতিভেদের মূলে যে স্থায়ী ও দৃঢ় প্রভেদের ভাব থাকে, তাহা দূর হইবার মত কোন নৈসর্গিক কারণ বা উদ্যোগ এখনও দেখা দেয় নাই। প্রাচীন সংস্কারের অনুরূপ জাতি বজায় রাখিলে সরকারী চাকুরী পাওয়ার পক্ষে বাধা হয় না, বিদেশীয়দের হাটে পণ্য বেচিবার পথে বাধা হয় না, অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার স্বার্থে বাধা ঘটে না।

এ দেশের প্রায় ষোল কোটি হিন্দুদের মধ্যে হাজার কতক একালের শিক্ষিতেরা জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার দল গড়িয়াছেন; তাঁহারা যেরূপ বিচারে এই পন্থা ধরিয়াছেন সে বিচার দেশের সাধারণ লোকের বদ্ধমূল সংস্কারের মধ্যে উপস্থিত হয় না। এই দলের লোক ছাড়া কয়েকশত লোক নিজেদের উপার্জ্জনের ও পদগৌরবের স্বার্থে ইউরোপ যাত্রা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জাতিভেদ ভাঙ্গিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকে দেশে ফিরিবার পর দেশের আবহাওয়ার গুণে নিজেদের হাড়ে বদ্ধ প্রাচীন সংস্কারকে জাগাইয়া তোলেন। কোন একটা সাধারণ জাতীয় লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না থাকায় প্রাচীন সংস্কারের মূল শিথিল হইতে পারে নাই। দেশের কোথাও কোথাও নীচের স্তরের লোকেরা উচ্চ জাতীয়দের অধিকার পাইবার জন্য যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহা ঠিক দেশবদ্ধ জাতিভেদের বিরোধী বলা একটু শক্ত। যে সকল শ্রেণীর লোকেরা মূলে হিন্দু সমাজের লোক ছিলনা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের অঙ্গ ছিল না, নূতন যুগের ভাবের প্রভাবে তাহারাই বেশীর ভাগ আন্দোলন করিতেছে। যাহারা মূলে অন্য দল বা জাতির লোক ছিল, এবং বিশেষ অবস্থায় হিন্দুসমাজের আশ্রয়ে ও আওতায় পড়িয়াছিল, তাহারা কখন স্পর্শ্য জাতি হয় নাই ও হিন্দুর মন্দিরে যাইবার বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাইবার অধিকার পায় নাই; এই শ্রেণীর লোকেরা যখন ব্রাহ্মণ্য প্রথার বিরোধী হয়, তখন ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে; এই বিরোধীদের মধ্যে কখন খাঁটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দৃঢ়মূল হয় নাই,—হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। যাহারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে জাতিগৌরবের নামে যে সকল আন্দোলন হয়, তাহাতে মূল সংস্কারের বিরুদ্ধাচার থাকে না; এ আন্দোলনে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয়,—কেবল নীচের স্তরের জাতিদের মধ্যে কে বড় বা কে ছোট তাহা লইয়া বিচার ওঠে। এরূপ বিচারে ও আন্দোলনে এরূপ কথা ওঠে না যে, এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। জাতিভেদ সংস্কারের যাহা খাঁটি মূল, তাহা দৃঢ় আছে ও সেই মূলের জোরে নানা প্রকার জটিল সংস্কার জন্মিয়াছে। কাজেই কেবল সাম্যবাদের বক্তৃতায় জাতিভেদ উঠিবে না।

———

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

অকূলের যাত্রী

দিগন্তে ওই রক্ত-রবির
অস্ত-আবির-আলোকে—
তটিনীর জল করে জ্বল্ জ্বল্
মাণিক মুকুতা ঝলকে।
পাখি উড়ে' যায় করিয়া কাকলি,
পরাণ আমার উঠিছে বিকলি',
দিনের কর্ম্ম সাঙ্গ সকলি
আজিকে,—
চিত চঞ্চল চলে যেতে বল্
খেয়া পারাপার মাঝিকে।
ওই হোথা পার গেছি কতবার
এসেছি ফিরিয়া ফিরিয়া—।
দিনের পাটনি! ঘরে যাও তুমি
আঁধার আসিছে ঘিরিয়া।
অস্ত-কিরণ মিলালো এবার,
যাওয়া আসা শেষ হ'লরে আমার,
এপার ওপার সব একাকার
করিয়া,—
তটিনীর নীর নিবিড় গভীর
তিমিরে—এলরে ভরিয়া।
অন্ধকারের পাটনি এখন
বন্ধ তরণী খুলিবে—
আমার চিত্ত পুলকমত্ত
নৃত্য-দোলায় দুলিবে।

রশি খুলে' দিব অকূল লক্ষ্যে
গহন তিমিরে তটিনী বক্ষে,
সেথা-দু'জনার চক্ষে চক্ষে
মিলিবে,—
অকূলের প্রেমে ব্যাকুল বক্ষ
পুলকে দুকূল ভুলিবে।
হাল ছেড়ে' তরী পাল তুলে যা'বে
পাটনী আমার দিশাহীন
ঘন নিঃশ্বাস-সুরভি-মুগ্ধ
নিবিড় মিলনে র'ব লীন।
করে কর ধরি' নির্ব্বাক্-মুখে,
পুলক-বিবশ-কম্পিত বুকে,
ভাসিয়া চলিব অনন্ত সুখে
চিরদিন—
আমি পাটনির পাটনি আমার
যাত্রা মোদের সীমাহীন।
মন উন্মন চাই ঘন ঘন
আঁধার ঘনায় গগনে—
মাঝি! আজিকার খেয়া শেষ হ'ল
ফিরে' যাও নিজ ভবনে।
সন্ধ্যা-অরুণ-কিরণের লেশ,
পশ্চিমে ক্রমে হ'ল নিঃশেষ,
কোথা কাণ্ডারি! চাহি অনিমেষ
নয়নে—

লহ অকূলের যাত্রী তুলিয়া
তোমার শীতল শরণে।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী

দেবত্র

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

অরুণ তাহার ছোট তল্পাটি বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল মীরা কখন তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার অকুণ্ঠিত দৃষ্টিপাতের সম্মুখে অরুণ ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া দৃষ্টি নামাইতেই মীরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্চেন ? উপাধি পরীক্ষা দিতে ?"

অরুণ মৃদুস্বরে উত্তর দিল 'হাঁ' !

"ন্যায়বাগীশ না হলে বুঝি আপনার চল্‌বেই না ?"

এবার আর কোন উত্তর না পাইয়া মীরা ঈষৎ উত্তপ্তস্বরে বলিল, "আপনার না-হয় মাস খানেকেই খেয়াল মিটে গেল, কিন্তু এই যে তুলোর চাষ আর তাঁতের উদ্যোগে কত হাঙ্গাম আর চেষ্টা করা যাচ্চে, এর একটা গতি করারও কি দরকার নেই ?"

অরুণ মাথা না তুলিয়াই উত্তর দিল, "বড়মা ছোটমা রয়েছেন, হারাণ আছে, আপনার যা দরকার তখনি তা করাতে পার্‌বেন—"

"অর্থাৎ আপনার আর এতে দরকার নেই—এই তো ?—কিন্তু যেদিন আমি আপনাকে সঙ্গী ক'রে দাদার এই কাজে নেমেছিলাম সেদিন কেন একথা জানান্ নি ?"

অরুণ একটু নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, "প'ড়ে রাখা জিনিষটা কাজে লাগানোই ভাল ! আপনাকেও তো এক্‌জামিন্ দিতে যেতে হবে ?"

"আমাকে ? কে বল্‌লে এ কথা আপনাকে ?"

অরুণ আবার নিঃশব্দে নিজ কার্য্যে মন দিল দেখিয়া মীরা উত্যক্তভাবে বলিল, "আমি যে বুঝিনি একথা মনে করবেন না। আমাকে একজামিন দিতে পাঠাবার এও একটা ষড়যন্ত্র এ আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু আপনাকে একটী কথা বল্‌তে চাই আজ, আপনার এমন ব্যক্তিত্বহীন প্রকৃতি কেন ? যে যখন আপনাকে যা উচিত ব'লে বুঝিয়ে দিচ্চে আপনি তখনি তাতেই সায় দিয়ে তাই ক'রে যাচ্ছেন। এ আপনার কি রকম স্বভাব ? নিজের অস্তিত্ব ব'লে নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব'লে একটা জিনিষ আপনার মধ্যে নেই কেন ?"

মীরার এই সতেজ সরল আক্রমণে অরুণ একদিকে যেমন একটু বিব্রত বোধ করিতেছিল, অন্য দিকে তেমনি বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "যার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব বিধাতাই বিধান করেননি, তার তা কেমন ক'রে থাক্‌বে মীরা দেবী ?—"

অরুণ আরও কিছু যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মীরা তাহার কথায় বাধা দিয়া সতেজে বলিয়া উঠিল, "রেখে দেন্ আপনার ঐ এক মন্তব্য আর এক ধারণা ! বিধাতা আপনাকে কি মানুষই

করেননি নাকি ? অবস্থার গতিকে না হয় পরের সাহায্যে আপনাকে বড় হ'তে হয়েছে কিন্তু তাতে নিজের মনুষ্যত্বকে কেন ছোট করছেন ? মানুষকে মানুষের সাহায্যেই তো প্রথম জীবনটা কাটাতে হয়, প্রত্যেক শিশুজীবনের কাছে মনুষ্য সমাজই এর জন্য দায়ী। যার বাপ মা না থাকে বা অবস্থার সুযোগ না থাকে, তাকে সমাজের সমর্থ মানুষরা আশ্রয় দিয়ে তার মনুষ্যত্ব বিকাশ কর্‌বার সাহায্য দিতে কি দায়ী নয় ? কিন্তু এই সাহায্যের উপকারের ভারে সে যদি নিজের ব্যক্তিত্বই না লাভ কর্‌তে পার্‌লে, তবে সে মানুষ হ'লো কিসে ? যাদের হাত দিয়ে সেই সাহায্য এসেছিল তাদের উপরে একটা অযথা কৃতজ্ঞতার আধিক্যে যদি সেই সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি চিরজীবন তাদেরই দাসত্ব ছাড়া মনুষ্যত্বের বিকাশের আর কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নিতে না পার্‌লে তাহলে উপকারের চেয়ে তার অনুপকারই তো করা হয়েছে বল্‌তে হবে ?"

অরুণ মীরার এই উত্তেজনাভরা সতেজ উক্তিতে ক্রমশঃ যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। কথা শেষ করিয়া মীরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিতে তাহার আত্মচৈতন্য ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। অরুণ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "যদি তাঁদের প্রয়োজনে নিজের জীবনের কোন কিছুই ত্যাগ কর্‌বার তার ক্ষমতা না হ'য়ে থাকে তাহ'লে কি তাতেও সে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হ'তে পার্‌বে, মীরা দেবি ?"

"এই কোন কিছুর তো একটা মাপ আছে অরুণ বাবু! আপনি দেশের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার কৃতজ্ঞতার বাড়াবাড়িতে এতবড় জিনিষটাকেও এই কোন কিছুর মধ্যে ফেলে দিচ্চেন, জিজ্ঞাসা কর্‌ছি এইটাই কি মনুষ্যত্বের লক্ষণ ?

"আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে এ মিথ্যা উচ্চ ধারণা রাখতে দিতে চাই না। আমি স্বীকার করছি আমার এ দেশ-ভক্তি নয়। আমার জীবনে এই একটি মাত্র বস্তু আছে তাকে আপনি কৃতজ্ঞতা বা অন্য যে-নাম ইচ্ছা দিতে পারেন।"

"তাই যদি হবে তবে কেন আপনি জেঠিমার একান্ত ইচ্ছা জেনেও করুণাকে এনে দেন নি ? জেঠিমা আর মার কাছে যখন কেউ ছিলনা, আমিও যখন মামার বাড়ী থেকে গেলাম তখন কেন আপনি এই কৃতজ্ঞতাকে ভুলে নিজের স্বাধীন মতে আর বাড়ি এলেন না ? আমাদের চেয়েও বেশী কষ্ট স্বীকার করে কেন বছরের পর বছর কাটালেন ? তখনো কি এঁদের আপনাকে দরকার ছিলনা ?"

অরুণ একটুখানি নিরুত্তরভাবে অধোমুখে থাকিয়া শেষে বলিল, "সেও আমি আমার জীবনের এই সত্বার বিরোধী কাজ করেছি বলে ত মনে করিনা।"

মীরা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "তাই ? সেও আপনার স্বাভাবিক ইচ্ছার বশে নয় ? এই কৃতজ্ঞতারই নামান্তর মাত্র তাও ? তাহ'লে আর আপনাকে বল্‌বার কিছুই নেই বটে। কিন্তু তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি সেজন্য মাপ্‌ করবেন। যাদের সঙ্গে আপনার এই কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ

তাদের সঙ্গে এক অবস্থা নেবার জন্য তাদের অধিক কষ্ট আপনি স্বীকার করুতে পেরেছিলেন, কিন্তু আজ তাদের জীবনের এই সকলের বাড়া কাজে আপনি এই যে অনাস্থা দিচ্চেন, এতে আপনার সেই কৃতজ্ঞতা শাস্ত্রেতেও কিছু ত্রুটী পড়ছে না কি ?"

অরুণ আবার ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া সহসা মীরার মুখের পানে দুই চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। একটু অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বরে বলিল, "না মীরা দেবি, তা পড়ছে না ! তাঁদের কাজের সামান্য সাহায্যের জন্য তাঁদের জীবনের পথে কোন আবর্জ্জনা সৃষ্টির সম্ভাবনা যেন আমা হতে না ঘটে। সেস্থলে শত হস্ত দূরে যাওয়াই আমার সে শাস্ত্রের বিধি। আপনি 'কৃতজ্ঞতা' নামে যাকে উল্লেখ করছেন, জানিনা তার নাম ঠিক এই কিনা, তবে করুণা আর তার ভাইয়ের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের, এইমাত্র এ জগতে তাদের জান্‌বার আর অনুভব করুবার আছে। করুণা পারুলে না, কিন্তু বলুন আপনি আমি যেন পারি। আমি যেন—"

"করুণা পারলে না ? আপনি বলেন কি অরুণবাবু ! সে যা পেরেছে আপনি তার কি জানেন ?

"জানি। সে ছেলে মানুষ। তার জন্যে আপনারা কতটা মনোকষ্ট পাচ্চেন তাও জানি।"

"আপনি বল্‌তে চাচ্চেন যে করুণার কোন নকড়ি ভট্টচার্য্য বা আঠারকড়ি চক্রবর্ত্তীকে বিয়ে করাই উচিত ছিল আমাদের নিশ্চিন্তি করবার জন্যে, এই না ?—যেমন আপনি দেশের কাজ করবার ইচ্ছাও মনে চেপে নিয়ে মার হুকুমে সেটাকে উচ্ছন্ন দেবার ফিকিরে ন্যায়বাগীশ হ'তে চলেছেন ? কেমন কিনা ?"

"আমি না থাকলে আপনার কাজ একেবারে উচ্ছন্ন যাবে এতটা কেউই মনে করতে পারেন না। তবে আপাততঃ এ কাজের দরকার তেমন বেশী মাত্রায় না থাকায় আপনিও আপনার তৈরী পড়াটা শেষ করুতে যাবেন, এইটুকুও সকলে আশা করছেন মাত্র।"

"আমিও আপনার দেখাদেখি পরীক্ষা দিতে ছুটব ? আপনাকেই এতটা অনুকরণ করুবার সখ্ আমার কবে থেকে জন্মেছে, তা আমি জানিনা কিন্তু আর সকলেই তা জানেন দেখছি। তাহলে আপনি ন্যায়ধীশ হ'তে যেতে আর দেরী করুবেন না, অরুণবাবু। পারেন তো অমনি একটা অধ্যাপকের পদ খালি পেলে সেই চাকরীতে বসে যাবেন। আমার দাদা আসুক, তাঁকে নিয়েই আমি আবার কাজ চালাতে পারি কিনা দেখ্‌ব ! তিনি যতদিন না ফিরবেন আমি প্রতীক্ষা করুব। মার এই পরীক্ষা দেওয়ার চাল্ আর সেই দশহাজারী মনসব্‌দারদের খিদমতে আমি কিছুতেই পড়ছিনা, তাঁকে এ কথা জানাবেন। ইলাদি'কেও আমি লিখেছি। বড় মামা মারা যাওয়ায় সেও এবার তো পরীক্ষা দেবেই না, বিয়ে করতেও তাকে আর কেউ বাধ্য করুতে পারবে না ! তাতে আমাতে অরুণাতেই আমাদের কাজ চালাব। যান আপনি, আপনার সাহায্য আর আমি চাইনা। আপনাদের বাদ দিয়ে আমরাই কিছু পারি কিনা দেখব।"

"আপনার কথা ভগবান প্রত্যেকটিই সফল করুন। কখনো এসে আপনাদের এই সাফল্য দেখে যেন কৃতার্থ হতে পারি। দাদা মশায়ের 'দেবত্র' এমনি করে সফল হোক্।"

"আপনি তাহলে সত্যই আবার এখান থেকে চলেছেন? আমার একটি সন্দেহ ভঞ্জন করে যাবেন? আমার জেঠিমা কখনই স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থা করেন নি যার দায়েই তাঁকে বাধ্য হয়ে এ সব করতে হচ্চে, নয় কি?"

অরুণ উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে রহিল দেখিয়া মীরা আবার একটু বেগের সঙ্গে বলিল, "মা আমার এমনিই বটেন! দাদা যেই তাঁকে সেই দশহাজারীর সন্ধান দিয়েছে অমনি তিনি আবারও রুচি বদলে ফেলেছেন দেখছি। যাক্ এ কথা। জেঠিমা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তো কথাই নেই, কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দিন দিন যে রকম হয়ে আসচে, তিনি যে বেশী দিন আর বাঁচবেন এমন আমার মনে হয় না, অরুণবাবু! দাদা ফিরে এলে এবার তাকে তার কাজের জন্য আর বাইরে যেতে না হয়, ঘরেই তার কাজ নিয়ে সে যাতে জেঠিমার কাছে থাকে, সেই উপায়ই আমরা করে রাখছি। আপনি এখন পরীক্ষা দিতে যাচ্চেন যান্। কিন্তু তখনকার কথা একটু ভাবছেন কি? জেঠিমা অবর্ত্তমানে তখন আপনিই তো দেবত্রের মালিক হবেন। করুণার বিষয়ে আমি ভাবিনা, কিন্তু আপনার কৃতজ্ঞতার যে রকম বাড়াবাড়ি, তখন আবার আমার জীবনের পথের জঞ্জাল মুক্ত করবার জন্য আমাকে এখান হতে তাড়িয়ে দেবেন না তো? দিলেও অবশ্য আমার নিজের মত কাজ থেকে আমায় আর কেহই টলাতে পারবেন না—তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্চে তখন কি করবেন আপনি? আপনার 'দেবত্র' হতে দেশের কাজও চলতে পারবে তো? আপনার কৃতজ্ঞতার কোন খানে এর জন্য বাধা উপস্থিত হবে না ত?

অরুণ তবুও উত্তর দিতে চাহিতেছেনা দেখিয়া মীরা তীক্ষ্ণনেত্রে তাহার আনত মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা আপনি তবে আসুন।"

"একটি মাত্র প্রার্থনা আপনার কাছে—" কথার সঙ্গে অরুণ মুখ তুলিতেই মীরা দেখিল তাহার মুখ একেবারে মরার মত সাদা হইয়া গিয়াছে। যে হাতটা দিয়া অরুণ তাহার ছোট পুঁটুলিটা ধরিয়াছিল সে হাতটা স্পষ্টই কাঁপিতেছে। অরুণ আবার চুপ করিতেই মীরা উত্তর দিল, "কি বলুন!"

তবুও অরুণ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। তারপরে হঠাৎ এক সময়ে বেগের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সনৎ ঘরে এসে পৌঁছলে আর—জেঠিমা যদি সত্যই চলে যান্ তখন একবার—না—তাই বা কি করে সম্ভব হবে?"

মীরা সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনার মতলবটা কি বলুন তো? আপনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করছেন নাকি যে আপনার কাছে কোন খবরও আমাদের আর পৌঁছুবে না? জেঠিমা তাঁর

শরীরের একরম অবস্থায় আপনাকে যেতে দিচ্চেন, আপনিও চলে যাচ্চেন—এ ব্যাপার কি আপনাদের ? আপনি যে একেবারে এখান থেকে চলে যাবার মতলব কর্‌ছেন এও কি তিনি জানেন ?"

অরুণ কি একটু উত্তর দিতে গেল ; কিন্তু কথাগুলা কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে চাহিল না। মীরার মুখে কি এক রকমের একটু হাসি দেখা দিল, বলিল, "অস্বীকার কর্‌বার চেষ্টা মিছে। মিথ্যে কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরুলো কই ? আমি আপনাকে বাধা দেব মনে কর্‌বেন না,—কেবল সত্য কথাটা মাত্র আপনার কাছে শুন্‌তে চাই ! আপনি কি একেবারেই যাচ্চেন ?"

"হাঁ৷ !"

"জেঠিমার কথা আপনি ভাব্‌ছেন না ? ভয় কর্‌ছে না আপনার ?"

"সনৎ আজ কালই বাড়ী আস্‌ছে খবর পেয়েছি !"

"দাদা আস্‌ছে ! তবু তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই আপনি চলে যাবেন ?"

"সে এসে পড়লে তো যাবার পথটা আমার বেশী সুগম হবে না, মীরা দেবি !"

"আপনাকে বুঝি যেতেই হবে ?"

"হাঁ৷ !"

"আমাদের খবরও আপনাকে পাঠাবার উপায় আপনি রাখ্‌বেন না বুঝ্‌ছি। জেঠিমা যদি শীগ্‌গির চলে যান ?"

"তিনি সে কথা মনে করেই আমায় আশীর্ব্বাদ করে বিদায় দিয়েছেন।" অতিকষ্টে কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া অরুণ মুখ ফিরাইয়া বলিল "সময় যাচ্চে, আমি—"

"দাঁড়ান আর একটু ! জান্‌বেন মা যার জন্য জেঠিমার মত গুরুজনকে, তাঁর এই সময়ে, আর আপনাকে, এই কষ্ট দেবার উদ্যোগ করেছেন তা মিথ্যে হবে ! তিনি দাদুর কাছে যে অপরাধ করেছেন এতদিন তার কিছুই প্রায়শ্চিত্ত হয়নি, কিন্তু এবার আর নিস্তার পাবেন না ! আমায় সেই বিয়েয় কিছুতেই রাজী কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনি যদি চিরদিনই আর এ দেবত্র অধিকার কর্‌তে না আসেন—আমি আপনার এই ত্যাগশক্তিকে আদর্শ ক'রে আপনার কর্ত্তব্য আমিই ক'রে যাব। আপনি আমায় ভার দেননি—তবু এ ভার আমিই স্বেচ্ছায় তুলে নিচ্চি, জেনে যান্‌। আপনার কৃতজ্ঞতার সার্থকতা আপনি যেখানেই যাননা কেন, জগৎ আপনাকে নিশ্চয়ই দেবে, এ না দিলে তার সকল নিয়মই উল্টে যাবে যে ! কিন্তু আমি যেন আপনার কাজ কর্‌ছি জেনেই নিজের সার্থকতা পাই, এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যান্‌ !"

মীরা অরুণের পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়াই ধীরপদে কয়েক পা চলিয়া গিয়া পেছন ফিরিয়া দেখিল, শ্বেত প্রস্তর প্রতিমার মত অরুণ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষে পলক নাই,

শরীরে কোন স্পন্দন নাই। মীরা ফিরিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল,—"অসুখ বোধ করছেন কি? একটু সামলে দু এক ঘন্টা পরে বেরুলেও আপনি এত বেশী অকৃতজ্ঞ হ'য়ে যাবেন না। খানিকটা বিশ্রাম করুন আমি যাই জেঠিমার কাছে, তাঁর জ্বরটা আজ বেশীই হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে।"

"যান্—আর আজ শেষ দিনে আর একটুও জেনে যান্ তবে,—যা কখনো আপনাকে বা জগতের কারুকেই জানতে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। যাকে আপনি কৃতজ্ঞতা বলে বারে বারে উল্লেখ করছেন—যাকে এখনি ত্যাগ-শক্তি বলেও উল্লেখ করলেন—আজ আপনি স্বেচ্ছায় ভার নিয়ে যার কর্ত্তব্য মাথায় নিলেন বলে জানিয়ে তাকে কি বুঝতে দিলেন তা কি আপনিও বুঝতে পারছেন? জগতের কাককে যে কথা সে জানতে দেবেনা ব'লে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে চলেছিল—আজ আপনার মাত্র এই কথায়ই যে সে বাঁধ মুক্ত হয়ে যাচ্চে, সে যে জানাতে চাচ্চে আপনাকে কৃতজ্ঞতা নয় তার নাম শুধু,—শুধু ঐ বলেই তাকে জানবেন না—"

"জানতে চাই না— শুনতে চাই না আপনার কথা, যান আপনি যেখানে যাচ্চিলেন—যান্—কে বলেছে আপনাকে একথা বলতে—একটুও বিশ্বাস করি না আপনার কোন কথা।"

"ঠিক্, ঠিক্, মীরা, আমিও একটুও বিশ্বাস করি না।" বলিতে বলিতে সনৎ আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল, পশ্চাতে হাস্যমুখী ইলা।

"দাদা" বলিয়া মীরা ইলারই হাত টানিয়া লইয়া তাহার স্কন্ধে মুখ লুকাইল। সনৎ অরুণের পানে চাহিয়া বলিয়া চলিল, "ইলার কাছে সব শুনলাম। এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েও তোমারে সেই পুরোনো পচা কৃতজ্ঞতার খেয়াল্ গেল না, অরুণ দা, ছিঃ! সেই খেয়ালে কত বড় অকর্ত্তব্য করতে যাচ্চ? আর সমস্ত বিরোধী স্বভাব যে দুঃখের প্রবল উৎপীড়নে এক জায়গায় এসে মিলেছে সেই মিলনকেও অস্বীকার করতে যাচ্চ! কি ভাগ্যে ঠিক্ সময়ে এসে পড়েছি, নৈলে তোমরা তো আবার এক কাণ্ড করে বসছিলে।"

"সনৎ, আজই তুমি এসে পৌঁছুবে এতো জানতাম না।"

"না জেনে ভালই হয়েছে, ইলার মুখে শুনলাম মার বড় অসুখ, চল তাঁর কাছে যাই।"

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীনিরুপমা দেবী

সাঁওতাল

(আরবী ছন্দ—মন্‌সরাহ্‌)

ছন্দ-সূত্র :—

মফ্‌তা আলুন | ফাএলাত | মফ্‌তা আলুন | ফা—
ওই পাহাড়ের | ধার দিয়ে | আস্‌ছে রে সাঁওতাল

ওই পাহাড়ের ধার দিয়ে আস্‌ছে রে সাঁওতাল,
রংটি কালো মিশ্‌মিশে—মূর্ত্তি সে জম্‌কাল্‌!
নাইক' তাহার বেশ-ভূষা, নাই বিলাসের লেশ,
সুস্থ-সবল তার দেহ দেখ্‌তে লাগে বেশ!
দূর পাহাড়ের জঙ্গলে নিভৃতে তার ঘর,
বাহ্য-জগৎ নয় আপন—সব যেন তার পর!
এই যে শহর ঘরবাড়ী, কারখানা ও কল,
শিক্ষা-জ্ঞানের এই আলো শুভ্র-সুনির্ম্মল,—
এর কোনোটাই নাই ওদের, নাই তা'তে আফ্‌সোস্‌
যা' আছে তা'র তা'ই ভাল—তাইতে সে সন্তোষ।
সভ্য জগৎ থাক্‌ দূরে—তা'র কিবা দরকার?
'ডোণ্ট-কেয়ার' ভাব ওদের দিব্বি চমৎকার!
বিশ্ব-মায়ের নিজ পেটের সব ওরা সন্তান
তাঁর ঘরেতেই বাস ওদের সেই ত ওদের মান!
মা'র হা'তে সে তৈরী ঘর, চত্বর ও প্রাঙ্গণ,
ভাঙ্‌বে না তা'র এক কোণা—রইবে চিরন্তন।
এ যেন মা'র সাফ্‌ আড়ি বৈজ্ঞানিকের পর—
ঘর তুলেছে দশ-তালা—সব চেয়ে সুন্দর!
সেই ঘরেতে ঠাঁই দেছে সন্তানে আপ্‌নার
এর চেয়ে আর উল্লাসের বল্‌ কি আছে তা'র?
স্নিগ্ধ-শীতল সেই যে ঘর নিভৃত নির্জ্জন,
মায়-পুতেতে হয় নিতুই মিষ্ট আলাপন
দুষ্ট ছেলে আমরা সব, ঘর ক'রেছি পর
ছুটছি শুধু চৌদিকে নিত্য নিরন্তর,
শস্য-শ্যামল এই মাটি—যার সেবা ঠাঁই নাই,—
সেই মাটিরে পায় ঠেলে চৌতালা উঠাই!
চেষ্টা কতই করছি সব ক'রতে গো সুখ-ভোগ,
হায় তবুও সর্ব্বদাই ছাড়্‌ছে না শোক রোগ!
মিষ্ট-মধুর মা'র সোহাগ সব ভুলেছি হায়,
মা আমাদের তাই বিরূপ লজ্জা ও ঘৃণায়!
তাই বুঝি মা ভুল ক'রেও নেয়না মোদের নাম,
ভাব্‌ছে—"ওরা ঘর ছাড়া, যাক্‌-গে জাহান্নাম!"
গুপ্ত সুধা যার বুকের তাই ক'রে না দান
সাঁওতালেরাই এক-চেটে কর্‌ছে সে সব পান।
ঝর্ণা-ঝোরা দেয় ওদের স্নিগ্ধ-শীতল নীর
নীল পাষাণের বুক-চোঁয়া সেই ত রে মা'র ক্ষীর!
তৃপ্ত মনে দুইবেলা পান করে সব তাই
'কল্‌-কা পানি' খাই মোরা—তা'য় অধিকার নাই!
কোর্ম্মা-পোলাও চপ্‌-কাবাব, এর কিছু না চায়,
মা'র ঘরেতে যা' আছে তাই ওরা সব খায়;
সাপ-শেয়ালের নাই বিচার—খাদ্য ওদের সব,
অন্নজলের নাই অভাব—অদ্ভুত এ বৈভব!
খোশ মেজাজে রয় ওরা, নাই চাতুরী ছল,
অন্ধ-যুগের এই মানুষ—শান্ত ও সরল!
পান্না-হীরা-জওহরের নাইক' অলঙ্কার
কণ্ঠে দোলায় ফুল্‌-মালা হয় যবে দরকার,
এম্‌নি ক'রেই মা ওদের রাত্রি-দিনমান
সব অভাবের হা'ত হ'তে করছে পরিত্রাণ,
আগ্‌লে ব'সে সব ছেলে বল্‌ছে—"হুশিয়ার!
লক্ষ্মীছাড়া সব ওরা, যাস্‌নে ওদের দ্বার,
সভ্যতা-মদ-গর্ব্বিত ওই যে বেকুফ্‌ দল,
ভ্রান্ত ওরা, নাই ওদের শান্তি ও সম্বল;
সভ্য হো'ক্‌ আর নব্য হো'ক্‌, থাক্‌ ওরা সব দূর,
সভ্য এবং সাঁওতালে ভেদ আছে প্রচুর!
অন্ধকারেই থাক্‌ তোরা, নিস্‌না ওদের দান
এই আশীর্ব্বাদ দেই সবে—হো'ক্‌ চির কল্যাণ।"

গোলাম মোস্তফা

আশুতোষের জীবনচরিত*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে গৃহে আর না পড়াইয়া সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তখন এই স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে বলিয়া দিলেন, তিনি যতদিন ক্লাসে প্রথম স্থানে থাকিতে পারিবেন, ততদিন এক টাকা করিয়া পাইবেন, দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে আট আনা করিয়া পাইবেন। আশুতোষ সর্ব্ববিষয়েই এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে, বৎসরের প্রায় সবদিনই এক টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন, মাত্র দুইদিন কি তিন দিন আট আনা পাইয়াছিলেন।

আশুতোষ যখন যাহা করিতেন প্রাণ দিয়া করিতেন, যখন যাহা শিখিতেন, ঐকান্তিক যত্নে সে বিষয়ের সমস্ত দিকের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। তিনি কোন কার্য্যই 'দায়সারা গোছ' করিতে জানিতেন না। পিতার সেই মূলমন্ত্র—"ভাল ক'রে শেখা চাই"—তাঁহার কর্ণে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইত।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ যে যত্নে, যে আগ্রহে ও যে স্নেহে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অমন পিতারই, এমন পুত্ররত্ন লাভ হইয়া থাকে। এদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, যে রাম পিতার একটা উচ্চারিত বাক্যের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত রাজসুখ পরিহার করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাসের বহুবিধ ক্লেশ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার মত পুত্ররত্ন লাভ তাঁহার ভাগ্যেই ঘটে, যিনি রাজা দশরথের ন্যায় রামবনবাস সংবাদ শ্রবণ করিয়াই "হা রাম" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। এমন পিতা না হইলে এমন পুত্রও লাভ ঘটে না। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের আকুলতা ও আকিঞ্চন, উৎসাহ ও প্রেরণা, তাঁহার সারল্য ও সদাশয়তা, মহানুভবতা ও দয়া বালক আশুতোষের হৃদয়কে সর্ব্বক্ষণ মহৎভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত। আশুতোষ সেই নিমিত্ত বালককালেও কখনও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিতেন না। তিনি যখন একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরের বালক মাত্র, তখনই ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের ২৫শ প্রতিজ্ঞার নূতন একটী প্রমাণ আবিষ্কার করেন। উহা কেম্ব্রিজের Messenger of Mathematics নামক বিশ্ববিশ্রুত পত্রিকায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এদেশে এত অল্প বয়সে কেহ মৌলিক গবেষণা বা তথ্যানুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া আজিও শুনি নাই। সাধারণের সহিত আশুতোষের এইরূপ প্রতি বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হয়।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার হাইকোর্টের জজ হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তাঁহাকে হাইকোর্টের উকিল করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি "পুত্রের মেধা দেখিয়া প্রীত থাকিলেও, তাঁহার বক্তৃতাশক্তির অভাব দর্শনে চিন্তিত ছিলেন। আশুতোষ বালককালে 'মুখচোরা' ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ একখানি ছোট টুল তৈয়ার করাইলেন। টেবিলের উপর সেই টুলখানির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার মত ভাবভঙ্গিতে আশুতোষকে স্কুলের পাঠ আবৃত্তি করিতে হইত। এই সময়ে তিনি বক্তৃতা সম্বন্ধে Bell's Elocution, Public Speaker প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক পড়িতেন, কখনও কখনও তাহা হইতে অংশবিশেষ লইয়া বক্তৃতাও করিতেন। যদি কোন শব্দের উচ্চারণ ভুল হইত, টেবিলের উপর চেম্বার্সের কৃত ইংরাজী অভিধান থাকিত, তাহা খুলিয়া তৎক্ষণাৎ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ দেখিয়া লইতেন। প্রবীণ বয়সে যাঁহার বক্তৃতার নির্ভীক বজ্রনির্ঘোষ উচ্চতম পদস্থিত রাজপুরুষদিগকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাঁহার জ্বালাময়ী ভাষা রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থাপক সভা প্রকম্পিত করিয়াছিল, যাঁহার স্বদেশ হিতৈষণা বাঙ্ময়ী হইয়া কলিকাতা সিনেট হাউস এবং মহীশূর, বেনারস, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ভাবী আশাস্থল বিদ্যার্থিগণের হিতকল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই অসাধারণ বাগ্মিতার এইরূপে সূচনা হইল।"*

স্কুলনির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া আশুতোষের মনস্তুষ্টি হইত না। তিনি বিবিধ বিষয়ের নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। গণিতে তাঁহার এতদূর অনুরাগ জন্মিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ কালেই এফ্, এ, পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট গণিত গ্রন্থসমূহ প্রায় সকলই তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। সমগ্র ইউক্লিডের জ্যামিতিখানি অধ্যয়ন করিলেন। কেবলি কি গণিতে পারদর্শিতা লাভ করিলেন? ব্যাকরণ কৌমুদী চারিভাগ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। এদিকে ইংরাজীতেও সুপ্রসিদ্ধ এড্মণ্ড বার্কের গ্রন্থসমূহ পড়িতে লাগিলেন। বহু বাঙ্গালা বইয়ের আদ্যন্ত অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। যে সকল গ্রন্থ পাঠে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা হয়, তাহাই আশুতোষ সাগ্রহে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় তিনি বালককাল হইতেই পরিশ্রম করিবার শক্তিরও অনুশীলন করিতেন।

অনেক ছাত্র ভাল কথা শুনিয়া বা সদুপদেশ লাভ করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনাবশে সামান্যক্ষণ অথবা দুই চারিদিন একটু ভাল হইবার চেষ্টা করেন। ক্রমে তাহাদের মনের দাগ মুছিয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাও কমিয়া যায়। এই দোষটি আমাদের জাতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন ভাল বিষয়েরই বেশীদিন অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের থাকে না। আশুতোষ এ ধরণেরই ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইতে কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। বালক বয়সেই কি, যুবক বয়সেই কি, প্রৌঢ়কালেই কি—যাহা সৎ তাহা যতই বিপদসঙ্কুল বা বাধা-

* আশুতোষের ছাত্রজীবন, তৃতীয় সংস্করণ (চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কলিকাতা), পৃঃ ২৪—২৫।

বিপত্তিপূর্ণ হউক না কেন, তাহার পশ্চাতে তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মগৌরবমণ্ডিত দৃঢ়চিত্ততার পরিচায়ক মুখশ্রী দেদীপ্যমান দৃষ্ট হইত।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া আশুতোষ দ্বিতীয়স্থান লাভ করেন ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে (১৮৮০ খৃঃ) প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তখন সুপণ্ডিত মিষ্টার সি, এইচ্, টনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ও মেসার্স রো, বুথ, রবশন, পার্শিভ্যাল প্রভৃতি মনীষিগণ অধ্যাপক ছিলেন।

আশুতোষ ভবানীপুর রসারোড হইতে প্রতিদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। দূরত্বনিবন্ধন আট দশজন ছাত্র একত্র একখানি বড় গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। প্রাতঃকালে নয়টা বাজিলেই স্নানাহার করিয়া প্রস্তুত হইতে হইত, এদিকে অপরাহ্ণে পাঁচটার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারিতেন না। তৎপরে একটু বিশ্রাম করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইত, সুতরাং দিনের বেলায় তাঁহার বড় একটা পড়াশুনা হইয়া উঠিত না। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ কিছুতেই তাঁহাকে রাত্রি ১০টার পরে পড়িতে দিতেন না, বলিতেন, "এই সময়ের মধ্যে যাহা হয়, তাহাই হইবে।" কিন্তু পাঠের প্রতি আশুতোষের এমন অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার পরমস্নেহময় পিতার অজ্ঞাতসারে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া দিবসের ক্ষতিপূরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আশুতোষ প্রথম প্রথম ১২টার সময় শয়ন করিতেন, ক্রমে মাত্রা বাড়িয়া গেল, তিনি রাত্রি ২টার পূর্ব্বে শয়ন করিতেন না। একদিন গভীর নিশীথে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি পুত্রের কক্ষে আলো দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। নিকটে গিয়া আশুতোষকে তখন পর্য্যন্ত পাঠ করিতে দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। সেইদিন হইতে কিছুতেই আশুতোষকে তিনি অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়িতে দিতেন না—বারে বারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন।

কিন্তু এই কঠিন পরিশ্রম তাঁহার শরীরে সহিল না। অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনার ফলে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হইবার উপক্রম হইল। শীতকাল একরকম করিয়া কাটিল, গরম পড়িতেই পীড়া বিষম বাড়িয়া উঠিল। আশুতোষ একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। পিতা বহুযত্নে ঔষধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ঔষধই তাঁহার মস্তকের ভিতরকার যন্ত্রণা কমাইতে পারিল না। শেষে বায়ু পরিবর্ত্তনে উপকার হইতে পারে এই আশায় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীসহ জুনমাসের শেষভাগে গাজীপুরে পাঠাইয়া দিলেন। গাজীপুরে আশুতোষের জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাপ্রসাদ বাবু ডিস্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য পীড়িত ভ্রাতষ্পুত্রের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যতদিন গরম ছিল আশুতোষের পীড়ার কোনই উপশম হইল না। জুলাই মাসে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে গরম কমিয়া গেল, তখন আশুতোষ কতকটা সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন।

"পশ্চিমাঞ্চলে জল বড় দুষ্প্রাপ্য। বাঙ্গালার ন্যায় সুজলা সুফলা ভূমি আর নাই। নয়ন-

প্রীতিপ্রদ হরিৎশস্য সমন্বিত প্রান্তর অথবা স্নিগ্ধচ্ছায়াবহুল তরুরাজিশোভিত গ্রাম পশ্চিমপ্রদেশে দৃষ্ট হয় না। গাজীপুরে অনেক বাটীর নিকটে ইন্দারা আছে, সহরের অধিবাসিগণ তাহা হইতে জল আহরণ করিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবুর গৃহের সন্নিকটেও একটি ইন্দারা ছিল। সেই ইন্দারার নিকটে বসিয়া একদিন আশুতোষ স্নান করিতেছেন, এমন সময় একটি বালক তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষস্থিত ভীমরুলের চাকে সহসা এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। ক্রুদ্ধ ভীমরুল প্রকৃত শত্রুর উদ্দেশ করিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী স্নাননিরত আশুতোষকে আক্রমণকারী মনে করিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশে বিষম দংশন করিল। তন্মুহূর্ত্তে ভীষণ যন্ত্রণা তড়িচ্ছটার ন্যায় সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইল। আশুতোষ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ইন্দারার পার্শ্বে পতিত হইলেন। গৃহের লোকজন সকলেই সর্ব্বদা আশুতোষকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। তাঁহাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করান হইল। মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য বহু চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফললাভ হইল না। * * ডাক্তার আনা হইল, কিন্তু কোন উপায়েই কেহ আশুতোষের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। সমস্ত দিন ও রাত্রি তাহাকে লইয়া এইভাবে সকলে বসিয়া কাটাইলেন। পরদিন স্নানের বেলায় ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে আশুতোষ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

চেতনালাভ করিয়া আশুতোষের মনে হইল মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গিয়াছে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সত্য সত্যই সেইদিন হইতে মস্তিষ্কের পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল।"*

ইহার পর আর একমাস গাজীপুরে অবস্থিতি করিয়া আগষ্ট মাসের শেষভাগে সকলে পুনরায় ভবানীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া যেমন একটু একটু পড়া শুনা আরম্ভ করিলেন অমনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। দুই সপ্তাহ কাল শরীরের উত্তাপ ১০৫° ডিগ্রী ছিল। এখনকার ন্যায় চিকিৎসা পদ্ধতি তৎকালে প্রচলিত ছিল না। এক্ষণে বিজ্ঞানের রাজত্ব— বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া অনেক প্রকার বিষ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে। যাহা হউক কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জ্বরের উপরই কুইনাইন্ প্রয়োগ করিয়া তাহাতেই জ্বর বন্ধ করিলেন। আশুতোষ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বড় দুর্ব্বল রহিয়া গেল।

দুই মাস পরে অর্থাৎ পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসেই এফ্. এ. পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। সকলেই আশুতোষকে এবৎসর পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছেন দেখিয়া শেষে কেহ আর আপত্তি করিলেন না।

সেপ্টেম্বর মাসের জ্বরের পরে আশুতোষের দক্ষিণ হস্ত সেই যে দুর্ব্বল হইয়া রহিল তাহা আর সারিল না। তাহার ফলে আশুতোষ পরীক্ষার সময়ে প্রথম বেলার তিন ঘণ্টা লিখিয়াই অতিশয়

* আশুতোষের ছাত্রজীবন, তৃতীয় সংস্করণ (চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা) পৃঃ ৪৮—৪৯।

ক্লান্তি অনুভব করিতেন—তাঁহার হস্ত অবশ হইয়া আসিত। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ বাটী হইতে বেটারী (Electric battery) লইয়া গিয়া টিফিনের সময় পুত্রের হস্তে লাগাইয়া দিতেন, তাড়িৎ তেজে হস্ত কিছুক্ষণের জন্য সবল হইত। কিন্তু তথাপি আশুতোষ অপরাহ্নে দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টার অধিক সময় লিখিতে পারিতেন না—তাহাতেই শরীরেও বিশেষ দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেন। এইরূপে কোনও ক্রমে এফ্. এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল। এক মাস পরে কলিকাতা গেজেটে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন আশুতোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। সেই বৎসর সুস্থ দেহে পাঠ করিতে পারিলে ও পরীক্ষার সময় নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত লিখিতে পারিলে কি ফল হইত তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজ-নাম্‌চা

গুরুজী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"সপ্তগ্রামের হরিহর চট্টোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। স্বামী স্ত্রী একাহার করে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে বহু কষ্টে একমাত্র পুত্র রাসবিহারীকে মানুষ করলেন। রাসবিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করে একটা বড় সরকারী চাকুরী পেলেন। তিনি নব বঙ্গের নব্য যুবক। পিতার সদাচার পূজা নিষ্ঠা প্রভৃতি কুসংস্কার গ্রাম্য ম্যালেরিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন ক'রে তিনি সভ্যতালোক-মণ্ডিত কলিকাতায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। গ্রামে থাক্‌লে স্ত্রী নানা প্রকার কুরীতি কুনীতি কুসংস্কারের ঘোমটায় আত্মার মুখ ঢেকে রাখবে, এই ভয়ে তিনি তাকেও নিয়ে এসে একেবারে নব-বিধান সমাজের ভগিনীদের সঙ্গে মিশবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রবিবারে দু'জনে ব্রহ্মমন্দিরে যান। স্ত্রী প্রতিদিন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ মহিলা উদ্যানে গিয়ে উন্মুক্ত বায়ু সেবন করেন; প্রবাসী ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্রিকায় যা পাঠ করেন উদ্যানবিহারিণী অনুমতা ভগিনীদিগকে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়ে দেন, এবং কখনও কখনও একটী ঝি সঙ্গে নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হট হট করে রাস্তায়ও চলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। পূজার ছুটীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বামী স্ত্রী দুজনে শ্রীক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে তীর্থের মাহাত্ম্য বশতই হউক আর যে কারণেই হউক রাসবিহারীর স্ত্রীর মনে একটা পরিবর্ত্তন এল। সেখানে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল। কলিকাতায় ফিরে এসে রাসবিহারীর স্ত্রী আর তেমন ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে মিশেন না;

ব্রহ্মমন্দিরে যাবার তেমন আগ্রহও আর দেখান না। এই অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন হচ্চে। এমন সময় আমি গিয়ে উপস্থিত। আমি তাঁদের ভালবাসতাম, তাঁরাও আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। আমাকে দেখে রাসবিহারীর স্ত্রী ব'ললেন,—

আপনিই বলুন না বাবা, চোকবুজে অন্ধকার দেখে কি প্রাণ তৃপ্ত হয় কিছুই বুঝি না, অথচ সকলে নিন্দে করবে বলে চোক বুজে থাকতে হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব ভাল কথাই আচার্য্য বেদী থেকে বলেন। কিন্তু মনের গতি ত রোধ করতে শিখি নাই; মন যে ততক্ষণ ছেলে পিলে, রান্না বান্না, ঘর কন্নার সঙ্গে বেড়ায়। সমাজ ভেঙ্গে গেলে মনে হয় অনেকেরই আমারই দশা; আমার স্বামীর কত মাহিনে, আমার কখানা গহনা হ'ল, ব্লাউস কাকে দিয়ে তৈয়েরী করিয়েছি ইত্যাদি প্রশ্ন লহরীই যেন উপাসনার সময় তাঁদের অন্তরে খেলচিল। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ত দেখেছি বাবা, শ্বশুরের পূজার আয়োজনের জন্য শাশুড়ী ঠাকরুণের কি ব্যস্ততা। লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার জন্য কি ঐকান্তিক আগ্রহ! দুর্গাপূজার সময় শ্বশুর ঠাকুর উপবাসী হ'য়ে যখন গদ্গদ স্বরে 'মা মা' ব'লে ডাকতেন, গ্রামের সকলে পূজার নৈবিদ্য উপহার এনে যখন আমাদের পূজা তাহাদের সকলের পূজা মনে ক'রে কৃতকৃতার্থ হত, বিজয়ার দিনে যখন সকলে ভেদাভেদ ভুলে কোলাকুলি করত, মনে হত মা আনন্দময়ী স্বয়ং আবির্ভূত হ'য়ে যেন জগৎকে আনন্দ ধারায় ভাসিয়ে দিচ্চেন!

আমি। মা, ভগবান স্বয়ং বলেছেন:—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"

যে তাঁকে যেভাবে ভজনা করে ভগবান তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করেন।

"মন্দিরে মসজিদে তিনি
হিন্দু মুসলমানে।
দেখা দেন ডাকলে তাঁরে
ডাক সিক্ত প্রাণে॥"

যে যেভাবেই ডাকুক না, তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। বিষ্ণায় নমঃ বললেও তিনি নমস্কার নেন, বিষ্ণবে নমঃ বললেও নমস্কার নেন। হরি, ব্রহ্ম, গড, খোদা, যে নামেই ডাক তিনি উত্তর দেন। কিন্তু ভাবভক্তি থাকা চাই।

রাসবিহারী। দেখুন, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান না থাকলে কেবল ভক্তিতে কিছু হয় না। ভক্তি অন্ধ। কুসংস্কার দেশাচার না গেলে দেশের পরিত্রাণ নাই। এই দেখুন না; মেয়েগুলি যেন ঘর ঝাঁট দিতে আর হেঁসেলের হাঁড়ি ঠেলতেই এসেছে। সময়ের দাম নাই,—এই দেখুন, আমার স্ত্রীর নাম—গরুড়ধ্বজবল্লভা—উচ্চারণ করতেই দুমিনিট লেগে যায়। সভ্য সমাজের দেখুন, কেমন মিষ্টি আর সংক্ষিপ্ত নাম-লীলা, বেণু, রেণু।

রাসবিহারীর স্ত্রী। তার চেয়ে এক কাজ কর না। বিলাতী কারখানার মুটে মজুরদের মতন এক, দুই, তিন, চার এই রকম ক'রে ডাক না। প্রাণহীন যেমন কারখানার কল—সভ্যতার চাকায় দরিদ্রদের পিষ্‌চে তাদের কোন খোঁজ খবর রাখে না, তেমনি সমাজটাকে গড়ে তোল একটা প্রাণহীন যন্ত্র করে। মানুষের নামের সঙ্গে যে কত কাহিনী, কত ইতিহাস, কত স্নেহ, কত আদর জড়িত, তা জানবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। আমার ঠাকুরমা এক মেলা থেকে একটা কাঠের গরুড় এনে অতি যত্নে রেখে দিয়েছিলেন, আমার বাবার ছেলে হ'লে তাকে দেবেন বলে। অনেক যাগ-যজ্ঞি করে, তারকেশ্বরে হত্যে দিয়ে অনেকদিন পরে যখন আমার মা অন্তঃস্বত্বা হলেন, ঠাকুর মা নাকি বলেছিলেন "ঐ গরুড় ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে বউ মা পোয়াতি হয়েছে।" আমি একটু বড় হতেই ঠাকুরমা আমার হাতে ঐ কাঠের গরুড় দিলেন। আমি নাকি আহার নিদ্রা ছেড়ে ঐ গরুড় তন্ময় হ'য়ে দেখ্‌তাম। তাই গ্রামের শিরোমণি ঠাকুর আমার নাম রেখেছিলেন "গরুড়ধ্বজবল্লভা"। কিন্তু ডাক নাম আমার লক্ষ্মী। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাবার উন্নতি। তাই ঠাকুরমা বাবাকে বল্‌তেন "ওরে, তোর ঘরে লক্ষ্মী এয়েছে, দেখিস্‌ একে অযত্ন করিস্‌ নে।"

রাসবিহারী। তোমার নাম অলক্ষ্মী রাখ্‌লেও আমি যে উচ্চ পদবী পেয়েছি, তা পেতাম। আর তোমার নাম গরুড়ধ্বজ-বল্লভা না রেখে যদি রাখতেন,—"গুঞ্জৎ কুঞ্জকুটীর কৌশিক ঘটা" তা হ'লেও আমার এম, এ পাশ করার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হত না।

বাক্‌যুদ্ধটা ক্রমশঃ ঘোরতর হচ্চে দেখে আমি বল্‌লুম, "বাবা, হর পার্ব্বতীরও এমনি ক'রে রাতদিন বাক্‌যুদ্ধ চল্‌ত, আবার তখনি থেমে যেত। শ্রীক্ষেত্র থেকে একজন সাধু মাণিকতলায় এসেছেন। তাঁকে দেখিয়ে আনবার জন্য মা আমাকে ডেকেছিলেন। আপত্তি না থাকে, এখনই নিয়ে যেতে পারি।"

রাসবিহারী। কোন আপত্তি নাই। আচার্য্য বলেছেন সাধু মহাজনের নিকট তীর্থযাত্রা আমাদের ধর্ম্ম সাধনের একটা অঙ্গ। আপনি এঁকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন সেই সাধুর নিকট, অবশ্য তিনি যদি প্রকৃত সাধু হন।

(৭)

"মাণিকতলা ষ্ট্রীটে—একটী বড় বাড়ী। তেতালায় একটী ঘরে একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বসে আছেন। বর্ণ তাঁহার তপ্তকাঞ্চন; বয়স চল্লিশের এ পারে। ঘরের মেজে মার্ব্বেলের। মাথার উপরে কারুকার্য্য খচিত রঙ্গিন ইলেক্‌ট্রিক আলোর ঝাড়। চতুর্দ্দিকে অনেক যুবতী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ঘিরে আছেন। তন্মধ্যে এক জন সোণার পিয়ালায় চা নিয়ে গুরুজীর মুখের কাছে ধরেছেন। তিনি প্রসাদ ক'রে দেবার পর ঐ চা অপর সকলে বেঁটে খাচ্চেন। এমন সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত। আমি নমস্কার ক'রে বললুম।

" বিকার হেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ

আপনি মহাপুরুষ। অপরাধ নেবেন না। শাস্ত্র বল্‌চেন,—

" হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব
ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে "

গুরুজী। হাঁ, সে বিধান নিকৃষ্ট অধিকারীর জন্য। প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে নিবৃত্তি সাধন করতে হবে। এ কালেও যে জনক রামানন্দ হতে পারে তা প্রমাণ করা আবশ্যক।

শিষ্যানী। প্রভুর শরীরে কাম গন্ধ নাই! কাম জয়ী হ'লে দেহে স্বর্গের সুরভি জন্মে। এখনি তার প্রমাণ পাবেন। দেখে নিন, ঘরে ধূপ ধুনো কিছুই নাই।

শিষ্যানীর কথা শেষ হবামাত্র গুরুজী আমার দিকে তাকালেন। একটী অপূর্ব্ব সৌরভে ঘর পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। যুথি, যাথি, মল্লিকা, গোলাপ, জেস্‌মীন, বকুল, অগুরু প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় সুগন্ধ মিশ্রিত করলে যে প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায়, সেই রকম একটা সুগন্ধে ঘর আমোদিত হল। মা লক্ষ্মী চুপি চুপি বল্‌লেন "দেখ্‌লেন বাবা, গুরুজীর কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা।" মা লক্ষ্মী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌লেন। গুরুজী তাঁর পাদপদ্ম মাথায় তুলে দিয়ে বল্‌লেন "গুরু তোমায় কৃপা করুন।"

সেদিনকার মতন সাধু দর্শন ব্যাপার শেষ ক'রে মা লক্ষ্মীকে বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। শুনলাম কিছুদিন পর তিনি ঐ সাধুর নিকট দীক্ষা নিয়েছেন।

একদিন কার্য্যোপলক্ষে—নগরে গিয়েছি। পথে একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি টিকটিকি পুলিস। আমাকে প্রণাম করে বল্‌লেন "মশাই আপনাকে প্রণাম করেছি আপনার গেরুয়াকে নয়।"

আমি। এ কথা বল্‌চেন কেন?

টিকটিকি। তবে গল্প বলি শুনুন। একদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। পথে একটা প্রকাণ্ড বাগান, ঠিক গঙ্গার ধারে। বাগানের পাঁচিল নীচু। বাহির থেকে দেখি এক নিভৃত স্থানে দুজনে কথা হচ্চে। একজন স্ত্রীলোকের হাতে একটী লণ্ঠন। দ্বিতীয় ব্যক্তি জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ঠাকুর বল্‌চেন "বামা, খুব সাবধান। পুলিশ টের পেলে বিপদ।"

বামা। হরাই নাপিতের মেয়েকে এত সাবধান কর্‌তে হয় না। বাবা আমার চৌদ্দজন পুলিশের নাক কাণ কেটে জোড়া দিত।

কৌতূহল উদ্দীপিত হলেও ব্যাপারটা বুঝবার জন্য দেরি করা অসম্ভব হল। জরুরী তার পেয়ে সেই রাত্রেই বড় সাহেবের কাছে যেতে হয়েছিল। পাঁচদিন পরে ফিরে এসে সেই বাগানের

সেই স্থানে গিয়ে দেখি একটী সদ্যজাত শিশুর পচা শব নিয়ে দুইটা কুকুর টানাটানি করচে। সঙ্গী কনষ্টেবল ও ডোমের জেম্মায় শব দিয়ে আমরা একেবারে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত। সন্ন্যাসী আমাকে দেখে বল্লেন :—

"কিগো ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু! কার কি ছিদ্র আছে তাই খুঁজে বেড়াচ্চ। মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।

আমি বল্লুম "প্রভু মক্ষিকা কেবল ব্রণমিচ্ছন্তি নয়, মক্ষিকা ভ্রূণমিচ্ছন্তি।"

সন্ন্যাসী। সে কি রকম?

আমি। আজ্ঞে, আপনার বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। কুকুরের ঝগড়া শুনে ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখি কি একটা নিয়ে কুকুর কামড়াকামড়ি করচে। কাছে গিয়ে দেখি একটা পচা সদ্যজাত শিশুর শব নিয়ে দুটো কুকুর টানাটানি কর্‌চে, আর শবের গায়ে বসে মাছি ভন্ ভন্ কর্‌চে। তাই বলছি "মক্ষিকা ভ্রূণমিচ্ছন্তি।"

এই কথা বলে কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র ডোম সেই অর্দ্ধভুক্ত শিশুদেহ নিয়ে এল। সন্ন্যাসী ঠাকুর "রাধে রাধে" বলে একটু স'রে গিয়ে হাঃ হাঃ ক'রে হেসে বল্লেন; "এই কথা! মস্ত লাস পেয়েছ, এখন খুনী ধরতে এসেছ। এমন দাও কি ছাড়তে পার? কিন্তু তোমার সমুদয় পরিশ্রম মাঠে মারা গেল। পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমার এক শিষ্যানীর মরা ছেলে হয়েছে। তাকে কেউ মারে নাই, কারণ শিষ্যানী সধবা, বিধবা নন। আমরা ছোট ছেলেকে পোড়াই না, পুঁতে ফেলি।"

আমি। সমাধি দেবার ত কথা নয় প্রভু, পোড়াবার নিয়ম যে।

সন্ন্যাসী। এঃ! তুমি দেখচি একেবারে নতুন টিকটিকি। কতদিন থেকে গোয়েন্দাগিরি করচ হে? এ ত অজ পাড়া গাঁ। এমন যে এমন মুন্সিপালের আট ঘাট বাঁধা কলকাতা—সেখানে কি হয়? নিমতলার ঘাটে কাঠের কয়লার বস্তা সব দেখেছ? ঐ বস্তার ভিতরে খোট্টাদের ছোট ছেলেদের শব পূরে পাথর বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেয়। ঘাটের সব-রেজিষ্ট্রারদের ঐ এক মস্ত রোজগারের পন্থা। যাও, যাও, বেশী ভিরকুটীর দরকার নেই। ডোম ব্যাটাকে পয়সা দিচ্চি, শবটা শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুক। আর তুমি ত মড়া ছুঁয়েছ, স্নান করে এস, প্রসাদ পেয়ে যাও।

কেমন যেন খটকা লাগল। পোয়াতির স্বামীর নাম ও ঠিকানা নিয়ে পর দিন সটান কলিকাতা........নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে গিয়া বাবিকের নিকট উপস্থিত। আমার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "আজ সাত দিন হল,—নগরে,—বাগানে কি মহাশয়ের স্ত্রী,—

তিনি মাদুরে বসে দোকানের খাতা দেখচেন। আমাকে প্রণাম করে বল্লেন, "আমার স্থান বড় সংকীত্তন (সংকীর্ণ?) টেবিল চেয়ার ধরেন না; এই মাদুরেই বসতে হবে।"

আমার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ সাত দিন হল—নগরে—বাগানে কি মহাশয়ের স্ত্রী একটী মৃত সন্তান প্রসব করেছেন?"

ক্ষণিক চুপ করে থেকে বাবুটী বল্লেন,—"মশাই, সে দুঃখের কথা কি বল্‌ব? বল্‌তে

গেলে মহাপাতক হবে। গুরুনিন্দে মহাপাতক। কি করব, উপায় নেই। আপনি কষ্ট করে এসেছ, সব কথা বল্‌তেই হবে। আমার ইস্ত্রীর বয়স এই চব্বিশ হবে। তেনার ছেলে-পিলে হয় নাই। তাই মনে করলুম একটা কিছু নিয়ে মনটাকে অসাব্যস্ত (সাব্যস্ত) ক'রে রাখবে। তাই সকলের পরামর্শে গুরুর সাশ্রয়ে (আশ্রয়ে) দিলাম। মুরুখ্‌খু কলু বই ত নয়? কেমন করে জান্‌ব. গুরু শিষ্যানী আহরণ (হরণ) করবে? ইস্ত্রী ত রোজই গিয়ে গুরু সেবা করেন। এক দিন গুরু বল্‌লে :—"দেখ, শরীরটা আমার কেমন অসুস্থ হয়েছে, তোমার শরীলটাও দেখ্‌ছি ভাল নয়; চল আমার—নগরের বাগানে। দুদিনে শরীল চাঙ্গা হয়ে যাবে।" মেয়ে মানুষ বই ত নয়? ভুজং ভাজং দিয়ে ত নিয়ে গেল। এক দিন শুন্‌লুম গুরুজীর পদ সেবার জন্যে গম্ভীর (গভীর) রাত্রে সোমত্ত সোমত্ত ইস্ত্রীলোকের পালা। চিত্রিটায় (চিত্ত) কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল। আর এক দিন এক গুরুভেয়ের কাছে শুন্‌লুম গুরুজী ইস্ত্রীকে ভুলিয়ে. ভালিয়ে ব্যাঙ্কে তার নামে যে কুড়ি হাজার ট্যাকা জমা ছেল সে সব ট্যাকা বের ক'রে নিয়েছে। কথাটা শুনেই—নগরে ছুট দিলুম। গুরুজী আমায় পা তুলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লে "আহা, তুমি কি পুণ্যিমন্তী ইস্ত্রী পেয়েছ? সব ধন সম্পিত্তি আমার পায়ে ঢেলে দিয়ে বল্‌লে কিনা 'এই পিথ্বিমীর ধন দৌলত নিয়ে কি করব? আপনার সেবায় লাগিয়ে পেরাণটা শেতল করি।' আমি বল্‌লুম, 'তা যা করেছেন ভালই করেছেন। এখন তেনাকে বাড়ী ফিরে যেতে দাও।' গুরুজী বল্‌লে "সে কি? তার এখন সাধনের পের্থম অবস্থা।" কি বল্‌লে মশাই —পের্বর্ত্তাবস্থা হবে, তার পর সেদ্ধাবস্থা হবে, তার পর বাড়ী যাবে। আমার মশাই অনুরাগ (রাগ) হল, মুরুখ্‌খু কলু বই ত নয়। আমি বল্‌লুম "গুরুজী অনুরাগ (রাগ) করবেন না; বিশ হাজার ত হজম করেছ; একটা মেয়ে মানুষকে সেদ্ধ ক'রে, সেবা ক'রে, একেবারে হজম করতে চাও কর। আমি চললুম।" বলেই দে ছুট। সেই থেকে দেড় বছর সে মুখো হই নি। আপনি বলচ সাতদিন হল ছেলে হয়েছেন? বুঝে লাও কথা। আমাকে আর আপনি ঘেঁটাবে না। ইচ্ছে হয় গুরুজীকে আমার ঘানিতে লাগিয়ে দিই। বড় বড় মোহন্তের তেলের মতন গুরুজীর তেলও খুব দামে বিক্রী হত।"

"বারিক ভায়ার চোক মুখের অবস্থা দেখে সরে পড়লাম।—নগরে ফিরে গিয়ে কিছুই করতে পারলাম না। লাস পোড়াবার পূর্ব্বে একটু সন্দেহ হয়েছিল বটে। কিন্তু তখন সব পচে গিয়েছে। টাটকা থাকলে ফুসফুস পরীক্ষা করলেই বুঝ্‌তে পারা যেত ছেলেটাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে কি না। সেই রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি আসাতে বামা শবটা ভাল করে ঢাকা দিতে পারে নাই, তাই কুকুর টেনে বের করেছিল ব'লে লাসটা পাওয়া গেল, নইলে গুরুজীর কীর্ত্তি অজ্ঞানান্ধকারেই ঢাকা থাকত। তাই বলি মশাই, ঐ গেরুয়াকে আমি বড় ভয় করি।"

টিকটিকি বাবুর কথাটা শুনে আর গুরুজীর চেহারার বর্ণনা শুনে মনে কেমন একটা খট্‌কা

লাগল। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা দমে গেল। তখনই—কলিকাতায় ফিরে গেলাম। সবে মাত্র বাড়ী ঢুকেছি, এমন সময় রাসবিহারী বাবুর বড় ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লে দাদা ঠাকুর শীগ্‌গির চলুন, মা কেমন করচে।"

(৮)

"হরি হরি! এ কি দৃশ্য! গোয়া বাগান ষ্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। ফুটপাথের পাথরের উপর মা লক্ষ্মীর কোমর, ফুটপাথে মাথা, আর ধড় রাস্তার উপর। মুখে কেবল "হরি বোল, হরি বোল।" চোকের জল মুছে এম্বুলেন্স ডাকতে বললাম। রাসবিহারী বাবু এবং আমি মাকে গাড়ীতে তুলে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন বস্তির হাড় ভেঙ্গে তিন টুকরো হয়েছে, পাঁজড়ার হাড়ও ভেঙ্গে গেছে। মাথাটা ঠিক আছে। দু ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। ঘাটে নিবার আয়োজন করতে লাগল ৩৷৪ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে রাসবিহারী বাবুর কাছে বৃত্তান্ত শুনে বুঝলাম—নগরের গুরুজী এবং মানিকতলার গুরুজী একই ব্যক্তি। মা লক্ষ্মী অতিশয় ভক্তিমতী। তাঁকে গুরুজী বলিয়াছিলেন "দেখ যে পথে এসেছ সে পথ বড় কঠিন, শাস্ত্রকরেরা বলেছেন শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়। গোপিনীরা স্বামী পুত্র ঘর বাড়ী ত্যাগ করে তবেত কৃষ্ণ পেয়েছিল। তোমাকেও স্বামী পুত্র ত্যাগ করে আসতে হবে। এই নিয়ে যদি ঘরে থাক, স্বামী পুত্রের অকল্যাণ হবে।" এই কথা শুনে অবধি মা লক্ষ্মী সর্ব্বদা আনমনা থাকতেন। সর্ব্বদাই বিড় বিড় করে বলতেন, "তবে ত চলে যেতে হবে; তা নইলে ত স্বামী-পুত্রের অমঙ্গল হবে।" মা লক্ষ্মী সে সময় তিন মাসের গর্ভবতী। এই অবস্থায় অনেকে উন্মাদ হয়। খুব সাবধানে রাখতে হয়, যাতে মনের কোন উদ্বেগ থাকে না। মা লক্ষ্মীর ত উদ্বেগের অভাব নাই। রাসবিহারী বাবু স্ত্রীকে চোকে চোকে রাখতেন। সে দিন দশ মিনিটের জন্য তাঁকে ঘরে রেখে খেতে গিয়েছেন। অকস্মাৎ সামনের বাড়ীর লোকেরা চীৎকার করে বল্লে "ওগো তোমাদের বউ রাস্তায় পড়ে গেছে।" হৈ চৈ পড়ে গেল। সে বাড়ীর লোকেরা বললে মা লক্ষ্মী ছাদে উঠে কার্ণিশে পা দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে পড়ে গেছে। মা আমার স্বামী পুত্রকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবার জন্য বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছিলেন।

নিমতলায় নিয়ে গিয়ে মা লক্ষ্মীর দেহে যখন আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, একজনের কাছে একখানা কাপড় চেয়ে নিয়ে তাই পরে আমার অশ্রুসিক্ত গেরুয়া অগ্নিতে ফেলে দিয়ে চলে এলাম। মা, সেই থেকে গেরুয়া পরিত্যাগ করেছি।"

(৯)

রামকান্তের এই আত্মকাহিনী সমাপ্ত হইলে তাহাকে বলিলাম, বাবা, গৃহী হয়েছেন বেশ না। দণ্ডধারণ করলেই সন্ন্যাসী হয় না। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলচেন :—

মৌনানীহা নিলায়াম্মা
দণ্ডা বাগ্দেহ চেতসাং।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ
বেণুভির্নভবেদ্ যতিঃ ॥

"মৌন (বাক্ সংযম), অনীহা (নিঃস্পৃহতা বা দেহসংযম), এবং অনিলায়াম (প্রাণায়াম বা চিত্তসংযম), বাক্য দেহ এবং চিত্তের এই তিন প্রকার দণ্ড যাঁহার নাই, তাঁহার হস্তে বাঁশের দণ্ড থাকিলেই তিনি যতি হইতে পারেন না।"

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বল্‌চেন :—

ভয়ঃ প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহ ষট্ সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতে বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিন্নু করোত্যবদ্যম্ ॥

'বিষয়মত্ত ব্যক্তির বনেতেও ভয় আছে, কারণ সে ছয়টা রিপুর সঙ্গে বাস করিতেছে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় আত্মজ্ঞানী পণ্ডিত, গৃহস্থাশ্রম তাহার কি অনিষ্ট করিতে পারে?'

গুরুর কথা কি বল্‌ব? আধুনিক গুরুর অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলন করেন। আপনার আত্মকাহিনী অনেকের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা হ'য়ে চোক খুলে দেবে। গুরু হওয়া কি সহজ?

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো
রেফঃ পাপস্য হারকঃ।
উকারো বিষ্ণুরব্যক্ত
স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃপরঃ ॥
তপস্বী সত্যবাদী চ
গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥

গ্—সিদ্ধিদাতা
উ—বিষ্ণু, শিব
র্—পাপহারী
উ—শিব, বিষ্ণু

গুরুর মধ্যে হরিহর বাস করেন। শক্তি সঞ্চার করে যখন গুরু তাকাতে বলেন, শিষ্য দেখেন তাঁর গুরুর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী ভগবান; তিনি দেখেন তাঁর সমস্ত

দেহ মন প্রাণ গুরুর ; তাঁর প্রাণের প্রত্যেক তন্ত্রে গুরুর সঙ্গীত ধারা চলেছে। তখন তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে গাহেন।

গুরো ! অজ্ঞানতিমিরহারী।
জ্ঞানাঞ্জন শলাধারী ॥
তুমিই ত অখণ্ড মণ্ডল,
তোমাতেই সব ভূমণ্ডল,
কভু বা ব্যক্ত,　　　কভু বা গুপ্ত,
সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ॥
এ দেহ গেহ সবই তোমার,
অহরহ তাহে কর বিহার,
মুখরিত তব গীত ছন্দে,
সুরভিত তব গন্ধে ;
তুমি আনন্দ সচ্চিৎ ঘন !
তৃষিত প্রাণে কর বরিষণ,
ভূমি ঊষর,　　　কর উর্ব্বর,
ঢালি অবিরত বারি ॥

শ্রীসুন্দরীমোহন দাশ

তিলক চরিত

তৃতীয় অধ্যায়

তিলকের পূর্ব্বের মহারাষ্ট্র

সেকালের ব্রাহ্মণদিগকে দুই দলে বিভাগ করা যায়। প্রথম, ভট ভিক্ষুক শাস্ত্রী পণ্ডিতের দল, দ্বিতীয়, চাকরীজীবী ব্রাহ্মণের দল। প্রথম দলের প্রভাব প্রতিদিনই কমিয়া যাইতেছিল। বাজীরাওর আমলে তাহাদের প্রভাব না হউক, ব্যবসায়টা অন্ততঃ খুবই ভাল চলিত। পেশবাযুগে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে যে দক্ষিণা বিতরিত হইত তাহার হিসাব খতাইলে টাকার অঙ্ক লক্ষের উপরে উঠিয়া যায়। প্রজার পয়সা যে এই প্রকারে এক শ্রেণীর লোকের জন্ম খরচ করা অন্যায় তাহা এখন সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু সেকালে এ ন্যায়ান্যায় বোধই ছিল না। বেদালোচনা ও

সংস্কৃত শিক্ষার দিক দিয়া দেখিলে দক্ষিণা বিতরণের প্রথাটা তখন যে এই দুইটি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিত তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বাজীরাওর আমলে বিদ্বান ব্রাহ্মণের প্রতিপালন ও সংরক্ষণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ ভোজনের ঘটাও অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। সোয়া হাত কদলী পত্রে পরিবেশিত পকান্নের সে বিবরণ শুনিলে এখনও সকলের জিহ্বায় জল আসিবে! পেশবাই নষ্ট হওয়াতে স্বভাবতঃই এই দলের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল। তথাপি তখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল বলিয়া, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, সকল সামন্ত রাজাই ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর দান করিতেন।

কিন্তু বাজীরাওর আমল হইতেই ভট ভিক্ষুকদিগের সম্বন্ধে জন সমাজে এক প্রকারে হীনবুদ্ধি প্রচলিত হইয়াছিল। একজন পুণাবাসী লিখিয়াছেন,—"ভট ভিক্ষুক, আগন্তুক, সুপকারী, ভিস্তি প্রভৃতি লোকের ও কাছারীর জায়গা এবং সবজী বাজারের এক রাস্তা বলিয়া বাজারের দিন বড়ই মুস্কিল হয়। রাস্তার মধ্য দিয়া গেলে গরু মহিষের উপদ্রব, ধার দিয়া ভট ভিক্ষুকের উপদ্রব!" 'লোকহিতবাদী' এ বিষয়ে বিস্তর লিখিয়াছেন—"আগন্তুক ব্রাহ্মণ, (পেশাদার অতিথি), মাধুকরী ব্রাহ্মণ, রাঘব ব্রাহ্মণ, কাছারীর উমেদার ব্রাহ্মণ, দীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়; ইহাদের স্বজাতিদিগের কি লজ্জা হওয়া উচিত নয়? এদেশে পেশা অনেক বাড়িয়াছে, সকলেই তাহা হইতে লাভবান হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সে লাভের অংশীদার নহে। ইহার কারণ ভিক্ষাদাতৃগণ। অন্যত্র কেহ শত চণ্ডীপাঠ করিয়া, কেহবা অভিষেক করিয়া, অলসের দল বিনা পরিশ্রমে তাহারও দক্ষিণা পায়, ধর্ম্ম সংরক্ষণ ইহারা করে না। কাহাকেও ধর্ম্মার্থী ও ধর্ম্মতৎপর না করিয়া কেবল আপনার উদর পূরণ ও যজমানের স্তুতিগান এই দুইটি কায মাত্র অলসেরা করিয়া থাকে। ইহাদিগকে যাহারা পয়সা দেন তাহাদের কোন উপকার হয় না। এরকম ধর্ম্ম করার মানে অলসতার বৃদ্ধি করা। অনুষ্ঠান জপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের রোজগারের সকল ফন্দীই এই শ্রেণীর। এবং প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত দক্ষিণা, খিচুরী, সভা দেবস্থান প্রভৃতির, সংস্কার উদ্যোগী লোক ব্যতীত হইবার নহে।" আর এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"ভাটরাও ভারবাহী কিন্তু মজুরের মত নহে। মজুর নিজের কায করিয়াই খালাস; কিন্তু ইহাদের মজুরীতে লোকের নীতিজ্ঞান নষ্ট হয়। এবং ইহারা অজ্ঞানদিগকে ভুলাইয়া আন্তরিকভাবে দুগুর্ণ বৃদ্ধি করে!" ইত্যাদি।

চাকুরীজীবী ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এরূপ খারাপ হয় নাই। পুরাতন কারকুনী ফড় গিয়া, তাহার জায়গায় সাহেবের কাছারী হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। এই ব্রাহ্মণ দলকে সাহায্য করা সরকারের পক্ষেও প্রয়োজন অথবা অপরিহার্য্যই ছিল এবং এই সাহায্য লাভ হইয়াছিল ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা। রাজ্য শাসনও রাজ্য জয়ের মতই কঠিন। রাজ্য শাসন করিবার কৌশল ইংরেজদের জানা ছিল কিন্তু এদেশের বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত লোকদের সহকারিতা ব্যতীত রাজ্য শাসনের আসল কাযগুলি সুললিতভাবে চালাইবার উপায় ছিল না। সেই সহকারিতা করিয়াছিল চাকুরীজীবীর দল। তাহারাই ইংরাজ সরকারের রাজ্য স্থাপনের পথটি, কাঁটা বাছিয়া, সাফ করিয়া দিয়াছিল। মাটি

নরম করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, গোলাপ জলের ছিটা দিয়া তাহারাই সে পথে সুখের ও আরামের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। সেই ব্যবস্থার ফলে রায়তের যে স্থায়ী লোকসান হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব আজ যদি সেই অজ্ঞ লোকেরা এই প্রাজ্ঞদিগের প্রতি আরোপ করে তবে তাহা একেবারে অনুচিত বলা যায় না। ইংরাজ শাসনের সেই আদিম যুগে সাহেবেরা হেড ক্লার্ক ও সেরেস্তাদারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন—আর পরাবলম্বী হইলেই নিজের ক্ষমতাও কিছু কিছু খোয়াইতে হয়। ক্ষমতা পাইয়া সেরেস্তাদারদের ওজন সেকালে খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে ক্ষমতা-মদেরও কিঞ্চিৎ সঞ্চার হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে বিনায়ক কোণ্ডদেব ওক 'শিরেস্তাদার' নামে একখানি ছোট গল্পের বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। চাকুরীজীবী লোকেরা ক্ষমতা পাইয়া সেই ক্ষমতার কিরূপ অপব্যবহার করে, কিরূপ অত্যাচারী ও অনীতিপরায়ণ হয়, এই গ্রন্থে তিনি তাহার চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে সময় এ বইখানির খুব আদর হইয়াছিল, কারণ পুস্তকের বর্ণনা প্রায় সকলেরই মনোমত হইয়াছিল। ওক লিখিয়াছেন—"সকল সেরেস্তাদার যদি রামদাস স্বামীর মত হয় তবে ইহলোকে অপযশের ভার বহন করিবে কে? এই কারাগৃহগুলি কে নির্ম্মাণ করিবে? ভাস্করনন্দন যমাজীর নরককুণ্ডগুলি কাহারা পূর্ণ করিবে?" সকল সেরেস্তাদার রামদাস স্বামীর মত হওয়া ত দূরের কথা, তখন শতকরা চার পাঁচটি রামদাস সেরেস্তাদার পাওয়াও কঠিন ছিল।

জগতে স্বার্থপরতার অভিযোগ কেহই এড়াইতে পারে না। পেশবার পতনের পর ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রে তরুণ দলের জন্য নূতন শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন কেন করিয়াছিলেন, স্বার্থের দৃষ্টিতে তাহার তিনটি উত্তর দেওয়া যায়। (১) শাসন কার্য্য চালাইবার চাকরের অভাব নিবারণের জন্য। (২) ভারতবাসীদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে পরাবলম্বী করিয়া বিলাতী মালের স্থায়ী খরিদ্দার বানাইবার জন্য। (৩) তাহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগী করিয়া খ্রীষ্টান করিবার জন্য। কে বলিবে যে এই তিনটি উদ্দেশ্যই সেকালের ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা দিগের মনে ছিল না। কিন্তু সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। মোক্ষ লাভের নিমিত্ত কেহ রাজ্য জয় করেনা। নিজের ধর্ম্ম, নিজের সভ্যতা, নিজের বাণিজ্য বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখাইত উচিত। ইংরাজ সরকারের যেমন রাজ্যশাসনের জন্য চাকরের দরকার ছিল, মধ্যমশ্রেণীর যুবকদিগেরও সেইরূপ পরিবার প্রতিপালনের জন্য চাকুরীর প্রয়োজন ছিল। রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে যে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য থাকিতেই হইবে এমন নহে। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ই পরস্পরের অনুকূল, এইমাত্র। মেকলে বলিয়াছেন—"আমাদের ভারতীয় রাজ্য লোপ হইলে ক্ষতি নাই, ব্যবসায় বজায় থাকিলেই চলিবে।" হিন্দুরা স্বধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন নাই বলিয়া অপর কাহাকেও সে চেষ্টা করিতে দেখিলে তাহাদের মনে বিস্ময় ও সংশয়ের উদ্রেক হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও মুসলমানেরা যাহা করিয়াছেন, খ্রীষ্টান ইংরাজ রাজ্যশাসকগণেরও তাহাই করিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক।

বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগের ন্যায় খ্রীষ্টানদিগকেও তাহাদের ধর্ম্মগুরু খ্রীষ্ট আদেশ করিয়াছিলেন—'তোমরা জগতের সর্ব্বত্র আমার ধর্ম্ম প্রচার করিবে।' মিশনারীরা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রবেশ করে। তাহারা স্বকীয় রাজ্যচ্ছত্রের ছায়ায় অক্লেশে বিনা বাধায় ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা পাইলে, তাহা ছাড়িবে কেন ?

কিন্তু ইংরেজেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, শিক্ষার দ্বারা ধর্ম্ম বিস্তারের কাযটা তেমন ভাল হয় না; ও কাযটা অন্য উপায়েই হয় ভাল। প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষার নূতনত্বে কেহ কেহ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে অবস্থাটা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রার্থনা সমাজের লোকেরাই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে সমধিক তৎপর। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের উত্তমোত্তম তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প তাহাদের ছিল। যাহারা নিজের ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে এক পা ফেলিয়াছেন তাহাদের পক্ষে পর ধর্ম্মের গণ্ডীতে অপর পদ স্থাপন করা কতকটা সহজ। প্রার্থনা সমাজের লোকেরা বাইবেলকে গীতার সঙ্গে সমান আসন দিতে লাগিলেন। তথাপি তাহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতেও সকল সন্দেহের নিরসন হয় না। ১৮৭৮ সালে মাধবরাওজী রাণাডে এতৎসম্পর্কে সার্ব্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের প্রাচীন আচার্য্য দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের উদাহরণ দিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।—"It is a great relief to us to find that as a result of 50 years' study Dadoba, though he reveres the Holy Bible and has made Chistianity the favourite study of his life, has failed to accept the current doctrines of the Christian religion. There is not a single point among the Cardinal Doctrines of the Christian Churches to which Dadoba has been able to subscribe his unqualified adhesion, nay more, he has expressed his dissent from the philosophy and rationale of these doctrines with unmistakable freedom". ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরম উদার সুশিক্ষিত লোকের মনের যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ হিন্দুর চিত্তে যে শিক্ষা, বাইবেল পাঠ বা পাদ্রীর মধুর উপদেশে, খ্রীষ্টধর্ম্মের রেখাপাতও করিতে পারে নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মিশনারীদিগকে খ্রীষ্টান করিবার ইচ্ছাও বাড়িতে লাগিল, এবং জোর করিয়া হউক অথবা ভুলাইয়া হউক ভ্রষ্ট করিবার জন্য দাঙ্গাও হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহারা একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে হিন্দুধর্ম্মের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। মিশনারীরা আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, শিক্ষা বিভাগ কিংবা শিক্ষা সম্পর্কীয় কোন কাযই সরকারের হাতে থাকা উচিত নহে। উদ্দেশ্য যে, তাহা হইলে শিক্ষা বিভাগের কাযটা

মিশনারীদের হাতেই আসিবে। ছাপাখানা খোলা, ছোটখাটো বই বাহির করা, রাস্তায় রাস্তায় প্রচারক খাড়া করিয়া বক্তৃতা দেওয়ান প্রভৃতি কায ত সুরু হইয়াছিলই, মিশনারীরা কথকতাও করিতে আরম্ভ করিল। পুণার হৌদগুলি (জলের চৌবাচ্চা) স্পর্শ করিয়া সম্ভব হইলে হিন্দুদিগকে ভ্রষ্ট করিবার, না হইলে অন্ততঃ ইংরাজের রাজ্যে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার অধিকার চালাইবার উদ্যোগ তাহারা চালাইতেছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা প্রথম হইতে বলিয়াছিলেন যে ইহাতে বিশেষ সুফল হইবে না, বেশী হয়ত হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে খ্রীষ্টেরও গণনা হইবে। ১৮৬৫ সালে জ্ঞান প্রকাশে একজন বোদ্ধা হিন্দু লিখিয়াছিলেন—"The disheartening disproportion between the unremitting labours of the Missionaries to christianise India and the success with which they have hitherto been attended is sufficient to cool the most violent ebullitions of religious enthusiasm."

খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের ধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগের ফলে হিন্দু ধর্ম্মের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা বুঝিতে মহারাষ্ট্রবাসীদিগের বেশী বিলম্ব হয় নাই। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইত কিন্তু সেগুলি তেমন জোরাল নহে। প্রচারকের খাঁটি শত্রু প্রচারক। অনেক বড় বড় গ্রামের উপান্তে তখন খ্রীষ্টান মিশনারী ও হিন্দুধর্ম্মোপদেশকের তর্কযুদ্ধ দেখা যাইত। মিশনরীরা একবার হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে চলিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের যুক্তির জাল যে তর্কশাস্ত্রের কোনই বাধা মানেনা তাহা সকলেরই জানা আছে। সে যুক্তির উত্তর দিবার মত বাক্‌পটুতা ও ভাবপ্রবণতা ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বেদের অপৌরুষেয়তা বিষয়ে অসন্দিগ্ধ ভাবপ্রবণ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরাই এ কাযের যথার্থ উপযুক্ত। তিলকের পূর্ব্বের মহারাষ্ট্রের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি মিশনারীর আক্রমণ বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন—বিষ্ণুবুবা ব্রহ্মচারী। ১৮২৫ সালে কোলাবা জেলার নিজামপুরের অন্তর্গত শিরবলী নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বিষ্ণুবুবার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভিকাজী পন্ত গোখলে। বিষ্ণুবুবার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সাংসারিক অভাবের জন্য বিষ্ণুবুবাকে প্রথম কৃষিক্ষেত্রের ও পরে কিছুদিন এক দোকানদারের চাকরী করিতে হইয়াছিল। যোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি ঠাণা জিলার শুল্ক বিভাগে একটি চাকরী পান। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই বুবার চিত্ত অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ ছিল বলিয়া আফিসের কাজ ব্যতীত বাকী সময় তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও দেবারাধনায় অতিবাহিত করিতেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বিষ্ণুবুবা তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"সপ্তশৃঙ্গির পর্ব্বতে ভগবান আমাকে ধর্ম্ম প্রচারের আদেশ করেন। আমি দত্তাত্রেয়ের বর লাভ করিয়াছি।" ১৮৬৫ হইতে ১৮৭১ পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাইর সমুদ্রতীরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন ও মিশনারীদিগের সহিত তর্ক করিতেন। কখনও কখনও সংস্কারকদিগের

সহিতও তাঁহার তর্ক হইত। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, দুই দলকেই তিনি অনায়াসে নিরুত্তর করিয়া ছাড়িতেন। ১৮৭১ সালে বোম্বাই নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে জ্ঞান প্রকাশ লিখিয়াছিলেন—"ইংরাজ আমলে বোম্বাই এলাকায় অনেক ব্রহ্মচারী ও ধর্ম্মোপদেশক দেখা গিয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুবুবার ন্যায় পণ্ডিত, সুবিচারক, জনহিতৈষী সন্ন্যাসী আমরা আর দেখি নাই।"

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

পেন্‌সন

[William Caineএর ইংরাজী হইতে]

১৮২১ সালে মিস্ ক্রুর জন্ম। চলনসই একরকম লেখাপড়া শিখে কুড়ি বছর বয়সে তিনি মার্থা বলে বছর আষ্টেকের একটী মেয়ের শিক্ষয়িত্রী হলেন। দশ বছর মাষ্টারী করার পর অন্যত্র কাজ পেয়ে তিনি চলে গেলেন। ইতিমধ্যে মার্থার বিয়ে হয়ে গেল হার্পার বলে এক ভদ্রলোকের সাথে। বিয়ের কিছুদিন পর তাদের ছেলে হল। তার নাম হল এড্‌ওয়ার্ড। সেটা ১৮৫৩ সাল।

এড্‌ওয়ার্ড যখন ছ বছরের, তার শিক্ষার ভারও পড়্‌ল ঐ মিস্ ক্রুর উপর। কিছুদিন এম্‌নি চল্‌ল। এডোয়ার্ড স্কুলে যাবার যোগ্য হয়ে উঠ্‌ল। মিস্ ক্রুও আবার নিজের পথ দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়্‌লেন। তাঁর বয়স তখন বেয়াল্লিশ।

১৮৭৫ সালে মার্থা মারা গেল। কিন্তু শেষ সময়ে সে তার পুরোণো গুরুমার কথা ভোলেনি। আর ঠিক্ এই সময়েই মিস্ ক্রু অসুখে ভুগে একদম অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। মার্থা মর্‌বার আগে তার স্বামীকে বিশেষ করে তাঁর খোঁজ খবর কর্‌তে অনুরোধ করে গেল।

হার্পার মার্থাকে ভালোবাস্‌ত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সলিসিটরদের বলে সে বন্দোবস্ত করে দিল যেন প্রতি বছর মিস্ ক্রুকে ১৫০ পাউণ্ড করে দেওয়া হয়। তার ইচ্ছে ছিল ঐ আয়ের একটা সম্পত্তি কিনে দেওয়া, কিন্তু মিস্ ক্রুর অসুখ, তাই আর হয়ে উঠ্‌ল না।

এডোয়ার্ড এখন বাইশ বছরের ছোক্‌রা।

১৮৮৮ সালে হঠাৎ হার্পারের মৃত্যু হল। গত তের বছর যাবৎ সমানে মিস্ ক্রুর এখন তখন অবস্থা গেচে, কিন্তু বিশেষ কিছুই হয়নি। মরবার আগে হার্পার ছেলেকে ডেকে বল্‌ল, "ওই বুড়ী মাষ্টারণী, এডি! তোমায় তার ভার নিতে হবে। ওর যা বরাদ্দ আছে, মরবার আগ্ পর্য্যন্ত ও তাই পাবে। বুঝেচ?"

কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হল।

এডোয়ার্ডের বয়স পঁয়ত্রিশ। বুড়ীর সাতষট্টি—ডাক্তার বলে সে মরল বলে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বুড়ী দিব্যি বাহাল তবিয়তে বছর বছর তার পেন্সন উস্থুল করে ব্যাঙ্কে জমা দিতে লাগ্‌ল।

এডোয়ার্ডের মৎলব ছিল তার নিজ ইচ্ছামত সম্পত্তি চালানো। বুদ্ধি তার বিশেষ ধারালো ছিল না। প্রমাণ—সম্পত্তি হাতে আস্‌বামাত্রই সব বেচে দিয়ে সে নগদ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিল। ফলস্বরূপ তার তিন হাজার পাউণ্ড আয়ের বিপুল মুনাফা বারো বছরের মধ্যেই চার শ'য় এসে ঠেক্‌ল।

কিন্তু বোকা হলেও এডোয়ার্ড অসৎ ছিল না। মিস্ ক্রুর টাকা দিতে কখনো কোনো গাফিলিই সে করেনি।

তার বর্ত্তমান আয় থেকে দেড়শ বুড়ীকে দিয়ে নিজের থাক্‌ত মাত্র আড়াইশ। এ টাকাটা দিয়ে সে মেক্সিকোতে এক মদের কোম্পানীর সেয়ার কিনে বস্‌ল। ভাব্‌ল যে এতে যদি সুরাহা হয়। কোম্পানী বেশ বড়—আর বিশ্বস্ত। সঙ্গে সঙ্গে উপ্‌রী কিছু রোজ্‌গারের চেষ্টাও দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

তার বেশ ছবি আঁকবার ক্ষমতা ছিল। আরো ভালো করে শেখ্‌বার জন্যে সে এক মাষ্টার রেখে ছবি আঁকা শিখ্‌তে সুরু করে দিল। তার বয়স তখন সাতচল্লিশ, আর বুড়ীর উনআশী। সেটা ১৯০০ সাল।

চট্‌পট্ সে সুন্দর আঁক্‌তে শিখ্‌ল। তার ছবির প্রশংসাও হতে লাগ্‌ল। একাডেমী তার একখানা ছবি দশ পাউণ্ড দিয়ে কিনে নিলেন। এডওয়ার্ড আর্টিষ্ট বনে' গেল।

ক্রমশঃ ছবি থেকে তার আয় বছরে ত্রিশ চল্লিশ পাউণ্ডে এসে দাঁড়াল। তার পর হল একশ। এম্‌নি বেড়ে যখন দুশোয় এসে দাঁড়িয়েচে, ঠিক্ সেই সময় মেক্সিকোর মদের কোম্পানী ফেল্ পড়্‌ল। সে চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

১৯১৪ সাল। তার বয়স একষট্টি, মিস্ ক্রুর তিরেনব্বুই। ছবিই এখন তার একমাত্র অবলম্বন। এডোয়ার্ড হিসেব করে দেখ্‌ল যে, যদি বিক্রী ভালো হয়, তবে বুড়ীর টাকাটা দিয়েও বছরে তার পাউণ্ড পঞ্চাশেক উদ্বৃত্ত থাক্‌বে। বেশ্ ত। একজন মানুষের কি আর এতে চল্‌বে না?

এই সময়ে পৃথিবী জুড়ে লড়াই বেধে উঠ্‌ল।

চার দিক থেকে দেশের বুড়োরা সব দেশে ফিরে এল। চাষ আবাদ কর্‌বার জোয়ান লোকের অভাব;—সে ভার গাঁয়ে গাঁয়ে বুড়োরাই নিল। আপিসের ছোক্‌রার দল লড়াইয়ে যাওয়ায় বুড়োদের প্রাণান্ত হবার যো হয়ে উঠেছিল—মেয়ে কেরাণীর দল এসে তাদের বাঁচাল। চল্লিশ বছরের কাউকে বয়স্ক বলে মানাই হ'ত না।

এক ছবি আঁকা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই এডোয়ার্ড পারত না। কিন্তু ছবির বাজার রীতিমত মন্দা। লোকজন সব হিসেবী হয়ে পড়েচে! সাধারণ উপহার দেবার ছবি আর কেউই কেনে না। কেবল খুব বড় শিল্পীর নামজাদা ছবি দু একখানা বিক্রী হয়।

এডোয়ার্ড অনশনের বিভীষিকা দেখ্তে লাগ্ল। শুধু নিজের জন্যে হলে এক কথা ছিল। কিন্তু তার সাথে যে মিস্ ক্রুং অদৃষ্টও বাঁধা! আর সে সত্যিই ছিল সৎ!

বুড়ীকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করত। কিন্তু মরদ কি বাত। যে ভার একবার কাঁধে নিয়েচে সে তা বহন কর্‌বেই—তা সে যে করেই হোক্!

সে খান কয়েক ছবি কাগজে মুড়ে পাইকেরদের দোরে দোরে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল যদি ক্যালেণ্ডারের ছবি কিম্বা ক্রিস্‌মাস্ কার্ড আঁক্‌বার কাজ জুটে যায়। দুঃখে পড়ে তার বুদ্ধিও কিছু বেড়ে গিয়েছিল। পাইকেরেরা পর্য্যন্ত বুড়োকে দোর থেকে ফেরাতে পারছিল না। সে ক্রমাগত এ দোকান সে-দোকান ঘুরে ঘুরে উমেদারী করে বেড়াচ্ছিল। তার ছবি কিছু খারাপ ছিল না—অবশেষে সে কাজ পেয়ে গেল। ছুটো কাজ—এটা সেটা আঁক্‌বার। যাক্—তবু দিন রাত খেটে পাউণ্ড চারেক করে সপ্তাহে আয় হতে লাগ্‌ল। কাজে তার সবাই খুসী হলেও আয় কিন্তু বাড়্‌ল না। তবে সে যা আঁকৃত তাই চল্‌ত। এটাও কিছু কম কথা নয়।

যুদ্ধের প্রথম বছর গাধার খাটুনী খেটে আর জানোয়ারের মত জীবনযাপন করে সে বুড়ীর বরাদ্দ আর বেঁচে থাক্‌বার মত নিজের দুমুঠোর জোগাড় করে নিল। আরো বছর দুয়েকও তেম্‌নি চল্‌ল। কিন্তু চতুর্থ বছরে নিজের দুবেলা আর জুট্‌ত না। তবু কোনোমতে বুড়ীকে ঠিক্ ঠিক্ তার বরাদ্দ জুগিয়ে এল।

জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠেছিল। এই কথা উল্লেখ করে মিস্ ক্রু এডোয়ার্ডকে লিখ্‌লেন। চিঠিতে তার বাপ মায়ের উল্লেখ ছিল—তাঁরা স্বর্গে গেচেন ইত্যাদি। চিঠির শেষে ছিল—ইতি আশীর্ব্বাদিকা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী———

এডোয়ার্ড যেখানে কাজ কর্‌ত সেখানে জিনিষপত্রের মহার্ঘ্যতার কথা উল্লেখ করে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য আবেদন কর্‌ল। তার প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল। সে এখন থেকে হপ্তায় পাঁচ পাউণ্ড করে পাবে।

মিস্ ক্রুর বরাদ্দ সে পঞ্চাশ পাউণ্ড বাড়িয়ে দিল। এতে তার নিজেকে আরো হীনভাবে দিন চালাতে হ'ত। রং, কাগজ-এর দামও চড়ে গেচে। তাকে অবিশ্রান্ত খাট্‌তে হত। ঘুম বহুদিনই তার চোখের পাতা থেকে বিদায় নিয়েছিল। এখন খাদ্যটাও আর জুট্‌ত না। চৌষট্টি বছরের বুড়ো সে, এই বয়সেও এরকম খাটুনী তাকে কাবু কর্‌তে পারে নি। মিস্ ক্রুর বয়স সাতানব্বই।

আর্মিষ্ট্রিসের দিন সে একঘণ্টার জন্যে কাজ বন্ধ করে শান্তি উৎসবে যোগ দিতে বেরুল। পথে ঠাণ্ডা লেগে পরদিনই তার জ্বর এল। কিন্তু খাটুনী কম্‌ল না। কাজ সমানে চল্‌তে লাগ্‌ল।

পরের রাতে ঘোর বিকার ও তার পরের রাতে তার মৃত্যু হ'ল।

মর্‌বার আগে কোনো মতে সে বুড়ীর ত্রৈমাসিক পঞ্চাশ পাউণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিল। দিয়ে সেভিংব্যাঙ্কে তার মাত্র চার শিলিং দু পেনি পড়ে ছিল!

গরীবদের ব্যবস্থামত তার কবর হল।

মিস্ ক্রু টাকা পেয়ে খুব খুসী হয়ে মামুলী ধন্যবাদের বাঁধি গৎ আওড়ে এডোয়ার্ডকে চিঠি লিখ্‌লেন। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখ্‌লেন যে পরের বার থেকে যদি আরো কিছু বেশী দেওয়া সম্ভব হয় তা হলে খুব ভালো হয়, কারণ এতে তাঁর চলা মুস্কিল হয়ে উঠেচে——

চিঠি যখন এডোয়ার্ডের ঠিকানায় এসে পৌঁছল, তখন সে কবরের তলায়।

বুড়ী টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে হিসাব নিকাশ খতিয়ে দেখ্‌লে যে এতদিনে তার দু হাজার পাউণ্ড পূরো হয়েচে।

শ্রীমণীশ ঘটক

ছিটে-ফোঁটা

ইতিহাস

(ডি, এল্, রায়ের গানের প্যারডী)

আজি এসেছি, এসেছি, এসেছি মোরাগো
ঠোঁটে করে সারা ইতিহাস,—
আজি মোদের যা কিছু আছে
এনেছি তোমার কাছে
দয়া করে' করে দিও পাশ।

আজি তোমার চরণতলে রাখি এ পড়ার ভার
ঢুলে-ঢুলে-রাত-জাগা সকল শ্রমের সার
পেপারে দিয়েছি ভরি' তিনটা ঘণ্টা ধরি'
দেখো যেন কোরোনা হতাশ।
ওগো এতদিন রাত জাগা নোট কিনে মনে রাখা
পেপারেতে লভুক বিকাশ!

ওই ভেসে আসে ভীতিকর ইতিহাস গৌরব
ভেসে আসে আকবর বাবরের কলরব
ভেসে আসে অবিরত 'ডেট্'রাশি শত শত
ভেসে আসে পাল, সেন, দাস!
ওগো অনেক লিখেছি আজি কম দাও তাও রাজী
একেবারে কোরো না নিরাশ!

আজি তোমার পেপার মাঝে কলম ছুটাতে চাই
প্রাণপণে কোন-রূপে 'ভিরিশ' উঠাতে চাই
কোনরূপে ঠেলে ঠুলে তরিয়া যাইব বলে
লয়েছিনু এই ইতিহাস;
আজি হাত-মুখ-কাণ-নাক আঙুল বাঁকিয়া যাক্
হয়ে যাই শুধু যেন পাশ!

"বনফুল"

কবির প্রতি

জ্যোছনা জমায়ে যদিও এখনও
'পমেটম' কেউ করেনি তৈরি
ফুলের হাসিতে করেনি জুতার 'ব্রক্সো',
অতি অপরূপ রমণীর রূপ
কাজে লাগেনাক বরং বৈরি
দুদিনেই যায় নয়ক মোটেই 'টন্‌কো' !

সন্ধ্যা-উষার রঙ্ গুলে গুলে
যায়না যদিও কাপড় ছোপান
শিশির গাঁথিয়া হয় না গলার হার গো
কুন্দদন্তে যদিও রে হায়
কোদালের মত যায় না কোপান
পাখীর গানেতে হয়না জমির সার গো।

তবু অনেকের এমনি স্বভাব
দরকারে যাহা লাগে না মোটেই
তাই নিয়ে তারা আনন্দে আছে মত্ত,
বোঝেনাক তারা এই দুনিয়ায়
চাল, ধান আর কয়লা ঘুঁটেই
হাসি, বাঁশী গান ও সবের চেয়ে সত্য।

বোঝেনাক' যদি কবিতা না লিখে
গোলাদার হয় দলে দলে সব
স্বদেশ হয়ত উদ্ধার হবে অচ্ছই
কবিতার যত মিথ্যে কাকলী
মিছে কেন এই আজগুবি সব
সোজা পথ আছে লেখোনাক বাপু গপ্পই।

"বনফুল"

পাজি

সুখের বোঝা বইতে গেলেও মচ্‌কে লোকের ঘাড়,
কটাস্ করে হাড়।
মানুষ তখন কেঁদে বলে :—"দুঃখ দিয়ে ধাতা,
ভাঙ্গ কেন মাথা ?
এরই নাম যদি সুখ, তবে ইনি ভাগুন্,—
সুখের কাঁথায় আগুন !"
ধাতা ভাবেন,—মানুষগুলার আন্দোলনই নেশা,
চেঁচিয়ে মরাই পেসা।
কহে শয়তান :—"লুচির ময়দা দিতে কেন ধাতা,
বুকে ঘোরাও যাঁতা ?"
ধাতা কহেন :—"আদৎ মানে বুঝিস্ না তুই ঠেঁটা,
ঘোঁটে বাড়াস্ লেঠা।"
কহে শয়তান :—"বোঝাও দেখি,—এই রাখ্‌ছি বাজি।"
ঠাকুর কহেন্ :—"পাজি"

অকৃতজ্ঞ

বল্‌লেন্‌ হরি-ওরে মানুষ, দিলাম মস্ত পৃথিবী,
বল্‌না শুনি, প্রতিদানে তোরা আমায় কি দিবি ?
কুড়িয়ে নিয়ে রত্নশস্য হাস্যমুখে দুহাতে,
মানুষ কহে :—ওহে ঠাকুর, কুলায় না যে উহাতে ;
বিনাশ্রমে সুখ দাও চালা ফুঁড়ে ছড়িয়ে।
হরি ভাবেন,—কি ঝক্‌মারি কর্‌লাম্‌ মানুষ গড়িয়ে।

পুস্তক পরিচয়

"রসকদম্ব"

কবি কালিদাসের 'রসকদম্ব' এখন বাজারে বিক্রী হচ্ছে। তিনি যে তাঁর গুরুগম্ভীর কাব্যচৌচালার এককোণে রসের ভিয়ানও পেতেছিলেন, তার পরিচয় আজ রসিকমাত্রেরই রসনায়।

প্রথম যখন একখানি 'রসকদম্ব' আমার হাতের মধ্যে এসে পৌছাল, তখন ভাবিনি তা' এতদুর উত্‌রেচে যে আমাকে দু'এক পাতা চাখা ভিন্ন বেশী কিছু কর্‌তে হবে। কেননা এ শ্রেণীর রচনা প্রায়ই এতটা শ্লেষ-বিদ্রূপের মসলা দিয়ে তৈরী হয় যে একটু বেশী উদরস্থ করলেই বুক জ্বালা করে। যেখানে শ্লেষ বিদ্রূপের মসলা কম,—সেখানে বীভৎসতা ও অশ্লীলতার দুর্গন্ধ মাতৃদুগ্ধকে পর্য্যন্ত উদ্গীর্ণ করে দেবার চেষ্টা করে। তবে একমাত্র ভরসা এই ছিল যে করুণ রসের নোন্‌তা খাবার যে ময়রার হাতে উত্‌রায়, হাস্যরসের খাসা মিঠাই গড়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

গ্রীষ্মকালের অলস দ্বিপ্রহরে, তন্দ্রাদেবীকে আহ্বান করে আন্‌বার জন্যই বোধহয় অনেকটা ক্ষীণ আশাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'রসকদম্ব' খানি চোখের সাম্‌নে তুলে ধর্‌লুম্‌। কিন্তু আশ্চর্য্য! তন্দ্রা আর এলো না--পাতার পরে পাতা উল্টে শেষ পাতায় গিয়ে ঠেক্‌লুম এবং তখন আর পাতা নেই দেখে কাজেই গোড়ার পাতা থেকে কেঁচে পাতা উল্টাতে সুরু কর্‌লুম্‌। এমনটা বহুদিন হয়নি—৺ডি, এল, রায়ের "আষাঢ়ে" "হাসির গান" ও ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "হসন্তিকা" পড়বার পর।

কষ্ট কল্পনার সাহায্যে কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার অক্ষম চেষ্টা যেমন অসহ্য, এমন আর কিছুই নয়। বেতালভট্ট ওরফে কালিদাসের গ্রন্থে সে রকম চেষ্টার আভাষ—কমই পেলুম। তাঁর—"অন্যমনস্ক" "বিভ্রাট-জাহাজ", "সবই-ছিল", "সদালাপী" প্রভৃতি কবিতা পড়্‌লে সত্য সত্যই তাঁর ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছা হয়,—

"—গেলাম গেলাম তলিয়ে গেলাম
　　　　হাসির বানে ভাসিয়ে দিলে,
পেট বুক সব কাঁপিয়ে দিলে
লিভার পিলে কাঁপিয়ে দিলে
ম'লাম ম'লাম হাঁপিয়ে দিলে
　　　　মাজার কাপড় ফাঁসিয়ে দিলে।"

জুতার গানটি তিনি বেশ 'জুত-সহ' করে গেয়েছেন। তাঁর গানের দু'এক ছত্রের নমুনা দেখুন—

জুতাই মোদের মাথার বালিশ
জুতায় বীরাসনটি গাড়ি,
ভদ্রলোকের চুরির জিনিষ
জুতোই নেমতন্ন বাড়ী।

* * * *

দিচ্ছি জুতা গোবধ করি
জুতাই ভব-নদীর তরী,
পায়ের ধুলোর বালাই গেছে
শুক্রও সে চরণ চাকে।"

তাঁর "ছত্র-বিয়োগে"র উচ্ছ্বাস আরও মর্ম্মস্পর্শী।

—"ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি
গ্রীষ্মকালে ঘাম মুচেছি তোমায় রুমাল করি।
হাত চলেনা পিঠে যেথায়
চুলকে দিতে তুমি সেথায়
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচির পরে চড়ি।

"এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদ-দায়ে
ব্যাঙের ছাতা মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।
নেইক তেমন আঙুলে বল
কাজেই লেমনেডের বোতল,
তোমায় ডগায় খুলে আমি খেয়েছি বারে বারে।"

তারপর তাঁর 'বদান্যতা'ও আমাকে তাক্ করে দিয়েছে। তিনি লজ্জার মাথা খেয়ে সাফ বলে দিচ্ছেন,—

"গিন্নিকে দিই দু'দশ টাকা প্রায়ই মাঝে মাঝে
তিনি তাতেই গয়না গড়ান—একেবারেই বাজে।
মায়ের শ্রাদ্ধে ভাগ্নে বেচু
চাইলে টাকা দিলুম কিছু,
বাবার মেয়ের শ্রাদ্ধ,—তা'ত আমার নহে দায়,
দেখলে ভেবে এরে নিছক দানই বলা যায়।"

এ ত গেল তাঁর নিজের কথা। পরের কথা বল্‌তে তাঁর মুখ আরও দরাজ। প্রথমেই নারী ভাবাপন্ন নব্য বাবুদের মেয়েলী ঢঙ্‌কে ও নব্যাগণের অলস বিবিয়ানাকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। গরীব "আমরা"দের 'হায়' তিনি বড়লোক হোমড়া চোমড়া "তামরা"দের শুনিয়ে দিচ্ছেন,——

"গরমের দিনে তোমাদের ঘরে
ফ্যান্ ঘুরে ফন্ ফন্
আমরা দুপুর রৌদ্রে পেটের দায়ে
ঘুরে মরি বন্ বন্।
শাল দোশালায় তোমরা বেড়াও সাজিয়া
পরি ছেঁড়া জামা গা'য় তেলে মোরা ভাজিয়া
করিয়াছি খোপা নাপিতের সনে কাজিয়া
মিটাতে ইচ্ছা নাই।

"তোমরা পোলাও দেখায়ে দেখায়ে খাও
মোরা খাই নিমসিম
তোমরা মোরগ হংস-ডিম্ব খাও—
আমরা ঘোড়ার ডিম।" ইত্যাদি

সামাজিক প্রসঙ্গেও কবি কালিদাসের ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নেই। ডি, এল, রায় যেমন বলেছিলেন,—"কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি If you think, then you are an awful goose",—ইনিও তেমনি বলছেন,——

"সহরে যাইয়া ঢুকি এখানে ওখানে
খাই বটে কাটলেট, চপ, চা'র দোকানে
ষ্টীমারে যদিও খাই মাঝিদের হাঁড়ীতে
যদিও মোরগ খাই লুকাইয়া বাড়ীতে
তাই বলে মূর্খেরা মনে মনে ভাব কি—
যার তার সাথে আমি সমাজেও খাব কি ?"

"একঘরে" কবিতায় তিনি আবার বেশী সাত্ত্বিক উদারতার ছবি এঁকেছেন। বিলেত-ফেরতাকে আমরা কখন জাতে ঠেলি ?—না,

"যদ্যাপি অনূঢ়া থাকে তবে তারে ধরো,
ভগিনী বা ভগিনীর সাথে চেষ্টা করো।
যদি রাজী নাহি হয় দূর কর তারে
সবে মিলে একঘরে কর একেবারে।
যদি উচ্চ পদ পায়, তাহার আপিসে
অথবা তাহার কোনো সহি সুপারিশে
চেষ্টা করো জামায়ের চাক্‌রীর তরে
চাকরী না দিলে তারে কর একঘরে।
ব্যারিষ্টার হয় যদি বিনা পয়সায়
অনুরোধ করে দেখ তব মামলায়।
ব্রিফ তব লয় কিনা দেখ চেষ্টা করে
তা' না হলে সবে মিলে কর একঘরে।"

কবির কতকগুলি প্যারিডির সঙ্গেও "রস-কদম্বে" দেখা সাক্ষাৎ হল। খুব উচ্চশ্রেণীর না হলেও, তারা যে যথার্থই প্যারিডি তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। আমি খুব আশা করি—'রস-কদম্বে'র প্রথম কিস্তি যা বাজারে বেরিয়েছে তা' চট্‌করেই ফুরিয়ে যাবে,—যদি না যায় বুঝ্‌তে হবে আমরা রস সাহিত্য মিষ্টান্নের কদর এখনও ভাল করে বুঝিনি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

The Economic History of Ancient India—প্রণেতা—নেপাল ত্রিভুবনচন্দ্র কলেজের ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীসন্তোষচন্দ্র দাস এম, এ,। ৩১১ পৃষ্ঠা ; মূল্য ৩৲ টাকা।

এই গ্রন্থখানিতে প্রাচীন ভারতের সম্পদের ইতিহাস ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালের বেদমন্ত্র রচনার যুগ হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের রাষ্ট্রনীতি কিরূপ ছিল, দেশের লোকের সুখ-সুবিধা কিরূপ ছিল, বহু বিদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, স্থলপথে ও জলপথে যাইয়া ভারতবাসীরা কিরূপে বহির্ভারতে চীনে, পশ্চিম এশিয়ায় ও আফ্রিকায় আপনাদের সভ্যতার আলোক ও ব্যবহার্য্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ করিয়াছিল, এবং পরে কি কারণে ধীরে ধীরে বিদেশে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পথ রুদ্ধ হইল, এই বিষয়গুলি অতি যোগ্যতার সহিত গ্রন্থখানিতে বিবৃত হইয়াছে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের বহুশ্রমে সঙ্কলিত এই গ্রন্থখানির যথার্থ সমালোচনা করিতে গেলে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয় ; আমরা তাহা করিতে না পারিয়া দুঃখিত। গ্রন্থকারের লেখায় সংযম ও সাবধানতা যথেষ্ট আছে ; গ্রন্থে এমন কোন উপপত্তি বা সিদ্ধান্ত নাই, যাহার অনুকূলে অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই। যে কারণেই হউক এখন এই শ্রেণীর গ্রন্থ দেশের ভাষায় লিখিলে আদৃত হয় না, আর ইংরেজিতে লিখিলেও সে গ্রন্থ ইউরোপে আদৃত না হইলে এদেশে আদৃত হয় না। ইউরোপীয়দের পড়িবার সুবিধার পথে একটি বাধা লক্ষ্য করা গেল ; প্রাচীন সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত প্রমাণগুলি বাঙ্গলা অক্ষরে থাকায় বিদেশী পণ্ডিতদের অসুবিধা ঘটিতে পারে। ভারতের

অন্ত প্রদেশের পণ্ডিতদের পক্ষেও এটা অসুবিধা। এ শ্রেণীর গ্রন্থে এমন দুচারিটি উপপত্তি ও সিদ্ধান্ত থাকিবেই, যাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে না, অথবা যাহাতে মতভেদ ঘটিবেনা। যে গুণে এরূপ গ্রন্থ আদৃত হয়, তাহা ইহাতে যথেষ্ট আছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের ও ঘটনা সমাবেশ করিবার কৌশলের প্রশংসা করিতেছি।

আফ্রিকা—(পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে)—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবতরত্ন রচিত। ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

আফ্রিকা দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণের এই বইখানিতে সে দেশের নানালোকের ৮ খানি চিত্র আছে ও আফ্রিকার লোকের আঁকা একখানি ছবির প্রতিলিপি আছে। এ দেশের লোকের সুশিক্ষার জন্ত বিদেশের বিবরণ বহু পরিমাণে লিখিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকারের এই আফ্রিকার বিবরণ বঙ্গের লোক-সাধারণের সাহিত্যে আদৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অল্প পরিসরের মধ্যে নানা যুগের নানা কথা বলিতে গেলে সাধারণ পাঠকদের পক্ষে বিবৃত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লইতে গোল হয়; গ্রীসের ও রোমের ইতিহাসের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় না থাকিলে স্থানে স্থানে কয়েকটি ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝিতে অনেকের অসুবিধা হইতে পারে। যাহাই হউক, গ্রন্থকারের লেখা সরল ও এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবৃতি আছে। আফ্রিকার প্রাচীন অধিবাসীদের দেহের বর্ণনা ও চিত্র এবং সামাজিক অবস্থার যে পরিচয় আছে, তাহা লোকের শিক্ষার পক্ষে উপযোগী হইয়াছে।

বুকের বালাই (পদ্যগ্রন্থ)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্, এ, রচিত। ১২০ পৃষ্ঠা; রেশমের বাঁধা মলাট, মূল্য ১৲ টাকা।

এই পদ্য বইখানিতে ৪১টি নানা কল্পনার কবিতা আছে। কবিতাগুলি উপভোগ্য ভাবের খেয়ালে রচিত, সরস ভাষায় ও নির্দ্দোষ ছন্দে গাঁথা, আর উহার অনেকগুলিতে হাস্যরসের মধুরতা আছে। মুদ্রিত কবিতাগুলির কয়েকটি বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির এই প্রথম রচনা পড়িয়া বলিতে পারি যে তিনি ভবিষ্যতে বঙ্গের কাব্য সাহিত্যকে যথেষ্ট অলঙ্কৃত করিবেন।

বৈশাখে

মিনিষ্টার উড়িল—কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে মিনিষ্টার উড়িয়া গেল। গবর্ণর বাহাদুরের নিযুক্ত মিনিষ্টারদের বা অমাত্যদের বেতন স্থির করিবার প্রস্তাবটি কাউন্সিলে পেশ্ হইবার অনেক আগেই রাজকর্ম্মচারীরা ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা শাসাইয়া বলিতেছিলেন যে, যদি কাউন্সিলের সদস্যেরা মিনিষ্টার বহাল রাখিবার বিরুদ্ধাচারী হ'ন্, তবে রাজসরকার বঙ্গদেশকে অনুন্নত দেশের বর্গে ফেলিবেন, আর বাঙ্গালীরা যে শাসনের কাজে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব পাইবেন না, তাহা স্থির হইবে। দেশীয় সদস্যেরা একথায় ভয় পান নাই; তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মিনিষ্টারেরা গবর্ণমেণ্টের হাতে সূতায় বাঁধা নাচের পুতুল মাত্র, নিজের ক্ষমতায় ও বিবেচনায় কাজ চালাইতে অক্ষম; কাজেই এ মিনিষ্টার খাড়া করিলে দেশের লোকের হাতে তিলমাত্রও শাসনের ক্ষমতা আসে না। এ অবস্থায় ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ না

চালাইয়া যাহা যথার্থ, তাহার স্বরূপ দেশের লোককে বুঝিতে দেওয়া উচিত। মিনিষ্টার উঠিয়া গেলে গবর্ণরের একার কর্তৃত্বে যাহা চলিতেছে, তাহা স্পষ্টভাবে তাঁহার হাতে চালিত হইবে, আর প্রচ্ছন্নভাবে সরকারের মর্জ্জি অনুসারের কাজগুলি সাক্ষী গোপাল খাড়া করিয়া করা হইবে না। বঙ্গদেশকে অনুন্নত দেশের মধ্যে ফেলিবার প্রসঙ্গে দেশীয় সদস্যেরা বলিয়াছেন যে, নিতান্ত বর্বর দেশে যেভাবে আইন জারি করা হয়, তাহাই যখন অর্ডিনান্স্ প্রভৃতি প্রচারে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন বঙ্গদেশকে অনুন্নত বলিয়া দাগিয়া দিলে অধিকতর অনিষ্ট হইতে পারে না।

কাউন্সিলের সদস্যদের কাজের পদ্ধতির সংবাদ পাইয়া পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য যে ভাবে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন, তাহা একটা পরিচিত উপমা দিয়া বলিতেছি। গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িবার সঙ্গে কলিকাতা সহরে জলের প্রয়োজন যত বাড়ে, ততই যেমন কলের জলের সরবরাহ কমিয়া যায়, ঠিক সেই রকমে এদেশে আন্দোলনের উত্তাপ যত বাড়িবে, শাসন সংস্কারের আশা নাকি ততই কম হইবে। চূড়ান্ত রকমে শাসন সংস্কার হইলেও আমরা কতখানি কি পাইতে পারি, তাহা এ প্রসঙ্গে আলোচন করা ভাল। সুস্পষ্ট খাঁটি কথা এই যে, ভারত-জেতারা এদেশকে আপনাদের মুঠার মধ্যে রাখিবেনই ; এ অবস্থায় শাসন সম্পর্কের কোন্ কাজগুলি গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই বিশ্বাস করিয়া দেশের লোকের হাতে দিতে পারিবেন না, তাহা হিসাব করিয়া দেখা উচিত। সেই কাজগুলি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার উপরেই এদেশের লোককে কর্তৃত্ব দেওয়া যখন চরম অধিকার দান, তখন ভবিষ্যৎ সংস্কারের বা রিফর্মের নামে আমাদের প্রলুব্ধ হইবার কিছু আছে কি না, তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার প্রজারা যখন কিছুতেই অসম্ভব রকমের অধিকার পাইতে পারে না, তখন একটা অনির্দ্দিষ্ট কাল্পনিক অধিকার পাইবার মোহ কাটাইয়া নিজেদের উন্নতির জন্যে যাহা করা সম্ভব, সেই দিকে মন দিলেই ভাল হয়।

রাজপুরুষদের উক্তিতে একথা যখন সুস্পষ্ট যে, মিনিষ্টার না থাকিলে সরকারের কোন ক্ষতি নাই অথবা শাসন চালাইবার কোন অসুবিধা নাই,—ক্ষতি ও অসুবিধা এদেশের লোকের, তখন সরকারি পক্ষ এ মিনিষ্টার বহালের জন্য এত উৎকণ্ঠিত কেন? এদেশের লোকেরা যদি অনুন্নত বলিয়া বিচারিত হইবার কলঙ্ক বহিতে চায়, তবে রাজপুরুষদের ক্ষতি কি? ইহার যখন উত্তর পাওয়া কঠিন, তখন মিনিষ্টার নিয়োগে সরকারের আগ্রহের কারণ কিঞ্চিৎ গূঢ় বলিয়া মনে হয়। অন্যদিকে আবার যাঁহারা মিনিষ্টার নিযুক্ত হন, তাঁহারা যখন এদেশের হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীর লোক, তখন বেসরকারি ইউরোপীয়েরা তাহাদের কর্তৃত্ব বরণ করিবার জন্য উৎসুক কেন? রাজনীতিতত্ত্ব বড়ই জটিল।

* * *

নূতন বাতাস।—বিনা বিচারে যাহাকে তাহাকে বন্দী করিবার অধিকারের পরোয়ানা জারি করিয়া সরকার বাহাদুর যখন সুভাসচন্দ্র বসু প্রমুখ ভদ্রলোকদিগকে জেলে পাঠাইলেন,

তখন অনেক লোক ইহার যে কারণ আঁটিয়াছিল, হয়ত তাহা নিতান্ত ভুল নয়। একজন নরহত্যার কাজের কথা সিরাজগঞ্জের একটি সভায় স্বরাজ-সাধক দলের কয়েকজন লোক যেভাবে বলিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার বাহাদুর স্বরাজের দলকে বিশেষ অসুবিধায় ফেলিবেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তাহার পর যখন সুভাষচন্দ্রের ও অনিলবরণ রায়ের সম্পাদিত কাগজে সিরাজগঞ্জে উত্থাপিত বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল, তখন ইংরেজি সংবাদপত্র ও সরকারি বৈঠকে উহা এমন ভাবে বিচারিত হইতেছিল, যাহাতে মনে হইয়াছিল যে, সরকার বাহাদুর সুভাষচন্দ্র ও অনিলবরণকে রাজদ্রোহীদলের পৃষ্ঠপোষক মনে করিতেছিলেন। এখন স্বরাজ্যদলের নেতা দাশ মহাশয় রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে ও শান্তিরক্ষার অনুকূলে যে মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া এদেশের ও বিলাতের রাজপুরুষদের মন নরম হইয়াছে মনে হয়। দেশের লোকের উপরে স্বরাজের নেতাদের প্রভাব খুব অধিক বলিয়াই রাজপুরুষদের বিশ্বাস ছিল, তবে পূর্ব্বে তাহা সরকারিভাবে স্বীকৃত হয় নাই; এখন রাজপুরুষেরা মনে করিতেছেন যে দাশ মহাশয়ের মন্তব্য পড়িয়া দেশের লোকেরা সুপথে চলিবে, ও গুপ্ত রাজদ্রোহীদলের লোকেরা পাপের পন্থা ছাড়িবে। যে সকল নেতারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাও যদি দাশ মহাশয়ের মত বিদ্রোহ-নীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য জ্ঞাপন করেন, তবে হয়ত সকলেই মুক্তি পাইবেন, আর অর্ডিনান্স ও সেই সম্পর্কের আইন রদ করা হইবে। সরকারি আলোচনার পদ্ধতি হইতে এই কয়েকটি কথা অনুমান করা গেল।

সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি যে কোন মতেই অতি দূর সম্পর্কেও রাজদ্রোহের সহিত যুক্ত থাকিতে পারেন না, ইহাই এদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বিশ্বাস; কাজেই তাঁহাদের পক্ষে দাশ মহাশয়ের মত মন্তব্য জ্ঞাপন করা সহজ হইবে। একদিকে যাঁহারা কাজের লোক, তাঁহারা মুক্ত হইলে দেশের মঙ্গল, আর অন্যদিকে যদি সরাসরি এক্তিয়ারের আইন উঠিয়া যায়, তবে দেশের লোকের একটা বিপদের বিভীষিকা দূর হয়। মনে হইতেছে, এবারে নূতন বাতাস বহিবে।

কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের উক্তিতে একথাটাও সুস্পষ্ট হইতেছে যে, স্বরাজের দলের লোকেরা যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাকে পরাভূত ও লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিবেন না, ও সরকারের দেওয়া অধিকারটুকু গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অভিপ্রায়ের মত নূতনভাবে অমাত্য নিয়োগ করা হইবে, ও তাঁহারা যে সরাসরি এক্তিয়ারের আইনের বিরোধী, তাহাও লোপ করা হইবে। মণ্টেগু রিফর্মটিকে মুডিমানের নির্দ্ধারিত পন্থায় সঙ্কুচিত না করিয়া নূতনভাবে অবিলম্বে সংশোধন করা হইবে কি না, তাহা কোন উক্তিতেই পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক, দাশ মহাশয়ের মন্তব্যে রাজপুরুষদের মন নরম হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। এই উত্তাপের দিনে আমরা স্নিগ্ধ বাতাসের প্রতীক্ষায় রহিলাম।
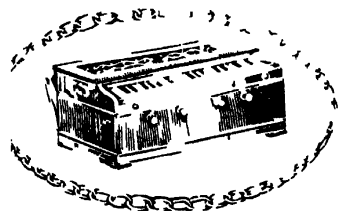
Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.
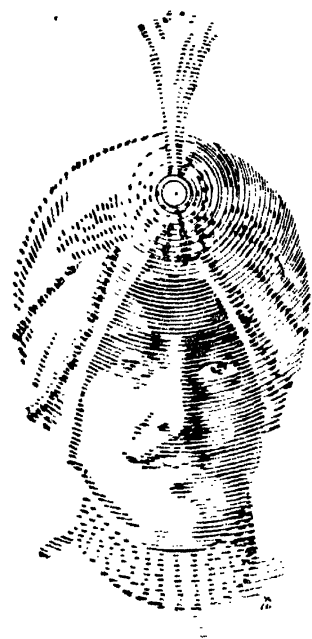
শ্রীচৈতন্য ও দিগ্বিজয়ীর বিচার

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

জ্যৈষ্ঠ

প্রথমার্দ্ধ
৪র্থ সংখ্যা

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমত রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি ?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্ত্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
অজানার যাত্রী কে গো ? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।

এই কি নির্ম্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে ?
এ কি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ?
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধন মোহ, এ রাত্রি বেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায় ?
হোক্ তাই !
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি, জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা,
ভুলায়ে পূর্ব্বের পথ অপূর্ব্বের পথে দ্বার খোলা।
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রসিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে
বারবার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্ত্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনেছি এমনি
বারেবারে ?
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে ?
একি মোর আপন বক্ষেতে ?
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সঙ্কেতে ?
তবে কি হবেই যেতে ?

সব বন্ধ করিব ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে ?
তরী কি ভাসাব স্রোতে ?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাকো মোরে কি খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথ বেলাতে ?
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি'
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে ?
সূর্য্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্র-সভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কি সঙ্কেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে' যায় ?
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি ?
তা'রে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কি শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ অক্টোবর, ১৯২৪
ষ্টীমার এণ্ডিস্।

সমালোচনা

কথা বলিতে গেলে লোকে নজর রাখে শ্রোতার দিকে। এক বৈঠকে যে-কথা অনায়াসে বলা চলে আর এক বৈঠকে সে-কথা চলে না। এক সমাজে যে-কথা নির্ভয়ে বলা যায় অন্য সমাজে সে-কথা বলিতে সঙ্কোচ হয়। বক্তা যেখানে জানে এখানে সমঝদার লোক আছে সেখানে সে সমঝাইয়া কথা কয়, যেখানে সমঝদার না থাকে সেখানে কেউ বা বেপরোয়া হইয়া কথা কয়, আর কেউ—বিশেষ যার কিছু দামী কথা বলিবার আছে সে সে সমাজে প্রায়ই সে কথা বলে না।

রস লইয়া যার কারবার তার কাছে রসিক শ্রোতার দাম বড় বেশী। বেণা বনে আনন্দে মুক্তা ছড়াইতে পারেন এমন ধনী মূর্খ হয় তো আছে, কিন্তু অরসিকের কাছে রস ছড়াইতে গিয়া রসিক যে তার কান্না পায়। দরদী গায়ক যদি শ্রোতার মুখে দরদের চিহ্ন দেখিতে না পায় তবে সে চন্দ্র ছাড়িয়া মুখ ভার করিয়া বসে। আর দরদী সমঝদার যদি কেউ থাকে তবে তার কণ্ঠ আনন্দে খেলিয়া যায়। কু-গায়ক সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

রস-সৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র কাজ, কাজেই সু-সাহিত্য রসিক পাঠকের অপেক্ষা রাখে। রসমাত্রেরই সৃষ্টি ও পুষ্টি হয় স্রষ্টা ও ভোক্তার সঙ্ঘাতে, এককে ছাড়িয়া অন্য রসের সম্যক স্ফূর্ত্তি করিতে পারে না। তাই সাহিত্য চায় রসজ্ঞ পাঠক, তাই সাহিত্যের আসরে সমালোচকের মান এত বেশী। কেন না সমালোচক রসিক; লেখকের লেখার ভিতর যে রস থাকে সমালোচকের অন্তরে তাহা রসের উদ্বোধন করে—সে উপভোগ করে, তার উপভোগের আনন্দ সে ব্যক্ত করে। পরিতৃপ্ত লেখক আরও রস সৃষ্টি করিতে উৎসাহিত হয়। সুধু তাই নয়, উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত বা কলা উপভোগ করিতে হইলে তার উপযোগী একটা শিক্ষা চাই। উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যও তেমনি সবাই ইচ্ছা করিলেই পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারে না। তাই সমালোচকের প্রয়োজন। তিনি গুহান্বিত রস উদঘাটন করিয়া সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া তোলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে উচ্চ অঙ্গের রসসম্ভোগের অধিকারী করিয়া তোলেন। লেখক ও পাঠকের মনের ভিতর এই সংযোগ সাধনই সমালোচকের সার্থকতা।

তা' ছাড়া সমালোচকের কাজ এক হিসাবে রসস্রষ্টার চেয়েও বড়। কবি লেখেন একটা ভাবের আবেশে। তাঁ'র চোখের সম্মুখে নিয়ত বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে সত্য শিব সুন্দরের শাশ্বত মূর্ত্তি, তার এক একটা অঙ্গ, এক একটা ক্ষুদ্র প্রকাশ তিনি যেমনটি দেখেন তাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর অন্তরটি খুলিয়া রাখেন, বিশ্বের নিত্যরূপ তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাঁ'র শক্তি অনুসারে তিনি সেই রূপের ছবি জগৎকে বিলাইয়া দেন। এমন অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে তাঁর ঋষির দৃষ্টিতে তিনি যে মন্ত্র পাইয়াছেন তার সম্পূর্ণ অর্থ তিনি জানেন না,

যে রূপ তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছে তার স্বরূপ সবটুকু তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কোকিলের মত কবি গান গাহিয়াই খালাস, কিন্তু সে গানের মোহিনী শক্তি তাঁ'র কাছে হয়তো ভাল করিয়া প্রকাশই হয় নাই।

সমালোচক ইহাতে তৃপ্ত হন না। তিনি রসের বিশেষজ্ঞ। কবি তাঁ'র অন্তরের উদ্যান হইতে তাঁ'র কাছে ফুল যোগাইয়া দেন, তিনি সে ফুলটির রূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন, তাকে বিশ্বরূপের ভিতর তার নিজের স্থানটিতে বসাইয়া তার সকল সৌষ্ঠব ফুটাইয়া তোলেন, কবির আহরিত কণা কণা রূপ কুড়াইয়া তিনি তোড়া বাঁধিয়া জগৎকে দেখান কত রূপ কবি আহরণ করিয়াছে, কত আনন্দের লুকান মণি সে কবির সৃষ্টির ভিতর আছে। তাই সমালোচক কেবল রসের ভোক্তা নন, তিনি এক হিসাবে রসের স্রষ্টা।

ইহাই সমালোচকের আসল কাজ, এই স্থানেই তাঁ'র প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। লেখক রস সৃষ্টি করেন, তাহা পরিবেষণ করিবার ভার সমালোচকের, আর পরিবেষণ করিতে করিতে তাঁ'র হাতের অপূর্ব্ব শক্তিতে রস বাড়িয়া উঠে, ফাঁপিয়া ফেনাইয়া তাহা ভাণ্ড ছাপাইয়া পড়ে।

রস সমালোচকের পণ্য, তিনি রস চেনেন। বাজে মাল হইতে তাঁহাকে রস বাছিয়া লইতে হয়, তাই বাজে মাল তাঁহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দূর করিতে হয়। কিন্তু এইটাকে সমালোচকের আসল কাজ বলিয়া মনে করিলে তাঁ'র একটা উপাধিকে মূল বস্তু বলিয়া ভুল করা হইবে। আসলে তিনি রসের পসারী, রস আহরণ ও বিতরণ তাঁ'র কাজ। সে কাজ করিতে তাঁ'র অনেক ধূলা ঘাঁটিতে হয় অনেক কাঁটাবন সাফ করিতে হয়, তাই বলিয়া ধূলা বা কাঁটা ঘাঁটা তাঁ'র ব্যবসা নয়।

সুতরাং সমালোচকের মুখ্যতঃ হওয়া দরকার—রসিক দরদী। তিনি সাহিত্য পাঠ করিবেন তাঁ'র হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া। তাঁ'র অন্তরে যে রসের বীণা আছে তার প্রত্যেকটি পরদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। কবির অন্তরের বীণায় যে সুরটি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠে সেটি তাঁ'র অন্তরে ধ্বনিত যদি না হয় তবে তাঁর সমালোচক হইবার চেষ্টা বৃথা। রূপের সাগর যদি তাঁ'র অন্তরে না থাকে, কবির অন্তর সাগরের প্রত্যেকটি বীচি যদি তার ভিতর একটি সমান তরঙ্গ না তুলিয়া দেয় তবে তাঁর সমালোচনার অধিকার নাই। যেহেতু বাগ্দেবীর স্বাধীন রাজ্যে কা'রও বিচরণ করিতে বাধা নাই, এহেন ব্যক্তি সেখানে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারেন, ছড়ি ঘুরাইয়া তিনি দুই হাতে রূপ রসের মাথায় ঘা বসাইতে পারেন, তাহাতে কেহ বাধা দিতে আসিবে না। তিনিই বাণীমন্দিরের খাতক হইতে পারেন কিন্তু সমালোচকের উচ্চ পদবীতে তাঁ'র কোনও অধিকার নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচকের আজ বড় দাম। সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে হইলে, রসসৃষ্টি সার্থক হইতে হইলে সমালোচক চাই—কবির সৃষ্ট রসধারা ধারণ করিবার যোগ্য আধার চাই। তাহা হইলে রসগ্রাহীর কোমল স্পর্শে কবির অন্তর বিকশিত হইয়া উঠিবে, রূপরসের ধারা তাহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িবে। সাধারণ পাঠক তাহা উপভোগ করিয়া ধন্য হইবে, উপভোগের

শক্তি তাদের বাড়িয়া যাইবে, কবির দৃষ্টির ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে, নূতন নূতন রসের খনি সে খুঁজিয়া বাহির করিবে, রসসাগরের গভীরতম প্রদেশে সে আনন্দে প্রবেশ করিবে, ভারতী রত্ন-সম্ভারে ভূষিত হইবেন। সমালোচকের অভাবে আজ বাঙ্গলায় একদিকে সুকবি রসসৃষ্টি করিয়া দীননয়নে তার উপভোক্তার ব্যর্থ প্রতীক্ষা করিতেছেন, অপরদিকে অকবি তার অ-রসের স্রোতে ভারতীর মন্দির ভাসাইয়া দিতেছে। প্রকৃত সমালোচক ছাড়া এ সর্ব্বনাশ কে রোধ করিবে?

সমালোচকের নাম করিতে ভয় হয়, কেননা নামটার যে ব্যবহার হইয়াছে তাহা মনোরম নয়। সমালোচক বলিতে আমাদের মনে হয় রক্তচক্ষু এক দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি যে বিশাল লগুড় হস্তে বাগেদবীর মন্দির-দুয়ারে বেয়াদব দরোয়ানের মত দাঁড়াইয়া নির্ব্বিচারে চারিদিকে লাঠি চালইতেছে। বেশ ঝাঁঝাল ও মুখরোচক করিয়া গালিগালাজ করিতে পারাটা সমালোচনার চরমোৎকর্ষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। সমালোচনা ন্যায় হউক অন্যায় হউক, তার ভিতর রসসন্ধানের চেষ্টা থাকুক বা না থাকুক বেশ লাগসই রকম হইলেই তাহা উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা বলিয়া চলিয়া যায়। ইহা একরকম সাহিত্যিক গুণ্ডামী—ইহা সমালোচনা নয়।

আর এক শ্রেণীর তথাকথিত সমালোচক আছেন, তাঁদের রসজাতীয় নিজস্ব জমা পুঁজি কিছুই নাই। তাঁদের সম্বল কেবল স্বদেশী ও বিদেশী নানা সমালোচকের নিকট ধারকরা কতকগুলি কথা। সেই কথা আশ্রয় করিয়া তাঁ'রা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করেন, রসের বিচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করেন এবং তার স্বাদ সম্বন্ধে বিরাট বক্তৃতা করেন।—কেবল করেন না তাই, যা' রসাস্বাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন,—তার স্বাদ গ্রহণ। একজন মহারাসায়নিক বলিয়া দিলেন যে অম্ল তাকেই বলে যা' নীল Litmus paper কে লাল করিয়া দেয়। অমনি এই শ্রেণীর সমালোচক একখণ্ড Litmus paper লইয়া সব রসের বিচার করিতে বসিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অম্লের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যাই হউক সকল রসের প্রকৃত পরিচয় স্বাদে। না চাখিয়া গেলাসের সরবৎকে Litmus paperএর জোরে অম্ল বলিয়া বরখাস্ত করিলে তাহাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসগ্রাহিতা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

পরের মুখে ঝাল খাইয়া ঝালের বিচার করা যায় না। তেমনি পরের কাছে সাহিত্য রসের ছক ধার করিয়া লইয়াও সমালোচক হওয়া যায় না। Aristotle or Taine বা কাব্যাদর্শ বা সাহিত্যদর্পণে রসের যে লক্ষণ আছে তাহা মিথ্যা নয় অগ্রাহ্যও নয়, কেন না সে সব গ্রন্থের লেখক ছিলেন রসজ্ঞ তাঁরা রস চাখিয়া যাচাই করিয়া তাদের সূত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল তাঁদের মুখের কথা সম্বল করিয়া বাহ্যলক্ষণ দিয়া কাব্য-বিচারও হয় না, রস-গ্রহণও হয় না। কেন না রসের স্বভাব বৈচিত্র্যে। সে কবি কবিই নয় যে রসের একটা নূতন স্বাদ আমাদিগকে দিতে না পারে। কাব্যাদর্শ, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি পড়িয়া যাঁরা তাদের প্রকৃত প্রাণ ও ভাবগ্রাহিতা লাভ করিয়াছেন তাঁরা রসের যে কোনও নূতন সৃষ্টি দেখিলেই তাহা চিনিতে ও তার সমাদর করিতে

পারিবেন। কিন্তু যে কেবলমাত্র তাঁদের বাহ্যলক্ষণগুলি মুখস্থ করিয়া পাড়ি দিয়াছে, সে তার রসেন্দ্রিয়টায় তালাচাবি দিয়া কেবল এই সব বাঁধি-গতের সাহায্যে রস সংগ্রহের চেষ্টা করিবে; তার পক্ষে নূতন রসের পরিচয় গ্রহণ অসম্ভব। রসের নূতন ধারা মাত্রই সে গুরুতর ব্যাভিচার বলিয়া মনে করিবে। এমন লোকের পক্ষে রসচর্চ্চা দারুণ বিড়ম্বনা। এক অন্ধ দুধ কেমন জানিতে চাহিয়াছিল। চক্ষুষ্মান এক ব্যক্তি বলিল তাহা বকের মত সাদা। তখন অন্ধ বলিল, বক কেমন? চক্ষুষ্মান তার হাত বেঁকাইয়া বকের গ্রীবার মত করিয়া দেখাইল। অন্ধ তাহাতে হাত বুলাইয়া ঠিক করিল দুধ এই হাতের মত। রসের স্বাদে পরাঙ্মুখ বা অশক্ত বাঁধিগৎ-সম্বল সমালোচকের দশা অনেকটা এই রকম হয়।

সমালোচনার প্রথম ও শেষ সূত্র রসের আস্বাদ। সমালোচকের মনের ভিতর রস-প্রবণতা না থাকিলে তার পক্ষে সমালোচনার চেষ্টা বিড়ম্বনা। যার অন্তরে রস আছে সে ছাড়া অন্য কারও সমালোচনার অধিকার নাই। তার অন্তরের এই রসেন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া সকল সাহিত্যকে পরখ করিতে হইবে—কবির ভাবে তার ভাবিত হইতে হইবে। যার ভিতর এমন দরদ নাই যাতে কবির কথার ভিতর দিয়া সে কবির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, কবি যা ভাবিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন সে কথা নিজের মনের ভিতর অনুভব করিতে পারে তার কাব্যপড়া অনর্থক, তার সমালোচনার চেষ্টা কাব্যের একটা উপহাসমাত্র। বালির মত কবির মনের সব রস শুষিয়া লইতে পারা সমালোচনার সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। যার এ স্বভাবদত্ত শক্তি আছে সে ইহার সম্যক্ অনুশীলন করিয়া ইহাকে তীক্ষ্ণ ও অশেষ ক্ষমতাশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে; যার রসগ্রাহিতা এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সে যেমন পুরাতন রস গ্রহণ করিতে পারিবে ও পূর্ব্বসমালোচকের আলোচনার দ্বারা রসের উপভোগকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিতে পারিবে, তেমনি রসের কোনও নূতন ধারার সম্মুখীন হইলে তাহাও আনন্দের সহিত উপভোগ ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে পারিবে। নূতন রসকে সে নূতন বলিয়া চিনিবে, আর তার নূতন আনন্দরাশি সে সহস্রধারায় সকলের কাছে বিতরণ করিবে।

বাঙ্গলায় আজ সমালোচকের বড় প্রয়োজন, রক্ত চক্ষু পাহারাওয়ালার নয়; পুরাতন ছাতাপড়া কষ্টিপাথর সম্বল করিয়া যে ঝুটা জহুরী সোণালোহা সমানে আঁস্তাকুড়ে ঠেলিয়া ফেলে তার নয়, যার অন্তরের রসগ্রাহিতার অভ্রান্ত নিকষমণিতে সোণার দাগ না কাটিয়া যায় না তার। বঙ্গ ভারতী সে কৃতী সন্তানকে বরণ করিবার জন্য দুই হাত মেলিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথম ভালবাসা

(স্পেনীয় লেখিকা—Emilia Pardo-Bazan—হইতে)

তখন আমার কত বয়স ছিল? ১৩ কি ১৪ বৎসর? খুব সম্ভব ১৬, কেননা তার আগে রীতিমত প্রেমে পড়াটা একটু বেশী শীঘ্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলিতে আমার সাহস হয় না। কারণ, পৃথিবীর দক্ষিণ ভূভাগে হৃদয় একটু অকালে পাকিয়া উঠে; এবং এই সব প্রণয়-বিভ্রাটের জন্য হৃদয় জিনিষটাই দায়ী।

আমার প্রথম ভালবাসা কখন আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা যদিও আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু আমি ঠিক্ বলিতে পারি, কি করিয়া উহার সূত্রপাত হইল। যখনই আমার দিদিমা সায়াহ্ন উপাসনা উপলক্ষে গির্জ্জায় চলিয়া যাইতেন, আমি তাঁর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁর আলমারির দেরাজগুলা হাতড়াইতে ভালবাসিতাম। দেরাজগুলা সুন্দররূপে তিনি গুছাইয়া রাখিতেন। উহার ভিতর প্রায়ই একটা না একটা দুর্ল্ভ ও পুরাকালের জিনিষ দেখিতে পাইতাম, ঐ দেরাজগুলা আমার কাছে যাদুঘর বলিয়া মনে হইত। তাহা হইতে কেমন একটা পুরাকালের রহস্যময় সুগন্ধ বাহির হইত, চন্দন-কাঠের হাতপাখার গন্ধে সমস্ত কাপড়-চোপড় ভুর্-ভুর্ করিত।

সাটিনের আল্‌পিন্-গদি,—এখন রং ম্লান হইয়া গিয়াছে; ফিন্‌ফিনে কাগজে সযত্নে জড়ানো পশ্‌মি সূতায় বোনা হাতঢাকা দস্তানা; সেলাইয়ের সরঞ্জাম; নীল মখ্‌মলের জরীর কাজ করা খোলে; তৃণমণি ও রূপার একটা জপ-মালা, এই সমস্ত দেরাজের কোণ হইতে বাহির হইয়া আছে দেখা যাইত। আমি উহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতাম, তারপর আবার উহাদের পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিতাম। কিন্তু একদিন—বেশ যেন আজিকার ঘটনা বলিয়া আমার মনে হইতেছে—উপর থাকের দেরাজের কোণে, কতকগুলা পুরানো কাপড়ের উপর সোনার মত ঝক্‌ঝকে একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম। আমি আস্তে আস্তে উহা বাহির করিলাম। উহা একটা তস্‌বির; হাতির দাঁতের ক্ষুদ্রাকারের তস্‌বির, তিন ইঞ্চি লম্বা, একটা সোনার ফ্রেমে বসানো।

প্রথম দৃষ্টিতেই আমি মুগ্ধ হইলাম। একটা সৌর কিরণ জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া ঐ চিত্রিত মোহিনীমূর্ত্তির উপর পড়িয়াছে। মনে হইল যেন ঐ মূর্ত্তিটি চিত্রের কালো "পশ্চাৎভূমি" হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে আসিতে ইচ্ছা করিতেছে। কি অপূর্ব্ব বিধাতার সৃষ্টি—যৌবনের স্বপ্ন ছাড়া আমি এরূপ মূর্ত্তি পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। তস্‌বিরে চিত্রিত মহিলার বয়স ২০।২২ বৎসর হইবে। এই স্ত্রীলোকটি কুমারী মাত্র নহে, একটা অর্দ্ধস্ফুট কুসুম-কলিকা নহে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের পূর্ণ মহিমাচ্ছটায় সমুজ্জ্বল যুবতী নারী। তাহার মুখ ডিম্বাকৃতি, বেশী দীর্ঘ নহে। ওষ্ঠযুগল ভরা-ভরা আধ খোলা, মুখ বেশ হাসি হাসি। চোখে মদির অপাঙ্গ দৃষ্টি। থুতির উপর একটা টোল্ খাওয়া-জায়গা আছে, যেন অনঙ্গদেব ক্রীড়াচ্ছলে ঐখানটা একটু টিপিয়া দিয়াছিলেন।

উহার শিরোভূষণ অদ্ভুত ধরণের কিন্তু সুশোভন ; কপালের পার্শ্বদেশ হইতে কুঞ্চিত কুন্তল ঝুলিয়া পড়িয়াছে—এবং মাথার চূড়াদেশে ঝুড়ির আকারে খোঁপা উঠিয়াছে। পরিচ্ছদের কথা আর কি বলিব……আজকাল ওরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে সভ্য মহলে একটা টি টি পড়িয়া যাইত। সমস্ত দেহযষ্টি ফিন্‌ফিনে পাতলা 'গজ' কাপড়ে আবৃত। আমি তন্ময় হইয়া প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে ছবিখানি যেন চোখ্‌ দিয়া গ্রাস করিতে লাগিলাম। ছবিখানি ছবি বলিয়া মনে হইল না—মনে হইল যেন উহা হইতে প্রাণবায়ু নিঃশ্বসিত হইতেছে—বেশ সজীব। ছবিটা হাতে লইয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলাম। ঠিক্ এই সময়ে বারাণ্ডা-পথে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার দিদিমা গির্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁর হাঁপানি-কাসির শব্দ ও তাঁর বাতক্লিষ্ট ফুলো পায়ে হ্যাঁচ্‌ড়াইয়া চলিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি ছবিখানি চট্ করিয়া দেরাজে পূরিয়া ফেলিলাম, এবং দেরাজ বন্ধ করিয়া জানালার কাছে আসিয়া, ভালমানুষটির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দিদিমা কাসিতে কাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। গির্জায় ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁর সর্দ্দিকাশি আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া তাঁর বলি রেখান্বিত ছোট ছোট চোখ্ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার শুষ্কশীর্ণ হাত দিয়া আমার পিঠে একটা সস্নেহ থাব্‌ড়া মারিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, নিত্য অভ্যাসানুসারে আমি দেরাজগুলা হাঁট্‌কাইতেছিলাম কিনা।

তাহার পর চাপা-উল্লাসের সহিত বলিলেন :—"একটু রোস্, একটু রোস্, তোর জন্যে একটা জিনিষ এনেছি—এমন একটা জিনিষ যা তোর ভাল লাগ্‌বে।"

এই বলিয়া তিনি তাহার বিশাল পকেট হইতে একটা কাগজের খোলে বাহির করিলেন ; এবং সেই খোলে হইতে বাহির হইল—একটা বোকে আঁটা ৩।৪ টা গঁদের লজুন্‌জুস্। তাহা দেখিয়া আমার গা কেমন করিতে লাগিল। তা ছাড়া দিদিমার চেহারা দেখিলে তাঁর হাতের এই মিষ্টিগুলা খাইতে প্রবৃত্ত হয় না। থুথুরে বুড়া, দাঁত নাই, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে-বসা মুখ-বিবরের উপর গোঁপের মতো দুই চারিটা রোঁয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। মুখবিবর তিন ইঞ্চি প্রশস্ত। পাংশুবর্ণ রগের উপর সাদা চুল ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। কণ্ঠদেশ তলতলে ও পেরু পাখীর ঝুঁটির মত সীসা বর্ণ………মোদ্দা কথা—আমি লজুন্‌জুস্‌গুলো লই নাই। উঃ! আমার একটা ধিক্কার উপস্থিত হল—আমি জোরের সহিত বলিলাম :—

"আমি ও চাই নে, আমি ও চাই নে।"

"তুই চাস্ নে ? কি আশ্চর্য্য ! তুই যে বেড়ালের চেয়েও লোভী—তুই চাস্ নে ?"

আমি পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে বলিলাম—"আমি ছোট ছেলে নই—আমি মিষ্টির তোয়াক্কা রাখিনে।"

দিদিমা অর্দ্ধেক মজা করিবার ভাবে, অর্দ্ধেক বিদ্রূপের ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া, তারপর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সেই হাসিতে তাঁর মুখ আরও কদাকার হইয়া উঠিল—

তাঁর চোয়ালের ভীষণ অস্থিতত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি এরূপ মন খুলিয়া হাসিয়াছিলেন যে, তাঁর থুতি ও নাক পরস্পরের সহিত মিলিত হইল এবং গভীর বড় বড় গর্ত্তের মতো কতকগুলা বলি-রেখা তাঁর গালের উপর তাঁর চোখের পাতার উপর ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসির চোটে তাঁর মাথা ও শরীর কাঁপিতে লাগিল; অবশেষে কাসি আসিয়া তাঁর হাস্যোচ্ছ্বাসে বাধা জন্মাইল; এবং এইরূপ কাসিতে কাসিতে ও হাসিতে হাসিতে, তিনি অজ্ঞাতসারে আমার মুখের উপর তাঁর মুখনিঃসৃত কতকটা সুধা ছিটাইয়া দিলেন।

ঘৃণায় ও লজ্জায় অতিষ্ঠ হইয়া আমি তাড়াতাড়ি আমার মায়ের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সাবান ও জলে মুখ প্রক্ষালন করিয়া আবার আমার সেই চিত্র-মহিলার ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

সেইদিন ও সেই সময় হইতে তাহাকে ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিতাম না। দিদিমা যেমনি বাহির হইয়া যাইতেন, আমি তাঁর ঘরে সুর-সুর করিয়া ঢুকিয়া পড়িতাম ও সেই দেরাজ খুলিয়া ছবিটা বাহির করিতাম, এবং চিন্তায় মস্‌গুল হইয়া পড়িতাম। আমার মনে হ'ত যেন চিত্র-মহিলার ঢুলু ঢুলু চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর নিবদ্ধ এবং তার বক্ষদেশ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। চুম্বন করিতে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে আমার ধৃষ্টতায় চিত্র-সুন্দরী বিরক্ত হন। আমি ছবিখানি বুকে চাপিতে লাগিলাম, আমার গালে ঠেকাইতে লাগিলাম।

দিদিমার ঘরে ঢুকিয়া দেরাজ খুলিবার আগে, আমি মুখ ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া, বেশ ফিটফাট হইয়া লইতাম। রাস্তায় অনেক সময় আমার বয়সী অন্য বালকদের সঙ্গে দেখা হইত। তাহারা গর্ব্বের সহিত তাহাদের প্রণয়িনীর কথা বলিত, খুব উল্লাসের সহিত তাদের প্রেম-পত্র, তাদের ফোটো আমাকে দেখাইত, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, আমার কোন প্রণয়িণী আছে কি না, যার সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি হয়। আমার কেমন একটা লজ্জার ভাব আসিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিত। আমি কেবল উদ্ধতভাবে একটু হাসিয়া ইঙ্গিতে উত্তর দিতাম। তারপর তাদের ক্ষুদে প্রণয়িণীদের ছবি দেখাইয়া তা'রা আমাকে জিজ্ঞাসা করিত—কেমন দেখিতে, আমি কাঁধ বাঁকাইয়া অবজ্ঞার সহিত বলিতাম—"বিশ্রী"। একদিন রবিবারে আমার বালিকা-ভগিনী (cousin)দের সঙ্গে খেলিতে গিয়াছিলাম—তারা বাস্তবিকই দেখিতে সুশ্রী—সকলের চেয়ে যে বড় তার তখনও ১৫ হয় নি।

আমরা সবাই Sterescope দেখ্‌ছিলেম; এই সময় হঠাৎ একটি ছোট মেয়ে—যে সবচেয়ে ছোটো, গোপনে আমার হাত ধরিল এবং ভ্যাবাচাকা খাইয়া, লজ্জায় মুখ লাল করিয়া, আমার কাণে কাণে বলিল—"এই টে ন্যাও"। সেই সঙ্গে আমার হাতের তালুতে একটা কোমল ও তাজা জিনিস আমি অনুভব করিলাম। দেখিলাম, হরিৎ পত্রপল্লব সমেত একটা গোলাপের কুঁড়ি।

বালিকা একটু হাসিয়া আমাকে আড়চোখে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। আমি পিউরি-

ট্যানের ধরণে বলিয়া উঠিলাম:—"এই লও"। এই কথা বলিয়া গোলাপ-কুঁড়িটা তার নাকের উপর ছুঁড়িয়া মারিলাম। সে সমস্ত দিন আমার উপর অভিমান করিয়া রহিল। এখন সে বিবাহিতা, তিন সন্তানের মা, তবু এখনও সে আমাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

দিদিমা সকালসন্ধ্যা দুই বেলা, দুই তিন ঘণ্টা গির্জ্জায় থাকিতেন, সেই সুযোগে আমি লুকাইয়া ছবিটা দেখিতাম—কিন্তু দেখিয়া আমার তৃপ্তি হইত না। শেষে মনে করিলাম ছবিটা আমার পকেটেই রাখিয়া দিব। পকেটে রাখিয়া আমি সমস্ত দিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতাম যেন আমি একটা কি ঘোর অপরাধ করিয়াছি। আমি কল্পনা করিতাম, যেন ছবিটা উহার বস্ত্রাবরণের ভিতর হইতে আমার সব কাজ দেখিতেছে; শেষে এই ভাবটা এমন হাস্যজনক সীমায় আসিয়া পৌঁছিল যে, গা চুল্‌কাইতে হইলে, মোজাটা একটু উপরে টানিয়া দিতে হইলে, কিংবা এমন কিছু করিতে হইলে যাহা বিশুদ্ধ পবিত্র, আদর্শ প্রেমের সহিত খাপ খায় না—আমি ছবিখানি বাহির করিয়া একটা নিরাপদ স্থানে আগে রাখিয়া দিতাম, তারপর ঐ সব কাজ করিতাম।

বস্তুত, ছবিখানি চুরী করার পর হইতে, আমার খেয়ালের আর অন্ত ছিল না। রাত্রে বালিসের নীচে উহা লুকাইয়া রাখিয়া, আমি পাহারা দিবার ভঙ্গীতে নিদ্রা যাইতাম। ছবিখানি দেয়ালের কাছে থাকিত—আমি দেয়ালের বাহিরে। পাছে কেহ আমার এই রত্নটি চুরী করে এই ভয়ে আমি রাত্রির মাঝে কতবার জাগিয়া উঠিতাম। এই ছবির সংস্পর্শে আমি কত মধুর স্বপ্ন দেখিতাম, যেন আমার চিত্র-সুন্দরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহাস্যবদনে আমার নিকট আসিয়া একটা দ্রুত উড়ন্ত ট্রেণে করিয়া আমাকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁর পাদপীঠের উপর আমাকে বসাইয়া, আমার মাথার উপর, কপালের উপর, আমার চোখের উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি তাঁর সম্মুখে বাঁশী বাজাইলাম—গান গাহিলাম—তিনি আমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া একটু মৃদু মৃদু হাসিলেন। আমার ভিতরে কত রকম ভাব খেলিতে লাগিল। রাতদিন এই সব খেয়াল ও চিন্তায় মগ্ন থাকায় দিন দিন আমার শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। আমার মা, বাবা ও দিদিমা ইহা লক্ষ্য করিয়া বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। বাবা বলিলেন:—"এই বয়সটা একটা সঙ্কটের কাল,—বড়ই ভয় হয়।" আমার বাবা ঔষধাদির বই পড়িতেন। তিনি আমার কালো চোখের পাতা, ঘোলা ঘোলা চোখ, আমার কুঞ্চিত ফ্যাঁকাশে ঠোঁট, বিশেষত আমার অগ্নিমান্দ্য দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ওঁরা বলাবলি করিতে লাগিলেন:—"ওকে একটু আমোদ দেওয়া দরকার।" আমাকে থিয়েটারে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আমার পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন; আমাকে

ফেনময় তাজা দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। পরে মাথায় ও পীঠে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া আমার স্নায়ুতন্ত্রকে সবল করিতে চেষ্টা করিলেন।

যখনি আমার পরিবারের ও পরিজনের স্নেহযত্ন হইতে একটু ছাড়ান পাইতাম, আমি তখনি একাকী আমার চিত্র-সুন্দরীর সঙ্গে থাকিতাম। অবশেষে আরও কাছাকাছি হইবার জন্য আমি ছবিখানির কাচের আবরণটা অতি সন্তর্পণে খুলিয়া ফেলিলাম। হাতীর দাঁতের ফলকটা বাহির হইয়া পড়িল। আমার মনে হইল এইবার যেন আমার সুন্দরীকে আরও নিকটে পাইয়াছি—আমি প্রাণ ভরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলাম। এইরূপ করিতে করিতে, একটা অবসাদ-দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইলাম। আমি অচেতন হইয়া কৌচের উপর পড়িয়া গেলাম। তখনও ছবিটা মুঠার ভিতর খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া ছিলাম।

যখন আমার জ্ঞান হইল, আমার বাবাকে, আমার মাকে, আমার দিদিমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে আমার উপর ঝুঁকিয়া আছেন। তাহাদের মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাবা নাড়ী দেখিতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, আর অস্পষ্টস্বরে বলিতেছেন :—"নাড়ী অতি ক্ষীণ, নাই বলিলেই হয়।"

আমার দিদিমা আমার কাছথেকে ছবিটা লইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি যান্ত্রিকভাবে উহা লুকাইতে চেষ্টা করিতেছি—আরও বেশী করিয়া আঁটিয়া ধরিতেছি। তিনি বলিলেন :— "কিন্তু লক্ষ্মীটি......ছেড়েদে, তুই যে ছবিটাকে নষ্ট কর্‌ছিস। দেখ্‌ছিসনে ওটা দুমড়ে যাচ্চে? আমি তোকে ধম্‌কাচ্ছিনে......তুই যখনই দেখ্‌তে চাবি, তখনই তোকে দেখাব। ছেড়েদে, ছবিটা মাটি হল।"

আমার মা বল্লেন, "ওর কাছে থাক্‌না ওটা, ওর শরীর ভাল নেই।"

বৃদ্ধা উত্তর করিল—"বেশ বল্লে যাহোক! ওর কাছে ওটা থাক্‌না—ঐ রকম আর একটা কে চিত্র করবে বল্ দিকি?......আমি পূর্ব্বে যেমনটি ছিলাম, ঠিক্ সেই রকম কে আঁক্‌বে বল্ দেখি? আজকাল, ক্ষুদ্রাকৃতির ছবি কেউ আঁকে না......এটা অতীত কালের জিনিস। আর আমিও ত অতীতের লোক! ছবিতে যে রকমটি আছে, আমি কি এখন সেই রকম আছি? —একটুও না।"

বিস্ময়-আতঙ্কে আমার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইল। আমার আঙ্গুল হইতে ছবিটা খসিয়া পড়িল। আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

"তুমি......ঐ ছবি......তুমি......তোমার...... ?"

"কি বলিস্ বাছা, আমি কি এখনো ঐরকম সুন্দরী? ২৩ বৎসরে—এখনকার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল দেখ্‌তে ছিলাম—আমার বয়স এখন কত হল?—আমি ভুলে গিয়েছি।"

আমার মাথা নুইয়া পড়িল; প্রায় আমার মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়ে দিলেন; আর কয়েক চামচ পোর্ট খাইয়ে দিলেন।

আমি শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠিলাম। সেই অবধি দিদিমার ঘরে আমি আর কখনো যাই নাই।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতি ও শিল্প

সব মানুষ এক রকমের নয়। এক এক জাত এক এক রকমে খাচ্ছে পরছে চল্‌ছে ফির্‌ছে— এবং ভাবছেও। এক এক জাতির বাহিরের চালচোল রকম্ সকম্ এবং সকলই জাতির অন্তরের ভাবনা-চিন্তা এই দুয়ের যোগে উৎপন্ন হল শিল্পের মধ্যে দেশীয়তা জাতীয়তা। নানা ছন্দে লেখা. নানা ভঙ্গিমায় গড়া অন্তরে বাহিরে একে অন্যে যে ভিন্নতা তারি ফলে আসে শিল্প, আর একভাবে এক ভঙ্গিতে চলা আসে জাতিগত সংস্কারগত ঐক্য থেকে। যখন জগতের মধ্যে অথচ মানুষগুলি বালুকণার মতো স্বতন্ত্র দলে ধরা সেখানে জাতীয় শিল্প নেই কিন্তু একের শিল্প আছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিল্পও আছে। মাঠের মধ্যে একটা গাছ রইলো মাঠে শেষে একটা গাছ রইলো এইভাবে যখন সমস্ত অরণ্যটা ছড়িয়ে রইলো দিকবিদিকে তখন গাছগুলি তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের রূপ ও রূপের ছায়া স্বতন্ত্রভাবে গেল ধরে, যখন তারা এক হয়ে একটা দেশ জুড়ে দাঁড়ালো তখন আর এ গাছের ও গাছের রূপ রূপের ছায়ায় যে ভিন্নতা তা ধরা গেলনা। তেমনি একের শিল্পে অন্যের শিল্পে এক জাতির ভাবনায় অন্য জাতির ভাবনায় এবং একের আচারে অন্যের ব্যবহারে এইভাবে একতা ও ভিন্নতা দেখা দিলে যখন তখন প্রথা, রীতি ইত্যাদির বিভিন্নতা ও একতা দেখে বলা চল্লো এটি ভারতীয় ওটি ইউরোপীয় সেটি চীন অন্যটি জাপান। এই যে শিল্পে শিল্পে মোটামুটি জাতি বিভাগ দেশ কাল পাত্রভেদে ঘটেছে, সেইদিক দিয়ে শিল্পচর্চা করে দেখার মানে হল, শিল্পের সঙ্গে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে একেবারে বাইরে বাইরে পরিচয়। আর এক দিক দিয়ে পরিচয়—সে হল রসের দিক দিয়ে সেখানে জাতি বিভাগ ঐতিহাসিক রহস্য ইত্যাদি না হলেও কায চলে যায়।

এক দেশের মানুষে অন্য দেশের মানুষে যেমন একদিক দিয়ে স্বতন্ত্র, তেমনি অন্যদিক দিয়ে এক। সঙ্গীতের চাল দেশ কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সঙ্গীতের প্রাণ যেটি সুরের দোলায় দুল্‌ছে সেখানে ভেদাভেদ নেই। কালানুগত প্রথা আচার বিচার ধরে সৃষ্টি হয় চালচোলের—যেমন বাংলার কীর্ত্তন এবং পশ্চিমের ওস্তাদী গান। এখানে চাল দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে দেখাচ্ছে কিন্তু যখন রসের দিক দিয়ে দেখি তখন এতে ওতে বিষয়ের উচ্চ নীচ চালের রকম্ সকম্ দিয়ে যে ভিন্নতা তার হিসেবের খাতা দরকারই হয় না;—বীণা বাজছে, কি পিয়ানো, না বাঁশী, বিলাতি সুর বাজছে, না দেশী বাউল না দরবারি এটা ভুল হয়ে যায়। রসটি পাওয়াই হল আসল কায কাব্যে শিল্পে সঙ্গীতে এবং মানব জীবনে।

এই যে রসের প্রাধান্য এই নিয়ে জগতের তাবৎ শিল্প এক, এই নিয়ে যা শিল্প এবং যা শিল্প নয় তা সে সম্পূর্ণ আলাদা তাও প্রমাণিত হয় রসিকদের কাছে। এবং এই নিয়ে দেবশিল্প (Nature) ও মানবশিল্প (Art) দুই নয় এক—এও বলেন তাঁরা। ফুলের যেমন পরিমল শিল্পের তেমনি রস।

ফুলটি কোন জাতীয়, তার রূপ কেমন, সেটি বড় না ছোট—এ জ্ঞান এক ফুলে অন্য ফুলে পার্থক্য জানায়; ফুলের পরিমলটুকু সেও জানায় কি ফুলের বাস পাচ্ছি কিন্তু এই সব ব্যাপারের বাইরের জিনিষ হল—ফুল দেখে পরিমল পেয়ে মন মাৎলো যখন তখন—যে অনির্ব্বচনীয় বস্তুটি পাই সব ফুল থেকেই, সেই এক বস্তু নিয়ে রসিকের রস চর্চ্চা চলে।

বীণার কটা তার কটা ঘাট এবং বীণাতে যা বাজছে তার স্বরগ্রামের শ্রুতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিভাগ জ্ঞান নিয়ে রসভোগ তো বর্দ্ধিত হয় না, বীণা বাঁধার কৌশল সেটা বাজাবার কৌশল যখন আপনাকে হারিয়ে দিলে রসের তলায়, তখনি জানলেম বীণা যথার্থ ভাল বাজলো গানও ঠিক হলো; কিন্তু বীণা যেখানে আপনার খুঁটিনাটি খটখটি দিয়ে প্রমাণ করতে থাকলো আমি রুদ্রবীণ আমি সরস্বতী বীণ আমি শ্রুতিবীণ কিম্বা কালোয়াৎ যেখানে প্রকাশ করতে থাকলো আমি দক্ষিণী চাল আমি ভরতমৎ আমি নারদ আমি বিলাতি কিছু—সেখানে গান শুনে আনন্দ নেই—গানের ভঙ্গী দেখে আনন্দ, সঙ্গীত শাস্ত্রের কথকতা শুনে আনন্দের মতো আনন্দ,—কাযেই দেখা যাচ্ছে যে জাতির সঙ্গে জাতীয় শিল্পের জ্ঞান এক জাতিগত প্রথা ধরে দেখা আর জাতি থেকে আলাদা করে নিয়ে শুধু তার কারিগরি ও শিল্প হিসেবে দেখা এবং রসের বিচার করে দেখা এ তিন রকম দেখার পথ, যারা পড়ে শুনে শিল্পকে জানতে চায় তারা চলে প্রথম পথে, কারিগর শিল্পি এরা চলে দ্বিতীয় পথে, কাযের বাহাদুরি দেখে, এবং রসিক তারা চলে শেষের পথ ধরে শিল্প কাজের প্রাণের সন্ধানে। নিজের রুচি অনুসারে দেখার সঙ্গে রসিকের দেখার পার্থক্য এই—রসিক তিনি গণ্ডির হিসেব জেনে গণ্ডি পেরিয়ে জিনিষটিকে প্রাণ দিয়ে ধরার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, আর যে নিজের রুচি অনুসারে এটা ওটা দেখে সে গণ্ডির হিসেব একেবারেই অগ্রাহ্য করে, যেটা তার ভাল সেইটেই সবার ভালো ঠাউরে নেয়। নিছক নিজত্ব নিয়ে আছে—কোনো জাতির সঙ্গে কোনো কালানুগত প্রথার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন শিল্প বিশ্বের কোথাও নেই সুতরাং একেবারে আপ্‌রুচি নিয়ে রসের জগতে—রচনার জগতে—বিচরণ করতে গেলে এমন হতে পারে যে, হয়তো হাতে মণি উঠলো কিন্তু ফেলে দিলেম সেটা ঢেলা বলে, কিম্বা শবরীর হাতের গজমুক্তার মতো নিজের কাছে রাখলেম দিব্বি খেলার জিনিষ বলে মর্ম্মটা অজ্ঞাত রইলো।

নিজের রুচি খাবার জিনিষের বেলায় চলে, পেট আপনার সেখানে আপরুচি খানা কিন্তু হৃদয় নিয়ে যেখানে কথা সেখানে আপরুচি চালাতে গেলে চলে না। হৃদয়কে এক আপনার করে রাখলে নিজেই ঠকি, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলানোতেই রস পাই, সুতরাং বলতে পারি যে, রস হল দুইকে মিলিয়ে সেতু, রুচি হল দুইকে পৃথক করে প্রাচীর।

মানুষের অন্তর একের সঙ্গে মিলিতে চায়, ভাব করতে চলে কিন্তু ভাবের লোকটি সহজে খুঁজেতো পায় না, কালই সেখানে একের রুচি অন্যের রুচিতে ভিন্নতা নিয়ে দুটি মানুষ পৃথক এইভাবে মানুষ এককালে দলে দলে পাশাপাশি ছিল—রুচি দিয়ে পৃথক, ক্রমে মানুষ নিজের বড়

সমাজ বড় ধর্ম্ম এমনি সব বাঁধন নিজে সৃষ্টি করে দলে ভারি হয়ে একটি কৃত্রিম ঐক্যতা পেয়ে বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন জাতি হয়ে উঠলো এবং সেই জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার ধারা ধরে চলতে চলতে অন্তরের ভাবনা চিন্তাতেও দেখতে এক হয়ে উঠলো দুটি ভিন্ন রুচির মানুষের—এযেন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতে থাকলো। এই কৃত্রিম ভাবের মিলন থেকে উৎপত্তি হল জাতীয় শিল্প যাকে বলা যায় তা—সেখানে গড়ে তোলার ধরণ ধারণ শিল্পি বিশেষের উপরে ছাড়া রইলো না, শিল্পশাস্ত্রের কুল পঞ্জিকার মধ্যে শক্ত করে বাঁধা রইলো সব।

আমাদের এক শ্রেণীর মূর্ত্তি শিল্প অনেকটা এই শক্ত করে বাঁধা পাথর; তারপর সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদি সেখানে দেশ কাল পাত্র ভেদে এবং নিজের রুচি অনুসারে যে সব রাগ-রাগিণী রচনা হয়ে গেল তার থেকে সময়ে সময়ে নানা বাঁধুনী ও কায়দার হিসেব জড়ো করে আইন প্রস্তুত হল,—সঙ্গীতশাস্ত্র হল, ছন্দশাস্ত্র হল, নাট্যশাস্ত্র হল। নতুন যখন মানব সমাজ তখন এই বেড়া খুব কাজে এল তার শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতে কিন্তু গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আল্ ও বেড়া দুই বাড়িয়ে চলতে হল, না হলে জাত বাঁচে কিন্তু গাছ বাড়ে না! এই বেড়া বাড়ানো বা জাত না বাঁচিয়ে গাছের জীবন বাচানোর কাজ রসিকেরা সময়ে সময়ে এসে এদেশে ওদেশে করে গেলেন এ গাছের সঙ্গে ও গাছের এ জাতের সঙ্গে ও জাতের মিলন সেও ঘটালেন রসিকেরা—জাত-শিল্প ফল ধরিয়ে ফুল ফলিয়ে ফসল বৃদ্ধি করে চল্লো এবং জাতি রাজার ভাঁড়ারে সে সব জমা হতে থাকলো, জাতি খাজনা নিলে জাতীয় শিল্পের, দিলে খাজনা দুচার রসিকের মারফৎ দুচার কবি দুচার শিল্পি দুচার গাইয়ে, দুচার বাজিয়ে নাচিয়ে তারা। জাতির সঙ্গে জাতীয় শিল্প কলা সমস্তের সম্বন্ধ কালিদাসের রাজার প্রজার "স পিতঃ" গোছের নয়, 'পরের ধনে পোদ্দারী' করার সঙ্গে তার মিল আছে।

সমজদারে কারিগরে রসিকে গুণীতে দরদ দিয়ে করে গেল গান বল, ছবি বল, কবিতা বল—সব নিয়ে উৎসব। তাদের কজনের উৎসবের শেষে পড়ে রইলো যা ফুলশয্যা কিম্বা ময়ুর সিংহাসন তারি উপরে জাতের কর্ত্তা এসে মিল্ বসিয়ে দিয়ে গেল—হঠাৎ নবাব জাত নিলেমে সেগুলো কিনে নিয়ে সস্তায় নবাবি আমলের একটা অভিনয় করতে থাকলো, সভা কবির দল শিল্পির দল সৃষ্টি হয়ে কবির লড়াই, গানের লড়াই ইত্যাদি সুরু হল; স্বভাব কবি কল্কে পেলেনা সে সভায়, কেননা আসল বস্তু দিতে চায়, কোনো এক বড় আমলের নকল দিতে পারেনা একবারেই! নবাবি আমলের পরে এল যখন সাধারণের আমল তখনি জাতীয় শিল্পের খোঁজ পড়ে গেল দেখি সাধারণ অসাধারণ রকমে রসিক হয়ে উঠলো তখন। এই ভাবের জাতীয় যুগ ইতিহাসের পাতায় চিহ্ন রেখেছে যেমন তেমনি কবিতায় গানে শিল্পকলায়ও ছাপ রেখেছে। এই সাধারণ সভা বা জাতীয় সভায় কবির লড়াই দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়েছে কত কবির তার ঠিক আছে কি? শিল্পের সঙ্গে জাতীয় বিবাহ রাক্ষস বিবাহ, জাঁতার সঙ্গে মণিমুক্তার বিবাহ দিলে যা ফল হয় সেই রকমের বস্তু হচ্ছে জাতীয়

শিল্প ; তাতে রস থাকে না, ছাতুর মতো ভাবি শুকনো-জিনিষ থাকে জাতীয় শিল্পে—অনেকখানি গুড় না হলে সেই জাতীয় পুষ্টিকর জিনিষ রোচেনা একেবারেই।

জাতীয় উৎকর্ষ এবং শিল্পের উৎকর্ষ সমাজের মতো একভাবে একসঙ্গে বাড়ে না, এ এক হিসেব ধরে বাড়ে, ও আর এক হিসেব নিয়ে বাড়ে—একের বাড় অন্যের বাড়ের সাপেক্ষ নয়। ধন বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও বাড়বে এ যেমন ভুল, জাতির উৎকর্ষ শিল্পির উৎকর্ষ ভাবাও ঠিক তেমনি ভুল। জাত যে হিসেবে বড় হয় সে হিসেবে তার সঙ্গে শিল্পকলাও যে বড় হয়ে ওঠে এমনটা ঘটে না। জাত বলতে বলি—নেসন। আজকের জাপান জাত হিসেবে মস্ত কিন্তু শিল্পের দিক দিয়ে আমাদের কবির সেই 'অসভ্য জাপানে'র কাছে আজকের জাপানের হার হয়েছে! নেসন হিসেবে এই উৎকর্ষ আজ পেলে জাপান সেদিনের জাপান নেসন হিসেবে উৎকর্ষ পায়নি কিন্তু আর্ট হিসেবে বড় ছিল প্রাচীন জাপান।

জাতি আর্টের জননী নয়—হতেও পারে না। জাতির সঙ্গে আর্টের তো গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয় না, আর্টিষ্টের সঙ্গেই সেটা হয়ে থাকে বরাবর। বসন্তকালে বাগানের গাছে ফুল ধরে, সেই দেখে ফুল স্থষ্টিকর্ত্তা বাগানের মালিককে ভেবে নেওয়া ভুল। বসন্ত দেবতা বলে, মাতা ধরিত্রী বলে, দক্ষিণ বায়ু বলে কতকগুলো যে আছে। জাতীর ফুঁয়ে জাতীয়তার গৌরব জ্বলে কিন্তু ফুলের কলির মুখ খোলেনা! জাতির গড়া ন্যেশানাল পার্কে সেখানেও ফুল ফোটেনা ফুঁয়ে।

জাতীর কোলে শিল্পি এবং শিল্পও ধরা থাকে, দাস দাসী জ্ঞাতি কুটুম্বের মাঝে যে ভাবে থাকে মা ও ছেলে! মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিলে দাসীর কোলে সে ঘুমোলো, হয়তো মরলো—তেমনি শিল্পির অন্তরে শিল্প জন্ম নিলে, জাত দাসীর দলে সে নানা লীলা বিস্তার করলে, দাসীর দল আনন্দ পেয়ে বল্লে—ওগো আমাদের ছেলেটির জাতের সঙ্গে জাতীয় শিল্প কবিতা ইত্যাদির জাতীয় শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে যে টুকু যোগ তাও বাইরে বাইরে ছোঁয়া ছুঁয়ি নিয়ে জাত গেলে জাতির বিপদ গণে, কিন্তু শিল্প গেলে গান বন্ধ হলে কবিতা বন্ধ হলে চঞ্চল হয় মন জাতের মধ্যেকার দু-চার জনের। জাতীয় শিল্পের কত মন্দির ভাঙ্‌লো তার জন্যে চাঁদা তুল্লে কজন জাতীয় কংগ্রেস বসলো, তাঁতশালা বসলো, পাঠশাল খুল্লো। চাঁদামামার ছড়া আউড়ে বার হলো জাত পথে পথে এক তালে, এক সুরে, এক প্রাণে একটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুসি করে চাঁদা তুলতে!

জাতীয় নাট্য মন্দিরে, কলা ভবনে বা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা তাতে করে আজকের ভারতবাসীর সঙ্গে কালকের ভারতবাসীর কলাবিদ্যার বাইরে বাইরে কতকটা পরিচয় হল, যেন সেকালের রূপকথা শোনার কাষ হল মনের কল্পনা উত্তেজিত হল খানিক কিন্তু এতে করে আজকের আমরা আমাদের শিল্পকে নিজের করে যথার্থভাবে পেলেম না। যে রসবোধ তখনকার তাদের নানা সুন্দর স্থষ্টি বিষয়ে নিযুক্ত করে ছিল তাকে আবার ঘরে আনতে হলে এ ভাবের জাতীয় আয়োজনে চলবেনা। জাতি যে উপায়ে শিল্পকে জীবনপ্রদীপের আলোয়

বরণ করে ঘরে আনতে পারে নূতন বধূরূপে তারি আয়োজন করা চাই, নতুন করে উৎসব বাধুক, ঘরের মানুষটির প্রাণে কলাবৌটির সঙ্গে ঘরে বাইরে লক্ষ্মী বিরাজ করবেন তখন এসে, শ্রী ফিরে যাবে জাতির।

আমাদের জাতীর বাস্তুভিটে সেখানে পুরাকালের ঘরে ঘরে সৃষ্টির তৈজস পত্র জমা করে যেমন বুড়োকর্ত্তা গিন্নিরা চলে গেলেন। সব দেশেই সবার ভিটেয় এমনি ঘটনাই ঘটে কিন্তু আমার দেশে আর এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটালো—সেই বুড়োবুড়ি ছেলে বৌ হয়ে, নাতি নাতবৌ হয়ে বারে বারে ফিরে ফিরে পুরোনো বাসায় ঠিক অতীতকালের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে এলে। সাজে তেমনি, কাজে তেমনি,—সেই নাচ সেই গান সেই ছবি সেই ঝাড় লণ্ঠন শুধু কালটা এই! একে বলতে পারি অতীতে বর্ত্তমানে ভয়ঙ্কর রকম একটা রাক্ষস বিবাহ, এতে করে অতীত বাঁচলো বর্ত্তমানকে মেরে—এই সৃষ্টি ছাড়া বিবাহের ফল শুভ হলনা শিল্প সৃষ্টির পক্ষে।

কালচক্র ঘুরতে ঘুরতে জাতীয় জীবন যাত্রার রথখানি পৌঁছে দিলে যদি আজকের আমাদের সেই নৈমিষারণ্যে, তবে সে জীবন নিয়ে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যা কিছু তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন কায রইলো না।

জাতি বর্ত্তে থাকে যেখানে সেকালের সঞ্চয়ের উপরে সেখানে হয়তো তার জাত থাকে কিন্তু শিল্প প্রভৃতি নানা রচনা ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তার মান বজায় থাকা ক্রমেই দুষ্কর হয়। বর্ত্তমান ধরে তবে বর্ত্তে থাকে শিল্পকলা, অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু অতীতমুখীও নয় শিল্প। যে দিক দিয়েই চল আজকের জাতি ও তার মানুষগুলির সঙ্গে সে কালের যোগ স্বাভাবিক না হলে আজ আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানের সার্থকতা ভূত নামানোতে গিয়ে ঠেকে। রেলগাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে বার না হয়ে ষ্টেশনের দিকে পিছোতেই যদি থাকে ক্রমান্বয়ে তবে যাত্রিদের সে গাড়ি চড়ে গম্য কোথাও পৌঁছানো মুস্কিল হয়! পুরোনো ঘরে নতুন বর-বধূ তারা ইচ্ছামতো সেকালের কতক জিনিষ সংসারের কাযে লাগালে কতক জিনিষ দিয়ে নিজেদের 'ড্রয়িং রুম্' সাজালে নতুন খেলা পুরোনো ঘরে এইভাবে যখন সেকালকে একালের সঙ্গে যুক্ত করা হল তখন হল নতুন কালের উপযোগী সেকাল। আবার যেখানে সেকালের সঞ্চয় ভাণ্ডার ঘর থেকে সোজা পুরানো পিতলের দোকানে চলে গেল কিম্বা ভাঁড়ারেই রইলো এবং তার স্থানে বিদেশীয় দোকান ও হোটেলে এসে ভর্ত্তি করলে—ঘরখানা সেখানে নতুন পুরানো দুয়ের মিলন একেবারেই হতে পেলেনা।

বক্তৃতা দিয়ে প্রদর্শনী খুলে নানা উপায়ে সেকালের শিল্পকলার আদর বাড়ানো গেল আজকের জাতির কাছে; এতে করে উত্তরাধিকার সূত্রে জাতি এবং দেশ—যদি কিছু পেয়ে থাকে তাকেই ধরে রাখা চল্লো। প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণের আইন লাট কর্জ্জন করে এ কায অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু রক্ষণ ও বর্দ্ধন দুটো কথার অর্থ তো কিছু অর্জ্জন করা বোঝায় না।

আমাদের জাতি স্বভাবতঃ অতীত-মুখী, এই বৃত্তি আমাদের কুলানুগত প্রথা ধরবার দিকে

চালাতে চাচ্চে, এই বৃত্তি নিয়ে আমরা আজ যদি ছবি আঁকি মূর্ত্তি গড়ি ঘর তুলি তবে সব দিক দিয়ে অতীতকে আমাদের কর্ম্ম কাযের ধারা স্বীকার করে চলতে বাধ্য! শিল্পের কৌলিন্য এই করে চলতে চলতে আমরা পৌঁছেচি এমন অবস্থায় যখন আমাদের গান বাজনা সমস্তই হয়ে গেছে আজকের নয় আকবর ও তার পূর্ব্বের আমলের! আমাদের সঙ্গীত ও শিল্প প্রাচীন কৌলীন্য বজায় রাখতে গিয়ে আজকের জীবনধারার সঙ্গে এক হয়ে মিলতে পারছেনা, কাযেই সখের জিনিষ হয়ে রয়ে গেছে। ঠিক যে ভাবে অসংখ্য মানুষ যাদু ঘরে—ধরা নানা ভারত শিল্পের জিনিষগুলি দেখে বেড়ায় ও তার নানা রকম সমালোচনা করে, ঘোরাঘুরি করে, যাদুঘরের ঘরে ঘরে, নাচ গান ইত্যাদিও ঠিক সেইভাবেই অধিকাংশ লোকেই আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের জীবনে—গান শুনি নিজে গাইনা! নাচ দেখি নিজে নাচিনা!

নৃত্যকলা গীতকলা চিত্রকলা এ সবকে জাতীয় শিক্ষার মধ্যে স্থান দিতে বারম্বার বলা সেই থেকে সুরু হয় যখন থেকে গাইতে গলা চায়না, নাচতে পা সরেনা, আঁকতে-লিখতে হাত চাই-ই না। তখন সঙ্গীত সভাই করি নাট্যমন্দির শিল্প-শালা এসবই বা খুলে বসি জাতিকে জাগাতে দেখা যায় তাতে করে দেশে ও জাতির প্রাণে যে সুর পৌঁছয়, যে রং ধরে তার ছন্দ ছাঁদ সমস্তই পুরাকালের গানের টান টোন ভাব-ভঙ্গীর ব্যর্থঅনুকরণ তখন মনে আসে যে পুরোপুরি অতীত-মুখীন্ শিক্ষা নিয়ে বর্ত্তমান জাতিকে অতীতের আবছায়া বাজির তামাসা দেখাতে পারগ ছাড়া সত্যি কাযের লোক করে তোলা যায় না।

দেবী বীণাপাণি কালে কালে নিজের হাতের বীণা একটির পর একটি বর-পুত্রকে দিয়ে আসছেন, প্রত্যেকবার গুণী কবি তাঁরা একটি একটি নতুন তার চড়িয়ে তবে বাজাচ্ছেন সেই বীণা—পুরোণো তারে পুরোণো বীণা ভাল বাজে না নতুন তারে বাজে সে চমৎকার। সরস্বতীর বীণার তার প্রত্যেক বারে বদল হল, বিচিত্র সুর দিয়ে চল্লো নতুন নতুন গুণীর হাতে, নারদের বীণায় নারদ ছাড়া কারো হাত পড়্লোনা, সেই পুরোণো তার সুরও সেই সেকালেও যা একালেও তাই রয়ে গেল।

সেদিন আমার এক ছাত্র তার মামাতো প্রমাতামহের প্রপিতামহের আঁকা ছবি নিয়ে এল, আমি কাযটা ছাত্রের হাতের বলে ভুল করে বল্লেম—এটাতে, আমার ছাত্র ভারি, খুসি হয়ে উঠলো, তার নামের আগে আমি যে একটা চন্দ্রবিন্দু টেনে দিলেম সেটা সে দেখতেই পেলে না।

এমনি আর একদিন আমার সামনে আর এক ছাত্র ঠিক একখানি বিলাতি ছবি এনে বল্লে সেটা তার কায, আমি তার নামের আগে শ্রীযুক্ত কথাটি উড়িয়ে দিয়ে ছোট করে বসিয়ে দিলেম মিষ্টার এবং দু-একটা মিষ্টি কথা দিয়ে খুসি করে বিদায় করলেম—ঘরের ছেলে ঘরে গেল আনন্দে।

আমার দেশের যখন একদিকে পদ্মফুল কেবলি আউড়ে চল্লো দাশরথী রায়ের পদ্ম আর ভ্রমরের পাঁচালী, অন্যদিকে হয়ে গেল নীল আকাশ স্কটল্যাণ্ডের ব্লু-বেল ফুলের নীল সুরে বিদেশিনীর

চোখেরপ্রায় নীল, অথচ লোকে বল্লে ভালই হল ভালই হল, ভাল হলনা একথা গোপনে কিন্তু লেখা হয়ে গেল যমরাজের দরবারে চিত্রগুপ্তের খাতায়।

কাক এক কৌশলে বাসা বাঁধছে বক স্বতন্ত্র রকমে বাঁধছে বাসা। এই কৌশল নিয়ে কি কাকে বকে এ জাত ও জাত বলে আপনাদের পরিচয় দিচ্ছে। কোকিল বাসা বাঁধেই না, কাকের বাসায় ডিম পাড়ে অথচ তার সন্তান কোকিলই থাকে। আমাদের এই জাতিটা আগে তুলোট নয় তালপাতায় সংস্কৃতে পুঁথি লিখতো এখন লিখেছে—বিলাতি কাগজে, বিলাতি শ্লেটে ইংরাজিতে, এতেই রচনার জাতঃপাত হল এটা ভাবা ভুল। হীরকের ধাঁচাটা চেপটা কি গোল, এ নিয়ে তার জাতিভেদ হয়না, তার জ্যোতির হিসেব ধরে বিচার। রচনার প্রাণটি হচ্ছে আসল জিনিষ যা থেকে পরিচয় পাই এটি ভারতীয় না অ-ভারতীয়।

মস্ত একটা সোলা টুপির মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবন ধরা পড়ে পালিত হচ্ছে, তুলো নেই কাঁথা নেই ঝুলনো নেই কপাটি খেলা নেই সরিষার তেল নেই ক্ষীরের ছাঁচ নেই, পুরোনো চুষি কাঠির বদলে বেবি-প্যাসিফায়ার ধরা হয়েছে তার জন্যে, কিন্তু তবু তার ডাক যদি না সে বদলায় সাড়া যদি ঠিক দেয় তবে জানবো সে জাত হারায় নি। জাতীয় ছবি মূর্ত্তি কবিতা সবার ডাক আছে সাড়াও আছে, সেই সাড়া নিয়ে তাদের জাতিভেদ ধরা পড়ে রসিকের কাছে; প্রাণে পূবের সাড়া পৌঁছালো না পশ্চিমের আজকের না কালকের অথবা বর্ত্তমান দিলে অতীতের সাড়া কিনা এই নিয়ে জাত বিচার হয় রচনায়। শিল্প বল, সাহিত্য বল, ধর্ম্ম কর্ম্ম যাই বল সবার জাতীয়তা প্রাণের সাড়ার সঙ্গে যুক্ত বাইরের ভৌতিক বা আধিভৌতিক জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জামের ধুমধামের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই।

সোনাকে বিশেষ কোন একটা রূপ দিতে হলে ছাঁচে ঢালতে হয় কিন্তু সেই ছাঁচের এমন গুণ নেই যে রূপোকে সোনা করে, তেমনি জাতিকে বিশেষ একটা গঠন দিতে হলে জাতীয় শিক্ষার ছাঁচ দরকার কিন্তু সেই ছাঁচকে কিছু সৃষ্টি করার স্বাভাবিক উপায় বলে ভুল করা সোনা গালাবার মতিটাকে সোনা সৃষ্টি করার উপায় বলে ধরে নেওয়া! সোনা আপনি তৈরি হয় স্বভাবের নিয়মে, মানুষের হাতে গড়া সোনা সে জাত সোনা নয়—সে ক্যেমিকাল সোনা!

কাঁচা সোনার রং পায় পিতল কিন্তু সোনার গুণ তাতে পৌঁছায় না হাজারবার সোনা জাতীয় শিক্ষার ছাঁচে ঢাল্লেও। পুড়িয়ে পিটিয়ে লোহাকে ইস্পাত করা যায়, পিতলকে ছুরির আকার দেওয়া দেওয়াও চলে কিন্তু ইস্পাতের গুণ পিতলে পৌঁছায় না। মানুষ অদ্ভুত কৌশলে লোহাকে বাতাসের উপরে উড়িয়ে দিয়েছে পাখীর মতো কিন্তু সেই লোহাতে পাখীর প্রাণ পৌঁছে দেবার সাধ্য মানুষের কোনো যুগে হবে বলে বিশ্বাস করে কি কেউ?

'স্বভাবো মূর্দ্ধনীবর্ত্ততে'—মন গড়া শিক্ষালয়, চিরাগত কতকগুলো প্রথা ধরে শিক্ষালয় জাতির বা মানুষের মন বুঝে সে শিক্ষা ব্যবস্থা করা গেল তাকেই বল্লেম জাতীয় শিক্ষা। সার্কাসের

জানোয়ারগুলো এক রকমের শিক্ষা পেয়ে প্রায় মানুষের মতো চলা ফেরা বলা কওয়া করে কিন্তু সে শিক্ষার মূলে স্বাভাবিকতা নেই। বেরাল স্বভাবের নিয়মে যে জাতীয় শিক্ষা পায় তাতে ইঁদুর ধরতে মজবুত হয়ে ওঠে, সে দুধ খেতে শেখে, মুড়ো চুরি করতে শেখে, প্রাণের দায়ে এও স্বাভাবিক শিক্ষার ফলে ঘটে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেয় বেরাল কিন্তু যে শিক্ষায় বেরাল বসতে শেখে চৌকিতে যেতে শেখে, টেবেলে বাজাতে শেখে হারমোনিয়াম সেই মনুষ্য জাতীয় শিক্ষা বেরালের পক্ষে জাতীয় শিক্ষা বলা যেতে পারে না।

জাতীয় শিক্ষা স্বভাব বুঝে যেখানে চল্লো সেখানে ঠিক শিক্ষা হল আর যেখানে সে শিক্ষা সার্কাসের ঘুরপাক ধরে চল্লো সেখানে জাতি বড় একটা কিছু লাভ করতে পারলেনা, সার্কাস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তারও কাজ ফুরিয়ে গেল এবং এমন উপায়ও রইলো না যাতে করে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থা পেয়ে যায়।

আমাদের জাত যদি সেকালের মধ্যে ধরা থাকতো,—যেমন বেরাল জাত ধরা আছে, এখনো সেই পুরাকালে ষষ্ঠিমাতার পায়ের কাছে,—তবে কোন রকম শিক্ষা দিলে এদেশের কলাবিদ্যার পুনরাবির্ভাব হতে পারে এসব কথা ভাববার অবসরই হতো না। কিন্তু মানুষজাত যে কালে কালে তার বাইরের সঙ্গে ভিতরটাও বদলে চলেছে, এক কালের নরপিশাচ আর কালে হচ্ছে নরদেব, কাযেই দেখি সেকালের শিক্ষা তা একালে চালাতে পারা যায় না অটুটভাবে। জাতীয় শিক্ষার মধ্যে নানা শিল্পকলার স্থান আছে এটা এখন আর কেউ অস্বীকার করে না, যদিও জানি যে তপস্যা সাধনা প্রতিভা এসব না হলে কবিও হয় না শিল্পিও হয় না কেউ—কাযেই আমার দেশের চিত্র মূর্ত্তি কবিতা গান নাচ নাটক খেলা ধূলো ইত্যাদির যে কুলানুগত নানা প্রথা কালে কালে জমা হয়েছে এবং দেশাচার গত যে সমস্ত ব্যবস্থার ছাপ তাতে পড়েছে সেগুলো দেখে শুনে হিসাব ঠিক করে তবে আজকের আমাদের জাতিকে শিক্ষা ব্যবস্থা করে নিতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা জায়গায় এসে সমস্ত ব্যাপারটা ঠেকে—সেটি হচ্ছে একাল। প্রাচীন জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার আজকের কালানুযায়ী হল কিনা সেইটেই দেখবার বিষয়। সেকালের অনুকরণে একালের ছেলেরা মেয়েরা ছবি আঁকলে পাঁচালী গাইলে চরকা কাটতে বসে গেল—এ হল জাতীয় প্রদর্শনীতে মেডেল পাবার মতো করে শিক্ষা দেওয়া, একে জাতীয় শিক্ষা নাম দেওয়া যেতে পারে না—এক জাতীয় এবং এককালীন শিক্ষা বল্লেও বলা যায়। কোনো জাত এবং কোনো জাতের কোন কিছু এমন করে বড় হয় না। জাতীয় শিক্ষা সত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন কালের সত্যকে সে মেনে চলে, যে জাত শিক্ষায় দীক্ষায় সেকালকেই মেনে চল্লো সে জাত কোনো দিন সকালের মধ্যে জাগলোনা—দেশ জোড়া অকালের মধ্যে তার যথাসর্ব্বস্ব ক্ষয় হয়ে গেল।

আগে গাছ বাড়লো তবেতো তার ফল ফুল, তেমনি আগে জাত বাড়লো তবে তার শিল্পকলা ইত্যাদি কথা তর্কের মুখে বক্তৃতার তোড়ে প্রায়ই শুনি এবং হয়তো বলেও থাকবো কিন্তু হঠাৎ

মনে পড়লো যে, ফলন্ত ফুলন্ত বীজ বলে একটা পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটিই তাল, তমাল, বট, অশ্বত্থ হয়ে বাড়ে। মালি না থাক্‌লেও ফলন্ত বীজ গাছ হয়ে বাড়তে থাকে আপনার রস আপনি খুঁজে নিয়ে, কিন্তু অফলন্ত বীজ যদি হয় তবে সার মাটিতেও নিষ্ফলা রয়ে যায় সেটি।

শিশু দাঁত নিয়েই জন্মায়, শুধু দাঁত ফোটে ছেলে একটু বড় হলে, জাতির মধ্যে তেমনি জাতিটার যে সব বিকাশ ভবিষ্যতে হবে তা ধরা থাকে, কালে সেগুলো ফুটতে থাকে ভাল মন্দ আবহাওয়ার বশে। কোনো ছেলের কথা ফোটে আগে, কোনো ছেলে কথা বলে দেরীতে কিন্তু যে ছেলে বোবা তার কথা বড় হয়েও ফোটেনা, বুড়ো হয়েও ফোটেনা—যতই কেন ভাল আবহাওয়ায় সে থাকুক না।

বয়সে দাঁত পড়লো চুল পাকলো, দাঁতও বাঁধালেম চুলও কালো করলেম দুটোই সৌখীন জিনিষের মতো—শিকড় গাড়লোনা জীবন্ত মানুষের রক্ত-চলানের ক্ষেত্রে—এই ভাবে জাতীয় শিল্প সঙ্গীত কবিতার রং ধরানো যায় একটা বুড়ো জাতির গায়ে কিন্তু সেই কৃত্রিম রংতো টেঁকেনা বেশীদিন এবং সেটা দিয়ে জাতির জরা এবং মরার রাস্তাও বন্ধ করা চলেনা একদিনও।

যেখানে জাতীয় জীবন বলে একটা কিছু নেই সেখানকার মানুষগুলির সঙ্গে কতকগুলো শিক্ষাগার, পাঠাগার, কর্ম্মশাল, ধর্ম্মশাল, আখড়া, আড্ডা, আশ্রম, ভবন ইত্যাদি যেন তেন প্রকারেণ জুড়ে দিলেই যে ঠিক ফলটি পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই! মরা আম গাছে নাইট্রোজন্ বৃষ্টি করে আঁকসী হাতে বসে ফল পায় কি কেউ?

জাত দু'তিন রকম আছে যেমন—স্ক্রুপ্ জাত অর্থাৎ জাতে বড় গাছ কিন্তু এক বিঘতের বেশী তার বাড় নেই, ডালপালাগুলো চীনের পায়ের মতো বিষম বাঁকা চোরা—দেখতে গাছের মতো ঝাঁকড়া কিন্তু ফল দেয়না, ফুল দেয়না, ছায়া দেয়না, টবে ধরা থাকে। আর একরকম জাত স্কোপ্ জাত বা মৃত জাত—শুকনো গাছ অনেক কালের মরা কাট দেশ বিদেশে পাখী কাঠ-বেরাল, বন-বেরাল কাগা বগার খোপ আর দাঁড়ের কায করছে। স্ক্রুপ্ জাতের সুবিধে আছে যে কোন গতিকে টব থেকে ছাড়া পেলে সে তেজে বেড়ে উঠতে পারে, স্কোপ্ জাতের সে সুবিধে নেই, স্কোপে খাপে ফোঁপরা কাঠ তাতে টেবেল চৌকি ও তৈরি হয়না, জ্বালাতে গেলে ধুয়া হয়, শুধু সেটা নিয়ে দেহতত্বের এবং জাতিতত্বের নানা গভীর কথা সমস্ত আলোচনা করা চলে। একদিকে বাড় হারানো বড় জাত, অন্য একদিকে বাড় দাবানো বড় জাত, ভারতবর্ষী জাত বলতে এ দুটোর কোনটা তা বলা শক্ত। আমি দেখি আমাদের আজকের জাতীয় জীবনটা এই দুয়ের খিচুড়ী। ছিল জাত হবিষ্যান্ন জীবি, হল ক্রমে খেচরান্নজীবি! আগের জাত ভাল ছিল এখন হল মন্দ একথা আমি বলিনে। জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী কেউ তাকে ঠেকাতে পারেনা; কালের উপযোগিতা অনুপযোগিতার নিয়ম মেনে তবে বাঁচে জাত। আর্য্য জাতি এককালে ছিল আম মাংসভোজী তারপর খেতে সুরু করলে আমানি

এবং এখন খাচ্ছে আম আমানি তুইই, একই জাত শুধু কালের পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়ে ভিন্ন চেহারা ধরছে—এটার জন্যে ভাবনা নেই, শুধু এইটে ভাববার বিষয় এই জাতটির জীবনী শক্তির দৌড় বাড়ের দিকে, না তার উল্টোদিকে! আজ যদি কেউ আমাকে বলে হবিষ্যান্ন ধরলেই তুমি ঠিক তোমার আগেকার তাদের শিল্পকলার বিশুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই পেয়ে যাবে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত বিশুদ্ধ কবিতা বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং বিশুদ্ধ বর্ম্মকাণ্ড সমস্তই এসে যাবে দেশে ও জাতির কবলে, তবে তাকে এই কথাই তো বলবো যে, কালকের মতো হয়ে পড়ার জন্য মাতুলী ধারণ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? সেকালের রক্ষা কবচ একালের জীবন সংগ্রামে তো কাযের হবে না, সেকাল রাখলে যে একাল যায় তার কি? নদীর জাত বাঁচাতে গিয়ে নদীর চলাচল বন্ধ করায় কোন লাভ? চীনদেশ ভোজনবিলাসী তারা তিনশত বছরের হাঁসের ডিম খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে কিন্তু তা খিয়ে প্রাচান চীনের শিল্প সম্পদ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করে না একেবারেই—সখ হয় তাই খায়। সুস্বাদু বলে।

পুরোণো চাল ভাল, পুরোণো শাল ভাল, পুরোণো কাঁথা তাও ভাল, সকল ভাল জিনিষের ভাণ্ডার বলতে পারো আমাদের প্রাচীন আমলকে, অতএব পুরোণো হয়ে যাওয়া যে ভাল একথা তো কেউ বলছেনা আমরা ছাড়া!

আজকের কালে প্রাচীন শিল্পের আদর যথেষ্ট দেখে দলে দলে কেউ বৌদ্ধযুগের কেউ মোগল আমলের মতো ছবি মূর্ত্তি গান বাজনা ইত্যাদি করতে বসি শুধু এই নয় পুরাণের পাতা থেকেই কেবল ছবি মূর্ত্তি হাব ভাব ইত্যাদিও হুবহু নিয়ে কায করতে লেগে যাই তাহলেই বা কি হবে? এইভাবে সাময়িক আদর বা অনাদরের বিচার করে চলায় ব্যবসার বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে করে রসবোধ জাগেনা জাতির অন্তরে এবং জাতীটাও এতে করে নিজের শিল্প সম্পদ পেয়ে ধন্য হয়ে যায় না!

জাতিটাকে যখন চোরঙ্গীবাতে ধরলো তখন তার হাতে পায়ে বুকে পিঠে পুরোণো ঘি মালিস করে দেখা গেল—বেশ চলে ফিরে বেড়াতে লাগলো সে, তাই বলে পুরোণো ঘিয়ে লুচি ভেজে তাকে তুষ্ট ও পুষ্ট করা তো চল্লোনা—যে কবিরাজ পুরোণো ঘীয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই তখন বল্লেন টাটকা গাওয়া ঘীয়ে লুচী ভাজতে!

আজকের হাঁস তিনশো বছর আগেকার ডিম পাড়বার সাধনা করবার আয়োজন করে বসলে পরমহংস বলে তাকে ভুল করেনা কেউ, তেমনি আজকের জাত কালকের শিল্পের ভূত নামাতে শব সাধনার আয়োজন করছে দেখলে তার সিদ্ধিলাভের পক্ষে সন্দেহ অনেকখানি থেকে যায়।

আজকের সঙ্গে কালকের নাড়ির সম্বন্ধ আছে। আজকের শিল্প কালকের শিল্পের উপরে বসে পদ্মাসনা, শবাসনা এটা সত্যি কথা কিন্তু এই শবাসনার সাধনায় অনাচার ঘটলে ভূত প্রেত এসে সাধকের ঘাড় ভাঙ্গে, সিদ্ধিদাত্রী বরদা আসেন না এটা জানা কথা। শবাসনার জন্যে

ব্যস্ত নয় শব খুঁজছি কেবলি এতে করে অতীতের ভূতের কবলে পড়ে কর্ম্ম পঙ্গু হওয়া বিচিত্র নয়! সাধাসাধি করে হাতে পায়ে ধরে লোককে দিয়ে কায হয়, মেরে ধরেও কার্য্যসিদ্ধি করিয়ে নেওয়া চলে কিন্তু সে কায কার কায, সে সিদ্ধি কার সিদ্ধি—যে সাধছে বা যে মারছে কেবল তারি নয় কি? আমার কথায় ভুলে বা ধম্‌কানি শুনে যদি আজ দেশ শুদ্ধ ছবি মূর্ত্তি গড়তে লেগে যায় আমি যেমনটি চাই তেমনি করে তবে তার ফল দেশ পাবে না দেশের যারা আমার কথায় উঠলো বসলো তারা পাবে? আমার খেয়াল মতো আমি লোক লাগিয়ে ঘর বাঁধলেম সে ঘর আমার ঘর হল আমি তার আশ্রয় পেলেম ছায়া পেলেম মিস্ত্রী মজুর তারা ঢুকতেই পেলে না বৈঠকখানায়। গুরু হাত ধরে নিয়ে গেলেন শিষ্যকে শিল্পজগতে সেই যথার্থ গুরু, গুরু ঘাড় ধরে শিষ্যকে বল্লেন আমার আজ্ঞানুবর্ত্তি হয়ে যেমন বলি তেমনি চল সে গুরু গুরুমশাই তিনি নিজের বেতন বাড়িয়ে গেল ছাত্রের দৌলতে।

আগেও ছিল এখনো আছে এক একটা লোক জাতের কর্ত্তা হয়ে ওঠে তারা, যার জাত নেই তাকে জাত দিতে জানে না, যে জাত ঘুমোচ্ছে তাকে জাগাতে হলে কি করা উচিৎ তাও জানে না, জাত মারবার ফন্দিই তাদের মাথায় ঘোরে পাশাঙ্কুশ হস্তে তারা যমরাজের মতো বসে থাকে—জাতকে বাঁধবার পাশ, জাতকে মারবার অঙ্কুশ, দুই অস্ত্র সর্ব্বদা উঁচিয়ে।

আগেও ছিলেন এখনো আছেন অন্য এক একটি লোক তাঁরা বরাভয় হস্তে বুদ্ধদেবের মতো দ্বারে দ্বারে হেঁটে বেড়ান সমস্ত মানবজাতির হাতে ভিক্ষা নিয়ে তাঁরা জগৎবাসিকে ধন্য করে যান অভয় দিয়ে নির্ভয় করেন, বর দিয়ে শক্তিমান করেন। ঘুমন্ত জাতি মুমূর্ষু জাতির আশার প্রদীপের শিখা এই সব জাগ্রত মানব আত্মা যাঁরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলো বহন করে আনেন।

কালসূত্রে ধরা রইলো কালকের সকালের সঙ্গে আজকের সকাল, কালকের জাতির সঙ্গে আজকের জাতি, কাব্যকলা সঙ্গীতকলা শিল্পকলা জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনটিও তেমনি কালসূত্রে গাঁথা রইলো—বেজোড় মুক্তা! আজকের আমাদের জাতির উপরে সবচেয়ে যে বড় দায়িত্ব তা হচ্ছে—এই অতীতকালের মালায় যে বেজোড় মুক্তা দুলছে তার সঙ্গী আর একটি কালসূত্রে গেঁথে যাওয়া, আমাদের জীবন কেমন জিনিষটা ধরে গেল আগেকার জীবনের পাশে, এই নিয়ে আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের গুণপণা, বিদ্যা বুদ্ধি, সমস্তেরই বিচার করবে। অতীতের পাশে আজ আমরা যাই ধরি, কাচই ধরি মাটির ঢেলাই ধরি কালে সেই আজকে ধরা তুচ্ছ জিনিষ তাও মালার একটা অংশ ধরে থাকবেই—চাঁদের কোলে কলঙ্কের মতো। পরবর্ত্তী কেউ এসে অনুকূল সমস্ত প্রবন্ধ লিখে কিম্বা মাটির ঢেলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে হয়তো আমাদের আজকের তুচ্ছ কায সমস্তের গভীর অর্থ বার করে ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবে কিন্তু এমনো লোক থাকবে সেদিন সজোরে এই ঘোরতর রকমে মালা মাটি

করাটাকে অভিসম্পাৎ দিয়ে আজকের আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে চলবে ক্রমাগত। এই ভাবে হয়তো কতকাল—তা কে জানে মালা ফিরবে অনুকূল প্রতিকূল জাতি তত্ত্ববিদ্ জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয় শিল্প সমালোচক প্রভৃতির হাতে—মাটির ঢেলার পাশে আর একটি দানা তারা গাঁথবেনা, শুধু হাওয়াই গেঁথে যাবে দিনের পর দিন—তারপর হঠাৎ একদিন সারা দেশ সমস্ত পৃথিবী দেখতে পাবে হয় তো——মাটির ঢেলার পাশেই হঠাৎ আর একটি অপূর্ব্ব সুন্দর জীবন বিন্দু ধরা পড়েছে কালসূত্রে। এই জীবন বিন্দু জাতীয় কোন রকম শিক্ষাগার হাঁসপাতালের ল্যেবোরেটারী, লাইব্রেরী, ইউনিভারসিটি কিম্বা সিটি ফাদারদের চা খাবার পেয়ালায় কিম্বা আর্ট স্কুলের রংএর বাটির মধ্যে জন্মায়নি, মহাকাল একে সবার অসাক্ষাতে জন্ম দিয়েছে কোনো এক লোকের বুকের বাসায়, তারপর একদিন সেই একটি লোকের জীবন ও বিন্দু মহাকালই নিংড়ে নিয়ে ধরেছে নিজের বিজয় মালার মধ্যে।

এই যখন হ'ল তখন এল জাতি বিচার করে ভেবে চিন্তে একটা মহসভা ধুমধামে বসিয়ে জাতীয় কবি জাতীয় শিল্পী জাতীয় যে কেউ তার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলতে বার হ'ল এবং জাতীয় গৌরব অনুভব করার আয়োজন সার্থক করার চেষ্টায় কোথায় ন্যেশানাল কনসার্ট, ন্যেশানাল থিয়েটার, ন্যেশানাল হোটেল আছে সেখানে বায়না দিতে ছুটলো ও কাযটা যাতে ন্যেশানাল রকমে হয় তার জন্যে একটা রেজোলিউসান পাশ করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেল্লায়। রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে—মহাজাতি, মহাকাল দৈত্যের মতো, তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে—কে জাগে? রাজকুমারী সাড়া শব্দ দেন না, সাড়া দেয়, যে পাহারা দিচ্ছে মহাজাতির শিয়রে—কে জাগে—সওদাগরের পুত্র জাগে! কাল নিরস্ত হয় আবার আসে দ্বিতীয় প্রহরে, কে জাগে—মন্ত্রীপুত্র জাগে! তৃতীয় প্রহর যায় কাল ফিরে এসে বলে কে জাগে—কোটালের পুত্র জাগে! রাত শেষে অন্ধকার পাত্‌লা হয় কাল ছুটে এসে বলে কে জাগে—কে জাগে—রাজপুত্র জাগে!

বারে বারে এইভাবে মানবজাতি ঘুমোয়, জাতির শিয়রে জাগরণ বসে থাকে—কালের কবল থেকে তাকে বাঁচাতে, সকাল হলে এদের কায শেষ হয়ে যায়। এদের রাতের গাঁথা অসমাপ্ত মালা রাজকুমারীর ঘরের দুয়োরে পড়ে থাকে, সে মালা মহাজাতি-সাহাজাদীর হাতে গাঁথা মালা নয়—সে চহার দরবেশ তাদের জপমালা, রাজকুমারী তাকে অনেক সময় মাড়িয়ে চলে যান নিজের গরবে, হয়তো বা রাজকুমারীর দাসী সে পেয়ে যায় সে মালা ঘর ঝাঁট দিতে, কিম্বা ঘরের দুয়োরে আলপনা টানতে বসে, অথবা এমনি চলে যেতে যেতে!

জাতির সঙ্গে শিল্পী কবি এদের যোগ জাগ্রতের সঙ্গে ঘুমন্তের যোগ জাতির চোখে ঘুম আসে এদের চোখে ঘুম নেই, জেগে থাকে এরা একলা একলা বসে খেলে এরা, একলা মালা গেঁথে চলে বীণা বাজায় গান গেয়ে বলে—

"ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক পারে।
স্বপন বাধা টুটি
বাহিরে এল ছুটি
অবাক আঁখি দুটি
হেরিল তারে
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুহারে
তারে যে বেঁধেছিনু সে মায়া হারে
নীরব বেদনায়
পূজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায়
বন্দনা রে!" (রবীন্দ্রনাথ)

জাতীয় অনুষ্ঠানের ফলে দেশে বড় শিল্প, বড় কাব্য আসেনা—বড় বড় বাড়ি আসে, মন্দির আসে, মস্ত জনতা আসে, মস্ত কোলাহল সবই মস্ত প্রকাণ্ড ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে আসা যাওয়া করে, কিন্তু যা কিছু সত্য বস্তু জাতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়, তা ফুলের মধ্যে মধুর মতো স্বাতী নক্ষত্রের চোখের জলের মতো গোপনে নেমে আসে অদৃশ্য লোক থেকে; তার আসা যাওয়ার পথের চিহ্ন পড়েনা দেশের বুকে, যার কাছে আসে তার বুকেও সে গোপনে আসে, দেশ কালের অতীত এক দেশ থেকে, সে ডাক দেয় কবির প্রাণে, সে সাড়া পৌঁছে যায়। কবি বলেন—

—"ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওয়ত ছাতিয়া" এ কোন ডাক পাখি এ কোথা থেকে আসে যার ডাক শুনে প্রাণ ফাটে! এ কি জাতীয় খালের কাদায় বাসা বাঁধে? স্বদেশী পাখি ধরার ফাঁদে একে কি ধরা যায় না? হেনরী মার্টিনের বন্দুকে একে আকাশ থেকে পাড়া চলে খানার টেবেলে? এ একের প্রাণে সে বসন্তকালের সমীরণ বইলো তাই ধরে আসা যাওয়া করলে কালে কালে দেশে দেশে বারে বারে দেশের কবি গাইলে এই ডাক পাখির উদ্দেশে—

"তুমি কোন পথে যে এলে পথিক
দেখি নাই তোমারে
হঠাৎ স্বপন সম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে।" (রবীন্দ্রনাথ)

লোকারণ্য তার একধারে হঠাৎ আগমনী বেজে উঠলো, জাত জানেও না সোনার তরী এসে গেছে পসরা বয়ে নতুন অতিথিকে বয়ে, মস্ত জাতির বিনা বেতনের চাকর কবি শিল্পী এরা ছুটে

গেল অতিথির অভ্যর্থনা করতে, অতিথি তাদের ধন্য করে গেল ; জাত তার কোন খবরই নিলে না। বিদায় বেলায় দেশের কবিই একা তাকে বল্লেন—

তোমার সেই দেশেরি তরে
আমার মন যে কেমন করে
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে।

অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়ার আড়গোড়ার একটা সাহেব সমুদ্রের উপরে সূর্য্যাস্তকে তাদের স্বদেশী সন্ধ্যা বলে বর্ণন করেছিল আমার এক বন্ধুর কাছে, সে হিসেবে আর্টকে বলা চলে ন্যেশানাল কিন্তু আসলে আর্ট তা নয়, সে পথিক তারা বাসা জাতীয় আগারে নয়, তার পথ জাত দেবতার রথচক্র লাঞ্ছিত বড় দাণ্ডাও নয়, ছোট গলিও নয়, ঠিক ঠিকানা সব নিশানা হারানো পথে বিস্ময়কর অপূর্ব্ব দর্শন সে কবিকে বলায়—

"কোন দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা
কোন গানের সুরের পারে, তার
পথের নাই নিশানা। (রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবত্র

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অরুন্ধতী তাঁহার শয্যায় মুখ ঢাকিয়া শুইয়াছিলেন। মুখের কাছে করুণা বসিয়া মাথায় বাতাস দিতেছিল। "মা" বলিয়া ডাকিয়া সনৎ তাঁহার পায়ের কাছে বসিতেই তিনি একটা হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন মাত্র, একটী কথাও কহিতে পারিতেছিলেন না। হাতটা নিজের মাথায় ও মুখের উপর বুলাইতে বুলাইতে সনৎ বলিল "এবার আর হয়ত তোমায় ছেড়ে শীগ্‌গীর দূরে যাবার দরকার হবে না মা, মীরা আর অরুণদা শুনছি আমাদের কাজে লেগেছে।"

"অরুণ যে আমায় ছেড়ে গেছে সন্টু,—মীরার জন্য সে—তুই সব আগে তোর কাকিমার যা সাধ তাই আগে মিটিয়ে দে,—সে অন্ধ—অন্ধ—"

বলিতে বলিতে অর্দ্ধপথে থামিয়া অরুন্ধতী হাঁপাইতে লাগিলেন।

সনৎ এসে মায়ের অপর পার্শ্বে মুখের নিকটে গিয়া বলিল "অরুণ কোথায় যাবে? যাক্ দেখি তার কত বড় সাধ্যি! ঐ ছাখ সে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাকিমা কই করুণা? ডাক্ দেখি তাঁকে! আমি এসেছি তাও তাঁর দেখা নেই যে?"

কক্ষান্তর হইতে ম্লানমুখে সরস্বতী আসিয়া দাঁড়াইতেই সনৎ উঠিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। তারপরে অভিমানস্ফুরিত মুখে বলিল "বেশ যা হোক্-মা বটে। কতক্ষণ এসেছি তবু সাড়াই নেই।"

"সণ্টু আমি বুঝ্‌তে না পেরে—"

"সে যা হয়েছে হয়েছে এখন সে কথা ছেড়ে দাও। তোমার ঐ মেয়েটিকে বুঝ্‌তে পারা তোমার সেই চক্রবর্ত্তী বাবার সাধ্যিতে কুলোবেও না—এতে তোমারই বা দোষ কি! এবার আমরা ভাল ক'রে কাজে লাগ্‌ব, তার আগে শিগ্‌গীর মীরার বিয়েটা দিয়ে নিতে হবে। এবার আর তুমি সে দশ হাজারী জামাই পাবেনা বাপু। একে পরের হাতে দিলে আমার কাজও চল্‌বে না। ওকে—"

"সণ্টু—না—না—আমার অরুণকে অত অনাদরে আমি বিলিয়ে দিতে দেব না। ওকে যেতে দাও, অরুণ যাক এখন এখান থেকে। তুমি তোমার কাকিমা যাকে পছন্দ করেছেন সেই বর এনে আগে মীরার বিয়ে দাও—"

"দিদি" সরস্বতী অরুন্ধতীর শয্যার নিকটে নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল, "চিরদিনই সব দোষ মাপ করে এসেছ আজও কর! আমি যে বুঝ্‌তে পারিনি। মেজবৌ মীরাকে পরীক্ষা দিতে পাঠাতে পার্‌লেই সব ঠিক্ করে নেবেন একথা লিখেছেন তোমায় বল্‌তেই তুমি যে অরুণকে"—

উত্তেজিত ভাবে অরুন্ধতী তাঁহার রোগশয্যা হইতে মাথা তুলিয়া সরস্বতীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "সরিয়ে দেব না? এমন অন্ধ যে, তাকে কেন আমার অরুণকে দেব? চিরদিন এইই দেখে আস্‌ছি তোমার—আজ নিজের মেয়ের বিষয়েও ঠিক তেমনিই অন্ধত্ব!"

"মেয়ের বিষয়ে কি বল্‌ছ দিদি—আমি কি অরুণকে চাই নি? জিজ্ঞাসা কর তোমার মেয়েকে! ও মেয়ের দায়ে আমার কি অরুণকে পাবার আশা কর্‌বার উপায় ছিল? ওযে—"

"ওটা অমনি বটে—কাকিমার দোষ নেই মা সত্যিই। ইলা ওকে নিয়ে এসতো, ওদের কাজ দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছি জায়গাবিশেষে পাত্রবিশেষে দুজন হ'লেই অনেক কাজ ভাল চলে। মীরাও তা নিশ্চয় এখন বেশ বুঝেছে—তবু সহজে চিরদিনের স্বভাব তো ছাড়তে পার্‌ছে না। ওর দুষ্টুমি আমি ঘুচিয়ে দিচ্চি। আর অরুণদা, তোমারও মাথা ঠিক কর্‌বার সময় এসেছে! বারে বারে ছেলে মানুষী চলে না। আমাদের ঢের কাজ আছে।"

অরুণের হাতের উপর মীরার হাতটী তুলিয়া দিয়া সনৎ বলিল "মা উঠে বসে আশীর্ব্বাদ কর, আর ভাল হয়ে ওঠো! তুমি না ভাল হলে তোমার ছেলে মেয়েরা কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না যে। কাকিমা—এদিকে এসো, মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।"

"সন্টু আগে আমি তো মীরা অরুণকে আশীর্ব্বাদ করবনা—আগে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে চাই! তোরই একটা অন্যায় কাজের জন্য দিদি এমন অকালে বিছানায় শুয়েছেন। ওঁকে যদি বিছানা থেকে তুল্‌তে চাস্ আরও একটা কাজ তোকে কর্‌তে হবে। বাবার ইচ্ছাই যে শেষে সকলের ওপর জিত্‌ছে তাকি দেখ্‌ছিস না? কেন আর মেয়েটাকে এমন জ্যান্তে মরা করে রাখিস্? নে তুইও করুণাকে ধর সনৎ,—আমাদের চিরকালের আঁধার ঘর আবার আলো হয়ে উঠুক।"

মীরা ও অরুণের হাত ছাড়িয়া দিয়া সহসা স্তব্ধভাবে সনৎ দাঁড়াইল। মুখ হইতে অস্ফুটে বাহির হইল "কাকিমা"! কাকিমার হাতে তখন করুণার হাত; তাহাকে একরকম জোর করিয়াই তিনি সনতের দিকে টানিয়া আনিতেছিলেন। সনতের এই অস্ফুট বাক্য যেন একটা বিপন্নের কণ্ঠস্বরের মতই শুনাইল, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে করুণার কম্পিত দেহ যেন কাঠের মত হইয়া নিজের গতিকে বাধা দিবার জন্যই দেয়ালের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। অরুন্ধতী তাঁহার জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহকে মুহূর্ত্তে টানিয়া তুলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "কি করলি ছোটবৌ, আবার হতভাগিটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌লি? কে তোকে এ কাজ কর্‌তে বল্‌লে? আমি কি ওর হাতে আমার করুকে দিতে পারি? ওযে মা বোন্ স্ত্রীর জন্য জন্মায় নি। কেন আবার মেয়েটাকে এ দুঃখ দিলি? আমার কোলে দে ওকে" বলিয়া টলিতে টলিতে অরুন্ধতী শয্যা হইতে উঠিতেছিলেন; মীরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া সরোদনে বলিল "তুমি উঠোনা জেঠিমা, এনে দিচ্চি তোমার করুকে। দাদা, বিয়ে করলেই কি আর জগতের কোন বড় কাজ করা যায় না? তুমিই না বল্‌লে জায়গাবিশেষে দুজন হলেই কাজ আরও ভাল হয়! তোমার জীবনেই কি তা এত অসম্ভব? এইই যদি তোমার প্রধান মত তবে কেন—কেন তবে—"।

সনৎ ধীরকণ্ঠে বলিল, "তবে কেন তোর বিয়ে দিলাম এই বল্‌ছিস্ তো? তার উত্তর তুই আর অরুণ দুজনে দুজনার কাছ থেকেই পাবি, কিন্তু আমার জীবনতো তোরা দেখ্‌ছিস্? মার এত অসুখ ইলার মুখে শুনেই বাড়ী এসেছি। সত্যাগ্রহের ডাক ঠেলে রেখে পাছে ঠাকুরদাদার মতন মাকেও না দেখ্‌তে পাই এই ভয়ে এসেছি,—ইলাও তোমার সেবা কর্‌তে এসেছে মা।"

অরুন্ধতী পুত্রের পানে প্রশান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কেন তা এসেছ সন্টু?—আমি তো তার জন্য একটুও দুঃখিত হতাম না! আমি তো জানি তুমি 'দেবব্রের' কাজ করছ— তোমার মাকে তোমার ঠাকুর্দ্দা যে ভার দিয়ে গিয়েছেন সেই কাজের বড় দিক্‌টাতেই আমার সর্ব্বস্ব যে তুমি তোমাকেই আমি দিয়েছি।"

সরস্বতী জায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিল "ভাই ব'লে মাকে ও একবার চোখের দেখা দেখ্‌বে না—এমন দেবতার কাজ দেবতাদেরই থাকুক; মানুষকে মানুষের কাজ করতেই হবে। আমিই একদিন করুর সঙ্গে সন্টুর বিয়ের কথায় রাগ করেছি দিদি, কিন্তু এখন সেই আমিই

বল্‌ছি—এ তোমাদের অকর্ত্তব্য। তোর জীবন দেখ্‌তে কি বল্‌ছিস সণ্টু, তোদের জীবনতো গৌরবের কিন্তু কি অগৌরবের মধ্যে দুঃখের মধ্যেই না এই মেয়েটীকে ফেলেছিস্ তুই।"

সনৎ উত্তর দিতে না পারিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অরুন্ধতী করুণার নিস্পন্দ নিষ্কর্ম্মা ক্ষীণ দেহটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রতিমার মতন নিশ্চল! ইলার শুভ্র মুখ যেন আরও সাদা হইয়া উঠিতেছিল। মীরা নিঃশব্দে একদৃষ্টে করুণার পানেই চাহিয়াছিল। এতক্ষণ পরে অরুণ কথা কহিল "কেন কাকিমা আপনি এমন কথা বল্‌ছেন? করুণা কোনো অগৌরবের মধ্যে তো নেই। সনতের জন্যে তার একটী কেন এমন দুচারটে জীবনও যদি সে উৎসর্গ কর্‌তে পারে তাতেও যে তার গৌরব! আপনাদের স্নেহের আঁচল—তার জগদ্ধাত্রী মার বুকে সে স্থান পেয়েছে তার কিসের দুঃখ?"

সনৎ অরুণের পানে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া বলিল "দাদা, তুমিই আমার কর্ত্তব্য আমায় বুঝিয়ে দাও! ঠাকুরদাদা তাঁর যে কাজের জন্য তোমাদের নিযুক্ত করে গেছেন মীরার সঙ্গে তুমি সে কাজে বেশী সাফল্য লাভ কর্‌বে—তাই সেই অভিমানী মীরা আজ স্বইচ্ছায় দেবত্রের কাজে নিজেকে নিযুক্ত কর্‌লে! কিন্তু আমায় তিনি স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন আমিতো আমার এ জীবন—"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "ভাই ভুল কর্‌ছ! তুমিই না একদিন বলেছিলে, তিনি তোমায় কি দিয়ে গেছেন তা তুমি অনুভব কর্‌ছ! আমাদের তিনি কাজের ছোট অংশ এই গ্রামটির কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করে গেছেন, আর তোমার মাকে যে প্রধান আদেশ দিয়ে গেছেন তার ভার তুমিই নিয়েছ যে! এদেশের মত দুঃখী আর কে আছে? ভগবানের আর মানুষের দেওয়া দুঃখ নির্ব্বিচারে কে মাথায় করেছে এমন? সেই দেবতার কাজে তুমি আপনাকে দিয়ে তোমার মার আর স্বর্গগত পিতামহের আত্মারই তৃপ্তি সাধন কর্‌ছ ভাই! তোমার এ স্বাধীনতা তিনি হয়ত এইজন্যই দিয়ে গেছেন।"

মীরা আবার কথা কহিল। রুদ্ধস্বরে বলিল "আরও একজন মানুষের অকারণ দেওয়া দুঃখও নির্ব্বিচারে সহ্য কর্‌ছে; সে আমাদের করুণা। দাদা তুমি মনে কর্‌ছ তুমিতো এমনি করেই দিন কাটাবে—তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ তার পক্ষে কেবল দুঃখেরই হবে না? কিন্তু এই দুঃখের ভার কি সেটুকু না দিয়েই কমাতে পার্‌বে? বরং বেশী দাদা—বেশী—" এতক্ষণ ইলা নির্ব্বাক স্তব্ধ ভাবেই ছিল এইবার একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া সনতের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল "সত্য সনৎ দাদা, অন্যায় হতে অন্যায় ক্রমশঃ বেশীই হ'য়ে যাচ্ছে। আর অন্য মত কর'না!"

"তুমিও এই কথা বল্‌ছ ইলা? তুমিই না কালই বলেছিলে তুমিও আমাদের কাজে যোগ দেবে, তোমার জীবন এখন স্বাধীন। তুমিই আজ অন্যমত কর্‌ছ! আমার এ জীবনের সঙ্গে করুণাকে গেঁথে দিয়ে কি সুখ দেবে তোমরা মনে কর্‌ছ?"

"না সনৎদা—দুঃখ, কিন্তু সেই দুঃখের অধিকারই তাকে দাও—এইটুকু মাত্র সকলে তোমার কাছে চাচ্চে! আর তুমি দ্বিধা ক'রনা!"

সনৎ মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "মা, একি তোমারো আদেশ? আমি জানি, আমিই করুণার সকল দুঃখের মূল, আমার জন্যই তার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে—কিন্তু এখন এমন ক'রে তাকে নিলে তাও কি সে সইতে পারবে? আমার দেওয়া সকল দুঃখই তো নিরাপত্তে সে মাথায় নিয়েছে কিন্তু এ ভারও কি সে সইতে পারবে! আমার কর্ত্তব্য তুমিই বলে দাও? কারও কথায় আমার আজ আর নির্ভর নেই,—কেবল তুমি বল।"

ধীরে ধীরে অরুন্ধতী উত্তর দিলেন "হ্যাঁ, করুণাকে তুমিও তোমার সকল ভার নির্ব্বিচারে চাপাতে পারবে বলেই সে জন্মেছে! তাকে তুমি সেই অধিকার মাত্র দাও—তারপরে—"

"আর কিছু বলতে হবেনা মা, দাও তবে তুমিই তোমার করুণাকে আমার ভার তুলে। বল তাকে সে যেন কাতর না হয়—সে যেন পারে—সে যেন—"

"পারবে সনৎ, চিরদিনই কি সে পারছে না?"

"হ্যাঁ, আরও পারতে হবে—আরও—"

"তাও পারবে।" ইলাকে এতক্ষণ অরুন্ধতী দেখেন নাই, এইবার সে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই অরুন্ধতী তাহার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন "আমায়ও দেখা দিতে এসেছ মা? যদিই যাই তুমি এ ক্ষোভটুকু কি আমায় দিতে পার?"

"আপনি কোথায় যাবেন? আপনাদের দেবত্রের কাজের এই তো মাত্র আরম্ভ! আপনি গেলে যে কিছুই হবে না। তবু আপনার ছেলে মেয়েরা সবাই নিজের নিজের সার্থকতা বুঝতে পেরেছে; মীরা অরুণদা আপনার ডান হাত বাঁহাত হয়ে কাজ করবে; করুণা আপনার গৃহের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মী হয়ে সনৎদাকে তাঁর নিজের সার্থকতায় উজ্জ্বল করে তুলবে কিন্তু আমি এখনো কোন কিছুই শিখিনি যে মা! আমায় শেখাও, কি করতে হবে কোন পথে যেতে হবে!—আমার আপনার লোক আজ আর কেউ নেই—কেউ আমায় আজ চায় না, আমি তোমারই সেবা করতে এসেছি পিসিমা!"

ইলাকে বুকে টানিয়া লইয়া অরুন্ধতী বলিলেন "আত্মপর নেই—জগতের সকলের সেবা কর মা তুমি! তোমাদের মত জীবনই জগতের সব চেয়ে কাজে লাগে যে মা। কে তোমায় চায় না? সকলেই আগে তোমায় চাইবে; সবাই তোমার আপনার হবে! শ্রান্তি ক্লান্তির দিনে দুঃখের দিনে তুমি সেবালক্ষ্মী হয়েই তবে জগতের প্রাণ জুড়ে থাক। নিজের কিছু যদি তোমার আর দরকার না থাকে—অনেকের অনেক দরকারেই তোমার জীবন ভ'রে উঠুক!"

সমাপ্ত

শ্রীনিরুপমা দেবী

বসন্তে ও বরিষায়

সে দিন বসন্ত প্রাতে হৃদয়ের বাতায়ন খুলি,
সুদূর দিগন্ত পানে কালো কালো আঁখি দুটি তুলি
বসেছিল কৃষক বালিকা শ্যামল পল্লির মাঠে;
স্বর্ণরবি রশ্মি রেখা সুনির্ম্মল সুন্দর ললাটে
পড়েছিল—স্বপ্নোজ্জ্বল যৌবনের উন্মেষের মত !
সুরের আঘাত হানি ধরিত্রীর ভাঙি মৌনব্রত
কোকিল পাপিয়া পাখী কুহরিল চম্পকের শাখে
পল্লবের অন্তরালে—অন্তরের গূঢ় বেদনাকে
সুর ভাষা ছন্দ দিয়া; অবসন্ন বসন্ত সমীর
যেন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ব্যথাভরা ঝরা চামেলির
উড়াইয়া পুষ্প রেণু কুড়াইয়া কুসুমের রাশি
কিশোরীরে কানে কানে কয়ে গেল এসে "ভালোবাসি,
বড় ভালোবাসি সখি!"—সেই সুরে উঠিল নাচিয়া।
রক্তের প্রত্যেক কণা—মনে হোলো প্রণয় যাচিয়া
ফিরিতেছে তারি লাগি বুঝি কোন্ দেশ দেশান্তরে
উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক এক লক্ষ যুগ লক্ষ বর্ষ ধরে !
হিল্লোলে হিল্লোলে বায়ুভরে উড়ে এলো তারি কথা ?
তারি প্রেম-নিবেদন অব্যক্ত মধুর ?—তনুলতা
শিহরিল পুলক কম্পনে—সে কী হর্ষ বেদনায় !

আর এক ঘন নীল আষাঢ়ের আসন্ন সন্ধ্যায়
স্বচ্ছনীর শীর্ণরেখা জনহীন তটিনীর তীরে
(শ্যামাঙ্গিনী ধরণীর সুকোমল বক্ষ খানি চিরে
উদ্বেলিত অমৃতের ধারা) বসেছিল কৃষক রমণী,
বালিকা নহে সে আর—এখন সে হয়েছে জননী
পিতৃহীন দুরন্ত শিশুর—তাই তারে বারে বারে
ধরে আনে, বলে—খোকা পড়ে যাবি যাসনে ওধারে !

অবোধ শোনেনা মানা চারিদিকে করে ছুটাছুটি,
জল ভারে অবনত গগনের তলে পড়ে লুটি !
তড়িৎ হানিল মেঘে জ্যোতির্ম্ময় হিজি বিজি রেখা
চিকিমিকি ঝিকিমিকি, মা শুধালো—কি লিখেছে লেখা
আকাশের স্বর্গশিশু বল দেখি ওরে মোর খোকা
মেঘের শেলেটে কালো ? ওরে ওরে তুই ভারী বোকা !
লিখেছে যে—দুষ্ট খোকা মোর শোনেনা মায়ের কথা
খালি তারে করে জ্বালাতন—প্রাণে তার দেয় ব্যথা !
এলো জল যাই ঘরে চল্ ভরে নে' কলস জলে
চেয়ে ছাখ রাজহাঁস কী রকম চলে দলে দলে
স্রোতে ভেসে ; বড় হলে তোরে আমি এনে দেবো কিনে
একটা ময়ূর ছোট, নাচবে সে বরিষার দিনে
মেঘ দেখে তোরি মত ! জননীর প্রলাপ ছাপিয়া
কাল বোশেখীর নৃত্য অকস্মাৎ তাথিয়া তাথিয়া
হোলো সুরু অসময়ে—দুরু দুরু কাঁপিল হৃদয় !
একি গো তাণ্ডব লীলা—বাতাসের একি অভিনয় !
মনে হোলো—দূরে, অতি দূরে—আকাশের পরপারে
অশান্ত হৃদয় এক দীর্ঘশ্বাসে দারুণ চীৎকারে
জানায় অন্তরব্যথা, ভালবাসা তার সর্ব্বগ্রাসী
হা হা করে কয়ে ওঠে—"ভালবাসি আজো ভালবাসি"
তৃপ্তিহীন প্রেতাত্মার মত !

আষাঢ়-সন্ধ্যার সাথে
বসন্ত প্রভাত আজ বিরহের একই বেদনাতে
মিলে গেল ! অশ্রুময় স্মৃতির সোনার তারে তাই
ঝঙ্কারিয়া বেজে ওঠে—সে যে নাই, ওরে সে যে নাই।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

জাপানের সামাজিক প্রথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিক্ষা

গত বৎসর আমি ৬ মাসের ছুটী লইয়া স্বদেশে—জাপানে গিয়াছিলাম, সেইজন্য তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা "বঙ্গবাণী"তে যতদূর বাহির হইয়াছিল তাহার পরে এতাবৎকাল এই প্রবন্ধ বাহির করিতে পারি নাই। নানাবিধ কাজকর্ম্মে এত অধিক ব্যস্ত ছিলাম যে, ফিরিয়া আসিলেও "জাপানের সামাজিক প্রথা" সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই লিখিতে পারি নাই। কিন্তু আমার এ দেশীয় বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে এবং বর্ত্তমানে আমার কাজকর্ম্মের ভিড় কোনওরূপে কমাইয়া একটু অবসর করিয়া লইতে পারিয়াছি বলিয়া এবারে প্রথমে আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

সেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের ঋষি-মহর্ষিরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীকে 'পুরুষার্থ' বলিয়া গণনা করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য এই চারিটীকে পুরুষার্থরূপে গণনা কেবল এদেশেই নহে, পরন্তু সব দেশেই দেখা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীর কোন একটীর পূর্ণতা সাধন করিতে গেলে কোন না কোন পন্থার অনুসরণ আবশ্যক। এই পন্থা বা উপায়ই সাধারণতঃ শিক্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী, ব্যক্তির পক্ষে যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনি পুরুষার্থ। যখন জাতি এই পুরুষার্থ লাভ করে, তখন তাহার সেই অবস্থাকে 'প্রতীচ্যের' ভাবে 'সভ্যতা' বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক সকলেই উন্নত হইতে চায়—সভ্য হইতে চায়—এই উন্নতি বা সভ্যতা লাভ করিতে চাহিলে সকলের পক্ষেই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। বোধ হয় এই জন্যই জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই দুই একটী নিতান্ত অসভ্য জাতি ছাড়া আর সকলের মধ্যেই শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু না কিছু সব দেশেই ছিল। জাপানেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। সেখানেও প্রাচীন কাল হইতেই শিক্ষার একটী ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।

অবশ্য যদিও আমি এখানে জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, তবুও প্রসঙ্গত সেখানকার প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিরও একটু স্থূল আলোচনা গোড়ায় করিয়া রাখা ভাল।

আমি পূর্ব্বেও একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন কালে জাপানেও প্রায় ভারতেরই মত জাতিভেদ বা চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ দেখা যাইত। আমাদের দেশের 'সামুরাই' (ক্ষত্রিয়), 'নোকা' (কৃষক), 'দাইকু' (সূত্রধর—Carpenter) ও 'সোনিন' কতকটা এদেশী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও দ্বিধাবিভক্ত শূদ্র ছাড়া

আর কিছুই নহে। ইহাদের মধ্যে 'সামুরাই' ছিল ঠিক ভারতীয় ব্রাহ্মণেরই মত বর্ণ গুরু এবং বাকী তিনটী ইহার তুলনায় অনেক হীন বলিয়া গণ্য হইত। এইজন্য প্রাচীন কালে শিক্ষার সর্ব্ববিধ আয়োজন ও অনুষ্ঠান কেবল এই শ্রেণীর মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছিল। বাকী তিন বর্ণের পক্ষে শিক্ষা লাভের তেমন কোন সুযোগ সুবিধা মিলিত না। তখন কেবল "কাঙ্গাকু" নামক এক প্রকার শাস্ত্রমূলক বিদ্যারই প্রচলন ছিল। আমাদের দেশের ভাষায় 'কাং' অর্থে চীনে, আর 'গাকু' বলিতে বিদ্যা বুঝায় অর্থাৎ চীনদেশীয় পণ্ডিতদিগের লিখিত শাস্ত্রের পঠন-পাঠনমাত্র। যেখানে বসিয়া এই বিদ্যার চর্চ্চা চলিত আমাদের দেশের ভাষায় সেই পাঠশালার নাম 'জিক্'। এই 'জিক্' কতকটা এদেশী প্রাচীন ধরণের টোলের মত। সামুরাই শ্রেণীর যুবকেরা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে চীন বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদিগের আবাস-ভবনে গমন করিয়া এই বিদ্যা শিখিয়া আসিত। যে গৃহে বসিয়া এই বিদ্যার পঠন-পাঠন চলিত, তাহারই নাম 'জিক্'।

তারপর সামুরাই ছাড়া অন্য বর্ণের মধ্যেও ধীরে ধীরে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহারা পূর্ব্বোক্ত চীন বিদ্যাগার বা জিক্‌গুলিতে গিয়া জ্ঞানার্জ্জনের অধিকারী ছিল না। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ ছোট ছোট বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা মন্দিরে বসিয়া তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে ও হিসাব করিতে শিখাইতেন। ইহা কতকটা এদেশী গুরু মহাশয় বা ওস্তাদজীর পাঠশালার মত। এই পাঠশালাগুলিকে আমাদের দেশের ভাষায় "টেরা কয়া" বলে। 'টেরা' অর্থে মন্দির, আর 'কয়া' বলিতে প্রাথমিক শিক্ষার স্থান বুঝায়। এই 'জিক্' বা 'টেরা কয়া'য় পড়িতে ছাত্রদের কোন নিয়মিত বেতন দিতে হইত না, কেবল বৎসরের প্রথমে বা শেষভাগে কিছু গুরু-দক্ষিণা দিলেই হইত। এখানে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, এই সব 'জিক' বা 'টেরা কয়া'র ছাত্রদের সহিত তাহাদের গুরুদের সম্বন্ধ অনেকটা এদেশী গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের মত পবিত্র ও মধুর ছিল এবং পরস্পরের স্নেহ ভক্তির উপরই উহার প্রতিষ্ঠা হইত। আরও একটী আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তখনকার দিনের সেই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াই লোকে যেরূপ চরিত্রবান্ ও মহৎ হইত আজকালকার দিনে সেরূপ দেখা যায় না। ইহার অবশ্য এই একটী কারণ দেখা যায় যে, তখনকার দিনে শিক্ষা বলিতে বিদ্যা-চর্চ্চা যতখানি বুঝাইত তাহারও অধিক বুঝাইত চরিত্রগঠন।

প্রায় ১৫০ দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপ হইতে পর্ত্তুগীজ ও ডাচ্ জাতির লোকেরা আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন। ইয়োরোপের মধ্যে তৎকালে এই দুই জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা ক্রমেক্রমে ভারত, জাভা, সুমাত্রা ও চীনে আপনাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া অবশেষে বাণিজ্যার্থ জাপানে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাপান সর্ব্বপ্রথম ইহাদেরই মারফৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। সেইদিন হইতেই তাহার চোখ খুলিয়া যায়। তাহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনেক বাড়িয়া যায়, তাই জাপান

পর্তুগীজ ও ডাচ্-জাতিকে আপনার গুরু বলিয়া মানিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহাদেরই নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতার "হাতে খড়ি" গ্রহণ করে। তারপর ক্রমেক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের সকল পরাক্রান্ত জাতিই বাণিজ্যচ্ছলে এখানে আসিয়া জাপানীকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজ, বড় বড় বন্দুক ও কামান প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্র এবং তখনকার দিনের চিত্তচমৎকার ঘড়ী ও দুরবীণ প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপুঞ্জ দেখিয়া আমরা ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে আমরা অনেকেই উহার নিন্দা করিতাম এবং ইয়োরোপবাসীদিগকে অসভ্য বলিয়াই মনে করিতাম। এইজন্য তখনকার দিনে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে ঐসব দেশে গমন বড় নিন্দনীয় ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশের যাঁহারা ভবিষ্যদ্দর্শী তাঁহারা উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই; তাঁহারা লোকনিন্দাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া ঐসব দেশে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমাদের দেশের লোকেরা ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে এবং উহার দোষ গুণ বিচার করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে। প্রায় ৭০—৮০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম ভিত্তি-পত্তন হয় এবং তদবধি আমাদের দেশের অভিজ্ঞদের ধারণা হইল এই যে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অবাধ প্রসার না হইলে দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। ইহাই আমাদের দেশের নব্য শিক্ষার প্রারম্ভ কাল।

আমাদের ছেলে বেলায় দেশে অনেক রকমের কুসংস্কার দেখিতাম; কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের ফলে আজকাল তেমন কুসংস্কার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনারা সকলেই জানেন জাপানে বড় ভূমিকম্পের প্রাচুর্য্য। এমন কি, সময় সময় প্রত্যহই অল্প অল্প ভূমিকম্প হইতে থাকে, আবার ৫।৭ বৎসর অন্তর অন্তর এক একটা ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়। এই ভূমিকম্প সম্বন্ধে আমাদের ছেলে বেলায় লোকের এরূপ কুসংস্কার ছিল যে, ভূমির খুব নিম্ন স্তরে একটা প্রকাণ্ড "নামাজ" (সিঙ্গী মাছ—wels) মৎস্য সর্ব্বদা নিদ্রিত আছে। যখন উহা জাগ্রত হইয়া শরীর সঞ্চালন করে, তখনই ভূমিকম্পের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভূমির উপরিভাগে যে যে স্থান এই মৎস্যের মস্তক বা পৃষ্ঠোপরি বর্ত্তমান সেখানে কম্পনের বেগ অনেক কম এবং যে স্থান উহার পুচ্ছের উপরি থাকে, সেখানেই কম্পনের আধিক্য অনুভূত হয়। বর্ত্তমানেও যদি এই কুসংস্কার থাকিত তবে গত ভীষণ ভূমিকম্পের সময় টোকিও সহরকেই ইহার পুচ্ছের উপরি বর্ত্তমান বলিয়া লোকে মনে করিত। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের ফলে এই কুসংস্কার আজকাল একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন বিদ্যালয়ের নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরাও ভূমিকম্পকে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই ফল বলিয়া জানে। আমাদের ছেলে বেলায় আরও একটা কুসংস্কার দেখিতাম এই যে, 'কাল বৈশাখীর' দিন আকাশে যে ভীষণ মেঘগর্জ্জন হয়, উহাকে লোকে

আকাশচারী কোন একটী প্রকাণ্ড দৈত্যের বিকট ভেরীনিনাদ বলিয়াই মনে করিত এবং লোকের এরূপও ধারণা ছিল যে, ঐ প্রকাণ্ড দৈত্যটাই আকাশের এক কোণে বসিয়া নিজের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে অসময়ে অপরিমিত মেঘ-বিদ্যুৎ ও ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া দুষ্টলোকের গৃহ ও জীবন বিপন্ন করিয়া থাকে। এই কুসংস্কারও আজকাল একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। এখন সকলেই জানে যে, আকাশস্থ বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যুতের পরস্পর মেলামেশার ফলে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ নানাবিধ ব্যাপারে পূর্ব্বে যে সব কুসংস্কার দেখা যাইত, আজকাল সেগুলি কেবলমাত্র প্রাচীন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের বাল্যকালে নীচ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে লিখিতে পড়িতে জানে এরূপ লোক খুব কম দেখিতাম; কিন্তু আজকাল মোটেই লিখিতে পড়িতে জানে না এরূপ স্ত্রী-পুরুষ হাজারে একটীও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। আমার এই কথায় আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, গত ৪০ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষার কত বিস্তার ঘটিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, ইহা উচ্চ-নীচ বা ধনিদরিদ্র-নির্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছয় বৎসর কাল বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের ফল।

আগামীবারে আমরা প্রথমতঃ 'কিণ্ডারগার্টেন' বা 'হাতে কলমে' শিক্ষাপদ্ধতির কথা আলোচনা করিয়া পরে যথাক্রমে আদ্য, মধ্য ও শেষ শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রী আর, কিমুরা

নিয়তি

রামটহল বন্দুক স্কন্ধে করিয়া ট্রেজারির সম্মুখে পরিমিত পদক্ষেপের সহিত পাহারা দিতেছিল আর আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল।

রামটহল আওরঙ্গাবাদের ট্রেজারি গার্ড। ছাপরা জেলার একটা পল্লীতে তাহার বাড়ী। কিন্তু ছয় বৎসর হইতে সে এক রকম ঘর ছাড়া বলিলেই হয়। আগে সে স্ত্রীকে লইয়াই থাকিত। যেখানে গিয়াছে স্ত্রীকে লইয়াই কত হোলি দুজনে একত্র কাটাইয়াছে, কতদেশে ঘুরিয়াছে। সরকারের চাকুরীও তো তাহার কম দিন হয় নাই। যখন ২২ বৎসরের জোয়ান সেই সময় চাকুরীতে ঢুকিয়াছে আর এখন বয়স হইতে চলিল ৫২ বৎসর। আর কয়েকটা বৎসর কাটাইতে পারিলেই পেন্‌সন মিলিবে। কিন্তু পেন্‌সন মিলিলেই বা কি? সে তো বাড়ী গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না। বাড়ী গেলেই তাহার ভয় হয়। সেই ভয়ের একটু গোপন ইতিহাস আছে।

রামটহল স্ত্রীকে লইয়াই বরাবর থাকিত। বিবাহ হইয়াছিল তাহার বহু আগে—তখন তাহার বয়স ছিল ৯, আর তাহার স্ত্রী পার্ব্বতীর বয়স ১০।১১ না হইলেও ৯এর নীচে তো নয়ই। তবে হাঁ,

গওনা হইয়াছিল কিছু পরে অন্ততঃ ৪।৫ বৎসর পরে। ২৪ বৎসর বয়সেই তাহার বাবুজী ও মা দুজনেই হঠাৎ প্লেগে মারা গেলে সে স্ত্রীকে আসিয়া লইয়া যায় এবং সেই হইতেই সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

সন্তান না হওয়ার জন্য তাহার মনে মনে একটা গভীর দুঃখ। দুজনেরই বয়স যখন প্রায় ৩৫ তখন পর্য্যন্ত তাহারা নিঃসন্তান। তার পর ৩৫ বৎসরের পর যখন সে গয়ায়, সেই সময়ে সে জানিল পার্ব্বতীর সন্তান হইবে। গয়াজী যে সারা ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বড় তীর্থ সে বিষয়ে সেই হইতে আর কোন সন্দেহ ছিল না—আজিও নাই। সন্তানসম্ভাবনা শুনিবামাত্র রামটহল আনন্দে অধীর হইয়াছিল এবং সেই দিন হইতে সে স্ত্রীকে কোন প্রকার কঠিন কাজ করিতে দিত না। সহরে সহরে ঘুরিয়া এইটুকু তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, এরূপ অবস্থায় কাহাকেও অধিক পরিশ্রম করিতে দিতে নাই, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইতে হয় ও প্রফুল্ল রাখিতে হয়। এই তিনটি করিবার জন্যই সে বিধিমত সচেষ্ট থাকিত। এমন কি পারতপক্ষে সে স্ত্রীকে রাঁধিতে পর্য্যন্ত দিত না এবং নিজে লোটা বর্ত্তন মলিত—চৌকা দিত। পার্ব্বতী প্রথমটা স্বামীর এই কাণ্ড দেখিয়া হাসিত—আদরটা কয়েকদিন ভালও লাগিয়াছিল। কিন্তু যখন শেষে দেখিল যে তাহার স্বামী তাহাকে বড় লোকের গৃহিণীর মত স্থবির করিয়া রাখিতে চায় তখন সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল। দাম্পত্য কলহও ঘটিল, কিন্তু পার্ব্বতী বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, যদিও তাহার অধিক বয়সে সন্তান হইতেছে তথাপি সেজন্য তাহাকে কাঠের পুতুলের মত করিয়া রাখিবার দরকার নাই। পার্ব্বতী আরও বলিল, সে তাহার শাশুড়ীর মুখেও শুনিয়াছে যে, যাহা রহে ও সহে তাহাই ভাল, বেশী বাড়াবাড়ি কোন ক্ষেত্রেই কর্ত্তব্য নহে। যদিও রামটহল অনেক বুঝাইয়াছিল যে, তাহার ইহাতে কি অসুবিধা—ভবিষ্যতে যখন ছেলে জন্মগ্রহণ করিবে তখন তো পার্ব্বতীর কাজ বাড়িয়াই যাইবে। সেই জন্যই এ কয়দিন একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আর তাহার নিজের কাজ বাড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুধু একটা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া কয় হাত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান তো—সে একটা শিশুতেও পারে। কাজেই বাকী সামর্থ্য ও সময়টা সে কি করে—একটা কাজ তো চাই তাই সে পার্ব্বতীকে সাহায্য করিতে আসে।

পার্ব্বতী স্বামীর অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া—মুখে কাপড় দিয়া হাসিত। মেয়ে মানুষ হইয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিতে সে ভয়ঙ্কর আপত্তি করিত; কিন্তু রামটহল বিজ্ঞের মত তাহাকে বুঝাইত যে, ও দুধ তো তাহার জন্য নহে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য। সে আবার আসিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পায় তাহার ব্যবস্থা তো করিয়া রাখিতে হইবে। তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে পড়িয়া স্ত্রীকে শুনাইত যে, স্বয়ং রামচন্দ্রজী সীতাজীকে গর্ভাবস্থায় কত আদর করিতেন।

এবম্বিধ বাদ প্রতিবাদের মধ্যে পার্ব্বতী গয়াতেই একটি পুত্র প্রসব করিল। রামটহল পুত্র-

মুখ দেখিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। বন্ধু বান্ধবকে বেশ করিয়া খাওয়াইল। পাড়ায় পাড়ায় প্রসাদ পর্য্যন্ত বিলাইল। এই সব কারণে দোকানে তাহার কয়েক টাকা ধারও হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও রামটহল দুঃখিত হইল না। গয়ায় জন্মিয়াছিল তাই রামটহল ছেলের নাম গদাধর রাখিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে কাগজের উপর বাবু গদাধর মিশ্র লিখিয়া নিজে দেখিত ও পার্ব্বতীকে দেখাইত এবং নামটা যে কি চমৎকার কাগজের উপর মানায় তাহাও দুজনে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ভাগ্যে অন্য কোন বাজে নাম না রাখিয়া ঠিক যে নামে তাহাকে মানাইবে সেই নামটাই রাখিয়াছিল। গদাধর হাঁটিতে শিখিবার বহু আগে সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, গদাধরকে যেন বন্দুক ধরিয়া পাহারা না দিতে হয়। অমন ছেলের কানে কলম হইলে যেমন মানায় কাঁধে বন্দুক হইলে তাহার সিকির সিকিও মানায় না। তাহাকে যে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইতে হইবে তাহা সে একেবারে ঠিক করিয়া রাখিল। গদাধর কথা বলিবার আগেই তাহার পড়িবার বই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিল এবং পাঁচ বৎসরে পড়িতেই তাহাকে একটা শুভদিন দেখিয়া গুরু অর্থাৎ পাঠশালায় হাজির করিয়া দিল। তাহার প্রকাণ্ড গোঁফ নাড়িয়া গুরুকে বুঝাইয়া দিল যেন এই ছেলের গায়ে হাত না তোলে এবং এই হাত না তোলার জন্য সে মাসের মাহিয়ানাটা ডবল করিয়া দিবে।

গদাধরের জন্মের পর হইতেই রামটহল বড়ই ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছিল। সাধু দেখিলেই সে সেবা করিত। অতিরিক্ত সেবা দেখিয়া পার্ব্বতী যখন খরচের কথাটা তুলিত সে বলিত এসব গদাধরের কল্যাণে—তাহার দীর্ঘজীবনের জন্য সে করিতেছে। বোতল বোতল ওষুধে যে কাজ না হয়, ভাল সাধুর পায়ের এক আধ-মুঠা ধূলা পাইলেই তাহার দশগুণ কাজ করে। এসব তথ্য দেশের লোক ভুলিয়া যাইতেছে তাইতো দেশের এত অকল্যাণ। যাহা হউক এই অকল্যাণ যাহাতে তাহার সংসারে না প্রবেশ করে সে বিষয়ে রামটহলের যত্নের পরিসীমা ছিল না। গদাধরের বয়স বৎসর নয় দশ হইতেই রামটহল তাহাকে ইংরাজী স্কুলে নাম লিখাইয়া দিল।

এই সময়ে হঠাৎ রামটহল অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কয়েকদিন রামটহল বড়ই উন্মনা হইয়া রহিল। কাহারও সহিত বড় একটা কথা কয় না, ছেলেকে আদর করে না, পার্ব্বতীর সঙ্গে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ করে না। রামটহলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের পার্ব্বতীও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না, জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর মিলিল না।

মেয়ে মানুষের মন—প্রথমটা পার্ব্বতীর সন্দেহ হইল স্বামীর মনটা আর কোথাও ধরা পড়ে নাই তো। যদিও এ বয়সে বড় একটা তাহা ঘটে না—তবুও পুরুষতো, বিশ্বাস কি? পার্ব্বতী লক্ষ্য করিয়া তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। কাজ শেষ হইলে সে যে ঘরে আসিয়া বসিত আর বিশেষ কাজ ছাড়া বাহির হইত না। রাত্রে ডিউটি পড়িলে বাহিরে থাকিত নচেৎ সেই ছোট ঘরখানায় বসিয়া গোস্বামীজীর বইটা লইয়া বিষণ্ণমুখে মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া পড়িয়া যাইত।

রামটহলের ক্ষুধা পর্য্যন্ত কমিয়া গেল। পার্ব্বতীর একবার সন্দেহ তবে কি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে—যে সাধু সন্ন্যাসীর উপর টান! কিন্তু আপাততঃ তাহারও কোন লক্ষণ দেখিল না। পার্ব্বতীর ভরসা হইল কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। এই ভাব লক্ষ্য করিবার কিছুদিন পরেই রামটহল ম্লানমুখে বলিল সে আরঙ্গাবাদে বদ্‌লি হইয়াছে। পরশুই যাইতে হইবে। পার্ব্বতী বলিল জিনিষপত্র সব গুছাইয়া লই। কিন্তু রামটহল তখন অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিল; সেখানে সে একাই যাইবে। সহরের ভিতর সে একটা চালা ঘর ভাড়া করিয়াছে সেখানে পার্ব্বতী গদাধরকে লইয়া থাকিবে; কারণ আরঙ্গাবাদে এখানকার মত বড় স্কুল নাই; ছোট স্কুল—ইংরাজীতে তাহাকে মাইনর স্কুল বলে, তার মানেই ছোট স্কুল।

কথাটা এইটুকু সত্য যে, সে সময় আরঙ্গাবাদে মাইনর স্কুলই ছিল বটে। কিন্তু মাইনর স্কুলে পড়িতে গদাধরের কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। পার্ব্বতী কিন্তু অতশত বুঝিল না। তবু সে বলিল, না থাক্ ভাল স্কুল তবু তাহারা যাইবে। সেই স্কুলেই যেটুকু জ্ঞান হয়—সেই ভাল। তার ছেলে তো সত্যিকার হাকিম হইবে না। কথাটায় রামটহল বড়ই মর্ম্মাহত হইল। যে ছেলেকে কত আশা করিয়া মানুষ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে এসব কথা সে সহ্য করিতে পারিত না। সে পার্ব্বতীকে বুঝাইল মানুষ কিসের থেকে কি হয় কেহই বলিতে পারে না। না জানিয়া শুনিয়া ও রকম একটা কথা ফস্ করিয়া বলিয়া বসিতে নাই। তাহাতে লাভ তো হয়ই না, উপরন্তু ক্ষতির আশঙ্কা থাকেই। রামটহল আরও বুঝাইল যে এখানে স্কুলের কর্ত্তাদের কৃপায় গদাধর বিনা বেতনে পড়িতে পাইতেছে। সেখানে তাহা পারিবে কি না কে বলিতে পারে। না পারিবার কথাই ধরিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর রামটহল একটা মোটামুটি স্কুলের বেতন ধরিয়া দিল যে, ইংরাজী স্কুলে ছেলে ৭।৮ বৎসর পড়িবে তাহাতে খালি স্কুলের বেতনই অনুমান আড়াই শত টাকা লাগিবে আর সে টাকাটা এখানে থাকিলে বাঁচিয়া যাইবে। আর খরচের কথা—এখানে থাকিলেও লাগিবে ওখানেও লাগিবে। তা বলিয়া ছেলের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিতে হইবে।

একে তো এই সব যুক্তি, তারপর রামটহল অনেক দিন পরে স্ত্রীর সহিত এতগুলি কথা এক সঙ্গে কহিল। পার্ব্বতী যুক্তি সম্পূর্ণ না বুঝিলেও আর আপত্তি করিল না, খালি চোখের জল ফেলিয়া নিরস্ত হইল।

তারপর যথাসময়ে পার্ব্বতী ও গদাধরকে নূতন বাসায় আনিয়া তাহাদের সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ক্রন্দনরতা পত্নী ও ক্রন্দনোন্মুখ পুত্রকে শান্ত করিবার একটু বিফল চেষ্টা করিয়া রামটহল নিজের লোটা কম্বল ও একটা কেরেসিনের বাক্স লইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে আরঙ্গাবাদের দিকে যাত্রা করিল।

বাহিরে আসিয়া রামটহলের চোখ দুটায় যে অশ্রুর বাণ বহিয়াছিল আর বুকটার ভিতর যে

তোলপাড় করিতেছিল তাহার এক কণাও যদি পার্ব্বতী দেখিত ও বুঝিতে পারিত তাহা হইলে কিছুতেই স্বামীকে একা ছাড়িয়া দিত না।

পার্ব্বতী তবু এ খবরটা জানিত না যে, স্বামী ইচ্ছা করিয়া এই বদ্‌লি করাইয়াছে; জানিলে কি করিত বলা যায় না।

(২)

ছয় বৎসর সে আরঙ্গাবাদে আছে। তাহার স্বভাব মাধুর্য্যে ও সরলতায় সবাই তাহার উপর প্রীত, সেজন্য তাহার বদ্‌লির সময় হইলেও বদ্‌লি হয় নাই। এই কয় বৎসরের মধ্যে রামটহল বৎসরে দুইবার করিয়া বাড়ী গিয়াছে, কিন্তু ২।৪ দিনের বেশী কিছুতে থাকে নাই। যে সময়টা থাকিত সে সময়টাও যেন একটু ভয়ে ভয়ে থাকিত। পার্ব্বতীর চক্ষুতে এ ভাবটা এড়ায় নাই; কিন্তু এ ভয়টা যে কিসের তাহা সে বুঝিতে পারিত না। একবার ভাবিত স্বামী হয় তো কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। তার জন্য হয় তো ভয়ে-ভয়ে থাকে যদি দৈবাৎ ধরা পড়িয়া যায়। কখনও বা ভাবে স্বামীর কোন কারণে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতেছে। অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে কেন সে এরূপ হইয়া গেল। সে নিজে কি কোন দিন রামটহলের কাছে কোন দোষ করিয়াছে—যদি করিয়াই থাকে তাহা হইলেও কি তাহার মার্জ্জনা নাই। আর মার্জ্জনাই যদি না থাকে তাহা হইলে শাস্তি-দিলেই তো মিটিয়া যায়। যদিও সে উপযুক্ত ছেলের মা হইয়াছে তথাপি যদি রামটহল এখনও তাহাকে ধরিয়া মারে তাহা হইলেও সে কিছু বলে না—রাগও করে না। কেন না আগেকার দিনগুলা তাহার বেশই মনে পড়ে। বেশী করিয়া যখন গদাধর গর্ভে ছিল ও পরে সে যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল সেই সময়কারের আদর যত্ন ও ভালবাসার কথা পার্ব্বতী চিতায় যাইবার আগে ভুলিতে পারিবে না! এই সব কথা ভাবিতে ও বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিত। রামটহলও ওকথা শুনিয়া বড়ই কাতর হইত। কিন্তু সে নিজের ব্যবহারের কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিত না। কিসের একটা বোঝা তাহার মনে পাথরের মত বসিয়া আছে তাহা তুলিয়া ফেলিবার ধৈর্য্য বুঝি অসম্ভব।

যে ছেলের জন্মের সময় তাহার অত আনন্দ, যাহার পড়িবার ক্ষমতা হইবার কত আগে সে ছেলের জন্য বই যোগাড় করিতে গিয়া কত লোকের উপহাসাস্পদ হইয়াছে, সে ছেলে এখন কত বই সারা করিয়া পাশ দিতে চলিল তবু স্বামীর তাহার উপর আগেকার টান ফিরিয়া আসিল না, ইহা ভাবিয়া পার্ব্বতী নীরবে চোখের জল ফেলিত, আর তাহার অদৃষ্টের দোষ দিত। অদৃষ্টের দোষ নইলে অমন স্বামীর মন ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সে কোথায় যে তাহার দোষ তাহা ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। পুত্রের মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতে তাহার লজ্জা করিত, যদি সেও ভাবে তাহার মায়ের কোন দোষেই তাহার পিতার মন এমন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এক একবার সে ভাবিত যা হইবে হউক সে ছেলের হাত ধরিয়া স্বামীর কাছে গিয়া উঠিবে। তাহার সব

থাকিতে সে কেন এমন বঞ্চিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সাত পাঁচ ভাবিয়া সে কল্পনাকে সে কাজে পরিণত করিতে পারিত না।

গদাধরকে কোন কথা না বলিলেও সে এটা বুঝিতে যে, তাহাদের তিন জনের মধ্যে কোন খানটায় একটা গোল বাধিয়াছে। মা ও বাবা দুজনকেই সে ভালরূপেই জানিত, কেহ যে ইচ্ছা করিয়া কাহারও উপরে কোন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই তাহা সে বুঝিত। কিন্তু তবু গোল যে একটা কোথাও আছে তাহাতে তো কোন সন্দেহ নাই।

তাহার পরীক্ষা আসিল। ভাল করিয়া পরীক্ষা দিয়া পিতাকে লিখিল যে, এবার তো তাহার পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর সেখানে কোন কাজই নাই। যদি তাঁহার অনুমতি হয় সে মাকে লইয়া আরঙ্গাবাদ আসে।

ফেরৎ ডাকে জবাব আসিল—এমন কাজ যেন এখন কিছুতে না করা হয়। আরঙ্গাবাদে প্লেগ এখন দেখা দিয়াছে—এ সময়টা কাটিয়া যাক্ ; তাহার পর সুবিধা বুঝিলেই সে নিজে গিয়া সবাইকে আনিবে ইত্যাদি।

পার্ব্বতীও আশা করিয়াছিল যে, উপযুক্ত পুত্র যখন লিখিয়াছে তখন আর অমত হইবে না। যখন দেখিল ইহাতেও কোন ফল হইল না তখন পার্ব্বতী একেবারে মুস্‌ড়িয়া পড়িল। গদাধরের তরুণ প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল।

যথা সময়ে গদাধরের পাশের সংবাদ বাহির হইল। গদাধর তখন মনে মনে একটা মতলব আঁটিল। মাকেও সেকথা জানাইল না।

(৩)

চৈত্রের শেষ। বিহারের বায়ু এ সময় বাংলার মত সুধু উতলা নয় একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সমস্ত দুপুরটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পরও মনে হইতেছে যেন মাটীর নীচ হইতে এখন গরম শ্বাস বাহির হইতেছে। সমস্ত মাটী যেন অন্ধকার মুড়ি দিয়া অসহ্য গ্রীষ্মে স্তব্ধ হইয়া আছে। রামটহল একা আঃ বা উঃ কোন প্রকার শব্দ না করিয়া শুধু নিয়মমত বন্দুক হাতে পাদচারণা করিতেছে।

রাত্রি ১০টা বাজে। রামটহলের হঠাৎ মনে হইল পাশের দিকে যেন কাহার পদশব্দ হইল। গুলি করিবার জন্য সে কাণ পাতিয়া রহিল। হাঁ পায়ের আওয়াজই বটে তো। সে সত্য সত্যই হাঁকিল—হুকুমদার অর্থাৎ who comes there (কে আসে ?)

কোন উত্তর নাই। দ্বিতীয় বার তীব্রস্বরে সে হাঁকিল—হুকুমদার। মূর্ত্তি বেশ স্থির—একটু খানি সময় দাঁড়াইল কিন্তু কোন উত্তর আসিল না।

তৃতীয় বার সে হাঁকিল—হুকুমদার, উত্তর না আসিতে সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ লোকের পদ লক্ষ্য

করিয়া সে বন্দুক ছুড়িল। মুর্ত্তি যেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটু আগে জানু পাতিয়া বসিতে যাইতেছিল। তখন বন্দুক ছুটিয়া গিয়াছে।

বন্দুক সশব্দে ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী দ্রব্য পতনের শব্দ হইল।

আলো লইয়া রামটহল ছুটিয়া আসিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। এ সে কি করিয়াছে। চোর ভাবিয়া কাহাকে সে মারিয়াছে। এ যে তাহারই একমাত্র পুত্র গদাধর!

বন্দুক ফেলিয়া দিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সে মৃতপুত্রের বুকে লুটাইয়া পড়িল।

সরকার হইতে তাহার কর্ত্তব্যপ্রিয়তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা হইয়া গেল।

সে উপরওয়ালার হাতে পায়ে ধরিয়া পরদিনই ইস্তাফা মঞ্জুর করাইয়া লইল। পুত্রের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া সেই হস্তে কি আর বন্দুক ধরা যায়?

চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সে নত নেত্রে অপরাধীর মত পার্ব্বতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা তাহাকে বলিল। ইহাও বলিল যে এত করিয়াও সে নিয়তির লেখা খণ্ডন করিতে পারিল না। এক সাধু বলিয়াছিলেন তাহার পুত্র তাহার নিজের হাতে মরিবে। সেই আশঙ্কায় সে এত কাল এত কষ্ট সহ্য করিয়াও পুত্রকে ও পত্নীকে দূরে রাখিয়া আপনি একা দূরে পড়িয়াছিল; পাছে ঘটনাচক্রে রাগের ঝোঁকে বা ভুলের বশে কি ঘটিয়া যায়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেই মানুষ করা একমাত্র পুত্র—এত গুণের পুত্র—পিতার হাতেই প্রাণ দিল।

নিয়তি এমনিই কঠিন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

রামগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লর্ড এলেনবরো ও উইলবারফোর্স বার্ড

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল (Sir Robert Peel) পীল বিলাতে কমন্স মহাসভায় (Lord Ellenborough) এলেনবরোর প্রত্যাহ্বানআজ্ঞা প্রচারিত করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় দুই মাস যাবৎ এ সংবাদ কেহ অবগত ছিল না। ১৫ই জুন শনিবার প্রাতঃকালে ৬ই মে তারিখের মেল যখন কলিকাতায় পৌঁছাইল তখন বড়লাটের প্রত্যাহ্বানের সংবাদ পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইল। ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লর্ড এলেনবরো প্রেরিত

হইয়াছিলেন, কিন্তু সত্য সত্যই যুদ্ধে তিনি একটি বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। আফগানিস্থান হইতে একটি বৃহৎ কবাট আনয়ন করিয়া তিনি উহাকে মহম্মদ গজনীর দ্বারা ধ্বংসিত সোমনাথ-মন্দিরের দ্বার অনুমান করিয়া প্রচার করেন। এই উপলক্ষে ভারতের

রামগোপাল ঘোষ

রাজন্যবর্গ ও অধিবাসীদিগকে "ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া যে ঘোষণাপত্র দেন তাহা ঐতিহাসিক মতে মুসলমানের পক্ষে অপমানসূচক ও হিন্দুর পক্ষে অবিশ্বাসজনক। এলেনবরো সিভিল সার্ভিসকে ঘৃণা করিতেন ও সামরিক সার্ভিসের বন্ধু ছিলেন। ডাইরেক্টার-

দিগের পুত্রদিগকে সাহেবজাদা বলিতেন ও তাঁহাদিগের উপর লিডেন হল ষ্ট্রীটের যে কোন প্রস্তাবেরই প্রবল প্রতিবাদ করিতেন। রামগোপাল বারাকপুরে নিমন্ত্রিত হইয়া লর্ড এলেনবরোর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান্। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল তাঁহার প্রিয় গোবিন্দচন্দ্রকে তদানীন্তন গভার্ণর জেনারেল সম্বন্ধে লিখেন যে পরশ্ব দিন রাত্রে বড়লাটের সম্মানের জন্য বারাকপুরে একটি জাঁকাল রকমের বল্‌নাচ ও রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। লাটের চেহারায় বিশেষ মহত্ব কিছু দেখিলাম না—দেখিলাম শিকলাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের শেষাবস্থা। পোষাকের যদিও পারিপাট্য ছিল না তবে তাঁহার হাবভাবে বিলাসিতার নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছিল, চেহারায় প্রতিভার দীপ্তি থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চ অভিমতের মহত্বের পরিচায়ক কিছু ছিল না। বক্তৃতায় মহত্ব বা সুনীতি কিছুই ছিল না বরং তাহাতে যে একটা আত্মম্ভরিতা ছিল তাহা তাঁহার প্রিয় সৈনিক সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রীতিকর হয় নাই, কিন্তু "অসি দ্বারা ভারতবিজিত হইয়াছে, আর অসি দ্বারাই উহা রক্ষিত হইবে" ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিমত। বার আনা ভাগ শ্রোতা সামরিক সম্প্রদায়ভুক্ত সুতরাং তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক পরিচ্ছদের শেষে বিপুল আনন্দধ্বনি হইয়াছিল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই লর্ড এলেনবরো কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার ভারতত্যাগের পর বড়লাট কাউন্সিলের সহকারী সভাপতি (Wilberforce Bird) বার্ড, লর্ড হার্ডিঞ্জের আগমন পর্য্যন্ত অস্থায়িভাবে গভার্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। অ্যাকডেমিক অ্যাসোসিয়েসনে উপস্থিত হইয়া ইনিই উদীয়মান নবীন যুবকদলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, তখন ইনি বাঙ্গালার ডেপুটি গভর্ণর ছিলেন। লর্ড এলেনবরোর সময়ে বার্ড সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দেন ও লটারি বা সুরতি খেলা বন্ধ করিয়া দেন। তিনি পুলিসের সংস্কার করেন। ১লা সেপ্টেম্বর রাজা কালীকিষণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে দেশীয় অধিবাসীদিগের একটি সভা হয়। সেই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল, রসময় দত্ত, মতিলাল শীল, রাজা (পরে মহারাজা সার) নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিশ্বনাথ, মতিলাল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম মন্তব্যটি এইরূপ ছিল :—বার্ড সাহেবের লৌকিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বহু গুণে প্রীত হইয়া এদেশবাসী তাঁহাকে সম্মান করিবার নিমিত্ত একখানি বিদায়পত্র প্রদান করিতেছেন এবং কলিকাতার কোন সাধারণ স্থানে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষাকল্পে একখানি প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার প্রবর্ত্তন করেন, রামগোপাল তাঁহার সমর্থন করিয়া বলেন যে বার্ড সাহেব সাধারণ হিতের জন্য অনেকগুলি কার্য্য করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত দেশীয় শিক্ষার তিনি একজন পরম বন্ধু, এই কারণে তিনি চিরকাল ভারতবন্ধু বলিয়া ভারতবাসীর মনে জাগরূক থাকিবেন। Wet docksর উপকারিতা ও ভারতবর্ষে লৌহবর্ত্মের প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করিয়া তিনি ব্যবসা সম্বন্ধে যে সুবিধা করিয়া দিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন

তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বার্ডের প্রশংসা করেন। রামগোপাল স্বয়ং ব্যবসায়ী ছিলেন, সেজন্য ব্যবসা সম্বন্ধে এ উন্নতির চেষ্টাটুকু তিনি উল্লেখ করেন।

এই সভায় তাঁহার তৈলমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত ডেপুটি গভর্ণরকে অনুরোধ করিবার মন্তব্য গৃহীত হয়। ইহার ফলে কলিকাতা টাউন হলে বার্ডের একখানি পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রেলওয়ে

অবাধ বাণিজ্যের অব্যাহত নিয়মে ইংরাজ আগমনের প্রারম্ভ হইতেই ভারতবর্ষের বহু উৎপন্ন দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী হইতেছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসানে যখন পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল, তখন বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত ইউরোপে প্রবর্ত্তিত নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ের প্রচলন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল, তন্মধ্যে যুগান্তরকারী বাষ্পীয় শকট ও বৈদ্যুতিক তার যন্ত্রের প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়ে ত্বরিত উন্নতির সহিত উৎপাদিত পণ্যের দ্রুত বিতরণ—যে স্থানে যে বস্তুর বিক্রয় বা কাটতি হইতে পারে সেই সেই স্থানে সেই সকল বস্তুর আনয়নের নিমিত্ত দ্রুতযানের অভাবও অনুভূত হইতে লাগিল। বহু সামগ্রী সম্যক ক্রেতার বাজারে উপস্থিত না হওয়ায় ব্যবহৃত হইতেছিল না, অনেক সামগ্রী দূরপল্লীর অজ্ঞাত স্থানে উপযুক্ত প্রয়োজন সাধন না করিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। দেশের মধ্যে বহুস্থান দুর্গম ছিল। তীর্থপর্য্যটন এত সময়সাপেক্ষ ও বিপদসঙ্কুল ছিল যে, বিষয়সম্পত্তির জন্য চরমপত্র লিখিয়া দিয়া তবে পর্য্যটক এ কার্য্যে ব্রতী হইতেন। কলিকাতা হইতে কাশী যাইতে হইলে বিভিন্ন যানে বা পদব্রজে যে সময় ব্যয় হইত তাহা আমরা পাদ লিখনে * প্রদান করিলাম। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতে বাষ্পীয়

* পর্য্যটনের উপায়	সময়	ব্যয়
১। অশ্ব বা টাট্টু পৃষ্ঠে	১৪ হইতে ১৮ দিবস	২৩৲ টাকা
২। ছয়দাঁড় নৌকায়, ইহাতে ছয় হইতে দশ জন আরোহী যাইতে পারিত	৩০ „ ৪৫ „	৬০৲ „
৩। পাল্কী বা ডুলিতে	১৫ „ ১৮ „	২২৲ „
৪। ডাক আরোহণে	৪½ „ ৫ „	৪৫৲ „
৫। ষ্টীমারে	১৫ „ ২৫ „	৩০৲ „
৬। শকট (ছকড়, একা প্রভৃতি) ইহাতে দুই হইতে চারি জন আরোহী যাইতে পারিত	১৫ „ ২২ „	২৫-৩০„
৭। পদব্রজে (একটি লোক পাঠাইতে হইলে)	১৮ „ ২০ „	১০৲ „

শকটের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু অনেকে বিশেষ আপত্তি করেন। তখন এলাহাবাদের পর হইতে ডাক কোম্পানীর দ্বারা মালপত্রাদি বাহিত হইত, এলাহাবাদের নীচে হইতে-ষ্টীমার কোম্পানী ঐ কার্য্য সম্পাদন করিত। ইহারা ও ইহাদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরা রেলওয়ে প্রবর্ত্তনে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন এলাহাবাদের উপরে কেবলমাত্র দোয়াব ভিন্ন প্রদেশে বৃহৎ নদী অতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয় না সুতরাং এরূপ স্থানে রেলপথ বিস্তার করিলে ব্যয় অল্প হইবে। পরে (Sir R. Macdonald Stephenson) ষ্টিফেনসন নামক একব্যক্তি এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। ইনি প্রথমে "ইংলিশম্যান" পত্রিকার সাব এডিটার ছিলেন, তারপর তিনি পূর্ব্ব ভারতবর্ষে রেলপথ প্রবর্ত্তন সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে ব্যাপৃত থাকিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সৃষ্টি হয়। এই রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে ষ্টিফেনসন সাহেব, সমস্ত খ্যাতনামা সদাগরের অভিমত গ্রহণ করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের খসড়া তৈয়ারী করেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে প্রবর্ত্তনে বাণিজ্য সম্বন্ধে কি সুবিধা আশা করা যায় ও ইহাতে মূলধনের কতদূর সুবিধাজনক নিয়োগ সম্ভব এই দুইটি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত ষ্টিফেনসন অনুরোধ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রামগোপাল, কেলসেল ও ঘোষের আফিস হইতে যে উত্তর প্রদান করেন তাহার সারাংশ আমরা "Report upon the practicability and advantages of the introduction of Railways into British India with copies of the official correspondence with the Bengal Government and Full Statistical Data" নামক পুস্তক হইতে নিম্নে প্রদান করিলাম।

"প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে দ্রব্যাদি ও আরোহীদিগের দ্রুত ও নিরাপদ পরিচালনায় ব্যবসার যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা অবিসংবাদিত। লৌহবর্ত্মের প্রবর্ত্তনে দেশের লুক্কায়িত ও অর্দ্ধ উন্মুক্ত সম্পদরাশির সমূহ পরিণতি হইবে ও তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভ্যুদয় হইবে—দেশে বিলাতী ও অন্যান্য বস্তুর প্রচলন বর্দ্ধিত করিবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে যদি যথাসম্ভব অল্প খরচে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা নির্ব্বাচন করিয়া বর্দ্ধমান, বেনারস ও মৃজাপুর সন্নিকটস্থ কয়লার খনির নিকট দিয়া লইয়া যাওয়া হয় ও পাটনা হইতে গয়া পর্য্যন্ত একটি শাখা রেল খুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে লাভের সম্ভাবনা অনুকূল বলিয়াই অনুমান হয়। অবশ্য এই কার্য্য চালনার ভার বিশেষরূপে পারদর্শী সাধু ব্যক্তিগণের দক্ষহস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। এই লাইনের জন্য বিশদরূপে জরিপাদি করিয়া রেল, ইঞ্জিন, গাড়ি ও চালাইবার ব্যয় প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া উপযুক্ত দেশীয়-দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

লৌহবর্ত্ম প্রচলনের বিশেষ আনুকূল্য করিবার কারণ এই যে এ দেশে উহা বিলাত অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও ন্যায্য ভাড়া নির্দ্ধারিত হইলে কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অনেক বিলাতী রেলে আরোহিগণের দ্বারাই রেলকোম্পানীর যথেষ্ট আয় হয়, এখানেও আরোহীর অভাব হইবে না। তবে ইহার প্রতিকূলে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ এ দেশের সাধারণ অধিবাসী অত্যন্ত গরীব, দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীর পর্য্যটক বলিয়া খ্যাতি নাই, তৃতীয়তঃ, হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংস্কার এইরূপ শকটারোহণের অন্তরায়। তবে যদিও এ দেশীয় অধিকাংশ লোকেই বাষ্পীয় শকটে পর্য্যটন করিবার ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম নহে, তথাপি যাহারা সক্ষম তাহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে যদিও কোন সামাজিক সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ব্যবসা সম্বন্ধ অতিবিস্তৃত ও অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে। আর ব্যবসা বিষয়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশবাসীরা পর্য্যটক বলিয়া বিদিত আছে। গভর্ণমেণ্টের রাজধানী ও শক্তিকেন্দ্র ও তাহার সহিত প্রজাদিগের সংস্রব বিশেষ আবশ্যকীয়। গভর্ণমেণ্টের মেল ও সৈনিক-দিগের বহনের জন্য গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। দ্রুত ভ্রমণের পক্ষপাতী কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ও বর্দ্ধিত সংখ্যক শিক্ষিত দেশীয়েরা সর্ব্বদাই রেলপথে ভ্রমণ করিবেন। আর কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি যে সকল তীর্থ স্থান আছে সেই সকলের জন্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু তীর্থ যাত্রীরা অচিরে গাড়িগুলি পূর্ণ করিবে। এই সম্বন্ধে দেশবাসীদিগের ধর্ম্মসংস্কারের বিষয়ও বিবেচনা করা উচিত, তবে তিনি স্বয়ং ভারতবাসী বলিয়া এ বিষয়ে কতক দৃঢ়তার সহিত তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতে সক্ষম। আরোহীদিগকে মুসলমান ও উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এই তিন ভাগে বিভাগ করা হউক। স্ত্রী আরোহীদিগের জন্য ভিন্ন গাড়ি নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং ইহা ব্যতীত একেবারে বার ঘণ্টার অধিক যাত্রীদিগের ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন না হইলে, কতিপয় নিতান্ত পুরাতন অভিমতের গোঁড়া বৃদ্ধ ভিন্ন সর্ব্বসাধারণ রেলপথে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইবে। কেবল স্ত্রীলোকদিগের ভ্রমণে বিশেষ আপত্তি হইবে তবে তিনি আশা করেন যে দেশীয় সংস্কারের এই দুর্গটিও বাষ্পীয়যানের সভ্যকরী প্রভাবে চুর্ণ হইয়া যাইবে।

পত্রশেষে তিনি বলেন যে রেলপথ প্রবর্ত্তনে ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম অভিমত সম্বন্ধীয় বিশাল পরিবর্ত্তন সংশাধিত হইবে, তাহা ব্যতীত তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এই প্রবর্ত্তনে ব্যবসারও ত্বরিৎ উন্নতি ও বিস্তৃতি হইবে, সুতরাং এই নব অনুষ্ঠানের সফলতার তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের অফিস দ্বারা বিস্তর বস্ত্রর আমদানী ও বিট্রিশপণ্যের বিক্রয় সাধিত হয়। কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে যদি রেলপথ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও আরও অধিক বস্ত্র আমদানী করিতে পারিবেন ও আরও অধিক বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন। রেলপথ প্রবর্ত্তনের সপক্ষতায় ইহাই তাঁহাদের স্পষ্ট ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আরও বলেন যে ল্যাঙ্কাসায়ারের (Lancashire) ব্যবসায়ীরাও তাঁহাদের ব্যবসার ভালমন্দের সহিত জড়িত, সে কারণ তাঁহারাও এই ভাবী অনুষ্ঠানের সমর্থন করিবেন।

সমস্ত সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। রামগোপাল যে সময়ে এই চিঠিখানি লিখেন, তাহার প্রায় এগার বৎসর পরে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ খোলা হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলি স্পর্শ করিয়া যাওয়ায় ইহা দেশের সমৃদ্ধির বিতরণে ও নানা প্রয়োজনীয় পণ্যাদি উপযুক্ত ক্রেতার হাটে দ্রুত ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিচালন করায় দেশবাসীর বহু অভাব মোচন করিয়াছিল। বাঙ্গালা হইতে ক্রমশ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী, বিহারী, মারহাট্টা, জাঠ, রাজপুত, মুসলমান প্রভৃতি ভারতের উন্নত জাতিগুলিকে ব্যবসাদি নানা সম্পর্কে মেলামেশা করাইয়া তাহাদিগের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে সহানুভূতি ও একটি জাতীয়তার একত্বে কেন্দ্রীকৃত করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল। এদিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সুগম করিয়া দিয়া প্রদেশগুলির শাসন ও সংরক্ষণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লীতে ভারত গর্ভর্ণমেণ্টের বারুদের গোলা ছিল, রেল লাইন দ্বারা এই কয়টি স্থান সংযুক্ত করিয়া সামরিক প্রয়োজনীয়তাও সাধিত হইয়াছিল। রামগোপাল তাঁহার পত্রে রেলপথ প্রবর্ত্তনে যে সকল সুবিধার আশা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথটি ভারতে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের সেয়ার (share) বাহির হইলে, রামগোপাল বিস্তর ক্রয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় যেদিন প্রথম এই রেল খোলা হয় সেদিন তিনি একখানি কামরা রিসার্ভ (reserved) করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া চুঁচুড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। ষ্টিফেনসন ইহার প্রথম এজেণ্ট নিযুক্ত হন, তাঁহার সহিত রামগোপালের বিশেষ সম্প্রীতি হয়। রামগোপাল বাগাটি যাইবার জন্য হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতেন, ষ্টিফেনসন ইহা জানিতে পারিলেই তাঁহার কামরার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গল্প আরম্ভ করিতেন। ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ত্রিবেণী হইতে মগরা হাট ষ্টেসনে উঠিতে হয়, এই ষ্টেসনের সে সময়ে প্রচলিত একটা গল্প আমরা বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ" নামক পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"একজন ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকট নিম্নলিখিত গল্পটি বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একদিন কোথায় যাইতেছিলেন, মগরা ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন ট্রেণখানি ছাড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে রামগোপাল বাবুর পাল্কী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন কেবল রামগোপাল বাবু কি করেন দেখিবার জন্য তিনি ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ট্রেণখানি হঠাৎ আবার প্ল্যাটফরমে আসিয়া লাগিল। আবার গাড়ি থামিল দেখিয়া ব্রাহ্মণও গাড়িতে উঠিলেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

অনুরাগের পথে

(১)

অনুরাগের পথটী বাঁকা
কালো আঁখির আলোয় মোড়া
নয়ন জলের এলুন আঁকা।
দৃষ্টি সদাই উর্দ্ধপানে,
বিঘ্ন বাধা কেউ না মানে
আগায় পথিক ডুরির টানে
যায় যে রথের নিশান দেখা।

(২)

ইন্দ্রধনু রয় ফুটে রয়
সেই সে পথের কাজল মেঘে,
শিশির জমে মুক্তা যে হয়
অনুরাগের বাতাস লেগে।
পিয়ায় কাঁটা ফুলের মধু,
চোখে রূপের তুফান শুধু,
বুকের চেয়ে সুখ যে বড়
অঞ্চলে ফুল যায় না ঢাকা।

(৩)

এই পথেতে রাজার ছেলের
পরণে হায় গৈরিক বাস
সিংহাসনের নেয়না খপর
পদ্মাসনের পায় যে আভাষ।
চায় যে আলোক মগ্ন হতে
নির্ব্বাণেরি আনন্দেতে,
চকোরকে হায় ভূলোক ভুলায়
দূর শশধর পীযূষ মাখা।

(৪)

এ নয় ধূসর শুক্নো সড়ক
পূর্ণ চাতক আর্ত্তনাদে,
রৌদ্রে যেথায় কণ্ঠ শুকায়
বারি কণার প্রার্থনাতে।
ভ্রমর চলে এই পথে যে
পরাগ উড়ে, সারঙ বাজে,
এই পথে ফুল বুক পেতে দেয়
অফুরন্ত শোভার থাকা।

(৫)

সার্থবাহের নয়কো এ পথ
রুক্ষ মরুর বক্ষ দিয়ে,
মরালকুলের অরাল এ পথ
কমল কুঁড়ির বক্ষ দিয়ে।
কিরণ ধরে চাঁদকে পেতে
এই পথেতে হয়রে যেতে,
সুন্দর এ পথ বন্ধুর এ পথ
মন্দিরেতে তুলবে একা।

(৬)

দস্যু মারে কলসী কাণা
রক্ত পড়ে ঝরঝরিয়ে
লৌহকে প্রেম স্বর্ণ করে
আলিঙ্গনের আঘাত দিয়ে।
সবাই চাহে ব্যাকুল চিতে
আপনাকে তাই বিলিয়ে দিতে,
ভোগের এ পথ, ত্যাগের এ পথ
ফাগের রাগে এ পথ পাকা।

(৭)

দীর্ঘ এ পথ অসীম সীমা
শেষ নাহি এর চক্রবালে
চলাই চরম আনন্দ এর
রূপের ছায়ার অন্তরালে।
বৃন্দাবনের কদম বীথি
শেষ নাহি এর অপার প্রীতি
কুঞ্জে কোথায় ঝুলন দোলে
দোলে নোয়ায় তমাল শাখা।

শ্রীকমলরঞ্জন মল্লিক

আধুনিক বাংলাভাষার গঠনের দোষগুণ

সাহিত্য জাতির মানসিক সম্পদের মাপকাঠি। বুদ্ধির দিক দিয়া যে জাতির উপার্জ্জন যত বেশী, ভাষাও সে জাতির তত সম্পদশালী। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি যাহাদের যত প্রখর, কল্পনা যাহাদের যত সজাগ, ভাষা প্রকাশের ভঙ্গী তাহাদের তত সুন্দর, ভাবের আবেশে তাহা তত ভরপূর। ভাষার আবেগের মাঝখানেই জাতির জীবন-চাঞ্চল্য ধরা পড়ে। সাহিত্যে চিন্তার সুস্পষ্টতা ও সামঞ্জস্য জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় দেয়। এক কথায় সভ্যতার পথে জাতি কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ভাষা তাহার পরিমাণ বলিয়া দেয়। কোন ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে সেইভাষা-ভাষী জাতির সভ্যতার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হিসাবে ধরা যায়।

বাহিরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যে জাতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, উন্নতির ক্রমিক-ধাপগুলি তাহাদের খুব স্পষ্ট হইলেও অগ্রগমনের গতি তাহাদের খুব মৃদু, তাই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহারা যে চলিয়াছে বুদ্ধি দিয়া একথা বুঝিতে পারিলেও, মনে ইহা তাহাদের কোন বিপ্লব আনিয়া দেয় না। পরিবর্ত্তন তাহাদের উপর একেবারে আসিয়া চাপিয়া পড়ে না। কিন্তু নিজ স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে চিরকাল বাস করিয়া হঠাৎ যাহারা কোন বৈদেশিক আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে তাহাদের অবস্থাটা কিছু অন্যপ্রকার হইয়া দাঁড়ায়। বদ্ধ মনোভাব ও সঙ্কীর্ণ বিশিষ্টতার বাঁধ বাহিরের প্রবল ধাক্কায় একেবারে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যায়। এই প্লাবনের মুখে জাতির সাহিত্য, চিন্তার ধারা ও মনোভাব সমস্ত বদলাইয়া যায়। জাতির এক শ্রেণীর লোক কিন্তু ইহাকে সুনজরে দেখিতে পারেন না। বদ্ধ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে অর্দ্ধেকটা জীবন যাঁহারা কাটাইয়া দিয়াছেন এই দম্‌কা বাতাসের ঝাপটা খাইয়া তাঁহারা অনেকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। আর এক শ্রেণীর লোক কিন্তু ইহাকে প্রাণে-মনে বরণ করিয়া লন। এই পরিবর্ত্তনকে স্থায়ী ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য প্রাণপণ করেন। তবে স্বাধীনতার সমস্ত সুফলের সাথে তাহার হঠাৎ আগমনের কুফল উচ্ছৃঙ্খলতা ইঁহাদিগকে অনেক যায়গায় পাইয়া বসে। আর ইঁহারাই হইতেছেন সমাজের শক্তিশালী লোক, জাতির যাহা কিছু সৃষ্টি ও গঠনের কাজ তাহা ইঁহারাই করিয়া থাকেন। তাই ইঁহাদের নবসৃষ্ট সাহিত্যের উপর তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ কিছু পড়িয়া যায়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে বাহিরের সাথে এমনি এক প্রচণ্ড ধাক্কা বাঙালী খাইয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্য বাঙালীর মনের ঝোঁক, তাহার সভ্যতা ও মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেও এই নবজাত সাহিত্যের বিবর্ত্তন ধীরে ও ক্রমে হয় নাই। মানুষের ক্রমবর্দ্ধিত চিন্তাশক্তি ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করিবার জন্য অবিরত দুঃসহ যুদ্ধ করিয়া জাতির অজ্ঞাত-সারেই তাহার সাহিত্যে একটা

পরিবর্ত্তন এখানে আনিয়া দেয় নাই। বিদেশের চিন্তা ও সাহিত্য একদিনে আসিয়া আমাদের উপর চাপিয়া পড়ে। এক শ্রেণীর লোক ইহাকে গ্রহণ করিয়া অতি-দ্রুতগতিতে সাহিত্যকে এক অজানা সার্থকতার দিকে লইয়া চলিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন এইদিকই শ্রেয়ের দিক। আর এক পক্ষ কিন্তু এই পরিবর্ত্তনকে মহা অশুভসূচক বলিয়া মনে করিতেছেন। বাঙ্‌লার অধুনাতন সাহিত্য প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরই সৃষ্ট। কাজেই একশত বর্ষের পূর্ব্বের বাংলার সহিত বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আর তুলনাই হয় না। ভাবে, সম্পদে, চিন্তায়, প্রকাশের ভঙ্গিতে ও পদবিন্যাসে বর্ত্তমানের বাংলা একেবারে স্বতন্ত্র জিনিষ। এই পরিবর্ত্তিত বাংলার মধ্যে কতটুকু ভাল আর কতটুকু মন্দ সেই কথাটাই বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

গতানুগতিক জীবন যাত্রার পথে বাঙালীর যখন প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে দেখা হয়, সে আজ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ক্রমে পাশ্চাত্য-সভ্যতা বাঙালীর জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। শিক্ষায় দীক্ষায় সংস্কারে বাঙালী একেবারে আলাদা মানুষ হইয়া গেল। সাহিত্য কিন্তু তখনও পিছনে পড়িয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষা বাঙালীর মনে যে সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইয়া তুলিল, চিত্তের যে প্রসারতা বাড়াইয়া দিল নিজ সাহিত্যে বাঙালী তাহার উপযুক্ত কোন জিনিষের সন্ধান পাইল না; তাই ইংরাজী শিক্ষিত সে কালের বাঙালীদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা দেখা যায় নাই।

বাংলাভাষার উন্নতির প্রথম সোপান হইতেছেন বঙ্কিম বাবু। শক্তিশালী লেখকের হাতে পড়িয়া বাংলাভাষা সেই প্রথম সম্পদ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কঠিন বাধা নিষেধের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে ভাব আর সেদিন আটকা রহিল না; নিজের প্রকাশের জন্য শব্দ সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে ও ভিন্ন সাহিত্য হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া তাহার পথ সে সুগম করিয়া লইল। বাঙালী যখন দেখিল যে তাহার চিন্তা ও ভাব তাহার মাতৃভাষায় সুন্দর ও পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে পারে, তখন নিজ ভাষার প্রতি সে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু এই যে বিধি-নিষেধের বাঁধে একটু ছিদ্র করিয়া দিয়া গেলেন প্রবল বন্যা সেই পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিমেষে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বিদেশী শিক্ষাপুষ্ট বাঙালীর চিন্তাকে নিজবক্ষে স্থান দিতে যাইয়া ভাষা একেবারে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ত ইহার মধ্যে আসিয়া কিছু প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তাহা স্বাভাবিক এবং হয়ত বা তাহার প্রয়োজনই আছে।

চিন্তা ও ভাবের দিক দিয়া সাহিত্যে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কথা আজ বলিব না—আজ শুধু ভাষার গঠনের কথা বলিব। যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি দেখিতে পাই সে হইতেছে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রচনা প্রণালীর অনুসরণ, ভিন্ন সাহিত্য ও কথিত ভাষা হইতে শব্দসংগ্রহ এবং দেশের অংশ বিশেষে প্রচলিত ক্রিয়া পদগুলিকে সাহিত্যে স্থান প্রদান। এই সমস্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেছেন যে বাংলা সাহিত্যে আজ কোন নিয়ামক

কেন্দ্রশক্তি নাই—ব্যভিচার আসিয়া আজ সেখানে নিয়মের আসন দখল করিয়া বসিয়াছে। একে একে একথাগুলির সত্যতা পরখ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

সর্ব্বপ্রথম বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রচনা প্রণালীর অনুসরণের কথা। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে যত জিনিষ দিয়াছে তাহার মধ্যে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হইতেছে এই যে—সে আমাদের সৌন্দর্য্য বোধ ও রসানুভূতিকে অধিকতর জাগ্রত করিয়াছে। সাধারণতঃ আমরা লিখি দুই কারণে। আমাদের কোন আবেগ বা অনুভূতিকে যখন মূর্ত্তি দিতে ইচ্ছা করি তখন আমরা লিখি; আর সেই যে লেখা সে হয় নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—একেবারে ছবি আঁকা। সবার সৌন্দর্য্য বোধ কখনও একরকম হয় না। একই জিনিস সবার মনে একই রকম সাড়া দেয় না, আবার একই প্রকাশের মধ্যে দুইজন লেখক তাঁহাদের মনের ছবির নিখুঁত মূর্ত্তি দেখিতে পাননা। তাই এই রকম লেখায় দুইজন লেখকের রচনাপ্রণালী কখন এক হইতে পারে না।

আর আমরা লিখি প্রয়োজনের তাগিদে, আমাদের চিন্তা এবং কল্পনাকে প্রকাশ করিতে। এই লেখার মধ্যেও আমরা আমাদের মনের রসকে মিশাইয়া দিই—আমাদের নিজ নিজ বোধ অনুসারে তাহাকে সুন্দর করিয়া বলিবার চেষ্টা করি। তাহা বাদে আমাদের চিন্তার ধারাও কিছু কিছু তফাৎ। কাজেই এই জাতীয় লেখার প্রণালীও আমাদের পৃথক হয়। এই নিয়মানুসারে অবশ্য সব লেখকেরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। কিন্তু প্রত্যেক লেখকই ত একটা একটা বিশেষ ধরণে লেখেন না। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই এক একটী বিশিষ্ট ধরণে লিখিবার এক একটী দল আছে। এ সম্বন্ধে একটী কথা আছে। যাঁহাদের মনের গঠন অনেকটা এক প্রকারের, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহারা একই পথের অনুসরণ করেন। এই একই পথের পথিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও তাহার মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া তাহাকে আলাদা করা যায় না। আমাদের এই মনের গঠন আবার ঢালাই হয় এমন সব শক্তিশালী লেখকদের ছাঁচে যাঁহারা বিশেষভাবে তাঁহাদের সমসাময়িক সাহিত্য প্রভাবান্বিত করেন। আমাদের কেহ কেহ আদর্শ হিসাবে অতীতের কোন শক্তি-শালী লেখককে গ্রহণ করেন আর আমাদের অধিকাংশ চালিত হন বর্ত্তমানের দ্বারা। অবশ্য একটী ভাষায় যখন এই প্রকার পাঁচ সাত জন ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক আবির্ভূত হইয়া পাঁচ সাত রকমের পৃথক রচনা প্রণালীর প্রচলন করিয়া যান, তখন আর পরবর্ত্তী লেখকদের আবার কোন নূতন প্রণালী গ্রহণের আবশ্যকতা প্রায় হয় না; প্রচলিত রীতির কোন না কোন একটী তাঁহাদের মনের সহিত খাপ খাইয়া যায়। বাংলা ভাষার এই পরিণত অবস্থা এখনও আসে নাই। যে দুই জন লোকের রচনাভঙ্গী সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাঁহারা হইতেছেন বঙ্কিমবাবু এবং রবিবাবু। যাঁহারা এই দুই জনের কাহাকেও ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিতে পারেন না তাঁহারা নিজ নিজ পছন্দমত রীতি সাহিত্যে চালাইবার অক্ষম চেষ্টা করিয়া হয়ত

ভাষাকে কিছু পীড়িত করিতেছেন। ইহা স্বাভাবিক, এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। ইহা সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ দিতেছে। বাংলার গল্প সাহিত্যে কয়েকজন লেখক এক কবিত্বময়ী মিষ্ট ভাষার সৃষ্টি করিতেছেন। এঁদের ২।১ জনের শক্তি দেখিয়া মনে হয় যে এঁদের এই আরম্ভ ভবিষ্যৎ সাফল্য-জ্ঞাপক। শরৎ বাবুই ইঁহাদের অগ্রণী,—ইঁহা হইতে দুই এক জন একটু ভিন্ন পথেরও অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু রচনার কাঠামো সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যাঁহারা অভিযোগ করেন তাঁহাদের একটা কথা সত্য। যাঁহাদের নিজেদের কোন বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যবোধ নাই এমন অনেক লেখক সৌন্দর্য্যের নামে কথা অনর্থক কায়দা করিয়া বলিতে যাইয়া,—ভাবের দৈন্য, কথার চটকে ঢাকিতে যাইয়া শুধু যে লেখা কদর্য্য করিয়া ফেলেন তাহা নয়, ভাহার অর্থ অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও ধোঁয়াটে করিয়া ফেলেন। অনেক সাময়িক লেখক আবার রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিত্বময়ী ও ভাবপ্রকাশক কথা অকারণে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া সে কথাগুলির অবমাননা ও অর্থহানি ত করেনই, পরন্তু নিজেদের লেখারও সত্য-সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। আমরা দেখাইলাম যে বিভিন্ন প্রণালীর রচনা নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবের পরিচয় প্রদান করে না, আর ব্যভিচার যে কিছু কিছু আসিয়াছে একথা সত্য হইলেও অতি স্বাভাবিক। কাদা না তুলিয়া শুধু মাছ জালে ধরা যায় না।

ভিন্ন সাহিত্য হইতে কথা সংগ্রহের বিরুদ্ধে অনেকে এই কথা বলেন যে, ইহাতে ভাষার শুদ্ধিতা নষ্ট হইয়া বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিতেছে এবং সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে ভাষা ক্রমে দুর্বোধ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে ভাষা শক্তিশালী ও গতিবিশিষ্ট, বাহির হইতে দুই দশটী কথা আসিয়া তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না; নিজের রঙে ভাষা তাহাদিগকে রঙ্গীণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের মনের সমস্ত ভাব ও চিন্তা যথাযথভাবে সব সময়ে প্রকাশ করিতে পারি, এমন শব্দ-সম্পদ আমাদের ভাষায় নাই। শুধু আমাদের কেন, যে প্রচণ্ড গতিতে আজিকার বিশ্বসভ্যতা ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত করিয়া অগ্রসর হইতেছে, বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলনে যে চিন্তার তরঙ্গ ও ভাবের বিপ্লব সমগ্র মানবজাতিকে আজ চঞ্চল করিয়াছে তাহাকে অন্য কোন ভাষার সাহায্য না লইয়া প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কোন ভাষারই নাই। এই যে ইংরাজী ভাষার মত অতি সম্পদশালী ভাষা, কত বিদেশী শব্দে ইহার অঙ্গ পুষ্ট। আর ভিন্ন দেশীয় শব্দের তালিকা ইহার নিত্যই দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে বিশেষতঃ ইহার বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি শাখায় অন্য দেশ হইতে কথা ধার করিতেই হইবে। কিন্তু এদিকেও যথেষ্ট সাবধান হইবার আছে। যে কোন লেখক যে কোন ভাষা হইতে যে কোন শব্দ গ্রহণ করিলে যে কোন জাতি তাহা গ্রহণ করিবে তাহা বলা যায় না। যে জাতীয় কথাগুলি আমাদের নাই অন্য কাহারও নিকট হইতে তাহা লইবার সময় আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে কোন্ ভাষায় সেই শব্দগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশক (expressive) এবং কোন্‌গুলিই বা আমাদের ধাতু প্রকৃতির সহিত সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক খাপ খায়। এদিক দিয়া আরও করিবার আছে। পাঁচ বা সাত বৎসর বা এমনি কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সাহিত্যে কি কি শব্দের আমদানি হইল সে সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান হওয়ারও প্রয়োজন, এবং এই নূতন আমদানি শব্দগুলির বিষয় সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। ইহাতে ঐ সব নূতন শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকের মনে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য পরিষৎ বোধ হয় এ সম্বন্ধে কিছু করিতে পারেন। অবশ্য এখানে একথা বলা দরকার যে বিনা কারণে বিদেশী বা স্বদেশী ভিন্ন সাহিত্যের কথা দিয়া লেখা বোঝাই করিলে তাহা অপাঠ্যই হয়। দুই শ্রেণীর লেখকের কাছে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। এক শ্রেণী হইতেছেন অতি সংস্কৃত-প্রিয়; ইঁহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিলেও ইঁহারা একেবারে বিরল নহেন। ইঁহাদের একটা কথা মনে রাখিলে চলিবে যে বাংলা ও সংস্কৃত পৃথক ভাষা, একটির ব্যাকরণ ও শব্দসম্ভার আর একটীর ঘাড়ে আনিয়া চাপাইলে সে তাহা বহন করিতে পারিবে না। অবশ্য ইঁহাদের বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ কেহ করেন না। দ্বিতীয় দল হইতেছেন যাঁহারা বাংলার মধ্যে ইংরাজী ভাঁজ না দিয়া লিখিতে পারেন না। অনেক সময় দুই একটা কথার পুরাপুরি অর্থবোধক বাংলা খুজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই অজুহাতে খিচুড়ী পাকান কখন উচিত নয়। যে সমস্ত অর্থবোধক শব্দগুলি বাংলায় নাই তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম ভারতের জীবিত ও মৃত অন্যান্য ভাষাগুলির দ্বারস্থ হওয়া উচিত। সেখানে বিফল হইলে পার্শী বা আরবী প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষা আমাদের ভাষাগঠনের অনেক সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ইউরোপীয় অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ আমাদের ভাষার সহিত খাপ খাওয়ান শক্ত, কাজেই ওখান হইতে শব্দ সংগ্রহ একেবারে নিরুপায়ের উপায়। তাই বলিয়া চেয়ারের পরিবর্ত্তে কেদারা লিখিতে যাওয়া অবশ্য হাস্যজনক। আর এ বিষয়ে সাবধান হইবার আছে দুই একজন মুসলমান লেখকের তাঁহাদের উর্দ্দূ শব্দপ্রিয়তা সম্বন্ধে।

এখন কথিত ভাষাকে সাহিত্যে স্থান প্রদান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ইহার দুইটী দিক আছে। প্রথম হইতেছে,—আমাদের চল্‌তি কথার মধ্য হইতে শব্দসংগ্রহ; দ্বিতীয় হইতেছে,—দেশের অংশ বিশেষে প্রচলিত ক্রিয়াপদকে অপরিবর্ত্তিতভাবে সাহিত্যে গ্রহণ। প্রথম কথা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, যে সব শব্দের সাহায্যে ভাব আমাদের মনে নিত্য আনাগোনা করে সেই সব শব্দের দ্বারা গঠিত যে ভাষা তাহার সহিত আমাদের মনের সম্বন্ধ অতি নিকট। সে ভাষা আমাদের মনকে যত গভীরভাবে স্পর্শ করে খুব সুলিখিত মার্জ্জিত ভাষা কখন তাহা পারে না। আমাদের কথিত ভাষায় সমস্ত ভাব প্রকাশ করিবার মত শব্দপ্রাচুর্য্য নাই তাই, সাহিত্যে কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিছক কৃত্রিম শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সাহিত্য তাহা কখনই আমাদের মনের কাছে আত্মীয়রূপে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের নিত্য-পরিচিত কথাগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া যখন আমাদের কাছে তাহারা হাজির হয় তখন পরিচিত কথার ছোঁয়াচে তাহাদিগকে

অনেকটা পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যায়। অনেকে আবার সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী হইলেও বলিতেছেন যে, শুধু পশ্চিম বঙ্গের ভাষাকেই সাহিত্যে চালাইয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গকে ছাঁটিয়া ফেলা হইতেছে। ইঁহাদের বিপক্ষে অনেক কিছু বলিবার আছে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ভাষার মধ্যে যখন পার্থক্য রহিয়াছে তখন দেশের কোন্ অংশের ভাষা সাহিত্যে স্থান পাইবে তাহা নির্ভর করে কয়েকটী জিনিষের উপর। প্রথমতঃ, দেশের যে অংশের ভাষার সহিত সাহিত্যে প্রচলিত ভাষার সাদৃশ্য অধিক সে অংশের ভাষার দাবী একটু বেশী আছে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের যে অংশে অধিক সংখ্যক অধিকতর শক্তিশালী লেখক জন্মান সে অংশের ভাষা সাহিত্যে বেশী প্রচলিত হইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রধান কারণটী এখনও বলা হয় নাই। দেশের যে অংশে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য বন্দর এবং রাজধানী অবস্থিত সেই অংশের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দেশের সমস্ত দিকের লোক নানা প্রয়োজনে এখানে আসিয়া মিলিত হয়; কাজেই এখানকার কথার সহিত দেশের সর্ব্বাংশের লোকের যতখানি অধিক সংস্পর্শ ঘটে অন্য কোন স্থানের পক্ষে ততখানি সম্ভব নহে। কাজেই পশ্চিম বঙ্গের চল্‌তি কথা হইতে শব্দ সংগ্রহের বিরুদ্ধে সঙ্গতির দোহাই দিয়া, বিশেষ কিছু বলা যায় না। অবশ্য সমগ্র দেশের লোক যাহাতে কথ্য ভাষার সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন কোন কথা ব্যবহার করা উচিত নয় যাহা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে আবদ্ধ এবং দেশের অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত ভাব-প্রকাশক নূতন রকমের কথা আছে তাহাদিগকে সাহিত্যে স্থান দিতে হইবে।

এখন বাকি রহিল পশ্চিম বঙ্গের স্থান বিশেষে প্রচলিত ক্রিয়াপদগুলিকে অবাধে যে সাহিত্যে চালান হইতেছে সে সম্বন্ধে দুই এক কথা। এ সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত কথা বলা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের এক খণ্ডাংশে সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বঙ্গবাণীতে "ভাষা—আট পৌরে ও পোষাকী" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। তাঁহার যুক্তি অতি সুসঙ্গত। প্রত্যেক লেখকেরই ও-কথাগুলি ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থলে ভাষার যাহা তফাৎ তাহার অধিকাংশই হইতেছে ক্রিয়ার উচ্চারণে। আর এই ক্রিয়ার উচ্চারণ অনেক স্থলেই ১৫ ২০ মাইল অন্তর অন্তর বেশ উপলব্ধি করার মত তফাৎ, কাজেই কোন স্থান বিশেষের ক্রিয়াপদকে চালাইলে ভাষাকে যে শুধু প্রাদেশিক করা হয় তাহা নয় তাহাকে অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হয়। এ সম্বন্ধে একটা সাহিত্যিক বাঁধা-বাধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখিতেছি যে বহু লেখক, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, চল্‌তি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিতেছেন। আমার মনে হয় ইহা অতি মার্জ্জিত ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এবং স্বাধীনতার হঠাৎ আগমনের কুফল উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ, যার কথা গোড়ায় বলিয়াছি।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

দুকুল হারা

নিশিতে গোপনে আমার ক্ষুদ্র
উঠানের এক পাশে,—
থরে থরে ফুল গন্ধব্যাকুল
রজনীগন্ধা হাসে।
রাজ উদ্যানে ফুটেছে বসোরা,
গন্ধে তাহার দিক মাতোয়ারা,
ঘোর ঘোর ভোর চোরের মতন
গিয়াছিনু সেই আশে,—
রজনীগন্ধা রহিল ফুটিয়া
বিমল শুভ্র বাসে।

পরশিতে ফুল দুলিয়া দুলিয়া
হাসিল গর্ব্বভরে,—
কাঁটার আঘাতে কাটিল আঙুল
রক্ত ঝরিয়া পড়ে।
রাজ প্রহরীরা করে চীৎকার,
কঠিন তাড়না দণ্ড প্রহার,
মরণ অধিক লজ্জার ব্যথা
লইয়া ফিরিনু ঘরে,—
বেদনা-বিকল সকল অঙ্গ
নয়নে অশ্রু ঝরে।

মুছিয়া নয়ন আঙ্গনার কোণ
চাহিয়া দেখিনু হায়!
বেলা দু'পহর তপন প্রখর
লেগেছে ফুলের গায়।
এলায়ে পড়েছে দলগুলি তা'র,
ঝরিয়া গিয়াছে সৌরভ ভার,
নবনী কোমলা ফুলবালা মোর
অনাদরে মরে যায়,—
ক্ষণেকের ভুলে পদ পিছলিয়া
দুকূল হারানু হায়।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী

চিত্রাবলী

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

বিষয়াসক্ত

বাউল

দিদি

দৈবের খেয়াল

বিসর্জ্জন
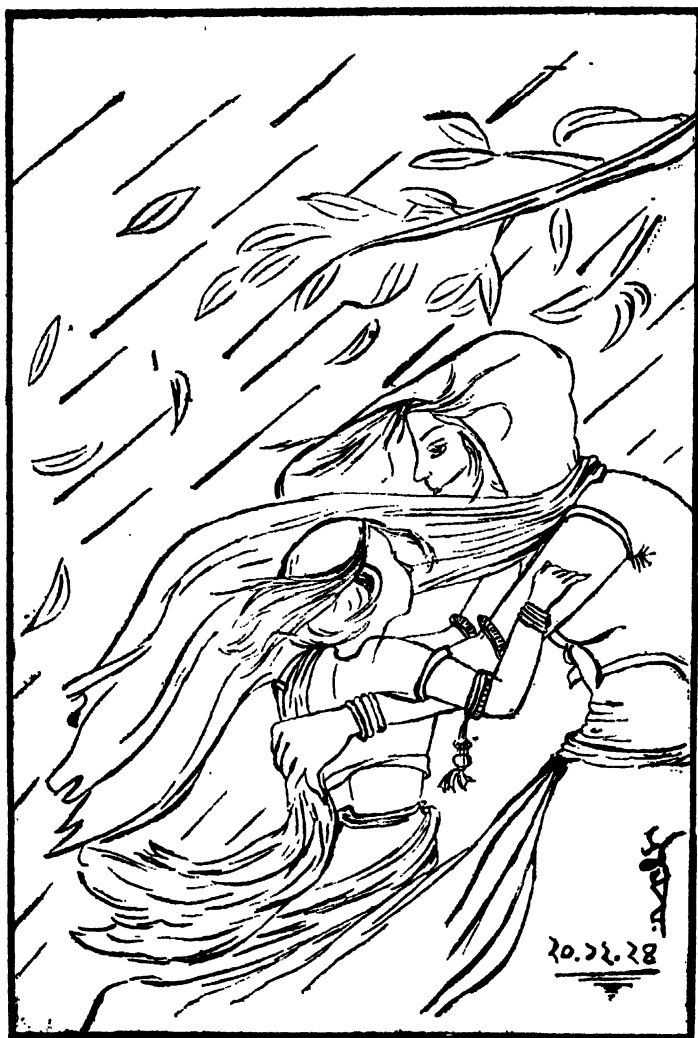
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সবিতা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে তখন অভিমান করিয়া আসিলেও ভাবিয়াছিল যে, স্বামী তাহাকে আবার নিশ্চয়ই সাদর আহ্বান করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও তাহার কোন লক্ষণ না দেখিয়া সে যেমন ব্যথিত হইল, তেমনই রাগও করিল। স্বামীর যে এরূপ কঠিন প্রাণ, তাহা ত সে পূর্ব্বে জানিত না।

সবিতা সেই যে শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ জানিয়াছে, তাহার পরে সে তাহাদের আর কোন সংবাদই জানিতে পারে নাই। সে এখানে আসিবার পরে কঠিন-হৃদয় স্বামীর মাত্র একখানা পত্রই পাইয়াছিল। তাহার পরে যদিও পিশিমা তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামী ত তাহাকে যাইবার জন্য একবারও বলে নাই। সত্য সত্যই যে এই দুইদিনের মধ্যেই সে স্ত্রীকে ভুলিয়া যাইবে, তাহা ত পূর্ব্বে সে ধারণাও করিতে পারে নাই। তুচ্ছ অভিমানের ফল যে সত্যই এতদূর আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা যে তাহার ধারণার অতীতই ছিল।

সে একবার ভাবিল যে, সেখানে ফিরিয়া যাইবে। তাহার যখন পরাজয়ই হইল,—ললিতার অখণ্ড ভবিষ্যদ্বাণীই যখন সিদ্ধ হইল, তখন কেন আর বৃথা এই দহন জ্বালা সহ্য করা। কিন্তু আবার মুহূর্ত্তপরেই সেই কথাটা ভাবিতেও লজ্জায় তাহার আপাদমস্তক রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ছি ছি, তাহা হইলে কি লজ্জার কথা হইবে! সে অভিমান করিয়া আসিয়া আবার নিজেই উপযাচিকা হইয়া ফিরিয়া গেলে স্বামী কি তাহাকে পরিহাস করিবে না? তাহার সেই পরিহাস যে সে সহ্য করিতে পারিবে না।

তবে কি উপায়? না, না, সে কখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেখানে যাইতে পারিবে না। ইহাতে যত কষ্টই হউক। স্বামী হয় ত সত্যই তাহার গৃহলক্ষ্মীকে আনিয়া সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। তাই হয় ত এই অভাগিনীর কথা তাহার মনেই নাই। স্বামীরই যদি তাহাকে প্রয়োজন না হয়, তবে সে কেন যাচিয়া তাহারই পদতলে স্থান লইতে যাইবে! কেন, তাহাদিগের দাসীত্ব করিতে যাইবে! সে কি এমনই একটা তুচ্ছ জীব!

আবার—আবার অভিমান। চক্ষু বহিয়া অভিমান-স্রোত দর দর ধারে ঝরিতে লাগিল। সে স্বামীর স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করিয়া নিজের অপরাধের কথা বিস্মৃত হইয়া গেল। ভাবিয়া দেখিল না যে, এই ঘটনার মূল দোষ কাহার। তাহার এ কথাও মনে হইল না যে, স্বামী তাহার নিকট হস্ত প্রসারণ করিয়া যাহা চাহিয়াছিল, তাহা সে দেয় নাই বলিয়াই স্বামী এইরূপ মনকে অন্য পথে চালনা করিয়াছে।

সবিতা রুদ্ধ অভিমানে দিবারাত্র মরমে মরিয়া থাকিত। তাহার স্বাস্থ্যও ক্রমেই খ হইয়া আসিতে লাগিল। কর্ত্তা মেয়ের অবস্থা দেখিয়া বড় বড় ডাক্তারের ঔষধ সেবন করাই লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। গৃহিণী মেয়ের স্বাস্থ্য নষ্টের প্রকৃত কা বুঝিতে পারিতেন। তাই তিনি একদিন কর্ত্তার নিকট সশঙ্কিতচিত্তে বলিলেন, "সবুকে শ্বশুরবা পাঠালে বোধ হয় ভাল হয়।"

বিস্মিত হইয়া কর্ত্তা বলিলেন, "কেন ?"

"ওর শরীর যে দিন দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে,—তাতে—"

"বাঃ, তুমি বলছ কি ? এখানে যেমন ডাক্তারের ওষুধ খাওয়াতে পারছি,—সেখানে কি অ তেমন হবে ? পাড়াগাঁয়ে মোটে ডাক্তারই নেই,—তা আবার ওষুধ !"

গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওর মনের কষ্টই শরীর খারাপ হওয়ার কারণ। আমার মনে হ সেখানে গেলেই ও ভাল হবে।"

"তুমি কি পাগল হয়েছ ? প্রথমতঃ, এখানে ওর যেমন চিকিৎসা হবে, সেখানে তেমন হ না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা কেউ একখানা চিঠি দিয়েও ত জিজ্ঞেস্ করেন না যে, ও কেমন আছে। অবস্থায় এমনভাবে সেখানে ঠেলে দেওয়া কি উচিত ? আমার মেয়ে কি এতই—যাক্, তা হবে পারে না।" বলিয়া উকীলবাবু ক্রোধ গম্ভীর মুখে গৃহিণীর দিকে চাহিলেন।

গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সবটার চেয়ে জীবনটা বেশী।"

"সেখানে গেলেই যে জীবনটা থেকে যাবে, আর আমার এখানে থাকলেই কি—"

গৃহিণী বাধা দিয়া শঙ্কিতচিত্তে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "চুপ কর, ওগো, চুপ কর। এম অলক্ষুণে কথা মুখে এনো না।" কর্ত্তা নীরব হইলেন। ক্রোধে অপমানে তিনি কি বলিবেন, f করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। গৃহিণীও ক্ষুণ্ণমনে নিঃশব্দে রহিলেন।

ধীরে ধীরে দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সবিতার গর্ভস্থ সন্তান দিন দিন বাড়ি উঠিতে লাগিল। গৃহিণী মেয়ের সাধের আয়োজন করিলেন।

উকীলবাবুর বন্ধুবান্ধব সকলে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীতে ক্ষুদ্র এক উৎসবের আনন্দ কল্লোল উত্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার জন্য এই উৎসবানন্দ, তাহার মু আনন্দের একটি রেখাও ফুটে নাই। মুখখানা যেন একেবারে তমসাবৃত। মেয়ের মলিন মু দেখিয়া গৃহিণীর মুখেও হাস্যরেখা ফুটিতেছিল না।

সপত্নীর সাধোপলক্ষে আমন্ত্রিতা হইয়া ছায়াও সেখানে আসিল। সবিতার ম্লান গম্ভীর মু দেখিয়া সে প্রাণে বড় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। সে ভাবিল যে, বোধ হয় সবিতা তাহার প্রা তাহার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই বুঝি তাহার এই বেদনা !

ভাবিতেই ছায়ার মুখখানি যেন আপনিই নত হইয়া গেল। মনে মনে স্বামীর প্রতি বিষম রাগ হইল। ছি ছি, পুরুষ হইয়া এতখানি দুর্ব্বলতা!

ছায়া নতমুখে বসিয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কে যেন মৃদুস্বরে বলিল, "চুপটি করে বসে আছ কেন ভাই? ওদিকে ওদের কাছে চল না।" ছায়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সবিতা বলিতেছে।

ছায়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে সবিতার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "এখানেই বস না ভাই, দু'চারটে কথাবার্ত্তা বলি।"

সবিতা ছায়ার নিকটে বসিয়া বলিল, "কি বল্‌বে, বল না ভাই!"

ছায়া কি বলিবে, নীরবে বসিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া ইত্যবসরে সবিতা বলিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?" ছায়া একটু নীরব থাকিয়া পরে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "এখানেই।"

"না, তা নয়। তোমাদের আসল বাড়ী কোথায়?"

ছায়া সহসা কিছু বলিতে পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল, কি জানি যদিই সবিতা তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে!

তাহাকে নীরব দেখিয়া সবিতা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ, বল না ভাই।"

ছায়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না—ভাব্‌ব আবার কি! আমাদের বাসগ্রাম এই কলকাতার কাছেই।"

"তোমার আর কে আছে?"

"বাবা।"

"তিনি ছাড়া আর কেউ নেই? তোমার স্বামী—?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া ছায়ার সমস্ত শরীরখানি যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে কি উত্তর দিবে, মুখ হইতে যেন বাক্য নিঃসরণই হইতেছিল না। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া সবিতা কৌতূহলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় গৃহিণী সেখানে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তোমরা ওদিকে চল মা, বেলাটা যায়। আয় সবু, ঐ শাড়ীখানা পরে নে।" সবিতা উঠিল। ছায়াও একটি মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া যেন বাঁচিল। ললিতা সহাস্যে ছায়ার হাত ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল।

যথাসময়ে রমণীরা সানন্দে ভোজনাদি করিয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া যাইতে লাগিল। ছায়াও গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। সে যাইবার সময় সবিতা তাহাকে বলিয়া দিল, "কাল

আবার অবশ্যই এসো। আমি ঝিকে পাঠিয়ে দেবো, বুঝেছ ?" ইহাতে ছায়া অসম্মত হইতে পারিল না। নীরবে মস্তক হেলাইল। কিন্তু তাহার মন ইহাতে সায় দিতেছিল না।

ছায়ার অদ্ভুত ভাব দেখিয়া সবিতা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তাহার পরিচয়টা ভালরূপ জানিবার জন্য তাহার একটা অদম্য কৌতূহলও হইয়াছিল। তাই সে ছায়াকে আবার আনাইয়া তাহার পরিচয়টা ভালরূপে জানিবার সঙ্কল্প করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে ছায়াকে আনান হইল। সকলে বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "কাল ত আর কথা বার্ত্তার সময়ই ঘটে উঠ্‌ল না। তাই আজ—"

ললিতা বলিল, "বেশী দূর ত নয় ভাই, তুমি ইচ্ছে করলে রোজই এখানে আসতে পার। মুহুরিমশায় সেদিন বাবার কাছে বলছিলেন যে, তুমি একা বাড়ীতে থাক,—বড় কষ্ট হয়; কেন ভাই, আমাদের কাছে যদি এস, তবে আমরা যেমন খুসী হই, তুমিও ত তেমন একটু খুসি হ'তে পার।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "একা ? কেন, আর কেউ নেই ?"

ললিতা ছায়ার হইয়া উত্তর করিল, "না, আর কেউ নেই। একজন ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন।"

"তাই নাকি ?" বলিয়া গৃহিণী ছায়ার দিকে চাহিলেন। ছায়া উত্তরের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সকৃতজ্ঞ নয়নে ললিতার দিকে চাহিয়া রহিল। সবিতা পূর্ব্বদিনের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই, তোমার স্বামী কোথায় ? তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও না কেন ?"

ছায়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ললিতা সবিতার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও যদি তোকে এখন এ কথা জিজ্ঞেস্ করে, তবে তুই কি উত্তর দিবি বল্ দেখি ?"

সবিতা রাগিয়া বলিল, "তোমায় তা শিখিয়ে দিতে হবে না। তুমি এমন কেন দিদি ? তোমার জ্বালায় আমি একটি কথা পর্য্যন্ত বলতে পারি নে।"

ছায়া মৃদু হাসিয়া সবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সবিতা খানিক হাসিয়া, খানিক রাগ করিয়া নাকিস্বরে বলিল, "দিদি এমনই—হুঁঃ।"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোরা প্রায় কলির বুড়ী হয়ে এলি, এখনও তোদের ছোটবেলাকার সেই অভ্যাসটা গেল না।"

ললিতা একটু হাসিয়া আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "না,—আর ছেলেমানুষী নয়। বল ভাই, কাজের কথা বল।"

ছায়া ভাবিয়া দেখিল, সেই একটা কথা জানিবার জন্য ইহারা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, এই অবস্থায় কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকাটা নিতান্ত অশোভন। অথচ সত্য কথাটি বলিতে গেলেও তাহার ফল কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে জানে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে ছায়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "এখানে বাবা একা কি করে থাকবেন, তাই আমিই তাঁর কাছে থাকি।"

গৃহিণী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু তাঁরা এতে আপত্তি করেন না?"

ছায়া কি উত্তর দিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কারা?"

"তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা?"

ছায়া সামলাইয়া লইয়া অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, "না, তাঁরাও বেশী আপত্তি করেন না। আমিও বাবাকে একা ফেলে যেতে চাই নে, এখানেই বেশ আছি।"

গৃহিণী প্রথমতঃ বিস্মিতনয়নে ছায়ার দিকে চাহিলেন, পরে দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বামহস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "মেয়ে জন্মে বুঝি কেবল দুঃখ ভোগের জন্যই। আমার সবুর দশাও প্রায় তোমার মতই মা।"

এই স্থলে কিছু না বলা ভাল দেখায় না বলিয়া, ছায়া নিজের অনিচ্ছাস্বত্বেও মৃদুস্বরে বলিল, "কি রকম?"

গৃহিণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এই ত দেখ না মা, ভাল ঘর বর দেখে মেয়েটাকে বিয়ে দিলেম, কিন্তু ভিতর দিয়ে যে ওর কপালটা এমন ভাঙ্গা, তা আগে জানতুম না। ছেলে নাকি আগে একবার বিয়ে করেছিল, কিন্তু সেই বউ পছন্দ না হওয়ায় আবার বিয়ে করলে। কিন্তু সেই নচ্ছাররা আগে একথা আমাদের জানায় নি। তা হলে কি আর সেখানে মেয়ে দিতেম! কিন্তু পরে একথা প্রকাশ হয়ে গেল। সবু ত একথা শুনে, সুরেশের উপর রাগ করে চলে এল। কিন্তু তারা এমন ছোটলোক, প্রথম পোয়াতী বউ, রাগ করে চলে এলেও একবার তার খবরটাও ত নেওয়া উচিত। কিন্তু সে সব কিছুই না, একেবারে চুপচাপ। তারপরে হঠাৎ একদিন সুরেশের এক চিঠি এল, যে তার বাবার ব্যারাম, সবু যদি যেতে চায়, তবে যেন পাঠিয়ে দিই। কিন্তু আমরা ত আর তেমন বেহায়া নই যে, যে মারবে, বেড়ালের মত ছুটে আবার তারই কাছে—"

ছায়া আর শুনিতে পারিতেছিল না। অসহিষ্ণুর মত তাঁহার কথা পূর্ণ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "সকলই কর্ম্মফল। কারও দোষ দেওয়া মিথ্যা। তবে আমার জীবনের কথা এ রকম নয়। এর সম্পূর্ণ বিপরীত।" বলিয়াই ছায়া অপ্রস্তুতভাবে থামিয়া গেল। কোথায় সে তাঁহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে সে এ কি বলিতেছে! লজ্জাকুণ্ঠিতমুখে সে আবার বলিল, "তারপর? তারা কি আর এর পর কোন সংবাদই নেয় নি?"

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না মা, তা হলে কি আর—" কথাটি সম্পূর্ণ না বলিয়াই তিনি ব্যথিতচিত্তে মাথাটি নাড়িলেন। ছায়াও নীরবে বসিয়া রহিল। সদাহাস্যময়ী ললিতা সহাস্যে সবিতাকে বলিল, "ওলো সবু, এর সঙ্গে তুই সই পাতিয়ে নে। তোরা দুজনেই প্রায়—"

সবিতা এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল, এইবার সে রাগ করিয়া ললিতার দিকে চাহিয়া

বলিল, "দেখ দিদি, তোমার রঙ্গ নিয়ে তুমিই থাক, আমার ও-সব ভাল লাগে না।" বলিয়াই সবিতা সেখানে হইতে চলিয়া গেল।

ছায়া ললিতার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "দিদি, আমায় একটি পান দিন না।" শুনিয়া গৃহিণী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "হাঁলো, তোদের আক্কেল কি রকম? মেয়েটি কখন এসেছে, এখনও একটি পান দিস্ নি। কলি কোথায় গেল? তাকে বল্, পান আন্তে।"

ললিতা সহাস্যে বলিল, "ওগো, এতক্ষণ পান দিই নি বলেই ত এমন মধুর দিদি ডাকটি শুন্তে পেলেম। আমি ত সেই মতলব এঁটেই চুপ করে বসেছিলেম"। বলিয়া ললিতা হাসিতে হাসিতে ছায়ার হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার নামটি কি এইবার বল ভাই।"

ছায়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিল, "ছায়া।"

"ছায়া? বেশ, আজ হ'তে তুমি আমার ছোটবোন হলে ছায়া। ওলো, সবু, কলি, আয়, তোদের দিদিকে প্রণাম করে যা। অমনি দু'টি পানও নিয়ে আয়। না-না, পান আমিই এনে দেব, ছায়া আমার কাছে পান চেয়েছে যে।" বলিয়া সহাস্যমুখে ললিতা পান আনিতে গেল।

সবিতা ও কলিকা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়া সহাস্যে উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "বস না।" উভয়েই বসিল। ললিতা পান আনিয়া ছায়ার হস্তে দিয়া সবিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রণাম করেছিস্?" সবিতা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

ছায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আঃ দিদি, আপনি করছেন কি? ও আমাকে প্রণাম করবে কেন, আমরা দুজনেই প্রায় সমবয়সী।"

"না, না, সমবয়সী হবে কেন, সবু তোমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে। আর দেখ ভাই, তুমি আমায় আপনি বলো না। দিদি,—আপনি,—কথাটা বড় বিশ্রী শুনায়। দিদি,—তুমি,—কথাটি বড় মিষ্টি শুনায়।"

বলিতে বলিতে ললিতা সবিতার হাত ধরিয়া ছায়ার সম্মুখে ঠেলিয়া দিল। সবিতা বিব্রতভাবে ছায়ার পায়ে নিজের হাতখানা লাগাইয়া নিজের কপালে স্পর্শ করিল। ছায়া লজ্জিতভাবে সবিতার হাত চাপিয়া ধরিল। এক পার্শ্ব হইতে কলিকা ছায়াকে প্রণাম করিতে যাইয়া সানবাঁধা মেজেয় মাথাটি ঢুপ্ করিয়া ফেলিল।

দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আহা,—হা, পাগলি প্রণামের ধুমে মাথাটি ভাঙ্গলি?" কলিকা অপ্রস্তুতভাবে কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "না, তেমন লাগে নি।"

সবিতা হাসিয়া বলিল, "তোর মাথা ভাঙ্গাই সার হলো। প্রণামও হলো না, আশীর্ব্বাদও মিলল্ না।"

ছায়া উঠিয়া কলিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না, না, সবই হয়েছে। আহা, এই দেখ, ওর কপালটা কেমন ফুলে উঠেছে।"

কলিকার দিকে চাহিয়া আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কলিকা লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এবার ত আমার পালা দিদি।"

"কিসের ? কপাল ভাঙ্‌বার ?"

"না, প্রণাম করবার" বলিতে বলিতে ছায়া গৃহিণীকে প্রণাম করিল। তিনি গম্ভীর হইয়া ছায়ার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "কপাল ভাঙ্গবে কেন, যোড়া লাগ্‌বে।" বলিয়া তিনি নীরবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরে ছায়া ললিতাকে প্রণাম করিল। ললিতা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। আরও কিয়ৎকাল সকলের কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া এইবার ছায়া বিদায় লইল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে আসবে বাছা ? কাল নয়, পরশু আসতে পারবে ?" ছায়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "হুঁ"।

ছায়া চলিয়া গেল। গৃহিণী কন্যাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মেয়েটি বেশ। কিন্তু কেন যে ও স্বামীর ঘর থেকে নির্ব্বাসিত হয়েচে, তা জানিনে।"

ছায়া গৃহে আসিয়া সায়াহ্নিক কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে অদ্যকার ঘটনাটা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের সহিত এইরূপ মিলামিশা করা সঙ্গত কিনা, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। তাহারা ছায়াকে যেরূপ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, এই অবস্থায় সে পর পর ভাবে থাকিলে তাহাদিগকে যে অবজ্ঞা করা হইবে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

তাই ইহাতে তাহার মন গেল না। অধিকন্তু সে ভাবিয়া দেখিল যে, সে যদি নিয়ত সবিতার সংশ্রবে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি ছায়ার ভালবাসা জন্মিবে। এবং সেই ভালবাসার ফলে হয় ত তাহার মনটাও একটু পরিষ্কার হইয়া শান্তি পাইতে সমর্থ হইবে।

তবে এই বিষয়ে তাহার একটু সন্দেহ হইতে লাগিল যে, এইরূপ ঘনিষ্ঠতায় যদি তাহারা তাহার প্রকৃত পরিচয়টা জানিয়া ফেলে, তবে যে তাহার সেই লজ্জা রাখিবার স্থান হইবে না।

সে একবার ভাবিল, যে না,—তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া থাকাই তাহার উচিত। কিন্তু তাহারা যখন তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য দাসীকে পাঠাইয়া দিবে, তখন সে কি বলিয়া তাহাতে আপত্তি করিবে ? তাহা ত হইবে না, তাহা যে সে পারিবে না। তবে ? তবে কি করিতে হইবে ? সবিতাকে ভগ্নীরূপে জ্ঞান করিতে হইলে যে তাহার সঙ্গ প্রয়োজন। এই সুন্দর সুযোগটি কি তবে সে ছাড়িয়া দিবে। না—না, তাহা হইলে হয় ত পরে তাহাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

স্বামীকে সে যাহা বলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সবিতাকে ভগিনী জ্ঞানে যে তাহাকে স্নেহ করিতেই হইবেই। সতীন বলিবার অথবা ভাবিবার পথ ত সে আর রাখিয়া আসে নাই। আর

সেই পথ রাখাও তাহার ইচ্ছা নয়। তবে অদ্যকার এই নূতন সম্পর্কটিই মানিয়া চলিতে হইবে— কিন্তু অতি সাবধানের সহিত। কেহই যেন কোনরূপে ঘুণাক্ষরেও না জানিতে পারে যে, সে সবিতার সতীন।

সতীন শব্দটা মনের আঁধার গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া, সবিতাকে সে ভগ্নীর প্রাপ্য স্নেহে হৃদয়ে গাঁথিয়া লইবে। ঝড়, বাত্যা, বৃষ্টি কিছুই যেন তাহা স্পর্শও না করিতে পারে।

স্বামীর সম্পূর্ণ উপযুক্তা প্রিয়তমার অভিমান ভাঙ্গাইয়া সে আবার তাহাদের মিলন করাইয়া দিবে। স্বামীর মুখে সে আবার সুখের হাসি ফুটাইয়া দিবে। পারিবে না কি ? ভগিনীর স্নেহের আসনে দাঁড়াইয়াও কি সে তাহা পারিবে না ? ততদূর শক্তি কি তাহার নাই ? কই আছে ? সে এক মনে এতখানি ভাবিলেও অন্য মনে তাহা গ্রাহ্য করে না। সে যে ক্লান্তভাবে বলে উঠে, "নাগোনা, আর পারি না।"

কিন্তু এ ভাব মনে রাখিলে ত চলিবে না। ছায়া যে স্বামীর নিকট বলিয়া আসিয়াছিল, যে এখন তাহার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। সে মনকে অন্যরূপে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কই ? সে মনকে কি সেই বাক্যের অনুরূপ করিতে পারিয়াছে। না, এখনও ততদূর করিতে পারে নাই। তাহা হইলে কি আর তাহার প্রাণে এখনও এমন যন্ত্রণা,—এমন অশান্তি থাকিতে পারিত ?

কিন্তু ততদূর করিতে পারে নাই বলিয়া কি সে হতাশ হইবে ? না, আবার সবেগে সতেজে দাঁড়াইয়া সে প্রাণপণে যুঝিতে আরম্ভ করিবে।

পরদিন ছায়াকে লইয়া যাইবার জন্য একজন ঝি আসিল। রমানাথ তাহাতে আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, অভাগিনী এ ভাবে থাকিলে যদি একটু শান্তি পায়, তবে কেন তাহাকে বাধা দিব। তিনি ছায়াকে যাইতে বলিলেন। ছায়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেই বাড়ী চলিয়া গেল।

রমানাথ ছায়ার মনের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যদিও তাহাদিগের সহিত কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করাটা তিনি তেমন ভালবাসিতেন না, তবু ছায়ার তাহাতে কোন অনিচ্ছা বা অনাসক্তি না দেখিয়া তিনি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না।

রমানাথ এই চাকরী ত্যাগ করিয়া যাহাতে অন্য কোথাও জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় করিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

তিনি দেনাগুলি সমুদয় পরিশোধ করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এখন চিন্তা কেবল দুইটি পেটের জন্য।

সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, মাসে মাসে হাতে যাহা থাকিত, রমানাথ তাহা জমাইয়া রাখিতেন। ক্রমে কিছু টাকা হাতে হইলে পরে তিনি ছায়ার জন্য দুই একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত

করাইতে ইচ্ছা করিলেন। ছায়া তাহাতে আপত্তি করিল না। সে ভাবিল, অলঙ্কার গড়াইয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে।

একদিন রমানাথ সানন্দে দুইখানি সুবর্ণ বলয় ও দুইটি কর্ণাভরণ আনিয়া ছায়ার হস্তে দিলেন। ছায়া পিতাকে প্রণাম করিয়া গহনাগুলি সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিল। গহনাগুলি সেই যে বাক্স বন্দী হইয়া রহিল, আর একদিনের তরেও চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখিল না।

রমানাথ অনুযোগের সহিত ছায়াকে গহনা ব্যবহার করিতে বলিতেন, কিন্তু সে মৃদু হাসিয়া বলিত, "সর্ব্বদা ব্যবহার করলে ক্ষয় হয়ে যাবে বাবা। কোথাও যেতে হলে পরে যাব।" অগত্যা রমানাথ নীরব হইতেন।

উকীলবাবুদের বাড়ী যাওয়াটা ছায়ার খুব ঘন ঘন হইয়া উঠিল। প্রায় প্রত্যহই সেখান হইতে দাসী চাকর আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। বিশেষ ঠেকা হইলে ক্বচিৎ কোন দিন বাদ যাইত।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"সুরো!"

চমকিত ভাবে সুরেশ পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, "কেন পিসিমা?"

"এভাবে থাকলে যে দিন চলবে না।"

"কেন পিসিমা, দিন ত বেশ চলে যাচ্ছে।"

"একে কি আর বেশ চলা বলে রে? তুইই ভেবে দেখ্ দেখি।"

সবেগে বুকটাকে কম্পিত করিয়া সুরেশের একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। একটু সামালাইয়া লইয়া সে বলিল, "আমি কি করব, বল পিসিমা।"

"তুই কেন এভাবে থাকিস্ বাছা? সংসারের দিকে একটু ফিরে দেখিস্ না। আমি বুড়ী হয়েছি, আর কেন আমার ঘাড়ে এসব চাপিয়ে রেখেছিস্ বল দেখি। তিনকাল গেছে, এখন এই শেষকালেও কি আমায় এ বোঝা ঘাড়ে নিয়েই থাকতে হবে রে? তোদের সংসার তোরা হাতে নে, আমায় কেন আর এতে বেঁধে রেখেছিস?"

সুরেশ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহার উত্তরের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া পিসিমা আবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "উত্তর দে। বল্ আমায় কেন আর—"

সুরেশ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মাফ কর পিসিমা, দুটো দিন মাফ কর। সবাই একত্রে এমন নির্দ্দয়ের মত বেঁধে মেরোনা। ওঃ—বাবা আমায় এমন বিপদে কেন ফেলে গেলেন।"

পিসিমা কিয়ৎক্ষণ অনুতপ্ত-ব্যথিত-ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃগতপ্রাণ পুত্র যে পিতৃশোকটা এখনও সামলাইতে পারে নাই, এবং ইতিমধ্যে যে প্রাণে আরও দুই একটা আঘাত

পাইয়াছে, তাহা তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াও এই কথা বলাতে যেন একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

সেই কথাটা ঢাকিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে তিনি সান্ত্বনাপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "সংসারে এলে দুদিন পরে তাকে আবার যেতেই হয়। এটা ত নিত্যকার ঘটনা বাছা। এতে দুঃখু করে আর কি লাভ! দাদা—" পিসিমা সুরেশকে সান্ত্বনা দানের জন্য এই কথা বলিলেও তিনি নিজে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। একরাশি বাষ্প আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া পড়িল।

সুরেশও নীরবে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল। মনের ভার একটু হাল্কা হইলে পরে সে চোখ মুখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল।

পিসিমা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যে যায়, সে ত সংসারের ভাবনা থেকে রক্ষা পায়। দাদা মরেছেন, না, যেন বেঁচেছেন। সংসারের এই অবস্থা কি তিনি আর চোখে দেখতে পারতেন? যাক্ সে সব কথা। তুই যদি বাছা এখন একটু ধৈর্য্য না ধরিস্, তবে কি গতি হবে! আমার ত আর এ সংসারে থাকতে ইচ্ছে করে না। বুড়ো হয়েছি, এখন মরবার বাকী আর দুদিন বৈত নয়। এর মধ্যে পরকালের সম্বলটা যদি না করতে পারি, তবে,— আচ্ছা সুরেশ একটা কাজ করতে পারিস?"

সুরেশ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ পিসিমা?"

"আমায় অন্ততঃ দুটি দিনের জন্য রেহাই দিতে পারিস্? আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসতেম। এই ত বড় একটা যোগ আসছে, গাঁয়ের পাঁচ জন যাচ্ছে,—"

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যেয়ো পিসিমা, আমার তাতে আপত্তি নেই। তোমার পরলোকের কাজে আমি বাধা দিতে চাইনে" বলিয়া সুরেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

পিসিমা বলিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস? শোন্ ত একটা কথা।"

সুরেশ দাঁড়াইল, কিন্তু ফিরিল না। পিসিমা কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "আমার মাথা খাস্ বাছা, আর এ ভাবে থাকিস্নে। বৌদের কাছে এক এক খানা চিঠি লিখে জান্, তারা আসবে কি না। ছোটবৌমার কি হল, তাত কিছুই জানতে পারলেম না। তোর নামে না লিখিস্, আমার নামে লিখে দে।"

"মাপ কর পিসিমা, এখন না। ভেবে দেখি, তার পরে।"

"এখন যাচ্ছিস্ কোথায়?"

"বৈঠকখানায়। একটু আগে নিবারণ কেন ডেকেছিল, তা দেখে আসি।"

"খাবারটা খেয়ে যা না।"

"না, এখন না, পরে।" বলিয়া সুরেশ বাহিরে চলিয়া গেল। পিসিমা কিয়ৎক্ষণ নীরবে তাহার গন্তব্য পথের পানে চাহিয়া থাকিয়া পরে একটি দীর্ঘশ্বাস সহকারে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ গাঙ্গুলিমহাশয়ের অন্তর্ধানের পর হইতেই সংসারটা বড়ই বিশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। পিসিমা আর এই ভার বহন করিতে পারিতেছিলেন না। শ্রান্ত ক্লান্ত মন ও শরীর বিশ্রাম চাহিতেছে। কিন্তু বিশ্রাম পাওয়ার কোন উপায় না পাইয়া তিনি ভারি অশান্তিতে দিন কাটাইতে ছিলেন। আর সুরেশ যে তাহাপেক্ষাও অধিকতর অশান্তিতে ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার কোন দিকেই আদৌ লক্ষ্য ছিল না। এমন কি, পিসিমা তাহাকে স্নানাহারের জন্য তাগাদা না করিলে তাহার সেই সকল নৈমিত্তিক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিতেও মন যাইত না।

একমাত্র বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিবারণের বলেই সংসারটি খাড়া ছিল। সে মাঝে মাঝে সুরেশকে ডাকিয়া কাগজ পত্রের সম্মুখে নিয়া বসাইত। কিন্তু সুরেশের সেই সব কিছুই ভাল লাগিত না। তাই সে তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিয়া সেই সব ফেলিয়া নিজের নির্জ্জন কক্ষটিতে আসিয়া বসিত।

এইরূপে থাকিতে থাকিতে সুরেশের শরীরের কান্তি দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। দেহটি নিস্তেজ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রশস্ত ললাটে বিষাদের গভীর রেখা অঙ্কিত হইয়া রহিল। মন নিরুৎসাহ, অবসন্ন, ক্লান্তিযুক্ত।

পিসিমা এই সব দেখিয়া নিবারণকে বলিলেন, "তুমি বাবা আমার গঙ্গাস্নানের বন্দোবস্তটা করে দাও। সুরোর আশায় বসে থাকলেই হয়েছে আর কি! ছেলেটা দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্ছে। ওকে নিয়ে একটু ঘরের বের না হতে পারলে হবে না।" তিনি ভাবিলেন, যে সুরেশ স্থানান্তরে গেলে হয়ত একটু ভাল হইবে। মনে একটু স্ফূর্ত্তি পাইলে বোধ হয় শরীরটিও সারিয়া যাইবে। তাই তিনি সুরেশকে জোর করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে তোকেই যেতে হবে কিন্তু।"

সুরেশ সম্মতি অসম্মতি কিছুই জ্ঞাপন করিল না। নিবারণের দ্বারা সমস্ত বন্দোবস্ত করাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি যাত্রা করিলেন। সুরেশকেও তাঁহার সঙ্গেই যাইতে হইল। বাড়ীতে রহিল কেবল নিবারণ ও রাঁধুর মা।

কালীঘাটে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহারা উঠিলেন। গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন করা হইল। দুইদিন থাকিয়া পরে সুরেশ বলিল, "পোঁটলা পুঁটলি বাঁধ না পিসিমা, আর কেন?"

পিসিমা মৌখিক রাগ দেখাইয়া বলিলেন, "হাঁ,—তা বলবি বৈ কি। চোরের দায়ে ধরা পড়েছি কি না। আমি এখনই যাব না ত। আরও কিছুদিন এখানে থাকব।"

সুরেশ নতমুখে নীরবে রহিল। পিসিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তবে এখানে আর থাকতে চাইনে। আমার ইচ্ছা,—অন্য একটা।"

মৃদুস্বরে সুরেশ বলিল, "কি পিসিমা?" পিসিমা অতি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "বলব? আমার কথাটি রাখবি ত?"

"কি, আগে শুনিই না।"

"যদি রাখিস্, তবে বলি। আমায় এক যায়গায় নিয়ে যাবি সুরো?"

"কোথায় পিসিমা ? বাড়ী ?"

"না রে, আগেই ত বলেছি, এখন বাড়ী যাব না। আমায় আমার বেয়াইদের বাড়ী নিয়ে চল। আমি নিবারণকে দিয়ে তাদের ঠিকানা জেনে নিয়েছি। কি বলিস্, যাবি কি না ?"

শুনিয়া হঠাৎ সুরেশের মুখখানা যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে স্পন্দিত হৃদয়ে ঔৎসুক্য পূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কা'দের ঠিকানা জেনেছ ?"

পিসিমা তাহার উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দু বেয়াইরই ঠিকানা জানতে পেরেছি ; এখন দুই যায়গার এক যায়গায়ই আমায় নিয়ে চল।"

সুরেশ ভাবিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার উজ্জ্বল মুখখানা আবার নিরাশার ঘনান্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। তাহার মুখজ্যোতি অপসৃত হইতে দেখিয়া পিসিমা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কি ? তা কি সম্ভব নয় ?"

"না, পিসিমা, না তা হয় না। তা অসম্ভব—।" রুদ্ধকণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে সুরেশ সেই স্থান হইতে প্রস্থানোদ্যত হইল।

পিসিমা "বাধা দিয়া বলিলেন, কেন হয় না সুরেশ ? এটা কি এমনই একটা অসম্ভবের কথা !"

সুরেশ একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "হাঁ, এটা একেবারেই অসম্ভবের কথা। তার চেয়ে বল পিসিমা, আমরা অন্য এক যায়গায় যেয়ে বেড়িয়ে আসি।"

পিসিমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অন্য এক যায়গায় যেয়ে কি হবে ? আমার ইচ্ছে ছিল,—যাক্, তুই কোথায় যেতে চাস্ ?"

"দূরে কোথায় যাওয়ার ত এখন উপায় নেই পিসিমা, চল, এই কাছেই আলিপুরে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"আলিপুর ? সেখানে কি কোনও ঠাকুর আছেন ?"

"ঠাকুর সর্ব্বত্রই আছেন। তবে সেখানে নামজাদা কোন মন্দির নাই বটে।"

"তবে সেখানে দেখবার মত কি আছে ?"

"খুব ভাল ভাল জিনিষ আছে পিসিমা। খুব বড় চিড়িয়াখানা, তাতে নানা রকমের জন্তু জানোয়ার—।"

"তা, তোর যদি তাই দেখতে ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে চল্ সেখানেই। কিন্তু আমার বড় আশা ছিল,—"

"আশাটা আপাততঃ মনেই চেপে রাখতে হবে পিসিমা।"

"অগত্যা তা ছাড়া আর কি করা যায়! তবে কখন যাওয়া তোর ইচ্ছে ?"

"কাল।" বলিয়া সুরেশ ভ্রমণোপযোগী বেশ সজ্জিত হইয়া গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীচপলাবালা বসু

রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ও সঙ্গীত *

(কথোপকথন)

কবিবর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। আমি ও আমার একটী আত্মীয় তাঁকে গিয়ে প্রণাম কর্ত্তেই তিনি উঠে বসলেন।

কবিবর হেসে ব'ললেন, "তোমার সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা আজ বিজলীতে পড়্‌ছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁর দিকে চাইলাম। কারণ আমি তাঁকে একটী চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নেই যেটা বাংলা গান সম্বন্ধে আছে।

কবিবর ব'ললেন, "তোমার লেখার সঙ্গে মূলতঃ আমি একমত। যারা রস রূপের লাবণ্যে মজে জগতে তাদের সংখ্যা অল্প, যারা বাহাদুরিতে ভোলে তাদের সংখ্যাই বেশি। এইজন্য অধিকাংশ ওস্তাদই কসরৎ দেখিয়ে দিগ্বিজয় করে বেড়ায়। ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙ্গালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ-মর্য্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মত তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট—যাঁর কাছে ৺রাধিকাবাবু কিছু শিখেছিলেন।"

আমি ব'ললাম, "কিন্তু আপনার কি তাঁর গান মনে আছে? খুব ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে খুব অন্তর্দৃষ্টি থাকেনা; কাজেই আমার বোধ হয় সে সময়ে উচ্চ সঙ্গীতে আমাদের হৃদয় কেমন সাড়া দেয় সেটাও ভাল স্মরণ থাকার কথা নয়।"

---

* এ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করছি। এ কথোপকথনটি আমি কবির ইচ্ছামত তাঁকে বোলপুর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কবিবর তাঁর অসুস্থতাসত্ত্বেও তাঁর নিজের বক্তব্যটুকু প্রায় সমস্তটাই আমূল লিখে দিয়েছেন—যেটা তাঁর ও আমার ভাষার পার্থক্যে প্রতীয়মান হবে। (এজন্য আমি কবির কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি)। কবি যা-যা লিখে দিয়েছেন তার অনেক কথা সেদিনকার আলোচনায় তিনি ঠিক্ সেভাবে বলেন নি। তবে আমার মনে হয় যে তাতে যে শুধু কিছু আসে-যায়-না তাই নয়, তাতে এ প্রবন্ধটির মূল্য যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। কারণ মুখে মানুষ অনেক কথাই ঠিক্ তেমন বিশদ ক'রে তুলতে পারে না, যেমনভাবে সে লিখলে পারে। কবিবরের লিখিত দু-একটি নতুন যুক্তির ও উপমার উত্তরে আমিও দুএকটি প্রতিযুক্তির অবতারণা কর্ত্তে বাধ্য হয়েছি,—যেগুলি আমি সেদিন আলোচনাক্ষেত্রে ঠিক্ সেভাবে প্রয়োগ করি নি। এটুকু বলা দরকার মনে করলাম শুধু সত্যের খাতিরে। আর একটা কথা। কবির সঙ্গে আমি তাঁরই সঙ্গীত নিয়ে যে রকম সমান-সমান-ভাবে আলোচনা করেছি সেটা স্পর্দ্ধাবশে নয়—সে অধিকার ও সম্মান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন ব'লেই। প্রথম কথোপকথনটি ২৯-৩-২৫ তারিখে ও দ্বিতীয়টি ৮-৪-২৫ তারিখে হয়েছিল।

কবিবর ব'ললেন, "কিন্তু আমার স্মৃতিতে এখনও সে সঙ্গীতের রেশ লুপ্ত হয় নি। যদু ভট্টের জীবনের একটী ঘটনা বলি শোন। ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর গানের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার তাঁর সভায় অভ্যাগত একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ নটনারায়ণ রাগে একটি ছোট গান গেয়ে যদু ভট্টর কাছে তারি জুড়ি একটী নটনারায়ণ গানের প্রত্যাশা করেন।

যদুভট্টর সে রাগটী জানা ছিল না, কিন্তু তিনি পরদিনেই নটনারায়ণ শোনাবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'লেন। ওস্তাদজী গাইলেন। যদুভট্টের গান এমনই তৈরী ছিল যে তিনি সেই দিনই রাতে বাড়ী গিয়ে চৌতালে নটনারায়ণ রাগে একটী গান বাঁধলেন ও পরদিন সভায় এসে সকলকে শুনিয়ে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সেই সুরে জ্যোতি দাদা একটী বাংলা গান রচনা করেছিলেন।" ব'লে কবিবর গুণ গুণ করে সে সুরটী একটু গেয়ে শোনালেন।

আমি বল্‌লাম, "এ-রকম গায়ক এক একজন ক'রে যাচ্ছেন তাতে দুঃখ করা এক রকম বৃথা, কারণ গায়কও সঙ্গীতের খাতিরে কিছু অমর হ'তে পারেন না। তবে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে সঙ্গীত রাজ্যে একজন গুণী গেলে তাঁর স্থান পূর্ণ ক'রবার লোক আর মেলে না। আমাদের দেশে গায়কদের মধ্যে যথার্থ শিল্পী ক্রমেই যে কি রকম বিরল হয়ে উঠ্‌ছে তা জানেন এক যথার্থ সঙ্গীতানুরাগী। য়ুরোপে এরকমটা হয় না। সেখানে এক গায়ক যায় বটে কিন্তু তার স্থানে অন্য গায়ক জন্মায়।"

কবিবর বল্‌লেন, "তা সত্য।" ব'লে একটু চুপ করে বল্‌লেন, "আজ তোমার সঙ্গে একটা আলাপ ক'রতে চাই।"

আমি সাগ্রহে বল্‌লাম, "বলুন।"

কবিবর বল্‌লেন, "অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে যে মতভেদের কল্পনা করি, আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় তার অনেক খানিই ফাঁকি। বাংলা ও হিন্দুস্থানী গান নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ যদি বা থাকে তা হ'লে অন্ততঃ তার সীমাটি স্পষ্ট করে নির্দ্দিষ্ট হওয়া ভাল। নইলে সত্যের চেয়ে ছায়াটা বড় হ'য়ে অমিলটা প্রকাণ্ড দেখতে হয়। গোড়াতেই একটা কথা জোর করে ব'লে রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসচি ব'লে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গানে আমাকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করে।"

আমি ব'ল্‌লাম, "এ কথাটা আমার ভারি ভাল লাগ্‌ল। আর আপনার মতন গুণগ্রাহী শিল্পী-মনের কাছে আমি ত এই-ই আশা করেছিলাম। আপনার "জীবন-স্মৃতিতে" হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা যথার্থ অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেকের আপনার সহজ হাল্‌কা সুরের গান শুনে উলটো ধারণা জন্মে থাকে যে ওস্তাদি সঙ্গীতের আপনি বিরোধী।"

কবিবর ব'ললেন, "মোটেই না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে একটী উদার বিশেষত্ব, যেটাকে তুমি বলেছ—সুরের মধ্য দিয়ে শিল্পীর নিত্যনিয়ত নব নব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির স্বাধীনতা—সেটা য়ুরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা ক'রে আরও স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি।"

আমি বল্‌লাম, "এটা খুবই ঠিক্‌। আমারও য়ুরোপে অনেকবার মনে হয়েছিল যে আমাদের শুধু সঙ্গীতে নয়, সভ্যতায়ও, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে হ'লে একবার পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা খুব দরকার। নইলে আমাদের বিশিষ্ট দানটী সম্বন্ধে আমাদের ঠিক যেন চোখ ফোটে না।"

কবিবর ব'ললেন. "সত্যি কথা। কিন্তু একটা বিষয় আমি তোমাকে আজ একটু বিশেষ ক'রে বল্‌তে চাই। তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার বিকাশ যে-ভাবে হ'য়েছে আমাদের বাঙ্গালা সঙ্গীতের ধারা সেভাবে বিকাশ লাভ করেনি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতি-ভেদ আছে। বাংলার সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।"

আমি বল্‌লাম, "কিন্তু সুর—"

কবিবর বল্‌লেন, "কীর্ত্তনে সুরও অবশ্য কম নয়; তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীর্ত্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র। এ কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্ত্তনের প্রাণ অর্থাৎ আঁখর কি বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই; সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয় কি? কিন্তু কীর্ত্তনে আমরা পদাবলীর মর্ম্মগত ভাব রসটীকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দ্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হ'তে থাকে। সেই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্চে সঙ্গীতসম্মিলিত কাব্য। সঙ্গীতই তাকে সেই আবেগ-বেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে ক'রে নূতন নূতন আঁখর তা-থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে স্তব্ধ থাকে সেখানে আঁখর চলে না। বিদ্যাপতি পাঠকালে পাঠক তাতে নূতন বাক্য যোজনা ক'রলে ফৌজদারী চলে। কারণ পাঠক ত বিদ্যাপতি নয়। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে আঁখরে যে দৈন্য অনিবার্য্য, কীর্ত্তনের সুরের ঐশ্বর্য্য সেটাকে পূরণ করে দেয় ব'লেই সেটাতে রসের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্ত্তনে, সুরে-বাক্যে অর্দ্ধনারীশ্বর যোগ হয়েচে। যোগের এই দুই অঙ্গের মধ্যে কে বড় কে ছোট-সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে উভয়কে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে সেই সৌন্দর্য্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে

অক্সিজেনকেই নিই, বা হাইড্রোজেনকেই নিই তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মত যৌগিক সৃষ্টি—তা দুইয়ে মিলে অখণ্ড। হিন্দুস্থানী গান রূঢ়িক, তা একাই বিশুদ্ধ। সৃষ্টি ব্যাপারে রূঢ়িক শ্রেষ্ঠ না যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের কোনো অর্থ নেই। ভালো যা তা ভালো ব'লেই ভালো—রূঢ়িক ব'লেও না, যৌগিক ব'লেও না।"

কথাগুলি ভারি ভালো লাগল, বিশেষতঃ কীর্ত্তনের আঁখর হ'চ্ছে কথার তান,—এই উপমাটী! ঐ উপমাটীর মধ্যে কবিবরের উপমা দেবার ক্ষমতাটিই আমাদের কাছে যেন তার পরিচিত গরিমায় মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠ্‌ল।* কথায় উপমা অনেক সময়ে লেখায় উপমার চেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

আমি ব'ললাম, "বাংলার যে কাব্যে একটা নিজস্বদান আছে একথা কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে কি প্রমাণ হয় যে আমাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য থাক্‌তে পারে না! আমাদের দেশে বড় বড় কবি জন্মেছেন সত্য; কিন্তু তা থেকে ত সিদ্ধান্ত করা চলে না যে আমাদের দেশে সঙ্গীতকার জন্মাতেই পারে না। আমাদের দেশে ধরুন যদুভট্ট, অঘোর চক্রবর্ত্তী, রাধিকা গোস্বামী, সুরেন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বড় বড় গায়কও ত জন্মেছেন? তবে?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র গাইয়ে, অর্থাৎ সুর আবৃত্তিকার, হিন্দুস্থানীর কাছ থেকে শিখে। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে একটা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি আছে যেটা তাদের একটা সত্যকার সম্পৎ, ধার-করা জিনিষ নয়। কাজেই এ উৎস তাদের মধ্যে সহজে শুকিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বড় গায়ক মানে কি জান? যেন খাল কেটে জল-আনা, যা একটু দৃষ্টি না রাখলেই শুকিয়ে যেতে বাধ্য। ওদের দেশে কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিকাশ খাল কেটে টেনে আনা নয়, নদীর স্রোতের মতনই স্বচ্ছন্দগতি, চলার চালেই মাতোয়ারা।"

খালের সঙ্গে নদীর এ উপমাটী ভারি হৃদয়গ্রাহী মনে হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "বাংলার বৈশিষ্ট্য যে অবিমিশ্র সঙ্গীতে নয় তার একটা প্রমাণ যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মেলে। সঙ্গীতের বিশুদ্ধতম রূপ কিসে?—না, যন্ত্র সঙ্গীতে। একথাত অস্বীকার করা চলে না? কিন্তু দেখ, বাংলা দেশ কখনও হিন্দুস্থানী-দের মত যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি? আরও দেখ ওরা কেমন অকিঞ্চিৎকর কথা গানের মধ্যে অম্লান-বদনে চালিয়ে দেয়। অক্ষমতা বশতঃ নয়, সুরের তুলনায় তাদের কাছে কথার খাতির কম ব'লে। বাঙালী ভাগ্যদোষে কুকাব্য লিখ্‌তে পারে কিন্তু অকাব্য লিখ্‌তে কিছুতেই তার কলম সরবে না। "সামলিয়ানে মোরি এঁদোরিয়া চোরিরে"। এঁদোরিয়া মানে বুঝি জলের ঘড়ার বিড়ে। শ্যামচাঁদ সেটি চুরি ক'রেছেন, কাজেই তার অভাবে শ্রীরাধার জল আনার মহা

অসুবিধা ঘট্‌ছে। এইটেই হ'ল সঙ্গীতের বাক্যাংশ। অপর পক্ষে বাঙালী কবি এঁদোরিয়া চুরি নিয়ে পুলিশ-কেসের আলোচনা করতে পারে কিন্তু গান লিখতে পারে না।"

আমরা এ কথায় ভারি হেসে উঠলাম। কবিবরও আমাদের হাসিতে যোগ দিলেন। হাসির রোল থামলে আমি ব'ললাম, "একথা আমি মানি। কিন্তু তাই ব'লে কি আপনি বলতে চান যে ওদের গান শেখা আমাদেয় পণ্ডশ্রম মাত্র?"

কবিবর জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, "কখনই নয়। আমরা কি ইংরেজী শিখিনা? শিখি ত? কেন শিখি?—ইংরেজী সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। তার রস পানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় স্বকীয় শক্তিকেই নূতন উদ্যমে ফলবান ক'রে তোলবার জন্যে। রেনেসাঁস যুগে ইংরেজী সাহিত্য ধাক্কা পেয়েছিল ইটালী থেকে, কিন্তু তার জাগরণটা তার নিজেরই। শেক্‌স্‌পিয়রের অধিকাংশ নাট্যবস্তুই বিদেশের আমদানি কিন্তু তাই বলেই শেক্‌স্‌পিয়ারের রচনা ইংরেজী সাহিত্যে চোরাই মাল এমন কথা ত বলা চলে না। গানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাল ক'রে শিখ্‌লে তা থেকে আমরা লাভ না ক'রেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনই যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জ্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রস সৃষ্টি হয় না; সাহিত্যেও না সঙ্গীতেও না।"

আমি ব'ললাম, "তা ত বটেই। তবে কোনও সভ্যতার দানই ত অনড় অচল থাকতে পারে না! তাই বাঙালীর গান কেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে লাভ করবে না! এ লাভ করাই ত স্বাভাবিক, কারণ সত্য লাভে ত মৌলিকতা নষ্ট হয় না—অনুকরণেই হয়। আমরা আমাদের নিত্য-নতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই ত শিল্পজগতে নতুন সৃষ্টি করে থাকি? এবং এতেই ত সমৃদ্ধতর harmony গড়ে ওঠে?"

কবিবর ব'ললেন, "ওঠেই ত। দেখ, য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে কি আমরা একটা নতুন সমৃদ্ধি লাভ করি নি? না, যদি না কর্ত্তাম তবে সেটাই বাঞ্ছনীয় হ'ত?"

আমি বললাম, "অবান্তর হ'লেও এখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। অনেকে বলেন যে অমুক বাঙালী নাট্যকারই হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক। যুক্তি জিজ্ঞাসা ক'রলে তাঁরা উত্তর দেন যে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক তাঁর মধ্যেই য়ুরোপের বিন্দুমাত্রও প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। আমার সত্যিই আশ্চর্য্য মনে হয় যখন আমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের মুখেও অম্লানবদনে এরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হ'তে শুনি। এরূপ কূপমণ্ডুকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যেরকম নির্ব্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনও সভ্যদেশে সেভাবে গৃহীত হ'তে পারে না, নয় কি? আমার ত' ব্যক্তিগতভাবে ৺পিতৃদেবের ভাষা, refinement, সমৃদ্ধ রসিকতা, আপনার অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী বা শরৎ বাবুর লেখাও সে খাঁটী বাঙালী সাহিত্যিকের লেখার

চেয়ে ঢের উচ্চ-শ্রেণীর লেখা মনে হয়। আপনার কি মনে হয় না যে এরকম নিয়ত খাঁটি বাঙালী হও, খাঁটী বাঙালী হও ক'রে চিৎকার করা শুধু সাহিত্যিক chauvinism মাত্র ?”

কবিবর ব'ললেন, “তা ত বটেই। দুর্গম গিরিশিখরের উৎস থেকে যে আদি নির্ঝরটি ক্ষীণ ধারায় বইচে তাকেই বিশুদ্ধ গঙ্গা ব'লে মানব, আর যে ভাগীরথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে তার সঙ্গে পথে বহু উপনদীর মিশ্রণ ঘটেছে ব'লে তাকেই অশুদ্ধ ও অপবিত্র ব'লব এমন কথা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয়। প্রাণের একটা শক্তি হ'চ্ছে গ্রহণ করার শক্তি, আর একটা শক্তি হচ্চে দান করার। যে মন গ্রহণ করতে জানে না, সে ফসল ফলাতেও জানে না, সেত মরুভূমি। যদি বাঙালীর বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তা হ'লে আমি ত অন্তত তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ এই-ই জীবনের লক্ষ্য।”

আমি ব'ললাম, “আপনার কথাগুলি আমার ভারি ভাল লাগল। আর্ট জগতে চিন্তারাজ্যের একটু খবর রাখলেই ত দেখা যায় যে এক সভ্যতা নিত্য অপর সভ্যতা থেকে নূতন সম্পদের খোরাক জুগিয়ে নিয়েছে, নয় কি ? তাই যে দু'চার জন লোক থেকে থেকে তারস্বরে রোদন করে ওঠেন যে, গেল গেল য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালীর বাঙালীত্ব ঘুচে গেল তাঁদের সে আর্ত্তনাদে অন্ততঃ আমার মন ত সাড়া দিতে চায় না।”

কবিবর ব'ললেন, “তা ত বটেই। তা ছাড়া কোন্‌টা বাঙালীর আর কোন্‌টা বাঙালীর নয়, তার বিচার শোনবার জন্য আমরা কি কোনো স্পেশাল ট্রিবিউনালের মুখ তাকিয়ে থাকব ? বাঙালী গ্রহণ-বর্জ্জনের দ্বারাই আপনি তার বিচার করচে। হাজার প্রমাণ দাও না যে, বিজয় বসন্ত বাংলার বিশুদ্ধ কথা-সাহিত্য, বঙ্কিমের নভেল বিশুদ্ধ বঙ্গীয় বস্তু নয়, তবু বাংলার আবাল-বৃদ্ধবনিতা বিজয়বসন্তকে ত্যাগ করে বিষ-বৃক্ষকে গ্রহণ করার দ্বারাই প্রমাণ করচে যে, ইংরাজী সাহিত্য-বিশারদ বঙ্কিমের নভেল বাঙলার নিজস্ব জিনিস। আমি ত একবার তোমার পিতার গানের সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে, তাঁর গানের মধ্যেও য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে তবে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না, যদি তার মধ্য দিয়ে একটা নূতন রস ফুটে উঠে বাঙালীর রূপ গ্রহণ করে। আর দেখ য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের দুয়ারে এসেছে ও আমাদের পাশে শতবর্ষ বিরাজ করেছে। আমি বলি আমরা কি পাথর, না বর্ব্বর যে তার উপহারের ডালি প্রত্যাখ্যান করে চলে যাওয়াই আমাদের ধর্ম্ম হয়ে উঠবে ? যদি একান্ত অবিমিশ্রতাকেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়, তা' হ'লে বনমানুষের গৌরব মানুষের গৌরবের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। কেন না, মানুষের মধ্যেই মিশল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশল নেই।”

আমি বললাম, “আপনার এ কথাগুলি আমাকে ভারি স্পর্শ করেছে। আমারও মনে হ'ত

যে এ বিষয়ে এ বাঙালী এ অ-বাঙালী বলে তারস্বরে চিৎকার করা মূঢ়তা, কষ্টিপাথর হচ্ছে—আনন্দের গভীরতা ও স্থায়িত্ব।"

কবিবর ব'ললেন, "নিশ্চয়। আমি বলি এই কথা যে, যখন কোনও কিছু হয়, ফুটে ওঠে,—তখনই সেইটাই তার চরম সমর্থন। যদি একটা নূতন সুর দেশ গ্রহণ করে তখন ওস্তাদ হয়ত আপত্তি করতে পারেন। তিনি তাঁর মামুলি-ধারণা নিয়ে বলতে পারেন, 'এঃ, এখানটা যেন—যেন—কি রকম অন্যরূপ শোনাল, এখানে এ পর্দাটা লাগল যে!' আমি বলব 'লাগলই বা।' রস সৃষ্টিতে আসল কথা 'কেন হ'ল?'—এ প্রশ্নের জবাবে নয়, আসল কথা 'হয়েছে'—এই উপলব্ধিটিতে।"

আমি গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসার জন্য বললাম, "এ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ ত কিছুই নেই। আমি কেবল আপনার গানের সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী। আমি বলি গায়ককে আপনার গানের সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ব'ললেন, "এই খানেই তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ। আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে,—এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে? কথাকে সরিক বলে মানতে সে যে নারাজ! বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপোষ করে নেয়, যেহেতু, সেখানে একের যোগেই অন্যটী সার্থক। দম্পতির মধ্যে পুরুষের জোর কর্ত্তৃত্ব যদিও সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে প্রবল, তবুও উভয়ের মিলনে যে সংসারটীর সৃষ্টি হয় সেখানে যথার্থ কে বড় কে ছোট তার মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই মোটের উপর বলতে হয় যে কাউকেই বাদ দিতে পারিনে। বাংলা সঙ্গীতের সুর ও কথার সেইরূপ সম্বন্ধ। হয়ত সেখানে কাব্যের প্রত্যক্ষ আধিপত্য সকলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়, কিন্তু কাব্য ও সঙ্গীতের মিলনে যে বিশেষ অখণ্ড রসের উৎপত্তি হয় তার মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখব তার কিনারা পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানী গানে যদি কাব্যকে নির্ব্বাসন দিয়ে কেবল অর্থহীন তা-না-না ক'রে সুরটাকে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা সে গানের পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয় না। যে রস-সৃষ্টিতে সঙ্গীতেরই একাধিপত্য সেখানে তান-কর্ত্তবের রাস্তা যতটা অবাধ, অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে কাব্য সঙ্গীতের একাসনে রাজত্ব সেখানে, তেমন হ'তেই পারে না। বাংলা সঙ্গীতের—বিশেষতঃ আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের বিকাশ ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় হয় নি। আমি ত সে দাবী করছিওনা। আমার আধুনিক গানকে সঙ্গীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও না, আপত্তি কি। বট গাছের বিশেষত্ব তার ডাল আবডালের বহুল বিস্তারে, তাল গাছের বিশেষত্ব তার সরলতায় ও শাখা পল্লবের বিরলতায়। বটগাছের আদর্শে তাল গাছকে বিচার কোরো না। বস্তুতঃ তালগাছ হঠাৎ বটগাছের মত ব্যবহার করতে গেলে কুশ্রী হয়ে ওঠে। তার ঋজু অনাচ্ছন্ন রূপটিতেই তার

সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য তোমার পছন্দ না হয় তুমি বটতলার আশ্রয় কর—আমার দুইই ভালো লাগে, অতএব বটতলায় তালতলায় দুই জায়গাতেই আমার রাস্তা রইল। কিন্তু তাই বলে বট গাছের ডাল আবডাল গুলোকে তালের গলায় বেঁধে দিয়ে যদি আনন্দ করতে চাও তা হলে তোমার উপর তালবন-বিলাসীদের অভিসম্পাৎ লাগবে।"

আমি বল্লাম, "এখানে আপনার কথাগুলো সম্বন্ধে আমার কিছু ব'লবার আছে। প্রথমতঃ আমি বল্‌তে চাই এই কথা যে, আপনি যে উপমাটিকে এত বড় করে তুল্‌লেন সেটি মনোজ্ঞ হ'লেও কলাকারুর আপেক্ষিক বিচারে এরূপভাবে উপমাকে প্রধান করাতে মূল বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক সময় একটু ভুল বোঝার সহায়তা করা হয় বলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়। ধরুন, হিন্দুস্থানী সুর ও বাংলা গান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ একথা আপনিই বেশি জোর করে বল্‌ছেন। অথচ উপমা দিচ্ছেন দুটো গাছের সঙ্গে, যেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বাংলা সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃতি ভেদটি অনেকটা বটের শাখাপত্র ও তালের ঋজু রূপের মধ্যে প্রভেদেরই মতন। কিন্তু বস্তুতঃই কি এ দুই সঙ্গীতের প্রকৃতি-ভেদটি এইরূপ? অন্ততঃ এটা স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরে নেওয়া চলে না, এটা প্রমাণ সাপেক্ষ, এটা ত মানেন? তবে একথা থাক্। আমি শুধু আর্টের ক্ষেত্রে relative মূল্য নির্দ্ধারণে উপমার একান্ত বিশ্বাসযোগ্যতার উপর খুব নির্ভর করা সব সময়ে ঠিক নয় এই কথাটিই বল্‌তে চাই। এখন আমি আপনার মূল যুক্তির সম্পর্কে দু চারটি কথা বল্‌ব। আপনি যেভাবে রচয়িতার অনুভূতিটিকেই প্রামাণ্য বলে মনে কর্‌ছেন, আমি স্বীকার করি, কোনও শিল্প বা শিল্পীর সৃষ্টিকে সেভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আর একটা viewponitও যে আছে যেটা নিতান্ত অগভীর নয় একথাও আপনাকে স্বীকার কর্‌তে হবে। আনাতোল ফ্রান্স কোথায় বেশ বলেছেন যে, "প্রত্যেক সুকুমার সাহিত্যের একটা মস্ত মহিমা এই যে, প্রতি পাঠক তার মধ্যে নিজেকেই দেখে।" আপনার কবিতার আবেদনও যে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের হ'তে বাধ্য একথা ত আপনাকে মানতেই হবে। তা হলে গানের ক্ষেত্রেই বা তা না হবে কেন? আমার ত মনে হয় শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির ভিতরকার কথাটা—শিল্পের মধ্য দিয়ে একটা বিশ্ব-জনীনতার তারে আঘাত দেওয়া অর্থাৎ আমার মনে হয় আসল কথা নানা লোকে আপনার কবিতার মধ্যে দিয়ে কতরকম suggestionএর খোরাক সংগ্রহ করে। আপনি ঠিক কি ভেবে আপনার নানান কবিতা লিখেছেন বা নানান গান রচনা করেছেন সেটা ত গ্রহীতার কাছে সবচেয়ে বড় কথা নয়—বিশেষতঃ যখন একজন কখনই অপর কারুর প্রাণটি ঠিক ধর্‌তে পারে না। আপনি নিজেই কি লেখেননি যে, কবিকে লোকে যেমন ভাবে কবি তেমন নয়? তাই আমার মনে হয় যে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার কবিতা বা গানের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন রস সঞ্চয় করে। এ কথাটার খুব extreme সিদ্ধান্তটিও আমার কাছে ভুল মনে হয় না। অর্থাৎ যদি একজন যথার্থ শিল্পী আপনার কোনও

গানকে সম্পূর্ণ নতুন সুরে গেয়ে আনন্দ পান ও পাঁচজনকে আনন্দ দেন, এমন কি তা হ'লেও আপনার তাতে দুঃখ না পেয়ে আনন্দই পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কেননা আর্টের কষ্টি পাথর হচ্ছে আনন্দের গভীরতা। অথচ আপনি বল্‌তে পারেন যে এক্ষেত্রে আপনার গানের মধ্যে "আপনি" যে সুরটি ফুটিয়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন সেটা বজায় রইল না। মান্‌লাম। কিন্তু—কিছু মনে করবেন না—তাতে কি সত্যই খুব আসে যায়? বিশেষতঃ যখন ভারতীয় গানের ধারায় শিল্পী চিরকাল কমবেশী স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।"

কবিবর বল্‌লেন, "না, একথা আমি অস্বীকার করি না বটে, কিন্তু তাই বলে তুমি কি ব'লতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমিত' নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপ সৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। মুখের মধ্যে সন্দেশ দাও—খুসির কথা। কিন্তু যদি চোখের মধ্যে দাও তবে ভীম নাগের সন্দেশ হ'লেও সেটা দুঃসহ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোন দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে ত আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"

আমি ব'ললাম, "মাপ করবেন কবিবর। আপনার এ কথাগুলির মধ্যে অনেকখানি সত্য থাক্‌লেও এর বিপক্ষে দুচারটে কথা বলার আছে। প্রথম কথা এই যে, আপনার সন্দেশের উপমাটি আপনার অনুপম উপমাশক্তির একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হলেও এতেও আবার সেই ভুলবোঝার প্রশ্রয় দেওয়া হ'তে পারে, এ আশঙ্কা আমার হয়। কারণটা একটু খুলে বলি। সন্দেশ চোখে দিলে তা দুঃসহ হয় মানি, কিন্তু সেটা স্বতঃসিদ্ধ বলে নয় একথা খুব জোর করেই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সন্দেশ চোখে দিলে দুঃসহ হয় এই কারণে, যে এটা মানুষ পরীক্ষা করে দেখেছে। নইলে অন্ততঃ ভোজনবিলাসীর পক্ষে নিখর্চায় একট বাড়তি ভোজনেন্দ্রিয় লাভ হ'লে তাতে তার বোধহয় আপত্তি হ'ত না। বাংলা গান সম্বন্ধেও ঐ কথা। বাংলা গান যথেষ্ট তান দিয়ে গাওয়া যদি অসমীচীন হয় তবে সেটা এক 'ফলেন পরিচীয়তে'ই হতে পারে—আগে থাক্‌তে স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য হ'তে পারে না। কারণ, যদি কেউ আপনাকে গেয়ে দেখিয়ে দিতে পারে যে, বাংলা গান যথেষ্ট তানালাপের সঙ্গে গাইলেও তা পরম সুশ্রাব্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তাহ'লে ত আপনার সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতেই হবে যে হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের মধ্যে যে একটা অনপনেয় গণ্ডী আপনি টান্‌তে চান সেটা সীতাহরণের গণ্ডীর মতন অলঙ্ঘ্য নয়।—অর্থাৎ গায়কের মধ্যে সুধু প্রয়োগজ্ঞানের অভাবেই এ সাময়িক গণ্ডীর সৃষ্টি; শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ গণ্ডী অতিক্রম কর্লে'ও সীতার মতন বিপদে না

পড়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারেন। আমি শুধু তর্কের জন্য এ নিছক্ "যদির" আশ্রয় নিচ্ছি মনে করবেন না, এটা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব দেখেছি বলেই এ 'যদি'-বাদ করলাম জানবেন। তবে সে কথা যাক্। আমি আর একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই, ও সেটা এই যে আপনার শত আশঙ্কা ও সতর্কতা সত্বেও আপনার গানকে আপনি তার মৌলিক সুরের গণ্ডীর মধ্যে টেনে রাখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনার গানেরই একজন ভক্ত আগে আমার সঙ্গে ঠিক এই কথা বলেই তর্ক করতেন যে যদি আপনার গানে প্রত্যেক গায়ককে তার স্বাধীন সৃষ্টির অবসর দেওয়া হয় তাহ'লে আপনার সুরের আর কিছু থাকবে না। কিন্তু সেদিন তিনিও আমার কাছে স্বীকার কর্লেন যে, আপনার 'সীমার মাঝে অসীম তুমি'-রূপ সহজ সুরটাও একজন তাঁর সামনে এমন বিকৃত করে গেয়েছিলেন যে তার গ্রাম্যতা না শুনলে কল্পনা করাও কঠিন। আমারও মনে হয় না যে আপনি শুধু ইচ্ছে ক'রলেই আপনার মৌলিক-সুর হুবহু বজায় থেকে যাবে। আপনি কখ্‌খনো পারবেন না, এ আমি আগে থেকেই ব'লে রাখ্‌ছি। যদি আমাদের গান harmonized হ'ত ও ঠিক য়ুরোপীয়দের মতন সর্ব্বদা স্বরলিপি দেখে গাওয়া হ'ত, তা হলে হয়ত আপনি যা চাইছেন তা সাধিত হতে পারত। কিন্তু আমাদের গান যে অন্ততঃ শীঘ্র এভাবে গৃহীত হতে পারে না এটা যদি আপনি মেনে নেন তা হ'লে বোধ হয় আপনার স্বীকার না ক'রেই গত্যন্তর নেই যে আপনি যেটা চাইছেন সেটা কার্য্যক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া অসাধ্য না হোক্ একান্ত দুঃসাধ্য ত বটেই। আর তানালাপের স্বাধীনতা না দিলেই কি আপনি আপনার গানের কাঠামটা হুবহু বজায় রাখতে পারবেন মনে করেন। সহজ-সুরের ধরা-কাঠের মধ্যে কি বিকৃতি কম হয়? আপনার অনেক সহজ গানও আমি এভাবে গাইতে শুনেছি যে—মাপ করবেন—তা সত্যিই vulgar শোনায়। তবে আশাকরি এ কথাটা ব্যবহার করার জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না।"

কবিবর একটু ম্লান হেসে বল্‌লেন, "না না আমি তোমায় ভুল বুঝিনি মোটেই। তুমি যা বলছ তা আমারও যে আগে মনে হয় নি, তা নয়। আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেচি যে আমারও ভয় হয়েচে যে আমার-গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় ব'লেই গায়কের নিজের দোষ-গুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না ক'রেই পারে না। ছবি ও কাব্যকে এই দুর্গতি থেকে বাঁচান সহজ। ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বর উপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছা মত উলট্‌-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্ম্ম-বুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।"

কবিবরের এই কথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বিশেষ ক'রে মনে হচ্ছিল—মানব-হৃদয়ের

কোনও সত্য অনুভূতির বিশুদ্ধতা বজায়-রাখার সেই চিরন্তন নিষ্ফল চেষ্টার ট্র্যাজিডি। জগতে প্রায় কোনও দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক বা শিল্পীই কিছু দিন পরে সাধারণের এ ভুল-বোঝার হাত হতে নিষ্কৃতি পান নি। কবিবরের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব-জ্ঞানের সূক্ষ্ম অনুভূতিটী যে তাঁর সুকুমার সুরের Caricature কতটা আঘাত না পেয়েই পারে নি সেটা যেন সেদিন সন্ধ্যার গ্লানিমায় তাঁর ক্লান্ত কথাগুলির মধ্য দিয়ে বেশি করেই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌ল।

আমি ব'ললাম, "আপনি এতে যে কতটা ব্যথা পেয়ে থাক্‌বেন সেটা আমি অনেকটা কল্পনা করতে পারছি। কিন্তু ট্র্যাজিডি ত জগতে আছেই, শিল্পেও আছে, সুতরাং তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। এজন্য আমার মনে হয় যে, যে ট্র্যাজিডি অবশ্যম্ভাবী তাকে নিবারণ করবার প্রয়াস নিষ্ফল। যদি আপনিও বিফল প্রয়াস কর্ত্তে যান তাহলে আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবে না, হবে কেবল—তার স্থলে একটা অহিত সাধন করা। অর্থাৎ আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের Caricature নিবারণ কর্ত্তে পারবেন না। পার্ব্বেন কেবল সত্য শিল্পীকে তার সৃষ্টি কার্য্যে বাধা দিতে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে আপনি চেষ্টা করলেও আপনার মৌলিক সুর বজায় রাখতে পারবেন না। কিন্তু তবু আপনার গানে শিল্পীর নিজের Expression দিয়ে গাওয়াটা আপনার কাছে ব্যথার বিষয় বলে অনেক সত্যকার শিল্পী হয়ত আপনার গান তাদের নিজের মতন করে গাইতে চাইবে না। আপনার অনিচ্ছা না থাকলে হয়ত তারা আপনার গানের মূল কাঠামটা বজায় রেখে তাদের ইচ্ছামত স্বর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আপনার গানকে একটা নূতন সৌন্দর্য্যে গরীয়ান করে তুলতে পারত। কিন্তু আপনার সুর 'হুবহু বজায় রাখতে হবে'—আপনার এই ইচ্ছা বা আদেশের দরুণ তাদের নিজেদের অনুভূতির রঙ ফলিয়ে আপনার-গান গাওয়া তাদের কাছে একটা সঙ্কোচের কারণ না হয়েই পারবে না। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। শিল্পীকে এ স্বাধীনতা দিলে অবশ্য আপনার গানের মূল ভাবটী (Spirit) বজায় রাখা কঠিনতর হবে একথা আমি মানি। কিন্তু যেহেতু সব বড় আদর্শেরই উল্টো দিকে risk ও বড় হতে বাধ্য, সেহেতু এ risk এর গুরুত্বের জন্য ত আদর্শকে ছোট করা চলে না।

কবিবর একটু ভেবে বল্‌লেন, "অবশ্য যারা সত্যকার গুণী, তাদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম। তবে একটা কথা ;—না দিলেই বা মানছে কে ; দ্বারী নেই, শুধু দোহাই আছে, এমন অবস্থায় দস্যুকে ঠেকাতে কে পারে ? কেবল আমি এসম্পর্কে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে বাংলা-গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে একথা তুমি মান কিনা ?"

আমি বল্‌লাম, "মানি—যদি বাংলা গান হুবহু হিন্দুস্থানী গানের তানালাপের পদ্ধতি নকল করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আমি একথা ইতিপূর্ব্বে লিখেছি যে বাংলা গানে, বিশেষতঃ কবিত্বময় ও ভাবময় গানে তানের একটু সংযম করতেই হয়। সেই জন্য বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের

অপূর্ব্ব রস পুরোপুরী আমদানী করা চলে না। কিন্তু তবু অনেকখানি চলে একথা আপনাকে মানতে হবে—বিশেষতঃ সত্যকার শিল্পীর হাতে। কারণ সত্যকার শিল্পী একটা সহজ সৌষ্ঠব জ্ঞান (Sense of proportion) ও সংযমজ্ঞান নিয়ে জন্মান, একথা বোধহয় সত্য। আপনি যদি বিখ্যাত রসিক রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে আপনারই গান শুন্‌তেন তা-হ'লে বুঝতেন আমি কেন আপনার কাছ থেকে এ স্বাধীনতা চাইছি। অবশ্য এক শ্রেণীর বাংলা গান আছে যা নিতান্তই সহজ সুরে রচিত ও সহজ সুরেই গেয়। সেগুলির সঙ্গে আমার বিবাদ নেই এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমি এ স্বাধীনতা চাইছি না। আমি কেবল বলি এই কথা যে আর এক শ্রেণীর বাংলা গান কেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবেই হবে, যার মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্পূর্ণ না হোক্—অনেকখানি সৌন্দর্য্যের আমদানি করা চলবে ? আমার সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের কতকগুলি গান শুনে আরও বেশি করে মনে হয়েছে যে এটা শুধু সম্ভব তাই নয় এটা হবেই। আমি আরও একটু বেশি বল্‌তে চাই যে এদিকে বাংলা গানের বিকাশ অনেকটা ইতিমধ্যেই হয়েছে যার হয়ত আপনি সম্পূর্ণ খবর রাখেন না। এবং আমরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে নিয়ে একটু উদারভাবে চেষ্টা করলে এ বিকাশ পরে আরও সমৃদ্ধতর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমার মোট কথাটি এই যে বাংলা গান বাংলা বলেই তাতে তান দেওয়া চল্‌বে না একথা আমার সঙ্গত মনে হয় না।"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "আমি ত কখন এ কথা বলিনি যে কোনও বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলঙ্কারের জন্য তার দাবী আছে। আমি এরকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।" ব'লে কবিবর স্বরচিত একটী ভৈরবী তান দিয়ে গাইলেন।

তারপর তিনি বল্‌লেন, "হিন্দুস্থানী গানের সুরকে ত আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিই না। আমাকেও ত নিজের গানের সুরের জন্য ঐ হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে! আর এতে যে দোষের কিছুই নেই একথাও ত আমি সাহিত্যের উপমা দিয়ে বল্‌লাম। কাজে কাজেই হিন্দুস্থানী গান ভাল করে শিখলে তার প্রভাবে যে বাংলা সঙ্গীতে আরও নূতন সৌন্দর্য্য আসবে এটাই ত আশা করা স্বাভাবিক। তাই তোমরা এ চেষ্টা যদি কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অনুমোদন আছে এ কথা নিশ্চয় জেনো। কেবল আমি তোমাকে বাংলার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বল্‌লাম সে কথা ক'টী মনে রেখো।" বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কেমন করে নূতন সৌন্দর্য্য বাংলা সঙ্গীতে ফুটানো যেতে পারে, এটা একটা সমস্যা। তবে চেষ্টা করলে এ সমস্যার সমাধানও না মিলেই পারে না। একথা স্মরণ রেখে যদি তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত assimilate ক'রে বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন কর্ত্তে পার, তা হ'লে তুমি সগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে' দিতে পারবে ; নইলে সুরের জলপ্লাবনই হবে কিন্তু তাতে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটবে না।"

আমি বল্‌লাম, "আপনার সঙ্গে ত দেখছি এখন আমার কোনই মতভেদ নেই।"

কবিবর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি হাস্‌লেন।

৮ই এপ্রিল, ১৯২৫।

সকালবেলা। কবিবরকে একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, তবে দিন দশেক আগে যতটা শ্রান্ত দেখিয়েছিল ততটা নয়।

আমি বল্‌লাম, "আমি আপনাকে আজ একটা প্রশ্ন করতে চাই। সেটা এই যে সঙ্গীতের ভাষা বিশ্বজনীন—The language of music is universal—ব'লে যে একটা কথা আছে সেটা সত্য কি না। আমার মনে হয় সত্য নয়। এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার এ সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, আমি বারবার দেখেছি যে য়ুরোপীয় সঙ্গীত আমাদের মনে বা ভারতীয় সঙ্গীত ওদের মনে কখনই একটা খুব বড় রকম অনুরঞ্জন তুলতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার বিখ্যাত সঙ্গীত-রসিক রোমাঁ্যা রোলাঁর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হত। তাঁর বার বার বলাসত্ত্বেও আমি আজ অবধি তাঁর কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনি যে সঙ্গীতের আবেদন দেশ-কাল-পাত্রের অতিরিক্ত।"

রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "সকল সৃষ্টির মধ্যেই একটা দ্বৈত আছে; তার একটা দিক হচ্ছে অন্তরের সত্য, আর একটা দিক হচ্ছে তার বাহিরের বাহন। অর্থাৎ একদিকে ভাব আর একদিকে ভাষা। দুইয়ের মধ্যে প্রাণগত যোগ আছে কিন্তু প্রকৃতিগত ভেদ দুইয়ের মধ্যে আছে। ভাষা সার্ব্বজনীন নয় অথচ এই সত্য সার্ব্বজনীন। এই সর্ব্বজাতীয় সম্পদকে আয়ত্ত করতে গেলে তার বিশেষ জাতীয় আধারটীকে আয়ত্ত করতে হয়। কবি শেলির কাব্যের সার্ব্বজনীন রসটী উপভোগ করতে গেলে ইংরেজনামে একটা বিশেষ জাতির ভাষা শিখে নেওয়া চাই। সেই ভাষার সঙ্গে সেই রসের এমনি নিবিড় মিলন যে দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ একেবারেই চলে না। গানের ভিতরকার রসটী সর্ব্বজাতির কিন্তু ভাষা, অর্থাৎ তার বাহিরের ঠাটখানা, বিশেষ বিশেষ জাতির। সেই পত্রটী যথার্থ রীতিতে ব্যবহারের অভ্যাস যদি না থাকে তবে ভোজ ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই বলে ভোজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। য়ুরোপীয়েরা আপন সঙ্গীতের যে প্রভূত মূল্য দেয় এবং তার দ্বারা যে সুগভীরভাবে বিচলিত হয় সেটা আমরা দেখেছি—এই সাক্ষ্যকে শ্রদ্ধা না-করা মূঢ়তা। কিন্তু একথাও মানতে হয় যে এই সঙ্গীতের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা এর ভাষা আমি জানিনে। ভাষা যারা নিজে জানে তারা অন্যের না-জানা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়। অনেক সময়ে বুঝতে পারে না, না-জানাটাই স্বাভাবিক। ভাষা যখনই বুঝি তখনি রস ও রূপ অখণ্ড এক হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কাব্যের ও গানের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ দেশ কালের যেমন বিশেষত্ব আছে, ছবির ভাষায় তেমন নেই, কারণ ছবির উপকরণ হচ্ছে দৃশ্য পদার্থ; অন্যভাষার মতন সে ত একটা সঙ্কেত নয় বা প্রতীক নয়। গাছ শব্দটা একটা সঙ্কেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নেই, কিন্তু গাছের রূপ রেখা আপন পরিচয়

আপনি বহন করে। তৎসত্ত্বেও চিত্রকলার idiom যতক্ষণ না সুপরিচিত হয় ততক্ষণ তার রসবোধে বাধা ঘটে। এই কারণেই চীন জাপান ভারতের চিত্রকলার আদর বুঝতে য়ুরোপের অনেক বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু যখন বুঝেচে তখন idiom থেকে রসকে ছাড়িয়ে নিয়ে বোঝেনি। উভয়কে এক করে তবেই বুঝেচে। তেমনি সঙ্গীতকেও বোঝবার একান্ত বাধা নেই। কিন্তু তার প্রকাশের যে বাহ্যরীতি বিশেষ দেশে বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে, তাকে জোর করে ডিঙিয়ে সঙ্গীতকে পূর্ণভাবে পাওয়া অসম্ভব। কোনো আভাষই পাওয়া যায় না তা বলিনে, কিন্তু সেই অশিক্ষিতের আভাষ নির্ভর-যোগ্য নয়।

"এক ভাষায় বিশেষ শব্দের যে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে অন্য ভাষার প্রতিশব্দে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যবহারের যে ছাপ লাগে, হৃদয়াবেগের যে রং ধরে সেটা 'ত অন্য ভাষায় মেলে না। কারণ চরণকমলকে feet lotus বললে কি কিছু বলা হয়? অথচ এই শব্দটার মধ্যে ভাবের যে সুরটি পাই, সেই সুরটি যে কোন উপায়ে যে কেউ পাবে, সেই আনন্দও তার তেমনি সুগম হবে। অতএব এই বাহিরের জিনিষটাকে পাওয়ার অপেক্ষা করতেই হবে তা হলেই ভিতরের জিনিষটিও ধরা দেবে। আমরা ইংরেজী সাহিত্যের রস অনেকটা পরিমাণেই পাই, তার কারণ ইংরেজী শব্দের কেবলমাত্র যে অর্থ জানি তা নয়, অনেক পরিমাণে তার সুরটা, তার রঙটাও জেনেছি। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ভাষা সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলতে পারিনে। Keatsএর Ode to a Nightingaleএ—fairy land forlornএর perilous seaর ঊর্দ্ধে magic casementএর ছবি যে অপূর্ব্ব-সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাকে আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ওর শব্দগত সঙ্গীত প্রতিশব্দে দুর্লভ বলেই যে এ বাধা, তা নয়। ওদের পরীর দেশের কল্পনার সঙ্গে যে সমস্ত বিচিত্রতার অনুভাব জড়িয়ে আছে আমাদের তা নেই। কিন্তু Keatsএর কবিতার মাধুর্য্য আমাদের কাছে ত ব্যর্থ হয় নি। কারণ দীর্ঘকালের অভ্যাস ও সাধনায় আমরা ইংরেজী সাহিত্যের বাহির দরজা পেরিয়ে গেছি। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আমাদের সেই সুদীর্ঘ সাধনা নেই—দ্বারের বাইরে আছি। তাই এটুকু বুঝেছি যে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বিশ্বজনের কিন্তু তার ভাষার দ্বারী বিশ্বজনের নিমক খায় না।"

আমি বললাম, "রসের বিশ্বজনীনতার কথা বললেন কিন্তু রুচিভেদ—।"

কবিবর বললেন, "অবশ্য রুচিভেদ নিয়ে মানুষ সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই বিবাদ করে আসছে।"

আমি বললাম, "কিন্তু তা হ'লে কি বলতে হবে যে আর্টে absolute values সম্বন্ধে মানুষের মনের মধ্যে অনৈক্যটাই কায়েম হয়ে থাকবে মতৈক্য কখনও গ'ড়ে উঠবে না?"

কবিবর বললেন, "উঠবে। তবে সেটার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাল। একমাত্র কালই এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচারক। সাময়িক মতামত যে প্রায়ই শিল্পের বা শিল্পীদের relative value সম্বন্ধে ভুল করে বসে একথা কে না জানে?"

আমি বল্‌লাম "ঠিক কথা। সেক্‌স্‌পীয়রের সময়ে লোকে বল্‌ত যে, Ben Johnson তাঁর চেয়ে বড়। কিন্তু আজ আমাদের একথা শুনলে হাসি পায়।"

কবিবর হেসে বল্‌লেন, "সেক্‌স্‌পীয়রের দৃষ্টান্তটী খুব সুপ্রযুক্ত। তাঁর সময়ে লোকে তাঁকে বিজ্ঞভাবে মূর্খ ব'লে Ben Johnsonকে মস্ত পণ্ডিত হিসাবে বড় করে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখছ ত কাল কেমন ধীরে ধীরে আজ Ben Johnson-এরই উচ্চ আসনে মূর্খ সেক্‌স্‌পীয়রকে বসিয়েছে? তাই রুচিভেদ নিয়ে আমাদের কালের রায় গ্রহণ করা ছাড়া এ সম্বন্ধে সমস্যার কোনও চরম সমাধান হ'তে পারে না।"

কি চমৎকার কথাগুলি! আর একটা চরিত্রের কি সুন্দর পরিণতি!

ফেরবার সময় আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল সুইজর্লণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আর একজন সমতুল্য অভ্রভেদী মানুষের কথাঃ—Quelle harmonie!" (কি সমন্বয়!—রোমাঁ রোলাঁ সুইজর্লণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে ঠিক্ এই কথা দুটি আমাকে বলেছিলেন।)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অভিনন্দন *

স্বাগত সুধীমণ্ডলী লহ, শ্রদ্ধার উপহার,—
এ মহামিলন সার্থকি' শুভ প্রীতির অর্ঘ্যভার!
বাঙ্গালীর সেরা গৌরব ঠাঁই—
বাণীর সেবক মিলেছে সবাই!
অতীত, লুপ্ত শ্মশান-চিহ্ন
ঝরায় অশ্রুধার!—
রিক্ত হিয়ার পঞ্জরে কাঁপে বেদনার হাহাকার।
ছুটে চলে অই উত্তাল পদ্মা করিয়া অট্টহাস—
মিটেনি এখনো রাক্ষসী-ক্ষুধা, উন্মাদ অভিলাষ।
সেদিনো পাষাণী লুটে নিল সব—
বাঙ্গালীর শেষ স্মৃতি-গৌরব; †
লক্ষ নয়ন অপলক, ক্ষোভে—
হেরিল সর্ব্বনাশ,—
ফেনায়ে তুলিল বুকের রক্ত, আকুল দীর্ঘশ্বাস।

ফেল চক্ষের দুই ফোঁটা জল, নোয়াও একটু শির।
প্রাচীর তীর্থে, বাণী পদতলে তর্পণ বাঙ্গালীর!
প্রতি অণু এই তৃষিতার হায়—
জাগে নিশিদিন প্রাণ-পিয়াসায়!
সন্তান কবে জুড়াইবে জ্বালা;—
বন্ধনে সুনিবিড়!—
ব্যথা-থরথর বক্ষে ঝাঁপা'য়ে দীনহীনা জননীর।
কি দেখিতে আর এসেছ বাঙ্গালী? বিস্মৃত গরিমায়
কি পাইবে আর, সকলি শূন্য! এ মহা শ্মাশান-ছায়!
কঙ্কালসার রিক্তার সাজে—
অই হের মার মূর্ত্তি বিরাজে;
সারা বাঙ্গালার মূক-ক্রন্দন
কাঁপে এই কিনারায়!
বিথারিয়া জ্বালা তীর্থ-স্মৃতির গৌরব-মেখলায়।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

* মুন্সীগঞ্জে ষোড়শ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর সাহিত্য-শাখার উদ্বোধন কবিতা
† রাজবাড়ীর মঠ।

জাতি-রক্ষা

চাষার মেয়ে হইলেও সে খাঁদা-বোঁচা ছিল না। মুখখানি ছিল বেশ মানানসই। কিন্তু তাহার গায়ের রঙটা ছিল একেবারে কালো কুচকুচে, যেন কষ্টি পাথর খুদিয়া গড়া। এই জন্য তাহার নাম রাখা হইয়াছিল কালী। মা-বাপে আদর করিয়া ডাকিত মা কালী। চারিটি ছেলের পর এই মেয়েটি হইয়াছিল বলিয়া তাহার আদর ছিল ছেলেদের অপেক্ষাও অনেক বেশী। এই আদরের অত্যাচারে আট বছর বয়সে কালীর হাতে লাল শাঁখা উঠিল—সিঁথিতে টুকটুকে সিঁদুর পড়িল। সৌখিন জিনিষের মত লাল শাঁখা ও রাঙা সিঁদুর কালীর কাঁচা মনটাকে বেশ খুসী করিয়া তুলিল কিন্তু এই দুইটি জিনিষের মধ্যে নারীর যে কি সুখ সৌভাগ্য নিহিত আছে সে তাহার মর্ম্ম বুঝিল না।

চারটি বছর পরে হঠাৎ একদিন কালীর হাতের লাল শাঁখা ভাঙিয়া গেল, সিঁথির রাঙা সিঁদুরও মুছিয়া গেল। এত সখের জিনিষগুলি হারাইয়া কালীর মনটা খুবই কাতর হইল সত্য, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের যে কত বড় একটা ক্ষতি হইয়া গেল, তাহার বুদ্ধিতে তাহা ধরা পড়িল না। বরং শাঁখার বদলে যখন তাহার হাতে লালরঙের একগোছা রেশমী চুড়ী উঠিল, তখন কালী মনে করিল, এ পরিবর্ত্তনে সে জিতিয়া গেল।

আরো পাঁচটা বছর কাটিয়া গেল। কালী এখন সতেরো বছরের। তাহার স্বাভাবিক নিটোল দেহের গঠন আরো নিটোল হইয়া উঠিয়াছে। একটা স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, তরল রূপের লীলা তাহার সারা দেহে নাচিয়া ফিরিতেছে। পুষ্ট, সুগোল হাতের উপরে লাল রেশমী চুড়ী ক'গাছা এমন সুন্দর আঁটিয়া বসিয়াছে যেন চিত্রকরের তুলির টানে কয়েকটা লাল সরু রেখা হাতের উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কালী মাছ খায়, পানের রঙে ঠোঁট দুখানি সব সময়ে টুকটুকে করিয়া রাখে, ডেপেড়ে শাড়ী পরে। স্বামীর সাথে তাহার সধবা নামটা গিয়াছে বলিয়া, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে সে একটুও আমল দেয় নাই—কেহ দিতেও বলে নাই। তার সমবয়সীদের মত সে ঘাটে পথে যায়, হাসে খেলে, চাষার মেয়েদের মত এমন সব কথারো আলোচনা করে, যা'তে তার কোন অধিকার নাই। বিধবা বলিয়া কালীর যৌবনও আটকাইয়া রহিল না। মনও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিল না। স্থূল, সূক্ষ্ম দুইটা জিনিষই শাস্ত্রের শাসন উপেক্ষা করিয়া চলিল।

বয়স যখন এমনি করিয়া কালীর বাহিরটাকে সুন্দরী করিয়া সাজাইয়া দিল, তখন তাহার মনও সুন্দরের জন্য বাসরসজ্জায় সাজিয়া উঠিল। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার এমন একজনের সঙ্গে দেখা হইল, যাহাকে দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল তাহার অন্তর বাহিরের বাসর-সজ্জা তাহারি জন্য।

একদিন কালীর কাকীমাকে তাহার বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য তাহার ছোটভাই কার্ত্তিক আসিয়া উপস্থিত হইল। কার্ত্তিকের বয়স বাইশ বছর। পুরুষের যাহা রূপ, চাষার ছেলে বলিয়া ভগবান তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। রোদের আগুনে পুড়িয়া, বর্ষার জলে ধুইয়া তাহার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণ যৌবনশ্রী, খাঁটি সোনার মত এমন ঝলমল্ করিয়া উঠিয়াছে যে, রাজপুত্রের হীরা জহরতের জৌলুস্ও তাহার কাছে হার মানে। কালী ও কার্ত্তিকের চোখে চোখে দেখা হইতেই তাহারা চিনিয়া লইল, তাহারা যেন কত জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। যেন একগাছি সরু সোনার তারে দুজনের হৃদয় বাঁধা পড়িল।

ঘনিষ্ঠতাটা খুব শীঘ্র শীঘ্রই জমিয়া উঠিল। জমিয়া উঠিবার অবসরও মিলিল। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এত দিন পরে বাপের বাড়ী যাইবে তাহাকে একখানা নূতন শাড়ী না দিলেই নয়; অথচ, কালীর বাবা বাঘাই সর্দ্দারের অবস্থা এমন নয় যে চট্ করিয়া তিন টাকা দিয়া একখানা শাড়ী কিনিয়া দেয়। কাজেই এই নূতন শাড়ীর জন্য, আজকাল করিয়া, কালীর কাকীমার বাপের বাড়ী যাওয়া পিছাইয়া যাইতে লাগিল; কার্ত্তিককেও সেই জন্য কালীদের বাড়ীতে থাকিয়া যাইতে হইল। এ কয়টা দিন কার্ত্তিক কালীকে কেবল খাটাইতে লাগিল। সে কালীকে দেখিলেই একটা-না-একটা ফরমাইস করিয়া বসিত। কখনো বলিত, "কালী, একটা পান সেজে দেনা ?" কালী, পান সাজিয়া যখন কার্ত্তিকের হাতে দিত তখন কার্ত্তিক পান যে খাইবার জিনিষ সেটা প্রায়ই ভুলিয়া যাইত।

কার্ত্তিক কখনো বলিত, "এক ছিলিম তামাক সাজ্ না কালী।" কালী, তামাক সাজিয়া যখন কলিকাতে ফুঁ দিত, কার্ত্তিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। নলচের মাথায় কলিকাটা বসাইয়া দিয়া, কালী যখন হুঁকাটা কার্ত্তিকের হাতে দিত, তখন কালীর মুখের দিকে চাহিয়াই সে হুঁকার এমন জায়গায় মুখ দিয়া টানিতে আরম্ভ করিত যে তাহার ভুল দেখিয়া কালী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত।

বাহিরের হাসি-কৌতুক এইরূপ চলিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের অন্তরের কথা যাহা, তাহা সমাজের বিধি বিধানের পাষাণ ঠেলিয়া কিছুতেই বাহির হইতে পারিতেছিল না, তাহা পাথরে-ঘেরা ঝরণার জলের মত ক্রমে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

দিদির বড় যা, এই সুবাদে কার্ত্তিক, কালীর মাকে বড়দি বলিয়া ডাকিত। একদিন দুপুরে কালী ও তাহার মা ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছে, এমন সময় কার্ত্তিক আসিয়া বলিল, "কালী, এক ছিলিম্ তামাক সাজতো।" কালী কলিকায় তামাক পূরিয়া আগুনের জন্য রান্নাঘরে গেল। সে চলিয়া যাইতেই কার্ত্তিক বলিল, "বড়দি, কালীকে কি এমনি করেই রাখ্‌বে ?"

কালীর মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি করবো রে কার্ত্তিক, ওর যেমন অদেষ্ট।"

এমন সময় কালী কলিকায় আগুন দিয়া ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ তাহার মার সহিত কার্ত্তিকের যে কি কথা হইয়াছে তাহা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু পরের কথাগুলি সে বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিল।

কার্ত্তিক বলিল, "আমি বলি কি বড়দি—" কিন্তু ঐ টুকু বলিয়াই কার্ত্তিকের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। কালীর মা বলিল, "তুই কি বলিস্?"

কার্ত্তিক অনেক চেষ্টা করিয়া আবার বলিল, "আমি বলি—"

কিন্তু সবটুকু সে কিছুতেই বলিতে পারিল না। দ্বিধা, ভয় ও সঙ্কোচে তাহার কথা ফুটিতেছিল না।

দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কালী দুইজনের কথা শুনিতেছিল আর কার্ত্তিকের অর্দ্ধসমাপ্ত কথায় সে হাসি আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

কার্ত্তিকের অবস্থা দেখিয়া কালীর মা বলিল, "বল্ না, রে, কি বল্‌তে চাচ্ছিস্?"

এবার কার্ত্তিক সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আমি বলি কি, আমার সঙ্গে কালীর বে দাও।"

কথাটা কানে যাইতেই কালী লজ্জায় মুখখানা দরজার আড়ালে সরাইয়া লইল। কালীর মা কিন্তু এমন অসম্ভব, অসামাজিক প্রস্তাবে রাগ করিল না। তার বড় আদরের কালী বিধবা, সে কি তার কম বেদনা। কতবার সে সমাজের মুখে মনের দুঃখে ঝাঁটা মারিয়াছে। কার্ত্তিককে দেখিয়া, তাহার কতবার মনে হইয়াছে, "আহা, এটি যদি কালীর বর হতো!" সুতরাং তাহারি প্রাণের কথা যখন কার্ত্তিকের মুখ দিয়া বাহির হইল, তখন তাহার মন পূর্ণমাত্রায় সম্মতি দিল বটে, কিন্তু মুখে তাহা বাহির হইল না; বরং সে যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "কি যে বলিস্! তা কি কখনো হয় রে, কার্ত্তিক? ওর যেমন পোড়া কপাল, তেমন কত পোড়াকপালীই আছে। তারাও যেমন করে থাক্‌বে, ও-ও তেমনি করে থাক্‌বে।"

"তাই বা কেন থাক্‌বে, বড়দি?"

"না থেকে কি কর্‌বে? আমরা ছোট জাত্ হলেও হিঁদুতো বটে। আমাদের তো বিধবার বে হয় না। আর হলেই বা সমাজে তাদের জায়গা দেবে কেন?"

"না-ই বা দিলে, বড়দি। যে সমাজে জায়গা দেবে সেই সমাজেই না হয় আমরা যাব। আমাদের জাতের কতজন কেরেস্তান্ হয়েছে, আমরা দুজনেও কেরেস্তান্ হব। তা হলে তারা আমাদের ফেল্‌বে না।"

কালীর মার মন গলিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, "না হয় এ সমাজে থাক্‌বে না—না হয় জাতই যাবে, তবু আমার কালী তো সুখে থাক্‌বে।"

সুযোগ বুঝিয়া কার্ত্তিক বলিল, "কি বল?"

কালীর মা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মেয়ে মানুষের কথায় তো কাজ হয় না রে। সকল কথার মালিক হলো পুরুষ মানুষ।"

কার্ত্তিক মিনতি করিয়া বলিল, "এক বার বলেই দেখ না, বড়দি?"

কালীর মা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "যে মানুষ! আমি বল্‌তে পারব না।"

কার্ত্তিক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। কালীর হাতের কল্‌কের তামাক তাহার হাতেই পুড়িয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

২

তাহার পরদিন দুপুরে বাঘাই যখন মাঠ হইতে ফিরিয়া, খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তামাক টানিতে বসিল, তখন কালীর মা তাহার কাছে ঘনাইয়া বসিল। কার্ত্তিককে সে মুখে যাহাই বলুক্ তাহার মনটা কিন্তু কার্ত্তিকের কথা ভুলিতে পারিতেছিল না। কথাটা একবার পাকেপ্রকারে তুলিবার জন্ম সে বলিল,—

"হ্যাঁ গা ভদ্রলোকেরা নাকি আজকাল বিধবার বে দিচ্ছে ?"

বাঘাই একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া, হাসিয়া বলিল, "সে খবর কেন রে ? আমি মলে নিকে বস্‌বি নাকি ?"

কালীর মা বলিল, "মরণ আর কি !''

"তবে জিজ্ঞেস্ কচ্ছিস্ যে ?"

"আহা, আমার কালীর যে কি দশা তা কি ভুলে যাচ্ছ ?"

"ভুলি নাই গো, তবে এসব যে জাতজন্ম যাওয়ার কথা।"

"যদি জনম ভোর দুঃখই পেল, তা হলে কি হবে জাতজন্ম নিয়ে ?"

তার পর কালীর মা একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কার্ত্তিকে বল্‌ছিল কি, যদি তার সাথে কালীর বে দাও—"

কথাটা আর শেষ হইল না। বাঘাই হাতের হুঁকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, "কি ! কাত্তিকে বলে এত বড় কথা ? আমার বাড়ী বসে, আমারি জাত মার্‌বার চেষ্টা।"

এক লাফে বারান্দা হইতে আঙিনায় নামিয়া বাঘাই সর্দ্দার ডাকিল, "কাত্তিকে—কাত্তিকে।"

কার্ত্তিক তখন বাড়ীতেই ছিল, ডাক শুনিয়া বাঘাই সর্দ্দারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই বাঘাই ঠিক বাঘের মতই তাহার উপরে পড়িয়া, কিল চড় মারিতে লাগিল আর মুখে বলিতে লাগিল, "ব্যাটা পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার, হারামজাদা আমার মেয়ের উপরে তোর নজর। বেরো আমার বাড়ী হ'তে—বেরো বল্‌ছি, নইলে খুন করে ফেল্‌ব।"

ঘরের মধ্যে কালী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বাঘাই সর্দ্দারের কিল চড় গুলি যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের উপরে দুম্ দুম্ করিয়া পড়িতেছিল। কালীর মা দৌড়াইয়া যাইয়া, কার্ত্তিককে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আহা, কর কি—কর কি ? কুটুম্বের ছেলে যে।"

দু'চার ঘা কালীর মার পিঠেও পড়িল। কার্ত্তিক একটা কথাও বলিল না। নিজেকে রক্ষা করিবারও কোন চেষ্টা করিল না, নীরবে মার খাইল।

বাঘাই আঙুল দিয়া পথ দেখাইয়া বলিল, "বেরো এক্ষুণি, আমার বাড়ী হতে। এর পরে এ গাঁয়ের ত্রিসীমানায় যদি দেখি, তা হ'লে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেল্‌ব।"

কার্ত্তিক নীরবে বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে যে ব্যথা বাজিয়াছে তাহার কাছে কয়েকটা কিল চড়ের ব্যথা, ব্যথা বলিয়াই মনে হইল না। কালীর মনটা বড়ই বিরূপ হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, চুপ্‌ করিয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে পলাইয়া যাইয়া বাপ্‌কে বেশ করিয়া আক্কেল দিয়া দেয়।

এই ঘটনার পরে চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। কার্ত্তিক আর আসিল না। তাহাকে যে একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারে নাই, কালীর বুকের মধ্যে সেই ব্যথাই রি-রি করিয়া ফিরিতেছিল। একটিবার কার্ত্তিকের সহিত দেখা করিবার জন্য তাহার মন আকুল হইয়া উঠিল।

বারুণী-স্নানের দিন কালীদের গাঁয়ের ক্রোশ খানেক দূরে একটা গাঁয়ে মেলা বসিল। কালীরা অনেকেই গেল।

যেখানে মনিহারী দোকানের সারি সেই খানে মেয়ে মানুষের ভিড় বেশী। কৌটা, আয়না, চিরুণী, পিতলের গিল্‌টি গয়না, কাচের চুড়ীতে সবগুলি দোকান ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। ভিড়ের মধ্যে কালী হঠাৎ দেখিল, কার্ত্তিক একেবারে তাহার গা ঘেঁসিয়া যাইতেছে। সে আস্তে হাত বাড়াইয়া, সকলের অলক্ষিতে তাহার কাপড়ে একটা টান্‌ দিল। কার্ত্তিক ফিরিয়া চাহিয়াই দেখিল, কালী। তাহার মুখখানা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। তার পরে, এদিকে-ওদিকে চাহিয়া সে সভয়ে একটু দূরে যাইয়া-সরিয়া দাঁড়াইল। কালী ভিড়ের মধ্যে, তাহার দল ছাড়িয়া কার্ত্তিকের কাছে যাইয়া বলিল, "একটা কথা আছে।"

কালী ও কার্ত্তিক একটু দূরে সরিয়া যাইয়া এমন জায়গায় দাঁড়াইল যেন কালীর দলের কেহ তাহাদিগকে না দেখিতে পায়। কালী বলিল, "আমার জন্য সেদিন কি মারটাই না খেলে।"

কার্ত্তিক বলিল, "তাতে আমার কিচ্ছু কষ্ট হয়নি, কালী। কিন্তু কষ্টটা যে কি তা আর কি বল্‌ব।"

সে মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার চোখ দুটি তখন সজল হইয়া উঠিয়াছে।

কালী মিনতির সুরে বলিল, "আমায় তুমি নিয়ে চল।"

কার্ত্তিক, জিভ্‌ কাটিয়া বলিল, "কি বলছিস্‌ কালী, তাও কি হয়।"

কালী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "আমি যে আর সইতে পারি না।"

কার্ত্তিক বলিল,—"কষ্টটা কিছু আমারো কম হচ্ছে না কালী, কিন্তু তোর মা বাপের অমতে তোকে চুরি করে নিয়ে যে তোর নামে একটা বদ্‌নাম আন্‌ব, তা আমি পার্‌ব না। লোকে যখন তোর কুচ্ছো কর্‌বে, তখন আমার যে কষ্ট হবে, সে কষ্ট তোকে পেলেও যাবে না। না কালী, ও কথা আর বলিস্‌ না।"

কার্ত্তিকের কথার জোরে, কালী বুঝিল তাহার মন অটল। কালী ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কার্ত্তিক বলিল,—"ভাল হয়ে থাকিস্, কালী। তোর নামে যদি কোন অপযশের কথা ওঠে, তা হলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

কালীর দুঃখও হইল, অভিমানও হইল। কিন্তু সকলের চেয়ে তাহাকে অভিভূত করিল, কার্ত্তিকের করুণ মিনতি। কালী ক্ষুণ্ণ মনে তাহার দলে যাইয়া মিশিল।

৩

একটা বছর প্রায় ঘুরিয়া গিয়াছে। একদিন কালীর মার সহিত তাহার প্রতিবাসী কালাচাঁদের স্ত্রী নন্দরাণীর ভয়ানক ঝগড়া বাধিয়া গেল। কারণ, কালাচাঁদের একটা বাছুর আসিয়া, কালীর মা আঙ্গিনায় যে ধান শুকাইতে দিয়াছিল, তাহা খাইয়া গিয়াছে। ঝগড়ার মধ্যে রাগের মাথায় কালীর মা, নন্দরাণীর একটা কুৎসার কথা উল্লেখ করিল। নন্দরাণী, ঝগড়ার শাস্ত্রটা বেশ ভাল করিয়াই জানিত। ঝগড়ার মুখে গলার জোরে অনেক মিথ্যাকে সে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আজও সে নিজের কুৎসার পাল্‌টা জবাব সেইভাবে দিয়া দিল। সে বলিল,—"কি আমার সতীরে! যেমন মা, তেমনি মেয়ে। সেদিন তোদের মিন্‌সে যে কাত্তিকে ছোঁড়াকে ধরে অমন করে ঠেঙিয়ে দিলে, তার গোপন কথা বুঝি আমরা কিছু জানিনা। নিজের ঘর সাম্‌লাতে পারিস না, পরকে বল্‌তে আসিস্।"

ফল কথা, নন্দরাণী উচ্চ সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া দিল, কালী কাত্তিকের সঙ্গে নষ্টা। ঝগড়া এইখানেই শেষ হইল না। নন্দরাণীর দাদা, মহেশ সর্দ্দার সে অঞ্চলের নমঃশূদ্র সমাজের প্রধান। নন্দরাণী তাহার দাদার কাছে কাঁদিয়া বলিল, "কালীর মা আমায় যা-তা ব'লে অপমান করেছে। কালী আর কাত্তিককে নিয়ে যে এত কেলেঙ্কারি হলো, তা গাঁয়ের কে না জানে? বাঘাইসর্দ্দার, ছোঁড়াকে মেরে আধমরা করে দিলে। কালীর মা বলে, এ সব মিথ্যা কথা আমিই রটিয়েছি, শুনেছ, দাদা? এর একটা বিহিত তোমায় করতেই হবে।"

বোনকে অপমান করিয়াছে শুনিয়া মহেশ সর্দ্দার রাগিয়া আগুন হইল। সে বলিল,—"তুই ঘরে যা, রাণী। আমি সে মাগীর ফরফরানি ভাঙ্‌ছি।"

কয়েকদিন পরে একটা বিবাহ উপলক্ষে, মহেশসর্দ্দার হুকুম জারি করিল যে বাঘাই সর্দ্দারকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না এবং তাহাকে লইয়া কেহ খাইতে পারিবে না।

কথাটা জানিতে পারিয়া, বাঘাই, মহেশ সর্দ্দারের নিকটে যাইয়া অনেক করিয়া বুঝাইল যে, কালীর সম্বন্ধে ও-কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা—কালীর চরিত্রে কোন দোষ নাই। কিন্তু সে সব কথা টিঁকিল না। মহেশসর্দ্দার বলিল, "পঁচিশ টাকা জরিমানা দিলে তোমাকে আমরা সমাজে তুলে নেব।"

গরীব বাঘাই সর্দ্দার, যাহার একখানা শাড়ীর দাম তিন টাকা সংগ্রহ করিতে তিন সপ্তাহ

লাগে, পঁচিশ টাকা সে কোথায় পাইবে ? কিন্তু না দিয়া তো উপায় নাই। জাতি রক্ষা করিতে হইলে যে টাকা তাহাকে দিতেই হইবে ; তাহাতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, হইতে হইবে।

অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও যখন কিছু হইল না তখন বাঘাই সর্দ্দারের ব্যর্থ রোষ যাইয়া পড়িল কালীর উপরে। সে বাড়ীতে যাইয়া কালীকে ধরিয়া নির্ম্মমভাবে মারিতে লাগিল। কালীর মা, মাঝখানে আসিয়া পড়িল। মারের বেশীর ভাগ তখন তাহারি পিঠে পড়িতে লাগিল। অবসর পাইয়া কালী তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন সোনা মিঞার বাড়ীতে যাইয়া পলাইল। বাঘাই সর্দ্দার গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিতে লাগিল, "একবার তোকে হাতে পেলে হয়। তোকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে জলে ভাসিয়ে দেব তবে আমি বাঘাই সর্দ্দার।"

এইরূপ হুলস্থূল হইয়া বাড়ীটা যখন একটু ঠাণ্ডা হইল তখন কালীর মা সোনা মিঞার বাড়ী যাইয়া, কালীকে বাড়ী আসিবার জন্য অনেক বুঝাইল কিন্তু কালী মারের ভয়ে কিছুতেই আসিতে সাহস পাইল না।

সোনা মিঞার বয়স ষাট বছর। সংসারে কেবল এক স্ত্রী। সাদাসিদে, নিরীহ লোকটি, তাহার পাঁচ ওক্ত নামাজ লইয়াই থাকে। সোনা মিঞাকে বাঘাই ডাকে চাচা বলিয়া, আর সোনা মিঞা, চাচার গৌরবে তাহাকে ডাকে শুধু বাঘাই বলিয়া। অনেক পুরুষ ধরিয়া তাহারা গায়-গায় ঘেঁসিয়া বাস করিতেছে। অনেক পুরুষের দান এই ডাকের সম্পর্ক-টাই তাহাদের এমন করিয়া আপন করিয়া দিয়াছে যে, ধর্ম্মের গোঁড়ামি সেখানে কোন রকমেই মাথা তুলিতে সুযোগ পায় না।

কালী যখন মার কথায় কিছুতেই গেল না তখন সোনা মিঞা, কালীর মাকে বলিল, "তুমি যাও, বউমা, আমি বাঘাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে, কালীকে রেখে আস্‌ব 'খন।"

কালী সে রাত্রি কিছুতেই বাড়ী গেল না। সমস্ত দিন রাত উপবাসী রহিল। রাত্রে কালীর মা, বাঘাইকে বলিল, "মেয়েটা ভয়ে এলোও না—আজ কিছু খেলোও না।"

বাঘাই সর্দ্দারের রাগ তখন কমিলেও একেবারে যায় নাই। সে বলিল, "থাক্‌গে এ রাত্তিরটা চাচির কাছে। কাল পেটে আগুন ধরলে নিজেই আস্‌বে।"

প্রাতঃকালে, নন্দরাণীর মারফত মহেশ সর্দ্দারের নিকট সংবাদ গেল, কালী কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং গত রাত্রি সোনা মিঞার বাড়ীতে কাটাইয়াছে—তাহাদের ভাতও খাইয়াছে।

মহেশ সর্দ্দার, বাঘাইকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, কালীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলে তাহাকে জাতির বাহির হইতে হইবে। জাতির বাঁধন যাহা ঊর্দ্ধতন ছাপ্পান্ন পুরুষ হইতে পুরুষে-পুরুষে বাঘাই সর্দ্দারের বংশে, কালসাপিনীর মত পেঁচ কসিয়া আসিতেছে, সে পেঁচ হইতে বাঘাই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না। স্নেহ, মমতা, রক্তের টান বিসর্জ্জন দিয়া সে জাতি বাঁচাইল।

কালীকে লইয়া বিপদে পড়িল সোনা মিঞা। সে মহেশের কাছে যাইয়া বলিল, "কালী একটা দিন না হয় তার চাচির কাছেই ছিল, তা কি হয়েছে ?"

মহেশ সর্দ্দার, সোনা মিঞার ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "দিন নয়, রাত ।"

"হলোই বা রাত। মোছলমান বলে আমি তো আর তাদের পর নই।"

মহেশ সর্দ্দারের মেজাজ চড়া হইয়া উঠিল। সে বলিল, "রেখে দাও তোমাদের আপন, পর। সোমত্ত মেয়ে, কাউকে বিশ্বাস নাই।"

সোনা মিঞা, তোবা, তোবা বলিয়া কানে হাত দিয়া বলিল, "কালী যে আমার নাত্‌নী, মেয়ের মেয়ে। আর আমার বাড়ীতে তার গায় হাত দেয় এমন সাধ্যই বা কার ? দলাদলি হয়েই থাকে সর্দ্দারের পো, মিছে মেয়েটাকে ডুবিও না।"

কিন্তু মহেশ সর্দ্দারের মন টলিল না—কালী ঘরে ফিরিবার অনুমতি পাইল না। সোনামিঞা, ক্ষুন্নমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, কালীকে বলিল, "দুটো রেঁধে খা, দিদি। না খেয়ে মরবি ?"

কালী উত্তর করিল, "আমি না খেয়েই মরব।"

কালীর ঘটনা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। আকুল সর্দ্দারের ছেলে রসিক যখন তাহা শুনিতে পাইল, তখন সে মনে-মনে একটা ফন্দি আঁটিল। রসিক কিছুদিন সিরাজগঞ্জ পাটকলে কাজ করিয়াছিল। কলের ধোঁয়া ও কালী তাহার বাহিরটা অপেক্ষা ভিতরটাকেই বেশী কালো করিয়া দিয়াছিল। যদিও অনেক দিন হইল সে কল্ ছাড়িয়াছে তাহা হইলেও তাহার অন্তরের কালীর ছাপ একটুও ফিকে হয় নাই। বরং দিনের পর দিন তাহা পাকিয়া গাঢ়ই হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় রসিক লুকাইয়া কালীর কাছে যাইয়া চুপে চুপে বলিল, "কালী, কার্ত্তিকে আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছে। তোর বাবা তোকে মারধর করে তাড়িয়ে দেছে শুনে নৌকো নিয়ে তোকে নিতে এসেছে, তোর বাপের ভয়ে, তোর কাছে আস্‌তে সাহস পেল না। তাই আমায় বড্ড কেঁদেকেটে বলে দিলে, তোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যেতে। কেন মিছে কষ্ট পাবি, কালী, চল্।"

এই বিপদের সময় কার্ত্তিকের নামে কালীর মনের মধ্যে খুব বেশী রকম সাড়া দিয়া উঠিল। বাড়ীতে তাঁহার যখন জায়গা নাই তখন কার্ত্তিকই তাহার একমাত্র আশ্রয়। মনটা যখন কার্ত্তিকের জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন রসিক যে তাহাকে মিথ্যাকথা বলিয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা তাহার মনেও আসিল না। কালী, যেন আশ্রয় পাইয়া আগ্রহে বলিল,—"চল।"

রসিক সকলের অলক্ষিতে কালীকে লইয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকায় কার্ত্তিককে না দেখিয়া কালী বলিল, "তাকে তো দেখ্‌ছি না ?" রসিক হাসিয়া বলিল, "তার নৌকা ও-পারে আছে।"

সে বোঠে মারিয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। নৌকা পারে লইয়া রসিক দু একবার "কার্ত্তিকে" "কার্ত্তিকে" বলিয়া ডাকিল। কিন্তু উত্তর না পাইয়া কালীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই তো

কার্ত্তিককে তো দেখ্‌ছি না। সে আমায় বলেছিল যদি এখানে আমায় না পাস্ তা হলে পাংসার ঘাটে যাস্। সেখানে আমায় নিশ্চয় পাবি। আমাদের দেরি দেখে তাই গেছে।”

রসিক গ্রামের লোক—খুব পরিচিত, কাজেই কালীর তখনো মনে কোন সন্দেহ আসিল না। রসিক আবার নৌকা বাহিয়া চলিল। রাত্রি বারোটার সময় তাহারা পাংসার ঘাটে পৌঁছিল। “আয়, কাল” বলিয়া রসিক নামিয়া পড়িল। কালীও নামিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কিন্তু তাহার মনে এইবার সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। আর তাহার সঙ্গে যাইবে না বলিয়া কালী পথের মাঝখানে বাঁকিয়া বসিল। কিন্তু রসিক তাহাকে অনেক বুঝাইয়া, আশ্বাস দিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু সে যখন পাংসার বাজারে পতিতা পল্লীর এক ঘরে তাহাকে লইয়া উঠাইল, তখন কালীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কালী কাঁদিল, ঝগড়া করিল। পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু নিরুপায় নিরাশ্রয় দুর্ব্বলের যাহা হইয়া থাকে কালীরও তাহাই হইল। কালী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পতিতার দলে মিশিল।

৪

বারুণী-স্নানের মেলায় কালীর সহিত দেখা হইবার পর হইতে কার্ত্তিকের মন কিছুতেই আর বাড়ীতে বসিল না। সে বাহির হইয়া পড়িল। কয়েক দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সে জাম্‌সেদপুর যাইয়া লোহার কারখানায় দশ আনা রোজায় ফিটার্ হইল। কর্ম্মঠ, নিপুণ কার্ত্তিক, চার-পাঁচ মাস পরেই দেড় টাকা রোজ পাইতে লাগিল। চার টাকা ভাড়ায় সে একটা বাড়ী পাইয়াছিল। সারাটা দিন সে কলে কাজ করিত, তারপর বাসায় আসিয়া নিজেই রাঁধিত, দুটি খাইয়া সেই যে সে ঘরে বসিত, আর একবারও বাহির হইত না। সে বসিয়া-বসিয়া কল্পনায় কালীকে লইয়া সেইখানে সুখের সংসার রচনা করিত।

সেবার পূজার বন্ধে কার্ত্তিক আটদিনের ছুটি পাইল। বিজয়ার মেলায় কালীর সহিত যদি দেখা হয় এই আশায় সে বাড়ী চলিল। একটা আশা ও আশঙ্কা বুকে লইয়া সে পাংসা ষ্টেসনে আসিয়া নামিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে করিয়া সে বাজারের পথ দিয়া নদীর দিকে চলিল। পথটা পতিতাদের পল্লীর মধ্য দিয়া গিয়াছে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে কার্ত্তিক হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। চোখের বিভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া, হাত দিয়া চোখ দুইটা বেশ করিয়া রগ্‌ড়াইয়া সে আবার ভাল করিয়া দেখিল। কিন্তু যাহা সে দেখিল, তাহাতে তাহার বুকখানা ভাঙিয়া গেল। “কালী শেষে এমন হলো!” সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। খানিকটা পরে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সে কালীর কাছে যাইয়া ডাকিল—“কালী।”

পরিচিত কণ্ঠস্বরে কালী চমকিয়া উঠিল এবং কার্ত্তিককে দেখিয়া, তাহার বুকের মধ্যের এত

দিনের রুদ্ধ বেদনার বান্ ডাকিয়া উঠিল, সে ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "যদি সেই এলে, তবে আমায় এমন করে ডুবিয়ে কেন এলে ?"

কার্ত্তিক ব্যথিত হইয়া বলিল, "আমি ডুবিয়েছি, কালী ? আমি তো তোকে ভাল হয়েই থাক্‌তে বলেছিলাম। কেন এমন করলি ?"

কালী বলিল, "কেন এমন করেছি ? দিন রাত ভাব্‌ছি ভগবান যদি সেকথা তোমায় বল্‌বার সুযোগ দেন। সব বল্‌ছি—শোন। তারপর যদি আমায় দোষ দিতে পার দিও।"

কার্ত্তিক দাঁড়াইয়াছিল। কালী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বস্‌বে ?"

"না। বল্।"

তখন কালী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পতনের কাহিনী কার্ত্তিকের কাছে বলিল। কার্ত্তিক শুনিয়া কতকটা তিরস্কারের মত বলিল, "যা' হবার হয়েছিল কিন্তু তার পর পরের দোরে খেটেও তো দুটো খেতে পারতিস্ ?"

কালী বলিল, "সে চেষ্টাও করে ছিলাম। যার মা বাপের ঘরে জায়গা হলো না, পরের ঘরে তার জায়গা হবে ? কোন ভদ্রলোক ঠাঁই দিলে না—যারা দিতে চেয়েছিল, তারা সকলেই রসিকের মত।"

কার্ত্তিক, দুঃখ ও অভিমানে বলিল, "যে পথে দাঁড়িয়েছিস্ কালী, মেয়ে মানুষের তার চেয়ে যে—" পরের কথা কয়টা কার্ত্তিকের মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিন্তু কালী তাহা বুঝিতে পারিয়া, মাটির দিকে চাহিয়া বলিল,

"তার চেয়ে মরণ ভাল। কত ভেবেছি মরব কিন্তু মরতে আমি পারি নাই। ওগো মরা যে বড় কঠিন।" বলিয়া, কালী মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কার্ত্তিকের হৃৎপিণ্ডটা কে যেন দুই হাত দিয়া মুচড়াইয়া দিতে লাগিল। তাহারি জন্যই তো কালীর এ দশা,—আত্মগ্লানিতে সে জ্বলিতে লাগিল। তখন সে অতি স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "চল্, কালী আমি তোকে আমার কাছে নিয়ে যাই।"

কালী চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, "একদিন যেতে চেয়েছিলাম ; সেদিন যদি নিতে তা হলে আমার এদশা হতো না। এখন আমি নরকে ডুবেছি। তোমার কাছে যাব, সে পথ আমার নাই—সে দিন চলে গেছে।"

কার্ত্তিক সস্নেহে বলিল, "সেই দিনই এসেছে, কালী। সেদিন তোকে নেই নাই, পাছে তোর নামে কলঙ্ক রটে। কিন্তু সে কলঙ্ক যখন হলোই তখন তোকে এ নরকে ফেলে যেতে পারব না।"

কালী, চোখ্ মুছিয়া বলিল, "যাব। কিন্তু তোমায় একটা প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে। আমার এই পাপে ভরা শরীরটা তুমি ছুঁতে পারবে না।"

কার্ত্তিক একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, "সেই প্রতিজ্ঞাই কচ্ছি কালী, চল্।" কার্ত্তিকের আর বাড়ী যাওয়া হইল না। সেখান হইতেই কালীকে লইয়া সে জাম্‌সেদ্‌পুরে ফিরিয়া গেল।

শ্রীকিশোরীলাল দাসগুপ্ত

বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কুতালামারার পতন হয়। এই সংবাদ বার্লিনে পৌঁছাইলে foreign office তৎক্ষণাৎ তাহা কমিটিকে সানন্দে টেলিফোন দ্বারা জ্ঞাপন করেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় টেলিফোন আসিল Kutelamara ist gefallen ! (কুতালামারার পতন হইয়াছে)। এই সংবাদে কমিটির সাধের আশা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎকালে আইরিস বৈপ্লবিক Sir Roger Casement আইরিশ সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া একটি দল গঠন করিয়াছিলেন; অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ Bohemia ও Croation জাতীয় কয়েদি সৈন্যদের লইয়া রুষ এক প্রকাণ্ড সৈন্যশ্রেণী গঠন করিয়া তাহাদের স্বজাতি শত্রু অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিয়োজিত করিয়াছিল। আর ভারতীয় সৈন্যদের কেনই বা তাহাদের স্বদেশমুক্তির চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করা যাইবে ? ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় কয়েদি সিপাহীদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া একটি army গঠন করিয়া ভারতের দিকে পাঠাইবার উদ্যোগ করা যাইবে। একবার যদি একটি সশস্ত্র বৈপ্লবিক army ভারতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে বিপ্লববহ্নি আবার প্রকৃষ্টরূপে দেশে প্রজ্বলিত হইতে পারে এই আশা করা যাইত। কুতালামারার কয়েদিদের মধ্যে কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বার্লিন হইতে দুইজন বৈপ্লবিক স্তাম্বুলে যাত্রা করেন।

স্তাম্বুলে আসিয়া তাঁহারা শুনিলেন যে কুতালামার কয়েদিদের Anatoliaতে আনা হইতেছে, মুসলমান অফিসারদের Eski-Schehar নগরে ও হিন্দু অফিসারদের Konia নগরে আনা হইতেছে। ইঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য তিনজন বাঙ্গালী নামধারী ব্যক্তি স্তাম্বুল হইতে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তাঁহারা Eski-Scheharএ পৌঁছিলে তথায় ৮০ জন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের তথায় বাসের বড় অসুবিধা হইতেছে এই সমস্ত কথা বৈপ্লবিকদের বলিলে তুর্কি অফিসার বলেন যে, "আমরা ইহাদের বহু সুবিধা দিতেছি, এক বড়লোক আর্ম্মানিকে তাড়াইয়া তাহার বাড়ীতে ইঁহাদের রাখিয়াছি; প্রতি কথায় ইহারা কেবল বলে যে ইহারা মুসলমান, সেইজন্য সর্ব্ব প্রকারের আবদারের দাবীর অধিকারী। কিন্তু ইহারা মুসলমান হইলে কি হয়; ইহারা ইংরাজের লোক এবং আমাদের বিপক্ষে লড়াই করিয়াছে, ইংরাজ যে প্রকার আমাদের লোককে ব্যবহার করিতেছে আমরাও তাহাদের লোককে সেই প্রকারের ব্যবহার প্রতিদান করিব"। বৈপ্লবিকেরা তর্জ্জমা করিয়া ভারতীয় অফিসারদের বুঝাইয়া দেয়। পরে কয়েদীরা বলেন যে তাঁহারা স্তাম্বুলে বাবাকে (খলিফা) দর্শন করিতে চান। তাহার জন্য দরখাস্ত করিতে বলা হয়। পরে তিনজন

বৈপ্লবিক কোনিয়া সহরে উপস্থিত হন। তথায় শিখ, গুরখা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অফিসারদের আনা হইতেছে। বৈপ্লবিকরা তথাকার সর্ব্বোচ্চ মিলিটারি অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রাচ্য দেশীয় লোক, আর ইঁহারাও প্রাচ্য দেশীয় লোক, ইঁহাদের সাহায্যের জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিব। এই স্থলের কয়েদিদের মধ্যে একজন ভারতীয় I. M. S. ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজন কালা ইংরাজ, পুরাতন কোনিয়া সহরে তিনি থাকিতে নারাজ সেইজন্য স্তাম্বুলে যাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তুর্কি অফিসারেরা তাঁহাকে তথায় রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। কারণ তুর্কিদের মধ্যে ডাক্তারের টানাটানি। কুতালামারায় যে কয়জন ভারতীয় ডাক্তার কয়েদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের তুর্কিরা ভারতীয় কয়েদীদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে তুর্কি Colonel ও বৈপ্লবিকেরা অনেক বুঝাইয়া বলিলে তিনি অবশেষে সেই হতভাগ্য সহরে থাকিতে রাজী হন। কোনিয়ার হিন্দু কয়েদীরা তুর্কির মধ্যদেশে হিন্দুর সাক্ষাৎলাভের প্রত্যাশা করে নাই। প্রথমে তাঁহারা মস্তকে ফেজশোভিত ব্যক্তিদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। শেষে একজন ইংরাজী শিক্ষিত শিখ, অফিসার যিনি পরিচয়ে বলিলেন যে তিনি বৈপ্লবিক অজিত সিংহের আত্মীয়, তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়াতে তিনি শেষে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চান ও বলেন যে, "প্রথমে আপনাকে বুঝিতে পারি নাই।"

কুতালামার কয়েদীদের কাছ হইতে অবরোধ কালের ভিতরকার অবস্থা কতকটা শুনিতে পাওয়া যাইল। মেসোপোটেমিয়ায় যে সব মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদের নেতাদের Court Martial করিয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং অবশিষ্টদের বসোরাতে পাঠান হয়। অবরোধকালে যখন ইংরাজের এরোপ্লেন দ্বারা উপর হইতে খাদ্যাদি তাহাদের জন্য নিক্ষিপ্ত হয় তখনও খাদ্যাদি লইয়া ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্যদের পৃথক আচরণ করা হইয়াছিল অর্থাৎ যখন সকল সৈন্যই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যখন বাহিরে শত্রুর গোলা ও অন্তরে জঠরজ্বালা, তখনও "সাদা ও কালার" তফাৎ হইয়াছিল এবং ভারতীয় সিপাহিরা খাদ্যাদি কম পরিমাণে পাইয়াছিল।

তৎপরে ইংরাজ-বাহিনী আত্মসমর্পণ করিবার পর যখন সিপাহীদের মরুভূমি মধ্যদিয়া আনাটোলিয়ায় আনা হইতেছিল তখন মুসলমানের মুল্লুকে পদার্পণ করিয়াছি অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি এই ভাবিয়া মুসলমান ভারতীয় সিপাহীরা হিন্দুদের বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষেপাইবার চেষ্টা করে। তাহারা হিন্দু সিপাহীদের শুনাইয়া বলে যে, "আজ গো মাংস ভক্ষণ করিলাম কিন্তু রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া মন্দ আস্বাদন হইয়াছিল" ইত্যাদি। এই কথা শুনিয়া হিন্দুরা রাগিয়া উঠিত এবং বলিত যে "এ কথা আমাদের সম্মুখে বলিও না"। হিন্দু অফিসাররা বলিত, "তুর্কিরা আমাদের সহিত অতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, রাস্তায় আরব দস্যুরা সমস্ত কাপড়

ও পোঁটলা-পুঁটলি চুরি করিয়াছে আর আমাদের স্বদেশী লোকই আমাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে"। তৎপরে শিখদের তুর্কিদের উপর অভিযোগ যে, মসুলে (Mosul) বারজন শিখদের তুর্কিরা জোর করিয়া কেশ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। ইহাতে শিখেরা তাহাদের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে ইহারা টাইফয়েড জ্বরে ভুগিতেছিল, কাজেই তুর্কি ডাক্তার তাহাদের মাথার কেশ কাটিয়া দিয়াছে।

তুর্কি Colonel যিনি ইহাদের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, সিপাহীদের খাদ্যের জন্য যখন পাঁঠা বা ভেড়া দেওয়া হইবে তখন যেন তাহাদের জীবন্ত পশু দান করা হয় তাহলে তাহারা স্বহস্তে "ঝটকা" করিয়া হত্যা করিবে। আর হিন্দুদের বাচ-বিচারের আধ্যাত্মিকতার দুইচার কথায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, যেন এমন কিছু করা না হয় যাহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে গোলমাল হয়। তুর্কিরা এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। এই ভারতীয় অফিসারদের নিকট শুনা যায় যে বেশীর ভাগ সিপাহীরা ইংরাজের দুর্ব্যবহারে চটিয়া গিয়াছে, এমন কি গুর্খারা পর্য্যন্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে। তবে কেহ কেহ খয়ের খাঁও আছে। এই সময়ে বৈপ্লবিকদের ইচ্ছা ছিল Bengal Ambulance Corpsএর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু তাহাদের এদিকে আনা হয় নাই এবং বৈপ্লবিকদেরই বেশীদূর অগ্রসর হইবার সময়ও পাশ ছিল না কাজেই তাহাদের কোনিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তবে I. M. S. ডাক্তারটি বলিলেন যে, এই Corpsএর একটি ছেলে দলভঙ্গ হইয়া ধরা পড়ায় তুর্কিরা তাহাকে সিপাহী ভাবিয়া রসা-সা-লাইনে কায করিতে দিয়াছে। কিন্তু তিনি তুর্কি অফিসারদের বুঝাইয়া তাহাকে সে কর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই কালে তুর্কিতে যত ভারতীয় সিপাহী ও সর্দ্দার কয়েদী ছিল তাহাদের কাছে হইতে বাঙ্গালীদের বড়ই প্রশংসা শুনা গেল। তাহারা সকলেই Ambulance Corpsএর কার্য্যের প্রশংসা করিল ও বলিল যে বাঙ্গালীর ভিতর এক নূতন "জোস" (তেজ) আসিয়াছে। দেশী অফিসারদের মধ্যে বৈপ্লবিক কথা কহিলে কেহ কেহ সাড়া দেয়, তন্মধ্যে একজন মহারাষ্ট্র যুবক অগ্রণী ছিলেন। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে জাতীয় বিপ্লবে কাহারা কাহারা যোগদান করিবে ? উত্তরে তিনি বলেন যে ইহা তিনি পল্টনে শুনিয়াছেন যে জাতীয় বিপ্লবে যদিচ পাঠান ও পঞ্জাবীরা যোগদান করিবে না কিন্তু তাহারা নিরপেক্ষ থাকিবে।

সিপাহীদের বন্দোবস্ত করা হইলে তুর্কি Colonel বলিলেন যে যখন তোমরা এখানে আসিয়াছ তখন আমার কর্ত্তব্য তোমাদের সহিত Wali (গভর্ণর) ও সহরের Commandantএর সঙ্গে মিলিত করা। Commandantএর কাছে যাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা কে ?" প্রত্যুত্তরে যখন শুনিলেন যে "আমরা ভারতীয় বৈপ্লবিক", তখন তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন তবে ভয়ানক ব্যক্তি! পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বিপ্লব" এ কথা আমরা এক্ষণে

ভুলিয়া গিয়াছি! ইহারা সকলেই নব্য তুর্কির বৈপ্লবিকদের লোক। তৎপরে ওয়ালীর দরবারে বৈপ্লবিকেরা হাজির হন। তিনি তোমরা কাহারা একথা জিজ্ঞাসা করায় যথাযোগ্য উত্তর পাইলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের সঙ্গে কোন কাগজ আছে? উত্তর পান যে, "তস্‌কিলাতের কাগজ আছে।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, "তস্‌কিলাত কি ও তাহার অধ্যক্ষই বা কে? বোধ হয় একজন আরব? যখন শুনিলেন যে তস্‌কিলাত হার্বিয়ার (সমর বিভাগ) অন্তর্গত তখন বলেন তবে তোমরা এখানে থাক আমি হার্বিয়ায় তোমাদের বিষয় অনুসন্ধান করি। অর্থাৎ তাহার মানে তোমরা এখন এ সহরে কিছুদিন "অন্তরীণ" থাক, আর আমি আমার ওয়ালীত্বর জাঁদরেলী করি! তাহার অর্থ তিনি তাঁহার বুরোক্রেটিক চালের ভারিত্ব দেখাইলেন। তুর্কি হইতেছে "মগের মুল্লুক." সেখানে "অন্ধেরি নগরী চৌপট রাজা"। স্তাম্বুল হইতে হাজার ছাড়পত্র বা সুপারিশ পত্র থাকুক মফঃস্বলের প্রভুরা তাঁহাদের পদের মর্য্যাদার কদর জানাইবার জন্য উৎপাত করিবেনই করিবেন। যাহা হউক সঙ্গী Colonel বুঝাইয়া এ ব্যাপার মিটাইয়া দেয়। তিনি বাহিরে আসিয়া বলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি এখানকার Garrison এর Commandant এসব কায আমার অধীন, তোমরা নির্ভয়ে বৈপ্লবিক প্রচার কর্ম্ম কর।

কুতালামারার লোকদের ও তুর্কিদের সহিত কথাবার্ত্তায় ইহা বুঝা গেল যে ৮০০০ হিন্দু সিপাহীদের বাগদাদ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য মরুভূমিতে রসা-সা-লাইন নামক স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর ২০০০ মুসলমান সিপাহীদের Taurus পর্ব্বতের শীতল ছায়ার আরামে রাখা হইয়াছে। হিন্দু সিপাহীরা অনুযোগ করে যে কোন দিন তাহারা রসদ পায়, কোন দিন তাহারা পায় না, আবার অনেক সময় তাহারা পুরা রসদ পায় না। প্রচার কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বৈপ্লবিকেরা স্তাম্বুলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় আসিয়া তস্‌কিলাতে তাঁহাদের অনুসন্ধানের রিপোর্ট পাঠান। তাহা পাঠ করিয়া সমর সচিব এনভার পাশা তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান যেন হিন্দু সিপাহীদের ধর্ম্ম এবং আচারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয় এবং তসকিলাতের সঙ্গে পরামর্শে ঠিক হয় যে কাহাকে কোথায় প্রচার কর্ম্মের জন্য পাঠান হইবে ইত্যাদি। এই কর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মনে বৈপ্লবিক ভাব আনয়ন করিয়া একটি বৈপ্লবিক বাহিনী গঠন করা। এ বিষয়ে তুর্কি সমর সচিব এনভার পাশাও হুকুম দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে যদি ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা একার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে তবে তাহাদের বাহিনী গঠন করিতে দেও। কিন্তু জার্ম্মাণ সিফারৎ খানাতে আসিয়া যাহা বৈপ্লবিকেরা শুনিলেন তাহাতে তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল। জার্ম্মাণ মাতব্বর অফিসাররা বলিলেন যে একটি army গঠন করিয়া ভারতে পাঠান যুক্তি। "বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রের বহির্ভূত। এ জিনিষ সৃষ্টি করা সোজা কিন্তু তাহা কার্য্যকরি করিবার ধাক্কা সামলান বড়ই মুস্কিল।" তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তাহাদের ইরাণে পাঠান যাইতে পারে। এই সময়ে জার্ম্মানেরা বোগদাদ অঞ্চল হইতে ভারতীয় লোক সংগ্রহ করিয়া

তাহাদের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়া ইরাণে যুদ্ধার্থে পাঠাইতেছিল। কুতালামারার পতনের পর তুর্কি সেনা ইরাণের দিকে যাইবার কথা ছিল। তুর্কিরা চায় যে ভারতীয় বৈপ্লবিক সৈন্যেরা তাহাদের বাহিনীর লেঙ্গুড় হইয়া সর্ব্বত্র চলে।

ইহা কিন্তু বার্লিন কমিটির মনঃপুত নহে। তাঁহারা চান্ বৈপ্লবিক বাহিনীকে ভারতে পাঠাইতে। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে রাস্তায় অনেক লোক সংগ্রহ হবে এবং তাহারা জার্ম্মাণ অফিসারদের দ্বারা শিক্ষিত হইলে একটি সুন্দর কার্য্যকরী বাহিনী সংগঠিত হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণ মাতব্বরেরা প্রথমে বলেন যে রসদের সুবিধার জন্যই বৈপ্লবিক বাহিনীকে তুর্কি সৈন্যের সঙ্গেসঙ্গে চলিতে হইবে। কিন্তু শেষে জার্ম্মাণরা বলিলেন যে এ চেষ্টা বাস্তব রাজনীতির কার্য্যকারিতার বহির্ভূত। পরে বোঝা গেল যে জার্ম্মাণরা নিজেদের কার্য্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করিতে চান, আর তুর্কিরা সিপাহীদের কয়েদ করিয়া মরুভূমিতে খাটাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কমিটি হতাশ্বাস হইয়া বৈপ্লবিক বাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। কমিটি বড় সাধের আশায় নিরাশ হইল।

কুলতামারার পতনের পূর্ব্বেই স্তাম্বুল কমিটি হইতে জনকতক সভ্যকে বোগদাদে উপরোক্ত প্লানানুযায়ী কর্ম্ম আরম্ভ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তথায় এই দলের নেতার বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অসদাচরণের নালিশ হওয়ায় এবং বৈপ্লবিক বাহিনী গঠনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার ফলে তাহাদের উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার হুকুম দেওয়া হয়।

কোন্ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় এ সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের এ পরামর্শে প্রথমে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কুতালামারার পতনের অগ্রে বৈপ্লবিকদের একজন দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক বন্ধু উক্ত স্থানে এগার হাজার সিপাহীর অবরোধ শ্রবণ করিয়া বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকায় ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সামরিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন ১৮৯৩ খৃঃ ভারতীয় প্রথম জাতীয় সমরের ইতিহাস উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে উপযুক্ত শিক্ষিত অফিসারের অভাবেই ভারতবর্ষীয়েরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়, অতএব বৈপ্লবিকেরা বিদেশে অফিসারের শিক্ষা গ্রহণ করুক।

ইঁহারও উক্ত সিপাহীদের জন্য কমিটির ন্যায় প্লান ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে এই সঙ্কল্পিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জার্ম্মাণ ফরেন আফিস তখন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলে এবং পুনরায় বলেন যে ইংরেজ বাহিনী আত্মসমর্পণ করিলে তখন এই প্লান লইয়া কার্য্য করা যাইবে। তদুপরি যে সব জার্ম্মাণ অফিসার ভারতীয় সংক্রান্ত কর্ম্মের সংস্রবে ছিলেন তাঁহারা প্রথমে এই সঙ্কল্পে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন। কিন্তু শেষে তুর্কিরা রস-আ-লাইনে সিপাহীদের কুলীর কার্য্যে নিয়োজিত করিবার পর সকলকার উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইল। কোন্ দলের রাজনৈতিক চালে এ সঙ্কল্প জলবুদ্বুদের ন্যায় শূন্যে উড়িয়া যাইল তাহা বুঝা যাইল না। শেষে তুর্কিতে কায করা বৃথা দেখিয়া কমিটি নিজের লোকদের তৎদেশ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিল।

পরে শুনা যায় যে হিন্দু-ভারতীয় সিপাহীরা মরুভূমিতে কার্য্য করিতে গিয়া ভয়ানক ভাবে মরিতেছে। কমিটি জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সাহায্যের কথা বলায় উক্ত গভর্ণমেণ্ট বলে যে, এ বিষয়ে তাহারা কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তুর্কি গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মে তাহাদের অনধিকার চর্চ্চা করার ক্ষমতা নাই। এইসব কারণে, যে প্রকারে জার্ম্মাণীতে কয়েদী সিপাহীদের আদুরে লাড়ুগোপালরূপে রাখা হইয়াছিল, কুতালামারার কয়েদীদের ক্লেশের লাঘব করার প্রভূত ইচ্ছা থাকা সত্বেও কমিটি কিছু করিতে পারে নাই, বাধ্য হইয়া অদৃষ্টের উপরই তাহাদের নিক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কষ্ট কেবল হিন্দু সিপাহীদেরই হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে কমিটির দুইজন সভ্য পারস্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে রসা-আ-লাইন দিয়া আসেন। তথায় তাঁহাদের সহিত একজন ভারতীয় ডাক্তারের সাক্ষাৎ হয়। কুতালামারায় যে ৭।৮ জন I. M. S. ডাক্তার কয়েদী হন, তাঁহাদের সিপাহীদের চিকিৎসার্থ বিভিন্নস্থানে রাখিয়াছিল। তিনি এই স্থানে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নাকি এই বৈপ্লবিকদ্বয়কে বলেন যে "তোমাদের বার্লিন কমিটির খবর আমি জানি, তাহারা বদমাইস লোক, এই সিপাহীরা মরিয়া যাইতেছে আর তোমাদের কমিটি ইহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কিছু করিতেছে না।" কিন্তু সত্য কথা এই যে তাহাদের ক্লেশ লাঘব করিবার কোন উপায় বা রাস্তা কমিটির হাতে ছিল না।

১৯১৬ খৃঃ শেষাশেষি কমিটি তুর্কিতে কার্য্য বন্ধ করে। তুর্কিতে কর্ম্মের অসুবিধার একটি প্রধান কারণ, আসল তুর্কিরা এসব কর্ম্মের খবর লইতেন না। যত মিশরী, আরব adventurer তথায় জুটিয়াছিল ও Panislamism এর নামে স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতেছিল; তাহারাই আবার অনেক ক্ষুদ্র পদে অভিষিক্ত ছিল ও প্রাচ্য দেশীয় কর্ম্মের মুড়ুলি করিত। তাহাদের অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মান্ধতার জন্য কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। আর যে সব মুসলমান ভারতবাসীরা সেই সময়ে তুর্কির জয় জয়কার করিতেন তাহারা ১৯১৮ খৃঃ শেষ কালে তুর্কির পতন (Capitulation) হইলে সব সেই দেশ হইতে পলায়ন করেন, ও তুর্কিদের গালাগালি দেন। কেহ কেহ মিশরীদের গালি দেন যে ইহারা তুর্কিদের কোন সত্য ঘটনা জানাইত না এবং তাহাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছে। কোন কোন ভারতীয় মুসলমান তুর্কির পতন হইলে তথা হইতে পালাইয়া Panislamism এর বুলি ছাড়িয়া রুষে যাইয়া Communist সাজেন। উদ্দেশ্য নুতন উপায়ে টাকা রোজগার করা।

সুইডেনে কর্ম্ম

১৯১৭ খৃঃ ষ্টক্‌হলমে (Stockholm) হলণ্ড দেশীয় ও সুইডিস সোসালিষ্ট পার্টিদ্বয় একটী সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যোদ্ধ্ জাতিদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা ও জগতে শান্তি স্থাপন করা। এই কন্‌ফারেন্সে ভারতের স্বাধীনতার দাবী করিবার জন্য বার্লিন কমিটি দুই জন সভ্যকে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখেন যে এই

কন্‌ফারেন্স মিত্রশক্তিদেরই খয়ের খাঁই করিতেছে, আর মিত্রশক্তিদের দ্বারা প্রপীড়িত জাতি সমূহের দাবীদাওয়ার কথা কর্ণপাত করিতে চায় না। এইজন্য তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া কমিটির লোকদের একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিতে হয়। এই সময়ে জার্ম্মাণির বাহির হইতে কর্ম্ম করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তথায় কমিটির একটি শাখা সংস্থাপিত করা হয়। ষ্টক্‌হলমে এই সময়ে ইউরোপের নানা দেশের বৈপ্লবিকদের সমাগম হয়। এইজন্য তথা হইতে প্রচার কর্ম্মের সুবিধা হয়। এই বৎসর অক্টোবর মাসে ত্রয়ানোস্কি (Trojanowsky) নামক একজন রুষবৈপ্লবিক উক্ত সহরে উপস্থিত হন। ইনি একটি Sovietএর সদস্য। প্রথমে গুজব উঠিল যে জার্ম্মাণির সহিত বৈপ্লবিক রুষ গভর্ণমেণ্ট পৃথক ভাবে সন্ধি করিবার জন্য ইঁহাকে অগ্রগামী দূত করিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু পরে শুনা গেল যে তিনি স্বীয় কর্ম্মে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত ভারতীয়দের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। এই সময়ে রুষে বোলচেভিকি বিপ্লব হয়। এই রুষীয় বৈপ্লবিক বন্ধু রুষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি Russo-Indian Society স্থাপন করেন। ও ভারতের উপর Russian bluebook প্রকাশিত করেন। পরে ইনি Trotskির দপ্তরে কর্ম্ম করেন ও তাঁহার সহিত ভারত সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হয়। ট্রটস্কি যখন ব্রেষ্টলিটোস্কে (Brest Litowsk) জার্ম্মানির সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন সেই সময়ে ষ্টক্‌হলম কমিটি হইতে এই কন্‌ফারেন্সে ট্রটস্কির কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠান হয় যে, যেন তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহাকে Self determination শক্তির অধিকার দেওয়া হউক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যে প্ররোচনার দ্বারাই প্রেরিত হউক, ট্রটস্কি কন্‌ফারেন্সে ভারত আয়র্লণ্ড ও মিসরের Self-determination শক্তি দেওয়া হউক এই প্রস্তাব করেন। ইঁহার জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৎসর ইংলণ্ডে একটি সোসালিষ্ট কনফারেন্স হয়, তথায় ভারতের স্বাধীনতার দাবীর কথা উত্থাপন করিয়া একটি টেলিগ্রাম ষ্টকহলম্ হইতে Philip Snowdenকে প্রেরণ করা হয়। এই বৎসর বোলচেভিকি বিপ্লবের অগ্রে রুষীয় তাতারেরা একটি কন্‌ফারেন্স করেন। তথায়ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য Self determination প্রয়োজন এই মর্ম্মে একটি টেলিগ্রাম ষ্টকহলম্ হইতে প্রেরণ করা হয়। এই বৎসর আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের সভাপতি উইলসন্ যখন তাঁহার বিখ্যাত ১৪ যুক্তি (14 points) প্রচারিত করেন, তখন এই ১৪ যুক্তি অনুসারে ভারতকেও স্বাধীনতা দিতে হইতে বলিয়া কমিটি হইতে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়। আমেরিকার সানফ্রান্‌সিসকো হইতে পরলোকগত ৺সুরেন্দ্রনাথ কর উইলসন্‌কে একটি টেলিগ্রাম পাঠান যে যেন "ভারতীয় স্বাধীনতার" বিষয় তাঁহার ১৪ যুক্তির অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে আমেরিকান পুলিশ তাঁহার উপর উৎপাত করে।

এই সময়ে বিভিন্ন নিরপেক্ষ (neutral) দেশে, ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন, আর

ভারত স্বাধীন না হইলে জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে না, কমিটি এই মর্ম্মে প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। কারণ এই সময় হইতে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃঃ প্রাক্কাল হইতে কমিটি ভারতে বিপ্লবের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সন্ধির সময়ে যাহাতে ভারতের দাবী গ্রাহ্য হয় তাহার জন্য সার্ব্বজনীন প্রচার করিয়া জমি প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছিল।

ইত্যবসরে রুষীয় বন্ধু ত্রয়ানোস্কি ট্রটস্কিকে অনুরোধ করিয়া পেট্রোগ্রাডে কমিটির দুই একজন সভ্যের আসিবার বন্দোবস্ত করান। ট্রটস্কি ষ্টকহলমস্থিত রুষীয় সফির (ambassador) Vororskyকে দুইজন ভারতীয় বৈপ্লবিকের পেট্রোগ্রাডে আসিবার জন্য পাশ দিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু ষ্টক্‌হলমের কার্য্য ফেলিয়া রুষে যাওয়ার তখন সুবিধা হয় নাই। ১৯১৮ খৃঃ জুন মাসে ত্রয়োনেস্কি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রাচ্য বিভাগের নেতারূপে বার্লিন কমিটিকে আবার লিখিয়া পাঠান, যেন কোন লোককে পাঠান হয় যিনি ভারত বিষয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তখন পাশের অভাবে জার্ম্মাণীর বাহিরে কোন বৈপ্লবিকের যাওয়ার সুবিধা ছিল না। সুইডেনে তখন ব্রাণ্টিং (Branting) গভর্ণমেণ্ট ছিল। এই গভর্ণমেণ্ট ইংরেজের বন্ধু, কোন ভারতীয় বৈপ্লবিককে সুইডেনের বাহির হইতে আসিতে দিত না এবং যাহারা তদ্দেশে ছিল তাহারা বাহিরে যাইলে আর পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পাইত না। এই জন্য ভারতীয় কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই প্রকারে যখন বৈপ্লবিকেরা ষ্টকহলম হইতে তেজে প্রচার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বড়ই উদ্বিগ্ন হয়। শেষে বৈপ্লবিক প্রচার কর্ম্মের প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাদের খয়ের খাঁ ইউসুফ আলীকে (Yusuf Ali) তথায় প্রেরণ করে। তিনি তথায় গিয়া বৈপ্লবিকদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। বৈপ্লবিকে-রাও তাঁহার কার্য্যের প্রত্যুত্তর দেন। ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সুইডেন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

১৯১৮ খৃঃ কমিটি শ্রীযুক্ত হরদয়ালকে সুইডেনে প্রেরণ করেন, উদ্দেশ্য তিনি তথাকার কমিটির কার্য্যে সহায়তা করিবেন। ১৯১৭ খৃঃ শেষকালে হরদয়ালকে কমিটির সহিত কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে পুনরাহ্বান করা হয়। আশা ছিল, তিনি আর কমিটির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিবেন না। তৎকালে তিনি Parthen Kirchen Sanatorium-এ বিহার করিতেছিলেন। কিন্তু সুইডেন গভর্ণমেণ্ট কোন ভারতীয় বৈপ্লবিককে সেই দেশে আসিবার অনুমতি প্রদান না করাতে তৎকালে তাঁহার সুইডেন যাত্রা হয় নাই। অন্য প্রকারে অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাকে ভিয়েনাতে (Vienna) পাঠান হয়। তথায় তিনি অনেকদিন স্থিতি করেন ও শেষে যখন সুইডেন যাইবার অনুমতি আসিল তখন তথা হইতে তাঁহাকে সুইডেনে পাঠান হয়। কিন্তু তথায় গিয়া পুনরায় স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করেন! অবশেষে সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে, হরদয়াল আমেরিকান পত্রে নিজের মতের পরিবর্ত্তনের কথা এবং জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের তাঁহার প্রতি আচরণের অলীক কথা

লিখিয়াছেন। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ইহা পড়িয়াই অবাক! একদিকে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টকে Liquidationএর অংশ লইবার জন্য লিখিতেছেন ও নিজের বৈপ্লবিক কর্ম্মের ভবিষ্যতের প্ল্যানও জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিতেছেন, আর অন্যদিকে সেই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অলীক কথা কাগজে লিখিতেছেন। এই প্রকারের ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যান।

হরদয়াল তাঁহার "Four years in Germany" নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ অলীক কথা লিখিয়াছেন। যেদিন হইতে বৈপ্লবিকেরা তাঁহাকে একজন বড় বৈপ্লবিক বলিয়া জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট পরিচয় করিয়া দেন সেইদিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়াছে। কিন্তু কমিটিতে তাঁহার কার্য্য ছিল, ষড়যন্ত্র করা, লোকের সঙ্গে লোকের লড়াইয়া দেওয়া। পরে কমিটি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য নিজে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়া খয়েরখাঁই করিবে। তাহার ষড়যন্ত্র ও নানাপ্রকারের নীচতা প্রকাশ পাইলে কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার ভরণপোষণের জন্য বরাবরই উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সে জার্ম্মাণির সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারে বেড়াইত। ১৯১৫-১৬ খৃঃ কমিটির অজ্ঞাতসারে জার্ম্মাণ ফরেন আফিসেরই সাহায্যে সে ছদ্মবেশে হল্যাণ্ডে যায়। ১৯১৭-১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে সে অষ্ট্রিয়াতে (ভিয়েনা) যায়। ১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টরই সাহায্যে সে সুইডেনে যায়, অথচ সে তাহার পুস্তকে লিখিয়াছিল যে, জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে কয়েদীপ্রায় রাখিয়াছিল, কোথায়ও তাহাকে যাইতে দেয় নাই!

মানব নিজের স্বার্থের জন্য মত বদলায়। জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, অনেক বৈপ্লবিক বা রাজনীতিকেরা স্বার্থের জন্য স্বীয় মত বদলাইয়াছে, সেইজন্য কেন বৈপ্লবিক আনার্কিস্ট হরদয়াল হঠাৎ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ভক্ত হইল ইহা বোধগম্য করা যায়। কিন্তু তাহার পুস্তকে যে সব অলীক কথা লিখিত হইয়াছে তাহা অকৃতজ্ঞতার চরম! ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

(২)

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ফাল্গুনের লেখাটা পড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "কুম্ভকর্ণ মহাশয়কে আবার শিরোনামায় স্থান দিলে কেন? সে বেচারা ত্রেতাযুগে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছিল বটে কিন্তু অনেক উৎপাতের পর যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অকালে অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। আজ এই নির্য্যাতিত জাতির অভ্যুত্থানের দিনে সে অমঙ্গল কাহিনী স্মৃতিপটে আনিয়া লাভ কি?"

আমার স্পষ্ট জবাব এই, ত্রেতার কুম্ভকর্ণ যথাকালে জাগিলে অসাধ্য, সাধন করিত। অকালজাগরণ তাহার অকালমৃত্যুর কারণ। বহুশতাব্দীব্যাপী নিদ্রা আমাদের কি ভাঙ্গিবে না? এখনও কি জাগাইবার সময় হয় নাই? এখন জাগাইলেও কি কাঁচাঘুম ভাঙ্গান হইবে? জাগিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই জাগিতে বলিতেছি। আমি আগেই বলিয়াছি যাঁহারা এখনও ঘুমাইতেছেন তাঁহাদের নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলে যদি কিছু হয়। আমি সে চেষ্টা করিব না।

পরমুখাপেক্ষী স্বরাজ দাসত্ব অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিন্তু এই পরমুখাপেক্ষিতা কিরূপে নিবারণ করা যায়? এ সমস্যার উদ্ধার করিতে হইলে বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভাব দূর করিবার জন্য কতদূর পরমুখাপেক্ষী। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা বিশ্লেষণ করা ভিন্ন এ তথ্য অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। বিলাসিতার উপাদান অসংখ্য। এ জাতির অনুকরণপ্রিয়তাও অসীম। অতএব বিলাসদ্রব্যের জন্য মাথা না ঘামাইয়া সাধারণ গৃহস্থের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির মধ্যে কয়আনা দেশী ও কয়আনা বিদেশী তাহা দেখা যাউক।

সকালে উঠিয়া টুথ পাউডার বা টুথ পেষ্ট ব্যবহার করা অনেকের মধ্যেই চলিতেছে। দেশী কারখানায় প্রস্তুত টুথ পাউডার বা পেষ্টের কৌটাটিও বিলাতী, সুগন্ধি বা ভেষজ উপাদানের সিকি ভাগ বিদেশী। চা খাওয়ার প্রচলন এখন ঘরে ঘরে। চা'এর উপকরণ চাপাতা, দুধ ও চিনি। চা পাতার চাষ এদেশে হয় বলিয়া এটাকে স্বদেশী ব্যবসায় বলিয়া ধরা হয়। চা বাগানের জমিটা এদেশে অবস্থিত বটে, কিন্তু বাগানের মালিক বিদেশী এবং পরিচালক বিদেশী। অবশ্য কুলিরা এ দেশীয় বটে। দুধ এদেশে দুষ্প্রাপ্য। সেই অভাব মিটাইবার জন্য আছেন বিদেশীর Condensed milk; বেশীর ভাগ লোক ইহারই শরণাপন্ন হয়। চিনি দানাদার না হইলে তাহাতে চা তৈয়ারি অসম্ভব। দানাদার চিনি ভারতজাত নয়। বিদেশ হইতে আমদানি হয়। দুই একটি দেশী কারখানায় বিদেশী মোটা চিনি আমদানি করিয়া তাহার রসকে পরিষ্কার করিয়া আবার দানা বাঁধান হয়, আর সেই চিনিকে দেশীয় চিনি বলিয়া অভিহিত করা হয়। গুড় জিনিষটা সম্পূর্ণ দেশী, কিন্তু তাহার ময়লা রং, চড়া গন্ধ ও ঈষৎ অম্ল আস্বাদ চা'এর সুগন্ধ (flavour) নষ্ট করে। মিছরি জিনিষটা এত অপরিষ্কার উপায়ে তৈয়ারি করা হয় যে তাহা ব্যবহার করাই উচিত নয়। অধিকন্তু বিদেশী অপকৃষ্ট চিনি হইতে উহা প্রস্তুত হয়।

জলখাবার হিসাবে যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা হয় তাহার মধ্যে বিলাতী বিস্কুটের বেশকাটতি। বিদেশীয় Chocolate Toffee, Jam এবং Preserves কতকগুলি সংসারে বেশ চলিতেছে।

স্নানের সময় সুগন্ধি কেশ তৈলের প্রচলন রীতিমত ঘটিতেছে। সাধারণ কেশ তৈলের ষোল আনার মধ্যে ছয় আনা বিদেশীয় উপকরণ। দেশীয় কারখানায় তৈয়ারি সুবাসিত নারিকেল

তৈল ব্যবহার করিলে ঘরের পয়সা বাহিরে যায় না। কিন্তু বিপদ এই যে অধিকাংশ-তথাকথিত নারিকেল তৈলের উপকরণ সস্তাদরের বিদেশীয় খনিজ তৈল এবং সুগন্ধের অনুকরণকারী কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ। "ফুলেল তৈল" নামধারী যে তৈল বাজারে চলে তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর তৈল। লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের আতর ও বিশুদ্ধ কৃষ্ণতিল তৈল মিশাইয়া এইরূপ তৈল তৈয়ারি হয়। সাবান একটা নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানায় মোটামুটি কাপড়কাচা সাবান তৈয়ারি হয় যদিও তাহার অধিকাংশই অপকৃষ্ট। কিন্তু ধোপারা সোডা সাজিমাটি প্রভৃতি যে সকল হানিকর মসলা দিয়া কাপড় কাচে তাহার তুলনায় এ সকল সাবান উৎকৃষ্ট জিনিষ। দুই তিনটি বড় বড় সাবান-কারখানায় কাপড় কাচা ও গায়ে মাখিবার সাবান এত উৎকৃষ্ট তৈয়ারি হইতেছে যে বিদেশীয় যে কোন সাবান হার মানিয়া যায়।

কাপড়চোপড় সম্বন্ধে এত বেশী কথা বলিবার আছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা শক্ত। "খাদি প্রতিষ্ঠানের" অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার Khadi Manualএ অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াছেন। আমি মোটামুটি ২।১টি কথা বলিতেছি মাত্র। এদেশে প্রায় তেত্রিশকোটি লোক আছে। তাহার মধ্যে অন্ততঃ দশকোটি কর্ম্মক্ষম। এই দশকোটির মধ্যে অনেকেই কোন কাজ করে না এবং বেশীর ভাগ লোকেরই সাধ্যানুযায়ী কাজ জুটে না। তাহারা যে সময়টির অপব্যবহার করে সে সময়টিতে চরকা ও তাঁত চালাইলে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাতে আমাদের দেশের সকলেরই উপযোগী ধুতি, সাটী, গামছা, জামা, বিছানার চাদর, লেপের খোল ও ওয়াড় প্রভৃতি তৈয়ারি হইতে পারে। এই কাজের জন্য যে পরিমাণ তুলার প্রয়োজন হয়, তাহা হয়ত' এখনও ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে আমাদের এ অভাব পূর্ণ হইতে পারে। অতএব বস্ত্রের জন্য বিদেশীয়ের উপর নির্ভর করা বাতুলতা মাত্র। মোজা, গেঞ্জি এদেশে তৈয়ারি হয় বটে কিন্তু ইহার সূতা সম্পূর্ণভাবে বিদেশী। মোজা না ব্যবহার করিলেও চলে আর গেঞ্জির ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া খাদির তৈয়ারি ফতুয়া ব্যবহার করিলেই চলে।

দেশের লোকের বস্ত্রসমস্যা যদি এত সহজে মেটে তবে দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা তাহা সাধন করে না কেন? এ 'কেনর' উত্তর আমি কি দিব? ইহাই দেশের পরম দুর্ভাগ্য। আসল কথা এই যে এ সমবেত চেষ্টার মূলে যে শিক্ষা, যে সংযম ও যে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন, আমাদের জাতির তাহা নিতান্তই অভাব। যতদিন দেশের লোকের সে নৈতিক উন্নতি না হইতেছে, ততদিন একেবারে হাল না ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় মিলজাত বস্ত্র চালাইতে হইবে। যাঁহারা "ক্লটির মত খোল" "glossy" "silk weed" বা "আদ্ধির মত মিহি" বস্ত্রাদি ভিন্ন ব্যবহার করিবেন না তাঁহাদের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা অসম্ভব। নতুবা খাদি ও বর্ত্তমান মিলজাত বস্ত্র দ্বারা দেশের

অভাব অনায়াসে মিটিয়া যায়। মিলের কাপড়ের মধ্যে একটা বিষয় বরাবর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কতকগুলি মিল বিলাতী সূতা আমদানি করিয়া তাহা হইতে কাপড় বোনে। আর কতকগুলি মিল তুলা হইতে সূতা কাটিয়া সেই সূতায় কাপড় বুনে। তাহাদের মধ্যে কেহ ভারতজাত তুলা ব্যবহার করে, কেহ কেহ ভারতজাত তুলার সঙ্গে বিদেশীয় তুলা মিশাইয়া দেয়।

শীত বস্ত্রের অধিকাংশই বিদেশীয়। আবার যেগুলি এদেশেই তৈয়ারি হয় তাহার অধিকাংশই বিদেশীয় উপকরণে প্রস্তুত।

আমাদের আহারের উপকরণগুলির মধ্যে কতকগুলি মসলা বিদেশীয়। ইহা ভিন্ন দুটি প্রধান জিনিষ নূন ও চিনি বিদেশীয়। নূন সম্বন্ধে লোকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, গুঁড়া নুন মাত্রেই বিলাতী এবং করকচ ও সৈন্ধব এদেশজাত। কিন্তু করকচ বিদেশীয় অপকৃষ্ট নুন এবং সৈন্ধব কিছু কিছু এদেশে পাওয়া যাইলেও অধিকাংশ বিদেশ হইতে আমদানি হয়। Cigaretteএর নেশায় যাহারা মস্‌গুল তাহারা বিদেশীয়কে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিতেছে।

লেখাপড়ার প্রধান উপাদান কাগজ, কলম, নিব, পেন্সিল ও ছুরি। ইহার প্রত্যেকটি এদেশে তৈয়ারি হইতেছে এবং বহুল পরিমাণে হইতে পারে কিন্তু দেশের লোকের অবহেলায় নিরুৎসাহ হইয়া কর্ম্মিরা রণে ভঙ্গ দিতেছেন। কাগজ-কলের মালিকেরা বিদেশী কাগজের সহিত দরের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া অনেক টাকা লোকসান দিতেছে।

দেশীয় tanning industryর বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ এত বেশী হইয়াছে যে, বিদেশীয় চামড়া বা জুতা এদেশ হইতে অনেক কমিয়া আসিতেছে। চামড়ার ব্যাগ, বাক্স, attache case দেশী চামড়া হইতে তৈয়ারি হইয়া বেশ কাটুতি হইতেছে।

এইবার একবার গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসনের কথা চিন্তা করা যাউক্। চায়ের বাটি, চিনামাটির রেকাবি, পিতল, কাঁসা, অ্যালুমিনিয়াম বা এনামেল থালা, বাটি, গেলাস, ঘটি, কাঁচের গেলাস প্রভৃতি প্রত্যেক গৃহস্থই কিনিয়া থাকেন। চিনামাটির বাসন এদেশে তৈয়ারি হয় অথচ জাপানী বা ইউরোপীয় মালের কাটুতি কমিতেছে না। কাঁসা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম বা এনামেলের বাসন নামেই দেশী। যে ধাতুর চাদর দিয়া ঐ সকল বাসন তৈয়ারি সে চাদরগুলি বেশীর ভাগ স্থলে বিদেশ হইতে আমদানি। কাঁচের গেলাস এদেশে অনেক জায়গায় তৈয়ারি হইতেছে। নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে চিনামাটি বা কাঁচের বাসন পিতলের বাসন অপেক্ষা অধিকতর দেশী।

চিরুণি, বুরুশ এদেশে তৈয়ারি হয় যদিও তাহার কোন কোন উপকরণ বিদেশীয়। আর্শি এদেশে তৈয়ারি হয় না কিন্তু কাঁচের কারখানাগুলি যেরূপ সুন্দর কাজ করিতেছে তাহাতে মনে হয় আর্শি তৈয়ারি শীঘ্রই সম্ভব হইবে। অঙ্গপ্রসাধনের সমস্ত উপাদানই এদেশে তৈয়ারি হইতেছে। Cosmetic, Toilet snow, Pomade, Handkerchief, Scent অনেকগুলি দেশী কারখানায়

তৈয়ারি হইতেছে। তবে দুঃখের বিষয়, এই সকল কারখানার অনেকগুলিতে বার আনা বিদেশীয় উপকরণ ব্যবহৃত হয়।

দেশীয় ছাতা নামে যে বস্তুটি বাজারে চলিতেছে তাহার বাঁট বিদেশী, কাপড় বিদেশী, শিক্ বিদেশী। মাত্র দেশীয় মিস্ত্রি ঠুকিয়া সেলাই করিয়া খাড়া করিয়া তুলে বলিয়া তাহাকে দেশী বলা হয়। আজকাল দেশীয় বাঁশের বাঁটের ব্যবহার কিছু কিছু চলিতেছে। ছড়ি জিনিষটা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। জুতার ফিতা বিদেশীয়। জুতার কালি দেশী পাওয়া গেলেও বিদেশীয়ের বেশী চলন। কাঁচি দেশী পাওয়া যায় কিন্তু বিদেশীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছেনা। ছুঁচ, আলপিন, সেফটিপিন, মাথার কাঁটা এদেশে তৈয়ারি হয় না। কোন কারখানায় এগুলি তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিলেও বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। দেশের লোকেরা স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া বেশী দামে না কিনিলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। বাড়ী তৈয়ারির মাল মসলার মধ্যে লোহা যদিও এদেশে তৈয়ারি হয় তথাপি বিদেশীয়ের অধিক আদর। রং সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। আর্শির কাঁচ বিদেশীয়। Plumbing ও Electric installation এর উপকরণগুলি অধিকাংশই বিদেশীয়। Insulator এবং Brass cock প্রভৃতি এদেশে তৈয়ারি হইয়া বেশ চলিতেছে। ঘরের আস্‌বাব পত্র অধিকাংশই দেশী, যদিও কতকগুলির উপকরণ বিদেশীয়। তালা, চাবি, তোরঙ্গ, বাক্স এদেশে বহুল পরিমাণে তৈয়ারি হইতেছে। লণ্ঠন এদেশে তৈয়ারি হয় না বলিলেই চলে কিন্তু দেশের লোকে উৎসাহ দিলে লণ্ঠন তৈয়ারি অসম্ভব নয়। ষ্টোভ এদেশে তৈয়ারি হইতেছে। ঘড়ি তৈয়ারি হয় না, কিছুকালের জন্য বিদেশীর উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। বাদ্যযন্ত্রগুলি অধিকাংশই বিদেশীয় অথবা বিদেশীয় উপাদানে এদেশে নির্ম্মিত।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ বা পথ্য ব্যবস্থা করি তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়। কারণ আমাদের মধ্যে বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের আদর বেশী এবং সেই শাস্ত্রে শিক্ষিত দীক্ষিত চিকিৎসকের উপর ভরসাও বেশী। এ সম্বন্ধে আম বেশী কিছু বলিলাম না। ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত "পরশুরাম" মহাশয় অনেক কথাই বলিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত আমি প্রয়োজনীয় বস্তুর দেশী-বিদেশী বিশ্লেষণে যাহা বলিলাম, তাহাতে দেখা যায় যে, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে অনেকগুলি এদেশে তৈয়ারি হয় এবং সেজন্য বিদেশীর উপর নির্ভর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার কতকগুলি এদেশে তৈয়ারি হইতে পারে কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে লোপ পাইতেছে বা শীঘ্রই পাইবে। আর কতকগুলি তৈয়ারি করিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই—চেষ্টা হইলেও বিদেশী প্রতিযোগিতায় টিকিবে কিনা সন্দেহ।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? ইহার সরল উত্তর আমি দিতেছি। এদেশের প্রত্যেক লোকের প্রধান কর্ত্তব্য এ দেশের লোকের টাকায় স্থাপিত এ দেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত

কারখানায় দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করা। কিন্তু এরূপ "শুদ্ধ স্বদেশী" জিনিষ পাওয়া সকল সময়ে সম্ভব নহে। প্রত্যেক কোন স্বদেশী কারখানায় প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করিবার আগে মনে মনে এইরূপ বিচার করা উচিত :—

১। তথাকথিত স্বদেশী কারখানাটি কাহার অর্থে প্রতিষ্ঠিত ? কে তাহা পরিচালন করিতেছে ? যদি বিদেশীয়ের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও বিদেশী পরিচালিত হয়, তাহার জাতদ্রব্য পরিত্যাজ্য। এ কথা শুনিয়া অনেকে বলিবেন, এরূপ কারখানায় আমাদের জাতভাই'এর অন্ন সংস্থান হইতেছে, তাহাদিগের অন্ন উঠান কি ধর্ম্ম ? আমি জিজ্ঞাসা করি, এই নিরন্ন জাতের কয় আনা ভাগ লোক অন্ন পাইতেছে যে, এই মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে বলিয়া সমস্ত দেশের অনিষ্ঠসাধন করিতে হইবে ?

২। যদি কারখানাটি দেশী লোকের অর্থে প্রতিষ্ঠিত, দেশী লোক পরিচালিত হয় তাহা হইলেও ভাবিতে হইবে জিনিষটা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত কি না। যদি সম্পূর্ণ দেশী উপাদানে প্রস্তুত অসম্ভব হয় তবে কিছুকালের জন্য বিদেশী উপাদান ব্যবহৃত হয় হউক, কিন্তু শীঘ্রই যাহাতে তুল্যগুণের দেশীয় উপকরণ সংগৃহীত হয় সকলের সমবেত চেষ্টা সেইদিকে থাকা প্রয়োজন।

অনেকে বলিবেন আমার যুক্তিমতে "শুদ্ধ স্বদেশী" দ্রব্যকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইলে যে পরিমাণ খরচ হইবে তাহা ব্যয় করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তাহা নয়। সভ্যজগতের ইতিহাসে বলে যে স্বদেশজাত "শুদ্ধ স্বদেশী" জিনিষের বহুল পরিচালনের ফলে ক্রমশঃ দাম কমিবে এবং প্রথম কয়েক বৎসর দেশের লোকের স্বার্থত্যাগের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে industry গুলির অনেক উন্নতি সাধিত হইবে এবং মূল্যও যথেষ্ট কমিবে। অনেকে এরূপ স্বার্থত্যাগকে বাতুলতা মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা যে সকল বিদেশীয় জিনিষের ভক্ত তাহার নির্ম্মাতারা তাঁহাদের স্বদেশে কি করিয়া থাকেন তাহার পরিচয় আমার এক প্রবাসী বন্ধুর চিঠি হইতে তুলিয়া নীচে দিলাম।

"সকলের চেয়ে কি চোখে লাগে জানেন ? Englandই বলুন আর Franceই বলুন সবাই intrinsically স্বদেশী, বিশেষতঃ France. Londonএ American জিনিষ পাবেন না, French জিনিষ পাবেন না। একদিন...বাবুর স্ত্রীর জন্য একটা asthmaর patent medicine খুঁজিতে বাহির হই। প্রথম ২।৪টি Pharmacyতে ঘুরে পেলাম না, একটা বড় Pharmacyতে যেতে তারা Patent medicineএর list বার করে দেখলে, তাতে ঐটি নেই। তখন তারা বল্লে, জিনিষটি american. তা'রা বল্লে আমরা american ঔষধ রাখিনা। তারপর আমরা তন্ন তন্ন করে সারা London সহর খুজলাম কোথাও পেলাম না, অথচ...বাবু কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তিন শিশি ঔষধ জোড়াসাঁকোর একটা ছোট ডাক্তারখানা থেকে কিনে এনেছিলেন। * * * তামাক ও দেশলাই আমার চোখ ফুটিয়েছে। Londonএ Sweedenএর দেশালাই খুঁজিয়া

পাওয়া শক্ত, আর British দেশলাইএর দাম ছ' পেনি। Franceএ এটা আরও দ্রষ্টব্য, safety match পাওয়া শক্ত। সবাই আমাদের পরিত্যক্ত গন্ধকের দেশলাই ব্যবহার করে * * ভাবটা যেন কি করা যায়, যদি দেশে safety match না তৈয়ার হয় তবে কি বিদেশ থেকে আনতে হ'বে? আর আমাদের দেশের হতভাগ্য matchmakerদের দুর্দ্দশা ও নির্য্যাতনের কথা মনে করে দেখুন। * * বিদেশী তামাক ফ্রান্সে চলে না। দেশে উৎপাদিত কড়া তামাক এরা খায়—সে যে কি কড়া তাহা বলা যায় না। একেবারে তাহা গাঁজা * * তামাক, cigarette State industry. তামাক cigarette, দেশলাই, postge stamp একসঙ্গে দোকানে বিক্রয় হয়। একটি রাখতে হ'লে আপনাকে সবক'টি রাখতে হবে। দেশী লোহায় তৈয়ারি হয় না বলে সারা ফরাসী রাজত্বে Telegraph electric lightingএর তার লোহার থামের মাথায় নয়, Pine কাঠের poleএর মাথায় মাথায় টানা আছে। Pine কাণ্ড বেঁকে ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে; কিন্তু তাতে কি, কাজ চলিলেই হ'ল। * * যাহা দেশে প্রস্তুত তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে, আর যাহা দেশে হয় না তাহা আমদানী করে না * * *।"

স্বাধীন জাতির স্বদেশপ্রেমের কাহিনী পড়িয়া আমাদের কি লজ্জায় মাথা হেঁট হয় না? আমরা এরূপস্থলে কি করিয়া থাকি? বাটীর পুরুষদের মধ্যে অনেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বা টানে দেশী জিনিষ কিনিয়া থাকেন। কিন্তু মেয়েরা সাধারণতঃ কোন সৌখিন আত্মীয়ের সাহায্যে সেই পরিমাণ বিদেশী জিনিষ কিনিয়া থাকেন। অনেক স্থলে নবীনা গৃহিণী স্বামীর পয়সায় চিত্র বিচিত্রিত খদ্দর ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহার কোন আত্মীয় আত্মীয়া ভালবাসার উপহার স্বরূপ বিদেশী বস্ত্র দান করিলে তদ্দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতে লজ্জিতা হয়েন না।

অধিকাংশ স্থলেই বিদেশী জিনিষের প্রেম বিলাসিতাজনিত। বিলাসিতার উপকরণ মাত্রই অধিকাংশ বিদেশীয়। অনেকেই বিলাসীকে artist বলিয়া ধরিয়া লয়েন। তাঁহাদের মতে art বলিলেই বিলাতী fashion বুঝায় এবং এইরূপ প্রত্যেক fashion-বাতিকগ্রস্তই artist। তাঁহারা বলেন কবি এবং artist এই দুই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না। যাহা সুন্দর তাহাই শ্রেষ্ঠ—তাহাতে দেশী বিদেশী ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই। দেশী চিনামাটির পেয়ালায় বা পাথর বাটিতে চা পান করা যাইতে পারে না; কারণ চা একটা সৌখিন জিনিষ। বিদেশীয় মিহি Porcelain ভিন্ন চলিতে পারে না। মাটির ফুলদানিতে ফুলের তোড়া রাখা যাইতে পারে না, কারণ সখের জিনিষ; তাহার আধার Cutglass বা electroplated vase ভিন্ন কল্পিত হইতে পারে না। মুখের ভিতর দাঁতন দিয়া দাঁত মাজা যাইতে পারে না; বিদেশীয় বুরুষ ঢুকাইতেই হইবে, হউক না তাহা নিষিদ্ধ জন্তুর লোমে নির্ম্মিত। কস্‌মেটিক, রুজ, পোমেড, স্নো, ক্রীম দেহের নানা স্থানে ঘষিতেই হইবে,—হউক না তাহা নিষিদ্ধ জন্তুর চর্ব্বিজাত। খালি, দেখিলেই চলিবে Made in England, Made in

France, Made in Germany বা Made in Czeko Slovakia লেখা আছে কি না। কাপড় মিহিসূতার তৈয়ারী ও চটকদার হইলেই চলিবে, তাহাতে দেহের নগ্নতা ঢাকুক্ আর নাই ঢাকুক্। স্ত্রীলোকের দেহ আপাদমস্তক বিদেশীয় বিলাস দ্রব্যে ঢাকিতেই হইবে কারণ aritistএর মতে সৌন্দর্য্যের জাতিভেদ নাই। এইরূপে আমি কত নাম করিব? তাঁহাদের বিলাসিতার কৃপায় কত কোটি টাকার বিলাস দ্রব্য এই গরিবের দেশে স্থান পাইতেছে। এই সৌন্দর্য্যসেবক কবি ও aritistএর দলের নেশা না কাটিলে দেশের দুর্দ্দিনও কাটিবে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন "তোমার প্রলাপ থামাও। কাজের কথা বল। তুমিই বলিয়া দাও ভাল দেশী জিনিষ এদেশে কি কি পাওয়া যায়। নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে মোটামুটি দেশী জিনিষে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা কোন্ কোন্ কারখানায় হইতেছে? আমরা যে দিকে তাকাই উন্নতিশীল দেশী industry বড় একটী দেখি না ইত্যাদি"। আমার উত্তর এই, আমি এরূপ কারখানার তালিকা প্রস্তুত করিতে অক্ষম। কারণ আমি মনের আবেগে কতকগুলি নিবেদন করিতেছি মাত্র। আমি বিজ্ঞাপনদাতা নহি। দেশী জিনিষের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে এবং যিনি ভালমন্দ বিচার করিতে সক্ষম তাঁহাকে পথ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। তবে এদেশে যে কতকগুলি কারখানা আছে, যাহা এই জাতির জাগরণের দিনে অন্য অনেক কারখানার আদর্শস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে, তাহাদের ইতিহাস ও বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রসঙ্গে একদল লোক বলিবেন "যে জিনিসটা এদেশে এখন তৈয়ারি হয় না, সে জিনিষটা না হয় বিলাত থেকে না কিনে জাপান বা জার্ম্মাণি থেকে এখন কিনিব।" তাঁহাদের প্রতি আমার এই জবাব যে, ভারত ভিন্ন অপর কোন দেশ হইতে এক পয়সার জিনিষ আমদানি করার মানে তোমার জাত ভাই'এর মুষ্টিমেয় অন্ন হইতে কয়েকটা দানা কাড়িয়া লওয়া। জার্ম্মাণি, জাপান, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, সবই আমাদের পক্ষে সমান। এখন বিকল্পের, অনুকল্পের সময় নহে। "শুদ্ধ স্বদেশী" ভিন্ন অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার মহাপাপ। এই ধারণা মনে বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন, ইহাতে লোকে আমাদিগকে কুসংস্কারী, অসভ্য—যাহাই বলে বলুক্।

হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সকলেই উপাসনার সময় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দসম্বলিত মন্ত্রের আবৃত্তি করে। মন্ত্রের ভাষার কোন বদল করিতে চাহে না। কেন না মন্ত্র—মন্ত্র। ক্রীড়ার সমগ্রী নহে। আজ তুমি একটা বদল করিলে, কাল, আমি একটা বদল করিলাম, এইরূপে তাহার অঙ্গহানি হইয়া গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আইন-ব্যবসায়ী দলিলের সনাতন ভাষা বদল করিতে চাহেন্ না, কেন না, পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে শেষে কোথায় দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। মানুষ স্বভাবতঃ বাধাবিঘ্ন মানিতে চাহে না। সেইজন্য ধর্ম্ম ও সমাজে অপ্রীতিকর অনুষ্ঠানের প্রচলন। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরা অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল।

বহুকাল নিদ্রাজনিত আলস্য আমাদের প্রতি অঙ্গের পঙ্গুতা আনিয়াছে। এ দুর্দ্দিনে অনুকল্প, বিকল্প, make-shift কিছুই চলিবে না। শুদ্ধ স্বদেশী ভিন্ন আমাদের আর কোন গতি নাই। মায়ের দেওয়া মোটা মিহি সব জিনিষই মায়ের ভালবাসার দান। আমরা তাহা মাথায় তুলিয়া লইব। মায়ের কাছে আব্দার করিব, অভিমান করিব, যাহা দিতেছেন, যাহা দিয়াছেন তাহার চেয়ে বেশী চাহিব, কিন্তু দুঃখিনী মা অভিমানী সন্তানের অভাব দূর না করিতে পারিলে মায়ের ক্রন্দনের নয়নধারার সঙ্গে আমাদের নয়নধারা মিলাইয়া দিব, অথবা বীরের ন্যায় মায়ের অশ্রু শুখাইবার চেষ্টা করিব,—দৈন্যের কঠোর তাড়নায় প্রলয়ের অমানিশায় মাকে ছাড়িয়া ভাই বোন স্ত্রী পুত্রকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া বিদেশীর হাত করিয়া, বিদেশীকে সাহায্য করিবার মানসে নিজের কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে ছুটিব না। জাতীয় জাগরণের দিনে এইই আমাদের মুলমন্ত্র।

"মৃত্যুঞ্জয়"

উদান বাণী

সিদ্ধি যদি চাস্‌রে তবে ডাক্‌রে বশী বশিষ্ঠে!
ধায় সুরভি বেজায় দূরে, চেঁচায় যদি অশিষ্টে।

উদ্ধত নয় যুদ্ধে জয়ী, স্রষ্টা সে ত রৌরবের।
সিদ্ধি নহে মত্ত জনের দৃপ্ত বাণী গৌরবের।
শান্তিনাশা আন্দোলনে ভ্রান্তি তোরা বাড়াস্‌নে;
বীরের ডাকে ধীরতাকে মরুর পারে তাড়াস্‌নে।
উষ্ণ মাথায় শ্মশান পাতা, সিদ্ধি সেথা তপ্ত ছাই,
বশিষ্ঠকে ভুলিস্ যদি পাবি তবে ব্যর্থতাই।

ঋদ্ধি যদি চাস্‌রে তবে বিশ্বরমায় ভুলিস্ নে।
বিদ্বেষে তুই বিদেশ নাশে ক্রুদ্ধ বাহু তুলিস্ নে।
ব্যাপ্ত শিল্পে রুদ্ধ করে ক্ষুদ্রকে তুই ধরিস্ নে।
লক্ষ্য ভুলে লক্ষ্মীকে তুই লক্ষ্মীছাড়া করিস্ নে।
ঋদ্ধিদেবী পৃথ্বী জোড়া করিস্‌নে তায় খর্ব্ব রে।
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দৈন্য আনে বর্ব্বরে।
চল্‌রে ছুটে কর্ম্মভূমে সর্ব্ব জাতির সঙ্গমে।
ঋদ্ধি আসে সিদ্ধি আসে দক্ষতা ও সংযমে

বৃদ্ধি যদি চাস্ রে তবে সদাশিবে স্মরণ কর্।
আকাশব্যাপী বিকাশকে তুই প্রাণের বাসে বরণ কর্।
ভেদের কারা গুঁড়িয়ে তোরা চিত্ত বাড়া বিস্তারে।
বধির বিধি, অধীর যদি ডাকে তাঁকে চীৎকারে।
অবতারের ভেল্কি-খেলায় ধাতার লীলা ভুলিস্ নে।
শিবের ধামে নরের নামের জয়ধ্বনি তুলিস্ নে।
কীর্ত্তি যবে প্রতিষ্ঠিত শৈবনীতির ভিত্তিতে,
বৃদ্ধি পাবি, ঋদ্ধি পাবি, সিদ্ধি পাবি পৃথ্বীতে।

১৯২২ খৃঃ অঃ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

আশুতোষের জীবনচরিত *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আশুতোষ বলিয়াছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হওয়াই তাঁহার জীবনের উন্নতির এক প্রধান কারণ। কলেজের বৃহৎ লাইব্রেরী দেখিয়া তাঁহার মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। বিশাল গ্রন্থসমুদ্র! মানুষ কেমন করিয়া এত জ্ঞান লাভ করে? আমি কি অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে পারিব না? বিস্ময়ে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই গ্রন্থাগার তাঁহার মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তীর্ণ করিয়াছিল যে, যখনই সময় পাইতেন আশুতোষ পাঠাগার হইতে পুস্তক লইয়া নিভৃতে বসিয়া একান্তমনে পাঠ করিতেন।

বাস্তবিক, পুস্তকাগারে প্রবেশ করিবামাত্র মনে হয় জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ যেন চারিদিক হইতে ডাকিতে থাকেন। একদিক হইতে ভগবান বাল্মীকি ও মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রামায়ণ ও মহাভারত খুলিয়া মহাপুরুষগণের পূত জীবনের পুণ্যকাহিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈবহি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যাণাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

—'কুসুমের সুবাস কেবল অনুকূল বায়ুভরেই বিকীর্ণ হয়, কিন্তু মানুষের ধর্ম্মজীবনের সৌরভ চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইয়া থাকে'। এই সকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মার চরিত আলোচনা করিয়া দেখ, পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখদুর্দ্দশা কল্পনা করা সম্ভব, সতৈকলক্ষ্য কেবল ধর্ম্মের শুভ্র ক্ষীণ রশ্মিটির দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া ইহাঁরা সমস্তই ধীর স্থিরভাবে সহ্য করিয়াছেন। যেমন পুরুষ চরিত্র, তেমনি নারীচরিত্র। সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী, ইহাঁরা সকলেই মহীয়সী, গরিমাময়ী ও অশেষগুণ সম্পন্না। যিনি এই সকল গৌরবমণ্ডিতা মহিলাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি নিজে একবার করিয়া অশ্রুবারি মার্জ্জনা করিয়াছেন, ও চিত্রে একটি করিয়া রেখাপাত করিয়াছেন। সে অশ্রুকণা দেবস্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর বারিবিন্দুর ন্যায় পবিত্র। এই সকল পূতকীর্ত্তি মহাত্মগণের চরিত পাঠে পুণ্য সঞ্চয় হয় ও সংসারে দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার শক্তি জন্মে।

অন্যদিকে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতিপ্রমুখ মনীষিগণ শান্তরসপ্রধান তপোবনে মুগ্ধা শকুন্তলা ও ভর্ত্তৃবিরহবিধুরা সীতাদেবী প্রভৃতির অপরূপ ও করুণ কাহিনী শুনাইতে সকলকে আহ্বান করিতেছেন। কেবলি কি কাব্য ও নাটক? মহামনস্বী কপিল, গৌতম, বশিষ্ঠ, কনাদ প্রভৃতি ষড়্‌দর্শনস্রষ্টাগণ 'ভগবানের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিচার করিতে করিতে কোন্ ঊর্দ্ধজগতে লইয়া যাইতেছেন। যাহাতে বিশ্বমানবের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয় এবং জীবজগতের ও জড় জগতের

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ হয় তাহার এক অণু ইহাঁদের সূক্ষ্মদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। ইঁহারা সমলোচকের ইঙ্গিতানুসারে কাব্য রচনা করিতেন না, সম্প্রদায়-বিশেষের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক নির্ম্মাণ করেন নাই এবং কোনও উপাধি বা পারিতোষিকের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মৌলিক প্রবন্ধ লিখিতেন না। ইঁহাদের প্রণীত অপূর্ব্ব গ্রন্থনিচয় পাঠ করিলে মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইবে। তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক-প্রসূত ক্ষুদ্র উপন্যাসের স্বল্পকর্ম্মা নায়ক-নায়িকার তুচ্ছ প্রেম ও বিরহমিলনের অকিঞ্চিৎকর প্রসঙ্গ দূরে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে। ধরিত্রী বিবিধ বর্ণবৈচিত্রময়ী ও নূতন সুষমা মণ্ডিত বলিয়া বোধ হইবে। যে দুঃখ সংসারের নিত্যসঙ্গী—দুর্ভেদ্য প্রাকারের ন্যায় যাহা জীবকে অহর্নিশি ঘিরিয়া রহিয়াছে—সেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সহজ পন্থা তোমার চক্ষুর সম্মুখে দিবা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীও এই সকল গ্রন্থের অনেক সুখ্যাতি করিতেছেন। একবার পাঠ করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

অপর দিক হইতে ইংরাজকবি সেক্স্পীয়র ডাকিয়া বলিতেছেন, "এই পৃথিবী কেবল পুণ্যবানে পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে ভাল মন্দ উভয় প্রকার নরনারী আছে। কতবিধ লোকচরিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি, পাঠ কর, আলোচনা কর, তোমার চক্ষু খুলিবে। মনে অঙ্কিত করিয়া রাখ

> "To thine ownself be true,
> And it must follow, as the night the day,
> Thou canst not then be false to any man."

অন্ধকবি মিল্টন্ জলদ্‌গম্ভীররবে আদি মানব দম্পতির স্বর্গচ্যুতির বিবরণ আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন, "Better to reign in hell than to serve in heaven." ঐতিহাসিক গিবন প্রাচীন রোমের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন, "দেখ, ঐ স্থানে কত বড় একটা জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। কালের তাড়নে ছায়াবাজির ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।" বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, "কেবল কথার বাঁধুনি দেখিয়া ভুলিও না। আমার অদ্ভুত কর্ম্মসমূহ প্রত্যক্ষ কর। কত কিছুইত করিয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীর দূরত্ব দূর করিব। সপ্তাহে ভারতের লোককে ইউরোপ ভ্রমণ করাইয়া আনিব।" এইরূপে নানা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গভীর জ্ঞানের সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া মানব সমাজের বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন।

কলেজে অবসর পাইলেই আশুতোষ লাইব্রেরীতে গিয়া বসিতে ভালবাসিতেন। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেন। কখনও নির্ব্বাক্ হইয়া গ্রন্থরাশির দিকে চাহিয়া থাকিতেন, কখনও বা যাঁহারা এই সকল অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা তাঁহাদিগের অসীম জ্ঞানের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

আশুতোষ ভাবিয়া ভাবিয়া আপন আলয়ে পুস্তকাগার স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে বড় বড় বই থাকিবে, অনেক দেশী বিদেশী মাসিক পত্রাদি থাকিবে, ইহা

তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। কলেজে ভর্ত্তি হইয়াই বহু খবরের কাগজ কিনিতে আরম্ভ করিলেন। বি, এ, পরীক্ষা দিবার সময় চারি বৎসরে তাঁহার পনের হাজার টাকা মূল্যের পুস্তকরাশি সংগৃহীত হইয়াছিল।

আশুতোষ চিরদিন অগণিত গ্রন্থরাশির মধ্যে বসিয়া বালকের ন্যায় আগ্রহে ও উৎসাহে পাঠ করিতেন। এ জীবনে কোন বিষয়েই এমন প্রীতি আর কিছুতেই তাঁহাকে দিতে পারিত না। কোন নূতন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিলেই তিনি আত্মহারা হইতেন—সেখানিকে ক্রয় না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। তাঁহার বাসভবন একটী বড় লাইব্রেরী বলিলেই হয়; বাঙ্গালা দেশে এত বড় পুস্তকাগার আর কাহারও নাই। শুনা যায় পাঁচলক্ষ টাকার বই আশুতোষের গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। মৃত্যুকালেও তাঁহার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার পুস্তকের অর্ডার দেওয়া ছিল। এই সব করিয়া একটি দিনও তাঁহার তাস কি পাশা খেলিবার সময় হয় নাই।

আশুতোষ ইংরাজি, সংস্কৃত, দর্শন, গণিত ও অতিরিক্ত গণিত এই পঞ্চবিষয়ে "এ" কোর্স লইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি, এ, পড়িতে লাগিলেন। এই সকল বিষয়ের বহু গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে পড়া ছিল, সুতরাং এবার আর অধ্যয়নের নিমিত্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বি, এ, পরীক্ষা হইয়া গেল। আশুতোষ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই এতদিনে আশুতোষের গুণের অনুরূপ পুরস্কার হইয়াছে মনে করিয়া সুখী হইলেন।

আদর্শ ছাত্র আশুতোষের আর এক বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি সর্ব্ববিষয়েই সমান উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বি, এ, পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান লাভ করিলেন ও তাহার এক মাস পরেই ফেব্রুয়ারী মাসে যে এম, এ, পরীক্ষা হইবার কথা, তাহাতেই ইংরাজীতে এম, এ, পরীক্ষা দিবেন স্থির করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রো কিছুতেই আশুতোষকে এক সঙ্গে দুই পরীক্ষা দিতে দিলেন না। রো সাহেব বলিতে লাগিলেন, "তা হলে বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হতে পারবে না।" শেষ পর্য্যন্ত রো সাহেবের কথাই মানিতে হইল। কিন্তু প্রথম উদ্যমে বাধা পাইয়া আশুতোষ এত করিয়া পড়িলেও ইংরাজীতে এম, এ, পরীক্ষা আর দিলেন না। ১৮৮৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে গণিত শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

এদিকে মৌলিক তথ্যানুসন্ধান চলিতে লাগিল। আশুতোষ কেম্ব্রিজে প্রফেসার কেলির নামে আর একটী প্রবন্ধ* প্রেরণ করিলেন। উহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লেখা ছিল। কেলি মহোদয় নিজে উহার উপর এক মন্তব্য লিখিয়া উহার খুব প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধটী

* 'Note on Elliptic Functions ;—*Quarterly Journal of Mathematics Cambrige*, Vol. 21.

কেম্ব্রিজের এক বড় কাগজে প্রকাশিত হয়। কেম্ব্রিজে প্রবন্ধ প্রেরণ সূত্রে তথাকার Messenger of Mathematics নামক বিখ্যাত পত্রের সম্পাদক মিষ্টার গ্লেসায়ারের সহিত আশুতোষের পত্রে পরিচয় হয়। মিঃ গ্লেসায়ার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা সভ্য ছিলেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার প্রস্তাবে সভ্যগণ আশুতোষকে আপনাদের সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। তৎপরবৎসর কেম্ব্রিজের গণিতাচার্য্য কেলি আশুতোষকে এডিনবরার রয়াল সোসাইটির সভ্য করিয়া দিলেন। আশুতোষ F. R. A, S. ও F. R. S. E. হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই সম্মানলাভ ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ও তৎপর দুইবৎসর আশুতোষ ঠাকুর আইনের অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করেন ও বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথমস্থান লাভ করিয়া উপর্য্যুপরি তিন বৎসর তিনটী স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

এই সময়ের এক স্মরণীয় ঘটনা,—শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌টের সহিত আশুতোষের সাক্ষাৎ। ডিরেক্টার মহোদয় আশুতোষকে ডাকিয়া পাঠান ও গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আশুতোষ বিলাত ফেরতদের সমান গ্রেড্ চাহেন ও চিরদিন তাঁহার প্রিয় প্রেসিডেন্সি কলেজেই অধ্যাপক থাকিতে চাহেন। এই বিষয়ে বাদানুবাদ হয়। শেষে আশুতোষ স্যর আলফ্রেডের প্রস্তাবিত সর্ত্তে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে সাহেব চিরদিন আশুতোষের উপর 'বক্র' ছিলেন। ইংরাজী ১৮৮৬ সালে আশুতোষ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করিলেন। এই বৎসর হইতেই আশুতোষ এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নিযুক্ত হন। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াই তিনি অনবরত গণিত সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আশুতোষের মন পড়াশুনা ও মৌলিক গবেষণা প্রভৃতির প্রতি এমন আকৃষ্ট হইয়াছিল যে তিনি একদিন ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বাৎসরিক মাত্র চারিহাজার টাকা পাইলেই অন্য সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপকতা ও মৌলিক তথ্যানুসন্ধান তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া লইতে পারেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ত্তা স্বয়ং উপযাচক হইয়া যাঁহাকে কর্ম্মগ্রহণ করাইতে পারেন নাই, তিনিই আবার স্বয়ং যাইয়া ডাক্তার গুরুদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুদাস বাবু আশুতোষের সামর্থ্য ও শক্তিমত্তা সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দিহান ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার এই প্রস্তাবে অতিশয় প্রীত হইয়া অর্থসংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আশুতোষের সমস্তগুলি গ্রহ মিলিয়া এমনি একটা ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা আরম্ভ করিল যে, গুরুদাস বাবুর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল, তিনি বৎসরে সেই চারিহাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেশবাসীর এই প্রতিকূলতা বা অনুকূলতার জন্য আশুতোষকে কাজেই কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতীতে ভর্ত্তি হইতে হইল।

যাহা হউক, ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ্‌ পাইয়াই আশুতোষ এম, এ, পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তিনি ১৮৮৭ খৃঃ এম, এ, পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ভারতবাসীর মধ্যে আশুতোষই সর্ব্বপ্রথম গণিতের মত কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পরীক্ষাতে পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তদবধি প্রতিবৎসর আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং এম, এ,-র পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন।

পূর্ব্ব বৎসর আশুতোষ বিশুদ্ধগণিত, মিশ্রগণিত ও বিজ্ঞান এই তিন বিষয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য বিষয়ে (Literary Subjects) পুনরায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়া এক দরখাস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় শুনিলেন না, তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। আশুতোষকে ত কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষা দিতে দিলেন না, কিন্তু সে বৎসর বৃত্তি পাইবার মত পরীক্ষার্থীও মিলিল না, সুতরাং কেহই পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না।

"এই বৎসর এক আশ্চর্য্য ঘটনায় আশুতোষের সহিত হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মিঃ জে, ওকেনেলী মহোদয়ের পরিচয় হয়। সেই সময় যিনি ভারতবর্ষের সার্ভিয়ার জেনারেল ছিলেন তাঁহার গণিতশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বদা বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও প্রকৃত ছাত্রের ন্যায় গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেন। ইংরাজী ১৮৮৭ সালে এই মহাত্মা পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বহুযত্নে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া নোটিশ বাহির হইল। তন্মধ্যে ফরাসিভাষায় লিখিত উচ্চাঙ্গ গণিতের দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল; আশুতোষ ঐ পুস্তক দুইখানি ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিলামে উপস্থিত হইলেন। নিলাম আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একজন ইংরাজ রাজপুরুষ জুড়িগাড়ীতে আসিয়া যে ব্যক্তি নিলাম করিতেছিল, তাহাকে দুই একটা কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। অন্যান্য জিনিসের পর উল্লিখিত গণিতগ্রন্থ দুইখানির মধ্যে একখানির 'ডাক' আরম্ভ হইল। আশুতোষ যত মূল্যই বলেন সেই নিলামকারী তদপেক্ষা একটাকা অধিক ডাকিতে লাগিল। আশুতোষ আশ্চর্য্য হইয়া ক্রমাগত মূল্য বাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি একশত টাকা পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, নিলামকারী ১০১৲ বলিয়া ঐ পুরাতন পুস্তকখানি নিজপার্শ্বে রাখিয়া দিল। আশুতোষ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির মূল্য আশুতোষ আরও বাড়াইলেন, ১৫০৲ পর্য্যন্ত বলিলেন, নিলামকারী ১৫১৲ বলিয়া উহাও আপনার পার্শ্বে রাখিয়া দিল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার এদেশে বড় একটা ঘটে না। দুইখানি অতি পুরাতন জরাজীর্ণ গণিতগ্রন্থ ২৫২৲ টাকায় বিক্রয় হইয়া গেল। আশুতোষ কৌতূহলবশতঃ সেই নিলামকারী সাহেবকে সহসা এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব কহিল, "জুড়িগাড়ীতে যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি জাষ্টিস্‌ ওকেনেলি; তিনি বলিয়া গেলেন যে দামেই হউক না কেন, এই বই দুইখানি যেন তাঁহার জন্য রাখা হয়।"

এদিকে ওকেনেলি মহোদয় ত দুইখানি পুরাতন পুস্তকের মূল্যের নিমিত্ত ২৫২৲ টাকার বিল পাইয়া অবাক। নিলামকারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত খুলিয়া বলিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙ্গালী যুবক এই বই দুইখানির মূল্য১০০৲ এবং ১৫০৲ বলিয়াছিলেন, এক টাকা করিয়া বাড়াইয়া তাঁহার জন্য কিনিয়া রাখা হইয়াছে। জাষ্টিস্ ওকেনেলি নিলামকারী সাহেবকে টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

পরদিবস হাইকোর্টে গমন করিয়াই জাষ্টিস্ ওকেনেলি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে বলিলেন, "আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক কোন বাঙ্গালী যুবককে কি আপনি চিনেন? আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই!" আশুতোষ তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে ডাক্তার ঘোষের শিক্ষানবিশ (Articled Clerk) ছিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী, আশুতোষকে বিচারপতি ওকেনেলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। আশুতোষ ওকেনেলি মহোদয়ের গৃহে গমন করিয়া ডাক্তার রাসবিহারীর পত্রখানি প্রদান করিলেন। সাহেব পরিচয়-পত্র না খুলিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "আমার নিকট তোমার কোন পরিচয়-পত্র আবশ্যক করে না। এই বই দুইখানিই তোমার যথেষ্ট পরিচয়।" প্রথম সাক্ষাতের দিনই জাষ্টিস্ ওকেনেলি এমনভাবে আশুতোষের সঙ্গে আলাপ করিলেন যেন কতকালের পুরাতন বন্ধু। যুবক আশুতোষ তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্ত্তায় ও সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পর হইতে যতদিন এদেশে ছিলেন ওকেনেলি মহোদয় আশুতোষের অকৃত্রিম সুহৃদ ও পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আশুতোষ চিরদিন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিচারপতি ওকেনেলির সদ্‌গুণরাশির ও প্রীতিপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহারের স্মরণ করিতেন।"*

সংবাদপত্রের স্তম্ভে অথবা করতালি প্রতিধ্বনিত সভাতলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ও সদ্‌ভাব সম্বন্ধে প্রাণহীন বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধের অবতারণায় বা শুষ্ক দীর্ঘবক্তৃতায় যে ফললাভের আশা করা যায় না, দুই একটী এইরূপ মহাপ্রাণ পুরুষের সহৃদয় ব্যবহারে তদপেক্ষা বহুগুণ সুফল আশা করা যাইতে পারে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং ৩০শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে ভর্ত্তি হইলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান "ডক্‌টার অব্‌ ল" (Doctor of Law) উপাধি লাভ করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক

* আশুতোষের ছাত্রজীবন, তৃতীয় সংস্করণ (চক্রবর্ত্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং কলিকাতা) ৯০-৯১ পৃষ্ঠা

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা——শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(অষ্টম গীত)

বুলা।

সুখনিশি পোহায়েছে, দেউটী নিভিছে গো,
ধ্রুবতারা লুকায়েছে মেঘের কোলে—
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে আধ ঘুম ঘোরে গো,
হাসিটুকু ধুয়ে গেছে নয়ন জলে।
অতি অকরুণ বঁধু মরমে বিঁধেছে শেল,
বেদনা দিয়াছে উপহার,—
আমার যা কিছু ছিল সকলি লুটিয়া নিছে,
রেখে গেছে শুধু হাহাকার!
কোথায় পরাণ বঁধু, এস ফিরে এসগো!
আমার কুটীরে পথ ভুলে,—
প্রেম-কুসুমহার বিফলে শুকায়ে যায়,
পরহে পরহে গলে ॥

সুর——সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী।

স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

ভৈরবী মিশ্র——ঠুংরী।

স্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II{র্সঃ র্সাঃ | ণঃ র্সাঃ | ণঃ পাঃ | দা পা I
খ নি শি পো হা য়ে ছে

২´ ৩ ০ ১
I -া পপা | পাঃ পঃ | পা জ্ঞা | জ্ঞমপদা -া I
দেউ টী নি ভি ছে গো••• •

I ।   পপা । পা   মমা । জ্ঞঃ   জ্ঞাঃ । রা   সা I
•   ধ্রু ব   তারা লু   কা য়ে   ছে

২´   . . ৩   ০   ১
I -া   সসা । রা   সরজ্ঞা । জ্ঞা   -া । -া   া} I
•   মেঘে র   কো•• লে   • •   •

{২´   ৩   ০   ১
I{সা   সা । -সরজ্ঞা   জ্ঞা । জ্ঞা   জ্ঞা । জ্ঞা   জ্ঞা I
স্ব   প • • ন্   ভা ঙি   য়া গে   ছে

I -া   জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞা   রা । জ্ঞা   জ্ঞমপদা । দা   -পমা I
•   আধ ঘু   ম ঘো   রে••• গো   ••

I -া   দদা । দঃ   দাঃ । দদা   -পদপদা । ণণা   -দপমা I
•   হাসি টু   কু ধুয়ে   •••• গেছে   •••

২´   . . ৩   ০   ১
I -া   মমা । পদণর্সা   -ঋর্ঋা । র্সা   -া । -া   া} II
•   নয় ন•••   •জ লে   • •

অন্তরা।

{২´   ৩   ০   ১
II{সঃ   সাঃ । সঃ   সাঃ । সা   -া । সঃ   ঋসঃ   -ণা I
অ   তি অ   ক রু   ণ্ বঁ   ধু•   •

২´   ৩   . . ০   ১
I -া   -া । া   সসা । সঃ   -জ্ঞা   জ্ঞঃ । জ্ঞঃ   জ্ঞাঃ I
•   • •   মর মে   •   বিঁ ধে   ছে

২ ৩ ০ ১

I জ্ঞা -া | া া | জ্ঞা জ্ঞমা | মাঃ মঃ I

শে ন্ • • বে দ • • না দি

২´ ৩ ০ ১

I মা মপা | জ্ঞমা · জ্ঞমপা | পা -া | -া া}I

য়া ছে• উ• প • • হা • র্ •

২´ ৩ ০ ১

I{দা দণঃ -র্সঃ | -া র্সা | র্সা র্সা | র্সঃ ঋা -র্সঃ I

আ মা• • র্ যা কি ছু ছি ল •

২´ ৩ ০ ১

I -ণা ণণা | ণাঃ ণঃ | দঃ দাঃ | জ্ঞা মা I

• সক লি লু টি য়া নি ছে

২´ ৩ ০ ১

I মঃ মাঃ | জ্ঞঃ জ্ঞাঃ | ঋঃ ঋাঃ | সঃ সাঃ I

রে খে গে ছে শু ধু হা হা

২´ ৩ ০ ১

I সা -ঋা | -জ্ঞা -মা | -ণা -া | -া া}I

কা • • • • • র্ •

২ ৩ ০ ১

I{ঋা ঋজ্ঞমপদণা | -র্সা -ঃ র্সঃ | র্সা -া | র্সা র্সা I

কো থা • • • • • • য় প রা ণ্ ব ধু

২´ ৩ ০ ১

-া র্সর্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | -ণর্সা -ণর্সঋা I

• এ স কি রে এ স • • • • •

২´ ৩ ০ ১

ঋা -া | -া া | ঋা ঋা | -জ্ঞা -ঃ ঋঃ I

গো • • • আ মা • র্ হৃ

২ ০ ১
I র্ঋা সর্ঋা | ণর্সা দণর্সা | র্সা -া | -া }I
টা রে৹ পথ ভু৹৹ লে

২´ ৩ ০ ১
I{র্সণা -র্সর্ঋর্সা | ণা ণা | ণণা -া | ণর্সণর্সা -ণদা I
প্রে৹ ৹৹৹ ম কু সুম ৹ হা৹৹৹ ৹র্

২ ৩ ০
I া দদা | পদপণাঃ দঃ | পপা -মপদপা | মা -া I
৹ বিফ লে৹৹৹ শু কায়ে ৹৹৹৹ যা য়

I -া জ্জজ্জা | দা -া | -া -পমা | া মমা I
৹ প র হে ৹ ৹ ৹৹ ৹ পর

২´ ৩ ০ ১
I পা -া | -া -দপা | া দদা | র্সা -া I
হে ৹ ৹ ৹৹ ৹ পর হে

২´ ৩ ০ ১
I -র্সা -া | -ণর্সা -ণর্সর্ঋা | র্ঋঃ র্ঋাঃ | -া }II II
৹ ৹ ৹৹ ৹৹৹ গ লে ৹

---

(১) রাগিণীর পরিচয়ার্থ নামকরণ সম্বন্ধে প্রথম গীতের শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) এ গানখানি 'ঠা' লয়ে না বাজাইয়া একটু দ্রুত লয়ে চালাইলে শ্রুতিমধুর হইবে;
২´ ৩ ০ ১
তাই I ধাগ্ঃ ধঃ | গে ধিন্ | তাগ্ঃ তঃ | গে তিন্ I বোল্‌টী প্রয়োজ্য।

-লেখিকা

পথের দাবী *

(১৪)

নদীপথের সমস্ত ক্ষণ ভারতীর মন কত-কি ভাবনাই যে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দ্দেশ নাই। অধিকাংশই এলো-মেলো,—শুধু যে-চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়া গেল সে সুমিত্রার ইতিবৃত্ত। তাহার প্রথম যৌবনের দুর্ভাগ্যময় অপরূপ কাহিনী। সুমিত্রাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিবার দুঃসাহস কোন মেয়ের পক্ষেই সহজ নয়, তাহাকে ভালবাসিতে ভারতী পারে নাই, কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে তাহার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার জন্য হৃদয়ের গভীর ভক্তি তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যত অপরাধই অপূর্ব্ব করিয়া থাক্, নারী হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ায় ভক্তি তাহার অপরিসীম ভয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল,—বলির পশু রক্ত-মাখা খড়েগর সম্মুখে যেমন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে,—তেম্নি। অপূর্ব্বকে ভারতী যে কত ভালবাসিত সুমিত্রার তাহা অপরিজ্ঞাত ছিলনা, ভালবাসা যে কি বস্তু সেও তাহার অবিদিত নয়, তথাপি আর একজনের প্রাণাধিকের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিতে নারী হইয়া নারীর তিলার্দ্ধ বাধে নাই। বেদনার আগুনে বুকের ভিতরটা যখন তাহার এম্নি করিয়া হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, তখন সে আপনাকে আপনি এই বলিয়া বুঝাইত যে কর্ত্তব্যের প্রতি এতবড় নির্ম্মম নিষ্ঠা না থাকিলে পথের দাবীর সভানেত্রী করিত তাহাকে কে? যাহাদের নিজের জীবনের মূল্য নাই, রাজদ্বারে রাজার আইনে যে-সকল প্রাণ বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে তাহারা নির্ভর করিত তবে কিসে? তাহার জন্ম, তাহার শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস, তাহার আসক্তির অনতিবর্ত্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি, তাহার কর্ত্তব্যবোধ, তাহার পাষাণ হৃদয় সকলের সঙ্গেই আজ যেন ভারতী একটা সঙ্গতি দেখিতে লাগিল। নারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিমান ভারতীর ছিল, আজ সে যেন আপনাআপনিই একেবারে বাহুল্য হইয়া গেল। আর তাহাকে সে নিজের স্বজাতি বলিয়াই ভাবিতে পারিল না। আজ তাহার মনে হইল, স্নেহের দিক দিয়া, করুণার দিক দিয়া সুমিত্রার কাছে দাবী করিবার, ভিক্ষা জানাইবার মত পরিহাস পৃথিবীতে যেন আর দ্বিতীয় নাই।

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই একজন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ডাক্তারের হাত ধরিয়া ভারতী নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লোকটার প্রতি চোখ পড়িতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ও আমাদের হীরা সিং তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া সিংজী খবর সব ভালো?

হীরা সিং বলিল, সব্ আচ্ছা।

আমিও যেতে পারি নাকি ?

হীরা কহিল, আপ্‌কো কঁহি যানা দুনিয়ামে কোই রোক সক্‌তা ? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

বুঝা গেল পুলিশের লোক ভারতীর বাসার প্রতি নজর রাখিয়াছে, ডাক্তারের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ভারতী হাত ছাড়িলনা, চুপি চুপি কহিল, আমি যাবোনা দাদা।

কিন্তু তোমার ত পালিয়ে থাক্‌বার দরকার নেই ভারতী।

ভারতী তেম্‌নি আস্তে আস্তে বলিল, দরকার থাক্‌লেও আমি পালাতে পারবনা। কিন্তু এর সঙ্গে যাবোনা।

ডাক্তার আপত্তির কারণ বুঝিলেন। অপূর্ব্বর বিচারের দিন এই হীরা সিংই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি ত জানো ভারতী পাড়াটা কত খারাপ, এত রাত্রে একলা যাওয়া ত তোমার চলে না। আর আমি যে——

ভারতী ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না দাদা, তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে, আমি ত এখনও পাগল হইনি যে——

এই বলিয়া সে অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই থামিয়া গেল। কিন্তু, এতরাত্রে ও-পাড়ায় একাকী যাওয়াও যে অসম্ভব, এ সত্যই বা তাহার চেয়ে বেশি কে জানিত ? হাত ছাড়িয়া নৌকা হইতে নামিবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া ডাক্তার স্নেহার্দ্রস্বরে আস্তেআস্তে বলিলেন, আমার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে আমার নিজেরই লজ্জা করে। কিন্তু যাবে দিদি আর এক যায়গায় ? আমাদের কবির ওখানে ? সে নদীর ঠিক আর পারেই থাকে। যাবে ?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কবি কে দাদা ?

ডাক্তার কহিলেন, আমাদের ওস্তাদজী, বেহালা বাজিয়ে,—

ভারতী খুসি হইয়া কহিল, তাঁকে কি ঘরে পাওয়া যাবে ? আর মদ জুটে থাকে ত অজ্ঞান হয়েই হয়ত আছেন।

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আমার গলা শুন্‌লেই তার নেশা কেটে যায়। তা ছাড়া কাছেই নবতারা থাকেন—হয়ত তোমাকে দুটো খাইয়ে দিতেও পারব।

ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, রক্ষে কর দাদা, এই শেষ রাত্তিরে আর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা কোরোনা, কিন্তু তাই চল যাই, সকাল হলেই আমরা ফিরে আস্‌বো।

ডাক্তার পুনরায় নৌকা ভাসাইয়া দিলে হীরা সিং অন্ধকারে পুনরায় যেন মিলাইয়া গেল। ভারতী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, দাদা, এই লোকটিকে পুলিশে এখনও সন্দেহ করেনি ?

ডাক্তার কহিলেন, না। ও টেলিগ্রাফ আফিসের পিয়ন, মানুষের জরুরি তার বিলি করে বেড়ায়, তাই ওকে দিনরাত্রির কোন সময়ে কোন খানেই বে-মানান দেখায়না।

সেইমাত্র জোয়ার সুরু হইয়াছে, খাঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় নদীতে কতকটা উজাইয়া না গেলে ও-পারের যথাস্থানে নৌকা ভিড়ানো শক্ত, এইজন্য কিনারা ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে লগি ঠেলিয়া যাওয়ার পরিশ্রম অনুভব করিয়া ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থাক্‌গে, কাজ নেই দাদা আমাদের ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে বরঞ্চ চল, তোমার বাড়ীতেই ফিরে যাই। জোয়ারের টানে আধঘণ্টাও লাগবে না।

ডাক্তার কহিলেন, কেবল সে জন্য নয়, ভারতী, ওর সঙ্গে দেখা করাও আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্যুত্তরে ভারতী উপহাসভরে হাসিয়া বলিল, ওঁর সঙ্গে কোন মানুষের কোন প্রয়োজন থাক্‌তে পারে এ তো আমার বিশ্বাস হয় না, দাদা।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেউ ওকে জানো না, ভারতী, ওর মত সত্যিকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায়নি এমন যায়গা নেই। তা'ছাড়া ও ভারি পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে ওছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই। ওকে আমি যথার্থ ভালবাসি।

ভারতী মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তা'হলে ওঁকে তুমি মদ ছাড়াবার চেষ্টা করোনা কেন?

ডাক্তার কহিলেন, আমি কাউকে কোন কিছু ছাড়াবারই ত চেষ্টা করিনে ভারতী। একটু-খানি চুপ করিয়া বলিলেন, তাছাড়া ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভাল-মন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভাল-মন্দের বাঁধা আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে, শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও-বেচারা যখন ভারি দুঃখ পায়, তখন, আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।

ভারতী কহিল, তুমি সকলের জন্যেই দুঃখ বোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের চেয়েও কোমল। কিন্তু তোমার গুণীকে তুমি বিশ্বাস কর কি করে? উনি মাতাল হয়ে ত সমস্তই বলে ফেল্‌তে পারেন।

ডাক্তার কহিলেন, ওই জ্ঞানটুকুই ওর বাকি থাকে। আর একটা সুবিধে এই যে, ওর কথায় বিশেষ কেউ বিশ্বাসও করেনা।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ওঁর নাম কি দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, অতুল, সুরেন, ধীরেন,—যখন যা মনে আসে। আসল নাম শশিপদ ভৌমিক।

আমার মনে হয় উনি নবতারার বড় বাধ্য।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, আমারও মনে হয়। এই বলিয়া তিনি পরপারের জন্য নৌকার মুখ ফিরাইলেন। স্রোত ও দাঁড়ের প্রবল আকর্ষণে ক্ষুদ্র তরণী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে এপারে আসিয়া ঠেকিল। চারিদিকেই সাহেব কোম্পানির বড় বড় কাঠের মাড় স্তূপাকার করা, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোয়ারের জল ঢুকিয়া দূরবর্ত্তী জাহাজের তীব্র আলোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, ইহারই একটা ফাঁকের মধ্যে ডিঙ্গি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ডাক্তার ভারতীর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। পিচ্ছিল কাঠের উপর দিয়া সাবধানে পা টিপিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া গেল, আশে পাশে ছোট বড় ডোবা, লতা গুল্ম ও কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহারই একধার দিয়া এই পথ অন্ধকার বনের মধ্যে যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ নাই। ভারতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, ও-পারে এম্নি একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেম্নি ভয়ানক যায়গায় নিয়ে এলে। বাঘ ভালুকের মত এ ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাক্‌তে জানোনা? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত কর্‌তে হয়?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।

চক্ষের নিমিষে ভারতীর আর একদিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও তাঁহার এম্নি সহাস্য কণ্ঠস্বরে ইউরোপের বিরুদ্ধে কি অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর বাঘ-ভালুক বোন্? কতদিনই ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুকই থাক্‌তো! হয়ত, বিদেশ থেকে শীকার করতে এরা আস্‌তো, কিন্তু এমন অহর্নিশি রক্তশোষণের জন্য কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌তনা।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত জাতি-নির্বিশেষে কাহারও এতখানি বিদ্বেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মানুষটীর এতবড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।

কিছুক্ষণ হইতে একটা অপূর্ব্ব সুস্বর মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কানে লাগিতেছিল, সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, ওস্তাদজী আমাদের জেগে আছেন এবং সজ্ঞানে আছেন,—এমন বেহালা তুমি কখনো শোননি ভারতী।

আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ভারতী স্তব্ধ হইয়া থাকিল। কোথায় কোন্ অন্ধকারের বুক চিরিয়া কত কান্নাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার আদি অন্ত নাই, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না। মিনিট দুয়ের জন্য ভারতীর যেন সংজ্ঞা রহিলনা। ডাক্তার তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া কহিলেন, চল।

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, চল। আমি কখনো এমন ভাবিনি, কখনো এমন শুনিনি।

ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, পৃথিবীতে আমার অগম্য ত স্থান নেই, এর চেয়ে ভাল আমিও কখনো শুনেচি মনে হয় না। একটু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু পাগ্‌লার হাতে পড়ে ঐ বেহালা বেচারার দুর্দ্দশার অবধি নেই। আমিই বোধ হয় ওকে দশ বার উদ্ধার করে দিয়েচি। এখনো শুনেচি অপূর্ব্বর কাছে পাঁচ টাকায় বাঁধা আছে।

ভারতী কহিল, আছে। ওঁর-নাম করে টাকাটা আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

গাছ-পালার আড়ালে একখানা দোতালা কাঠের বাড়ী। একতালাটা পাঁক, জোয়ারের জল এবং দেনো গাছে দখল করিয়াছে, সুমুখে একটা কাঠের সিঁড়ি এবং তাহারই সর্ব্বোচ্চ ধাপে একটা তোরণের মত করিয়া তাহাতে মস্ত বড় একটা রঙ্গিণ চীনা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। ভিতরের আলোকে স্পষ্ট পড়া গেল তাহার গায়ে বড় বড় কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা,—শশি-তারা লজ।

ভারতী বলিল, বাড়ীর নাম রাখা হয়েছে শশি-তারা লজ্? লজ্ তো বুঝ্‌লাম, শশি-তারাটা কি?

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, বোধহয় শশিপদর শশী এবং নবতারার তারা একজোরে শশি-তারা লজ্ হয়েছে।

ভারতীর মুখ গম্ভীর হইল, কহিল, এ ভারি অন্যায়। এ সব তুমি প্রশ্রয় দাও কি করে?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার দাদাটিকে তুমি কি সর্ব্বশক্তিমান মনে কর? কে কার লজের নাম শশি-তারা রাখ্‌বে, কে কার প্যালেসের নাম অপূর্ব্ব-ভারতী রাখবে, সে আমি ঠেকাব কি করে?

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, না দাদা, এ সব নোঙ্‌রা কাণ্ড তুমি বারণ ক'রে দাও। নইলে আমি ওঁর ঘরে যাবো না।

ডাক্তার কহিলেন, শুন্‌চি ওদের শীঘ্র বিয়ে হবে।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিল, বিয়ে হবে কি কোরে, ওর যে স্বামী বেঁচে আছে?

ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে মর্‌তে কতক্ষণ দিদি? শুনেচি ব্যাটা মরেছে দিন পনর হল।

ভারতী অতিশয় বিরক্তিসত্বেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও হয়ত মিছে কথা। তাছাড়া, এক বছর অন্ততঃ ওদের ত থাম্‌তেই হবে, নইলে সে যে ভারি বিশ্রী দেখাবে!

তাহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বেশ, বলে দেখ্‌বো। তবে, থাম্‌লে বিশ্রী দেখাবে কি, না থাম্‌লে বিশ্রী দেখাবে সেইটেই চিন্তার কথা।

এই ইঙ্গিতের পরে ভারতী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে

ডাক্তার চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, পাগলাটার জন্যেই কষ্ট হয়, শুনেচি ঐ স্ত্রীলোকটাকে নাকি ও যথার্থই ভালবাসে। আর কাউকে যদি বাসত! সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সংসারের ভাল-মন্দের ফরমাস, বন্ধুজনের অভিরুচি,—এসব অতি তুচ্ছ কথা ভারতী! কেবল এইটুকু কামনা করি ওর ভালবাসার মধ্যে সত্য যদি থাকে ত সেই সত্যই যেন ওকে উদ্ধার করে দেয়।

ভারতী চমকিয়া উঠিল। এবং তেম্নি চাপাকণ্ঠেই সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সংসারে তাকি হয় দাদা?

ডাক্তার অন্ধকারেই একবার মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পরে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস প্রাণপণে নিরুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দপদে উঠিয়া গুণীর বদ্ধ দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক শুনিয়া বেহালা থামিল। খানিক পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া শশিপদ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারকে সে সহজেই চিনিল, কিন্তু আঁধারে ঠাহর করিয়া ভারতীকে চিনিতে পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—অ্যাঁ আপ্নি? ভারতী? আসুন, আসুন আমার ঘরে আসুন। এই বলিয়া সে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তাহার আনন্দ-দীপ্ত মুখের অকপট আবাহনে, তাহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত সমাদরে ভারতীর সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। শশী বিছানার কোন এক নিভৃত স্থান হইতে বড় একটা খাম বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিয়া কহিল, খুলে পড়ুন। পরশু দশ হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট্ আস্‌চে,—নট এ পাই লেস্! বল্‌তাম্ না? আমি জোচ্চোর! আমি মিথ্যাবাদী! আমি মাতাল! কেমন হল ত? দশ হাজার! নট এ পাই লেস্!

এই দশ হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট্ সম্বন্ধে একটা পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা প্রয়োজন। তাহার বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পরিচিত-অপরিচিত এমন কেহ ছিলনা যে অচির ভবিষ্যতে একটা মোটা টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা শশীর মুখ হইতে শুনে নাই। কেহ বড় বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ ঠাট্টা তামাসাই করিত, কিন্তু ইহাই ছিল ওস্তাদজীর মূলধন। ইহারই উল্লেখ করিয়া সে একান্ত অসঙ্কোচে লোকের কাছে ধার চাহিত। এবং শীঘ্রই একদিন সুদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে তাহা শপথ করিয়া বলিত। এই অত্যন্ত অনিশ্চিত অর্থাগমের উপর কত আশা আকাঙ্ক্ষাই না তাহার জড়িত ছিল! বছর পাঁচ সাত পূর্ব্বে তাহার বিত্তশালী মাতামহ যখন মারা যান তখন সে মাসতুত ভাইয়েদের সঙ্গে সম্পত্তির একটা অংশ পাইয়াছিল। এতদিন এইটাই তাহাদের কাছে বিক্রী করিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, মাসখানেক পূর্ব্বে তাহা শেষ হইয়াছে। খামের মধ্যে কলিকাতার এক বড় এটর্ণির চিঠি ছিল, টাকাটা দুই এক দিনেই পাওয়া যাইবে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতী চিঠি পড়িয়া শেষ করিলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশহাজার টাকার না কথা ছিল, শশি?

শশী হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, দশ হাজার টাকাই কি সোজা নাকি? তাছাড়া নিজের মাস্‌তুত ভাই,—সম্পত্তি ত একরকম আপনার ঘরেই রইল, ডাক্তারবাবু, আর ঠিক সেই কথাইত মেজ্‌দা লিখে জানিয়েছেন। কি রকম লিখেছেন একবার—এই বলিয়া মেজ্‌দার চিঠির জন্য উঠিবার উপক্রম করিতে ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, মেজ্‌দার চিঠির জন্যে আমাদের কৌতূহল নেই। ভারতীকে বলিলেন, এই রকম একটা ক্ষ্যাপা মাস্‌তুত ভাই আমাদের থাক্‌লে—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শশী খুসি হইল না, সে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে লাগিল যে, সম্পত্তিটা একপ্রকার বিক্রী না করিয়াই এতগুলা টাকা পাওয়া গেল, এবং সে কেবল তাহার মেজ্‌দার মত আদর্শ পুরুষ সংসারে ছিল বলিয়া।

ভারতী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, সে ঠিক কথা অতুলবাবু, মেজ্‌দাকে না দেখেই তাঁর দেব-চরিত্র আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ও আর সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই।

শশী তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল কিন্তু আমাকে আর দশটা টাকা দিতে হবে। তাহলে সেদিনের দশ কালকের দশ আর অপূর্ব্ব বাবুর দরুণ সাড়ে আট টাকা,—পুরোপুরি ত্রিশ টাকাই পরশু তরশু দিয়ে দেব। নিতে হবে, না বল্‌তে পারবেন না কিন্তু।

ভারতী হাসিতে লাগিল। শশী কহিতে লাগিল ড্রাফ্‌ট্‌টা এলেই ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মাতাল, জোচ্চোর, স্পেণ্ডথ্রিফ্‌ট্ যা মুখে এসেছে লোকে বলেছে, কিন্তু এবার দেখাবো। আসলে হাত পড়বেনা, কেবল সুদের টাকাতেই সংসার চালিয়ে দেব, বরঞ্চ বাঁচ্‌বে দেখ্‌বেন। পোষ্ট অফিসেও একটা অ্যাকাউণ্ট খুল্‌তে হবে,—ঘরে কিছু রাখা চল্‌বে না। চাই কি বছর পাঁচেকের মধ্যে একটা বাড়ী কিন্‌তেও পারবো। আর কিন্‌তেই ত হবে,—সংসার ঘাড়ে পড়্‌ল কিনা! সহজ নয়ত আজকালকার বাজারে!

ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে মুখ গম্ভীর করিয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী কহিল, মদ ছেড়ে দিয়েচি শুনেচেন বোধ হয়?

ডাক্তার কহিলেন, না।

শশী কহিল, হাঁ একেবারে। নবতারা প্রতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছেন।

এই লইয়া উভয়ের আলোচনা দীর্ঘ হইতে পারিত, কিন্তু একজনের সকৌতুক প্রশ্নমালায় ও অপরের উৎসাহদীপ্ত উত্তর দানের ঘটায় ভারতী বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কোনটাতেই যোগ দিতে পারিতেছেনা দেখিয়া ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন শশি, তুমি ত তাহলে এখান থেকে আর শীঘ্র নড়্‌তে পারচনা?

শশী বলিল, নড়া? অসম্ভব।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমাদের তা'হলে এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা রইল।

শশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, সে কি করে হতে পারে? আপনাদের সঙ্গে ত আর আমি সম্বন্ধ রাখ্‌তে পারবনা। লাইফ আমার'রিস্ক করা যায় না।

ডাক্তার ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমাদের ওস্তাদের আর যা দোষই থাক, চক্ষুলজ্জা আছে এ অপবাদ অতিবড় শত্রুতেও দেবেনা। পারো যদি এই বিদ্যেটা ওর কাছে শিখে নাও ভারতী।

প্রত্যুত্তরে শশার পক্ষ লইয়া ভারতী অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিল, কিন্তু মিথ্যে আশা দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমি পারিনে, কিন্তু অতুলবাবুর কাছে এ বিদ্যে শিখে নিতে পারলে আজ ত আমার ছুটী হয়ে যেত দাদা।

তাহার কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কেমন ভারি হইয়া গেল। শশী মনোনিবেশ করিলনা, করিলেও হয়ত, তাৎপর্য্য বোধ করিতনা, কিন্তু ইহার নিহিত অর্থ যাঁহার বুঝিবার তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মিনিট দুই সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। প্রথমে কথা কহিলেন ডাক্তার, বলিলেন, শশি, দিন দু'য়ের মধ্যে আমি যাচ্চি। হাঁটা পথে চীনের মধ্যে দিয়ে প্যাসিফিকের সব আইল্যাণ্ড গুলোই আর একবার ঘুরব। বোধ হয় জাপান থেকে অ্যামেরিকাতেও যাবো। কবে ফিরবো জানিনে, ফিরবই কি না তাই বা কে জানে,—কিন্তু, হঠাৎ যদি কখনো ফিরি শশি, তোমার বাড়ীতে বোধ হয় আমার স্থান হবেনা?

শশী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি নির্ণিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার নিজের মুখ ও কণ্ঠশব্দ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে। আমার বাড়ীতে আপনার স্থান চিরকাল হবে।

ডাক্তার কৌতুকভরে কহিলেন, সে কি কথা শশি, আমাকে স্থান দেওয়ার চেয়ে বড় বিপদ মানুষের আর আছে কি?

শশী মুহূর্ত্ত চিন্তা না করিয়া বলিল, সে জানি, আমার জেল হবে। তা' হোক্‌গে। এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, এমন বন্ধু আর নেই। ১৯১১ সালে জাপানের টোকিয়ো সহরে বোমা ফেলার জন্যে যখন কোটোকুর সমস্ত দলবলের প্রাণদণ্ড হল, ডাক্তার তখন তার খবরের কাগজের ইংলিশ সব্‌এডিটার। বাসার সুমুখের দিকটা পুলিশে ঘিরেচে, আমি কাঁদতে লাগলাম, উনি বল্‌লেন, মরলে চল্‌বেনা শশি, আমাদের পালাতে হবে। পিছনের জানালা থেকে দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন,—ডাক্তার বাবু, উঃ—মনে আছে আপনার। এই বলিয়া সে বিগত স্মৃতির তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আছে বই কি।

শশী কহিল, থাকার ত কথা। কিন্তু আ-কিম সাহায্য না করলে সেবার ভবলীলা আমাদের সাঙ্গ হত ডাক্তার বাবু। সাংহাই বোটে আর পা দিতে হতনা। উঃ—ঐ বেঁটে ব্যাটাদের মত বজ্জাত জাত আর ভূ-ভারতে নেই! আমি ত আর সত্যিই আপনাদের বোমার দলে ছিলাম না—বাসায় থাক্‌তাম, বেহালা শেখাতাম। কিন্তু সে কথা কি শুনতো? শয়তান ব্যাটাদের না আছে আইন, না আছে আদালত! ধর্‌তে পারলেই আমাকে ঠিক জবাই করে ছাড়্‌ত! আজ যে এই কথা কইচি, চলে ফিরে বেড়াচ্চি সে কেবল ওঁরই কৃপায়। এই বলিয়া সে চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। কহিল, এমন বন্ধুও দুনিয়ায় নেই ভারতী এমন দয়া-মায়াও সংসারে দেখিনি।

ভারতীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার সমস্ত কাহিনী একদিন আমাদের গল্প করে শোনাওনা দাদা! ভগবান তোমাকে এত বুদ্ধি দিয়েছিলেন, শুধু কি এই অমূল্য প্রাণটার দাম বোঝবার বুদ্ধিটুকুই দিতে ভুলে ছিলেন! সেই জাপানীদের দেশেই তুমি আবার যেতে চাও?

শশী কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলি ভারতী। বলি, অতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচাশয় জাতির কাছে কোন প্রত্যাশাই করবেন না। তারা কোন দিন আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, কোমরে সেই দড়ি বাঁধার ঘটনাও শশি ভুল্‌লে না, জাপানীদের সে এ জীবনে মাপ করতেও পারলে না। কিন্তু এই তাদের সমস্তটুকু নয় ভারতী, এতবড় আশ্চর্য্য জাতও পৃথিবীতে আর নেই। শুধু আজকের কথা নয়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা শাদা-চামড়াকে চিনেছিল। আড়াইশ বৎসর আগে যে-জাত আইন করতে পেরেছিল, চন্দ্র সূর্য্য যতদিন বিদ্যমান থাক্‌বে খৃষ্টান যেন না আমাদের রাজ্যে ঢোকে, এবং সে যেন তার চরম শাস্তি ভোগ করে, সে-জাত যাই কেননা করে থাক্ তারা আমার নমস্য!

বক্তার দুই চক্ষু এক নিমিষেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রগর্ভ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে শশী যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল। সে সভয়ে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সে ঠিক! সে ঠিক!

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার বুকের মধ্যেটা যেন অভূতপূর্ব্ব অব্যক্ত আবেগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ এই গভীর নিশীথে, আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে এক মুহূর্ত্তের জন্য এই লোকটির সে স্বরূপ দেখিতে পাইল।

ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বল্‌ছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেননি? মিছে কথা! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস ভারতী? ক্যান্টনের একটা গুপ্ত-সভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন্ আমাকে একবার বলেছিলেন——

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌চে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে ধীরে সুস্থে পিস্তল বাহির করিয়া

কহিলেন, এই অন্ধকারে আমাকে বাঁধ্‌তে পারে পৃথিবীতে কেউ নেই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

কেবল বিচলিত হইল না শশী। সে সহাস্যে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ নবতারাদের একবার আসার কথা ছিল, বোধ হয়—

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বোধ হয় নয়, তিনিই। অত্যন্ত লঘু পদ। কিন্তু, সঙ্গে তাঁর 'দের'টা আবার কারা?

শশী বলিল, আপনি জানেন না? আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছেন যে। বোধ হয়—

ভারতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রেসিডেন্ট? সুমিত্রা দিদি?

শশী মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল। ভারতী ডাক্তারের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে যেন সে তাঁহার এখানে আসিবার হেতু বুঝিয়াছে। আজ রাত্রিটা বৃথায় যাইবেনা, প্রত্যাসন্ন বিক্ষেপের মুখে পথের দাবীর শেষ মীমাংসা আজ অনিবার্য্য। হয়ত আইয়ার আছে, তলওয়ারকর আছে, কি জানি হয়ত নিরাপদ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্রও সহর ছাড়িয়া আসিয়া এই বনেই আশ্রয় লইয়াছে। ডাক্তার তাঁহার অভ্যাস ও প্রথামত পিস্তল গোপন করিলেন না, সেটা বাঁ হাতে তেমনি ধরাই রহিল। তাঁহার শান্ত মুখের উপর ভিতরের কোন কথাই পড়া গেল না সত্য, কিন্তু ভারতীর মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাহাড় ও প্রান্তর

Ruskin বলেছেন "To myself mountains are the beginning and the end of all natural scenery; in them, and in the forms of inferior landscape that lead to them, my affections are wholly bound up; and though I can look with happy admiration at the lowland flowers, and woods, and open skies, the happiness is tranquli and cold, like that of examining detached flowers in a conservatory on reading a pleasant book; and if this scenery be resolutely level, insisting upon the declaration of its flatness in all the detail of it, as in Holland and Lincolnshire, on central Lambardy, it appears to me like a prison, and I cannot long endure it. But the slightest rise and fall in the Road—a mossy bank at the side of a crag of chalk, with brambles at its brow overhanging it—a ripple on three or four stones in the stream by the bridge—above all, a wild bit of ferny ground under a fir or two, looking as if, possibly, one might see a hill if one got to the other side of the trees, will instantly give me intense delight, because the shadow or the hope of the hills is in them."

রাস্কিন্ স্পষ্ট বক্তা লোক, মনের কথা খুলেই বলেছেন। পাহাড় পর্ব্বত না হ'লে তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটে না ; সমতল ভূমিতে, মাঠে, প্রান্তরে, বিস্তৃত জলাভূমিতে তিনি কোন শোভা দেখতে পান না। এ সব তাঁর কাছে কারাগার ব'লে মনে হয়। একখণ্ড উচ্চ-ভূমি, একটুখানি উঁচুনীচু রাস্তা কিম্বা ছোট্ট একটী টিপির উপর দুইচারিটি সরল গাছ (Pinos) দেখলে কিন্তু তাঁর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, তিনি সে সবের শোভার মধ্যে তন্ময় হ'য়ে পড়েন।

কোন জিনিসকে পছন্দ করা না করা কতকটা ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির এবং জন্মগত রুচির উপর নির্ভর করে, আর কতকটা শিক্ষা এবং সংস্কারের উপর নির্ভর করে। প্রথমোক্ত কারণের উপর যুক্তিতর্ক চলে না, তবে দ্বিতীয় কারণ বশতঃ যেখানে চিত্ত বিকৃতি জন্মে সেখানে রুচি শুদ্ধির সম্ভাবনা আছে। Ruskinএর খেয়ালের কতটা অংশ স্বভাবগত আর কতটা অংশ সংস্কারগত। সে নিয়ে তর্ক করবার এখানে প্রয়োজন নাই। তবে আমার মনে হয় প্রান্তরের যে একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে, আর বিস্তৃত সমতল ভূমির যে ভাব উদ্দীপনের একটী অসামান্য ক্ষমতা আছে সেই মহাসত্যটী রাস্কিন্ অনুভব করতে পারেন নি, তা সে দোষ তাঁর স্বভাবেরই হউক আর শিক্ষারই হউক।

অবশ্য পাহাড়ের সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ কি সমতল ভূমির সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ সে নিয়ে বিতণ্ডা করা বৃথা। পিঙ্গলকুন্তলা, সুনীলনয়না, গোলাপরাগরঞ্জিতা দীর্ঘাঙ্গিনী ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, কি ভ্রমরলোচনা, কৃষ্ণকেশদামশোভিতা, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব শ্যামাঙ্গিনীর সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, সে নিয়ে তর্ক করে লাভ নাই। উভয় সৌন্দর্য্যেরই একটা বিশিষ্ট কমনীয়তা, একটা নিজস্ব মধুরতা আছে। উভয় সৌন্দর্য্যই নিজ নিজ বিশেষত্বে উপভোগ্য এবং বরণীয়। তুলনার ন্যায় উপভোগেই হচ্চে সৌন্দর্য্যামোদীর সার্থকতা।

পাহাড়ের এবং প্রান্তরের শোভার মধ্যে একটা কুলগত পার্থক্য আছে। পার্ব্বত্য শোভা মনে একপ্রকার ভাব আনে, আর প্রান্তরের শোভা মনের মধ্যে অন্যপ্রকার ভাবের উদ্রেক করে। নিজের অনুভূতির কথা অবশ্য আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। পাহাড়ের শোভায় আমার বাহ্যেন্দ্রিয় বিমোহিত হয় ; প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়। প্রান্তরের শোভায় কিন্তু আমার ভাবের উৎস খুলে যায়। মন সসীমকে ছেড়ে অসীমের দিকে চলে যায়। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলি। সর্ব্বব্যাপী এক উদারভাব এসে আমার মনকে জুড়ে বসে।

Wordsworth বলেছেন "To me high mountains are a feeling." আমি কিছু নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি "To me vast plains are a feeling." উন্মুক্ত প্রান্তর আর তার উপর বিস্তৃত নীলাকাশের চন্দ্রাতপ আমার মনকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। আমি সেখানে জীবনের ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি কথাগুলি একেবারে ভুলে যাই ; যাহা অনন্ত, যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহাই এসে প্রাণকে অধিকার করে বসে। পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য পুলকের উৎস

আমার মনে অনেকবার খুলে দিয়েছে বটে, কিন্তু এ ভাবটী কখনও আনতে পারে নি। পার্ব্বত্য-শোভা আমার মনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়; কিন্তু প্রান্তরের শোভাসৌন্দর্য্যের অনুভূতির চেয়েও যে উপভোগ্য এবং মাদকতাপূর্ণ মনোভাব তাই, অর্থাৎ mystic feeling আমার মনের মধ্যে প্রকটিত করে তুলে। সীমাহীন প্রান্তরে মন আপন থেকেই অসীমের দিকে চলে যায়। অন্তহীন নীলাকাশে কল্পনার তরী যুক্তিতর্কের বহু দূরে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির দেশে পৌঁছায় যেখান থেকে স্বর্গরাজ্যের সোনার তোরণগুলি অতি নিকটে বলে মনে হয়।

মাঠের মধ্যে বন জঙ্গল থাকিলে, কিম্বা আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার হলে, আত্মার এই ব্রহ্মাণ্ড বিচরণে ব্যাঘাত হয়। খেয়াল অনন্তের পথে কতকদূর গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। ব্যথিতের বেদনায় প্রাণ ভরে উঠে। সেইজন্য বন-জঙ্গল-সমাকীর্ণ প্রান্তর আমার ভাল লাগে না। আর আকাশে যে দিন মেঘের ঘটা হয় সেদিন মাঠে যেতে আমি পছন্দ করি না।

তবে প্রান্তরের স্থানে স্থানে দুই চারিটী গাছ, দূরে দূরে দুই একটী ঘর, এখানে সেখানে কর্ম্মরত কৃষকের ছোট ছোট দল, আর নীলাকাশের অন্তহীন প্রাঙ্গণের কোথাও কোথাও ভ্রাম্যমান মেঘের মৃদুল গতি মনের আনন্দ বিহারে বাধা জন্মায় না, বরং সাহায্য করে। সীমাবদ্ধ মানব সমাজের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্য আমাদের প্রাণ অনন্তের পথে চলতে চলতে অন্তের দিকে এক একবার লুকিয়ে লুকিয়ে চাইতে ভালবাসে। আর সেইজন্য মন অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে একটী ছোটখাট oasis দেখিতে চায়, আর সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে অতি সসীম একটী কুটীর দেখলে পুলকিত হয়ে উঠে।

সকালে, দ্বিপ্রহরে, বৈকালে প্রান্তরের শোভা সব সময়েই উপভোগ্য। আমি কিন্তু সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটাই বিশেষভাবে উপভোগ করি। তখন গগন প্রান্তের নিশ্চল মেঘমালার অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা দিনমণির সমারোহপূর্ণ তিরোধান, প্রকৃতির শান্তিময় মৃদুল হাসি, পশুপক্ষীর আনন্দ কলরব, মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ আর প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি এনে দেয়। মস্তক তখন ভক্তিভরে আপনি প্রণত হয়ে পড়ে, হৃদয় মধ্যে অর্চ্চনাধ্বনি আপনি গুঞ্জিত হতে থাকে।

সমতলভূমির আর একটী শোভা আমার বেশ ভাল লাগে, সেটা হচ্ছে নদী কিম্বা তড়াগের উপর বৃষ্টির মুষলধারে বর্ষণ। সাহিত্যে যেমন নানাবিধ রস আছে, প্রকৃতিও তেমনি রসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। বিস্তৃত প্রান্তরে যেমন মনের মধ্যে mystic feeling এর আবির্ভাব হয়, কৃষ্ণকাদম্বিনী-সমাকীর্ণ আকাশের নদীর উপর মুষলধার বর্ষণ তেমনি মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা, একটা বিষাদের ভাব (tone)এনে দেয়। মনে হয় যেন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে কোন শ্রেষ্ঠ কবি রচিত এক Tragedyর অভিনয় দেখ্‌ছি। প্রাণের মধ্যে তখন বিষাদের কত তরঙ্গ উঠে, দুঃখের কত পুরাণ কাহিনী তখন মনে পড়ে, আর বিচ্ছেদের কত যাতনা এসে তখন হৃদয়কে চঞ্চল করে তুলে।

সমতল ভূমির সৌন্দর্য্য কেবল প্রান্তর আর জলাশয়ের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। ছোট্ট একটী

ঝোপের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী পাখীর বাসা কি মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে না? গ্রামের প্রান্তে শিমুল গাছটী সৌন্দর্য্যের ডালি মাথায় নিয়ে কি দাঁড়িয়ে থাকেনা? বট গাছের পাখীর কলরব কি মনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগিয়ে দেয় না?

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক অভিব্যক্তির মধ্যে আকাশের নীলিমা, মেঘ মণ্ডলের বর্ণ-বৈচিত্র্য, সমীরণের বিভিন্ন গতি, জনপ্রাণীর জীবনলীলা, লতাপল্লবের পুষ্পিত হাসি, ফুলের গন্ধ, প্রভৃতির সমস্ত নৈসর্গিক উপকরণ তাদের বিশিষ্ট অংশ নিয়ে থাকে। আর এই বিভিন্ন উপকরণের বিভিন্ন সংযোগে প্রকৃতি আমাদের জন্য নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকেন।

সৌন্দর্য্য পাহাড়ে, প্রান্তরে, পর্ব্বত শিখরে, বিস্তৃত সমতল ভূমিতে, আমাদের আশে পাশে চারিদিকে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। দারিদ্র্য প্রকৃতিতে নাই, দারিদ্র্য আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরকে সৌন্দর্য্যতত্ত্বে দীক্ষিত করতে পারলে আর তার সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে দেখতে পাব আমরা এক অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত রম্য কাননে বাস করছি যার প্রত্যেক গাছের মধ্যে আর প্রত্যেক পাতার মধ্যে ভাবের অনন্ত উৎস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেই উৎস তখন আমাদের দীক্ষিত আত্মার ইন্দ্রজালিক স্পর্শে নেচে উঠবে, আর আমাদের মন প্রাণকে পুলকে সিক্ত করবে।

শ্রীএস, ওয়াজেদ আলি

জ্যৈষ্ঠে

বিশ্বপ্রেমের হাওয়া-বাজি—যে চেতনা ও ভাবের প্রেরণা বিনা কোন মানুষের বা কোন জাতির স্থিতি ও উন্নতি অসম্ভব, তাহা এই,—মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে সে আপনার আত্মরক্ষা করিতে পাইবে, তাহার স্বাস্থ্যের ও জ্ঞানের উন্নতিতে বাধা পড়িবে না, সে সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল কাজে আপনার ক্ষমতার অনুরূপে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই চেতনা ও প্রেরণাকে যদি বিশ্বপ্রেম বল, তবে তাহাকে উপাদেয় সত্য ও খাঁটি রত্ন বলিয়া আদর করিতে পারি। যে এইরূপ চেতনায় ও প্রেরণায় কাজ না করিয়া নিজের চেহারার বিশিষ্টতার নামে, বিশেষ বংশের বা সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের দাবিতে, অথবা ধর্ম্মমত বিশেষের গৌরবে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকার চায়, সে খাঁটি বিশ্বপ্রেম হইতে বঞ্চিত বলিয়া কোন অধিকার লাভের উপযোগী নয়। প্রথম শ্রেণীর লোককে যে কোন দেশেই ফেলিয়া দাও, সেখানেই সে মানুষের প্রাপ্য অধিকারের দাবি করিবে ও অপরের অধিকারের পথে বাধা পড়িতে দেখিলেই সে বাধা পায়ে ঠেলিবার জন্য উদ্যোগী হইবে।

কোন প্রকারের ফাঁকিতে বা কুতর্কে এই সত্যকে ঢাকা অসম্ভব যে, প্রতি মানুষের মনে প্রথমে জাগিবে আপনার অধিকারের চেতনা, তাহার পর জাগিবে তাহার নিজের পরিবারের লোকের অধিকারের চেতনা, তাহার পর জাগিবে নিজের দেশের অধিকারের চেতনা, আর শেষে সেই চেতনার প্রসারে অন্য দেশের কথা মনে পড়িবে। এই মোটা কথাটা বুঝাইতে হইবে না

হইল, এ দৃষ্টান্ত রাজনীতির আসরেই মেলে। বিশেষ কারণে একজনের "মূর্দ্ধ্নি স্থিতিঃ" না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে "চরণৈরবতাড়নানি" শোভা পায় না। প্রাচীনতার দোহাই মানিয়া নিজের স্বাধীন মতে অটল হইয়া কাজ না করা অতি নিন্দনীয়; তেমনই আবার মতভেদ-জনিত অসহিষ্ণুতায় "পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রম" ঘটাইয়া শ্রেয়ের পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করা নিন্দনীয়।

এ প্রসঙ্গে বলিতে পারি, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বিরোধীদের নীতির যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট যুক্তি-যুক্ত না হইলেও, তাঁহার উক্তিতে বিদ্রূপের উপেক্ষা বা চপলতা নাই! মহাত্মা গান্ধিজি যেভাবে বৃদ্ধ নেতার সঙ্গে দেখা করিয়া সদ্ভাব স্থাপন করিতেছেন, অন্য নেতাদের পক্ষে তাহা করা উচিত। দেশে যে শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে, উহাতে আমাদের জাতীয়ত্বের উন্নয়ন কতখানি হইবে জানি না, কিন্তু অপরকে বিষ-চোখে দেখার দোষ ঘুচিলে মনুষ্যত্বলাভের পথ প্রশস্ত হইবে।

* * *

ওড়িষ্যার কথা—খুব সম্ভব, আমাদের পাকা বড়লাট ছুটি ফুরাইবার পর এদেশে ফিরিলে ওড়িষাকে গঞ্জামের খানিকটা অংশের সঙ্গে মিলাইয়া একটি উপপ্রদেশের সৃষ্টি করা হইবে। এই উপপ্রদেশ গড়িবার সময় যাহাতে সম্বলপুর জেলার যোগিনীচক, পদম্‌পুর এলাকা ও ফুলঝর এলাকা ওড়িষার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহার জন্য ওড়িষার লোকের উদ্যোগ করা উচিত। যে স্থানগুলির কথা বলা গেল সেখানকার লোকেরা মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুরের সহিত যুক্ত থাকিতে চায় না। নূতন উপপ্রদেশ গড়া হইবার পর ওড়িষাকে বিহার ও চুটিয়া নাগপুরের সঙ্গে মিলিত রাখা হইবে, স্থির হইয়াছে; ইহাতে বিহার ও ওড়িষা প্রদেশ আয়তনে বাড়িবে। গঞ্জাম অঞ্চলের লোকেরা মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে শিক্ষা বিষয়ে যে সকল অসুবিধায় পড়িবে, তাহার বিচার হইয়া নাকি স্থির হইতেছে যে, কটকের রাভেন্‌শা কলেজের প্রসার বাড়াইয়া উহাকে ওড়িষা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় বাড়িলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই; নূতন বিশ্ববিদ্যালয় না বসাইয়া যদি কটকের কলেজটিতে বহু বিষয়ের শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করা হয়, বহরমপুরের কলেজকে উন্নততর করা হয়, ও কটকের মেডিকেল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করা হয়, তবে ওড়িষার যথার্থ উপকার হইবে। এই প্রসঙ্গে চুটিয়া নাগপুরের কথা মনে পড়িতেছে। চুটিয়া নাগপুরটি দিন দিন যেরূপ উন্নত হইতেছে, তাহাতে রাঁচির মত স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া বড় অন্যায়।

সম্প্রতি চুটিয়া নাগপুরের বহুসংখ্যক গণ্যমান্য লোক রাঁচীতে মধ্য শ্রেণীর কলেজ খুলিবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। বেহারীরা যদি অন্য উপপ্রদেশের প্রতি কঠোর বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে তবে চুটিয়া নাগপুর ও ওড়িষাকে মিলাইয়া একটি স্বতন্ত্র উপপ্রদেশ করিলে হয়ত ভাল হইতে পারে। উত্তর ভারতে যুক্ত-প্রদেশটি আয়তনে অত্যন্ত বড়; এইজন্য গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়েরও বিচার করিতেছেন যে যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বভাগ ও বেহার অঞ্চলে মিলাইয়া একটি নূতন প্রদেশ করা চলে কি না।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

বৃতদল
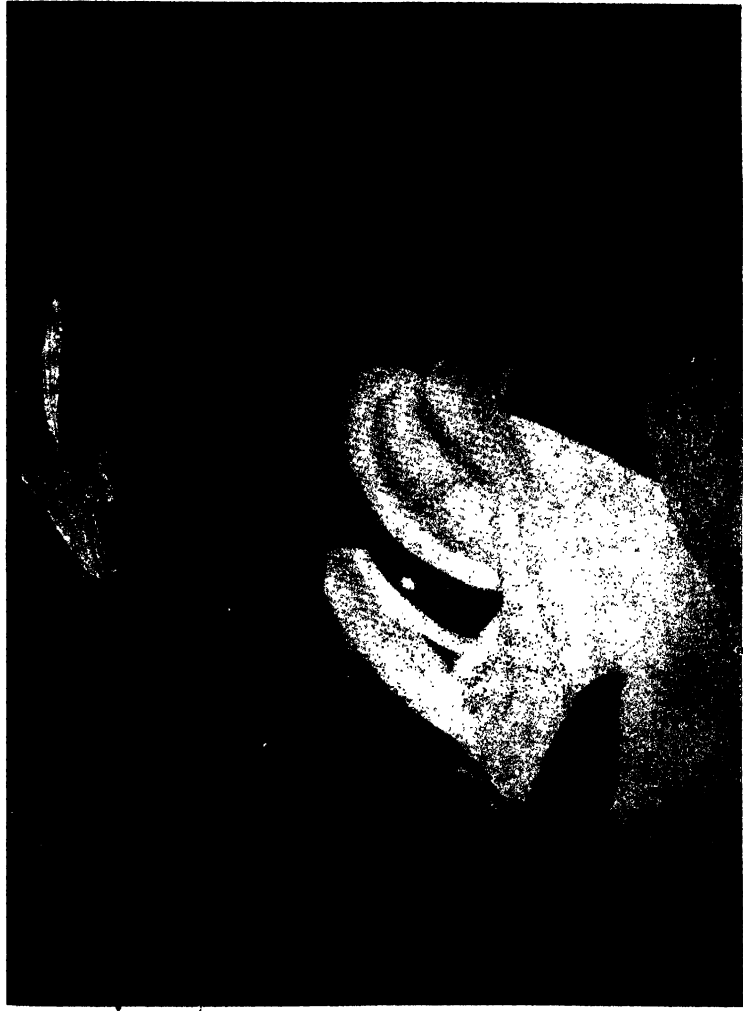
"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

আষাঢ়

প্রথমার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

বাঙ্গলার কথার আভিজাত্য

বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের বয়স খুব বেশি নয়। কিন্তু ইহার পরিণতি লাভ দ্রুতবেগে হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা ইহাকে আরম্ভের কালেই একটা অত্যন্ত উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ইহার অভ্যুদয়ে সহায়তা করিয়াছে, তাই ইহা আজ এমন একটা অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে বাঙ্গলার কথার আজ বিশ্বসাহিত্যের পাশে নিতান্ত লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবার কোনও হেতু নাই।

কিন্তু এই কথা-সাহিত্য এখনও পরিপূর্ণরূপে আভিজাত্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সমশ্রেণীর সমাজের কথা তাঁহার নায়ক নায়িকার মধ্যে রাজা রাজড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পন্ন গৃহস্থ বা জমিদারের জীবন পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোটগল্পে দুই এক স্থানে দরিদ্র ও পরিভূত জীবনের এক আধটা অতি করুণ চিত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্রও আভিজাত্যের দৃষ্টিক্ষেত্রকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার কথা-সাহিত্য সর্ব্বত্র বাঙ্গলার অভিজাত ভদ্র সম্প্রদায়ের জীবনের কথা লইয়া লিখিত। প্রভাত কুমার এ আভিজাত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। শরৎচন্দ্র অনেক

দিক দিয়া আভিজাত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও খুব বেশি দূর যান নাই। ভদ্র সমাজের ক্ষেত্রের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার দৃষ্টি তিনি কতক পরিমাণে বাহিরের জগতে চালাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু কখনও সেই ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া তাঁহার প্রতিভাকে অবনত পরিভূত দরিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের অশেষ কারুণ্য ও তাহার ভিতর ভগবানের অপূর্ব্ব বিকাশের অনুপম লাবণ্যধারার মধ্যে ডুবাইয়া দেন নাই। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর জলধর সেন অনেক দরিদ্র "ছোটলোক" শ্রেণীর লোকের ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু সেও ভদ্র সমাজের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ভদ্র জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয় বা Complement স্বরূপে।

আমাদের নাট্যকারেরাও এ বিষয়ে ভব্য সমাজের গণ্ডী কখনও ছাড়াইতে সাহস করেন নাই। গিরিশচন্দ্র সামাজিক জীবনের অনেক করুণ ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু সে ছবি গরীব ভদ্র লোকের জীবনের,—চাষার জীবনের নয়। আর কোনও নাট্যকার এদিকে একরকম অগ্রসরই হন নাই।

এ সকল নামের সঙ্গে আমার নিজের নাম করা অনেকের কাছে নিদারুণ আত্মগরিমার পরিচয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি নিজে যখন এ আলোচনা করিতে বসিয়াছি তখন আমার পক্ষে নিজের সম্বন্ধে এ কথা না বলাটাও গুরুতর ত্রুটি বলিয়া মনে হইতেও পারে। সেজন্য এস্থলে আমার বলা আবশ্যক যে, যদিও আমি অনেক উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছি, তবু দু'একটি ছোট গল্পে ছাড়া আমিও ভদ্রশ্রেণী বহির্ভূত কাহারও কথা লিখিতে সাহস করি নাই।

বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের এই ত্রুটি যে আমাদের চোখে না পড়িয়াছে এমন নয়। অনেকে যে এ সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহার পরিচয় আমরা আজকালকার কথা-সাহিত্যে দুই এক স্থানে পাইয়াছি। যে নবীন সাহিত্যিকগণ কথা-সাহিত্যে নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি এইদিকে পড়িয়াছে। তাহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম বহুদিন পূর্ব্বে যখন ইউরোপীয় এক উপন্যাসের অনুবাদ "জন্মদুঃখী" নাম দিয়া "প্রবাসীতে" বাহির হইয়াছিল। তাহার পর অনেকে, বিশেষ করিয়া "ভারতী"র দলের মনস্বী সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে ছোট বড় নানা রকম চেষ্টা করিয়াছেন। এ রকম যে সব চেষ্টা হইয়াছে তাহার সব হয় তো আমার নজরে পড়ে নাই, সবার কথা আমি জানিও না। সুতরাং সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমার পক্ষে দেওয়াও সম্ভব নয়। যাহা পড়িয়াছি তাহার মধ্যে শ্রীমান প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "চাষার মেয়ে" একখানা সুন্দর উপন্যাস। কিন্তু এই বইখানা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা গরীব শ্রমজীবির জীবন লইয়া কথা লিখিতে কেন এত পরাঙ্মুখ। "চাষার মেয়ে" বইখানি উপন্যাস হিসাবে সুন্দর ও উপভোগ্য, ইহার আদ্যোপান্ত লেখকের গল্প লিখিবার ক্ষমতার পরিচায়ক, কিন্তু এ গল্পের যে নায়িকা তাহাকে চাষার মেয়ে বলিয়া লেখক যতই ছাপ মারিয়া দিন, সে ভদ্রলোকের মেয়ে। তাহার জীবন লিখিতে গিয়া

গ্রন্থকার চাষার মেয়ের মনের খবর দিতে পারেন নাই। তেমনি গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রেও ভদ্র সমাজের ভাব, চিন্তা ও আবেষ্টনই জ্বল-জ্বলে হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ কাল নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে "ছোটলোক" লইয়া যে সব গল্প প্রকাশিত হইতেছে তাহার সবার মধ্যেই এই ত্রুটি সমান লক্ষিত হয়। শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়ার "সেখ আন্দু" বা "ইমানদার" ঠিক এ শ্রেণীর গল্প নয়—কারণ এগুলির যাহারা নায়ক বা তাহাদের সম্পর্কিত তাহারা এত নিম্নশ্রেণার নয়। প্রতিভাশালিনী লেখিকা তাঁহার শক্তিমান হস্তে ইহাদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা পরম মনোহর, চরিত্র গৌরবে অতুলনীয়, কিন্তু তাহাদের কথা, কার্য্য ও সমস্ত জীবন বাঙ্গলার ভদ্র যুবকের। আমি একথা মোটেই বলিতেছিনা যে, আমাদের দরিদ্র অবনত শ্রেণীর মধ্যে চরিত্র মাহাত্ম্যের অবসর নাই; সেখ আন্দুর মত চরিত্র তাহাদের ভিতর আছে, কিন্তু তাহাদের চরিত্রগৌরব ঠিক এমনি আবেষ্টনের ভিতর, ঠিক এমনি কথা ও কাজে ফুটিয়া ওঠে না। সে চরিত্রগৌরব ফুটাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শাস্তি" ও "কাবুলীওয়ালা"য়। ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "কৃতজ্ঞতায়" এ গৌরবের আর একটা দৃষ্টান্ত আছে, এমন কত আছে। শ্রীযুক্তা শৈলবালার নায়কেরা ঠিক যথাযথ আবেষ্টনের ভিতর সে গৌরব ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই।

আজ কাল যাঁহারা গল্প লেখেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যেমন করিয়া অবনত শ্রমিক জীবনের সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন, তেমন আর কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার লেখা পড়িলেই মনে হয় যে, তিনি এই শ্রেণীর লোকেদের জীবন ও মন দরদের সহিত অন্তরঙ্গভাবে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই তাঁহার চিত্রগুলি এত মনোজ্ঞ ও সত্য হইয়াছে।

সমাজের অবনত শ্রেণীর জীবনের পরিচয় দিবার এই সকল প্রচেষ্টা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কেন প্রতিভাবান লেখকেরাও অনেকে এ পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হন না, এবং যাঁহারা অগ্রসর হন তাঁহারাও পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন না। ইহার প্রথম কারণ এই যে, বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য এ পর্য্যন্ত যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভদ্রশ্রেণী হইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কাহারও অবনত শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। যাহাকে অন্তর বাহিরে না চিনি তাহার কথা আমরা লিখিতে পারিনা, লিখিতে গেলে পদে পদে ঠেকিয়া যাই। আমরা যে দেশের দরিদ্র অ-ভদ্র সমাজকে জানিনা তাহার কারণ আমাদের সামাজিক জীবনের একটা বিশিষ্টতা। আমরা আদ্যোপান্ত গৃহস্থ, আমাদের জীবনের পোনেরো আনা আমাদের গৃহে পর্য্যবসিত আর প্রত্যেকের গৃহ এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ। তাহার ভিতরের খবর বাহিরে কেহ জানে না। আমাদের প্রত্যেক সামাজিক সম্বন্ধ আমাদের বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ, সে গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া যাইবার জো' নাই। অপর সমাজের জীবনের বা চিত্তের পরিচয় আমরা পাই না। বাহিরের সম্পর্কে আমরা আমাদের শ্রেণী বহির্ভূত লোকদের যে পরিচয় পাই তাহা আন্তরিক নয়,—

নিতান্ত বাহ্যিক। আমাদের বেশির ভাগ লোক পরিবারের ভিতর বাস করে আপন স্বরূপে। পরিবারের বাহিরে আপনার সমাজের কাছে তাহারা মুখের উপর পরদা টানিয়া বাহির হয়, আর যখন সে গণ্ডী ছাড়াইয়া তাহাদের বাহিরের জগতের সঙ্গে মিশিতে হয় তখন তাহারা একটা মুখোস পরিয়া থাকে। সুতরাং যদি পরিবারের ভিতর উঁকি মারিয়া না দেখিতে পারি তবে আমরা তাহাদের জীবনের সত্য পরিচয় পাই না।

সেকালে আমাদের গ্রামের জীবনে অভিজাত ও ইতর শ্রেণীর মাঝখানে এত বড় উচ্চ প্রাচীর ছিলনা। জাতিভেদ যথেষ্ট প্রবল ছিল, কিন্তু সে ভেদের জন্য বিবাহ সম্বন্ধ ও খাদ্যাখাদ্য ঘটিত যত প্রভেদ থাকুক তাহাতে ভদ্রশ্রেণীর লোকের পক্ষে দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশীর জীবন ও অন্তরের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে এবং পরস্পরের ভিতর অল্পাধিক স্নেহ ও সহানুভূতির সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে বাধিত না। আজ আমাদের জাতিভেদ দুর্ব্বল হইয়াছে, ভদ্র পদবীতে আরূঢ় অস্পৃশ্যজাতির অন্ন খাইতে আমাদের এখন তত বাধে না কিন্তু ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর ভিতর ব্যবধান এখন বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ভদ্র ও অ-ভদ্র শ্রেণীর ভিতরে শিক্ষার তারতম্য ছিল, চিত্তের সৌকুমার্য্যে ভেদ ছিল, অনেক প্রভেদ ছিল, কিন্তু মোটামুটি উভয়ের Cultureএর যে সব মৌলিক কথা, তাহাতে বিশেষ প্রভেদ ছিলনা। নূতন শিক্ষার ফলে আমাদের চিন্তা ও ধারণা অন্য ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, আমাদের চিত্তের সৌকুমার্য্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং ভিন্ন ছাঁচে ঢালা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই নূতন শিক্ষা ও নূতন Cultureএর কণামাত্র আমাদের দরিদ্র জীবনে পৌঁছিয়াছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং কি নগরে, কি পল্লীগ্রামে, ভদ্র ও অ-ভদ্র শ্রেণীর ভিতর অন্তরের লেন-দেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে! আমাদের ভাষা তাহারা বোঝে না, তাহাদের ভাষা আমরা বুঝিনা—তাহাদের সঙ্গে অন্তরের যোগসাধন করিতে হইলে আমাদের পক্ষে কল্পনা ও সাধনার যে বিরাট চেষ্টার প্রয়োজন হয় তাহা আমরা করিতে পারিনা। পূর্ব্বের সে অবাধ আন্তরিক আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তার স্থানে নূতন কিছু আমরা সৃষ্টি করি নাই।

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের সকল দেশেই একদিন এ অবস্থা ছিল। ভদ্র ও ইতর শ্রেণী দুইটি স্বতন্ত্র জাতি ছিল, তাদের ভিতর কোনও যোগই ছিল না। ক্রমে ক্রমে এই সামাজিক দ্বৈতভাব কাটিয়া যাইতেছিল; ভদ্র ও অ-ভদ্র সমাজের ভিতর প্রভেদগুলি ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় আসিল শিল্প-বিপ্লব। ইহার ফলে পুরাতন সমাজবন্ধন ভাঙ্গিয়া পড়িল, অভিজাত ও ইতর শ্রেণীর যে অলঙ্ঘনীয় প্রভেদ ছিল তাহা ক্রমে দূর হইল, কিন্তু আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের সৃষ্টি হইল—ধনী ও নির্ধন, প্রভু ও শ্রমিকের ভিতর। ধনী উত্তরোত্তর ধনী হইতে লাগিল, শ্রমিক উত্তরোত্তর অধোগতি লাভ করিয়া দারিদ্র্য ও বিবিধ দুঃখে নিপীড়িত হইতে লাগিল। এই উভয় শ্রেণীর ভিতর সংযোগের কোনও সূত্র রহিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা চলিয়াছে।

তাহার ফলে বিলাতে শ্রমজীবি সমাজের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাদের হিতকল্পে যে সব অনুষ্ঠান ও বিধি গঠিত হইয়া গরীবকে মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব সম্পদে পূর্ণাধিকারী করিয়াছে, আমাদের দরিদ্র সমাজে যে সে সব কোন যুগে আসিবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আজ ইংলণ্ডের শ্রমজীবি-সম্প্রদায় শিক্ষা লাভ করিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা তাহাদের ভিতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, নানাদিক দিয়া তাহারা স্বজাতির উন্নতিসাধনে যত্নবান, রাষ্ট্রশক্তি আজ তাহাদের সহায়তাকল্পে নিরন্তর যত্নশীল, নানা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান তাহাদের উন্নতিকল্পে উদ্যোগী। উনবিংশ শতাব্দীতে যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া Chartistগণ সকলের কাছে লাভ করিয়াছিল কেবল উপহাস ও লাঞ্ছনা, আজ তাহার চেয়ে বেশি অধিকার সমস্ত জগৎ নির্ব্বিরোধে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

দরিদ্রের এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনে অনেক শক্তি সমবেত হইয়া সহায়তা করিয়াছে। তাহার সবগুলির হিসাব লওয়া আমার এখন উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিশেষভাবে দুইটি শক্তির কথা এখানে উল্লেখ করিব। প্রথম ভদ্রসমাজের মহানুভবতা, দ্বিতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ কথাসাহিত্য। যখন শ্রমজীবিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই, রাজশক্তি যখন এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই, তখন ভদ্রসমাজের, বিশেষতঃ ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের অনেক পুরুষ ও নারী কেবল আপনাদের উদারতা ও লোকহিতৈষণার প্রেরণায় দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া সাধ্যমত তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। এমন একটি দুইটি নয়, শত শত সহস্র সহস্র নরনারী এই পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং এখনও আছেন। আমাদের এ অনুষ্ঠান নাই বলিলেই চলে। আমাদের এ পুণ্য-প্রবৃত্তি ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু আমাদের দরিদ্রের উপচিকীর্ষা প্রধানতঃ ঘরে বসিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমরা মুষ্টিভিক্ষা দেই, কাঙ্গালি ভোজন করাই, যতটা দুঃখ ইহারা আমাদের ঘরে বহিয়া আনে তাহাতে আমরা কাঁদি কিন্তু আমরা তাহাদের ঘরে বসিয়া তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিতে পারি না, তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা জানিতে তাহাদের বাড়ীঘরে যাই না। তাই আমরা তাহাদের দুঃখের কথা জানি কম এবং অন্তরঙ্গভাবে ইহাদের জানি না বলিয়াই ইহাদের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ উপকার সাধন করিবার জন্য আমাদের কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারি না। আমাদের দান অনেক সময় অপাত্রে গিয়া পড়ে, আমাদের দয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারে না—তাহার কারণ আমরা ইহাদিগকে চিনি না।

ইংলণ্ডে ও ইউরোপ এবং আমেরিকায় দরিদ্র সমাজের হিতসাধনে যে সব শক্তি বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহার মধ্যে কথাসাহিত্যের স্থান খুব বড়। কথাসাহিত্য যে অত্যাচারিতের অত্যাচার নিবারণে কতদূর শক্তিমান হইতে পারে তাহার একটা বৃহৎ দৃষ্টান্ত—Uncle Tom's Cabin, Tolstoy, Gorki প্রভৃতির উপন্যাসের দ্বারাই রুষের বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডে

ঠিক এমন এক আধখানা গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা কঠিন। কিন্তু Dickensএর অপূর্ব্ব প্রতিভা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহার ধারা বহু প্রতিভাবান লেখক অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণের ভিতর দরিদ্রজীবনের দুঃখ ও দুর্দ্দশার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা কালে কালে হইয়াছে সে সব সম্ভব করিয়াছে। Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Old Curiosity Shop প্রভৃতি নানা গ্রন্থে Dickens দরিদ্রজীবনের যে করুণ চিত্র তাঁহার অমর তুলিকায় আঁকিয়া গিয়াছেন তাহা ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের বাহিরে সহস্র সহস্র নরনারীর চিত্ত ইহাদের প্রতি করুণায় দ্রব করিয়াছে। Dickens ও তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা যে এই সব চিত্র এত হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী করিতে পারিয়াছেন, তাহার কারণ অবশ্যই তাঁহাদের লোকাতীত প্রতিভা, কিন্তু সে প্রতিভার সঙ্গে, এই সব শ্রেণীর জীবন ও চিন্তাধারার সম্বন্ধে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার সংযোগ হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের এসব চিত্র নিদারুণ সত্যানুসারিতার গুণে একেবারে পাঠকসাধারণের মর্ম্মে গিয়া পৌঁছিয়াছিল।

আমাদের দেশে যাঁহারা কথাসাহিত্য লেখেন তাঁহাদের দরিদ্রজীবনের এ অভিজ্ঞতা নাই। এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য যে নিষ্ঠা ও কঠোর ত্যাগের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের নাই। তাই সহানুভূতি সত্বেও তাঁহারা দরিদ্রজীবনের করুণ মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আঁকিতে পারেন না। যে প্রতিভাশালী লেখক আমাদের জাতীয় জীবনের এই তমসাচ্ছন্ন অবজ্ঞাত অংশের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া তাহার সকল অন্ধকার গহ্বর উজ্জ্বল করিয়া লোকচক্ষে ফুটাইয়া তুলিবেন তাঁহাকে আমাদের আভিজাত্যের কঠোর বর্ম্মখানি ফেলিয়া একেবারে মিশিয়া যাইতে হইবে—দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে—মুক্ত সামান্য মানব অন্তর পাতিয়া তাঁহার ইহাদিগের জীবন ও চিত্তের সহজ ছাপ আপনার চিত্তের ভিতর তুলিয়া লইতে হইবে—তবেই তিনি ইহাদের জীবনের নির্ম্মম কারুণ্য পরতে পরতে খুলিয়া লোক-সমাজে প্রচার করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশ, সমগ্র ভারত, সমগ্র জগতের মানব সমাজ সেই প্রতিভাবান লোকোত্তর নিষ্ঠা ও চেষ্টাবান ঔপন্যাসিকের প্রতীক্ষা করিতেছে।

দরিদ্র পরিভূত জীবনের চিত্রে কথা-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিবার পথে আরও একটি গুরুতর অন্তরায়—আমাদের সাহিত্যের সুকঠিন ভব্যতা ও নীতিনিষ্ঠা। ভদ্রসমাজের বাহিরে যে জীবন তাহা ভব্য নহে ; এই সব সমাজের নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান ঠিক আমাদের মত নয়। সুতরাং ইহাদের জীবনের সত্য পরিচয় দিতে গেলে, ইহাদিগকে ভাল করিয়া জানিতে গেলে, আমাদের যে বিবরণ উপস্থিত করিতে হইবে তাহা কি ভাবে, কি ভাষায় অনেক স্থলেই ভব্য হইবে না। ইংলণ্ডে ইং ১৮৩৪ সালে Poor Law অনুযায়ী কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিশনের সভ্যগণ নানা-স্থানে নানাবিধ অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া অনেক লোকের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে ১৯২৫ সালেও দরিদ্র জীবন সম্বন্ধীয় এমন অনুসন্ধানের

প্রয়োজনীয়তা কেহ অনুভব করেন নাই। তেমন অনুসন্ধান যদি কোনও দিন কেহ করে তবে দেখা যাইবে যে, ঠিক ইংলণ্ডের ভাবে না হউক, অন্যভাবে আমাদের দেশের দরিদ্র সমাজে কেবল অর্থাভাবের দৈন্য নাই, তাহার চেয়ে বেশী আছে নৈতিক দৈন্য। Poor Law Commissionerএরা দরিদ্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ভদ্র সমাজের ভিতর নীতিধর্ম্মের যে আদর্শ ও নিয়ম সম্মানিত, দরিদ্রের ঘরে অনেক স্থলে তাহার ছায়া মাত্রও নাই—তাহাদের নৈতিক আদর্শ, জীবনের নিয়ামক ধারণা ও তাহাদের চিত্তের ভাষা উন্নত সমাজ হইতে বহুপরিমাণে ভিন্ন। তাঁহাদের সম্মুখে একজন বলিয়াছিলেন—

"A person must converse with paupers—must enter work-houses and examine the inmates—must attend at the parish pay-table before he can form a just conception of the moral debasement...... .....he must hear the pauper threaten to abandon his wife and family unless more money is allowed him—threaten to abandon an aged bed-ridden mother, to turn her out of his house and lay her down at the overseer's door unless he is paid for giving her shelter; he must hear parents threatening to follow the same course with regard to their sick children; he must see mothers coming to receive the reward of their daughters' ignominy, and witness women in cottages quietly pointing out, without even being asked, which are their children by their husband and which by other men previous to marriage"

এ চিত্র ইংলণ্ডের, এ দেশের নয়। আমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া বলিবেন আমাদের এ ধর্ম্মের দেশে এমন কদাকার ব্যভিচার সম্ভব নয়। একথা আংশিক ভাবে সত্য। অনেক বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অনেক ব্যভিচার যাহা ইংলণ্ডের দরিদ্র সমাজে দেখা যায় তাহা হয় তো এদেশে তত নাই। কিন্তু দরিদ্র জীবনের সঙ্গে নিকট পরিচয় করিবার সামান্য চেষ্টা করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের দরিদ্রজীবন সম্বন্ধে যদি সম্যক আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া আমাদের অভিজাত সমাজ যে দেশের কোটি কোটি নরনারীকে মনুষ্যত্বের সহজ অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ফলে যে তাহারা শুধু অনশনে ক্লেশ পাইতেছে, দুঃখদারিদ্র্যে জর্জ্জরিত হইয়া জীবনের একটা তুচ্ছ অভিনয় মাত্র করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা অনেক পরিমাণে হারাইয়াছে ধনসম্পদের চেয়েও যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাহাদের ধর্ম্ম, হারাইয়াছে আত্ম-সম্মান। নানা আকারে পাপ তাহাদের সমাজে বীভৎস ভাবে বিচরণ করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত তাহারা পাপের সঙ্গে বসবাস করে—এ কথা মনেও ভাবে না যে তাহা পাপ। তাহাদের চিত্তের অনেকগুলি সুকুমার অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাই তাহাদের ভাষা রূঢ় ও ভদ্রসমাজের অশ্রাব্য, তাহাদের চিন্তা ও ভাব নীতিবিগর্হিত, তাহাদের জীবনের সমস্ত আবেষ্টন একটা দুরপনেয় হীনতায় ভরা।

যে সত্যনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ইহাদের সত্য জীবনের নিখুঁত ছবি আঁকিতে যাইবেন তাঁহাকে ভব্যতার সঙ্কোচ অনেকটা পরিত্যাগ করিতে হইবে, পাঠকদের অ-ভব্যতার প্রতি যে উৎকট বিরাগ তাহা অতিক্রম করিতে হইবে, এমন জীবন আঁকিতে হইবে, এমন কথা শুনাইতে হইবে যাহাতে পাঠক সমাজের সুরুচি হয় তো হাহাকার করিয়া উঠিবে।

যদি লেখক ইহাতে কুণ্ঠিত হন, পাঠক যদি ইহাতে সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন, তবে এপথে তাঁহার না যাওয়াই ভাল। কিন্তু যদি ইহাদের জীবন ও চিত্তের সত্য পরিচয় পাইতে হয়, লোক-হিতের চেষ্টা যদি সম্যক্ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে এসব গল্পের আবেষ্টন যাহা হইবে, তাহাতে ধর্ম্মনীতি ও রুচির উপর কঠোর আঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। Maxim Gorki রুসের অবনত শ্রেণীর জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে অনেকের নাসিকা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের দেশের যে ঔপন্যাসিক দরিদ্রের কথা লিখিবেন তাঁহার লেখা Gorkiর চেয়ে অধিকপরিমাণে নীতি ও রুচি সুরভিত হইবে না।

কিন্তু এ কথাটা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট করা আবশ্যক যে, সমাজের অত্যাচার, দারিদ্র্যের পীড়ন, যে কেবল দরিদ্রকে অন্নহীন করিয়াছে ইহাই সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ নয়—তাহা ইহাদের আত্মার বিনাশ সাধন করিয়াছে; এবং আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা কেবল ইহাদের অন্নদান নয়, ইহাদের নৈতিক অভ্যুদয় সাধন।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জীবনের ভিতর যাহা কিছু রমণীয় যাহা কিছু মহৎ তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাদের নৈতিক অধোগতি অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা পশু নয়। ইহাদের ভিতরও ভগবান বহুরূপে বিচরণ করিতেছেন, ইহাদের ভিতরও ধর্ম্ম-বীরত্ব ও চরিত্র-গৌরব অনেক তুচ্ছ ঘটনায় নিয়ত পরিস্ফুট হইতেছে। ইহাদের জীবন ও চরিত্রের সেদিক নিপুণ তুলিকায় না ফুটাইয়া তুলিলে লেখকের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। দীন দরিদ্রের জীবনে যে মহত্ত্বের নিত্য পরিচয় দেখা যায় তাহা অনুভব করিতে হইলে বিশাল অন্তর ও কল্পনার বিরাট প্রসার থাকা আবশ্যক। বর্ম্ম-চর্ম্ম নহিলে যাহার চক্ষে লোকে বীর হয় না, কর্ণার্জ্জুনের কথা নহিলে যাহাদের অন্তরে প্রশংসা ধ্বনিত হইয়া উঠে না, রামসীতার প্রেম নহিলে যাহাদের অন্তরে প্রেমের গৌরব অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয় না তাহাদের এ স্থানে অধিকার নাই। যাহার অন্তরে সৌকুমার্য্যের অনুভূতি এত পরিণত হইয়াছে যে প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছ অশ্রদ্ধেয় ঘটনার ভিতর মানব-চরিত্রের গৌরব অনুভব করিয়া উৎফুল্ল হইতে পারে, দরিদ্র ভিখারিণীর প্রেম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয়ে যাহার অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠে, Crossing sweeperএর কবিতায় যে অপরূপ মহানুভবতার দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, দীন দরিদ্রের জীবনে যে সেই সৌন্দর্য্য, সেই ঔদার্য্য, সে গৌরব দেখিতে পারে তেমন দরদী লেখক ছাড়া কাহারও দরিদ্রের জীবনের ভিতর নজর দিবার অধিকার নাই। অন্যের চোখে ইহার মলিন আবেষ্টন ও নীচতার আবহাওয়ার ভিতর অপরূপ

রসের খনি ধরা পড়িবে না। এই যে শক্তি, সাধারণের ভিতর অসাধারণ কঙ্কালের ভিতর মহামূল্য মণি, নীচের ভিতর মহৎ, দরিদ্রের ভিতর ভগবানকে বুঝিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার দরিদ্র-জীবন হইতে রস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ-প্রয়াস। দীন দরিদ্রের তুচ্ছ জীবনের ভিতর নীরব ধর্ম্মের গৌরবময় মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল একটি ভিখারিণীর মেয়ের জীবনে—সেকথা আমি লিখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এইরূপ অভিজ্ঞতার ফল আধুনিক যুগের অবনত শ্রেণীর জীবন সংশ্লিষ্ট কথাসাহিত্য। ইহার সম্বন্ধে Walt Whitman লিখিয়াছেন,—

"Heroism steps forth from the tent of Achilles; chivalry descends from the armgaunt charger of the knight; loyalty is seen to be no mere devotion to a dynasty. None of these high virtues are lost to us. On the contrary, we find them everywhere. They are brought within reach in stead of being relegated to some remote region in the past or deemed the special property of privileged classes. The engine driver steering the train at night over perilous viaducts, the life-boat man, the member of a fire brigade assailing houses toppling to their ruin among flames; these are found to be no less heroic than Theseus grappling the Minotaur, in Cretan labyrinths. And so it is with the chivalrous respect for womanhood and weakness, with the loyal self-dedication to a principle or cause, with the comradeship uniting men in brotherhood, with passion fit for tragedy, with beauty shedding light from heaven on human habitations. They were thought to dwell far off in antique fable or dim mediaeval legend. They appear to our fancy clad in glittering armour, plumed and spurred, surrounded with the aureole of noble birth. We now behold them at our housedoors, in the streets and fields around us.............This extended recognition of the noble and the lovely qualities in human life, the qualities upon which pure art must seize is due partially to what we call democracy. But it implies something more than the word is commonly supposed to denote—a new and more deeply religious way of looking at mankind, a gradual triumph, after so many centuries, of the spirit which is Christ's, an enlarged faculty for piercing below externals and appearnces to the truth and essence of things."

বাঙ্গালার, ভারতের আজ সে দিন আসিয়াছে যখন আমাদের সব দিক দিয়া আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া, যাহাকে নীচ বলিয়া এতদিন আমরা বর্জ্জন করিয়াছি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে হইবে। এখন আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, যে জাতিকে আমরা উঠাইতে চাই যাহাকে জগতে আবার বরণীয় করিতে স্পর্দ্ধা করি তাহাদের বেশির ভাগ ওই কোটি কোটি পরিভূত মানবের ভিতর রহিয়াছে। উহাদের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ সাধন করিতে হইবে, উহাদের জীবন জানিতে হইবে, উহাদিগকে টানিয়া তুলিতে হইবে, উহাদের পেটে অন্ন দিতে হইবে, জীবনে আনন্দ সঞ্চারিত করিতে হইবে, আর সর্ব্বোপরি উহাদের অন্তরে সুপ্ত পরমাত্মাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

আজ সকালে আমি একখানা বই পড়িতেছিলাম, Genevaর International Labour

officeএর প্রকাশিত। পাশ্চাত্য সমুদয় শ্রমজীবিদের হিতার্থে যে সকল আইন হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। বইখানা পড়িয়া আমার মনে হইতেছিল যে, সেই সব দেশে দরিদ্র শ্রমজীবির অবস্থার উন্নতির জন্য কেবল রাজবিধির দ্বারাই কত নূতন অনুষ্ঠান নিয়ত হইতেছে—এমন সব ব্যবস্থা হইতেছে যাহা আমাদের দেশে চিন্তা করিতেও ভরসা হয় না। আর আমরা এখনও বসিয়া আছি, দরিদ্রের জীবন সম্বন্ধে কি গভীর অজ্ঞতা কি হিমালয়ের মত প্রচণ্ড ঔদাসীন্য লইয়া। এই ঔদাসীন্য লইয়া জাতির অধিকাংশকে এমন ভাবে নিরন্তর নিপীড়িত করিয়া আমরা স্বরাজ লাভের স্পর্দ্ধা করিতেছি। আমার মনে হইল যে যুগ যুগান্তর ঔদাসীন্য ও অত্যাচারে আমরা দরিদ্রের অশ্রুর যে প্রবল বৈতরিণী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি তাহার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য আমাদের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে দরিদ্রের ভগবান প্রসন্ন হইবেন না, ইতিহাসের আদিযুগে ভারত যে গৌরবের সৌভাগ্য বিশ্ববিধাতার অযাচিত দান স্বরূপে লাভ করিয়াছিল, এ অভিশপ্ত দেশে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। বঙ্গবাসীর দ্বারে আজ সেই প্রায়শ্চিত্তের অবসর আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাঙ্গলার প্রত্যেক সন্তানকে আজ সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, শক্তি ও সাধনা অনুসারে এই বিরাট প্রায়শ্চিত্তে যোগ দিতে হইবে, দরিদ্রকে অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিয়া শ্রদ্ধা দিয়া, সেবা দিয়া তাহাকে বরণ করিতে হইবে।

বঙ্গবাণীর যাঁহারা সেবক তাঁহাদেরও দৃষ্টি এদিকে ফিরিবে না কি? কত দিন দরিদ্রের ঘরে ভগবান তাঁহাদের সেবায় বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে "এবার ফিরাও মোরে" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একটা বৃহত্তর বাণীর আহ্বানে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। অগ্নিময় সুধাময় উদ্দীপনা তাঁহার বাণী—তিনি দরিদ্রের জীবনের ছবি বাঙ্গালীর চক্ষে তুলিয়া ধরিলে, ঘরে ঘরে নিদারুণ আত্মতিরস্কার হাহাকার করিয়া উঠিত, সেবার উৎসাহে বাঙ্গালী আকুল হইয়া অগ্রসর হইত। সে বাণী আজ বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত, পৃথিবীর দিক হইতে দিগন্তে তাহা ধ্বনিত হইতেছে—তাহাতে আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি জগৎ সমৃদ্ধ হইয়াছে, দরিদ্রের দুর্ভাগ্য, সে তাহাতে উপকৃত হইতে পারে নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি তো শুধু তাঁহার নিজের নয়, বাঙ্গালীর। তাঁহার পূত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাঁহারা বঙ্গবাণীর সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে এ প্রতিশ্রুতি অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ সৃষ্টি করিয়াছে। কথা-সাহিত্যে তাঁহার কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে তাঁহার উৎসাহের বাণী প্রদীপ্ত করিয়া আহিতাগ্নিকের মত তাঁহাদের সে অগ্নির সেবা করিবার জন্য আমি নির্ব্বন্ধের সহিত অনুরোধ করিতেছি। বাগেদবীকে কমলবনের সৌরভ ছাড়িয়া প্রাসাদের সৌভাগ্য বেষ্টন ছাড়িয়া দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিতে হইবে। দরিদ্রের অশ্রুবিন্দু দিয়া মালা গাঁথিতে হইবে, তাহার মলিন জীর্ণ বসনের অন্তরালে সুগুপ্ত মহিমোজ্জল

আত্মার সন্ধান করিতে হইবে, দেশবাসীর চক্ষের সম্মুখে দরিদ্রকে তুলিয়া ধরিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিতে হইবে——

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
যাদের ক'রেছ অপমান
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মিলন গীতি

এ কেমন,—হ'লো আহা মরি-মরি,
আজিকে—তোমার সাথে আমার মিলন
ছড়িয়ে গেল ভুবন ভরি'।
এ মিলন—দেখ্‌ছি সবার মনে মনে
গগনে—মাঠে ঘাটে বনে বনে
রাজিছে—দিশি দিশি দেশে দেশে
আলিঙ্গনের রূপটি ধরি'॥
আজিকে—সুরের সনে বাণীর মিলন কানে বাজে
সুষমার—রূপের সাথে রঙীন মিলন চোখে রাজে।
মাধুরীর—মিলন হলো রসের সনে
আদরের—মিলন হলো যশের সনে,
ভকতির—মিলন আজি পূজার সাথে
দেউল বেদীর সোপান'পরি।
আজিকে—ঢেউয়ের সাথে ঢেউয়ের মিলন গলাগলি,
পাখীরা—ছায়ায় মিলে তাহাই করে বলাবলি।
সমীরণ—গন্ধসনে আজকে মিলে,
এ মিলন—রটিয়ে বেড়ায় এই নিখিলে,
তৃতীয়ার—চাঁদ যেন আজ নীল যমুনায়
দ্যুলোক ভূলোক মিলন তরী।

শ্রীকালিদাস রায়

হিন্দু রাষ্ট্রের সমর বিভাগ *

সার্ব্বভৌমের শক্তিযোগ

(১)

"শ্রেণী"-স্বরাজে হিন্দু নরনারীর শক্তিযোগ দেখিলাম। চোলমণ্ডলের পল্লী-স্বরাজে হিন্দু শক্তিযোগ দেখিয়াছি, আর পাটুলিপুত্রের ত্রিশ মাতব্বরকে ভারতীয় শক্তিযোগেরই প্রতিমূর্ত্তি সমঝিয়াছি। আবার সঙ্ঘ পরিচালনায় রাজ-নির্ব্বাসনে চের-চোল-পাণ্ড্য দেশের "প্রতিনিধিতন্ত্রে"ও হিন্দুজাতির শক্তিযোগ স্পর্শ করিয়াছি।

এইবার সেই শক্তিযোগের অন্যান্য মূর্ত্তির সম্মুখীন হইব। স্বরাজ-স্বাধীনতা ইত্যাদির কর্ম্মক্ষেত্র এই হিন্দুশক্তি সাধনার একমাত্র সাক্ষী নয়। হিন্দু নরনারীর শক্তিযোগ সাম্রাজ্যের বা রাজ্যের শাসনেও মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। কেন্দ্রীকরণ, ঐক্যস্থাপন, সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি কর্ম্মের ক্ষেত্রেও হিন্দু নরনারীর ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইত।

স্বরাজ গঠনে যে ধরণের ব্যক্তিত্ব আবশ্যক হয় সাম্রাজ্য গঠনের ব্যক্তিত্ব ঠিক তাহার উল্টা! স্বরাজ চায় বহুত্ব, একসঙ্গে বহু কেন্দ্রের স্বাধীনতা, বহু ব্যক্তির আত্মকর্ত্তৃত্ব, বহু জনপদের স্বাতন্ত্র্য। সাম্রাজ্যের ঝোঁক বিপরীত। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রগুলাকে এক আইনকানুনের তাঁবে আনাই সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরগণের লক্ষ্য। অনেকের বহুমুখীনতা খর্ব্ব করিয়া তাহাদের ভিতর ঐক্য-বদ্ধতার রস সঞ্চার করাই সাম্রাজ্যবাদীদের সাধনা।

(২)

এই সাধনায় রোমানরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা বা ঐক্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাকে বলে "পাক্স রোমাণা" অর্থাৎ "রোমাণ শান্তি"। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা বর্ত্তমান যুগের ইংরেজ জাতিরও গৌরব। "পাক্স্ বৃটানিকা" বা "বৃটিশ শান্তি" নামে সেই সিদ্ধিলাভের কথা সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

সেই ঐক্য, সামঞ্জস্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলার যশ হিন্দুশক্তিধরগণের ইহিতাসেও জগদ্বরেণ্য। যে সকল দিগ্‌বিজয়ী ভারতসন্তান যুগে যুগে সুবিস্তৃত জনপদের নরনারীকে নানা বৈচিত্র্যের আব-হাওয়ায় ও একমুখী হইয়া "সমগ্রের" কথা চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দুসাহিত্যে "সার্ব্বভৌম" নামে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চক্রবর্ত্তী উপাধিতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সর্ব্বত্র তাঁহাদের রথের চাকা চলিত। তাঁহারা "চাতুরন্ত" নামেও পরিচিত ছিলেন। জগতের চার সীমানায়ই এই সকল সর্ব্বভৌমের প্রভাব জারি ছিল এইরূপ বুঝানো হইত। সার্ব্বভৌমের

* "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

শক্তিযোগে দুনিয়ায় যে শান্তি, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল ল্যাটিন পারিভাষিকের নজিরে তাহাকে "পাক্স্ সর্ব্বভৌমিকা" অর্থাৎ "সার্ব্বভৌমিক শান্তি" বলিতেছি।

(৩)

"দুনিয়া" "জগৎ" ইত্যাদি লম্বা লম্বা শব্দ কায়েম করা যাইতেছে। সেকালের ইয়োরোপীয়ানরা "বিশ্ব-শান্তি" বলিলে তাহাদের সুপরিচিত জগতের টুকরা টুকুকেই "সারা সংসার" বুঝিত। হিন্দুদের সার্ব্বভৌমের বিশ্ব-শান্তি বোলও ঠিক এই মাত্রার জগৎ-কথাই বুঝাইত। দুনিয়ার যতটুকু জানা ছিল বা বশে ছিল সেইটুকুই "গোটা জগৎ"।

আর এক কথা। বাস্তব জগতে রোমাণ সাম্রাজ্য বড় বেশী দিন টিঁকে নাই। তথা কথিত "রোমাণ শান্তি" মাল জগতের নেহাৎ কম ঠাঁইয়েই জানা ছিল। শান্তির বদলে অশান্তিই ইয়োরোপের প্রদেশে প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় বিরাজ করিত। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের যে কোনো ইয়োরোপীয়ান মানচিত্রে তাহার সাক্ষ্য অনেক। হিন্দু সার্ব্বভৌমিকদের বিশ্ব-শান্তিটার দৌড় বুঝিবার সময়ও বাস্তব জগৎটার কথা মনে রাখা আবশ্যক! প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই মৌর্য্য, গুপ্ত, বর্দ্ধন, পাল বা চোল সাম্রাজ্য নয়।

ইংরেজপণ্ডিত উল্ফ প্রণীত বার্ত্তোলুস নামক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আইন পণ্ডিত বিষয়ক গ্রন্থে (কেম্ব্রিজ ১৯১৩) রোমাণ বিশ্ব-শান্তির "ভিতরকার কথা" সহজেই বাহির করা চলে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ভারতীয় ঐক্য নামক ইংরেজী গ্রন্থের (লণ্ডন ১৯১৪) "সাহিত্য" এবং "লিপি" ঘটিত প্রমাণগুলাও বাস্তবের কষ্টি পাথরে ঘষিলে অনেক "কুলের খবর" বাহির হইয়া পড়িবে। তথা কথিত ঐক্য, শান্তি, সাম্রাজ্য ইত্যাদির আসরে হিন্দুরা যে ইয়োরোপীয়ানদেরই "মাসতুত ভাই" তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

যাহা হউক "পাক্স্ রোমাণা" দরের "সর্ব্বভৌমিক শান্তি" হিন্দুশক্তি যোগের কোষ্ঠীতেও ছিল। সেই শক্তিযোগের যন্ত্র গুলা, এক কথায় সাম্রাজ্য শাসন হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন বিষয়ক গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নাই।

সমর-দক্ষতায় হিন্দু নরনারী

রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের শাসনে অন্যতম,—বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান,—খুঁটা হইতেছে সমর বিভাগ। হিন্দু মতে "বল" রাজ্যের সাত "অঙ্গে"র এক এক "অঙ্গ"। সমর বিভাগের শাসনে হিন্দুজাতির দক্ষতা যুগে যুগে দেখা গিয়াছে। সামরিক শক্তিযোগ হিন্দু চরিত্রের বাস্তব ইতিহাসে ভিত্তিস্বরূপ "বল"-প্রয়োগের বিদ্যা এবং কলা ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের অনেক রসদ জোগাইয়াছে।

(১)

ইয়োরোপের মতন ভারতেও "মাৎস্য ন্যায়" প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লড়াই স্বাধীন

যুগের হিন্দুজীবনের স্বধর্ম্ম। সমর বিভাগে প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বল-প্রয়োগের কারবারে ভারতের জনসাধারণ সর্ব্বদাই পাকিয়া উঠিবার সুযোগ পাইত।

ভারতবাসীরা বিদেশীদের সঙ্গেও লড়িয়াছে। সেই লড়াইয়ে জয়লাভ করা হিন্দু জনগণের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই সময়ের ভিতর ভারত সন্তান অন্ততঃ পক্ষে চারি বার বিদেশী শত্রুকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে।

এশিয়ামাইনরের দোআঁসলা গ্রীক হেলেনিষ্টিক রাজা সেলিউকস হিন্দুর সামরিক শক্তি-যোগের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৩ সালে। আফগান মুল্লুকের দোআঁসলা গ্রীক হেলেনিষ্টিক নরপতি মেনান্দার বা মিলিন্দকে হিন্দুরা ১৫৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পরাজিত করে। এই গেল মৌর্য্য এবং সুঙ্গ বংশের শক্তিযোগের সাক্ষী।

পরবর্ত্তী কালে মধ্য এসিয়ার হুণ জাতিও হিন্দু জাতির সামরিক শক্তিযোগের ক্ষমতা চাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪৫৫—৪৫৮ সালে স্কন্দগুপ্ত ইহাদের গতিরোধ করেন। ৫২৮ সালেও আর একবার হুণেরা হিন্দুজাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র স্বদেশী লড়াইয়েই হিন্দু-পল্টন ওস্তাদ ছিল এমন নয়। বিশ্বশক্তির মাপকাঠিতেও ভারতের জনসাধারণ সামরিক জীবনের দক্ষতা যাচাই করাইতে অভ্যস্ত ছিল। জীবনযুদ্ধের আখড়ায় দাঁড়াইয়া হিন্দু-সেনাপতিরা বিদেশী রণ-নায়কগণকে পাঁয়তারায় ঢিট্ করিতে জানিতেন।

ঘরেবাইরে লড়িবার জন্য হিন্দু জাতিকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত। কোথায় আফগানিস্থান, কোথায় মধ্য এশিয়া, এই সকল সুদূরস্থিত জনপদেও ভারতের উত্তর সীমানা মাঝে মাঝে গিয়া ঠেকিয়াছিল। ভারতের নরনারীকে সেই সকল দেশের দুর্গরক্ষায় এবং স্বাধীনতা রক্ষায় পল্টন পাঠাইতে হইত।

আবার ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জও ভারতীয় রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সকল দ্বীপ-দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও ভারতের নারী-কুল নিজ নিজ সন্তান পাঠাইতে জানিত।

কি স্থলে, কি জলে,—উভয় কর্ম্মকেন্দ্রেই যুবকভারতের ডাক পড়িত। পল্টনকে অস্ত্র-চালনায় এবং নৌচালনায় পাকাপোক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সার্ব্বভৌমগণের মাথা ঘামাইতে হইত। ভারতীয় সেনাপতিদের ঘাড়ে লোক বাছাই হইতে রসদ-জোগানো পর্য্যন্ত সমর বিভাগের নানা কাজ আসিয়া পড়িত। সামরিক আত্মকর্তৃত্ব, দেশ-রক্ষার দায়িত্ব, ফৌজের দলে সামঞ্জস্য এবং শৃঙ্খলাবিধান সবই হিন্দুসমাজের আবহাওয়ায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইত।

হিন্দু-লড়াই ধর্ম্মের গ্রীক সাক্ষ্য

(১)

একমাত্র কর্ম্ম-মণ্ডলই হিন্দু নরনারীর সামরিক শক্তিযোগের সাক্ষ্য দেয় এরূপ বুঝিতে হইবে না। ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে দার্শনিকরাও সমরজীবনের অনুকূল চিন্তাতরঙ্গ সৃষ্টি করিবার জন্য কলম ধরিতেন অথবা গলাবাজি করিতেন। সমরযোগ হিন্দুজীবনের এক বিপুল তথ্য।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক প্রণীত "আলেক্জান্দার-জীবনীতে" হিন্দুদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। সাব্বাস বা শম্বুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর আলেক্জান্দার কয়েক জন "তত্ত্বদর্শী" "গিম্নো সোফিস্ট" বা দার্শনিকের (হয়ত বা বামুন পণ্ডিতের) সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া ছিলেন। অন্যতম ভারতীয় দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল :—"আমার বিরুদ্ধে তুমি শম্বুকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলে কেন?" হিন্দু "তত্ত্বদর্শী" মহাশয়ের জবাব প্লুতার্কের কাহিনীতে নিম্ন রূপ :—"আমি চাহিয়াছিলাম যে শম্বু হয় সম্মানজনক জীবন যাপন করুক না হয় কাপুরুষের মতন মরুক।"

হিন্দু-নরনারী স্বদেশ সেবার জন্য এইরূপ দর্শনই শিখিত। এই ধরণের বোল্‌চাল কতকগুলা রামায়ণ মহাভারতের "কথা" মাত্র ছিল না। প্লুতার্কের সাক্ষ্য অনুসারে বিশ্বাস করিতে হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর হিন্দু-দার্শনিকেরা লড়াইধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন। আলেক্জান্দারকে এই সকল হিংসাধর্ম্মী "পুরুতঠাকুর" (?) "গুরুমশায়", "আচার্য্য" এবং অন্যান্য তত্ত্বদর্শীদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইতে হইয়াছিল। হিন্দু পল্টনের শক্তিযোগের পশ্চাতে ছিল এই সকল দার্শনিকদের "প্রপাগাণ্ডা" বা স্বদেশ-সেবার আন্দোলন।

হিন্দু দার্শনিকদের হিংসা-প্রপাগাণ্ডার কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্লুতার্কের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। যে সকল ভারতীয় রাজারাজড়া আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী না হইয়া স্বদেশ-দ্রোহীরূপে তাঁহার স্বপক্ষেই যোগ দিয়াছিল তাহাদিগের মুখে চুণকালি লাগানো ছিল সেকালের "বামুন-পণ্ডিত"দের দর্শন-চর্চ্চার অঙ্গ। দেশের লোককে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাড়াইয়া ও ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা ব্রতবদ্ধ হইয়াছিলেন। আলেকজান্দারকে হঠাইবার জন্য পাঞ্জাবের পল্লীতে পল্লীতে যে সকল সামরিক প্রয়াস ঘটিয়াছিল তাহার "আধ্যাত্মিক" আগুন অনেক পরিমাণে আসিয়া পৌঁছিত হিন্দু দর্শনের বাক্‌বিতণ্ডা হইতে।

আলেকজান্দারের গ্রীক পল্টন ভারতে আসিয়া যে হিন্দুদর্শন চাখিয়াছিল সেই হিন্দু দর্শন সামরিক শক্তিযোগ এবং হিংসাধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। কাজেই তাঁহার ভারতীয় শত্রুগণের মধ্যে আলেক্জান্দার হিন্দুদর্শনকে এবং হিন্দু দর্শনের প্রচারকদিগকে চক্ষুঃশূল বিবেচনা করিতেন। এই জন্যই প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আলেকজান্দার বহুসংখ্যক হিন্দু দার্শনিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। স্বদেশ-সেবার প্রয়াসে এবং সামরিক শক্তিযোগের প্রতিষ্ঠায় হিন্দু দর্শনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এমন জবর সাক্ষ্য বিদেশীর মুখে বেশী পাওয়া যায় না।

যাঁহারা হিন্দুচিত্তের সমর-পিপাসা এবং হিংসাযোগ বিষয়ক বাস্তব তথ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিতে বসেন তাঁহারা হিন্দুদর্শনের আলোচনায় অনধিকারী বিবেচিত হইবেন। অন্ততঃপক্ষে তাঁহাদের প্রচারিত হিন্দুদর্শন একদেশদর্শী, আংশিক এবং ভ্রমাত্মক থাকিতে বাধ্য।

হিন্দু ও মুসলমান

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থে বিবৃত যুগপরম্পরার শেষের দিকে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুর সংঘর্ষ ঘটে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে মুসলমানরা ভারতের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দু জাতি তাহাদের সঙ্গে প্রায় তিন শ বৎসর ধরিয়া সম্মুখ লড়াইয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গুর্জ্জর প্রতীহারেরা রণে ভঙ্গ দেয় নাই। বাংলার সেন বংশ ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরাজয় স্বীকার করে নাই। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের যাদব এবং চোল রাজারা কাবু হন। কাশ্মীরের স্বাধীনতা ১৩৩৯ সাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

প্রায় আড়াই তিন শতাব্দী ধরিয়া যে জাতি বিদেশীর আক্রমণ রুখিতে পারে তাহার সমর-যোগ এবং স্বদেশসেবা সম্বন্ধে সন্দেহ করা সম্ভব একমাত্র ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে। একমাত্র তাঁহারাই হিন্দুরাষ্ট্রের তথাকথিত অনৈক্য এবং হিন্দুসমাজের তথাকথিত "জাতিভেদ" এই দুই তথ্য ফুলাইয়া তুলিতে অভ্যস্ত।

মুসলমানরা যতদিন "বিদেশী" ছিল ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হিন্দুরাষ্ট্রের ধুরন্ধরেরা কতবার ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আলোচনায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাক্ষ্য সম্প্রতি আনিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু চরিত্রের দোষগুলাকে যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মোটা অক্ষরে ছাপাইয়া দুনিয়ার বাজারে বাজারে রটাইয়াছেন তাঁহাদের বাপ দাদাদের এবং স্বজাত ভায়াদের চরিত্রখানা আলোচনা করিয়া দেখা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গলার ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পশ্চিমাদের হিন্দুজাতি বিষয়ক মত বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে দেখিতে পাই। অথচ ইতিহাস-বিদ্যার তরফ হইতে সমসাময়িক পাশ্চাত্য চরিত্রের বিশ্লেষণ করা হয় নাই। কাজেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের "ব্যাখ্যায়" ভুল প্রবেশ করিয়াছে।

যে আড়াই তিন শ বৎসর হিন্দু নরনারী বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল সেই সময়ে এই সকল শত্রুই ইয়োরোপের নানাদেশে ইয়োরোপীয়ানদিগকে গোলাম করিয়া রাখে নাই কি? মার্কিণ স্কট প্রণীত "ইয়োরোপে মুরিশ সাম্রাজ্য" নামক গ্রন্থে (ফিলাডেল্‌ফিয়া ১৯০৪) কিম্বা ইয়ং প্রণীত "দেড় হাজার বৎসরব্যাপী পূর্ব্বপশ্চিমের লেনদেন" বিষয়ক গ্রন্থে

(লণ্ডন ১৯১৬) মুসলমানদের নিকট পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ানদের পরাজয়-কাহিনী বিবৃত আছে। "কেম্ব্রিজ মিডিহ্ব্যাল হিষ্টরি" নামক কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত মধ্যযুগ বিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও মুসলমানের ইয়োরোপ-দখল সনতারিকসমন্বিতভাবে দেখিতে পাই।

(২)

খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ইয়োরোপের মুসলমান অধ্যায় সুরু হয়। সিসিলি, দক্ষিণ ইতালি, স্পেন, মায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব ফ্রান্স পর্য্যন্ত মুসলমানদের গোলামি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গোটা ভূমধ্যসাগর সেকালে মুসলমানজাতির কৃতিত্বে "এশিয়ান সাগরে" পরিণত হয়। তখনকার দিনে ইয়োরোপীয়নরা, শ্বেতাঙ্গ নরনারী, খৃষ্টিয়ানরা "বিদেশী এশিয়ান" শত্রুদের বিরুদ্ধে "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইতে পারিয়াছিল কি? ইয়োরোপে ঐক্যবদ্ধতা কোথায়? অধিকন্তু তথাকথিত "জাতিভেদ" ত খৃষ্টিয়ানদের সমাজে নাই। তথাপি খৃষ্টিয়ানরা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদের মতনই মুসলমান শাসন হজম করিতে বাধ্য হয় নাই কি?

তাহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে তুর্ক-মুসলমানেরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে বাদশাহী করিয়া আসিতেছে। সেই বাদশাহীর জের আজও কিছু কিছু দেখিতে পাই। সেকালের খৃষ্টিয়ানরা তুর্কদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল কি? একালের ইংরেজ এবং জার্ম্মান তুর্কী সম্বন্ধে একমত কি? জার্ম্মান সমাজেও জাতিভেদ নাই। ইংরেজ সমাজেও ত জাতি ভেদ নাই। তথাপি এই সকল পাকা-গোঁড়া খৃষ্টিয়ান শ্বেতাঙ্গেরা এসিয়াবাসীর অধীনতা বা সাম্রাজ্য ইয়োরোপে সহিতেছে কি করিয়া? মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েম করিয়া খৃষ্টিয়ানরা খৃষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে ইয়োরোপের ইতিহাসে কতবার?

এই সকল তথ্য মাথায় রাখিয়া তবে নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাজ-বিদ্যার সেবকদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। দুনিয়ার মাপকাঠিতে হিন্দুজাতির সামরিক শক্তিযোগ অন্য কোন জাতির তুলনায় খাটো নয়। লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়া হিন্দু নরনারী নিন্দনীয় বিবেচনা করিত না। লড়াই না করাই পাপ এই ছিল হিন্দু সমরযোগের প্রাথমিক ভিত্তি। এই কথাটাই আলেকজান্দার হিন্দুদার্শনিকের মুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু পল্টনের বহর

(১)

এইবার দুনিয়ার মাপকাঠিতে হিন্দু সমরজীবন জরীপ করিব। প্রাচীন হিন্দুপল্টনের বহর মাপিবার পক্ষে সেকালের রোমাণ সমরবিভাগের তথ্যগুলা কাজে লাগিবে। ইংরেজ পণ্ডিত গ্রীণিজ প্রণীত "রোমাণ পাব্‌লিক লাইফ্" অর্থাৎ "রোমাণদের সরকারী বা সার্ব্বজনিক জীবন

কথা” নামক গ্রন্থে (লণ্ডন ১৯০১) সুপ্রাচীন কালের রাজা সাভিয়ুস তুলিয়ুস-প্রবর্ত্তিত সমর-বিভাগ বিবৃত আছে। সকল কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরবর্ত্তী যুগের কয়েকটী তথ্য দেওয়া যাইতেছে। বিলাতী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা বা বৃটিশ বিশ্বকোষ গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, ২২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রোমাণ “গণতন্ত্রের” স্বপক্ষে লড়াইয়ের মাঠে লড়িতেছেন ৬৫,০০০ সৈন্য। রোমে তখন ৫৫,০০০ ফৌজকে “রিজার্ভে” রাখা হইয়াছিল। দরকার হইলে শত্রুর বিরুদ্ধে এই সংখ্যা হইতে কিছু কিছু করিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া হইত।

গ্রীক ঐতিহাসিক পোলিবিয়ুস ২৬৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ১৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ১১৮ বৎসরের রোমাণ গণতন্ত্রের দিগ্বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কথা অনুসারে ২১৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রোমাণ পল্টনে ৩৮,৪০০ এর বেশী ফৌজ ছিল না।

রোমাণ গণতন্ত্রের ফৌজসংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায় কার্থেজের বীর হানিবালের বিরুদ্ধে লড়াই উপলক্ষে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৮ হইতে ২০২ পর্য্যন্ত ষোল বৎসর এই লড়াই চলিয়াছিল। দ্বিতীয় কার্থেজ-সমর নামে রোমের ইতিহাসে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ। সেই সময়ে সিপিও ছিলেন অন্যতম রোমাণ সেনাপতি।

সিপিওর অধীনে রোমাণ পল্টনের বহর কত বড় ছিল? রামজে প্রণীত “রোমাণ প্রত্নতত্ত্ব” (লণ্ডন ১৮৯৮) গ্রন্থে জানা যায় যে তখনকার রোমাণ সেনা কখনো ১৮, কখনো ২০ এবং কখনো বা ২৩ “লিজ্যানে” বিভক্ত ছিল। এক “লিজ্যান” সেকালে ৪,০০০ বা ৫,০০০ ফৌজে গঠিত হইত। এই সংখ্যার অধিকাংশই ছিল পদাতিক। ৩০০ কিম্বা ৪০০ ঘোড়সওয়ার এক এক লিজ্যানে থাকিত। অর্থাৎ ৭২,০০০ হইতে ১১৫,০০০ পর্য্যন্ত ছিল গণতন্ত্রের আমলে সর্ব্ববৃহৎ রোমাণ সেনা।

(২)

হিন্দু সেনাপতিরা এই সকল রোমাণ পল্টনকে অতি সহজেই পকেটস্থ করিতে অথবা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কেননা হিন্দু রাষ্ট্রে পল্টনের বহর ছিল খুব বড়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর অবসান কাল সম্বন্ধে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিসের সাক্ষ্য আছে। সাক্ষ্যটাকে “কিয়ৎ” পরিমাণে “চাক্ষুষ” বিবেচনা করা চলে। কিন্তু মেগাস্থেনিসের প্রদত্ত সংখ্যাগুলা কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও অন্যায় হইবে না।

যাহা হউক, মেগাস্থেনিস বলেন যে, দক্ষিণভারতের পাণ্ড্যদেশে রাজত্ব করিতেন নারীরা। এই দেশের পল্টনে ১৫০,০০০ ছিল পদাতিক আর হাতী-সওয়ার ছিল ৫০০। আরবসাগরের উপকূলস্থ গুজরাত দেশের রাজার তাঁবে পদাতিক ছিল ১৫০,০০০। তাঁহার ঘোড় সওয়ারের সংখ্যা ৫,০০০ এবং হাতী-সওয়ারের সংখ্যা ১,৬০০।

এই সময়েই গঙ্গা এবং হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী জনপদে যে রাষ্ট্র ছিল তাহার পল্টনে পদাতিক ছিল ৫০,০০০, ঘোড়সওয়ার ছিল ৪,০০০ এবং হাতী-সওয়ার ছিল ৪০০। সম্ভবতঃ উত্তর বিহার উত্তর বঙ্গ এবং পশ্চিম আসাম এই তিন প্রদেশের কথা বলা হইতেছে। এই সকল বৃত্তান্তে মৌর্য্য সাম্রাজ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

সেকালে হিন্দুনরনারীর সামরিক শক্তিযোগ জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। এই জন্য গ্রীক মহলে ভারতীয় রাষ্ট্রের সমর বিভাগ সম্বন্ধে গল্পগুজব রটিত অনেক। মেগাস্থেনিসের পূর্ব্বেও হয়ত কেহ কেহ ভারতীয় সেনাবিষয়ক এই সব সংখ্যা প্রচার করিয়া থাকিবেন।

(৩)

পরবর্ত্তী কালের গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক (খৃঃ অঃ ১০০), তাঁহার "আলেকজান্দার জীবনীতে" এক বিপুল পল্টনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পল্টনে ছিল ২০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ ঘোড়সওয়ার, ২,০০০ রথ, এবং ৩,০০০ বা ৪,০০০ হাতী-সওয়ার। পল্টনের অধিপতি ছিল গঙ্গা-ধৌত জনপদের গঙ্গারিদে এবং প্রাসী জাত। বোধ হয় সেকালের মগধরাষ্ট্রের কথা এই বৃত্তান্তে বুঝিতে হইবে। আলেক্জান্দারের সমসাময়িক বলিয়া মগধের নন্দ বংশই বিবৃত হইতেছে ধরিয়া লওয়া যায়। তখনও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরা মাত্র।

গঙ্গাধৌত জনপদের আর এক জাতি সম্বন্ধে খানিকটা সামরিক খবর পাওয়া যায়। এই জাতি গঙ্গারিদে কলিঙ্গি নামে উল্লিখিত। রাজধানী ছিল প্রোতালিস নগরে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমাণ বিশ্বকোষে,—"বৃহৎসংহিতা"-সদৃশ প্লিনি-প্রণীত "প্রাকৃতিক ইতিহাস" গ্রন্থে জানিতে পারি যে, কলিঙ্গওয়ালারা ৬০,০০০ পদাতিক, ১০০০ ঘোড়সওয়ার আর ৭০০ হাতী-সওয়ার সর্ব্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখিত। সেকালের উড়িয়ারা সমর-দক্ষ জাত ছিল বেশ বুঝা যায়।

(৪)

গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকেরা ভারতীয় ফৌজের সংখ্যা লইয়া কল্পনা এবং অত্যুক্তি কিছু কিছু চালাইয়াছিলেন কি না কে জানে? কোনো ভারতীয় রচনায় সে যুগের পল্টনের কোনো খবর পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি "শাস্ত্র"-সাহিত্য এবং রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি কাব্য-সাহিত্যের নজির বর্ত্তমান গ্রন্থে লওয়া হইতেছে না।

অধিকন্তু যে যুগের কথা বলা হইতেছে সে যুগের প্রমাণস্বরূপ একমাত্র কৌটিল্য-প্রণীত "অর্থশাস্ত্র" স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু এই গ্রন্থে পল্টনের বহর মাপিবার উপায় দেখিতে পাই না। নগর-শাসনের মতন সমর-শাসন সম্বন্ধেও "অর্থশাস্ত্র" নেহাৎ অসম্পূর্ণ।

ক্রমশঃ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

চিরন্তন

১

মাঠের মাঝখানে গোটাকতক বহুকালের মৃত্তিকা-প্রোথিত স্তূপের খনন কার্য্য চলছিল, আর আমাকে থাকতে হ'য়েছিল সেখানে পরিদর্শক রূপে। সুজলা সুফলা বাংলা দেশের মোহ কাটিয়ে এই জন-মানবহীন পরিত্যক্ত ঊষর ভূমিতে আসার সময় মন যে দ্বিধা ক'রেছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমারই চোখের সম্মুখে একদিন হয়ত' বহু-সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার অদ্ভুত দৃশ্য, তার অচিন্তনীয় প্রহেলিকা নিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, এই প্রলোভন আমাকে টেনে নিয়ে এসেছিল। তা নইলে হয়ত এই নিস্তব্ধ প্রান্তর-ভূমির অসহনীয় নির্জ্জনতাকে বরণ ক'রে নিতে পারতাম না।

একটা বড় বটগাছের ছায়ায় পড়েছিল আমার তাঁবু, আর বহু কুলি মজুরদের জন্যে ছোট ছোট খড়ের ঘর তৈরী করা হ'য়েছিল।

সমস্ত দিন চলত' খনন-কার্য্য আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে তা বন্ধ হ'য়ে যেত। তখন কুলীরা তাদের সেই কুটিরে ফিরে গিয়ে হাসিগল্প কলরব করত, আর তাদের খাবারের আয়োজনে লেগে যেত। আমার বাবাজী (এ দেশী বামুন ঠাকুর) তৎক্ষণে রান্না চড়িয়ে দিয়ে চাকরের সঙ্গে বসে তার ঘরকন্নার গল্প করত, আর আমি একটা আরাম কেদারা নিয়ে তাঁবুর বাহিরে ব'সে থাকতাম। এদের সবারই সুখ-দুঃখের কথা কইবার সঙ্গী আছে, দিনের পরিশ্রমের পর আনন্দ আছে। কিন্তু এদের মধ্যে রয়ে গেলাম আমিই একা। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে বাঙ্গলা দেশের একটি ছোট গৃহে আমার যে আনন্দকে ছেড়ে এসেছি, তারই কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা রাত্রে উপনীত হোত, এবং তাহার পর সহসা চমক ভেঙ্গে যেত বাবাজীর কঠিন স্বরে "চৌকা লাগা বাবুজী"।

সেই স্তূপ-গুলোর ভেতর থেকে বেরোচ্ছিল ছোট বড় নানা-রকম মূর্ত্তি। শিলালিপি, এবং বোধ করি দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার নানাবিধ মুদ্রা, তাম্রশাসন, মাটির বাসন, লোহার জিনিষ এবং ধাতুর পাত্র। আমার কাজ ছিল, এদের পরীক্ষা ক'রে তাদের সম্ভব—অসম্ভব একটা নাম দেওয়া, তারা কি প্রয়োজনে লাগত তার একটা কল্পনা করা, এবং আমার উপরওয়ালা সাহেবকে রিপোর্ট করা। মাঝে মাঝে সাহেব নিজেও আসতেন।

সে দিন খুঁড়তে খুঁড়তে বেরোলো আশ্চর্য্য এক শিলামূর্ত্তি। মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের। কিন্তু আমাদের জানা কোন দেবীমূর্ত্তি বলেই তাকে নিরূপিত করা চলে না। এই মূর্ত্তিটি আমাদের পুঁথিবদ্ধ বিধিনিয়মকে একেবারে ওলট পালট ক'রে দিলে। এর পা-দুটো কোনও আসনই রচনা করেনি, হাত সহজ মানুষের মত এবং মুখে কোনও দেব-ভাব নেই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এর চোখ দুটি, পাথরে খোদাই হ'লেও তাদের স্বচ্ছতা অসাধারণ, এবং মনে হয় যে তাদের দৃষ্টি যেন একেবারে

অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে মুহূর্ত্তে যাচাই করে নিতে পারে, কোন নিকষের গায়ে সোণার অপরূপ দাগটুকু অমর হ'য়ে থাকবে।

২

পুঁথিগত বিদ্যা পরাস্ত হ'য়ে গেল এই অপরূপ মূর্ত্তিটির কাছে—এর কোন নামই দিতে পারলাম না। রিপোর্ট অসম্পূর্ণ হ'য়ে প'ড়ে রৈল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার মন পথভ্রান্ত হ'য়ে ফিরতে লাগল সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টির চারিপাশে! একবার মনে হ'ল যে লিখি যে এ মূর্ত্তির কোন নাম নেই, এ নাম—গোত্রহীন বিশ্বের চিরন্তন প্রহেলিকা, জগতের অনাদি সুষমার স্থলপদ্মের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী আবহমান কাল থেকে—যখন বৌদ্ধযুগ আসেনি তার অনেক আগে থেকে এবং তার অনেক পরেও—এমন কি আজ পর্য্যন্তও। কিন্তু লেখা চললোনা, কারণ রিপোর্ট হয়ত সত্য হ'ত কিন্তু চাকুরী বোধ করি অটুট থাকতনা।

এর যেন একটা মোহ আছে, এঁকে ভুলে থাকতে পারিনে, ছেড়েও থাকতে পারিনে। কুলি-দের বল্লাম, এই মূর্ত্তিটা নিয়ে এসে আমার তাঁবুতে রেখে দে। তারা আমার তাঁবুতে এনে রেখে দিলে।

তারই কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গল চকিতে কার মৃদু করস্পর্শে। চেয়ে দেখ্‌লাম আমার বিছানার নিকটে একটা চৌকির উপর ব'সে রয়েছে, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী, যাকে দেখে আমার অপরিচিত বলে মনে হ'লনা, কিন্তু চিনতেও পারলেম না। চোখ দুটো ভাল ক'রে মুছে নিয়ে আবার দেখলাম, সেই মূর্ত্তি, মুখে মৃদুহাস্য, এবং হাওয়ায় তার অলক-গুলো মৃদু মৃদু দুলছিল। সমস্ত দেহ এবং মাথার আধখানি ঘিরে যে ওড়না ছিল, তাকে গুছিয়ে নিয়ে সে ভাল ক'রে বসে হেসে বল্লে, চিনতে পারনা?

তার সেই অপরূপ সুন্দর মুখের পানে আমি মুগ্ধের মত চেয়ে রৈলাম, কবে কোন পরিচয়ের আভাষ যেন পেতে লাগলাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না। বল্লাম না তোমাকে ত' চিনি না।

সুন্দরী উচ্চহাস্য ক'রে উঠল, বললে আশ্চর্য্য! তবে শোন একটা গল্প!

আমি গবর্ণমেণ্ট আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি, দিনে মাটি খোঁড়ার তত্ত্বাবধান করি, রাত্রে রিপোর্ট লিখি, এবং খাই দাই-ঘুমোই, দু-মুঠা অন্নের জন্য দেশ ছেড়ে এসেছি এই নির্জ্জন প্রান্তরে, আমার উপরে রাত দুপুরে একি জুলুম! কোথা থেকে এলো এই সুন্দরী, এবং তাকে চিনতে না পারলেও সে গল্প না বলে ছাড়বেনা! আবহমান কাল থেকে দুপুর রাত্রে মানুষ ঘুমিয়েই এসেছে—কিন্তু আজ আমার উপর একি দৌরাত্ম্য! কিন্তু উপায়ও ত' নেই। যে এই গভীর রাত্রে আমার অনুমতি পর্য্যন্ত না নিয়ে আমার তাঁবুতে এসে নিজের জায়গা দখল করে বসল, সে যে গল্প না শুনিয়ে যাবে, এমন দুরাশা করবার মত সাহস আমার ছিলনা। নিরুপায় হ'য়ে বল্লাম "বল"।

সুন্দরী বল্লে এই যে আজ দেখছো এই নির্জ্জন বনভূমি আর প্রান্তর, দু' হাজার বছর আগে এর কিছুই ছিলনা, তখন এ ছিল এক সমৃদ্ধ নগর, তখনকার বিখ্যাত এক বৌদ্ধ-বিহার।

আমি বল্লাম, সম্ভব।

যুবতী বল্লে, সম্ভব নয়, নিশ্চিত। আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এখানে ছিল প্রকাণ্ড এক বিদ্যালয় যেখানে দূর-দূরান্তর হ'তে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করতে আসত, এখানে ছিল, ভিক্ষু ভিক্ষুণী, শ্রমণ, শ্রমণা, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী, যাঁরা সংসারের মায়া, কাম এবং মোহ ত্যাগ ক'রে প্রভু বুদ্ধের পদতলে তাঁদের ইহকাল পরকাল সমর্পণ করেছিলেন। এই বিহারের সীমার মধ্য থেকে দূর হ'য়ে গিয়েছিল, নশ্বর চিন্তা, অর্থের লোভ, পার্থিব কামনা, এবং তার পরিবর্ত্তে দিবারাত্র উঠত প্রভুর করুণা-কণার জন্য আর্ত্ত হৃদয়ের আবেদন! শ্রমণ এবং ভিক্ষু-গণ অনায়াসে সংসারের তুচ্ছ সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে উঠে, তাঁদের ভক্ত হৃদয়কে ঢেলে দিয়েছিলেন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এবং নির্ব্বাণের চিন্তায়।

নন্দী যেমন নিঃশব্দে তার ওষ্ঠে অঙ্গুলি-স্পর্শে মহাদেবের কৈলাস থেকে বসন্তকে বিতাড়িত ক'রেছিল, তেমনি এই নগরীতে সমস্ত পার্থিব কামনা নিরুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

সেই বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দলের মধ্যে ছিল এক ভিক্ষুণী, নাম তার সুলেখা।

তার যৌবন আর রূপ এই নিরোধের আজ্ঞা মানলেনা—তারা দিন দিন অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। বসন্ত যেমন কারুর নিষেধ না মেনে, অপূর্ব্ব গন্ধ পুষ্প—সুষমা সম্ভারে পরিপূর্ণ-সুন্দর হ'য়ে ওঠে তেমনি! প্রভুর নাম-গানের সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে বেজে উঠত আরও একটা সুর। যার অনেকখানি মিলে যেত সেই গানের সুরের সঙ্গে, কিন্তু আরও খানিকটা বাজতে থাকত এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে, যা দুরাগত সঙ্গীতের মত মুগ্ধ ক'রে তাকে বিফল করে দিত।

সে আকুল হ'য়ে ডাক্‌ত, প্রভু একি, একি! উত্তরে দৈব-বাণীর মত তার কানে যেন আস্‌ত, সুলেখা, এও ছোট নয়, তুচ্ছ নয়!

৩

সেদিন সকালে স্নান সমাপন ক'রে সুলেখা যখন উঠল তখন তার মুখে প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মির কনক কিরণ এসে পড়ে, তাকে ঠিক যেন পদ্মের মত দেখাচ্ছিল। আপনার সিক্ত বসন সংযত করে যখন সে মুখ তুললে তখন দেখতে পেলে তার মুখের পানে চেয়ে র'য়েছে অপলক দৃষ্টিতে এক তরুণ ছাত্র, চিত্রসেন।

তাদের সেই চারি চক্ষুর মিলন হ'ল, সেদিনকার সেই প্রভাত-সূর্য্য-কিরণের অনবদ্য-আশীর্ব্বাদ আলোকের মাঝখানে!

মুগ্ধের মত অনেকক্ষণ স্থির থেকে চিত্রসেন তার সাজির মধ্য হতে পূজার জন্য আহরিত সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ফুলটি নিয়ে সুলেখাকে দিয়ে বল্লে, সুলেখা এই আমার উপহার।

সুলেখা তাকে মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করলে, তারপর আপনার বক্ষের নিভৃত-তম প্রদেশে রেখে দিলে চিত্রসেনের সেই রক্ত-উপহার।

তারপর চলতে লাগল দেবতার নগরীতে নর-নারীর তুচ্ছ প্রেমের খেলা। কত অপূর্ব্বরূপে কত অজানা ভঙ্গীতে! আকাশ গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করলে, বাতাসের গুমট কেটে গিয়ে মলয় বইল, অবাধ আনন্দে। পিকের রুদ্ধ কণ্ঠ খুলে গেল, এবং গাছে গাছে ফুটে উঠল ফুল তাদের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে!

প্রধান শ্রমণ বৃদ্ধ ধর্ম্মপাল তার পুঁথি হ'তে চোখ উঠিয়ে বল্লেন, ধর্ম্মের নগরীতে এ হ'ল কি!

৪

দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু মানুষকে চলেনা। এই অতি-গম্ভীর ধর্ম্ম-নগরীর ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যে চলছিল যে তুচ্ছ প্রেমের খেলা, তাও একদিন ধরা প'ড়ে গেল।

ধার্ম্মিক শ্রমণ, শ্রমণা, ভিক্ষু, ভিক্ষুণীগণ প্রভুর নামে এই পাপাচারীদ্বয়কে অভিসম্পাত করলেম। এবং তাঁদের ধর্ম্মানুষ্ঠান যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যে বারম্বার প্রার্থনা করলেন। প্রধান শ্রমণ এই পাপের গভীরতায় শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন, এবং অবিলম্বে সমুচিত শাস্তির জন্য পাপিষ্ঠদিগকে নগরপালের হাতে সমর্পণ করলেন। যে অনাচারী পাপিষ্ঠদ্বয় প্রভুর নাম নিয়ে ধর্ম্ম-নগরীতে এত বড় পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাদের দণ্ড চুড়ান্ত হওয়াই উচিত, এইজন্য নগরপাল স্বয়ং সম্রাটের কাছে তাদের দণ্ডাদেশ প্রার্থনা ক'রে লিখলেন!

মৃত্যু-দণ্ডের আশঙ্কা নিয়ে কিন্তু আনন্দে রৈল সুলেখা আর চিত্রসেন, নগরীর অবরোধ-গৃহে। মৃত্যু ত' একমুহূর্ত্তের, কিন্তু তারপর রৈল যে মৃত্যুহীন অমর জীবন!

গভীর রাত্রে নিঃশব্দে অবরোধ-গৃহের অর্গল খুলে গেল। চিত্রসেন বললে, সুলেখা চল আমরা যাই, যেখানে দু চোখ যাবে! প্রভুর আজ্ঞায় আজ মুক্ত হ'ল আমাদের অবরোধ!

সুলেখা বললে, কিন্তু মৃত্যু-দণ্ড!

চিত্র-সেন ব'ললে, মৃত্যু-দণ্ড-দাতার চেয়ে গরীয়ানের কাছ থেকে এলো আমাদের মুক্তির আদেশ, তাই আজ অবরোধের অর্গল খুলে গেছে। চলো।

সুলেখা বললে, চলো।

তখন তারা চললো মানুষের ধর্ম্মের নগরী ছেড়ে ঈশ্বরের অনন্ত-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে! আশ্চর্য্য তার দৃশ্য, আশ্চর্য্য তার আলো। পাখীর গান তাদের প্রত্যুদগমন করলে, আকাশের নীলিমা তাদের আনন্দ দিলে, প্রভুর আশীর্ব্বাদ তাদের মুক্তি দিলে।

যখন তারা পৌঁছল, লতাপাতাবৃক্ষ ঘেরা প্রকৃতির এক উদার উন্মুক্ত গৃহে, তখন এলো নগরপালের কাছে সম্রাটের ব্যর্থ মৃত্যু-দণ্ডাদেশ!

৫

সেই লতাপাতা ঘেরা বনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোল তাদের প্রেমের গৃহ! দিকে দিকে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল, পাখীরা নিশ্চিন্তে গান ধর্‌ল।

চিত্রসেন বল্‌লে, সুলেখা প্রভুকে ফাঁকি দিয়ে প্রভুর কাজ করা চলেনা! এই বন, এই উদার প্রকৃতি, এই নীল আকাশ, এই আশ্চর্য্য বনফুল, আর তার চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে সুলেখা এদের কি এই জগতে কোন সার্থকতা নেই, কোন প্রয়োজন নেই? এই আনন্দকে আমরা অস্বীকার করি ব'লে, আনন্দও আমাদিগকে অস্বীকার ক'রেছে! নিরানন্দকে নিয়ে প্রভুর চরণতলে পৌঁছান মিথ্যা, কিন্তু আনন্দকে নিয়ে তাঁ'র কাছে যাওয়াই সত্যিকার যাওয়া!

সুলেখা চুপ করে রৈল বটে, কিন্তু তাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল আনন্দ অন্ততঃ তাকে অস্বীকার করেনি!

চিত্রসেন বল্‌লে, সুলেখা, আমি বুঝিতে পারিনে কেন, মানুষে দিকে-দিকে ঈশ্বরের অসামান্য এই যে বিকাশ, এর প্রতি অন্ধ হ'য়ে, নিজে ভাঙ্গা-ঘর তৈরী ক'রে তার মধ্যে তাঁকে ধরে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস করে।

এমনি ক'রে কাটতে লাগলো তাদের দিন, ঈশ্বরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ-তলে। সেখানে তাঁর যে পূজা দিনের পর দিন চলতে লাগলো, তা' আকাশেরই মত নির্ম্মল, স্বচ্ছ!

চিত্রসেন বল্‌লে, সুলেখা, আমাদের এ প্রেম ত' আজকের নয়, এ প্রেম আমাদের অসীম, অনন্ত। একে আমি মূর্ত্তি দান কর্‌বো, আমার অন্তরের মাঝখানে প্রেমের যে রূপটি ব'সে গেছে তাকেই আমি বাইরে প্রকাশ কর্‌বো।

তখন চিত্রসেন আরম্ভ কর্‌লে তার প্রেমকে শিলায় মূর্ত্তিমান কর্‌তে। কত-দিন কত-রাত্রি সে কঠিন পরিশ্রম করার পর যে মূর্ত্তি গড়ে উঠ্‌ল। তা দেখে সুলেখা বল্‌লে, ওই বুঝি তোমার প্রেমের মূর্ত্তি! ও ত' সুলেখা!

চিত্রসেন হেসে বল্লে, সুলেখা, ও দুই-ই যে এক! অদ্ভুত সেই মূর্ত্তির দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল সুলেখা! যে মনের কথা সে এতদিন হয়ত' গোপন ক'রে এসেছে, তা ফুটে উঠল ঐ মূর্ত্তির মুখে, যে হাসিটি সে লজ্জায় হাসেনি, তা রৈল ঐ মূর্ত্তির ঠোঁটে, যে দৃষ্টি তার চোখে কচিৎ দেখা গিয়েছে, তা' হ'য়ে রৈল চিরন্তন ওই মূর্ত্তির চোখে!

এমনি ক'রে অনেকদিন কেটে যাওয়ার পর তাদের সেই কুঞ্জবনে উঠল ঝড়, আর সেই ঝড় বৃন্তচ্যুত করে গেল সেই বনের পুষ্প-রাণী সুলেখাকে! মৃত্যুর সময় সুলেখা বললে প্রভু, তুমিই ত' শিখিয়েছ যে প্রেম চিরন্তন, আর মৃত্যু তার শেষ নয়। তবে—?

চিত্রসেন চোখের জল মুছে বল্‌লে, তবে আর দুঃখ নেই। কিন্তু সুলেখা মনে থাকবে এ কথা?

মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের মত হেসে সুলেখা বল্‌লে, আমার মনে ত আর অন্য কোনও কথাই স্থান পায়নি।

৬

বিশ-বৎসর পরে সেই ধর্ম্মনগরীতে চিত্রসেন তার সেই শিলামূর্ত্তিটি নিয়ে ফিরে এল। তখনকার প্রধান শ্রমণ অনঙ্গ-পালের কাছে গিয়ে বল্‌লে, প্রভু, আমি চিত্রসেন, যার মৃত্যু-দণ্ডাদেশ হ'য়েছিল, আমি সেই দণ্ড গ্রহণ করতে এসেছি!

শ্রমণ বল্লেন, শুনেছি। তুমি চিত্রসেন?

চিত্রসেন বল্লে, আমিই চিত্রসেন।

শ্রমণ বল্লেন, আর ওই মূর্ত্তি?

চিত্রসেন বল্লে, সুলেখার।

শ্রমণ হেসে বল্লেন, অপরাধ স্বীকার করছ?

চিত্রসেন বল্লে, না। যদিও বা সেদিন স্বীকার করতাম, এই বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার পর আর করিনা। কারণ প্রেমের যে মহান্ পথ প্রভু দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, আমি সেই পথেই তাঁকে পূজা ক'রেছি।

শ্রমণ বল্লেন,—তবে দণ্ড কিসের?

চিত্রসেন বল্লে,—সুলেখা চ'লে গেছে তাই তার কাছে যতশীঘ্র পারি যেতে চাই।

শ্রমণ তাঁর আসন ত্যাগ করে উঠে চিত্রসেনের হাত ধ'রে বল্লেন, চিত্রসেন, আজ থেকে তোমার স্থান হোল আমার চেয়েও উর্দ্ধে! সত্যিকার পূজো তুমিই ক'রেছ চিত্রসেন, আমরা পারিনি! আর ঐ যে তোমার মূর্ত্তি, ও আজ থেকে স্থান পাবে শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিদের সঙ্গে।

সেই থেকে সেই মূর্ত্তি রইল, সেই মন্দিরে, আর সুলেখা রইল জন্ম জন্ম তার চিত্রসেনের অপেক্ষায়।

আগন্তুকা চুপ্ ক'রে রইল। তার চোখ থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল, তার স্নিগ্ধতা আমাকে শীতল ক'রে দিলে, তার দেহে যে সুষমা জেগে উঠল, তা আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিলে।

খানিকটা চুপ করে থেকে সে বল্লে, সেই যুগ-যুগান্তরের অপেক্ষাকারিণী সুলেখা—আমি।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম! আশ্চর্য্য এই সুলেখা—অদ্ভুত তার কাহিনী। সাপের চোখের মত তার চোখ দুটো আমাকে অভিভূত ক'রে ফেল্লে, আমি নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রৈল্যুম।

সে আমার দিকে ঝুঁকে স্মিতহাস্তে বল্‌লে, আর সেই চিত্রসেন—তুমি!

আমি ? ওগো রহস্যময়ী, এ কি রহস্য উন্মুক্ত ক'রে দিলে আমার কাছে, এই যুগযুগান্তর পরে এই নিস্তব্ধ নিশীথ-রাত্রে ? বিশ্বের এই চিরন্তন প্রহেলিকার মাঝ-খানে যে তৃণটি নিঃশব্দে ভেসে চলেছিল, ওগো আনন্দময়ী, তার এ কি সার্থকতার কাহিনী আজ তার অজ্ঞাতে তাকে শুনিয়ে দিলে ? যদি শোনালে, তবে অয়ি রহস্যময়ি, তোমার মোহ-মন্ত্রে দূর ক'রে দাও, আজকের এই মিথ্যা-কথা, এই তাঁবু, এই কর্ম্ম, এই ভাণ। তোমার যাদু-মন্ত্রে আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও, সেই প্রকৃতির রম্য-ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, সেই চিরন্তন প্রেমের কুঞ্জবনে, আমার সুলেখার অমর বাহু-পাশে !

রমণী আমার দিকে ভৎ'সনার দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, তবু চিনতে পারনি !

আমি বল্লাম, সুলেখা, বোধ করি এখন চিনতে পারছি ! কিন্তু মাপ করো তোমার অযোগ্য চিত্রসেনকে—যে তোমার মত যুগে যুগে প্রেমের অমর বহ্নিকে বুকের মধ্যে প্রদীপ্ত রেখে, তার প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় তোমারই মত জাগরূক থাকতে সক্ষম হয়নি।

সুলেখা হেসে বল্লে—আজ আমার প্রতীক্ষা সার্থক হোল, আজ থেকে আমার মুক্তি ! বলে তার বুকের মধ্য থেকে একটি ফুল বার ক'রে আমার হাতে দিলে, যা শুক্নো হলে সৌন্দর্য্যে তখনও নবীন।

তার অন্তরের গোপন-রস-সিক্ত এই চিরন্তন প্রেমের নিদর্শনকে আমি মাথায় ঠেকালাম, বল্লাম সুলেখা এই যে এর মর্ম্মে মর্ম্মে তোমার যুগ-যুগান্তরের বিচিত্র কাহিনী গাঁথা র'য়ে গেছে, একে আমি সসম্মানে গ্রহণ করলাম।

মুহূর্ত্তে মলয়ের একটা স্নিগ্ধ হিল্লোলের মত এই কাহিনী, এই স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, আর আমি চোখ চেয়ে দেখলাম, যে আমার সম্মুখে সেই শিলামূর্ত্তির মুখের হাসিতে যেন সুলেখার হাসি মিলিয়ে রয়েছে, আর দৃষ্টি তার দৃষ্টি—সুলেখার সেই স্বচ্ছ, মর্ম্মবিদারী, চিরসুন্দর দৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

——— —

"মরণের বাঁশী"

ওই বাজে দূরে সুমধুর সুরে
মরণের বাঁশী উদাস করি'—
সাগরের পারে কে ডাকে আমারে
কার বাণী দিল হৃদয় ভরি' ?
সুখের লালসা, ধরার বিত্ত,—
সকলি মিথ্যা—সবই অনিত্য,
এ চির সত্য উজল আঁখরে
কেন দিল আঁকিয়া চিত্ত'পরি !!

হরি প্রাণ-ক্ষুধা আহা কিবা সুধা
ভরিয়া রয়েছে বাঁশির সুরে,
মিটিল তিয়াসা, প্রেমের পিয়াসা—
সকল বেদনা গিয়াছে দূরে।
গভীর আঁধার পলকে টুটিয়া,—
আলোকের হাসি উঠিল ফুটিয়া,
লাজ ভয়-মান হ'ল অবসান
বন্ধু এসেছে বর্ত্তি ধরি' !!

বেলা গুহ

তিলক চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়

তিলকের পূর্ব্বের মহারাষ্ট্র

ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হইবে না ইহা মিশনরিরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদের এই গুণটি অনুকরণীয় বলিতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে খ্রীস্ট ধর্ম্মের বিস্তার হউক বা না হউক আপনাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য অব্যাহত থাকিবে কি না এ প্রশ্ন তখনকার ইংরাজদিগের মনে নিশ্চয়ই উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এসম্বন্ধেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উদারমনের পরিচয় দিয়াছিলেন। লেপ্টেনেণ্ট ব্রিগস একদিন মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কাছেই কয়েকখানি নবমুদ্রিত আরবী পুস্তক দেখিয়া ব্রিগস্ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বইগুলি কিসের জন্য? এলফিনষ্টোন উত্তর দিলেন মারাঠাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য। কিন্তু মনে রাখিও এই শিক্ষার দ্বারাই আমাদের বোচকাবুচকি বাঁধিয়া য়ুরোপে ফিরিবার রাজমার্গ প্রস্তুত হইবে।

পেশবাই নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই মিশনরীরা মারাঠা-কেতাব ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মারাঠার রাজসিংহাসন ইংরাজের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মারাঠী "বত্রিশ-সিংহাসন" ইংরাজের হাতে গিয়াছিল। পেশবাই নষ্ট হইবার পরই এলফিনষ্টোনের প্রথম কার্য্য শিক্ষাপ্রচারের উদ্যোগ। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি বোম্বাই নগরে নেটিভ্ এডুকেশন সোসাইটী স্থাপন করেন। এই সোসাইটী যে ৫০,০০০৲ টাকা পাইয়াছিল তাহা দ্বারাই গ্রন্থ প্রকাশের কাজ আরম্ভ করা হয়। বলা বাহুল্য যে গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ স্কুলপাঠ্য। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কোন বিদ্যায় মারাঠাদিগকে সুশিক্ষিত করা হইবে সে বিতর্ক শীঘ্রই শেষ হইল এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রাধান্য স্থাপিত হইল। সুতরাং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রণ অনাবশ্যক ও ছোট ছোট সরল মারাঠা-গ্রন্থ প্রকাশ অধিক প্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হইল।

বিদ্যা ও দক্ষিণার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। পেশবা আমলে কিম্বা তৎপূর্ব্বে শিক্ষাবিস্তারের কোন সরকারী ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু বিদ্বান লোকদিগকে দক্ষিণা দানের রীতি ছিল। সকল দেশেই গবর্ণমেণ্টকে ধর্ম্ম সংরক্ষণের একটা বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেইজন্যই সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশেও ধর্ম্মসম্পর্কীয় এক একটা আলাদা সরকারী বিভাগ আছে। মারাঠা সাম্রাজ্যেও সরকারী পুরোহিত-উপপুরোহিত অথবা ঐ রকমের কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইত ধর্ম্মসম্পর্কীয় ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু প্রতিবৎসর বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণা বিতরিত হইত। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকারের

বার্ষিক বৃত্তি দান করিয়া বিদ্বান ও ধার্ম্মিক লোকদিগের পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইত, এবং এই বৃত্তিভোগী বিদ্বান শাস্ত্রী পণ্ডিতেরাও আবার ঘরে ঘরে শিষ্য পড়াইয়া বিদ্যাপরম্পরা রক্ষা করিতেন। সুতরাং তাহাদের জন্য সরকার হইতে যে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহাই শিক্ষাবিস্তারের খরচ বলা যাইতে পারে। পেশবা আমলে বার্ষিক দক্ষিণার খরচ কিরূপ বাড়িয়াছিল তাহা ডেক্কান ভার্ণাকুলার ট্রান্‌স্লেশন সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পেশবা দপ্তরের কাগজপত্র হইতে জানা যায়। পেশবাযুগের শেষ পর্য্যন্ত এই প্রকারে বিদ্যা দ্বারা দক্ষিণা অর্জ্জিত হইত কিন্তু পেশবাদিগের পতনের পর শিক্ষাবিস্তারের জন্য দক্ষিণার টাকা ব্যয় করা হইতে লাগিল। বাজীরাওর বাদশাহী শেষ হইলে এলফিনষ্টোন সাহেব রমণীয় আবদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দক্ষিণা বিতরণের পুরাতন প্রথা বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু দেবস্থানের আয়ের সহিত দক্ষিণার খরচপত্র রহিত করিলেন না, কেবল তাহার রূপান্তর করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ দক্ষিণা ভাণ্ডার হইতে বক্‌সিস দেওয়া হইত। তারপর নাসিক ও চাইর সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুদিগের জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কল্পনাও কিছুদিন চলিয়াছিল। পরিশেষে সে কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ১৮২১ সালে খাস পুণা সহরের বিশ্রামবাগে সরকারী সংস্কৃত পাঠশালা খোলা হয় এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আলাদা করিয়া রাখা হয়।

দুইএক বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা প্রায় দেড়শত হইল। সংস্কৃতশাস্ত্রগ্রন্থের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও গণিতের অধ্যাপনারও সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে বোম্বাইর ন্যায় পুণায়ও এডুকেশন সোসাইটী স্থাপিত হইলে ১৮৪২ সালে এই পাঠশালাতেই ইংরাজী ক্লাস জুড়িয়া দেওয়া হইল। ১৮৫১ সালের ৭ই জুন সংস্কৃত ও ইংরাজী ক্লাস যোগ করা হইলে বিদ্যালয়টির নাম হইল পুণা কলেজ। ১৮৫৫ সালে এডুকেশন সোসাইটী উঠাইয়া দিয়া সরকারী শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হইল এবং কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার ডাইরেক্টার অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকগণের হাতে গেল। পরে ১৮৬৩ সালে এই কলেজ বিশ্রামবাগ হইতে বাণবড়ীতে উঠিয়া যায় এবং ১৮৬৮ সালে তথা হইতে (ডেক্কান কলেজ) নব নাম ধারণ করিয়া সঙ্গমের অদূরে খণ্ডোবা শৈলে বিনির্ম্মিত বিশাল গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪২ সালে যে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহাই স্বতন্ত্রভাবে বিশ্রামবাগ হাই স্কুল নামে চলিতে থাকে। এই বিশ্রামবাগেই ট্রেণিং কলেজেরও একটি শ্রেণী ছিল এবং ট্রেণিং কলেজের ছাত্রদিগকে কেবল মারাঠাতেই প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৬৩ সালের কাছাকাছি হাই স্কুল, কলেজ এবং ট্রেণিং কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা প্রায় চারি শত দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন বিদ্যালয় পাঠশালা প্রভৃতির উপর প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদিগের কর্ত্তৃত্ব লোপ হয় এবং য়ুরোপীয়দিগের কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ হয়। সেকালের পণ্ডিতেরা কেবল মারাঠী জানিতেন বলিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে নিযুক্ত করা হয়। কেবল তাহাদের মধ্যে

কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপলুন কর অথবা কেরোপন্ত ছাত্রের মত যাহারা ইংরাজী শিখিয়াছিল তাহাদিগকে ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল, সরকারী রিপোর্টার অথবা প্রফেসার প্রভৃতির বড় বড় পদ দেওয়া হইয়াছিল। কৃষ্ণশাস্ত্রীর পর তিলকের শিক্ষা শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রেভারেণ্ড ম্যাকডুগাল, মেজারকেণ্ডি, রেভারেণ্ড ফ্রেজার, প্রেফেসর গ্রীণ, ই, আই, হাওয়ার্ড, রেভারেণ্ড মারেমিচেল, প্রোফেসর ডেপার এডুইন, আরনোল্ড্, ডাঃ মার্টিন হো, প্রো রাসেল, উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডাঃ কীলহর্ণ, প্রোফেসর ফারষ্ট এবং প্রোফেসর শুট প্রভৃতি য়ুরোপীয় পুণা ও ডেকান কলেজের অধ্যাপক অথবা অধ্যক্ষ হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ইংরাজী সংস্কৃতের স্থান সম্পূর্ণরূপে দখল করিল এবং মারাঠীও পিছে পড়িতে লাগিল। ১৮৫৬ সালে মারে মিচেল সাহেব কলেজের খাতায় মন্তব্য করিলেন—মোড়ী হস্তাক্ষরের প্রতি অধিক লক্ষ্য দিতে হইবে। ১৮৫৮ সালে এডুইন আরনোল্ড্ লিখিয়াছেন—Most of the advanced students are better scholars in English than in Marathi. অর্থাৎ উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রেরা মারাঠী অপেক্ষা ইংরাজীই জানে ভাল। বোম্বাইতেও পুণার পূর্ব্বেই মারাঠীর অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। মোট কথা কিছুদিন পূর্ব্বে মারাঠী ভাষার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত, মেজর কেণ্ডির স্মৃতিরক্ষার্থ মারাঠী প্রবন্ধের নিমিত্ত যৎসামান্য পারিতোষিক ব্যতীত, মারাঠী ভাষা অধ্যয়নের চিহ্ন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের এই মুখ্য বিদ্যালয়টিতে ছিল না।

শিক্ষা বিভাগের নবযুগের প্রারম্ভে যে য়ুরোপীয়রাই শিক্ষক এবং পরীক্ষক হইতেন তাহা বলাই বাহুল্য। ভাল ভাল য়ুরোপীয়ান আসিতেন কিন্তু টিকিতেন না, অযোগ্য য়ুরোপীয়ান টিকিয়া যাইতেন কিন্তু কাযের একেবারেই অনুপযুক্ত। এডুইন আরনোল্ড এবং ডাক্তার হো প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অল্পকাল থাকিয়াই এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার হো জাতিতে জর্ম্মণ। তিনি সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। মাত্র দেড়শত টাকা বেতনে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন, পরে তাঁহার পাঁচশত টাকা বেতন হইয়াছিল, সরকার হইতে পুরস্কারও পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি বিরক্ত হইয়া কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কেণ্ডি ও কর্কহ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর য়ুরোপীয়। কেণ্ডি সাহেব সাদা সিধা কতকটা বোকা ধরণের লোক আর কর্কহ্যাম ছিলেন পাকা ওস্তাদ। কেণ্ডি সাহেবের আবার মারাঠী বিদ্যার ভয়ানক অহঙ্কার, কাযেই তাঁহার অজ্ঞতাও বড় বেশী ধরা পড়িয়া যাইত। কর্কহ্যাম বুদ্ধিমান কিন্তু বড় অলস। ১৮৬৫ সালের কাছাকাছি তিনি পুণা হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, কিন্তু তিন তিন দিন পর্য্যন্ত সাহেব বাহাদুর স্কুলে পা দিতেন না, কিম্বা কোন শিক্ষক কি করে তাহার কোন খবর রাখিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষকই য়ুরোপীয়ান। মারাঠীর প্রশ্নপত্র করিয়াছিলেন কেণ্ডি সাহেব। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন—"Analyse and give the meaning of ডোচকে কা বোচকে, ভোকে কী কোকে।" আর অক্সেনহ্যাম সাহেব ভূগোলের

পরীক্ষায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"Name the chief towns on any European river with a course chiefly on the parallel of the longitude." এল্‌ফিনষ্টোন কলেজে এক সাহেব প্রফেসর গণিতের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বীজগণিতের কেতাব খুলিয়া "Omit" অর্থাৎ "পড়িওনা" সূচক O এবং "Read" বা "পড়িও" সূচক R ছাত্রদিগকে এই দুইটি অক্ষর ব্যতীত আর কিছুই বলিতেন না।

তিলক বি-এ পাশ করিবার বিশ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৬১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম (Calendar) পঞ্জিকা বাহির হয়, তাহা হইতে মহারাষ্ট্রের সেকালের প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতদলের কথা জানা যায়। ১৮৫৭ সালে পুণা কলেজ হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ছাত্র পাঠান হয়। তৎপূর্ব্বে হাইস্কুল ও কলেজ একত্র ছিল এই সময় হইতে এই দুইটি বিদ্যালয় পৃথক হয়। ১৮৫৯ সালে পুণা কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বাবা গোখলে ব্যঙ্কটরাও রামচন্দ্র ও বিষ্ণু বালকৃষ্ণ সোহোনীর নাম পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পন্ত ভাণ্ডার কর, বামণ আবাজী মোডক, মহাদেব নারায়ণ পরমানন্দ, মাধবরাও রাণডে, খণ্ডেরাও বেদরকর, বাল মঙ্গেশ বাগরে, জনার্দ্দন সখারাম গডে গীল প্রভৃতিও এই বৎসরেই বোম্বাইর বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও পূর্ব্বে ডাঃ সখারাম অর্জ্জুন রাউত, ডাঃ সীতারাম বিঠ্‌ঠল প্রভৃতির নাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র তালিকায় পাওয়া যায়। ইঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন নাই, কারণ তখনও এই পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই। প্রবেশিকা না পাশ করিয়াই তাঁহারা কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সালে যাহারা পাশ হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মাধবরাও কুণ্টে অন্যতম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৬ সালে ১১০০র বেশী ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। ১৮৬২ সালে বামণ আবাজী মোডক একা বিএ পাশ হইয়াছিলেন। তখন হইতে তিলক বি-এ পাশ হওয়া পর্য্যন্ত নিম্ন তালিকা অনুযায়ী বিএর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৬৩ (৩), ১৮৬৪ (৫), ১৮৬৫ (৭), ১৮৬৬ (৭), ১৮৬৭ (১১), ১৮৬৮ (২০), ১৮৬৯ (২) ?, ১৮৭০ (১৮), ১৮৭১ (১২), ১৮৭২ (১০), ১৮৭৩ (২০), ১৮৭৪ (১৯), ১৮৭৫ (২৭), ১৮৭৬ (১৮), ১৮৭৭ (৪০)। অর্থাৎ তিলক বিএ পাশ করিবার পূর্ব্বে ১৭৯ জন ঐ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিল। কিন্তু তিলক যে বৎসর বিএ পাশ হন সেই বৎসর হইতে এই সংখ্যা আরও বাড়িয়া চলিল। এল এলবী উপাধি ধারীদের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। ১৮৬৬ সালে মাত্র দুইজন, মাধবরাও রাণডে ও বাল মাঙ্গশ বাগার এল এলবী উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৭ সালে ২, ৬৮ সালে ৩, ৬৯ সালে ৩, ৭০ সালে ৬, ৭১ সালে ১৩, ৭২ সালে ০ (?), ৭৩ সালে ১, ৭৪ সালে ৩, ৭৫ সালে ২, ৭৬ সালে ৫, ৭৭ সালে ৩, ৭৮ সালে ৪ এবং ৭৯ সালে ৬ জন অর্থাৎ ১৪ বৎসরে মোট ৫৩ জন ছাত্র এল, এলবী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিলক যে বৎসর এই উপাধি পান সেই বৎসরই একেবারে ২০ জন এই পরীক্ষা পাশ করেন।

তিলক যে বৎসর এল এলবী পাশ করেন সেই বৎসর সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের সর্ব্ব প্রকারের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের মধ্যে এবং মোট ছাত্র সংখ্যা পৌণে তিন লক্ষ। ইহার মধ্যে কলেজ ছিল আটটি, আর্ট স্কুল ১টি, হাইস্কুল ৪৮টি, মিডল স্কুল ১৭৭টি, চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্লাস দুইটী, ব্যবসায় শিখাইবার ক্লাস পাঁচটি ও বাকী সকল প্রাথমিক পাঠশালা। বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮৪ এবং ট্রেণিং ক্লাসের সংখ্যা ৯। ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা ২৩ জন ব্রাহ্মণ, ৫৯ জন ব্রাহ্মণেত্তর হিন্দু এবং ১০ জন মুসলমান ছিল।

শিক্ষার তাদৃশ বিস্তার না হইলেও সেই সময়েই কেহ কেহ এই নবশিক্ষার কুফল অনুভব করিয়াছিলেন। "জ্ঞান প্রকাশে" ছাত্রদের একজন শুভ চিন্তক লিখিয়াছিলেন "এখন এদেশে ক্রমশঃ শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। কিন্তু তাহার ফলে ছাত্রদিগের শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং তাহারা কলেজের পড়া শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারেনা, দিলে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।" কিন্তু তথাপি কেহ কখনও শিক্ষার প্রসার বন্ধ করিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিরাছেন বলিয়া জানা যায় না। ১৮৬১ সালে বিশ্রাম বাগের পারিতোষিক বিতরণের উৎসব দেখিয়া সকলেই বেশ খুসী হইয়াছিল। এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে পুণায় ছাত্রাবাস স্থাপন করিবার ও তাহার সুদ হইতে ৫০।৬০টি দরিদ্র বালকের বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। এই সঙ্কল্প তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হয় নাই সত্য কিন্তু অন্য প্রকারে শিক্ষার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িয়াই গিয়াছে, কমে নাই।

পুরুষের শিক্ষারই যেখানে এইরূপ অবস্থা, সেখানে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? স্ত্রী-শিক্ষার নাম করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে বাদবিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল। পুণা নেটিভ জেনারেল লাইব্রেরীতে একবার এক বিতর্ক হইয়াছিল, জ্ঞান প্রকাশে এক "পিশাচ" তাহার সংবাদ দিয়াছেন,—

বুড়া শাস্ত্রী—তোমরা আর কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েদের পায়ে পড়িবে।

তরুণ—হাঁ, মেয়েরা গন্ধর্ব্ব, মেয়েরাইত গৃহের আত্মা।

শাস্ত্রী—ব্যাখ্যা করিবার কৌশল তোমাদের বেশ জানা আছে।

তরুণ—বাঃ বে পেশবাই সেয়ানা, "রামঃ রামৌ" করিলেই বুদ্ধি হয়না।

শাস্ত্রী—বেশ মহারাজ, এস কেস করিলে যদি হয়ত হোক! এইটুকু বলিয়াই "পিশাচ" লিখিতেছেন,—"মেয়েরা যদি ঘরের আত্মা, হন, তবে সূর্য্য জল আর সমুদ্র খোলার ঘর। একালে চারজন পুরুষের সামনে বাহির হইতে পারাই মেয়েদের একটা যোগ্যতা বলিয়া মনে করা হয়। বিলাতে রাণী রাজত্ব করেন, তাহার স্বামীকে কেহই পোঁছেনা, সেইরূপ হিন্দুস্থানেও পুরুষেরা সকালে উঠিয়া মেয়েদের দ্বাদশবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে—এই নিয়ম হইবে।"

১৮৭১ সালের জানুয়ারী বা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে—পুণায় "বিচারবতী স্ত্রী সভা" স্থাপিত হয়। এই প্রকার সভা সমিতি ব্যতীত লোক মত স্ত্রী শিক্ষার অনুকূলে আনা সম্ভব ছিল না। সভার সভ্যা ছিলেন মোটে সাত আটটি মহিলা। "জ্ঞান প্রকাশ" প্রথম হইতেইমধ্যম প্রকারের সংস্কারের পক্ষে ছিল। নীতির হিসাবে এই পত্র স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূল ছিল না। ১৮৭১ সালের ৯ই জানুয়ারীর জ্ঞান প্রকাশ লিখিয়াছে—"এ পর্য্যন্ত আমাদের প্রদেশে কোথাও নারীদিগের সমিতি হয় নাই, বোধ হয় সমস্ত হিন্দুস্থানেও এ প্রকার সমিতি এখন পর্য্যন্ত নাই। আমাদের অত্যানন্দ হইয়াছে।" কিন্তু এ লেখাটা কতকটা উপরোধে পড়িয়া, কারণ একটু পরেই জ্ঞান প্রকাশ লিখিয়াছেন—"কিন্তু কাহারও কাহারও মতে এখন এরূপ সভা স্থাপন করা, যাহারা দাঁড়াইতে পারেনা তাহাদিগকে দৌড় শিখাইবার চেষ্টার মত।"

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

জয় ও পরাজয়

আমায় যত করবে নিঠুর হেলা
 তোমায় আমি বাসবো ততই ভালো,
আমার ঘরের দীপটী নিভাও যদি
 তোমার ঘরে জ্বালবো উজল আলো।

আমার বুকে যেথায় বেদন বাজে
 সেথায় যদি কঠিন আঘাত কর,
বুলিয়ে দিব স্নেহের পরশখানি
 যেথায় তোমার আঘাত গভীরতর।

নিত্য যদি বিছাও সকাল সাঁঝে
 কাঁটা আমার যাওয়া-আসার পথে,
ফুলের রেণু ছড়িয়ে তখন দিব
 যখন তোমায় দেখবো সোণার রথে।

এমনি করে দুঃখ তোমার দেওয়া
 জয়ী আমায় করবে জীবন শেষে,
পরাজয়ের তীক্ষ্ণ কাঁটার মালা
 জড়িয়ে আছে, দেখবে তোমার কেশে।

শ্রীরেণুকা দাসী

সোনপুর-চিত্রাবলী

শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর স্যর বীর মিত্রোদয় সিংহদেব কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের সৌজন্যে

[পশ্চিম ওড়িষ্যায় সম্বলপুর অঞ্চলে সোনপুর ফিউডেটরি রাজ্য। এই রাজ্যটি প্রাচীন ঐতিহাসিকত্বায় প্রসিদ্ধ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোহর। নয় শতক হইতে তের শতক পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের নাম ছিল কোশল দেশ; দশ ও এগার শতকে এই কোশল দেশের রাজারা সারা ওড়িষার অধিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহাদের প্রধান রাজধানী ছিল মহানদী ও তেলনদীর সঙ্গমে সোনপুর নগরে। এই সঙ্গমের চিত্র চিত্রাবলীতে দ্বিতীয় চিত্র]।

বৈদ্যনাথ মন্দির
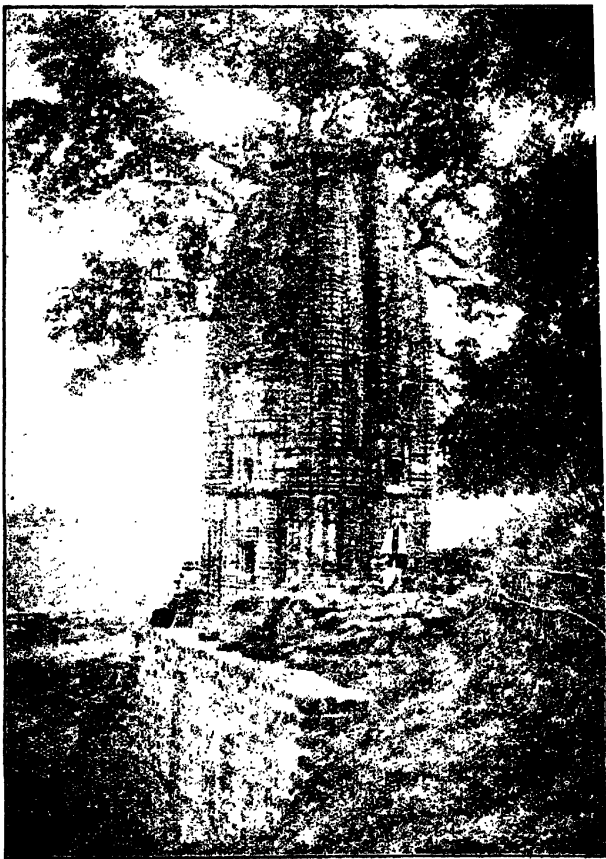
কারুকার্য্যে উৎকৃষ্ট এই মন্দিরটি তেলনদীর তটে অবস্থিত।

সোনপুর রাজঘাট
সোনপুর মহারাজার প্রাসাদসংলগ্ন ঘাট ও মহানদীর দৃশ্য
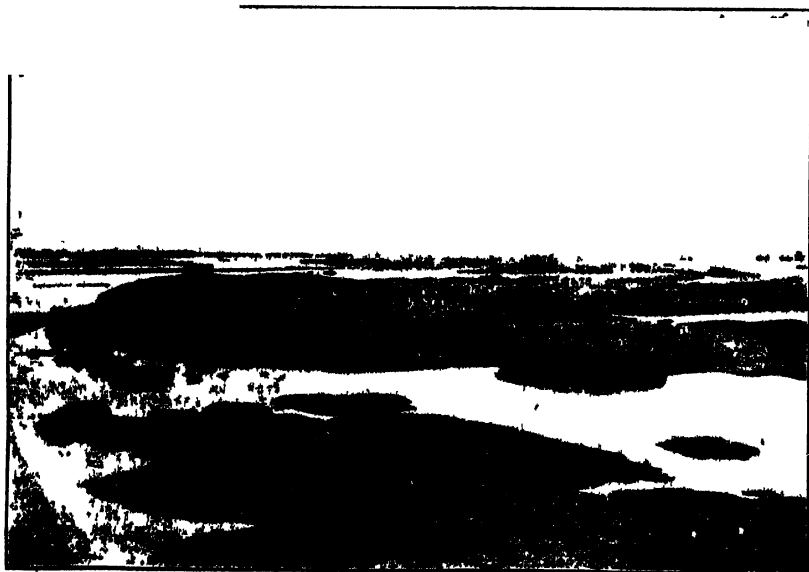
মহানদী ও তেলনদীর সঙ্গম

রামেশ্বর মন্দির
মহানদী ও তেলনদীর সঙ্গমের নিকট অবস্থিত।

কোশলেশ্বর মন্দির
এই প্রাচীন মন্দির তেলনদীর তীরে অবস্থিত।
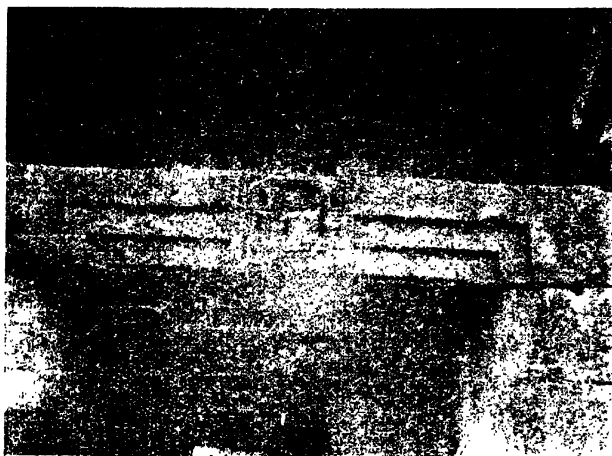
মাতঙ্গী মহালক্ষ্মী

কোশলেশ্বর মন্দিরের তোরণের উপরকার পাথরে খোদিত।

লঙ্কেশ্বরী পাথর

মহানদীর মধ্যে এই বড় পাথরে অতি প্রাচীনকালের লিপি আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পিতৃব্য ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নতুন কাকা বলেই ছেলেবেলা থেকে তাঁকে ডাকি। তখন আমি কত ছোট তা মনেই নেই চাকরের কোলে চড়ে চলা ফেরা করি, সেই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে নতুন কাকা মহাশয়ের লেখা "অশ্রুমতী" অভিনয় সুরু হল। আমার বেশ মনে পড়ে এই নাটক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে সকলকে দেখাবার জন্যে একটা বিশেষ আয়োজন করেছিলেন গুরুজনেরা। সেই আমার প্রথম থিয়েটার দেখা—এর পূর্ব্বে আমাদের বাড়ির মাঝের বড় ঘরটায় নতুন কাকার লেখা—"কিঞ্চিৎ জলযোগ" বলে প্রহসনের রিহার্সাল হচ্ছে এটুকুও মনে পড়ে। বড়রা সবাই মিলে গান গাইছেন—ভারি অদ্ভুত ঠেকতো সেটা সেই ছোট বয়সে আমার কাছে। আমি দরজার পাশ থেকে এক একবার উঁকি দিয়ে কাণ্ডটা দেখার চেষ্টা করতেম, ধরা পড়লেই ধমক খেতে হতো—যাও এখানে থেকে—গুরুজনদের মুখে যা কথা খুব রাগের অবস্থাতেও বার হতে শুনিনি।

'অশ্রুমতী' নাটকে আমরা-ছেলেরা—হুকুম পেলেম প্রথম বড়দের সঙ্গে একত্র বসে থিয়েটারে অভিনয় দেখার। সেই প্রথম আমার মন ও চোখ যেন মেলেম ভারতবর্ষের গৌরবের ছবি আর কাহিনীর দিকে, কল্পনার রাজত্বের প্রথম দরজা খুলে দিলে আমার এই "অশ্রুমতী"। বই দেখলেম, যিনি বই লিখলেন তাঁকে দর্শকেরা সকলে সমস্বরে ধন্যবাদ দিলে তাও কানে এল, কিন্তু চোখ তুলে নতুন কাকা মহাশয়কে দেখে নিই—এতটা সাহস তখন আমার হয়নি—এখনকার ছেলে মেয়েদের মতো গুরুজনের কাছে ফস্ করে এগিয়ে যাওয়া তখনকার প্রথাই ছিলনা। চাকর যেখানে বসিয়ে দিলে সেইখানেই বসে রইলেম সারাক্ষণ, তারপর অভিনয় শেষ হলে চাকরের কোলে চড়ে বাড়ি এলেম, "অশ্রুমতী" আমরা নিজেরা অভিনয় করবো এমনি একটা কল্পনা মনে ধরে তার পরদিন থেকে সেই আমাদের মাঝের ঘরে—যেখানে একদিন গুরুজনদের আমোদ করতে দেখেছিলেম সেইখানে—পর্দ্দা খাটিয়ে আমাদের অভিনয় চল্লো গুরুজনদের কাছে ধরা পড়া বাঁচিয়ে। এর পর থেকে 'সরোজিনী' 'পুরু বিক্রম' একে একে নাটক বার হয়—আমরা পড়ি, মুখস্ত করি, নিজে নিজেরাই তার অভিনয় করার চেষ্টা করি—ঘরের বড় বড় কৌচ টেবেল সমস্তকে ষ্টেজ প্লাট্‌ফারম্ সিন্ পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদি কল্পনা করে। নাট্যকলার চর্চ্চার সূত্রপাত আমার এইভাবে করে—নতুন কাকার লেখা নাটক সমস্ত। বাড়ির ছেলে পিলে এবং গুরুজন-এর মধ্যে তখন ব্যবধান রেখে চলতো চাকর দাসী এবং গুরুমশায় এবং বাড়ির দুচারজন পুরোনো আমলা এবং দু-একটি দূর কুটুম্ব সাক্ষাৎ।

আমাদের পড়ার 'স্কুল ঘর' ছিল এবাড়ির দোতালার উত্তরের একটা ছোট ঘর, ওবাড়ির তেতালায় থাকতেন নতুন কাকা—সেখান থেকে পিয়ানো হারমোনিয়াম এবং রবি কাকার গলার

সুর থেকে থেকে আমাদের কানে আসতো—বই থাকতো পড়ে সাম্‌নের টেবেলে মন যেতো চলে তেতালার ঘরে! তখন "কাল মৃগয়া" রিহার্সাল চলেছে, আমাদের সমবয়সী ওবাড়ির ছেলে মেয়েরা কেউ ঋষিকুমার কেউ বনদেবী সাজ্‌ছে কিন্তু হুকুম না হলে গিয়ে দেখার উপায় নেই আমাদের! নতুন কাকা এই দুঃসময়ে আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ দিলেন রিহার্সাল দেখতে—সে কি আনন্দের দিন! আমার বেশ মনে পড়ে সেই প্রথম নতুন কাকাকে আমি ভাল করে দেখলেম—কন্দর্পের মতো সুপুরুষ, মূর্ত্তিমান আনন্দের মতো! এই অভিনয় ওবাড়ির দালানের ছাতে ছোট ষ্টেজ বেঁধে হয়েছিল। নতুন কাকা সেজেছিলেন 'রাজা দশরথ' আর রবি কাকা সেজেছিলেন 'অন্ধ মুনি', ছেলেদের মধ্যে ভায়া ঋতেন্দ্রনাথ ঋষিকুমারের অংশ অভিনয় করেছিলেন, মেয়েরা কে কি সেজেছিলেন আমার মনে নাই, এমনি করে একটার পর একটা অভিনয় চল্লো বাড়িতে এবং ছেলেতে বুড়োতে ব্যবধান ক্রমে দূর হ'তে থাকলো। এই সময়ে দেখতেম এক একদিন নতুন কাকা মস্ত একটা ঘোড়ায় চ'ড়ে হাওয়া খেতে বার হ'তেন—ইন্দ্রায়ুধের মতো মস্ত ঘোড়া ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের মতো তার বর্ণ! আমি এখনো যখন চন্দ্রাপীড়ের কথা পড়ি তখন এই ঘোড়ায় সওয়ার নতুন কাকামশায়কে আমার মনে হয়।

গঙ্গার ধারের বাগান তখনকার দিনে একটা সখের ব্যাপার ছিল। আমরা আছি তখন আমাদের চাঁপদানীর বাগানে, নতুন কাকা রবি কাকা থাকেন ফরাশডাঙ্গার মোরাণ সাহেবের কুটিতে—সে সময় এক একদিন তাঁর কাছে যেতেম। গ্রীষ্মকাল গঙ্গার উপরে কালো মেঘ করে এসেছে রবি কাকা গাইছেন 'এ ভরা বাদর', নতুন কাকা হারমোনিয়াম দিচ্ছেন, গান চলতো একটার পর একটা—ছেলেরা এবং গুরুজনেরা সুরে মগ্ন—কাযেই রাত হতো ফিরতে, পথে দেখতেম গাছে গাছে জোনাকি ঝক্ ঝক্ করছে, মাথার উপরে মেঘের ফাঁকে চাঁদ, অন্ধকার গাছের শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে আধঘুম আধজাগা অবস্থায় আমাদের নিয়ে গাড়ি চলতো।

এর পরে নতুন কাকার কর্ম্মজীবন—একদিন একটা মস্ত লোহার ইঞ্জীন পঞ্চাশ ষাটজন মুটেতে টানাটানি করে রৈ রৈ শব্দে আমাদের গোলবাগানে এনে ফেল্লে! আমরা সেটার সঙ্গে অনেকদিন ধরে খেলা করছি হঠাৎ একদিন আবার মুটেরা এসে ইঞ্জীনটাকে টেনে টুনে কোথায় নিয়ে গেল কে জানে—শুনলুম নতুন ষ্টীমার তৈরী হতে গেল! এই ভাঙ্গা ইঞ্জীন দিয়ে 'সরোজিনী' জাহাজ প্রস্তুত হল এবং বরিশালের ওদিকে নতুন কাকার ষ্টীমার কোম্পানী সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করলে। সে এক মস্ত ইতিহাস—বাঙ্গালীর সঙ্গে সাহেবের লড়াই কাযের ক্ষেত্রে! তখন আমরা বড় হয়েছি, দেশের একটু একটু খবর নিই—খবরের কাগজ কিনে পড়ি, সেই সময় নতুন কাকা একদিন এসে 'ন্যেশানাল লীগে' আমাদের নাম সই করিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা তখন স্কুলে পড়ি স্কুলের ছেলের মতোই একটু একটু দেশের কথা ভাববার দীক্ষা নতুন কাকার হাতে সুরু হল, কিন্তু রাজনীতির স্বাদ আমার মনে পৌঁছলোনা! আমার বেশ মনে পড়ে

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা)

সুরেন্দ্রবাবুর যেদিন জেল হয় সেদিন ক্লাসের সব ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করলে—কালো ফিতে হাতে জড়িয়ে স্কুলে আসবে, আমি কালো ফিতে বাঁধতে আপত্তি করলেম, কিন্তু শেষে মারের ভয়ে কিছুদিনের জন্য একটা কালো পটি চার আনায় কিনে হাতে ধরেছিলেম।

এমনি গান বাজনা অভিনয় ধর্ম্ম কর্ম্ম যখন যেদিকের পথ শৈশবে যৌবনে আমার সামনে খুলেছে সেই সেই পথের গোড়ায় আমি নতুন কাকামশায়কে দেখতে পাই। কয়েক বছরের কথা—রাঁচীতে আর একবার তাঁর কাছ পেয়েছিলেম—তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল—তোমার ছবির কায কেমন চলছে? তারপর তাঁর নিজের আঁকা ছবির খাতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, দেখ। এই ছবির সমস্ত খাতা মৃত্যুকালে আমাদের তিনি দিয়ে গেছেন 'নতুন কাকামশায়ের শেষদান' এই কথাটি লিখে। এই ছবির খাতায় জানা অজানা ছোট বড় আত্মীয় পর কারু ছবি তুলে রাখতে তিনি ভোলেন নি। তিনি দুঃখ করে বলতেন—আমার ছবির খাতায় সবাই ধরা পড়েছেন—কেবল একমাত্র আশু মুখুয্যে মশায়কে আমি ধরেও ছেড়ে দিয়েছি—এই বড় আফ্‌শোষ হয়। এই ছবির খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হ'ল কই আমরাও তো ছবি আঁকি কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র সুন্দর অসুন্দর নির্ব্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি! কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর চোখে সুন্দর হ'য়ে উঠলো, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকলো কোন মুখ অসুন্দর রইলো না! রূপ বিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না! যেমন এই মানুষের সঙ্গে তেমনি সুরের সমস্ত যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল—বাদ্যযন্ত্র গুলো তাঁর কাছে অতি সহজে পোষ মেনে যেতো।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিসর্জ্জন

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

জনপূর্ণ মহানগরী কলিকাতায় পল্লীগ্রামের ন্যায় সৌন্দর্য্য কিছুমাত্রও নাই। পল্লীদেবী মধ্যাহ্নে যেরূপ নিঃশব্দে স্বর্ণাঞ্চল খানা মেলিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন তাহার সেই শান্ত স্তব্ধ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে না পুলকিত হইয়া থাকে।

কিন্তু দাম্ভিক নগরী সদাই চঞ্চল। তাহাতে পল্লীর ন্যায় লজ্জা-সঙ্কুচিত শান্ত প্রকৃতি কিছুমাত্র নাই। অহর্নিশি তাহাতে কেবল চঞ্চলতা, কেবল ব্যস্ততা, কেবল জনকোলাহল।

সদাই গাড়ী ঘোড়া যাইতেছে, আসিতেছে। সদাই ফিরিওয়ালারা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মোটর লরীর গম্ গম্ সর্ সর্ শব্দে কর্ণে তালা লাগিতেছে। চতুর্দ্দিকেই একটা উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চলতা।

মধ্যাহ্নে আহারের পরে একখানি সুন্দর প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া বাড়ীর গৃহিণী, সবিতা ও ছায়া গল্পাদি করিতেছিল। ললিতা ও কলিকা শ্বশুরালয় গিয়াছে, তাই তাহাদের গল্প গুলি তেমন জমিতেছিল না।

সবিতার শরীর আজ ভাল ছিল না। গৃহিণী ও ছায়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সন্তান প্রসবের কাল অতি নিকটবর্ত্তী। তাই ছায়া সেদিন বাড়ী যাইবেনা বলিয়া রমানাথের নিকট বলিয়া আসিয়াছে। সবিতা অধিকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে নিকটেই একখানা খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

দেখিয়া গৃহিণী শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "শুয়েছিস্ কেন ?"

সবিতা যন্ত্রণা-কাতর মুখে বলিল, "বড় কষ্ট।"

শুনিয়া গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় জ্যেষ্ঠপুত্র অমল সেখানে আসিয়া আবদারের সহিত বলিল, "মা, একটু বেড়িয়ে আসব ?"

"কোথায় ?

"আলিপুরে।"

শুনিয়া গৃহিণী বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোদের আর সময় টময় নেই। এখন কি বেড়াবার সময় ? এখানে ত মেয়েটার এই অবস্থা—"

অমল মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি বাড়ী থাকলে কি তার অবস্থাটা ভাল হয়ে যাবে নাকি ? আমি থেকে করব কি ?"

"করবি আবার কি ? তবু ত একটু চিন্তা ভাবনা,—তাও তোদের নেই। কাল ত রবিবার আছে, কাল গেলে হবে না ?"

"কাল একা একা যেয়ে কি করব। আজ অনেকগুলি সঙ্গী জুটেছিল।"

"তবে যা বাপু, বাবু যদি রাগ টাগ করেন, তবে কিন্তু আমি কিছু জানিনে।"

"তোমার কাছে যখন বলে গেলুম, তখন আমার আর কিছু দোষ নেই, তোমার ঘাড়েই সব।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে অমল চলিয়া গেল। গৃহিণী ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া চাকরকে ডাকিয়া ধাত্রীর জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ছায়া সবিতার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বুঝছ সবু ? ব্যথাটা কি ধীরে ধীরে বাড়ছে ?"

"না দিদি, এখন যেন আবার একটু কমে আসছে।"

"তা ভেবনা। ও রকম হয়েই থাকে, একবার বাড়ে, একবার কমে।

" কিন্তু আমার বড় ভয় করছে দিদি, মনে হচ্ছে, এবার বুঝি আর বাঁচব না।"

ছায়া শিহরিয়া বলিল, "ষাট্ ষাট্, অমন চিন্তা মনের কাছেও এনো না। ভাল হবে বৈকি, সুন্দর ছেলে হবে—"

সবিতা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "ছেলে ? কার জন্যে ? আর না হওয়াই ত মঙ্গল।"

ছায়া ব্যথিতচিত্তে বলিল," কেন সবু, কেন এমন কথা বলছ ?"

সবিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছেলে হলে থাকবে কোথায় দিদি ? আমি যেমন চিরদিন এ ভাবে এখানে থাক্‌তে পারছি,—থাকব, ছেলে কি আর তা পারবে ? পিতৃ পরিচয়—" সবিতা আর-বলিতে পারিল না। সবেগে বাষ্পরাশি আসিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

ছায়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, পরে শান্ত হইয়া ভাবিল বলে, "সবু, জানিস্ না, আমিই যে তোর সকল দুঃখের মূল। তোর এই স্নেহের ভগ্নিরূপিণী আমিই সেই সর্ব্বনাশী।" ছায়া বহুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। নিঃশব্দে বসিয়া আবার মনকে শক্ত করিল। সে যে আশায় এই পর হইতেও পর, তাহার হৃদয়ের তীব্র দীর্ঘশ্বাসের মূলটিকেও ভগ্নির স্নেহ বেষ্টনে বাঁধিয়া লইয়াছে, নিতান্ত পরকেও এমন ভাবে আপন বুকে টানিয়া আনিয়াছে, সেই আশা পুরাইবার এখনই ত সুন্দর অবসর।

এতদিন বলি বলি করিয়াও সে যে কথা বলিতে পারে নাই, মুখের নিকটে আসিয়াও আবার ফিরিয়া গিয়াছে, এখন যে সেই কথা আপনিই আসিয়া পড়িল। এই সুন্দর সুযোগে সেই কথাটি না বলিলে হয় ত আর কখনও বলা হইবে না।

ছায়া একটু স্থির হইয়া বসিল। ক্রন্দননিরতা সবিতার গাত্রস্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন বোন্ কাঁদছিস ? তোর কিসের অভাব! যে বস্তুর অভাব মনে করে আজ তুই কাঁদছিস্, বাস্তবিক তা ত তোর দুষ্প্রাপ্য নয়। তুই ইচ্ছে করলেই কি তা আবার পেতে পারিবিনে ?"

সবিতা ক্রন্দনারক্ত নেত্র বিস্ফারিত করিয়া ছায়ার দিকে চাহিল। ছায়া চিরদিন তাহাকে 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করিত। আজ এত স্নেহপূর্ণ 'তুই' সম্বোধন শুনিয়া সে যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি আনন্দিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার বিশাল নেত্র হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ছায়া সযত্নে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "উত্তর দাও সবিতা, বল তুমি কেন স্বামার স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে রয়েছ ?"

সবিতা আবার বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সে বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা ত তুমি জান দিদি। আবার কি বলব ?"

"হাঁ, জানি বৈ কি, আমি ত সবই জানি।"—বলিয়া ছায়া আবার সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমি তোমাদের সব কথা কি করে জানব ভাই ? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকের

অভিমানেরও একটা সীমা আছে। সে সীমার বাহিরে যে চলতে যায়, তারই কাঁটাতে পা বিঁধে। ভুলে কাঁটা বনে পা দিলে, যে কি অবস্থা হয়,—" বলিয়াই ছায়া থামিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে বিবর্ণমুখে আবার বলিল, "তা ভুক্তভোগী যে, সেই বেশ বুঝতে পারে। আমি আর কি বলব সবু?"

সবিতা সাশ্চর্য্যে ছায়ার মুখের পানে চাহিয়াছিল। এইবার সে বিস্ময়জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কে, তুমি কে দিদি? সত্য করে বল না, তুমি কে?"

ছায়া আবার কাঁপিয়া উঠিল। আবেগের সহিত সবিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সবু তুই আমাকে জানিস্ না? তুই আমাকে চিনিস্ না? আমি যে তোর দিদি!"

সবিতা অপলকনেত্রে ছায়ার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু বলিল, "হাঁ, তুমি আমার দিদি। দিদি, তুমি আজ একটি কথা বলে সত্যই আমার ঘুম ভাঙ্গালে। গণ্ডী অতিক্রম করতে গেলে যে কাঁটাবনে পা পড়ে, তাতে আর একটুও সন্দেহ নাই।" বলিয়া সবিতা ছায়ার দিকে চাহিল। ছায়া বুঝিতে পারিল যে সবিতা কিছু বলিতে চাহিতেছে।

সে একটু অপেক্ষা করিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কিছু বলবার থাকলে, বল না সবু। গণ্ডীর বাইরে পা পড়ে গেলেও ভিতরে আসতে ত তেমন কষ্ট নয় সবু।"

"সে কথাই বলব মনে করেছিলেম দিদি। আমার মনে হচ্ছে, এ যাত্রা আমি আর বাঁচব না। তাই গণ্ডীর ভিতরে যাওয়ার আশাও রাখি না। কেবল মনে হয়, তাকে একটু দেখে যাব, তার কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু—"

ছায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু আর কি সবু? তার সঙ্গে দেখা করাটা কি অসম্ভব! আমি তখনই যেয়ে মার কাছে বল্‌ব সেখানে টেলিগ্রাম করবার জন্য।"

"কিন্তু দিদি, লজ্জা—লজ্জা—"

"এখনও লজ্জা সবু? আমার অনুরোধ, আর লজ্জা করো না। আচ্ছা, তবে আমি মার কাছে বলে আসি।" বলিয়া ছায়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। সবিতা লজ্জায়, ভয়ে, উদ্বেগে, আনন্দে বালিশে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

একটু পরেই ছায়া আবার সেই কক্ষে আসিল। সবিতা তাহাকে দেখিয়া উদ্বেলিতহৃদয়ে বলিল, "বলেছ দিদি?"

"হাঁ, তার্ করবে মা।" সবিতা আপন মনে মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু যদি না আসে?"

ছায়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আসবে না কেন, নিশ্চয়ই আসবে।" সবিতা নীরবে রহিল।

ক্রমে সবিতার প্রসব লক্ষণ প্রকাশ হইল। ধাত্রী আসিল। গৃহিণীর বহু আপত্তিসত্বেও ছায়া সবিতার আঁতুড়ঘরে গেল। সবিতা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার সেই

মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিয়া গৃহিণী চক্ষুর জলে ভাসিতে লাগিলেন। ছায়া ও ধাত্রী সবিতাকে অভয়দান করিতে লাগিল।

সবিতা পূর্ব্বেই অতিশয় রুগ্ন, বল-শূন্য ছিল, এখন সে এমনই দুর্ব্বল হইয়া গেল যে, প্রসব করিবার শক্তি মাত্রও তাহার রহিল না। দেখিয়া ধাত্রী চিন্তিত হইল। গৃহিণী ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ছায়ার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।

দুর্ব্বলতার দরুণ যন্ত্রণায় সবিতা অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া উঠিল। গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। ধাত্রী হস্তের ইঙ্গিতে তাঁহাকে থামিতে বলিল। ছায়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহিণীকে নানা প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে লাগিল।

দাসদাসীরা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। গভীর বিষাদের করাল ছায়া বাড়ী খানাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ধাত্রীর বহু চেষ্টায় ও যত্ন শুশ্রূষায় সবিতার একটু জ্ঞান হইল। শীতল দেহ ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

"কেন মা, এই যে আমি।" বলিয়া গৃহিণী ব্যাকুলভাবে সবিতাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ধাত্রী তাহাতে বাধা দিয়া গৃহিণীকে একটু সরাইয়া দিল। তিনি পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওরে, আমার সবুকে একটু বুকে নিতে দে। তুই আমার সবুকে বাঁচিয়ে দে বাছা, যা চাস্ তোকে আমি তাই দেব।"

ধাত্রী তাঁহাকে অভয়দান করিতে লাগিল। গৃহিণী একটু আশান্বিতভাবে সবিতার নিকটে বসিয়া ডাকিলেন, "সবু, মা আমার!" সবিতা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। গৃহিণী তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভয় করো না, ভগবান ভাল করবেন।"

সবিতা আবার চক্ষু মুদিল। ধাত্রী তাহাকে বলকারক আরকাদি পান করাইল। পরে যেন সবিতা একটু শক্তি পাইল। সে আবার মাতার পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

"কেন মা, কি বলবে বল। এত ঘুমুচ্ছিস্ কেন সবু?"

"বড় ঘুম পাচ্ছে মা। উঃ বড় যন্ত্রণা!" বলিয়া সবিতা চক্ষু বুজিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ বুজিয়াই ক্রন্দনরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দিদি, সে ত এল না। আমি যে গো তার কাছে ক্ষমা চেতে পারলেম না।"

ছায়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সে আসবে সবু, এখন ত সময় হয়নি। তুই তার দেখা পাবি। সে জন্য ভাবিস্ নে।"

সহসা সবিতা চঞ্চল নেত্রে ছায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, সত্যই তুমি একথা বলছ? সত্যই তার দেখা পাব? সত্যই সে ক্ষমা করবে?"

"হাঁ সবু, সত্যই আমি এ কথা বলছি।"

সবিতা একটু তৃপ্তির সহিত আবার নয়ন মুদ্রিত করিল। ধাত্রী তাহার সন্তান প্রসব করাইবার

জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিধির বিধানের কাছে তাহার সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হইতে লাগিল। এইবার ধাত্রী ভয় পাইয়া গেল। তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া গৃহিণী ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ছায়া বহুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সবু, দিদি, আমার দিকে চেয়ে দেখ্। দেখে, আজ চিনে নে, আমি কে।" সবিতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সে তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল।

কক্ষ নিস্তব্ধ। রাত্রি গভীরা। সহসা বাড়ীর দ্বারে গাড়ীর শব্দ হইল। এত রাত্রে বাড়ীর দ্বারে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অমলের হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। সে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিতেছিল, "মাগো, ওমা, দেখে যাও, চোর ধরে এনেছি।"

গৃহিণী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ঐ পাগল ছেলেটার সদাই আনন্দ। তাহার চিন্তা ভাবনা কিছুই নাই। এখনও হয় ত সে কৌতুক করিয়াই এইরূপ বলিতেছে। কিন্তু অমলের সেই স্বরটা ছায়ার নিকট সম্পূর্ণ অন্য রকম শুনাইল। একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার দেহটি কম্পিত হইয়া উঠিল।

পার্শ্বের কক্ষেই উকীলবাবু চিন্তাকুলচিত্তে বসিয়া ছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অস্পষ্টালোকে অমলের পশ্চাতে আরও দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। এ কি! এতরাত্রে অমলের সঙ্গে এ কাহারা কোথা হইতে আসিল!

অমল পিতাকে দেখিয়া সভয়ে একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পশ্চাতের ব্যক্তিটি যেন কম্পিতপদে অগ্রসর হইয়া উকীলবাবুকে প্রণাম করিল। তিনি তীক্ষ্নয়নে তাহার দিকে চাহিলেন। চাহিয়া সেই অস্পষ্টালোকেও তিনি সেই ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়া বিস্ময়ে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, বহু চেষ্টায়ও তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না।

সকলেই নীরব। অমল বেশীক্ষণ সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে ভয়ে ভয়ে ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। বাবু গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "অমল!"

অমল আবার ফিরিয়া ভীতভাবে বলিল, "বাবা, আমি মার কাছে বলে গিয়েছিলেম। আর ফিরতে দেরী হল এই জন্য যে, সুরেশবাবু আর তাঁর পিশিমাও আজ আলিপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁদের দেখতে পেয়ে বললেম, আমাদের এখানে আসবার জন্য। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই এখানে আসতে চান না। আমায় তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। তারপর আমিও কিছুতেই ছাড়লেম না, আমার অনেক অনুরোধে, পরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।" বলিয়া অমল চুপ করিল।

বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, "ওঁকে ঐ ঘরে যেতে বল। সুরেশ এস।" বলিয়া তিনি সেই পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুরেশও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

পিসিমা ধীরে ধীরে প্রসূতির কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, "বৌমা!" সকলে চমকিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল। পিসিমাকে দেখিয়া ছায়ার মুখখানা প্রথমতঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু আবার দেখিতে দেখিতে সেইমুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। পিসিমাও ছায়াকে সেখানে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিন্তু তাহাদের সেই ভাব লক্ষ্য করিবার সময় কাহারও নাই। ধাত্রী রোগিনী, গৃহিণী কন্যাকে লইয়া অস্থির, তাঁহাদের বিস্ময় প্রকাশের অবসর কোথায়!

পিসিমা একটু দূরে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। তাহাতে কেহই কিছু বলিল না। কক্ষ নির্জ্জন। সবিতা ঘুমাইতেছে, মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছে। সহসা সে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "সে ত গো এল না, আমি ত তাকে আর দেখলেম না গো!"

ছায়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "সবু!" হঠাৎ সবিতা চক্ষু মেলিয়া পরিষ্কারকণ্ঠে বলিল, "কেন দিদি?"

"কাঁদিস্ নে, তোর বর এসেছে।" সবিতা উত্তেজিত ভাবে বলিল, "কই দিদি, কই?"

"তোর পিসিমাও এসেছেন।" সবিতা বিস্ময়াত্মকস্বরে বলিল, "আমার পিসিমা? তুমি তাকে কি করে জান দিদি? তারা এখন কোথায়?"

পিসিমা সবিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, "এই যে আমি বৌমা। তুমি এখন কেমন আছ মা?"

"পিশিমা, তুমি কি করে এলে?"

"সে কথা পরে জানবে মা, আগে সেরে নাও।"

"আর সারব কি? না, আর সে আশা করি না। পিসিমা, এগিয়ে এস আমার শেষ প্রণাম নাও।"

পিসিমা ও গৃহিণী একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ষাট্ মা, ষাট্, ভেব না, তুমি ভাল হবে।"

সবিতা অপলকনেত্রে মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "মা, তোমার এখনও সেই বিশ্বাস। না, মা, এখন থেকেই মনকে বেঁধে নাও। এস মা, আমায় জন্মের মত একবার বুকে ধরে'নাও।"

গৃহিণী সবিতাকে বক্ষে লইলেন। ছায়া সভয়নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি দেওয়ালের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ধাত্রীও সেইদিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "আরে ফিট্, ফিট্। জল আন, পাখা চাই।"

শুনিয়া একসঙ্গে কয়েকজন দাসী ছুটিয়া আসিল। ধাত্রী তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার করিতে লাগিল। চারিদিকে একটা হায় হায় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

কয়েকজন দাসী তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্য কক্ষে লইয়া গেল। সবিতা কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিল, "দিদি, কই তুমি? এই যে। আমি এ সংসারে এসেছিলেম, কেবল মানুষকে কষ্ট দিতে। তুমি আমার কোন্ অজানা অচেনা দিদি, আজ শেষ বিদায় নিচ্ছি, যদি—"

ছায়া সবিতার বুকের উপর পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "বলিস্ নে, আর বলিস্ নে সবু, চুপ কর। তুই আমায় অজানা অচেনা বলিস্ নে, সত্য পরিচয় জান্। জেনে যা, আমি তোর কে। আমি তোর সর্ব্বনাশিনী, আমিই তোর দুঃখদায়িনী,—কিন্তু তা বলে আমি তোর সতীন নই সবু। আমায় আর যা ইচ্ছা মনে করিস্, কিন্তু সতীন বলে মনে করিস্ নে, সেটা আমার সহ্য হবে না বোন।" বলিয়াই ছায়া চক্ষু নত করিল।

সবিতা স্তম্ভিতনেত্রে ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি প্রহেলিকা! দেখিতে দেখিতে সবিতার নেত্র বাহিয়া বর্ষার বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "সত্যই তুমি তাই? কিন্তু লোকে যেমন বলে, তেমন কিছুই ত তোমার মধ্যে দেখছি না দিদি। ওঃ আমি কি ভুল করেছি, তোমার মত দেবীকে আমি অন্য রকম ভেবেছি। তাই ত ভগবান আমায় আজ সেই ভুলের দণ্ড দিচ্ছেন। দিদি,—দিদি,—তুমি আমায় ক্ষমা করবে কি?" সবিতা আর কিছু বলিতে পারিল না, কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গেল।

ছায়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না, সে সবিতাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। একটা দমকা বাতাসের মত সবেগে সুরেশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "সবিতা! সবিতা! একান্তই যাও যদি তবে আমার দুটি কথা শুনে যাও।"

সবিতা বিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিল। রক্তশূন্য পাণ্ডুর গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। সে অতিকষ্টে হাত বাড়াইয়া, স্বামীর পদধূলি মস্তকে দিয়া, অশ্রু প্লাবিতমুখে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা? তুমি আমায় ক্ষমা করেছ কি সবু? যদি—"

"আমায় যদি ক্ষমা করে থাক, তবে আমার অনুরোধ,—এবার দিদিকে সুখী করো। আমার দুঃখিনী দিদির মুখে এবার সুখের হাসি ফুটিয়ে দিও। আর কি বলব,—আর কিছু বলতে পারছি নে, তুমি—আমায় ক্ষমা—কর। দিদি,—আমার দিদি,—ক্ষমা,—মা,—বাবা,"—বলিতে বলিতে সবিতার কণ্ঠ জড়িত হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল।

আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া ছায়া বলিল, "সবু, এখনই ঘুমাস্ নে,—এখনই ঘুমিয়ে পড়িস্ নে।"

অনুচ্চকণ্ঠে শব্দ হইল, "ঘুম আসছে,—ঘুম,—ঘুম—" বলিতে বলিতে সবিতা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

সুরেশ পাগলের ন্যায় সেই জ্যোতিহীন শীতল মুখ তুলিয়া ধরিয়া অপলক নেত্রে সেই মুখের দিকে চাহিয়া, বলিল, "পাষাণী,—একটু,—আর একটু থাম। আমার সবগুলি কথা শুনে যাও,—দুটি কথা বলতে দাও আমায়,—নিঠুর,—এখনই ঘুমিয়ে পড়লে? এইমাত্র এসেছি,—দুটি কথা

বলবারও সুযোগ দিলে না ?—সবিতা,—সবিতা, এখনও কি অভিমান! এখনও কি সেই অভিমানেই মুখ ফিরালে ?”—বলিয়া সুরেশ তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, সেই হিমশীতল কপোলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া বলিল, “তবে যাও সবু, জন্মান্তরে তুমি সুখী হয়ো।” নিদ্রা, নিদ্রা, মহানিদ্রা।

এই শেষ বয়সে হৃদয়ে এইরূপ একটি অসহ্য আঘাত পাইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। তেমন ধৈর্য্যবান ব্যক্তিও এইরূপ গুরুতর আঘাতে বিচলিত না হইয়া পারেন না। তাঁহারা উভয়েই শোকে জীবিতাবস্থায়ও যেন মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। ছায়া সর্ব্বদা সেই শোক-সন্তপ্ত দম্পতির নিকট থাকিয়া যথাকর্ত্তব্য পালন করিত।

তাহাদিগকে এইরূপ শোকগ্রস্ত অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া পিসিমা কিছুদিন সেখানেই রহিলেন। পিসিমার পীড়াপীড়িতে সুরেশও সেখানে থাকিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সে যে কি অবস্থায় রহিল, তাহা যেন সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। সে আর কিছুই যেন বুঝিতে পারিত না, কেবল তাহার মনে হইত, সংসারটা যেন অস্থি কঙ্কালময় একটা মহাশ্মশানভূমি। ইহা যেন নিতান্তই শূন্য, নিতান্তই সারহীন। ইহাতে যেন কিছুই নাই,—আছে কেবল,—অমোঘ দণ্ড—প্রায়শ্চিত্ত। ইহা যেন শুধু একটা দণ্ডালয় মাত্র।

ছায়া সবিতার মৃত্যুদিন ভিন্ন সুরেশের তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেদিন সবিতার নিকট সে একটি রমণীকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই রমণী যে কে, তাহা সুরেশ একেবারেই লক্ষ্য করে নাই। তাহার পর হইতে ছায়াও এমন গোপন ভাবে চলিত যে, সে যেন কখনও স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত না হয়।

কিন্তু সে এইরূপ বহু সতর্কতার সহিত চলিলেও তাহার মন যেন তাহাতে বিধ্বিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুতেই স্বস্তি নাই,—কিছুতেই শান্তি নাই,– বড়ই কষ্টকর অবস্থা। দিন দিনই সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, দিন দিনই তাহার সেই গর্ব্বিত ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

সে আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, একদিন নিজের অজ্ঞাতেই স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ ত তাহাকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত। ইহাও কি সম্ভব! সে এখানে কি করিয়া আসিতে পারে। তবে? ইহা ত স্বপ্ন নয়? না,—এই যে সত্যই সেই মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে আসিল!

সুরেশ স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিল, সে উঠিয়া পাগলের ন্যায় ছায়ার হাতে ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “তুমি? তুমি এখানে?”

ছায়া সহসা চমকিত হইয়া উঠিল, একি, সে এখানে কেন আসিয়াছে ! কি উদ্দেশ্যে,—কখনই বা আসিয়াছে ! ছায়া দুইপদ পশ্চাতে হটিয়া গেল।

সুরেশ উন্মাদের ন্যায় উজ্জ্বলচক্ষে চাহিয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দয়া কর, না বলে যেও না,—সতুর মত নিষ্ঠুরতা তুমিও কর না। বল,—এখনও শাস্তি দেওয়ার কি বাকী রয়েছে ? তুমি আমার দণ্ডদাতা,—বল,—দণ্ড কি এখনো শেষ হয় নি ?" ছায়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। আবার সতেজে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি কারও দণ্ডদাতা নই, কেবল সবুর দিদি।" স্বর বড় কাঁপিয়া উঠিল; তাই সে আর কিছু বলিল না।

"তার দিদি তুমি ? সে যাওয়ার সময় কি বলে গিয়েছিল, তা জান কি ? তার সেই অন্তিম অনুরোধ আমার এখন মনে পড়ছে—রাখতে দেবে কি ? আমি পাপী,—ক্ষমার অযোগ্য,—কেবল সেই মৃতাত্মাটাকে ক্ষমা করবে কি ? তার প্রতি এতটুকু কৃপা করে, তাকে একটু শান্তি পেতে দেবে কি ?"

"তাকে আবার কিসের ক্ষমা ! তার কি কোন অপরাধ আছে ? সে আমার এই প্রাণে গাঁথা বোন্,—সে, কতই অন্যায় আবদার করতে পারে,—" ছায়া আর কিছু বলিতে পারিল না, বলিবারও এমন কিছু ছিল না। সুরেশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে কার্য্যচ্ছলে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গিয়া এক নির্জ্জন কক্ষে বসিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যে ঘটিয়া গেল, তাহা যেন সে বুঝিতেই পারিল না। কেবল প্রাণটা ছটফট্ করিতে লাগিল, বুকটা সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। যেন সে প্রাণের সর্ব্বোত্তম অমূল্য কি একটা বস্তু হারাইয়া আসিয়াছে। অস্বস্তি,—অস্বস্তি,—কেবলই অস্বস্তি। দুর্ব্বল হৃদয় কেন আজ এমন তৃষিত ? তাহার সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে,—আর কেন ! সকলই যখন গেল,—তখন আর একটা কেন থাকিবে ! ইহারও যে শেষ করাই উচিত। এমন দহন জ্বালা আর যে সহ্য হয় না। স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া বলিতে হইবে, "প্রভু,—তোমারই জয়,—তোমারই জয়,—আমারই পরাজয়। আর পারি না, আমায় রক্ষা কর,—সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছি,—এখন আর আমি আত্মস্থ নই। নির্ব্বল,—একান্তই বলহীন,—বলহীন,—মুক্তি চাই,—ঐ চরণে স্থান চাই। বুঝেছি, রমণীর আর কিছুই নাই, আছে কেবল দাসীত্ব।" ছায়া উঠিল, কম্পিত পদে স্বামীর কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া পা দুইটা আর উঠিল না। সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, আবার পলাইয়া যায়। কিন্তু ছিঃ এখনও অভিমান ! মান অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া আজ ঐ চরণে স্থান লইতে হইবে যে। অতি কষ্টে ছায়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া, নতজানু হইয়া তাহার পদমূলে বসিয়া পড়িল। দুইহস্ত সংলগ্ন করিয়া মস্তক ঈষৎ নমিত করিল। সুরেশ স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিল, সে নিঃশব্দে পা দুইখানি সরাইয়া লইল।

ছায়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখনও পা ছুঁইবার অধিকার নাই আমার? বল,—এখনও কি মুক্তি দিবে না আমায়? যত বড় অপরাধই করে থাকি,—তার কি মার্জ্জনা হবে না?"

সুরেশ স্তম্ভিত। এই একটু আগে সে তাহার মনোবল দেখাইয়া সুরেশকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছে,—সুরেশ মনে মনে তাহার নিকট পরাজয়ও স্বীকার করিয়াছে,—কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার এ কি পরিবর্ত্তন!

"যতই অযোগ্যা হই না আমি, তবু অন্ততঃ ঐ পা ছোঁবার অধিকারও কি দেবে না আমায়? বল,—আর—"

সুরেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া, মুখখানাকে অন্যদিকে ফিরাইয়া ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "অনেক চেয়েছিলেম,—কিন্তু তুমি তা দাওনি—দাওনি।"

ছায়া আবার হাতজোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাঁড়াও, আজ এর একটা শেষ করে যাও।—দিয়েছি, সবই দিয়ে দি'ছি, আর কিছুই নাই আমার হাতে,—শুধু ঐ পা সম্বল।—"

সুরেশ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এ কি, ইতিপূর্ব্বে যাহার গর্ব্বিত মস্তক দেখিয়া তাহার নিজের মস্তক নত হইয়াছিল,—এখন যে সেই মস্তকই তাহার পায়ের নিকটে অবনত।

ছায়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হঠাৎ স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, নেত্র হইতে অজস্র বারিবর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "ঐ পায়ে আমায় স্থান দেবে না? আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে, আর পারি না,—এতকাল যুঝে এসেছি,—কেবল সেই সম্বলটুকু নিয়ে।—ক্ষমা কর,—দয়া কর,—ওখানে আমায় স্থান দাও।"

সুরেশ ছায়ার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "উঠ ছায়া,—চিরদিনের তরে মান অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়ে,—তোমার স্থান তুমি নাও,—আমার স্থান আমায় দাও।"

এই বলিয়া সুরেশ ছায়াকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। সমাপ্ত

শ্রীচপলাবালা বসু

রামগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উচ্চপদে ভারতবাসী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়

দেশের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়া তদুদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, শারবোর্ণ, মার্টিন বাওয়ল (Martin Bowle) অ্যারাটুন পিটারস (Arratoon

Peters) প্রভৃতির বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে শিক্ষা, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার স্রোত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সৃষ্টি হয়। সে সময়ে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি, প্রয়োজন হইলে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন, উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদিগকে সাহায্যদান প্রভৃতি এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল উপায়ে এই শিক্ষার স্রোত আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজ হইতে প্রতিবৎসর নূতন শিক্ষিত ছাত্র বাহির হইতে লাগিল, অন্যান্য বিদ্যালয় লইতেও অল্পশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত যুবকদল বাহির হইয়া জীবন সংগ্রামে যোগ দিল। প্রথম শিক্ষিত দলের কয়েকজন গভর্ণমেণ্টের নিকট উচ্চ চাকুরী লাভ করিল, সুতরাং শিক্ষিত দলের আশাও বর্দ্ধিত হইল। তারপর তাহাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যখন তাহাদিগকে উচ্চ পদস্থ করিল ও তাহাদিগের নিজের পদের তুলনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিল, তখন তাহারা দেখিল উভয়ের পার্থক্য অনেক। তাহারা উচ্চতর পদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সুলিভ্যানকে ধন্যবাদ দিবার নিমিত্ত যে সভা হয় তাহা ঔৎসুক্যের সমবেত অভিব্যক্তি।

মুসলমান রাজত্বকালে এ দেশীয়েরা উচ্চরাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বঙ্গে ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভে সেই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল। সে সময়ে কাউন্সিলের ইংরাজসভ্য যখন মাসিক তিন সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেন তখন বাঙ্গালার একপ্রকার ডেপুটি নবাবদ্বয়—রাজা সিতাব রায় ও মহম্মদ রেজা খাঁ—প্রত্যেকে বাৎসরিক নয় লক্ষ মুদ্রা বেতন পাইতেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার মাসিক ছয় সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেন। ইংরাজ অধিকারের পনের ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ-দিগের অপেক্ষা এ দেশীয়েরা অধিক বেতন পাইয়াছিলেন। মুসলমান সময়ে অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের বেতন অবশ্য অল্প ছিল, কিন্তু বেতন অল্প হইলেও আয় যথেষ্ট ছিল। বাদসাহ উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী-দিগকে মাসিক বা বাৎসরিক বেতন ভিন্ন যে জমি ও এককালীন পুরস্কার প্রদান করিতেন, অনেক কর্ম্মচারী সেই জমী হইতে তাঁহার রাজসম্মানের উপযুক্ত আয় করিয়া লইত। নিম্ন কর্ম্মচারীদিগেরও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশেও এই রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এই প্রণালী প্রচলিত ছিল। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে এ প্রথার ফল অনিষ্টকর বা উত্তম হইত; অত্যাচারী হইলে অধীনস্থ প্রজা বা ব্যক্তিগণ নির্য্যাতন ভোগ করিত, লোকরঞ্জক হইলে তাহারা সুখভোগ করিত। তখন সমস্ত "উপরি আয়" উৎকোচের মধ্যে গণ্য হইত না, উপহার বা বখশিস্ গ্রহণ তখন কৃতকার্য্যের ন্যায্য মুনাফা ছিল। সাধারণতঃ বেতনের হার অল্প ছিল, সুতরাং সম্মান রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে হইতে রাজকর্ম্মচারীকে অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সহিত সম্প্রীতি করিতে হইত। এরূপ রাজকর্ম্মচারী যাঁহাকে আয়ের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাঁহাকে কতকাংশে জনপ্রিয় হইতে হইত এবং প্রজাগণের ও দেশের আভ্যন্তরীণ নানা বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইত, এইরূপে তাহারা যে-যে স্থানে থাকিত সেই স্থান বা গ্রাম বা পরগণার সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিত। এই প্রথায় রাজকর্ম্মচারী রাজা ও প্রজা উভয়েরই সন্ধিস্থলে থাকিয়া উভয়ের সম্বন্ধের ও স্বার্থের সামঞ্জস্য

রক্ষা করিতে পারিত। ইংরাজ যখন এ দেশে আগমন করিল তখন দেশ অরাজক, রাজকর্ম্মচারী প্রথাতেও অনেক দোষ আশ্রয় করিয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মচারীরা তখন কেবল মাত্র প্রজা-নিপীড়নে রাজশক্তির অপব্যয় করিতেছিল। ইংরাজ আসিয়া দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিল—ইহাই দেশের দুর্ভাগ্য।

ইংরাজ যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, তথাকার রাজকর্ম্মচারী-প্রথা ভিন্নরূপ। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্ত্তনে সেখানে পরিশ্রমের বিভাগ হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল, একজনের আর একজনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিলনা, যদি ইহার প্রয়োজন হইত তাহা হইলে তাহার জন্যও লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজার নামেই পদ নিয়োগ হইত কিন্তু সকলের উপর প্রজাপ্রতিনিধি পার্লামেণ্ট মহাসভার প্রত্যেক বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিমিত্ত বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া তাহাদিগকে প্রজার উপর নির্ভর করিতে হইত না, সুতরাং তাহারা নিয়োগকর্ত্তার অভিপ্রায় অনুসারে ও তাহার আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিত। ইহারা নিয়োগ কর্ত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। সে যাহা হউক ইহাতে একটি সুন্দর শৃঙ্খলা ছিল। বিলাতে যে কোন কর্ম্মচারী অন্যায় উপায়ে অর্থ সংগ্রহ বা উৎকোচ গ্রহণ করে নাই তাহা নহে, সেখানেও রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সাধুতা অনেক বিলম্বে প্রকাশ পাইয়াছিল। দার্শনিক বেকন (Bacon) বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়াও মোহিনী মুদ্রার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তথাপি ইংরাজ যাহা জানিত সেই প্রথাই অবলম্বিত হইল। ভারতে প্রণালীবদ্ধ রাজকর্ম্মচারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এই ভারতবর্ষীয় প্রথার সহিত বিলাতী প্রথার এই পার্থক্য রহিল যে, পার্লামেণ্টের সভ্যেরা দেশবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ নানারূপে অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিত, কিন্তু এখানে যাহা নূতন প্রবর্ত্তিত হইল তাহাতে রাজকর্ম্মচারীরা শুধু শাসক হইল, দেশবাসীর সহিত একেবারে সম্পর্কবর্জ্জিত হইল। এদিকে ইংরাজ এখানে অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের মাসিক পুরস্কার অল্প রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অনুসারে তাহাদের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু মুসলমান সময়ে শাসন কর্ত্তার জ্ঞাতসারে প্রচলিত প্রথামত কর্ম্মচারীদিগের যে আয় ছিল, সে আয় বিলাতে ন্যায্য বলিয়া গণ্য হইত না, সুতরাং এখানেও উহা উৎকোচের মধ্যে গণ্য হইয়া কর্তৃপক্ষের চক্ষে হেয় হইয়া উঠিল, ও সাধারণ কার্য্যের অনুপযুক্ত ও অন্যায় পারিশ্রমিক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে যখন ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদিগের বেতন অল্প ছিল, তখন তাহাদিগের মধ্যেও অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের ঘটনা যথেষ্ট প্রকাশ পাইত। ক্রমশঃ ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদিগের বেতন বর্দ্ধিত হইল এবং দেশীয়দিগের বেতন হ্রাস পাইল। ফলে, প্রথমোক্তদিগের মধ্যে একটি সাধু ও মাননীয় কর্ম্মচারী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল ও দেশীয়দিগের মধ্যে উৎকোচগ্রাহী অত্যাচারী সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল। এরূপ উৎকোচগ্রাহী অত্যাচারী সম্প্রদায়কে কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবে? সেজন্য তাহারা সমস্ত রাজকার্য্য হইতে বিতাড়িত হইল। লর্ড

কর্ণওয়ালিস্, যিনি বাঙ্গলা ও বিহারে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তিনিই দেশীয়দিগের বেতন মাসিক দশমুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৫০৲ টাকা মূল্যের মামলা করিবার উচ্চ বিচারকের আসনে বসিবার অধিকার প্রদান করিলেন; উহার উচ্চে যে সকল পদ রহিল তাহাতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। বঙ্গদেশে তখন প্রায় চারিকোটি অধিবাসী ছিল, এই চারিকোটি অধিবাসীর শাসন ও বিচারাদি ভাষা ও আচার-বিচার-অনভিজ্ঞ বিদেশী কর্ম্মচারীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। এই অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রামগোপাল বলিয়াছিলেন যে, এরূপ অবস্থায় বিদেশী কর্ম্মচারীদিগকে বহুল অংশে দেশীয়দিগের উপর নির্ভর করিতে হইত। স্বল্প বেতনভোগী দেশীয় কর্ম্মচারীরাও এই অবসরে বেশ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টার ইহার কারণ বুঝিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে লিখেন যে, যে সকল ভারতবাসীকে গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিবেন তাহাদিগের বেতনের হারও উদারভাবে নিরূপিত হইবে, তাহাদের পারিশ্রমিক কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিবে না। যে সকল ইউরোপীয়দিগকে ভারতবাসীর ন্যায় সমান বিশ্বাস বা প্রয়োজনীয় পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা অতি সমৃদ্ধির সহিত বাস করে। একটি সম্প্রদায় প্রলোভনে পড়িতে পারে বলিয়া উহাকে প্রলোভনের বাহিরে রাখা হইয়াছে, আর একটি সম্প্রদায়কে তদনুযায়ী সাধুতায় প্রণোদিত না করিয়া উৎকোচের প্রলোভনে ফেলিয়া তাহাদিগকে উৎকোচ গ্রহণের নিমিত্ত দোষারোপ করা উচিত নহে।

"It is nevertheless essential......in India, that the natives employed by our Government shall be liberally treated, that their emoluments should not be limited to a bare subsistence, while those alloted to Europeans, in situations of not greater trust and importance, enable them to live in affluence and to acquire wealth, while one class is considered as open to temptation and placed above it, the other without corresponding inducements to integrity, should not be exposed to equal temptation and be reproached for yielding to it."

ইহা ব্যতীত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের ৮৭ ধারায় যাহা লিপিবদ্ধ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সুলিভ্যানকে ধন্যবাদ দিবার জন্য যে সভা হয় সেই সভায় রামগোপাল ঘোষ এ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করেন। তখন হইতেই Bureaucratic government এর আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই উহার বিপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে। আন্দোলনের পদ্ধতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ও নূতন পদ নিয়োগ ব্যবস্থা

লর্ড হার্ডিঞ্জের নিয়োগে বিলাতে ডিরেক্টার সভ্য তাঁহাকে যে ভোজ দেন তাহাতে নব নির্ব্বাচিত বড়লাট বিশেষরূপে প্রশংসিত হন, তবে বোর্ড অফ কমিশনারদিগের অধীনে

ডিরেক্টারগণই যে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা তাহাও এই সময়ে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। লর্ড এলেনবরোর প্রত্যাহ্বানের হুকুমের জন্য বিলাতে পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রশ্ন হয়, তাহাতে ইহা স্বীকৃত হয় যে, বড়লাট পদে নিয়োগ করিবার সময় সম্রাটের সম্মতির প্রয়োজন কিন্তু পদচ্যুতিতে ডিরেক্টারদিগের হুকুমই চরম। নূতন বড়লাটকে ডিরেক্টারদিগের কর্ত্তৃত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোম্পানীর সিভিল সার্ভেণ্টসকল ভারত-শাসন করিবার জন্য বিশেষরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত; তাহাদের ন্যায়-অনুমোদিত ও সুবিচারিত কার্য্যের উপর ভারতবাসীর সুখ নির্ভর করিত, সেই জন্য এই সিভিলিয়ানদিগকে উচ্চ প্রশংসা বাক্যে প্রশংসিত করা হইয়াছিল। সামরিক ও অসামরিক উভয়বিধ রাজকর্ম্মচারীদিগের গুণ ও উৎসাহ স্বীকৃত হইয়াছিল। ভারতে তখন শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই শান্তি রক্ষা করিবার জন্য ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ভারতীয় সমৃদ্ধির পূর্ণ পরিপুষ্টি করিবার নিমিত্ত, লর্ড হার্ডিঞ্জকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, ভারতবাসীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সংস্কারাদির কোন প্রকার বিপক্ষতাচরণ না করিয়া যাহাতে তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার বহুল বিস্তার সাধিত হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার এবং ব্রিটিশ রাজ্যের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া যাহাতে পিতার উপযুক্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য নবনিযুক্ত লাটের প্রতি বিশেষ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে রামগোপাল সুলিভ্যানের ধন্যবাদ সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ভারতবর্ষের শাসন যাহাতে পিতার উপযুক্ত হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"The aborigines of a country owe their rights to the land they occupy to none but to the Almighty Father of the great family of mankind. All the advantages arising from the possession of that land, constitute their birth rights. In the inscrutable wisdom of Providence and the arrangements of Society, these rights and privileges are to a certain extent, surrendered in the course of time to Govt. for the mutual and equal benifit of the whole people. Therefore; every Govt. ought to be a *paternal Government*........."

সুতরাং যখন জননেতার ও গভর্ণমেণ্টের মত প্রায় একই, সেরূপ স্থলে প্রজারঞ্জক বলিয়া খ্যাতিলাভ করা কেবলমাত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল। ডিরেক্টাররা আশা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া পুরস্কার স্বরূপ ভারতবাসীর ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি সময় শেষে বিলাতে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহাদিগের সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

এদিকে উচ্চপদে ভারতবাসী নিয়োগের জন্য যেমন আন্দোলন হইতেছিল, অন্যদিকে তেমনি সুশৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন

হইয়া উঠিতেছিল। যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী তখন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহাদের বেতন অত্যন্ত অধিক ছিল। সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে বহু সংখ্যক কর্ম্মচারীর নিয়োগ আবশ্যক, কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতনের হারে এতগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা অসম্ভব, সুতরাং অল্পব্যয়ে রাজকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচনের নিমিত্ত বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা চিন্তিত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশে দেশীয় শিক্ষিতদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যের অংশীদার করিয়া এই সমস্যার সমাধান করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ এ বিষয়ে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে একখানি পত্রে লিখেন :—

*   *   *   *   *

"In order to reward native talent and render it practically useful to the State, Sir Henry Hardinge, after due deliberation, has issued a resolution, by which the most meritorious students will be appointed to fill the public offices which fall vacant throughout Bengal.

*   *   *   *   *

"It is impossible throughout your Majesty's immense Empire to employ the number of highly paid European Civil Servants which public service requires. This deficiency is the great evil of British Administration. By dispensing annually a proportion of well-educated natives throughout the provinces, under British Superintendence, well-founded hopes are entertained that prejudices may gradually disappear, the public service be improved, and attachment to British institutions increased.........."

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর ভারতীয় শিক্ষিত যুবকদিগের জন্য কতকগুলি উচ্চপদ মুক্ত করিয়া দিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ উপরে উল্লিখিত রেজোলিউসনটি প্রচার করেন। গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই সকল বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং ভারতবাসীর মধ্যে যাহাতে ডিরেক্টারদিগের ইচ্ছানুযায়ী সমধিক শিক্ষা প্রচারিত হয় সেই কারণে, যে সকল যুবক উপযুক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে চাকুরীতে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তদানীন্তন শিক্ষা পরিষদ, Council of Educationকে, প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে ছাত্রদিগের গুণ, বয়স ও অন্যান্য অবস্থা নির্দ্দেশিত করিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার জন্য নাম পাঠাইতে বলেন। তদ্ব্যতীত সাধারণের মধ্যে যাহাতে সম্যকরূপে শিক্ষার বিস্তার হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, সর্ব্ব নিম্ন পদগুলিতেও নিরক্ষর অপেক্ষা যে লিখিতে ও পড়িতে পারে এরূপ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে। রামগোপাল ইহার দ্বারা দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ দেখিয়া আনন্দিত হন। তিনি বলিতেন যে, অধঃপতিত জাতির উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়।

সেই বৎসর ২৫শে নভেম্বর সার হেন্‌রি (পরে লর্ড) হার্ডিঞ্জের উক্ত রেজোলিউসনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ফ্রী চর্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন হলে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এ দেশবাসীর একটি সাধারণ সভা হয়। সেই সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম মন্তব্যটি এইরূপ ছিল যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়াছেন, সেইজন্য এই সভার মতে তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রয়োজন। রামগোপাল এই রেজোলিউসনটি প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ গতবৎসর হিন্দু কলেজের পদক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবাসী যাহাতে সম্যক শিক্ষা লাভ করেন তাহার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক ; সেই কারণে রামগোপাল আশা করিয়াছিলেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ এইরূপ কার্য্যই করিবেন। যাহা হউক উক্ত মন্তব্যের কার্য্য ব্যবস্থা অবশ্য পরে প্রকাশিত হইবে কিন্তু ইহার নৈতিক ফল এখন হইতে অনুভূত হইবে। গভর্ণার জেনারল যেরূপ যত্ন লইয়াছেন ইহাতেই শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা একটি ফ্যাসান হইয়া উঠিবে। শিক্ষালোকিত রাজকর্ম্মচারীর হৃদয়ে যখন শিক্ষা বিস্তারের বাসনা উদৃক্ত হইয়াছে তখন তাহা হইতে প্রচুর মানসিক ও নৈতিক সুফল আশা করা যায়। তৎপরে তিনি বলেন যে, এদেশবাসী যত প্রকার দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করেন শিক্ষাই সে সকল প্রতিকারের অব্যর্থ উপায়। উচ্চশিক্ষা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন একত্রে থাকিতে পারে না। শিক্ষা বিস্তারের ন্যায় এরূপ মহৎ কার্য্যে উচ্চপদস্থ যে ব্যক্তি তাঁহার কর্ত্তৃত্বের মোহরাঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার নিকট তাঁহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

তৃণফুল

অলি তা'র দ্বারে ঝুলিখানি কই পাতে ?
তরুণী আঙুল মালায় তারে না গাঁথে।
মধু বিন্দুটি নাহি তার দল পুটে,
সৌরভ যাচি' বায়ু ত পায়ে না লুটে।

গোপন মরমে অস্ফুট ভাষার গান
শিশিরে ঝলকি' আলোকে মেলেছে প্রাণ।
আঁখি-জলে-ভেজা হাসিমাখা মুখখানি।
—হাসি কান্না সে শরত রাণীর বাণী।

হোক্ না সে হায়। যত ছোট তৃণফুল
প্রভাতের আলো তা'র বুকে দুল দুল।
তা'র গীতিকণা আকুতি মিনতি আশা
তার ইতিহাস ঈষৎ মধুর হাসা।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বন্ধু

নিশুতি রাত ; সে ছিল একা।

অদূরে একটা প্রাকার বেষ্টিত নগর—সেই দিকে সে চল্‌লো।

কাছে এসে শুন্‌লে নগরে উৎসব চলেছে। বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল নূপুর সিঞ্জন, উচ্ছ্বসিত আনন্দ কোলাহল, অসংখ্য বীণার মধুর ধ্বনি। সে সিংহদ্বারে আঘাত কল্লে, প্রহরী দরজা খুলে দিলে।

সাম্‌নে চেয়ে দেখ্‌লে শ্বেত পাথরের টুক্‌রো দিয়ে গড়া এক সুরম্য অট্টালিকা। বড় বড় থামগুলো তার নানারকম ফুলের মালা দিয়ে সাজান। প্রাচীরের চারিদিক দেবদারু গাছ দিয়ে ঘেরা।

দু'একটা চমৎকার ঘর ছাড়িয়ে শেষে সে একটা কারুকার্য্যময় ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে দেখ্‌লে ভেল্‌ভেটের ওপর জরীর কাজ করা একটা সুশ্রী গদীর ওপর এক অনিন্দ্য-সুন্দর পুরুষ শুয়ে রয়েছে। চুলগুলো তার গোলাপের লালিমার মত মনোরম, ঠোঁট দুটো মদের মতো রাঙা।

সে পিছন দিক দিয়ে গিয়ে তাকে স্পর্শ কর্‌লে, তরুণ চম্‌কে উঠ্‌লো। সে বল্‌লে,—"এ রকম ভাবে বেঁচে আছ কেন ভাই ?"

তরুণ ফিরে তাকালে, তাকে চিন্তেও পাল্লে। উত্তর দিলে,—"আমি যখন কুষ্ঠ রোগে ভুগ্‌ছিলাম, তুমিইতো আমাকে বাঁচিয়েছিলে। আর কেমন করে বাঁচ্‌তে বল তুমি ?".........

সে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লো।

খানিক পরে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হোল, পরণের রঙীন্ কাপড়খানা তাকে সুন্দর মানিয়েছিল। নিঃশব্দে এক যুবক এসে তার পেছনে দাঁড়ালো, শিকারীর বেশে। রমণীর মুখখানি প্রতিমার মত নিখুঁত, আর যুবকের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আস্‌ছিল একটা কামনার দীপ্তি !

সে নিঃশব্দে চরণ ফেলে যুবককে স্পর্শ কল্লে। বল্লে,—"তুমি অমন ভাবে রমণীর দিকে তাকাও কেন ?"

যুবক ফিরে চাইতেই চিন্তে পাল্লে। বল্লে,—"আমি যখন অন্ধ ছিলাম, তুমিই তো আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলে। আর কেমন করে চাইতে বল তুমি ?".........

সে দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে রমণীর রঙীণ বসনের প্রান্ত ধরে বল্লে,—"আর কোন উপায়ে কি পাপের পথ থেকে সরে দাঁড়ান যায় না ?"

রমণী তাকে চিন্তে পাল্লে। একটু হেসে বল্লে,—"তুমিই তো আমার পাপ ক্ষমা করেছিলে। আর কোন্ পথে যেতে বল তুমি?".........

সে নগরের বাইরে চলে গেল। যাবার সময় দেখ্‌লে একটা লোক পথের ধারে বসে কাঁদ্‌ছে।

সে তার কাছে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে,—"কাঁদ্‌ছো কেন ভাই?"

লোকটা তার মুখের দিকে তাকালে, চিন্তে পাল্লে। বল্লে,—"আমি এক সময় মরে গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমিইতো আমার জীবন দিয়েছিলে। কাঁদা ছাড়া আর আমার অন্য উপায় কি আছে?".........

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী

আশুতোষ স্মৃতি

আজ একটি বৎসর হইল, সার আশুতোষ আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। মনে পড়ে সুরধুনী তীরে গত ২৫শে মে প্রাতের সেই প্রকাণ্ড ভিড়। অকস্মাৎ বজ্রাহত হইয়া যেন সমস্ত নগরী হাওড়ার পুলের দিকে ছুটিয়াছে। কত রাজা মহারাজা, কত শিক্ষিত অশিক্ষিত, কত শত্রুমিত্র, শোকক্ষিপ্ত হইয়া সেই সিংহবিক্রম পুরুষের বরবপুর শব দেখিতে ছুটিয়াছেন। তখনও আমরা বুঝি নাই, আমাদের ক্ষতি কত অপ্রমেয়, বিধাতার সেই দণ্ড কত নিদারুণ! সেদিন হিসাব নিকাশের অবসর ছিলনা। সেদিন দিগন্তব্যাপী বন্যায় যেমন রাজপ্রাসাদ ও কুটীর ভাসিয়া যায়, সেইরূপ মহানগরী মর্ম্মব্যথার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল; বাতব্যাধিতে যেরূপ সমস্ত শরীর স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেদিন আমরা সেরূপ হইয়াছিলাম। কোথায় ব্যথা লাগিয়াছে, সেদিন যেন সে বোধ লুপ্ত হইয়াছিল। যখন ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত প্রমথনাথ অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে শব লইয়া হাওড়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, তখন সে কি নিদারুণ দৃশ্য! আশুতোষের প্রিয় নয়নপুত্তলী পুত্রগণের দুর্দ্দমনীয় শোকাবেগ সমস্ত জনমণ্ডলীর মর্ম্ম বিদীর্ণ করিতেছিল। সেদিন কেওড়াতলার শ্মশানক্ষেত্রে দেখিলাম শ্রুতকীর্ত্তি শুভ্রকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক ষ্টিফেন, নীল চশমা যুগল খুলিয়া গণ্ডপ্লাবী অজস্র অশ্রু মোচন করিতেছেন। হাওড়া পুলের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেই সর্ব্বজনবরণীয় মহাপুরুষের শবের নিকট উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। একস্থানে দেখিলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজা অতি চঞ্চল পাদক্ষেপে রেলওয়ে মঞ্চে পুরুষবরের শববাহী শকটের প্রতীক্ষায় আনাগোনা করিতেছেন। সেদিন যে সকল দৃশ্য

* Oscar Wilde—অবলম্বনে।

দেখিয়াছিলাম, তাহার কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি মনে পড়ে; তাহা দেশব্যাপী ভূমিকম্প জলপ্লাবন কিংবা দিগন্তপ্রকম্পী ঘূর্ণাবর্ত্তের একটা দুঃস্বপ্নের মত। তাহা এত বিভীষিকাময় যে তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা মনে আনিতে পারিতেছিনা।

তাহার পর তাঁহারই সৃষ্ট দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদের সোপানে কতবার যেন সেই চিরপরিচিত পাদক্ষেপ শুনিয়াছি। মনে হইয়াছে সেই সুগভীর পদশব্দে সমস্ত গৃহগুলি কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার উপস্থিতিতে সমস্ত আফিস ঘর, সমস্ত অধ্যাপনার গৃহগুলিতে যেন একটা তড়িৎশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। সেই সকল দিনের ছবি এখনও যেন মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি যেন প্রতিনিধি পাঠাইয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছেন। বিচিত্রবর্ণের পাগ্‌ড়ি মাথায় পরিয়া বর্গীশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারকর তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন,—প্রকাণ্ড গেরুয়ার আল্‌খাল্লা গায় সৌম্যমূর্ত্তি সিংহলী পরিব্রাজক সিদ্ধার্থ তাঁহাকে দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার জানাইতেছেন, তামিলভাষী রাও বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ তাঁহার নিকট anthropologyর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন—বিশ্ববিশ্রুত মাদ্রাজী অধ্যাপক রাধাকিষণ তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, এবং পার্শীকুলপ্রদীপ ডাক্তার তারাপুর ওয়ালা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া অধ্যাপনা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। এক দিকে দ্রাবিড়ী বি, আর, রান্, ক্যানারিজের শিক্ষক আপ্পাজী রাও, মৈথিলী ক্ষুদী খাঁ এবং সিরাজ নিবাসী কাজিম সিরাজী, অপর দিকে প্যাগোডার মত টুপী পরিয়া তিব্বতীয় লামা এই বিচিত্রতার ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিমন্ত্রণক্ষেত্রে কোন জাতি বাদ পড়েন নাই। টোকিও নিবাসী কিমুরা, চীন পণ্ডিত মসুদা, বৌদ্ধকুলপ্রদীপ ডাঃ বড়ুয়া এবং শ্রমণ পূর্ণচন্দ্র,—তা ছাড়া জর্ম্মাণ ক্রল, ইংরেজ কালিস, অষ্ট্রীয়ান ষ্টেলা ক্রামব্রিশ, পলিটেকনিকের বেকার সমস্যার ক্যাপ্‌টেন পেটাভেল, বিহারী গণেশ প্রসাদ, দ্রাবিড়ী রমন—কত শত; কাহাকে ফেলিয়া কাহার নাম করিব?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্যার আশুতোষ এশিয়ার শিক্ষাকেন্দ্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাচ্যজ্ঞান সম্বন্ধে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। এই মহোদ্দেশ্য সাধন কল্পে তিনি যে পথ দিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা ফুলের পথ নহে, কাঁটার পথ। তাঁহার চেষ্টা যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই শত্রুতা ও বিদ্বেষ সকল দিক হইতে তাহাকে যুগপৎ আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহা ভালবাসার দণ্ড। যে ভালবাসে, সর্ব্বদা সর্ব্বযুগে সে এই উৎকট দণ্ড পাইয়াছে। ইহা ভগবানের পরীক্ষা, তুমি জগৎকে ভালবাসিবে, এত বড় অহঙ্কার তোমার। তুমি কত সহ্য করিতে পার, ভগবান্ তাহা কষিয়া দেখিবেন। তোমাকে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা পোড়াইবেন। তুমি যাহাদিগকে ভালবাসিতে চাহ, তাহারাই তোমাকে শূলে দিবে, ক্রুশে ঝুলাইবে,—প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা হইতে তাড়াইবে, তোমার সাধের বাড়ীঘর নদীয়াপুরী হইতে তাড়াইয়া তোমাকে কাঙ্গাল ফকির বানাইয়া ছাড়িবে। এই অগ্নিপরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তবে বুঝিব তুমি জগৎকে ভালবাসিবার যোগ্য। এপথ কোন দিনই কুসুমাকীর্ণ হয় নাই। ইহা চাওনীর বিনিময়ে চাওনি ও হাসির বিনিময়ে হাসি নহে, এই ব্রতের এ কথা নহে। ইহা রঙ্গমঞ্চের অভিনয় অথবা উপন্যাসের প্রতিপাদ্য আখ্যান বস্তু নহে। ইহার স্বরূপ মাতৃস্নেহ। বিশ্বের সমস্ত হাতুড়ীর আঘাতে তোমার হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হইবে, তবু তুমি ভালবাসিবে। তবে তো 'পাশের' সার্টিফিকেট পাইবে।

এই মহা পরীক্ষায় অবশ্য স্যার আশুতোষ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়াছি শুধু ধূম, বারুদ, অগ্নিশিখা, বিষোদ্গারী গোলাগুলি। অপর দিকে পাহাড়ের ন্যায় শক্তিশালী বক্ষ, অটুটবিক্রম অদম্য চেষ্টা। মনে হইয়াছে যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামানের গোলা হিমগিরির লক্ষ্যে অজস্র ছুটিয়াছে, যেন ইন্দ্রদেব ঝঞ্ঝা, বাদল, জলপ্লাবন ও বন্যা দিয়া গিরিগোবর্দ্ধনকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; সেই দুর্দ্দিনের কথা ভাল করিয়া মনে নাই,—এইটুকু স্মরণ হইতেছে, যেন বিশ্বের অজগরপ্রতিম বিরুদ্ধশক্তি বিষোদ্গীরণ করিয়া ও অনল বেষ্টনের দ্বারা কোনও অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। কিন্তু এক মহাদেবপ্রতিম মহামানব অনড় অকম্প সাহস ও অমিতবিক্রমে সেই হলাহল পান করিয়া সেই ভুজঙ্গকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিশ্বের নমস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মনে হয় যেন দেবতারা তাঁহার শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন—সেই পুষ্পবৃষ্টি তত বেশী হইতেছে, যত বেশী পৃথিবী তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে।

এই রাজার রাজ্যে আমরা বাস করিতাম। সে রাজা আমাদেরই মত এক গৃহস্থের ছেলে। কিন্তু বিধাতা স্বয়ং তাঁহার ললাটে রাজটীকা আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এইজন্য পার্থিব রাজশক্তি তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য পাশী, সিরাজী, মাদ্রাজী, বোম্বেবাসী, তেলেগু, তামলী, দ্রাবিড়ী, তিব্বতীয়, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, সিংহলী ও চৈনিক সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একাধিপত্য স্বীকার করিতেন। সাম্রাজ্য গঠন করিবার শক্তি লইয়া তিনি বাঙ্গালার কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার চেষ্টায় অপূর্ব্বত্ব সকলের দৃষ্টি এত বেশী করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার ক্ষেত্র যতই সামান্য হউক না কেন, তিনি নিজে ছিলেন অসামান্য। তাই তিনি একটা লগুড়ের মত সামান্য অস্ত্র লইয়া কামানের গোলাগুলির সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন; এবং তাহার মন্ত্রপূতঃ এই লগুড়টি গোলাগুলিকে নিরস্ত করিয়াছিল। এই অসম রণক্ষেত্রের ইহাই অপূর্ব্বত্ব।

আপনারা জানেননা যে তাঁহার একটা কথার দাম ছিল শত শত স্বর্ণমুদ্রা। শেষকালের অর্থকৃচ্ছের দরুণ তিনি আমাদের কোনও দাবীদাওয়াই মিটাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? গবেষণা-ক্ষেত্রে কোনও ভাল কাজ করিলে তিনি যে তাঁহার সমস্ত প্রাণের হাসিতে বিশাল গুম্ফযুগ্ম উদ্ভাসিত করিয়া পিঠ চাপড়াইয়া উপদেশ দিতেন, সেই উৎসাহপূর্ণ দুই একটি কথার মধ্যে যে প্রেরণা থাকিত, কোনও টাকার থলিতে সে প্রেরণা থাকিতে পারেনা। সেই উৎসাহ সম্বল করিয়া অতুল অধ্যবসায়ের সহিত আমরা আবার কাজে লাগিয়া যাইতাম।

আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সৌধমালা এক বিশাল পঞ্জরের মত দাঁড়াইয়া আছে। যিনি ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি আজ কোথায়? তিনি যে গাণ্ডীবে টঙ্কার দিতেন তাহার ধ্বনি এখনও আমাদের কানে আছে, যদিও সে গাণ্ডীবী নাই,—তিনি যে স্বর্গীয় বীণায় ঝঙ্কার দিতেন, সেই বীণাধ্বনি এখনও কানে বাজে, যদিও সে নারদ নাই। সেই স্মৃতিমূলক পুণ্য-প্রেরণা বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রাণের প্রতি স্পন্দনে শুনিতে পায়, তবে হয়ত সেই অপূর্ব্ব গৌরব একেবারে স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইবেনা। নতুবা এই বিশাল গৃহ হয়ত কেরাণীগণের কলকোলাহলপূর্ণ ও অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্যহীন স্তিমিত গুঞ্জনমুখর আফিসগৃহে পরিণত হইয়া যাইবে। যে বিশ্ববিদ্যার জ্ঞানতৃষ্ণার খাদ ভগীরথকল্প মহাপুরুষ কাটিয়া গিয়াছেন, তাহা হয়ত কালে শুকাইয়া যাইবে।

স্যার আশুতোষ যে একজন অদ্বিতীয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তাঁহার বাগ্মিতায় প্রতিপক্ষ সাহেব বাঙ্গালীর যুক্তি-বাত্যাড়িত কদলীর ন্যায় একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িত,—তাঁহার বিরাট কল্পনা আকার ধারণ করিয়া সুবিশাল দ্বারভাঙ্গা গৃহের জ্ঞান ভাণ্ডারের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও প্রখর প্রতিভা বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় চিরজ্বলন্ত ছিল। তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তি ও অধ্যবসায়শীল অক্লান্ত, চিরকর্ম্মঠ, সুবিপুল ধৈর্য্য জন-সমাজের চিরবিস্ময়কর। এসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব দয়ার স্মরণে এখনও আমি চক্ষের জল রোধ করিতে পারিনা। সে দয়ার সুরধুনীর তীরে ছিল, সর্ব্ব-প্রাণীর অবাধ নিমন্ত্রণ। কেহ কেহ কহেন, তিনি মিষ্ট কথা বলিতেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে ছিল, মিছরীর ভাণ্ডার। বাহ্য আদর আপ্যায়ন, করমর্দ্দন, মিষ্টকথার প্রবঞ্চনা তো আজকাল চারিদিকেই দেখিতে পাই। কেহ কেহ বা পলাশের মত বড় বড় আশার কুসুম দেখাইয়া শেষে খানিকটা তুলা দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতির অসারত্ব প্রতিপালন করেন। বাঙ্গালী দরিদ্র জাতি; তাঁহাদের অনেকেই বিপদে পড়িয়া এইরূপে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু এই যে বাহিরে কর্কশ খেজুর গাছটি,—সে যে কি নির্ম্মল রসধারা দিয়া আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দেয়, তাহা যে জানে সে কি সেই তরুবরকে ছাড়িতে পারে? তাঁহার দয়া ছিল সেই খেজুর রসের ন্যায়, বাহিরে কঠোর নারিকেল ফলের ন্যায়; বাহ্য দৃষ্টিতে বংশ ও ইক্ষুদণ্ডেতে তফাৎ কি? কিন্তু যিনি ভিতরের খবর জানেন, তিনি সে তফাৎ জানেন। এই দয়া বিদ্যাসাগরী দয়া—কঠোর আবরণের ভিতর প্রাণদায়ী করুণার অফুরন্ত রস, লোকে তাহা জানিত। তাহা না হইলে নিত্য নিত্য অজস্র জনসঙ্ঘ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে ধমক খাইতে যাইত কেন? যিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম না করিতেন; এমন লোক আমি বড় দেখি নাই। তথাপি সেই ব্যাঘ্রের গহ্বরে রাত দিন এত লোকের আনাগোনা হইত কেন? কলিকাতায় ত আরও শত শত লোক আছেন,—যাঁহারা ইচ্ছা করিলে আশুতোষের মত কিংবা ততোধিক পরের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের কাছে না যাইয়া এই পিপ্ড়ার সার দিন রাত ৭৭নং রসারোডের পথে ধাবিত

হইত কেন ? যে পথে কণ্টকের মধ্যেও মধু সঞ্চিত আছে, সে পথের সন্ধান তাহারা ভাল জানিত। আমি কতবার দেখিয়াছি, সামান্য লোকের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছে। কখনও দেখিয়াছি, শীর্ণ অনাহারপীড়িত কোনও বালকের দুঃখ কাহিনী তিনি অসীম মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন ! ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠির সহায়ে কত বৃদ্ধ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া নিজ দুঃখের কথা বলিয়াছে। তাঁহার মত বড় লোকের গৃহে এরূপ দুঃস্থ অজ্ঞাত লোকের প্রবেশাধিকারই অসম্ভব। কিন্তু সেই সব লোক তাঁহার কাছে যে সান্ত্বনা পাইয়াছে তাহা তাহারা দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায়ই মনে করিয়াছে। সকলেরই যে তিনি উপকার করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না ; কিন্তু অনেকেরই করিয়াছেন। যেখানে পারেন নাই, সেখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তিনি কখনও মিথ্যা আশা ভরসা দেন নাই। যেটুকু করিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত করিবেন বলিয়া অনেক সময় পূর্ব্বে ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু যেখানে তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়াছে, সেখানে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই যবনিকার অন্তরালে, তাহার আভাস তিনি পূর্ব্বে প্রায়ই দেন নাই।

এই সকল গুণ তাঁহার এমন ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে সাধারণ মানুষের মত মনে হয় না। তিনি নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিতেন না। সর্ব্বদা নিজের চোখ খুলিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং অতি সংযতবাক্ ছিলেন। স্বকৃত উপকারের কথা কখনও কাহারও নিকট উল্লেখ করিয়া আত্ম-শ্লাঘার পরিচয় দেন নাই।

আজ আমি নিশ্চয়ই জানি, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এবং বাহিরের শত শত লোক তাঁহার অভাব ব্যক্তিগত ক্ষতির ন্যায় মনে করিতেছেন। যখন দুঃসময় আসে, যখন পীড়া, শোক, অর্থকৃচ্ছ্রতা বা অন্য কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, তখন প্রাণটা অনেক সময় ধড়ফড় করিয়া উঠে, মনে হয় পিতৃকল্প কে যেন চলিয়া গিয়াছেন, যিনি আমাদের জন্য শত চিন্তা করিতেন। এ ভাব শুধু আমার নহে, শত শত লোক বেদনার সহিত ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে ক্রোধে ছিলেন তিনি রুদ্ররূপী, বিষাণের ন্যায় তাঁহার ওজস্বী স্বরে অপরাধী প্রতিপক্ষের প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইত ; বাগ্মিতায় ছিলেন তিনি দেবগুরু ; অতি সংক্ষেপে, অতি কূট তর্কের গ্রন্থি মোচন করিতে তাঁহার মত আর কে পারিবে ? দৃঢ়তায় ছিলেন তিনি অশ্বত্থকল্প। পৃথিবী এক দিকে, এবং একমাত্র তিনি একদিকে থাকিলেও বিচলিত হইতেন না। তাঁহার মত নির্ভীক জগতে দুর্ল্লভ। যেখানে বিপদ, কোটের বোতাম খুলিয়া উন্মুক্ত বক্ষ বিস্তার করিয়া তিনি সেখানে সকলের অগ্রগামী। ভগবান যে কর্ম্মফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতার শিক্ষা অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন সেই শিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহকল্প। যখন তাঁহার জয়পতাকা প্রায় ভূমিশায়ী হয় হয়, তখনও প্রণবধ্বনির ন্যায় উদাত্তস্বরে তিনি বলিলেন, "কি ভয় ? কি ভয় ?" সৌভাগ্যক্রমে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত ও রণক্লান্ত হইয়াও তিনি পরাজিত হন নাই। বিজয়লক্ষ্মী সর্ব্বদা

তাঁহার প্রিয় পুত্রকে আমরণ অঙ্কে রাখিয়াছিলেন। দুর্গামণ্ডপে আমি তাঁহাকে পবিত্র গরদ পরিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে, কি ভক্তিপূর্ণস্বরে তিনি চণ্ডী আবৃত্তি করিয়াছেন, তাহা স্বকর্ণে না শুনিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে, পাশ্চাত্যজ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ কতটা আভিজাত্য ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। স্যার আশুতোষ কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী পরিচ্ছদের গৌরব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখনতো অনেক আফিসে ও সভাগৃহে দেখা যায় বাঙ্গালী ধুতি চাদর পরিয়া সাহেবদের সঙ্গে একত্র কাজ করিতেছেন। কিন্তু এই স্বদেশী বেশভূষাকে আশুতোষ সমধিকপরিমাণে আদৃত করিয়াছেন। তিনিই এই পূজার পুরোহিত। বিদ্যাসাগরের জীবন সাহেবদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ছিলনা। কিন্তু আশুতোষের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, সাহেব ও বাঙ্গালী লইয়া। তথায় তিনি স্বদেশী পরিচ্ছদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষিতদিগের চপ্ কাট্‌লেট্, কাঁটা চামচ ও ছুরির ঠকঠক্ শব্দের আতিশয্যের দিনে—হ্যাট কোট নেকটাইয়ের প্রবল হুজুগের যুগে—নগ্নোদর ব্রাহ্মণ অতি তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পুরিয়া ভীমনাগের সন্দেশ আহার করিতেন; এদৃশ্য দেখিবার বটে। বক্তৃতা না করিয়া আশুতোষ স্বদেশীকে যে একধাপ উপরে উঠাইয়াছেন, তাহাতে কে সন্দেহ করিবে?

এখনও বাঙ্গালাদেশ আশুতোষের স্মৃতিতে ভরপুর। এই যে এখন বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গ্রাজুয়েট, ইহা তাঁহারই কৃপায়। নতুবা যদি মান্দ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় নূতন Regulation, অজগরের মত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করিত, তবে অনেককেই শিক্ষামন্দিরের third class হইতে বিদায় লইতে হইত। স্যার আশুতোষের অক্ষৌহিণী সৈন্য আজ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষার ধ্বজা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে উজ্জ্বল শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহার নারায়ণীসেনা। ইঁহারা বঙ্গদেশকে যে শ্রী প্রদান করিয়াছেন, ভারতের কোন প্রদেশে তাহা নাই। আর তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কীর্ত্তি বাঙ্গালার ভাষা লক্ষ্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুণ্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদের দীনা, রাজদরবার হইতে নির্ব্বাসিতা, বিশ্বের জ্ঞানশালার মর্য্যাদাবঞ্চিতা, অথচ স্বগৌরবে উজ্জ্বলা বঙ্গভাষা এক কোণে পরম উপেক্ষায় দিনপাত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়পুত্র আশুতোষ তাঁহাকে হাত ধরিয়া বিশ্বশিক্ষার উচ্চপ্রকোষ্ঠে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, দেবতার অভিষেক হইয়া গিয়াছে,—এখন আপনারা এই তীর্থের যাত্রী হউন। তিনি ভিত্ গড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, এখন আপনারা এই তীর্থের মহিমা প্রচার করুন।

আমাদের দেশে কবির অভাব নাই। এদেশের পল্লীতে পল্লীতে পল্লীকবি,—নগরে নগরে নাগরিক কবি। তন্মধ্যে আধুনিক কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, উপন্যাসে শরৎচন্দ্র, এবং দার্শনিক চিন্তায় ব্রজেন্দ্রশীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হীরালাল ও হীরেন্দ্র প্রভৃতি, ইতিহাস ক্ষেত্রে অক্ষয় মৈত্রেয়, নগেন্দ্রনাথ, নিখিলনাথ, রাখালদাস, রমেশচন্দ্র, রমাপ্রসাদ, হেমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। সঙ্গীতে দিলীপ, নাট্যমঞ্চে শিশিরভাদুড়ী, চিত্রকলাপে অবনীন্দ্র,

গগনেন্দ্র, নন্দলাল যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও কাহারও যশ ভারতের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে ধ্বনিত হইতেছে। উপরিউক্ত যশস্বিগণ ছাড়াও, ছোট ছোট রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্র, শরৎচন্দ্র যে কত উদিত হইতেছেন, তাহার অবধি নাই। এই বঙ্গদেশ যে সুকুমার কলার ও কবিত্বের ক্ষেত্র! এত কষ্টে পড়িয়াও বাঙ্গালী মস্তিকের উর্ব্বরতা হারায় নাই। এখনও বাঙ্গালী ভাব জগতে রাজত্ব করিতেছে। তাহার কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়াছে সত্য; কিন্তু সে তাহার হাতের বীণাটি ছাড়ে নাই। বার্দ্ধক্যপীড়িত কবি এখনও বসন্তের গীতিকা ও বর্ষামঙ্গল গাহিতেছেন। এই অফুরন্ত রসের উৎস দারিদ্র্য রাক্ষসী শতচেষ্টা সত্বেও একেবারে শোষণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু বাঙ্গালী কর্ম্মজগতে হীন। এই দৈন্য জাতীয় লজ্জার বিষয়। নগরে নগরে মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, রাজপুত, পার্শী বাঙ্গালীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কর্ম্মজগতে স্বীয় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন; ইংরেজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চত্য জাতিরা যেখানে যান, সেখানেই কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলেন, আর আমরা হটিতে হটিতে কেবলই পিছাইয়া পড়িতেছি। বিশ্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার মানিয়া আমরা এতটা হীন হইয়া পড়িতেছি যে নিজেদের কুঁড়ে ঘরটি পর্য্যন্ত সাম্‌লাইতে পারিতেছিনা। সাহেবেরা যেখানে 'মিল' স্থাপন করেন, সেইখানেই একটা কুলীর আড্ডা, অর্থাৎ কুলীপল্লীর পত্তন করেন,—সেই কুলীপল্লীর ত্রিসীমানায় পর্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিতে পারেনা। কিন্তু আমরা আমাদের সোণার পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আতঙ্কে ছাড়িয়া দিতেছি। আমাদের সম্মুখে শত শত কর্ম্মদৃষ্টান্ত বিফল হইয়া যাইতেছে। এই কর্ম্মজগতে আমরা একান্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছি।

কিন্তু এই যে একটি লোক আসিয়া আকাশ বিদীর্ণকারী উন্মাদনাময়ী—ক্ষণপ্রভার ন্যায় চকিতে চলিয়া গেলেন, তিনি দেখাইয়া গেলেন, বঙ্গের বাহু এখনও কর্ম্মঠতায় হীন হইয়া পড়ে নাই। তিনি শুধুহাতে আসিয়া এই যে প্রকাণ্ড শিক্ষাগার গড়িয়া গেলেন, এযেন যাদুকরের কুহক কাঠির স্পর্শে সৃষ্ট অত্যাশ্চর্য্য নগরীর ন্যায়! ইঁহার আহ্বানে ঘোষ, পালিত, খয়রার ভাণ্ডার হইতে অজস্র অর্থ আসিয়া উপস্থিত হইল—যেমন করিয়া এক যুগে, অর্জ্জুনের শরবিদ্ধা ধরিত্রী তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন। কোথায় গেল বস্তী, কোথায় গেল মাধববাবুর বাজার, কোথায় গেল ভাঙ্গা ইটের বাড়ীগুলি—হর্ম্মে হর্ম্ম্যে, রাজপ্রাসাদে রাজপ্রাসাদে এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ছাইয়া পড়িল। কত অধ্যাপক আশুতোষের পদতলে বসিয়া অধ্যাপনার ব্রত গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি সেই সকল বিশ্বপণ্ডিত,—ভ্যাণ্ডগ্রাফ্‌, ওল্ডেন বার্গ, সিলভ্যাঁ লেভি, টমাস, ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি মহাসাগরের পরপার হইতে আমাদের দ্বারভাঙ্গা গৃহে বক্তৃতা করিতে ছুটিয়া আসিলেন। এই সকল অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি, যাঁহারা সম্রাটের আহ্বানও উপেক্ষা করেন, তাঁহারা আশুতোষকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেননা। মহাকর্ম্মীর আহ্বানে সমস্ত কর্ম্মজগতে সাড়া

পড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনকে একটা ঝঞ্ঝা বায়ুতে পরিণত করিয়া বাঙ্গালীকে ঊর্দ্ধ আকাশে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন, নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মহাযানের দিব্যদীপ্তিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ উদ্ভাসিত হইয়াছে। আর কি সেই সকল বিশ্বপণ্ডিতের কেহ এই গৃহে পদার্পণ করিবেন? আর কি গুণীর গুণ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বজাতির মনস্বিগণকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'অনরারী' উপাধিমণ্ডিত করিবেন? বিশ্বের সমস্ত বিদ্যাকেন্দ্রের সঙ্গে তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধের স্বর্ণসূত্র কি ছিন্ন হইয়া গেল? আর কি জ্ঞান চর্চ্চার তুঙ্গশৃঙ্গে আমরা বাঙ্গলীকে তেমন সমাসীন দেখিব, যেমন দেখিয়াছিলাম আশুতোষকে? যত বড়ই পণ্ডিত আসিয়াছেন, তাঁহারা আশুতোষকে গুরুস্থানীয় মনে করিয়া তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়াছেন। সেই অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয় চিরতরে হারাইয়াছে।

আশুতোষকে মনে পড়িলে মনে হয়, যেন জগতের ভিড় ঠেলিয়া কেহ উচ্চ লক্ষ্যে ধ্রুবতারার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। একদিন তাঁহাকে অলস, সুপ্ত বা উদ্দেশ্যবিহীন দেখিতে পাইনাই। তাঁহার ক্ষণিক রোগশয্যা—সে যেন আরও ঘনীভূত কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে স্তূপাকৃতি হাইকোর্টের নথিপত্র, আর পার্শ্বে উর্দ্ধে অধোদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অসংখ্য পুস্তিকা, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কার্য্যবিবরণী। তাঁহার শয্যাগৃহ, পাঠাগার, বিশ্রামশালা—সমস্ত স্থলেই মৃত ও জীবিত গ্রন্থকর্ত্তাদের গ্রন্থ। সেই সকল মহাত্মাদের শত শত বৎসরের বাণী যেন মুহুর্মুহুঃ এই মহাকর্ম্মী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। বিজ্ঞান ও শিল্প, কলা, গণিত ও ন্যায়, চিত্র ও কবিতা, স্থাপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য—চিরাগত উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষের প্রাপ্ত এই মহৈশ্বর্য্যের কেন্দ্রস্থানে আশুতোষ বিরাজ করিতেন। তিনি তাঁহাদের চিরসঙ্গী ছিলেন। এইজন্য এতটুকু ক্ষুদ্রতা তাঁহার ছিলনা। এজন্য তাঁহার কল্পনা এত বিরাট ছিল ও তাঁহার কর্ম্মঠতা এত অপ্রতিহত ছিল। তিনি প্রতিমুহূর্ত্ত এই মানবজাতির প্রকৃত সম্রাট্‌দের সাহচর্য্য লাভ করিতেন। এইজন্য তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কামনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিনও তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ করিলেন না। বিশ্বসেবক নিজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিশ্বের সেবা করিয়া গেলেন। এই সেবায় তিনি এরূপ ব্রতী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজ পরিবার বর্গের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের অবকাশ ছিলনা। শত শত সভাসমিতির কোনটিতে একদিন তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিনাই। শত শত সভাসমিতির সমস্ত কার্য্য তিনি একক করিয়াছেন। আর সকলে ছিলেন চিত্রপুত্তলী। কেরাণীর ক্ষুদ্রকার্য্য ও অধ্যাপকের গভীর গবেষণা—এসমস্তই তাঁহার উপদেশের প্রতীক্ষা করিত। তাঁহার বাহু ছিল একক কর্ম্মশীল, তাঁহার মস্তিষ্ক ছিল একক উর্ব্বর, তাঁহার হৃদয় ছিল একক জীবন্ত। আমরা বাঙ্গালা জীবনের আধুনিক মহাচিত্রশালায় কর্ম্মঠতায় আশুতোষের ছবি সর্ব্বাগ্রগণ্য দেখিতে পাই। কবি, বৈজ্ঞানিক, কলাবিৎ, গণিতজ্ঞ ও ইতিহাসবেত্তা এই সকল

মনস্বী সেই চিত্রশালায় যেন তাঁহার বাহু ধরিয়া দাঁড়াইয়া। হে বাঙ্গালী শিল্পী, এই ছবি আঁকিয়া রাখ। মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, ক্যানারিজ, সিংহলী, সাহেব, বাঙ্গালী সকলেই একত্র হইয়া এই মহাবাঙ্গালীর ভুজাশ্রিত,—সেই মহাভুজ ছিল, সকলের বোঝা বহনক্ষম, সকলবিপদ উত্তীর্ণ হইবার সাঁকোস্বরূপ। তিনি গেলেন, একদিনের তরে আমাদের সেবা না লইয়া! তিনি আমাদের সেবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। একদিনও আমাদিগকে তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবার অবসর দিলেন না। আমরা যে যেখানে আছি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের যাঁহারা কলিকাতায় আছেন, তাঁহারা যে প্রাণান্ত করিয়া রাত্রি জাগিয়া তাঁহার সেবা করিয়া প্রাণের খেদ মিটাইতেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি দিলেননা। তিনি সেবা দিতে আসিয়াছিলেন, সেবা নিতে আসেন নাই। তিনি কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না। জাতীয় শিক্ষার দাবী তিনি ভিখারীর বেশে যাচ্ঞা করেন নাই; তিনি বীরের ন্যায় তাহা 'জোরসে' আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন এই ছিল বিরোধের মূল কারণ। তিনি যে ছিলেন মহাবীর,—নেপোলিয়ান, জুলিয়াস সিজার ও আলেকজাণ্ডারের স্বগণ, তিনি কি টুপী নামাইয়া সেলাম করিয়া ভিক্ষা চাহিবার লোক? সম্রাট্ যেমন আদায় করেন, তাঁহার দাবী ছিল সেইরূপ রাজরাজেশ্বরোচিত। এইজন্য তাঁহার ললাটে আমরা রাজটীকা এইরূপ উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলাম।

আর এক গুণ ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিতা। একটু গুণের লেশ তিনি যাঁহার মধ্যে পাইতেন তাহা তিনি উৎসাহ দিয়া সাধ্যমত বাড়াইয়া তুলিতেন। এখন যে গুণীর গুণ লোক তাচ্ছিল্যের অন্ধকারগুহায় গুমরাইয়া কাঁদিতেছে, কে আর জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া উৎসাহের জলসিঞ্চনে তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিবে? তিনি নরচরিত্রের সূক্ষ্ম পাঠক ছিলেন। কোনও লোককে দেখামাত্র অতিঅল্প পরিচয়ে তিনি তাঁহার গুণ আবিষ্কার করিয়া লইতেন। এইযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা মৌলিক গবেষণায় যশস্বী হইয়াছেন, আশুতোষের উৎসাহ ছিল তাঁহাদের সফলতার মেরুদণ্ড। যেমন করিয়া বিক্রমাদিত্য নবরত্নকে আহ্বান করিয়া তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া এলিজাবেথ, আকবর ও অগষ্টস্ তাঁহাদের সভায় সাম্রাজ্যের সমস্ত মনস্বীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া এই কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ, রসসাগর ও বাণেশ্বর প্রভৃতি কবি—হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণনাদ বাচস্পতি, ও রামগোপাল সার্ব্বভৌম প্রভৃতি নৈয়ায়িক,—প্রাণনাথ, পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি স্মার্ত্ত, এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণের দ্বারা তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তেমনই করিয়া আশুতোষ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়কে পণ্ডিতগণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু এখন সেই মৌলিক গবেষণা—যাহা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া ইহার ভিত গড়িয়াছিলেন—যে গবেষণার ফলে প্রাচ্যবিদ্যায় য়ুরোপ এসিয়ার নিকট হার মানিবে এই

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'টাইমস' প্রভৃতি বিলাতের শ্রেষ্ঠপত্রিকা সমূহ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেই মৌলিক গবেষণা শাপভ্রষ্টা লক্ষ্মীর ন্যায় অনাদরের অতলতলে প্রবেশ না করিলেই রক্ষা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কি মৌলিক গবেষণার আর সেই সুযোগ হইবে? এ যে পাহাড় কাটিয়া পথ তৈয়ার করিবার ব্যাপার! এখানে যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পাঠকমণ্ডলী কদাচিৎ প্রবেশ করিয়া থাকেন। এখানকার পথের পথিকদিগকে লোকে পাগল মনে করিয়া উপহাস করে। ইঁহাদের যে বনে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া পাথরের টুকরা ও ছেঁড়া কাগজ কুড়াইতে হয়,—তাঁহাদের যে কুঁড়েঘরের চাষাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে হয়। এ পথের পথিকদিগকে আর কে উৎসাহ দিবে? ইঁহাদের উৎসাহ, অর্থ—দুইয়েরই দরকার! সাধারণ লোকেরা এই অর্থব্যয় একান্ত অনাবশ্যক মনে করে। এই জায়গায় আমরা তাঁহার অভাবে প্রকৃত দৈন্যের শেষসীমায় অবতরণ করিয়াছি। এখন মনে হয়, মৌলিক গবেষণার মূলে শেষ কুঠারাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইতেছি। কে আর সেই ভাবের পাগলদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া খোঁজ লইবে? বহু কৃচ্ছ্র সঞ্চিত দুর্লভ পুঁথিপত্র যে উপেক্ষায় নষ্ট হইতে চলিতেছে কে তাহা রক্ষা করিবে? চারিদিকে সাংসারিকতা, দস্তুর মাফিক কর্ম্ম চালাইবার চেষ্টা, ঠাঠ বজায় রাখিবার আলোচনা। চারিদিকে ছাত্র পড়াইবার, লিপি তৈরি করিবার উৎসাহ—পাঠ্যপুঁথি পাঠ করাইয়া জাড্যদোষ দূর করিবার প্রসঙ্গ। এখন এই পাগলদের খোঁজ কে লইবে? তাঁহারা যে বিষণ্ণমুখে জীর্ণশীর্ণবেশে এক কোণে লুকাইয়া আছেন। তাঁহাদের কথা যে পাগলামি, তাঁহাদের জন্য ব্যয় যে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। তাঁহারা যে কথা কহেন, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হাসিয়া উড়াইয়া না দিলেও ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির সঙ্গে শুনিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যান। এই পাগলারা যে আশুতোষের প্রাণের লোক ছিল। এই পাগলামির জন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্ নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। হায় সেই ভিত্ কি ধ্বসিয়া যাইবে? যে ভিত্ ইস্পাৎদৃঢ়, যাহা কালে ক্ষয় করিতে পারেনা, যাহা বাহিরে ধরা না দিলেও বীজের অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষে পরিণত হয়, যাহার সৌষ্ঠব একযুগে পরিস্ফুট না হইলেও যুগান্তরে পুষ্পপল্লবদল সমৃদ্ধ বিশাল মহীরুহের মত মনের সভ্যতাকে নবশ্রী সম্পন্ন করে,—সেই ভিত্ সেই পাগলামির বীজ প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন যিনি, তিনি আজ কোথায়? চারিদিকে বিপুল বায়ু স্রোতের বিরাট শূন্যতায় এক হা—হা—হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে। বৈষয়িকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাগলদের স্থান দিবেন কিনা, তাহাদের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করিয়া এই পাঠাগারের অভ্রভেদী উচ্চতা সম্পাদন করিবার সুযোগ দিবেন কিনা, জানিনা। সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য যাঁহার বাহু সুবিস্তার হইয়া প্রসারিত ছিল, তিনি ত আজ নাই! বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রেরণার মূলে জলসিঞ্চন করিয়া তাহা বাঁচাইয়া রাখিবেন কিনা, জানিনা। যদি সেই মৌলিক গবেষণার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে দ্বারভাঙ্গা ও মাধব বাজারের হর্ম্ম্যরাশির উপর আমি লিখিয়া রাখিব "নিষ্ফল,—ইহা স্যার আশুতোষের স্মারক বিদ্যার মহাকেন্দ্র নহে—ইহা তাঁহার সমাধি।*

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

---

* কৃষ্ণনগর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রথম বার্ষিকী আশুতোষ স্মৃতি সভার সভাপতির অভিভাষণ।

"মিসর-কুমারী"র স্বরলিপি

[রচনা——শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত]

(দশম গীত)

বিরহিণীগণ ।

সঁমরিয়া বেদরদা ! তোরি নাহি-রে বিচার—
সুরৎ দিখায় মুঝে দিবানী বনায়ো রে ;
অব্ মুঝে রুলাও বেকার ।
ঝুর্ ঝুর্ নয়না কাজর পথারি যায় ;
নিঁদিয়া নঃ আবে সারি রতিয়াঁ—
বাট্ নিরখত দিনুওয়া গুজরি যায় ;
পেয়াস্ জলাওয়ে মোরি ছতিয়া—
আ-বো সঁমরিয়া, বেদরদা পিয়া ! হিয়া মোরি করত পুকার্ ॥

সুর——সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগচী ।

স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ।

মিশ্র———কাফী ।

স্থায়ী ।

০ ১ ২´ ৩ ০
II{ পা পা | -র্সা র্সা I র্সা -া | -না -ধপা | পধা -ণা |
সঁ ম ০ রি য়া ০ ০ ০০ বে০ ০

ধা -পা I মগা মগা | -রা -গা | জ্ঞা -া | জ্ঞা -া I
দ র্ দা০ ০০ ০ ০ তো ০ রি ০

I -া া | পা ধা | পধা -ণা | -া -ধা I -পা -া
০ ০ না হি রে০ ০ ০ ০ ০ ০

৩　　　০　　　১　　　২´　　　৩
া　পা | পা　-না | -ধা　-না I -র্সা　-া | -া　া }
•　বি　চা　•　•　•　•　•　র　•

{০　　　১　　　২´　　　৩　　　০
I { ধা　ধা | -র্সা　র্সা I র্রা　-া | র্রা　র্রা | র্রা　র্রা |
সু　র　ৎ　দি　খা　য়　মু　ঝে　দি　বা

১　　　২´　　　৩　　　০　　　১
| র্গা　র্রা I র্সা　না | ধা　-া | পা　-া | জ্ঞা　-জ্ঞা I
নী　ব　না　য়ো　রে　•　অ　ব্　মু　ঝে

I পা　পা | ধপা　ধা | র্সঃ　-ণাঃ | -া　-ধা I -ধপা　জ্ঞা
রু　না　ও•　বে　কা　•　•　•　••　•

| -পা　া } II
র্　•

অন্তরা।

{০　　　১　　　২´　　　৩　　　০
II { মা　মা | মা　মা I গা　মগা | রা　-া | রা　জ্ঞা
ঝু　র　ঝু　র　ন　র•　না　•　কা　জ

-া　জ্ঞা I গজ্ঞা　পা | পা　-া | পা　পা | পা　পা I
র্　প　খা•　রি　বা　র　নি　দি　য়া　নঃ

I পা　পা | পা　ধা | মা　পা | ধা　-া I -া
আ　বে　সা　রি　র　তি　রাঁ　•　•

৩ ০ ১ ২´ ৩
| -া া } | { র্সা -া | র্সা র্সা I র্সা -া | র্সা র্সা |
• • বা • ট নি র • খ ত

-া ননা | ননা না I ধা ধা | ধা -া | পা ধা
• দিনু ওয়া শু জ রি বা য় পে য়া

I -পা পা I পা পপা | মা মা | গা গা | রা -া I
স্ জ লা ওয়ে মো রি ছ তি য়া •

২´ ৩ ০ ১ ২´
| -া -া | -া া } | { ধা -া | র্সা -া I র্রা র্রা |
• • • • আ • বো • সঁ র

৩ ০ ১ ২´ ৩
| র্রা র্রা | র্সা -র্গা | র্রা -া I র্সা -না | ধা ধা } |
রি য়া বে • দ ন্ দা • পি য়া

পা পা | ক্ষা ক্ষা I পা পা | ধপা ধা | র্সঃ -ণাঃ
হি য়া মো রি ক র ত৹ পু কা •

| -পা -ধা I -ধপা -ক্ষা | -পা া II II

নিবেদন।

১। আমরা আমাদের বর্ণমালা ঠিক যে ভাবে উচ্চারণ করে থাকি, পশ্চিম প্রদেশবাসীরা সে-ই বর্ণমালা সে ভাবে উচ্চারণ করেন না। আমরা ক, খ, গ,.........ইত্যাদিকে একরকম গোলাকারভাবে, অর্থাৎ আমাদের উপর নিচের ঠোঁটকে বৃত্তাকারে পরিণত করে, উচ্চারণ করে থাকি। পশ্চিম-প্রদেশবাসীরা তা' করেন না।

তাঁরা গলার বীচির কাছে জিহ্বার অংশটিকে ওপর দিকে তুলে ধরেন, আর ঠিক সেই জায়গার ওপরের দিকের অংশটিকে সেই সঙ্গে নামিয়ে দিয়ে, ওপরনীচের দুই অংশের সংমিশ্রণে উচ্চারণ করেন। ফলে তাঁদের 'ক' উচ্চারিত হয়—ইংরাজী Kerchief কথার প্রথম 'e' অক্ষরের মত। 'খ' উচ্চারিত হয়—ইংরাজী 'custom' কথার 'u' অক্ষরের মত। 'গ' উচ্চারিত হয়—ইংরাজী 'gum' কথার 'u' অক্ষরের মত—ইত্যাদি। এই তফাৎটুকুকে বোঝাবার জন্য আমরা ক, খ, গ ইত্যাদির সঙ্গে আকার যোগ করে দি। তা'ই 'মিসর-কুমারী' নামক পুস্তকে—'বানায়ো' কথার 'ব' অক্ষরে, 'পাক্ষারি' কথার 'প' অক্ষরে, 'রাতিয়া' কথার 'র' অক্ষরে, 'গুজারি' কথার 'জ' অক্ষরে, আর 'ছাতিয়া' কথার 'ছ' অক্ষরে, আকার যোগ করে দেওয়া আছে। আমাদের ও প্রথাটি অসঙ্গত। যদি অসঙ্গত না হয়, তা হ'লে 'বানায়ো' কথার 'ন' অক্ষরে, 'পাথারি' কথার 'থ' অক্ষরে, 'রাতিয়া' কথার 'য়' অক্ষরে, আর 'ছাতিয়া' কথারও 'য়' অক্ষরে ঐ যে আকার যোগ করা আছে, উচ্চারণগুলি তখন ও অক্ষর ক'টার কোন রকম হবে? সুতরাং আমরা এখানে আকার ছাড়িয়া দিলাম। অন্যান্য স্থানেও বানানে তফাৎ আছে দেখ্‌তে পাবেন। সে সকল জানাতে গেলে স্থানাভাব হ'বে, অগত্যা এখানে জানান আর হ'ল না।

গানখানি কার্ফা তালের নিম্নলিখিত ঠেকার সহিত চল্‌বে :—

২´ ৩ ০ ১

I ধেনে নাতে | নেতে নাক্ | ধেনে নাতে | নেতে নাক্ I

-লেখিকা।

"ধর্ম্ম"-সাহিত্যে সৃষ্টি-তত্ত্ব *

যখন হইতে মানুষের চিন্তাশক্তি জন্মিয়াছে, তখন হইতেই তাহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—কে এই বিশ্ব জগৎকে নির্ম্মাণ করিল? কি করিয়া নির্ম্মাণ করিল? তাই বেদে বা পুরাণে, বাইবেলে বা কুর্‌আনে, কিংবা পৃথিবীর অন্য ধর্ম্ম গ্রন্থে বা মতে সর্ব্বত্রই এই সৃষ্টি-তত্ত্ব পাওয়া যায়। বাঙ্গালার "ধর্ম্ম"-সাহিত্যেও আমরা সৃষ্টি-তত্ত্বের সন্ধান পাই।

শূন্য পুরাণে আমরা দেখিতে পাই প্রথমে কিছুই ছিল না—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস॥

নহি ছিল ছিষ্টি আর ন'ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
* * * * *
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মুন্‌সী-গঞ্জ অধিবেশনে পঠিত।

তখন "সত্তি ধুন্ধুকার", সবই শূন্য। সেই সময়

সুন্নত ভরমন পরভুর শুন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মাআধর॥
মহাসুন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুই জন॥

অনিল হইতে পরভুর হএ গেল দআ।
ঠাকুরর পরিসদ হইল কত মাআ॥

প্রভু এইরূপে অনিল সৃষ্টি করিয়া "বিম্বু" বা বুদ্বুদের উপর আসন করিলেন। বিম্বু ভার সহিতে না পারিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। প্রভু আবার শূন্যে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন

বিসার উপরে পরভুর উপজিল দআ।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ॥

প্রভুর দেহ হইতে নিরঞ্জন ধর্ম্ম জন্মিলেন। ধর্ম্মের হাত পা চোখ নাই। জন্মিয়া

দআর আসনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বম্ভ জানে॥

বম্ভ জানে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে। তার পর তাঁহার হাই হইতে উল্লূক পাখী জন্মিল। উল্লূকের পৃষ্ঠে ধর্ম্ম আসন করিয়া চৌদ্দযুগ ব্রহ্ম ধ্যানে কাটাইলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় উল্লূক কাতর হইয়া পড়িল। নিরঞ্জন মুখের অমৃত দিলেন। উল্লূক মুখ পাতিয়া কিছু খাইল, কিছু শূন্যে পড়িল। তাহা হইতে জল সৃষ্টি হইল। নিরঞ্জন উল্লূকের পিঠে জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন। উল্লূক ভার সহিতে না পারিয়া রসাতলে যাইতে লাগিল। তখন উল্লূকের "বীর পাক" খসিয়া পড়িল। তাহা হইতে পরমহংস জন্মিল। ধর্ম্ম নিরঞ্জন হংসের পৃষ্ঠে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ধ্যানে কত যুগ কাটিয়া গেল। হংস ভার সহিতে না পারিয়া প্রভুকে ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল। প্রভু জলে ভাসিতে লাগিলেন। উল্লূক মুনি আচ্ছাদন দিয়া তাঁহার পাশে পাশে ফিরিতে লাগিলেন। জলে প্রলয় কাণ্ড হইতে লাগিল। তখন জলকে থামাইবার জন্য "স্বরূপ-নারান" ধর্ম্ম জলে পদ্ম হস্ত দিয়া বলিলেন, "থাম, থাম।" তাঁহার পদ্ম-হস্ত হইতে কূর্ম্মের সৃষ্টি হইল। জলের উপর কূর্ম্মের পৃষ্ঠে ধর্ম্ম বসিলেন। একদিকে কূর্ম্ম, আর দিকে উল্লূক, মাঝে "দেব নারায়ন" ধর্ম্ম। এইরূপে কূর্ম্মের উপর বসিয়া ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানে কত শত যুগ কাটাইয়া দিলেন। কূর্ম্ম ভার সহিতে না পারিয়া ফেলিয়া পালাইল। ধর্ম্ম ও উল্লূক উভয়ে পুনরায় জলে ভাসিতে লাগিলেন। অবশেষে

উল্লূক বলন্তি গোসাঞি সুনহ উপাঅ।
দেবতা হইয়া কতই ভাসিঞা বেড়াঅ॥
উল্লূক বলন্তি গোসাঞি উপাঅ কারন।
জলের উপরে কর ছিষ্টির সাজন॥

তখন উল্লূকের কথা মত সৃষ্টি পত্তন করিবার জন্য ধর্ম্মরাজা নিজের কনক পৈতা ছিঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে সহস্র-মস্তক-বিশিষ্ট বাসুকি নাগ জন্মিল। জন্মিয়া নাগ

আহারের জন্য ছুটিল। ধর্ম্ম ও উল্লূক ভয়ে পলাইতে লাগিলেন। তখন উল্লূকের পরামর্শে ধর্ম্ম কানের কুণ্ডল জলে ফেলিয়া দিলেন তাহা হইতে ভেক জন্মিল। বাসুকি আহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মের মাথায় দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইল।

এখন 'ত্রিদশের নাথ' ধর্ম্ম নিজের গলায় পদ্মহস্ত দিয়া তিলেক প্রমাণ মলা লইয়া বাসুকির মাথায় রাখিলেন। তাহা হইতে নবদ্বীপ বিশিষ্ট বসুমতী বাসুকির মাথায় সৃষ্টি হইল। তখন

নিরঞ্জন বোলেন্ত বসু সুন গো বচন।　　জনম হইলা বসুমতী হও গো চিরাই।
মোহর এক বাক্য তুমি কর গো পালন॥　　আহ্মি জাক জনম'ইব তাক দিও ঠাঁই॥

তারপর ধর্ম্ম ও উল্লূক উভয়ে জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিলেন। এখন উল্লূকের পিঠে আসন করিয়া ধর্ম্ম ত্রিকোণ পৃথিবী দেখিতে হইলেন। বসুমতীও বেগে বাড়িয়া চলিল। ধর্ম্ম ও উল্লূক পৃথিবী ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্ম ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেলেন। অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম তিনি মুছিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে আচম্বিতে আদ্যাশক্তির জন্ম হইল। আদ্যাশক্তিকে ঘরে রাখিয়া ধর্ম্ম ও উল্লূক দুইজনে বল্লুকা সৃষ্টি করিতে গেলেন। ধর্ম্ম গণ্ডী রেখা দিয়া বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিলেন। উল্লূকের কথা মত জগজ্জনকে সৃষ্টি করিবার জন্য ধর্ম্ম সেই নদী তীরে ধ্যানে বসিলেন। এক ব্রহ্মস্থানে প্রভুর চৌদ্দ যুগ কাটিয়া গেল। এদিকে আদ্যাশক্তি যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। একদিন তিনি নিজের যৌবনের কথা ভাবিতেছিলেন, সহসা কামদেব জন্মিলেন। কাম দেবীর আজ্ঞায় বল্লুকায় ধর্ম্মের তপস্যা স্থানে গেলেন। ধর্ম্মের তপস্যা ভগ্ন হইল। উল্লূক মৃত্তিকার ভাণ্ডে কামদেবকে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহাতে বল্লুকায় কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। উল্লূকের কথায় ধর্ম্ম তপস্যা ছাড়িয়া আদ্যাশক্তির সংবাদ লইতে ঘরে ফিরিলেন। আদ্যার যৌবন দেখিয়া ধর্ম্ম ও উল্লূক তাঁহার বরের চেষ্টায় বাহির হইলেন। তখন

কি দিএ রাখিআ গেলে বোলেন্ত পার্ব্বতী।
বিস মধু রাখিলাম বোলে জুগ পতি॥

একদিন পার্ব্বতী আদ্যাশক্তি যৌবন-ভার সহিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিবার জন্য সেই বিষ খাইয়া ফেলিলেন। ফলে কিন্তু আদ্যাশক্তি গর্ভবতী হইলেন। তারপর তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জন্মিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাঁহারা তপস্যায় গেলেন।

দুই চক্ষু অন্ধ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যেখানে তপস্যা করিতেছেন, ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে ছলনা করিতে সেখানে গেলেন। দুর্গন্ধ শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে ধর্ম্ম প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা তিন অঞ্জলি জল দিয়া মড়া ভাসাইয়া দিলেন। তারপর বিষ্ণু তিনিও তাহাই করিলেন। কিন্তু শিব ধ্যান যোগে সমস্ত জানিতে পারিয়া সেই দুর্গন্ধ শব লইয়া নাচিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের বরে অন্ধ শিব ত্রিলোচন হইলেন। ধর্ম্মের আদেশে শিবের মুখামৃতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অন্ধত্ব ঘুচিয়া দিব্য চক্ষু হইল।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেখানে নিরঞ্জন, আদ্যাশক্তি ও উল্লুক আছেন, তথায় গেলেন। নিরঞ্জন ধর্ম্ম ব্রহ্মাকে সৃষ্টি পত্তন করিতে বলিলেন, বিষ্ণুকে পালনের ভার দিলেন আর শিবকে সংহারের ভার দিলেন। তার পর তিনি আদ্যাশক্তিকে নরলোকের জন্য হেতু মন দিতে বলিলেন। তখন

আদ্যাসক্তি বোলে পরভু মাআধর।
কেমনে করিব ছিসৃটি সংসার ভিতর ॥
অজোনি সম্ভবা ভোগ নাহিক আহ্মার।
কেমন উপায় করি কহ করতার ॥

মহাপরভু বোলে সুন্ন আহ্মার বচন।
জে রূপে করিব তুহ্মি ছিসৃটির সৃজন ॥
জোনিরূপা হও তুহ্মি সর্ব্বজীবে রবে।
মানুস আদি জীবজন্তু গর্ব্ভেত জনমিবে ॥

ধর্ম্ম আরও বলিয়া দিলেন যে জন্ম জন্মান্তরে মহেশ আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করিবেন। এইরূপে চারিজনের উপর সৃষ্টির ভার দিয়া প্রভু নিরঞ্জন উল্লুক আসনে শূন্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম-পূজা-বিধানের দুই স্থানে (১৯৯ পৃষ্ঠা—২০৮ পৃষ্ঠা, এবং ২০৮ পৃঃ—২১৭ পৃঃ) সৃষ্টি-বিবরণ আছে। প্রথম বিবরণে জল সৃষ্টির পরে ধর্ম্মের দশাবতারের কথা আছে—এক স্থলে মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভৃগুরাম, বলরাম, রাম, জগন্নাথ এবং ভবিষ্যৎ কল্কী অবতার; অন্য স্থলে বলরামের পূর্ব্বে রাম এবং জগন্নাথ স্থানে "বোদ্দ রূপে ভগবান" দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিবরণে জলের পরে সহস্র মস্তক বিশিষ্ট অষ্ট নাগ সৃষ্টির কথা আছে। তার পর দশ অবতারের বর্ণনা—মীন, বায়বর্ন্ন (বায়ুবর্ণ ?), বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, গোপিকান (কৃষ্ণ), হলধর, কলংখিনী (কল্কী), তার পর

দশ মুরূতে গোসাঞি বলালে জগর্নাথ।
নিমের পৃতিম গোশাঞি সুবর্ণের দুটী হাত ॥

হিঁদু মুছুলমান তোথা একছত্র করিঞা।
আপনা জানান প্রভু জানান্ জানিঞা ॥

হাতে লিলে তির কামঠা পায় দিয়া মজা।
গোউড়ে বলান গিয়া ধর্ম্ম মহারাজা ॥

তার পরে আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একমনে নিরঞ্জনকে ধ্যান করিয়া বল্লুকার তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম হরের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিতে চাহিলেন। কিন্তু উল্লুকের পরামর্শে তাঁহাকে দেখা না দিয়া গঙ্গাকে দর্শন দিলেন এবং মহাদেবের জন্য "ষোল শঙ্খ দুই পদ্ম নিদর্শন" দিয়া বল্লুকার তীর ধর্ম্মের ঘর ভরণ করিতে বলিয়া বিদায় হইলেন।

ধর্ম্মমঙ্গল গুলির মধ্যে ময়ুরভট্টের রচিত মঙ্গল গান সর্ব্ব প্রাচীন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় ইহা এখন অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত। মাণিক রাম গাঙ্গুলি ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্ম মঙ্গল লিখেন। তাহাতে যে সৃষ্টি বর্ণনা আছে (পৃঃ ৯, ১০, ১১) তাহাতে আমরা শূন্য পুরাণেরই প্রতিধ্বনি পাই। সেখানে নিরঞ্জন মহাপ্রলয়ের পরে শূন্যে রহিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেইজন্য উল্লুক পক্ষী সৃজন করিলেন। তারপর নিরঞ্জনের মুখামৃত হইতে জল সৃষ্টির কথা এবং তৎপরে

নিরঞ্জন কর্ত্তৃক শবরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ছলনার বৃত্তান্ত এবং ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির বিবরণ আছে। পুস্তকের অন্যত্র (পৃঃ ৫) নিরঞ্জনের দশাবতারের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা সাধারণ পুরাণ সম্মত।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে (১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত) নিরাকার নিরঞ্জন সনাতন ব্রহ্ম হইতে প্রলয়ান্তে জগৎ সৃষ্টির বৃত্তান্ত আছে। এখানে দেখিতে পাই ব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইয়া "নবীন নীরদ শ্যাম জিনি কত কোটি কাম" মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার নাসাপুট হইতে উলূক জন্মিল। তারপর তাঁহার বদনপীযূষ হইতে জল সৃষ্টি হইল। অতঃপর পরমব্রহ্মের বামে (ঘামে ?) পরা প্রকৃতি জন্মিল। পরা প্রকৃতিকে দেখিয়া ব্রহ্মের মন টলিল। প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জন্মিলেন। তারপর ব্রহ্ম মড়া হইয়া সকলকে পরীক্ষা করিলেন। মহাদেব কেবল তাঁহাকে চিনিতে পারেন। ব্রহ্ম মহাদেবকে সৃষ্টি করিতে বলিলেন। মহাদেব ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। তখন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া ব্রহ্ম ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা মহীকে উদ্ধার করিতে বলিলেন। পরমব্রহ্ম বরাহরূপে সপ্ত সাগরের নীচে গিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীকে প্রলয়ের জল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। জলের উপর পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। পরমব্রহ্ম বাসুকি, কূর্ম্ম, অষ্টকুলাচল ও সুমেরু পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়া ধরাকে স্থির করিলেন। তারপর ঈশ্বর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের ভার দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

"ধর্ম্ম" সাহিত্যের বাহিরেও এইরূপ সৃষ্টি-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মাণিকদত্তের মঙ্গল-চণ্ডী গীতের সৃষ্টি-বিবরণ অনেকটা শূন্য পুরাণেরই মত। তাহাতে অনাদ্য নিরঞ্জন ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাঁহার মুখামৃত হইতে জলের সৃষ্টি, উলূকের সৃষ্টি, তারপর পাতাল হইতে মাটি আনিয়া বসুমতীর নির্ম্মাণ, বসুমতীকে গজের উপর স্থাপন, গজ পৃথিবীর ভার সহিতে পারে না দেখিয়া কূর্ম্মের সৃষ্টি, গজ ও কূর্ম্ম উভয়ে রসাতলে যায় দেখিয়া অতঃপর কনক পৈতা হইতে সহস্র-মস্তক বিশিষ্ট বাসুকির সৃষ্টি, তৎপরে ধর্ম্মের ঘামে আদ্যার জন্ম, ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি, ধর্ম্মের আদেশে সাত জন্মের পর আদ্যার সহিত মহাদেবের বিবাহ—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নাথধর্ম্মে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের পরিচয় অমরা পাই তাহা অনেকটা শূন্যপুরাণের সঙ্গে মিলে। নাথ মতে (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩১শ ভাগ ২য় সংখ্যা দেখুন) অলেকনাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদি ধর্ম্ম নাথকে সৃষ্ট করেন। তারপর অলেকনাথের মুখামৃত হইতে স্থলের (জলের ?) সৃষ্টি হইল। "অনাদি নাথ সেই স্থলের (জলের ?) উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর অলেকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে 'কাকেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদাস্তর' সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন।" তখন অলেকনাথ গঙ্গার সৃষ্টি করিয়া "অনাদির জটার মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন——

" আদি দেবি সৃজিছি তুমার লাগি শক্তি। আদিয়ে অনাদ্যিয়ে শৃষ্টি নির্ম্মিছি।
গঙ্গাদেবি শৃজিছি আদির অঙ্গে গতি ॥ দুয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি ॥

এইরূপে সৃষ্টির ভার অনাদির উপর দিয়া অলেকনাথ চলিয়া গেলেন। তাঁহার "কৃপায় কাকেতুকা ওরফে আদিদেবী জীবিতা হইলেন এবং আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।" ক্রমে বাসুকি ও পাতাল সৃষ্টি করা হইল, বাসুকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার ফটের উপর তিন কুল (ত্রিকোণ ?) পৃথিবী স্থাপন করা হইল। তারপর ধর্ম্মের মুষ্টির মধ্য হইতে ব্রহ্মা ও মহাদেব জন্মিলেন। তাঁহারা 'চক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে' এমতাবস্থায় অম্বল ভিতর পড়িয়া রহিলেন। অনাদি নাথ ছদ্মবেশে একে একে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া রন্ধন ভোজনের স্থানের জন্য অপোড়া পৃথিবী চাহিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু প্রার্থীকে তাড়াইয়া দিলেন। শিব নিজের মাথার তিন জটায় রন্ধন ভোজন করিতে বলিলেন। অনাদিনাথ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবনশক্তি লাভ করিবার উপায় বলিয়া দিয়া গেলেন। শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকেও তাঁহার উপায় বলিয়া দিলেন। শিব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর গুরু হইলেন। তারপর শিব অনাদি নাথের আদেশে গঙ্গা ও গৌরীকে বিবাহ করিলেন। তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দক্ষিণসমুদ্রের কুলে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে ছলনা করিবার জন্য অনাদি মড়া গরুর রূপে ভাসিতে ভাসিতে একে একে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঘৃণা ভরে উঠিয়া পলাইয়া গেলেন। শিব চিনিতে পারিয়া মড়াকে লইয়া সৎকার করিলেন। অনাদিকে যখন দাহ করা হয়, তখন তাঁহার বিভিন্ন অংশ হইতে অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের উৎপত্তি হয়।

গোরক্ষ বিজয়ে সৃষ্টি-বিবরণ নিম্ন লিখিতরূপে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে জল স্থল কিছুই ছিল না। সকলই অন্ধকার। তারপর পৃথিবী সৃষ্টি করিতে আদি বা আদ্য প্রভু অনাদি বা অনাদ্য ধর্ম্মকে জন্মাইলেন। ধর্ম্মদেব প্রথমে নিদ্রিত ছিলেন। পরে চৈতন্য পাইয়া কাছে ছায়ার লক্ষণ দেখেন। তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া নখ দ্বারা বিদীর্ণ করেন। তাহা হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ধূঁয়া ও কুয়াসা উৎপন্ন হইল। তাহার বক্ষে ক্ষিতির স্থাপনা হইল। ধর্ম্মের হুঙ্কারে ব্রহ্মা জন্মিলেন, মুখ হইতে বিষ্ণু হইলেন। আদ্য অনাদ্যরূপে দেখিয়া ভাবাবেশে ধর্ম্মাক্ত হইলেন। সেই ধর্ম্ম হইতে আকাশ, স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্য, পরমাত্মা, দেবতা ও জীবগণ জন্মিলেন। তারপর অনাদ্যের শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে শিব মীন নাথ, হাড়িফা, কানফা, গাভুর সিদ্ধা ও গোরক্ষনাথ জন্মিলেন এবং তাঁহার সকল শরীর হইতে জগতের মাতা গৌরী জন্মিলেন। আদ্য গৌরীকে গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে বলিলেন। সকলে মাথা হেট করিলেন।

" তবে পুনি আজ্ঞা কৈল নাথ নিরঞ্জন।
হরগৌরি হও তবে একহি জীবন ॥
আজ্ঞা কৈলা হর প্রতি পাইলা এই নারী।
তাহানে লইয়া জাও হর মোর আজ্ঞা ধরি ॥
হরগৌরি চলি জাও পৃথিবীর মাজ।
এথাতে রহিলে তোক্ষি নাহি কোন কাজ ॥
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তবে খিতিত য়াইল।
খিতিত য়াসিয়া সিদ্ধা সকল রহিল ॥"

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আদি দেবের বর্ণনা এইরূপ :—

আদিদেব নিরঞ্জন　যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন　নাহি কেহ সহচর　দেবতা অসুর নর,
পরম পুরুষ পুরাতন।　সিদ্ধ-নাগ-চারণ কিন্নর।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি,　চিন্তিলেন মহামতি,　নাহি তথা দিবানিশি　নাহি তথা রবি শশী
সৃজনের উপায় কারণ ॥　অন্ধকার আছে নিরন্তর ॥

এই আদিদেব হইতে আদি দেবী উৎপন্ন হন। তারপর মহান্,অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি সৃষ্ট হন। ব্রাহ্মণ কবিকঙ্কণ মহাশয় “ধর্ম্ম” মতের সহিত পৌরাণিক ও দার্শনিক মত মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি পাকাইয়াছেন।

শূন্য পুরাণের সৃষ্টির ছায়া ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই। সেখানে আছে যে পরমপ্রকৃতি স্বরূপিণী মহামায়া প্রথমে অন্ধকার প্রকাশ করিলেন। তখন কারণ-জলে সমস্ত প্লাবিত। তারপর তিনি বিনা গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে প্রসব করিলেন। তাঁহারা কারণ-জলে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য শবরূপা হইয়া ভাসিতে ভাসিতে একে একে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু পচা গন্ধে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া গেলেন, ব্রহ্মা চারিদিকে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চতুর্ম্মুখ হইলেন; কিন্তু জ্ঞানী শিবের কোন ঘৃণা নাই, তিনি গলিত শব চাপিয়া বসিলেন।

দেখিয়া শিবের কর্ম্ম　তাহাতে পশিলা মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি　দুজনে সন্তুষ্ট অতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥

শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত এই সকল সৃষ্টি-তত্ত্বে তুলনা করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে ক্রমশঃ অনেক পৌরাণিক ও দার্শনিক ব্যাপার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মূল সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে শূন্য পুরাণের সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল কোথায়? হিন্দুমতে, না অন্য কোন মতে। প্রথমে দেখা যাউক হিন্দুমতের সহিত ইহার কোথায় কোথায় মিল আছে। আদিতে কিছুই ছিল না, কেবল অন্ধকার ছিল। এই মত পৃথিবীর নব্য ও প্রাচীন অনেক ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া গেলেও প্রাচীন ভারতেও ইহার অনস্তিত্ব ছিল না। ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল ১২৯ সুক্তে) আমরা ইহার সন্ধান পাই; যথা :—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
　নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্
　নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
　ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
　তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস ॥ ২
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহ
　প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ পিহিতং যদাসীৎ
　তপসস্তন্ মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩

১। "তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। "তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিলনা, কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। "সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জলমগ্ন ছিল। অবিদ্যমান্ বস্তু দ্বারা সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন"। (রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

মনুসংহিতাতেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়:—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

(১ম অধ্যায়)

"এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয়, কোন লক্ষণা দ্বারা অনুমেয় নয়; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল"।

(পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)

প্রভু হইতে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের সৃষ্টি এবং ধর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তি এবং আদ্যাশক্তি হইতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে মানস পুত্র ও মনু প্রভৃতির সৃষ্টির সহিত তুলনীয়। আদ্যাশক্তি হইতে ব্রহ্ম প্রভৃতির সৃষ্টি পুরাণেও দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তবে আছে (৮১ অধ্যায় ৬৫ শ্লোকে)—

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ।
কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

"তুমি আমাকে, ঈশান ও বিষ্ণুকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছ। অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ?"

ব্রহ্ম প্রভৃতির জন্ম ও পরীক্ষা বৃত্তান্ত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পুরাণ অপ্রাচীন, সম্ভবতঃ ধর্ম্মমত হইতে ইহার উপাদান গৃহীত। নিম্নে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ দিতেছি।

"হে জৈমিনে! পূর্ব্বে এই জগৎ কেবল শূন্যময় ও অন্ধকার পূর্ণ ছিল। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক কোন পদার্থই ছিল না, তৎকালে কেবল মাত্র প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়

বিদ্যমান ছিলেন, তৃতীয় বস্তু কিছুই ছিল না। অনন্তর কৈবল্যসংস্থিত পুরুষের সৃষ্টি বাসনা হইবা মাত্র প্রকৃতিযোগে এক ব্রহ্মই ত্রিধা বিভক্তি হন। প্রকৃতিসম্ভব সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই পুরুষত্রয় উৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। প্রথম সাত্বিক, দ্বিতীয় রাজস ও তৃতীয় তামস। ৬—৯। পরে দেবী প্রকৃতি পুরুষকে গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদিগের মধ্যে কে আমাকে গ্রহণ করিবেন? সেই পুরুষত্রয়ের উপকারিণী দেবী প্রকৃতি এইরূপ চিন্তা করিয়া অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে জলের সৃষ্টি করত তাহাতে রস যোজনা করিলেন। যাহারা সৃষ্টি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, উক্ত প্রকৃতিই তাহাদিগের অভিজ্ঞাস্বরূপিণী। অতঃপর প্রকৃতি পুরুষকলেবর ধারণ পূর্ব্বক সেই জলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন বলিয়া নারায়ণ নামে সেই মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ হইল, কারণ, নার শব্দে জল ও অয়ন শব্দে স্থান, সুতরাং জলই তাঁহার আবাস স্থান হইল বলিয়া নারায়ণ নাম হইল। অনন্তর দেবী প্রকৃতি; সেই সাত্বিকাদি পুরুষত্রয়কে শরীরী করিলে তাঁহারা বাসস্থান না পাইয়া সলিল মধ্যে ভ্রমণ করতঃ চিন্তান্বিত হইলেন। পরে "তোমরা সকলে তপস্যা কর" এইরূপ আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। সেই সময় জলরাশি শুষ্কীভূত হইল। অতঃপর তাহারা আত্মসন্নিবেশ করতঃ তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১০—১৭। পরে ভগবতী প্রকৃতি, তাঁহাদিগকে তপোনিষ্ঠ দেখিয়া পরীক্ষা উপায়োদ্ভাবন পূর্ব্বক শবরূপ ধারণ করিয়া সেই জলরাশিতে ভাসমান হইতে থাকিলেন। তাঁহার অঙ্গ সকল বিকৃতি ছিন্ন ভিন্ন এবং কৃমিগণে পরিব্যাপ্ত। তদীয় দেহ হইতে কেশজাল ও মাংস রসাদি গলিত হইতেছে। সেই বীভৎসরূপিণী শবরূপা প্রকৃতি এইরূপে ভাসমান হইয়া প্রথমে সাত্বিক পুরুষের নিকট গমন করিলে সাত্বিক বিমুখ হইয়া পূর্ব্বদিকে মুখ পরিবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর, শবরূপা প্রকৃতি তাঁহার পূর্ব্বদিকে গমন করিলে সাত্বিক উত্তরাস্য হইলেন, পরে প্রকৃতি উত্তর দিকে যাইলে তিনি পশ্চিমাস্য হইলেন। তৎপরে প্রকৃতি পুনরায় পশ্চিম-দিগ্বর্ত্তিনী হইলে তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইলেন। সাত্বিক এইরূপে চতুর্ম্মুখ হইয়াও নিবৃত্তি লাভ করিতে না পারায় পলায়ন করিতে বাসনা করিলে প্রকৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। প্রকৃতিকে দেখিয়া সাত্বিকের মুখত্রয় বৃদ্ধি পাইল বলিয়া তিনি তদবধি ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অনন্তর ভারতী প্রকৃতি তাঁহাকে সাত্বিক ভাবের অভিভাবক রাজসভাব দান করিয়া এবং রক্তবর্ণ ও সৃষ্টিকর্ত্তা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন। পরে শবরূপা প্রকৃতি রাজসপুরুষের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, তিনি মনোবিকার বশতঃ সহস্রশীর্ষ সহস্রচক্ষু ও সহস্রপাদ হইয়া দশদিক পরিব্যাপ্ত করিলেন বলিয়া তিনি বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং নেত্র নিমীলন করিয়া জল মধ্যে শয়ন করিতে লাগিলেন, তখন প্রকৃতি তাঁহার তাদৃশ ভাব দর্শনে তাঁহাকে রাজসভাবের অভিভাবক সাত্বিক ভাব প্রদান পূর্ব্বক শুক্লবর্ণ ও পালক করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন। ১৮—২৭। পরে সেই শবরূপী প্রকৃতি তামস-পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী

হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিতে অসমর্থা হইয়া গন্ধবহ বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। হে জৈমিনে! তৎক্ষণাৎ সেই বায়ু তাঁহার শরীর হইতে পূতিগন্ধি পরমাণু সকল সঞ্চালিত করত তামস-পুরুষের নাসারন্ধ্রে সংযোজন করিতে আরম্ভ করিলে দুর্গন্ধে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। অনন্তর তামসকামু-সংসৃষ্ট বিকৃতাকার শবদর্শনে করদ্বারা তাহা ধারণ করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন আদ্যাশক্তি দেবী পরমা প্রকৃতি সেই তামস পুরুষকে পরম শিবময় এ জন্য শিব নামের যোগ্য জানিয়া মনে মনে তাহাকে আশ্রয় করিলেন।" ২৮—৩৩।

(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৬—৩৩ শ্লোক)।

পৃথিবীর আধার বাসুকি, গজ ও কূর্ম্ম এই বিশ্বাসও পুরাণ সম্মত।

শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের সহিত অনেকস্থলে মিলিলেও তাহাতে মহাযান বৌদ্ধ মতেরও প্রভাব দেখা যায়।

নেপালী বৌদ্ধমত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন—

"স্বয়ং পরমপুরুষ মহাশূন্য অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই পূর্ণ। পূর্ণ জ্ঞানরূপে তাঁহার নাম আদিবুদ্ধ ও পূর্ণ শক্তিরূপে তাঁহার নাম আদিধর্ম্ম বা আদিপ্রজ্ঞা। এই উভয়ই অনাদি ও অনন্ত এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য থাকিলেও উভয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মহাশূন্যের ইচ্ছা মাত্র আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার সাহায্যে ঐশী শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধ (ও দেবগণ) উৎপন্ন হন। আদি বুদ্ধ চিরকালই নিবৃত্তিতে সুষুপ্ত। জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত পঞ্চ বুদ্ধকে আত্ম হইতে বিস্ফুরিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই বিশ্বের মূলীভূত প্রথম ও প্রধান কারণ হইলেও স্থূল দৃষ্টিতে এই পঞ্চ বুদ্ধই সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। ইঁহারা পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু চতুর্থ ভ্রাতা অমিতাভ হইতেই বর্ত্তমান বিশ্বের কর্ত্তা বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির উদ্ভবে হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে পূজা করা হইয়া থাকে। * * * বোধিসত্ত্বগণই জগতের সৃষ্টিরক্ষা ও পালন করিয়া আসিতেছেন।"

(বিশ্বকোষ—সৃষ্টিতত্ত্ব)।

কারণ্ডব্যূহ মতে আদিবুদ্ধ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া অবলোকিতেশ্বরকে উৎপন্ন করেন। অবলোকিতেশ্বরের শরীর হইতে চন্দ্র সূর্য্য মহাদেব বিষ্ণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন। এই অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারা। ত্রিকাণ্ড শেষ মতে তারা অবলোকিতেশ্বরের কন্যা। Sir Charles Eliot বলেন "The Dharma or Nirainjana of the Sunya Purana seems to be equivalent to Adibuddha" (Hinduism and Buddhism, Vol. II, p. 32 foot note) অর্থাৎ "শূন্য পুরাণের ধর্ম্ম বা নিরঞ্জন আদিবুদ্ধের সমান বলিয়া মনে হয়।" বস্তুতঃ শূন্যপুরাণের ধর্ম্ম বিশেষতঃ নাথ সাহিত্যের অনাদ্য বা অনাদি নেপালী বৌদ্ধমতের আদিধর্ম্ম ও কারণ্ডব্যূহের অবলোকিতেশ্বর তুল্য এবং শূন্যপুরাণের প্রভু বা নাথ-সাহিত্যের আদি বা আদ্য নেপালী বৌদ্ধমতের মহাশূন্য ও

কারণব্যূহের আদিবুদ্ধের তুল্য। মহাদেব দাসের ধর্ম্ম গীতাতেও ধর্ম্মকে আদিবুদ্ধের পুত্র তুল্য বলা হইয়াছে। সেখানে ধর্ম্ম বহু যুগ ধরিয়া আদিবুদ্ধের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন এরূপ বর্ণনা দেখা যায় (Mayurbhanj Archaeological Survey by Nagendra Nath Vosu., Intoduction)। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ; ধর্ম্ম নিরঞ্জনের ও পদ্ম হস্ত। তারা অবলোকিতেশ্বরের কন্যা ; আদ্যাদেবী বা দুর্গা ধর্ম্মের স্বেদ হইতে উৎপন্ন।

ময়ূরভঞ্জের মহিমাধর্ম্মের-সৃষ্টি-তত্ত্ব অনেকাংশে শূন্যপুরাণেরই মত। সেই মতে "একমাত্র স্বয়ম্ভূ মহাশূন্যই জগতের আদিভূত কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে কোন বিভূতি ছিল না। যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি বিভূতি প্রকাশ করিবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম্ম নামে আত্ম প্রকাশ করিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার ললাট দেশের ঘর্ম্ম হইতে বিশ্বের আদি-শক্তি স্বরূপা একটী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই রমণী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উদ্ভূত হইলেন। তখন জগতের সৃষ্টি ও পালনের ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইল। তদনুসারে ইঁহারা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অদ্যাবধি তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।"

(বিশ্বকোষ, সৃষ্টিতত্ত্ব)

যাবা দ্বীপেও এক সময়ে শূন্যপুরাণের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত ছিল। সেখানে সঙ্‌হ্যঙ্‌ কমহায়ানিকন নামক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে আদিপিতা অদ্বয় ও আদিমাতা অদ্বয়জ্ঞান বা ভরালী প্রজ্ঞা পারমিতা হইতে দ্বিরূপ বুদ্ধের উৎপত্তি হয়, বুদ্ধ হইতে শাক্যমুনি, শাক্যমুনির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে লোকেশ্বর, লোকেশ্বর হইতে অক্ষোভ্য ও রত্নসম্ভব, শাক্যমুনির বামপার্শ্ব হইতে বজ্রপাণি, বজ্রপাণি হইতে অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি, শাক্যমুনির মুখ হইতে বিরোচন, এবং বিরোচন হইতে ঈশ্বর, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উৎপন্ন হন। (Sir Charles Eliotএর Hinduism and Buddhism, Vol II, p 173) Sir Charles Eliot এর মতে বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপাল, তিব্বত (কালচক্র মত) এবং যাবায় এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত হইয়াছে (Hinduism and Buddhism) Vol II, p 32)।

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় যে ব্যাবিলোনিয়ার সৃষ্টি-মহাকাব্যে (Epic of Creation) কিঞ্চিৎ পরিমাণে এইরূপ সৃষ্টি বৃত্তান্ত দেখা যায়। তাহাতে দেখিতে পাই প্রথমে কিছুই ছিল না। পরে দেব অপ্‌সু (গভীর জলরাশি) এবং দেবী তিয়মাত (জলীয় অন্ধকার) হইতে একমাত্র পুত্র মুম্মু (জলপ্লাবন) উদ্ভূত হয়। দেব-দম্পতী হইতে পুনরায় লখ্‌মু, ও লখমু, এবং তৎপর আনসার ও কিসর উৎপন্ন হয়। মুম্মু হইতে অণু, লখ্‌মু-লখমু হইতে এন্‌লিল্‌ এবং আন্‌সর্‌-কিসর্‌ হইতে এআ জন্মায়। এআ এবং দম্‌কিন হইতে বেল্‌মেরোদাখ উৎপন্ন হন। বেল্‌ মেরোদাখ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

(Hastings' Encyclopædia of Religion and Ethics, Article on Cosmogony and Cosmology (Babylonian)

কাহারও কাহারও মতে. মেরোদাখই ঋগ্‌বেদে মার্ডীক, মৃড় হইয়াছেন। এই মৃড় পরে রুদ্র হইয়া তৎপরে শিব হইয়াছেন (শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকঙ্কণের টীকা ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই শিবই শূন্যপুরাণ প্রভৃতিতে প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আশুতোষ স্মরণে

এখনও এক বৎসর অতীত হয় নাই আশুতোষের তিরোধান ঘটিয়াছে কিন্তু এই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্ষে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী পণ্ডিত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পালি শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন স্বতঃই মনে হইতেছিল—অপরস্থা কিম্ ভবিষ্যতি। এত শীঘ্রই যদি আমরা মহাপুরুষের প্রাণপাত ভুলিয়া না যাইতাম, তবে আমাদেরই বা এত দুর্দ্দশা হইবে কেন? জাতির অধঃপতনের যুগে অনেক ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায়। মহাপুরুষের কার্য্যস্মৃতি-বিস্মরণও আমাদের জাতীয় জীবনের মহাব্যাধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেদিন চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন। বাঙ্গালী অন্ধ তিমিরে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। বৈদেশিক মোহের আবরণে স্বাধিকার ও নিজস্ব জলাঞ্জলি দিয়া—জননী বঙ্গভাষাকে বর্ব্বর ভাষা জ্ঞানে, সুসভ্য বৈজাতিক ভাষায়—বাঙ্গালী স্বপ্ন দেখিতেছিল। ওদিকে মহাসিন্ধুর পারে বসিয়া বৈদেশিক পণ্ডিতবর্গ ভারত শক্তি ও প্রাচ্য সভ্যতাকে হীনতর প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, ভারতের কলাবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য খালি গ্রীসের নিকট ধার করা,—এই ভারতে এমনকি প্রাচ্যভূমিতে কখনও নির্ব্বাচনতন্ত্রের প্রচলন হয় নাই,—ইহা যথেচ্ছাচারিতাই লীলাভূমি; অতএব ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন হইতে পারে না, ভারতের স্বরাজ সুদূরপরাহত ইত্যাদি বহু মৌলিক গবেষণায় ভিনসেণ্ট স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকই ব্যাপৃত ছিলেন ভারতের তাজমহলে পাশ্চাত্য প্রভাব না দেখাইলে ভারত বড় হইয়া যায়, ভারতের বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষে মৌলিকতা থাকিলে ইউরোপীয় সভ্যতা পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে না, ভারতের সিরাজদ্দৌলা, আওরঙ্গজেব, আলাউদ্দিনকে হীন ও ঘৃণ্য না করিলে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি হইবার সম্ভাবনা,—তাই ঘর-বাহিরের সমবেত চেষ্টায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা নিজে নিজেদের হেয়জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিলাম। তাহার ফলে দেখিয়াছিলাম যে দারুণ গ্রীষ্মেও হ্যাট-কোটে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর মুখে তখন ইংরাজীর খই ফুটিতেছে। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী বলিয়া

চিনিবার জন্য বর্ণ ভিন্ন কোন উপায় নাই। অনাদৃতা জননী মাতৃভাষা আস্তাকুঁড়ে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনের ভিতর মর্ম্মন্তুদ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। বাঙ্গালী গৃহিণীও গৃহস্থালী ছাড়িয়া বাঙ্গালী শিশুকে আয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী বরেণ্য আশুতোষ দেশকে সজীব করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আশু চমকপ্রদ যুগপৎ করতাল ধ্বনিতে আকুলিত বঙ্গবীরের উন্মুক্ত পথে না যাইয়া আশুতোষ দেশের চিন্তা, ভাব ও কর্ম্ম জীবনে অলক্ষ্যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। জন্মভূমির সীমান্তের বাহিরে বিদেশী চিন্তা কেন্দ্রে ভারত সভ্যতার বিচার ও মীমাংসার পরিবর্ত্তে দেশ-আদর্শ দেশ-ইতিহাস দেশের ভিতরে আনিবার জন্য বিদেশী-ভাব-প্রাণাদিত বিশ্ববিদ্যালয়কে খাঁটি দেশের জিনিস করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আশুতোষ ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সেই স্বপ্নের ঘোরে তিনি বাঙ্গালীর কণ্ঠে এক অভূতপূর্ব স্বপ্নময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতের উন্মাদনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের মনীষিগণকে সাদর আহ্বান করিয়া বাঙ্গালায় শিক্ষাজীবন তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

আজ তাহার ফলে বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চশিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ভারতবর্ষ, খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীন ভারত, প্রাচীন মুদ্রাবিজ্ঞান, ভারতীয় রাজনীতির ক্রমবিকাশ, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম্মের উত্থান পতনের ইতিহাস, মুসলমান সভ্যতা ও জ্যোতিষ, প্রাক-বৌদ্ধ যুগের ভারতীয় দর্শন, অশোক লিপি, ছত্রপতি শিবাজী, এসিয়ার ধারাবাহিক নৃতত্ত্বের প্রাথমিকপাঠ, খলিফাদিগের প্রাচ্যদেশ, তিব্বতীয় ভাষার ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বঙ্গসাহিত্যসম্পদ, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশ, বাংলায় রূপ ও লোক কথা, বাঙ্গলা অক্ষরের উৎপত্তি, সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা, বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় ও ইতিহাস, ভারতের সামজিক জীবন ও ইতিহাস, ও ভারতের অর্থনীতি ও প্রাচীন শাসননীতি, ভারতীয় দর্শন, গণিত জ্যোতিষ ও রসায়ন, নৃতত্ত্ব, সুকুমার শিল্প ও কলাবিদ্যা, প্রচীন লিপিতত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি নানা গবেষণা ও অনুশীলনে দেশ মুখরিত হইতেছিল। সমগ্র এসিয়া হইতে শতশত ভূর্জ্জপত্র, মুদ্রা, শিলা, লিপি, অনুশাসন, পুঁথি সংগৃহীত হইতেছিল। বঙ্গসাহিত্যে জগৎসাহিত্য সৃষ্টি হইতেছিল।

দেশের এই বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি কল্পে বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়নের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই ভারতে একদিন বৌদ্ধ যুগ আসিয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। তদানীন্তন সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্ম্মের অবস্থা দেখিতে হইলে বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসন্ধান ভিন্ন ভারত ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি অধ্যাপনার সৃষ্টি। আশুতোষ উঠিয়া পড়িয়া পালি চর্চ্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর স্বনামধন্য পুরুষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যখন পালিভাষায় এম, এ, পরীক্ষা দেন, তখন ইংলাণ্ড, জর্ম্মানি হইতে

পালি পরীক্ষক ধার করিয়া আনিতে হইয়াছিল। আজ তাহার পরিবর্ত্তে বৌদ্ধভিক্ষু, সিংহলী, চৈনিক, ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ শিক্ষাদান করিতেছেন। ইহা কেমন করিয়া সহ্য হইবে। তাই আশুতোষের সাম্বৎসরিকীর প্রারম্ভে পালি-সঙ্কোচের বিশেষ আয়োজন, আর বাঙ্গালী পণ্ডিতই সে যজ্ঞের প্রধান হোতা। তাই বলিতেছিলাম আশুতোষকে হারাইয়া আমাদিগের ভাগ্যে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি? আজি মহাপুরুষের তিরোধানের দিনে আসুন আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনের উক্ত স্মৃতি স্মরণ করিয়া আমাদিগের এই অভিশপ্ত দেশের প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাকরি।*

মৌলবী আজিজল হক

দলাদলি

(গল্প)

(১)

প্রকৃত তথ্যটা ঠিক্ জা'ন্‌তে পারা না গেলেও এটা জোর গলায় বলা যেতে পারে যে, মুখুয্যেদের ধনদৌলত খ্যাতি-প্রতিপত্তি গুলাই হয়েছিল বামুনপাড়ার বেকার পরনিন্দুক দলের হিংসার কারণ। কিন্তু ঐ গুলা অর্জ্জন ক'রতে কি অধ্যবসায়—কত অদম্য সাহস এবং কত মাথার ঘাম যে পায়ে ফে'ল্‌তে হয়েছিল তাত বু'ঝ্‌বার শক্তি তা'দের ছিল না। তা'রা ভেবেছিল—এ শুধু জুয়াচুরি—কেবল লোককে ঠকিয়ে নিজের স্বার্থের উদর পূর্ণ করা। কাজেই কি ক'রে তা'দিকে নিজেদের পর্য্যায়ে টেনে এনে তা'দের উন্নতির ফুটন্ত ফুলগুলি মুচ্‌ড়ে' ভেঙ্গে দিতে পারা যায়, তা'ই হ'য়েছিল হিংসক দলের কয়দিনকার আলোচনার বিষয়। এর জন্য মাথা ঘামিয়ে তা'দের তামাকের শ্রাদ্ধের ফর্দ্দটা দিনের পর দিন একমাত্রা করে বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু তারা মীমাংসার আলোক রেখা তা'দের কারো সমুখে সে পর্য্যন্ত ফুটে উঠবার আভাষও দেখ্‌তে পায় নাই। কেননা, তাদের আলোচ্য দু'ভাই নিশিকান্ত ও তারাকান্তর বাড়ীর যুবকরা পর্য্যন্ত বড় কারো সঙ্গে মিশে হাসি-গল্প গান-বাজ্‌না প্রভৃতিতে সময় কাটা'তে কোনমতেই রাজি ছিল না। দায়িত্ব সম্পূর্ণ করাই ছিল তা'দের সব চেয়ে বড় আনন্দ।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে ছিলেন হিংসকদলের পাকা নেতা। যুবকরা মতলবটাকে কাজে পরিণত ক'র্‌বার কোন উপায় স্থির ক'র্‌তে না পেরে, শেষে তাঁকেই ধরে ব'স্‌ল। এই রকম কাজের অভিজ্ঞতা তাঁ'র মাথার চুলের সহজ রঙ্‌টাকে অনেক দিন হল বদ্‌লে দিয়েছিল। রায়দের তরুণ যুবক মোহনের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খাওয়ার পর থেকে—হাতে কোন কাজ না থাকায়, দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে চালের ফাঁকে আকাশ দেখে আন্‌মনে ঝিমুতে

* এই প্রবন্ধটী কৃষ্ণনগরে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর বাৎসরিক স্মৃতি সভায় লেখককর্ত্তৃক পঠিত।

হচ্ছিল। অনাহূতভাবে যখন উমেশ ও হলধর তাঁর কাছে এসে মুখুয্যেদের সর্ব্বনাশের প্রস্তাবটা ক'রলে তখন তিনি তা'দিকে উৎসাহ দিয়ে ব'ল্‌লেন,—"তা—এটা ক'র্‌তে পা'র্‌লে একটা বাহাদুরী আছে উমেশ ভাইপো!"

মাথাটী মৃদু মৃদু এদিক ওদিক কয়েক বার দুলিয়ে উমেশ ব'লল,—"খুড়ো আমরা বনেদী বংশের। আমাদের হাঁড়ি চড়্‌বে না—আর, ওরা চক্‌মিলান পিট্‌বে! এতও কি গায়ে সয়!"

হলধর ক্রুদ্ধভাবে বলে উ'ঠ্‌ল,—"শুধু তা হলেও তো রক্ষা ছিল। এ যে দিনে ডাকাতি ক'র্‌ছে। টাকায় ৯ সের চাল কিনে রাণীগঞ্জে ৭ সের করে বে'চ্‌ছে। লোককে টাকা কর্জ্জ দিয়ে টাক্‌তি দু'পয়সা সুদ নিচ্ছে। সব জুয়াচুরি—জুয়াচুরি। কাঁহাতক আর সহ্য হয়। বেটারা মহাজন নয়—মহাযম!"

গম্ভীরভাবে বাঁড়ুয্যে মোশায় ব'ল্‌লেন,—"জানি সবই বাবা—বুঝিও সব। তবে সবাই এত দিন চুপ করে ছিলি। কাজেই, কিছু বলি নি। একেতো লোকে আমাকেই সব কাজেই দোষ দেয়—তবে যখন তোরা জেগেছিস, তখন আর ভাবনা নাই। উমেশ বাবাজীকে একটা কাজ করতে হবে। দেখ,—ঐ যে—আঃ—লোকগুলার নাম কর্‌তেও কেমন যেন ঘৃণা হয়। ঐ যে হে—তারার বেটা সতে,—, ওকে কোন রকমে আমাদের দলে নিয়ে বুঝিয়ে দাও যে, তার জেঠা তার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়ে নিজের বিষয়টা বেশী করে নিয়েছে। দু'ভাই—বিষয় সমান না হয়ে কম বেশী হবার, ঐ কারণ। বড় চামার বেটার ছেলে কেলে' কি ভবাকে কায়দায় আ'ন্‌তে পা'র্‌বে না। তুমি এইটুক্ কর—ভাইয়ে ভাইয়ে একটু লাগিয়ে দাও। তারপর আছে শর্ম্মারাম, তোমার খুড়া!"

উমেশ ব'ল্‌ল,—"তা একথা মন্দ নয়। এক ঢিলে দু'পাখীই ম'র্‌বে। আমার এই ক'দিন ঐ সতে'র সঙ্গে একটু একটু আলাপের মত হয়ে আ'সছে। চার খাইয়ে শীগ্‌গীরই বাছাধনকে কাঁটায় গাঁথ্‌ছি আর কি! খুড়ো তাহলে কথা হয়ে রইল, এখন তবে উঠি।"

"সে কি বাবাজি, এরই মধ্যে! তামাক্কুটামাক খা—একটু তোরা বস্। আমি এই দোকান থেকে এলাম বলে। তামাকের খরচ তো আমার কম নয়। এই একটু আগে ফুরিয়েছে। তোরা বস, আমি আসি!" বাঁড়ুয্যে মশায় ব্যস্ততা দেখিয়ে উ'ঠ্‌বার যোগাড় ক'র্‌ছিলেন। উমেশ বাধা দিয়ে ব'ল্‌ল,—"থাক্ খুড়ো—, আর কষ্ট করে দোকানে যেতে হবে না। একটু আগে খেয়ে এসেছি—এখন আর খেয়াল নাই!" "তা দেখ্ বাবা, তোদের মন। ব'ল্‌বি—খুড়ার ওখানে গেলাম্ এক কল্‌কে তামাকও দিলে না!" জবাবের খাতিরে বৃদ্ধ মুখে এইরূপ ব'ল্‌লেন বটে, কিন্তু উমেশ প্রভৃতির সৌজন্যে মনে মনে অনেকটা সন্তোষ লাভ ক'র্‌লেন। তা'রা চলে গেল। একটা কাজ হাতে এল ভেবে তিনি মনে মনে একটু প্রফুল্ল হলেন।

(২)

নেতার পরামর্শমত তারাকান্তর পুত্র সতীশকে নিজের দলে টেনে নিতে উমেশের বড় বিলম্ব হ'ল না। যদিও প্রথম প্রথম অনেকটা গায়ে পড়া ভাবেই তাকে সতীশের সঙ্গে মি'শতে হল, তবু আদর আপ্যায়িত যত্নসম্ভ্রম প্রভৃতি মানুষ বশ ক'র্‌বার কায়দাকানুনগুলা দিয়ে সে তাকে অল্পদিনের মধ্যেই এমনই বেঁধে ফে'ল্‌লে যে, সতীশ তা বু'ঝ্‌তে পা'র্‌লেও বাঁধন ভা'ঙ্‌তে পা'র্‌লে না। তার মনে হ'ল সেগুলা তার সৌভাগ্য, কর্ম্মের মাঝে আরামের স্নিগ্ধ-স্পর্শ। উমেশ তার একজন যথার্থ দরদী বন্ধু। ক্রমে এমন দাঁড়া'ল যে, সতীশের অন্তরের কথা উমেশের কাছে খুলে না ব'ল্‌লে—সে দিনটা তার বড় অশ্বস্তিতেই কেটে যেত। উমেশ বু'ঝ্‌ল—তার চেষ্টাটা একটু একটু করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। আলাপের তরল অবস্থাটা ক্রমেই জমাট বাঁধ্‌তে সুরু হয়েছে। দিন কয়েক পরে ইচ্ছা ক'র্‌লে, সে সেটাকে হাতের মুঠোর মাঝে চেপে রা'খ্‌তে পা'র্‌বে। তখন আর সেটার ঝরে পড়ে যা'বার কোন উপায়ই থাক্‌বে না। হলও তাই। একদিন সুযোগ বুঝে উমেশ তার দলবল সহ তাদের আড্ডায় বস্‌ল। সতীশও সেখানে ছিল। এলোমেলো ছন্দে কত কথা ভিন্ন ভিন্ন মুখে প্রকাশ পেয়ে আসরটাকে একেবারে সরগরম্ করে তু'ল্‌ল। কত রাজার মা হ'ল ডাকিনী—কত সম্রাট্ বুদ্ধিদোষে ভিখারী—কত সাধু চোর—আবার কত বাটপাড়্ পুণ্যের, দয়ার সাকার জীবন্ত মূর্ত্তি!

হলধর ব'ল্‌ল,—"ও সব তো দূরের কথা। এই আমাদের গাঁয়ের মাখন সদ্‌গোপের কথাই ধর। চাল্‌চলন দেখে—কথাবার্ত্তা শুনে, মনে হয় লোকটা সদাশিব।" হলধরের কথা শুনে সতীশ সাগ্রহে প্রশ্ন করে উ'ঠ্‌ল, "কেন, কি ক'র্‌লে মাখন?"

সূচনাটা কাতরতার রেশ্ দিয়ে ভিজিয়ে তু'ল্‌তে একটা জাঁকাল রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে হলধর আবার ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল,—"সেদিন ওর ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীটা এসে—দুটো ভাতের তরে ওর কাছে এমনই কান্নাকাটি আরম্ভ ক'র্‌লে যে, আমরা ক'জন আর দাঁড়িয়ে থা'ক্‌তে পা'র্‌লাম্ না। পরে হরি সদ্‌গোপের মুখে শু'ন্‌লাম—বেটা তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ধর্ম্মতঃ সেও তো একটা অংশী!"

বাধা দিয়ে উমেশ ব'ল্‌ল,—"সে কথা ছেড়ে দে' হলধর। ওত বিধবা! ভাই বেঁচে থা'ক্‌তেই ন্যায্য প্রাপ্য দিচ্ছে কি সবাই? ব'ল্‌লে সত্যি কথাটাই ব'ল্‌তে হয়। তবে শু'ন্‌তে যা' একটু খারাপ লাগে। এই—বড় মুখুয্যে কি সতীশের বাপ্‌কে ঠিক ভাগ দিয়েছে? কিহে সতীশ, তুমি কি বল?"

সতীশের কিন্তু কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে ধীরভাবে উত্তর দিল,—"না উমেশ, বাবাকে জেঠা খুব স্নেহ করেন। ব্যবসা বুদ্ধি তাঁর বেশী, তাই, আমাদের চেয়ে তাঁর অবস্থা এখন ভাল। ছোট ভাইকে ফাঁকি দেবার লোক জেঠা ন'ন।"

"সতীশ, এ'কথা যে তুমি ব'লবে—তাকি আর না জানি। ভাল লোকে কখন কি পরের দোষ দেয়! আমাদিগে না হয় এই বলে দাবিয়ে রাখলে। যারা পাকা মাথা তারাও অনেকে যে ঐ কথাই বলে।" নিজের বক্তব্য শেষ করে উমেশ চুপ করল্।

বিস্মিতভাবে সতীশ প্রশ্ন করে বসল,—"কে?" মনের মধ্যে একটা দম্কা বাতাস ছুটে গিয়ে ভিতরের জিনিষগুলো যেন ওল্‌ট্ পাল্‌ট্ করে দিতে চাইল।

উমেশ উত্তর দিল—, "এই ধর—, গোবিন্দ খুড়া—" কথাটা তার শেষ হ'ল না। এমনই সময় সেই ঘরটার দরজার ওধারে এসে দাঁড়িয়ে বাঁড়ুয্যে মোশায় বলে উঠলেন,—"কি বাবা উমেশ, আমার নাম কি হচ্ছিল বাবা! রাধেশ্যাম—হরি হে' তোমারই ইচ্ছা। সতীশ বাবাজীর যে বড় অবসর।" উমেশের ঠোঁট্ দু'টাতে একটি ক্রুর হাসির লুকান রেখা খেলে গেল। সতীশ নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত ক'রলে।

হলধর বলে উঠল,—"অনেক দিন বাঁচবে খুড়ো। এস—বস বস।"

বৃদ্ধ আসন গ্রহণ করিলে উমেশ ব'লল,—"বলছিলাম কি খুড়া যে, সতীশের জেঠা নিজে হাতে তুলে সতীশের বাপ্‌কে যা' দিল—ও ভাল মানুষ তাই নিল। বিষয় ভাগ ঠিক্ ঠিক্ হয় নাই। সতীশ অবিশ্বাস করায় ব'ল্‌লাম—যে এটা অনেকেই জানেন। আমাদের খুড়াও জানেন।"

বাঁড়ুয্যে মোশায় উমেশের কথা শুনে কতক্ষণ চুপ্ ক'রে কি যেন স্মরণ ক'রবার চেষ্টা করলেন। তারপর স্বরটা একটু টেনে ব'ল্‌লেন, "তা—ব'ল্‌তে—ও পুরোণ কথা আর কেন বাবাজী! গত কর্ম্মের অনুশোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রাধেশ্যাম—রাধেশ্যাম—হরি হে তোমারই ইচ্ছা। একবার হুঁকোটা আন হলধর। আমাদের বুড়োদের এখানে থা'ক্‌তে হলে আগে ওটা চাই বাপ্‌ধন!" পরে সতীশের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ল্‌লেন, "ওটা শুনে বড় দুঃখ হ'ল, নয় সতীশ? ভগবান মালিক। সবই তাঁর ইচ্ছা। দিলে হরি হরে কে; আর নিলে হরি রাখে কে! ও নিয়ে দুঃখ করো না বাবাজী! আর উমেশ, তোর কি খেয়ে দেয়ে কোন কাজ ছিল না, একথাটা নাই বা বলতিস্ সতীশকে? কত ওর দুঃখ হল। বড় হয়েছে, ও'ত নিজেও সেটা বুঝ্‌ছে। তবে কিনা, শু'ন্‌লে বড় দুঃখ হয়। নিজের লোক—রাধেশ্যাম—রাধেশ্যাম—এই তো সংসার—হলধর!"

বাঁড়ুয্যে মোশায়ের চোখের জলে দু'গণ্ড সিক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

মুখে একটা ভক্তির ভাব এনে উমেশ আর সবকে উদ্দেশ করে ব'লল,—"দেখ্‌ছ তোমরা, খুড়ার কত তরল প্রাণ!" হলধর উঠে বাইরের দিকে গেল। সতীশের একেবারে কেঁদে ফেল্‌লে। "হলধর যা, তামাক সেজে এনে খুড়াকে দে।" সমস্ত মনটা যেন হিন্দোল্-দোলায় দু'ল্‌তে লা'গ্‌ল।

(৩)

মনের আক্রোশটা আত্মপ্রকাশ ক'রবার একটা সুযোগ পেল। প্রত্যেক বৎসর উমেশের

ঘরে শ্যামা পূজার সময় গ্রামের ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়ান হয়। এবৎসর কিন্তু বড় মুখুয্যে নিশিকান্তকে বাদ্ দিয়ে নিমন্ত্রণ হল। এর কারণটা কি জানতে বড় মুখুয্যে তাঁর ছোট ভাই তারাকান্তকে বাড়ীর একটা ছেলে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। একটু পরেই ছেলেটা ফিরে এসে ব'ল্‌ল,—"ওর ব'ল্‌লেন—তাঁরা উমেশ কাকাদের দলে। আমাদের বাড়ী আসবেন না।"

নিশিকান্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"কে বললে খোকা,—তারা, না আর কেউ?"

"ছোট দাদা কথাই কইলেন না। বড় জেঠা বললেন।"

'সতীশ?'

'হাঁ।' খোকায় সঙ্গী হাবা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ব'ল্‌ল, "খোকা, উমেশ কাকাদের ওখানে কালী দেখতে যাবি?"

"হাঁ ভাই, চ। চাটুয্যেদের কালীর চেয়ে ওঁদের কালী কত বড়!" খোকা হাবার সঙ্গে চলে গেল। বৃদ্ধ নিশিকান্ত স্থিরভাবে বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে কালিদাস তাঁর কাছে আ'সতেই তিনি ব'ল্‌লেন,—"কালী, উমেশ আমাদিগে নেমন্তন্ন করে নাই!"

কালিদাস গম্ভীরভাবে ব'ল্‌ল,—"হাঁ, গ্রামের আর সব ভদ্রলোক এই অন্যায়ের জন্য তার বাড়ীতে খেতে যাবেন না। তাঁরা আমাদের দলে।"

নিশিকান্ত পুত্রের কথায় সন্তুষ্ট হতে পা'রলেন না। ব'ল্‌লেন—"এই ছোট গাঁ—বিনা কারণে দুটা দল হবে? তা ছাড়া তারার সঙ্গে আমার দল। তা ও কি হয়? আমি একবার উমেশের ওখানে যাই।"

তীব্রস্বরে কালিদাস ব'ল্‌ল,—"তা'হলে আমরা বাড়ী থেকে চলে যাব। ভবা ও ভবতোষ দেখ্'সে বাবা উমেশদের খোসামুদী ক'র্‌তে যাচ্ছে!"

ভবতোষ তখন দালান বাড়ীর দাওয়ায় বসে কি একটা কাজ কর্‌ছিল। সেখান থেকেই সে ব'ল্‌ল,—"বাবা ওদিকে গেলে আমরাও বাড়ীর বার হব দাদা।"

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন।

এরপর তিন তিনটী মাস দে'খ্‌তে দেখ্‌তে অতীতের মধ্যে মিশে গেল। ঈর্ষার আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে ক্রমেই প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠল। কালিদাস তার দলের লোকদের একদিন আড্ডা ভোজ দিল। সতীশ ভা'বল—এটা তাকে অপদস্থ করবার জন্যে ধনের প্রাচুর্য্য দেখান হল। পরদিন সে তার চেয়ে দ্বিগুণ আড়ম্বরে নিজের দলের লোকদের আড্ডাভোজে নিমন্ত্রণ কর্‌ল।

মুখুয্যেদের বসত বাড়ীর একপাশ চেপে দু ভাইয়ের পাশাপাশি দুটী বৈঠকখানা। কয়েকজন যুবক তখন কালিদাসদের বৈঠকখানায় তার সঙ্গে তাস খেলার আমোদ উপভোগ ক'র্‌ছিল আর মাঝে

মাঝে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিচ্ছিল, সতীশ নিজেদের বৈঠকখানার বাইরে এসে তাদিকে শোনাবার জন্য জোরে জোরে বল্‌ল—" গরীব হলেও আমাদের বুকের পাটা বড় কম নয় খুড়ো।"

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে হাস্‌তে হাস্‌তে ভিতর থেকেই উত্তর দিলেন, " তা আর ব'ল্‌তে বাবাজী! কি বল্ উমেশ? কথা কইবার অবসর নাই বুঝি? মাংসের গন্ধে একবারে যে মাতাল হয়ে গেছিস্ রে? রাধেশ্যাম—রাধেশ্যাম, সবই তাঁর ইচ্ছা বাবা। ধর্ম্মপথের জয় জয়কার হবেই হলধর। বিষ্ণুপুরের অম্বুরীটা একবার খাওয়াও বাবাজী।"

হাতের হুঁকাটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হলধর ব'ল্‌ল,—" এই যে তৈরী খুড়ো, হর্‌দম্ চালাও।" উমেশ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। "হলধরের কায়দা দেখ খুড়া। বলে—তৈরী—হর্‌দম্ চালাও। বলিহারী ভায়া! হা হা হা, হো হো হো।"

কালিদাস বৈঠক্‌খানা থেকে তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে জোরে হাঁক্‌ল—'সিঙ্গ্‌ল্-হ্যাণ্ড।'

(৪)

তারপর মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন বড় মুখুয্যের ছোট ছেলে ভবতোষের শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন নির্দ্দিষ্ট হল। স্থানীয় গ্রাম সকলের ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের সকাল বেলায় নিশিকান্ত কালিদাসকে ডেকে ব'ল্‌লেন,—" তোর কাকাকে একবার ডাকবিনে রে?" কালিদাস মুখটা ভার করে একদিকে গিয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ দুঃখিত মনে বাহিরের দিকে গেলেন।

সদর দরজার কাছে যেতেই তাঁর নজরে প'ড়্‌ল—তারাকান্ত সমুখের পথটা ধরে কোথায় চলেছেন। ডা'ক্‌লেন, " তারা—দাঁড়া, একটা কথা শোন।" তারাকান্তের গতি স্থির হল। নিশিকান্ত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে ধরে ব'ল্‌লেন, " আজ ভবর ছেলের ভুজান, খেতে যাবি না?"

তৎক্ষণাৎ তারাকান্ত বেশ স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিল,—" আমার দলের লোক্‌দের ছেড়ে কৈ আর যাচ্ছি।"

নিশিকান্ত আবার প্রশ্ন ক'রলেন, " তাহলে ওরাই তোর আমার চেয়ে বেশী হল? আমরা যে দু ভাঁই রে। চোখ্ দুটা তাঁর জলে ভরে উঠল। এবারও তারাকান্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর দিলেন,—" তা এখন বেশী বৈকি।"

নিশিকান্ত তাঁর হাতের বাঁধন মুক্ত করে নিলেন। তারাকান্ত পূর্ব্বে যে দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলে গেলেন। বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ মনে ঘরে ফির্‌লেন।

যথা সময়ে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন হল। গৃহকর্ত্তা স্বয়ং সমস্ত কাজ পরিদর্শন ক'র্‌লেন। অভ্যাগত একজন ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, " মুখুয্যে মোশায়, আপনার ছোট ভাইকে তো দেখ্‌ছিনা?"

বৃদ্ধ নিশিকান্তর বার্দ্ধক্য-জর্জ্জর বুক্‌টা একটা তীক্ষ্মমুখভল্লের খোঁচায় যেন আরও জর্জ্জর করে দিল। তিনি উত্তর দিলেন,—"সে আমার সঙ্গে দল করেছে। আজ সকালে আমি হাতে ধর্‌লাম—এল না। না আসুক, আমিও ওর কোন কাজে যাব না। ওরে কালিদাস, মেয়েদের ডা'ক্‌তে পাঠিয়ে দে।" চোখের জল সাম্‌লাতে তাড়াতাড়ি তিনি সেই দিকে তদ্বির ক'র্‌বার অছিলায় সেখান থেকে সরে প'ড়লেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে তাঁর বড় মেয়ে শিবানী এসে ব'লল, "সন্ধ্যে হয়—তুমি বুড়ো মানুষ দুটী মুখে দিবে চল।"

তিনি বল্‌লেন, "হাঁ যাই মা, তারাকে আগে দিয়ে আয় দেখি।"

শিবানী বিরক্ত হল। ব'ল্‌ল,—"তুমিই মর কাকার লেগে—সে তো ভুলেও তোমার দিকে চায় না।"

"না চাক্ মা। আমি বড়—ও ছোট। বুদ্ধি থা'ক্‌লে কি আমার সঙ্গে দল করে?"

শিবানী আর কিছু না বলে চলে গেল এবং একটু পরে ফিরে এসে ব'ল্‌ল,—"তরী তরকারী আর সব থালায় সাজিয়ে দিতে গেলাম কাকাকে, ফিরিয়ে দিলে।"

নিশিকান্ত যেন কাতর হয়ে প'ড়্‌লেন। কন্যাকে সম্বোধন করে ব'ল্‌লেন, "আমার বিছানাটা করে দাও গে তো মা।"

"খাবে না?"

"না, বড় মাথাটা ধরেছে। হয়ত জ্বর আসবে।" সরলা শিবানী বু'ঝ্‌তে পা'রলে না—এই অল্পকালের মধ্যেই হঠাৎ তার পিতা কি করে অসুস্থ হয়ে উ'ঠ্‌লেন। বলে বস্‌ল,—"এই এখুনি আমাকে ব'ল্‌লে—তারাকে আগে দিয়ে আয় তবেই আমি খাচ্ছি। আর এখুনিই মাথা ধ'রল—জ্বর এল?"

"বুড়ো মানুষের কখন কি হয় তার কি ঠিক আছে শিবানী? দেখছিস্ না চোখ্‌গুলা ছল্‌ছল্ ক'র্‌ছে?" সত্য সত্যই বৃদ্ধের চোখ দু'টী তখন ছল্‌ছল করছিল। শিবানী তা' দেখে আর দেরী ক'রল না পিতার জন্য শয্যা প্রস্তুত ক'র্‌তে চলে গেল।

তারপর আরও কিছুদিন গেল। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি একদিন সতীশের বড় ছেলের শুভ যজ্ঞোপবীত সম্পন্ন হল। সেদিন ছোট মুখুয্যের বাড়ীতে খুব ধূম্-ধাম্ আর খুব জাঁকাল রকমের একটা ভোজ হ'ল। বাড়ীর আর সকলের মুখেই আনন্দের ছোপ্ লেগে ছিল। কিন্তু—মালিকের মুখের ভাবে, বিরক্তিভরা একটা অবসাদ—চোখের দৃষ্টিতে, স্ফূর্ত্তিহীনতার একটা মলিনতা যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সমস্ত কাজ তিনি নিজে তদারক্ ক'রছিলেন বটে কিন্তু যেন প্রাণহীনভাবে—অনিচ্ছাসত্বে। ঠিক যেন বায়স্কোপের ছবি—,তারা হা'স্‌ছে কাঁদ্‌ছে কাজও ক'র্‌ছে। তবু, যেন তাতে প্রাণের অভাব। তারাতো স্বেচ্ছায় সে-সব ক'র্‌ছে না—অন্যের প্রেরণা তাদিকে করাচ্ছে।

তারাকান্তর মনের ভাব লক্ষ্য করে গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে একবার তাঁকে ব'লূলেন,—"মনমরা কেন তারাকান্ত—ফূর্ত্তি কর' ফূর্ত্তি কর—তোমার নাতির পৈতে!"

বাঁড়ুয্যে মোশায়ের কথায় একটু ম্লান হাসির রেখা তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা গেল মাত্র।

ব্রাহ্মণ ভোজন হয়ে গেল। তিনি নিজে রান্নাশালে যেয়ে একটা থালায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত উপকরণ সাজালেন। তারপর পাত্রটী হাতে নিয়ে বাইরে এলেন। সতীশ সে দিকে কি জন্য আস্ছিল। জিজ্ঞাসা ক'র্ল,—"বাবা, এ সব কাকে দিতে যাচ্ছ?"

তারাকান্ত ক্রুদ্ধভাবে হাতের থালাটা মাটীতে ফেলে দিয়ে রুক্ষস্বরে ব'লূলেন, "সে কৈফিয়ৎ তোমার কাছে যদি আমি না দি'। আমার ইচ্ছা!" সতীশ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। আরও কিছুদিন গেল। দলাদলিটা যেন আরও জাঁকাল হল। কথাবার্ত্তা বিশেষ না হলেও মুখ চাওয়া চাওয়িটাও এতদিন অন্ততঃ হচ্ছিল। এবার তাও বন্ধ হল।

সতীশের পুত্রের যজ্ঞোপবীতের দিন বিশেক পর, তারাকান্ত সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁর সদর দরজায় বসে একমনে ধূমপান ক'র্ছিলেন। বড় মুখুয্যের সদর দরজা দিয়ে কয়েক জন তাঁর প্রতিপক্ষের লোক বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন ব'ল্ল,—"আর বেশীক্ষণ টেকে না। এক ঘণ্টাই জোর!"

আর একজনে ব'ল্ল,—"ঐ রকমই তো মনে হল।" তারাকান্ত হাতের হুঁকাটা একপাশে ঠেসিয়ে রেখে তাদের দিকে তাকালেন। ঠিক এই সময় একটা লোক তাঁর আপাদ্‌-মস্তকটা একবার কি জানি কেন দেখে নিল। পরে সকলে মিলে চলে গেল। ছোট মুখুয্যের ইচ্ছা হ'ল তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, কার অসুখ। কিন্তু, পা'র্লেন না। লোকগুলা ক্রমে অদৃশ্য হয়ে প'ড়্ল। তিনি হুঁকাটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে উঠে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। যে ছেলেটার সে দিন যজ্ঞোপবীত হল সে তখন উঠানে দাঁড়িয়ে তার পৈতার গোছাটী দে'খ্‌ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন,—"ও বাড়ীতে কার অসুখ রে?"

ছেলেটা অবাক্ হয়ে উত্তর দিল, "জান না বুঝি, বড়দাদার!"

"দাদার!" কথাটা যেন তাঁর বিশ্বাস হল না।

"হাঁ, আজ তিনদিন আগুড়ার ডাক্তার আস্‌ছে যে!"

তারাকান্ত আর কিছু না বলে উঠে গিয়ে বড় মুখুয্যেদের বাড়ীর দিকে যাবার যে দরজাটা এতদিন তিনি বন্ধ করে রেখেছিলেন—সেটা খুলে ফে'ল্‌লেন। দে'খ্‌লেন, তাঁদের দালান বাড়ীর দাওয়ায় স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি লোক জমে কি কথাবার্ত্তা বলছে। তাড়াতাড়ি তিনি দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে নিজের বড় ঘরের চালাটার মেজেতে বস্‌লেন। দৃষ্টিটা থা'ক্‌ল—শূন্যের দিকে। সন্ধ্যার ফিকা অন্ধকারটা এর মধ্যেই তাঁর চোখে ঘোরাল দেখাল। আকাশের তারাগুলা যেন বড় বিশৃঙ্খল মনে হল। এ যেন সাজাবার দোষ। দৃষ্টিটা সেদিক থেকে ফিরিয়ে সম্মুখে

নিক্ষেপ ক'র্তেই চোখে প'ড়্ল—উঠানের একপাশের আমগাছটা অন্ধকারে পাগলের মত মাথা নাড়্ছে। বৈঠক্খানা হতে বাঁয়া তব্লা ও হার্মোনিয়মের সুরগুলা একসঙ্গে মিশে—ঠিক যেন অনুতপ্তের কান্নার মত বাতাসে ভেসে এসে তাঁর কাণের পর্দ্দায় আঘাত ক'র্তে লাগল। তিনি আর স্থির থাক্তে পা'র্লেন না। উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ব'ল্লেন—"যা ওদিগে বারণ করে দেগা আমার বৈঠকখানায় মাতুনি কর্তে।"

ছেলেটা চলে গেল। তিনি সেই দরজাটা আবার খুলে বড়বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন। পিছন্ থেকে সতীশ এসে ডাক্ল,—"কোথায় যাচ্ছ বাবা ?"

পুত্রের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে তারাকান্ত আবার সেদিকে চ'ল্তে লাগলেন। সতীশ সেখানের চৌকাঠটা ধরে দাঁড়িয়ে থাক্ল। দালানের দাওয়ায় পৌঁছে জানালার ফাঁক্ দিয়ে তিনি দেখ্লেন—উত্তর দিকের কুঠ্রীটার মেজেতে কে শুয়ে আছে। একপাশে কেরোসিনের লণ্ঠনটা জ্বল্‌ছে। তারই কাছে বড় মুখুয্যের দু' ছেলে ও মেয়েরা বসে আছে। সেখান থেকে যেয়ে তিনি দালানের সেই ধারের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। একটা পা ভিতরের দিকে বাড়ালেন। আবার কি ভেবে নিজের বাড়ীর দিকে ফিরে চ'ল্তে লাগলেন। কতকদূর যেয়ে দাঁড়ালেন। কি ভাব্লেন। আবার দালানের দিকে ফির্লেন। এবার ভিতরে প্রবেশ করে শায়িতের শয্যার একপাশে অধোবদনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কি ব'ল্তে গেলেন। প্রথমটা কথা বের হল না। ঠোঁট দুটী ঈষৎ কাঁপ্ল। খানিকক্ষণ চুপ্ করে থেকে জড়িতস্বরে ডাক্লেন,—দা-দা !

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আশঙ্কায় তাঁর বুক্টা কেঁপে উঠ্ল। চোখের কোণ হতে বর্ষার ধারা নেমে এল। কতকটা সাম্লে নিয়ে আবার ডাক্লেন,—"দাদা—আমি তারাকান্ত, তোমার অসুখ,—আমাকে যে বলে পাঠাও নাই ?"

রুগ্নের ক্ষীণ মুদিত চক্ষুর পাতা দুটী বারেকের জন্য খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার মুদিত হল। একরাশ্ অশ্রু বাধা ঠেলে বাইরে এসে প'ড়্ল। তারাকান্ত তাঁর বুকের কাছে মাথাটা নিয়ে গেলে তিনি তাঁর শীর্ণ হস্তের স্নেহবন্ধন কনিষ্ঠের গলায় দিয়ে অস্পষ্ট কম্পিতস্বরে উচ্চারণ কর্লেন, "ভা-ই।"

মিলনের আনন্দ যেন তাঁকে সেই মুহূর্ত্তে সমাধিস্থ করে দিল। ক্ষুদ্র ভাই শব্দটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কি যেন উজ্জ্বল-প্রসন্নতা—কি যেন শান্তির অমিয়-জ্যোতিঃ তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠে তাঁকে চিরতন্ময় করে তুল্ল। মেয়ে-ছেলেরা কেঁদে উঠ্ল,—"বাবা গো।"

সজল নয়নে বাইরে এসে তারাকান্ত ডাক্লেন, "সতীশ, আয়, আমাদের দলাদলি মিটে গেছে—দাদা গলাগলি করে দিয়েছেন।"

ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় জান্বার জন্য গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে সতীশের আস্বার একটু পরেই তার

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পিতার ডাক্ শুনে সে যখন বড় বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল তখন ব'ল্লেন, "একি কর্‌ছ সতীশ!"

সতীশ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিটা একবার তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেল। বাঁড়ুয্যে মোশায়ের মুখটায় যেন কে কালি মাখিয়ে দিল।

দূরে থেকে উমেশের আওয়াজ শোনা গেল,—"খুড়া!"

"ফেঁসে গেল উমেশ!" জোরে এই কথা কয়টা উচ্চারণ করেই নেতা ঠাকুর চেলার কাছে মনের দুঃখটা জানাতে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

শ্রীকৃত্তিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎপত্তির ইতিহাস*

(১) জড়ের কথা

বিশ্বের আদি কি, বীজ কি, উহার মূল কোথায়? এক 'সময়ে' কিছুই ছিল না, আর 'পরে' বিশ্বের উপাদান জন্মিল, ইহা মানুষের চিন্তার অতীত,—কল্পনায় ধারণা করা অসম্ভব। 'সময়' বলিতে গেলে বুঝি আজ কাল দিয়া গাঁথা 'আগের' ও 'পরের' একটা অশেষ ধারা; এই সময়ের ভাবনা এড়াইয়া এমন একটা আদি কালের কথা ভাবিতেই পারিনা, যখন 'সময়' ছিলনা,—'আগে-পরে' দিয়া গাঁথা অবস্থাটি ছিলনা।

অন্যদিকে আবার 'আগে ও পরে' ভাবিতে গেলেই একটা 'স্থানের' ভাবনা জাগে; অর্থাৎ একটা অবস্থা আগে ও একটা অবস্থা পরে বলিলেই তাহার অর্থ হয় যে, সেই অবস্থা একটা 'স্থান' জুড়িয়া 'আছে'। মনে পড়ে 'আছে',—'নাই' অবস্থাটি মানুষের ভাবনায় জাগে না। 'না ছিল এসব কিছু' মানুষের মনের কথা নয়,—একটা মিথ্যা কথার ফাঁকা আওয়াজ। যিনি কবিতায় লিখিয়াছেন 'না ছিল এ সব কিছু', তাঁহাকেই উহার সঙ্গে জুড়িয়া লিখিতে হইয়াছে—"'আঁধার' ছিল অতি ঘোর 'দিগন্ত' প্রসারি"; অর্থাৎ কিছু ছিল বলিতে হইয়াছে, ও যাহা ছিল, তাহা একটা স্থানে ছিল বলিতে হইয়াছে। বিশ্বের উপাদান ছিলনা ও পরে হইল, সময় ছিল না ও পরে হইল, মহাশূন্যও ছিলনা ও পরে হইল, এরূপ ভাবনা করিবার চেষ্টা অতি অসম্ভব চেষ্টা। শ্রেষ্ঠতম মানুষের ভাবনায় যাহা অসম্ভব, তাহা ছাড়িয়া সম্ভবকে লইয়াই উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজিতে হইবে।

যে 'মহাশূন্য' এড়াইয়া কিছু ভাবিতে পারিনা, যে 'মহাকাল' ভুলিয়া আমাদের

* এই প্রবন্ধ রচনায় ডাক্তার বিজলীবিহারী সরকার আমাকে প্রভূত সাহায্য করিতেছেন—লেখক।

চিন্তা নাই তাহা ধরিয়াই বিশ্বের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজিতে হইবে। আমাদের জ্ঞানের মূলে ও জ্ঞানকে জড়াইয়া আছে এই যে মহাশূন্য, উহাতে সূক্ষ্মদর্শীরা অশেষ তরঙ্গলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই তরঙ্গিত মহাশূন্যকে আকাশ বলিব না; যাহা ফুটিয়াছে অর্থাৎ মোটা দৃষ্টিতে প্রকাশ (প্র+কাশ) পাইয়াছে, তাই লোক-সাধারণের ভাষায় আ+কাশ—ইংরেজি Sky. জ্ঞানের সুবিধার জন্য ইউরোপীয় সূক্ষ্মদর্শীরা উহার নাম দিয়াছেন ইথর (ether); একটা কিছু নাম দিয়াই যখন বস্তু নির্দ্দেশের সুবিধা করিতে হইবে, তখন এই সহজে উচ্চার্য্য 'ইথর' শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

এই তরল হইতেও তরল ইথরে কাঁপুনি উঠিয়া ঢেউ খেলিল কেমন করিয়া? এই কাঁপুনি বা গতি, ঐ ইথরের স্থিতিগত প্রকৃতি বা ধর্ম্ম; পদার্থ বলিতেই বুঝিতে হইবে তাহার একটা ধর্ম্ম যাহা দিয়াই সেই পদার্থটি বুঝি; উহা পদার্থ হইতে আলাদা বস্তু নয়। মানুষের রূপ যেমন মানুষ হইতে অভেদে ভাবিতেই হইবে, তেমনই ঐ গতিকে ইথরের সঙ্গে অভেদে উহার প্রকৃতি বা ক্রিয়া স্বরূপে ভাবিতেই হইবে। ইথরের প্রকৃতিতে বা ধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছে এই যে, উহার এক অংশে চলিয়াছে এক রকমের গতির খেলা, ও অন্য অংশে চলিয়াছে অন্য রকমের গতির খেলা। একটা গোল বলের মধ্যে একটি কাঠি চালাইয়া উহাকে ঘুরাইলে যে রকমের বর্ত্তুল-গতি হয়, তাহাই এক অংশের গতির ধারা; ইংরাজীতে বলে rotational গতি,—আমরা বলিব বর্ত্তুল-গতি।* একটু লম্বা ছাচের বর্ত্তুলের দুই প্রান্ত চাপা পড়িলে তরল বর্ত্তুল যেমন ভাবে ঘুরিতে পারে, সেই ভাবে ইথরের অন্য অংশে ঢেউয়ের আবর্ত্তন চলিয়াছে; এই ধরণের গতির ইংরেজী বিশেষণ irrotational—আর আমরা বলিব পরাবর্ত্ত গতি। নিজে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া না নিলে এই গতির ভেদ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল ধারণা হইবে না। এই গতি-বিভঙ্গে জন্মিতেছে ঢেউএর ফোট্‌কা, আর সেই ফোট্‌কাগুলি হইয়া ওঠে বিদ্যুৎগর্ভ। কোথা হইতে আসিল সেই বিদ্যুৎ? যাহাকে বিদ্যুৎ বলি, তাহা ঐ গতিরই একটা রূপান্তরিত অবস্থা। পদার্থের ধর্ম্মে যাহা আছে, তাহাই আলাদা আলাদা অবস্থায় নানারূপে ফুটিয়া ওঠে। বিদ্যুৎগর্ভ ফোট্‌কাগুলির ইংরেজি নাম Electron; দু-এক জন পূর্ব্ববর্ত্তী লেখককে অনুসরণ করিয়া উহার সংস্কৃত নাম দিলাম—বিদ্যুৎ-কোরক ও বাঙ্গলা নাম দিলাম বিদ্যুৎ-কুঁড়ি। এই বিদ্যুৎ-কুঁড়ি যোগে যাহা জন্মে, তাহার নাম অণু বা পরমাণু; আর সেই পরমাণুকে বলি সারা বিশ্বের উপাদান। কি পদ্ধতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে জোড়া বাঁধে তাহা বলিবার আগে বলিয়া রাখি যে, আমাদের দেশে জোড়া-লাগা পরমাণু সংহতির মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা ধরিয়া ঐ সংহতির ভিন্ন ভিন্ন নাম পাই; যথা দুটি পরমাণুর সংহতির নাম দ্ব্যণুক। সংখ্যা হিসাবে এইরূপ অনেক নাম থাকিলেও অতি ক্ষুদ্র পরমাণুসংহতি মাত্রের নাম দিতেছি দ্ব্যণুক, অর্থাৎ ইংরেজি Molecule.

এই পরমাণু ও দ্ব্যণুক কত ক্ষুদ্র তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। হাইড্রজেন নামক

বা ষ্পীয় পদার্থের ছত্রিশ হাজার দ্ব্যণুক, যতটুকু স্থানে থাকিতে পারে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের ঘন পরিমাণ—এক ইঞ্চের '০৩৯৩৭ অংশ মাত্র। এই যে আছে কল্পনার অতীত সংখ্যা পরমাণু উহার মধ্যে 'জাতিভেদ' আছে; অর্থাৎ এক পরমাণু এক রকম বাষ্পীয় পদার্থের (gas) মূল, আবার অন্য পরমাণু অন্যের মূল। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরমাণুদের মধ্যে এক হিসাবে ক্ষমতার প্রভেদ আছে; কোন এক জাতির পরমাণু অন্য যে কয়েকটি পরমাণুকে আপনার গায়ে জোড়া লাগাইতে পারে, তাহার হিসাব আছে, যথা:—হাইড্রজেন বাষ্পের একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর একটার সঙ্গে মিলিতে পারে, অক্‌সিজেনের পরমাণু পারে অন্য দুইটিকে মিলাইতে, কার্‌বনের পরমাণু পারে অন্য চারিটিকে মিলাইতে আর নাইট্রজেনের পরমাণু অন্য তিনটি অথবা পাঁচটিকে মিলাইতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যাহা ঘটে, তাহা হইল পরমাণুর একটা প্রাকৃতিক লক্ষণ।

পরমাণুদের আর জন্মগত ধর্ম্মের বা প্রকৃতির কথা বলিতেছি। প্রত্যেক পরমাণুতে যে গতি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ নড়া-চড়ার ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহার একটা বিশিষ্টতা এই যে, প্রত্যেক পরমাণু একদিকে বোঁ করিয়া ছুটিয়া দুরান্তে পলাইতে চায়, আবার অন্যদিকে অন্য পরমাণুকে টানিতে চায় ও অন্য পরমাণুর দিকে আকৃষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে যেমন দেখি, একদিকে আছে তাহার বৈরাগ্য বুদ্ধি ও অন্য দিকে আছে প্রেমে সংসার গড়িবার বুদ্ধি—ঠিক যেন সেই রকমের দুইটি "টান" প্রতিপরমাণুতে একসঙ্গে মিলিয়া আছে, ও দুইটি "টান"ই যুগপৎ একসঙ্গে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

যে সকল পরমাণুতে সকল পদার্থ গড়া, ও আমরা গড়া তাহার আর একটি প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি। কোন একটা পদার্থ গড়িবার উদ্যোগে (বুদ্ধি করিয়া নয়) যখন পরমাণুতে পরমাণুতে অচ্ছেদ্য পাকা যোগ ঘটে (অর্থাৎ রাসায়নিক যোগ ঘটে), তখন ভিন্ন রকমের বৈদ্যুতিক অবস্থার পরমাণুরা অথবা বিদ্যুৎ-কুঁড়িরা পরস্পরকে অতি প্রবলবেগে (তড়িৎ প্রবাহে কাঁপিতে কাঁপিতে) অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনপাশে বাঁধে। কোন বিবাহে,—কোন স্ত্রী পুরুষের প্রেমের মিলনে বা গভীর অনুরাগের আলিঙ্গনে অত বেগ নাই, অথবা উত্তেজিত ভাবের অত কাঁপুনি নাই।

এইমাত্র বলিলাম একটা "পাকা যোগের" কথা,—যে রকম যোগের ফলে পরমাণুরা আপনাদের নিজের মত আলাদা আলাদা না থাকিয়া একটা বিশিষ্ট রকম নূতনত্বের জন্ম দেয়। উহার স্বরূপ বলিতেছি। জলে লবণ দিলে যে লোণা জল হয়, তাহাতে নূতন একটা পদার্থ জন্মে না; জল শুকাইলে বা উড়িয়া গেলেই লবণ আলাদা হইয়া পড়িবে। এটা হইল কাঁচা যোগ; এ রকম যোগে একটার সঙ্গে আর একটা গুলাইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। আর পাকা যোগে যে রাসায়নিক পরমাণু গড়ে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের পরমাণুকে আর মিলনের পরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; 'ক' ও 'হ' এমন ভাবে মিলিয়া যায়, যাহাতে জন্মে একটা 'খ'; সেই 'খ' হইল এমন ভাবে আলাদা ও নূতন, যাহাতে 'ক'কে বা 'হ'কে আলাদা করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্ব্যণুবদের মিলনের বিভিন্ন ধরণের ও ভঙ্গির ফলে যে বিভিন্ন রকমের পদার্থ গড়িয়া উঠে, সেটাতে পরমাণুদের আর এক রকমের প্রকৃতি জানা যায়। মনে কর, পরমাণুরা এই ধরণে ও ভঙ্গিতে মিলিল, যেমন চা'ল দিয়া চূড়া করিয়া নৈবেদ্য সাজায় অথবা অন্য ধরণে কোন পদার্থকেই গোল করিয়া কিম্বা চৌকা করিয়া সাজায়; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরণে ও ভঙ্গিতে সাজিয়া মিলিবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পদার্থ জন্মে। কয়লাতে যে জাতির পরমাণু পাই, হীরকেও সেই জাতির পরমাণু পাই; পরমাণুরা ভিন্ন ভিন্ন ধরণে ও ভঙ্গিতে মিলিবার ফলেই এক মিলনেব ফল হইয়াছে,—কয়লা, অন্য মিলনের ফল হইয়াছে—হীরক।

বুঝাইয়া বলিবার কথাটা হইল এই যে, যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে, গড়িয়াছে ও গড়িতেছে, তাহা পরমাণুদের মজ্জাগত ধর্ম্মে,—পরমাণু হইতে অচ্ছেদ্য, পরমাণুর প্রকৃতিতে। গতি বল, আকর্ষণ বল, শক্তি বল, মিলনের ধরণ বল বা ভঙ্গি বল, বিদ্যুৎ বল, আলোক বল, উত্তাপ বল, সে সকলই পরমাণুদের প্রকৃতিগত ধর্ম্মের ফল; এক ধর্ম্ম এক অবস্থায় ফুটিয়া ওঠে, আর অন্য ধর্ম্ম অন্য অবস্থায় ফুটিয়া ওঠে, এইমাত্র। যে মহাশূন্যের ওপারের ভাবনা মানুষের চিন্তায় অসম্ভব, সেই মহাশূন্যকে পাই ইথর-সাগর রূপে। এই ইথর সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববীজ। ইথরে ঢেউ খেলিয়া যায়, আর সেই ঢেউ-এ ফোটে বিদ্যুৎ-কুঁড়ি; বিদ্যুৎ-কুঁড়ির যোগে হয় পরমাণু, আর পরমাণুর নানা রকমের যোগে জন্মে সকল রকমের পদার্থের সমষ্টি এই সারা বিশ্ব।

এ দেশের একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা আদি মহাশূন্যকে পূজা করে; মহাশূন্যের পরমাণুদের দলে স্বতন্ত্র ভাবে বোধিসত্ত্ব নামক অণু বা দ্ব্যণুক না মিলিলেও উক্ত সম্প্রদায়টিকে ইথরের উপাসক বলিতে পারি। অন্যদিকে আবার যদি বলি যে, ইথর-রূপ মহাশূন্যের বা ব্যোমের তরঙ্গে জাত পরমাণুরা তাহাই গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা মানুষের মঙ্গলে লাগে,—অর্থাৎ যাহা মানুষের শিব, তাহা হইলে আর একটা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারি। মানুষের শিব, ইথর বা মহাশূন্য বা ব্যোম হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া, ঐ শিব গালবাদ্যে 'ব্যোম-ব্যোম' শব্দ করিতেছেন। ব্যোমে মানুষের চেতনার বীজ থাকিলেও ঐ চেতনা ইথরের তরঙ্গে ফোটে নাই বলিয়া কি উহার অচেতন অবস্থা বুঝাইবার জন্য উচ্চারিত হয়—'ব্যোম ভোলা'? চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, তাহা আদিতে না ফুটিলেও ইথরের লীলাকে 'ভোলা' লীলা বলা চলে না,—ঐ লীলা একটি সম্বন্ধ পদ্ধতিতে চলিতেছে, ভুল করিয়া উল্টা-পাল্টা রকমে নয়।

(২) জীবনের কথা

মানুষের কাছে সকল তত্ত্বের বড় তত্ত্ব তাহার জীবনের রহস্য। এই যে বিশ্বের জড়পিণ্ড, এই যে পাথর, এই যে মাটি, এই যে জল, উহা যত সুসম্বদ্ধ হইলেও জড় মাত্র; আর জড়ে ও জীবে কত প্রভেদ! এই যে মানুষ চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ, আত্মপরের জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত, মননে নিরত, আকাঙ্ক্ষায় ও আশায় উৎসাহিত, কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব, প্রীতিতে প্রফুল্ল, নির্ব্বাণের ভয়ে ভীত, সে কি জড়পিণ্ড

বৈ আর কিছু নয় ? শরীর পুড়িয়া যখন ছাই হয়, তখন তাহাতে তাহাই পাই যাহা অচেতন জড়পিণ্ডের উপাদান ; কিন্তু সেই জড়ের উপাদান কি করিয়া জীবনে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, আর জীবনে উদ্‌বুদ্ধ চেতনা শরীরের ক্ষয়ে কি পরিণাম পায়, তাহাই হইয়াছে মানুষের চিন্তনীয় সমস্যা।

সমস্যাপূরণের পথে প্রথম প্রশ্ন এই,—জীবনের রহস্য কি জড়ের রহস্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বা গভীরতর ? জড়ের সমস্যা পূরণে এই টুকুই বিশেষভাবে আমাদের অবোধ্য ও অসাধ্য যে, মহাশূন্য বা ইথর কিরূপে কোথা হইতে জন্মিল ; সেই জন্মের রহস্যকে বা আদির রহস্যকে যদি স্বতন্ত্র হেঁয়ালিরূপে রাখি, তবুও জড়ের রহস্য অপেক্ষা জীবনের রহস্য গুরুতর হয় কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা ইথরের ধাতুগত,—যাহা তাহার প্রকৃতি, তাহারাই প্রকাশে এই বিশ্ব গড়িয়াছে বুঝিতে পারি ; সে স্থলে ইথরের জন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যাহা, ইথর যে বিশ্ব-বীজ হইল কেন, সে জিজ্ঞাসাও তাহাই। যাহা হইয়াছে, তাহা একটা ধাতুগত প্রকৃতি লইয়াই হইয়াছে। এই প্রকৃতির সঙ্গে আর একটা স্বতন্ত্র "পুরুষ" জুড়িয়া জীবনের রহস্য উন্মুক্ত করিবার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহাই (ইথরাতীত আদির কথা ছাড়িয়া) বিচার করিতে হইবে।

ইথরে ঢেউ খেলায়, সে ঢেউএ আলোক ফোটে অথবা বিদ্যুৎগর্ভ স্ফেটক বা বিদ্যুৎ কুঁড়ি জন্মে, বিদ্যুৎ-কুঁড়ির যোগে পরমাণু হয়, আর পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যোগে ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু জড় পদার্থ দেখি, সে সকলেরই উৎপত্তি হয়। ইথরে এমন গুণ কোথা হইতে আসিল, যে উহা হইতে এতখানি বিকাশ সম্ভব হইল, এরূপ প্রশ্নের এই একই অর্থ যে, ইথর হইল কোথা হইতে। ঐ যে ঢেউ, আলোক, বিদ্যুৎ ও পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা গেল, উহাতে সূচিত হইতেছে একটা গতি, শক্তি,—কর্ম্মক্ষমতা। ঐ গতিটিকে, শক্তিকে, কর্ম্মক্ষমতাকে ইথর হইতে অথবা পরমাণু হইতে অথবা একটা সুসম্বদ্ধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরিতে পার না ; ওগুলির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই,—উহারা ইথর বা পরমাণুদের লীলায় পরিস্ফুট নানা অবস্থার নাম। নাম ও রূপ যেমন কোন পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নয়, গতি প্রভৃতিও তেমনি পদার্থ হইতে অভিন্ন ; একটা শক্তি স্বতন্ত্র ভাবে নিজের অস্তিত্ব লইয়া আছে, এই রূপ ভুল ধারণা অনেকের আছে বলিয়া এতখানি লিখিতে হইল। যে পদার্থকে কেবল যে ধর্ম্মের ফলে চিনিতে পারি, তাহার সেই ধাতুগত লক্ষণ যখন তাহার ক্রিয়ায় ফোটে, তখন সেই ক্রিয়াকে বা ক্রিয়ার লক্ষণকে আলাদা একটা পদার্থ বলিতে পার না ; সুবিধার জন্য আলাদা অবস্থার আলাদা নাম দিতে হয়,—এই মাত্র। এ কথা মনে রাখিলে জীবের শরীরে প্রকাশিত গুণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন রকমের হেঁয়ালির বা রহস্যের আবর্ত্তে পড়িব না। কথাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের এই পৃথিবী যখন অসাধারণ উত্তাপে-কাঁপা বাষ্প-গোলক ছিল, তখন পাথর, জল প্রভৃতি কিছুই পাথররূপে বা জলরূপে ছিল না। উহার তাপ খানিকটা উপিয়া যাইবার পর

পৃথিবীর কাঠামো রূপে উহার বাহিরের আবরণ বা খোসাখানি কঠিন হইল ; পরে আবার বহু যুগযুগান্তের পর, অধিকতর শৈত্য আসিবার পর যখন জলের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল, তখন তপ্ত বৃষ্টির ধারায় পৃথিবীর কঠিন আবরণের উপরকার বড় বড় খাতে বা গর্ত্তে জল জমিয়া সমুদ্র হইল। পৃথিবীর কঠিন খোলসখানির বা স্থলের জন্ম যে জলের জন্মের অনেক আগে, আমরা পৌরাণিক সৃষ্টির বিবরণের সংস্কারে তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। এই যে পাথর ও নানা ধাতু জন্মিল ও তাহার পর জল জন্মিল, উহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য পৃথিবীর স্রষ্টাকে উদ্যোগ করিতে হয় নাই ; যত তপ্ত হইলেও পৃথিবীর পিণ্ডে যাহার বীজ ছিল, তাহাই তাপ-ক্ষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুকূল অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাথর, মাটি, জল প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, জীব সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইবে না কেন ? পৃথিবী তাহার শরীরের অংশগুলির পরে পরে বিকাশের ইতিহাস স্তরে-স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। গোড়ায় যে স্তর পড়িয়াছিল ও তাহার উপর আবার যে স্তর পড়িয়াছিল, তাহা আলাদা আলাদা করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। গোড়ার স্তরে আমরা কোন জীবের কঙ্কাল পাই না; জীবের উদ্ভব হইয়াছিল জলের জন্মের পরে একটি নূতন অনুকূল অবস্থার আবির্ভাবের সময়ে। সকল শ্রেণীর জীবের (উদ্ভিদেরও বটে) জীবনের মূল যে "জৈবনিক" পদার্থ, উহা যে ধাতু পাথর, জল প্রভৃতির মত পৃথিবীর আত্মশরীর হইতে অনুকূল অবস্থায় ফুটিয়া বাহির হয় নাই, একথা যে বলিবে তাহাকেই জৈবনিকের অপার্থিব সৃষ্টির প্রমাণ দিতে হইবে। অনুকূল অবস্থায় পরে পরে সকল পদার্থ জন্মিতে পারিল, আর জৈবনিকের বেলায় কেন যে বলিতে হইবে সে অন্য মুল্লুক হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। যাহা এক সময়ে জন্মিয়াছে এই পৃথিবীতে, ও রহিয়াছে এই পৃথিবীতে, তাহা যে এই পৃথিবীর নয়, একথা যিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন, তিনি আশ্চর্য্য রকমের জীব।

এক সময়ের বিকাশের অনুকূল অবস্থায় (যে অবস্থা এখন আর আমরা পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে পারি না) পৃথিবীর স্থল ভাগ সাগরকে ঠিক কি কি পদার্থ উপহার দিয়াছিল, সাগরের গর্ভে যাহার রাসায়নিক যোগে খানিকটা আঠার মত জৈবনিক রচিত হইল, তাহা এখনও জৈবনিকের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে নাই। জীবন্ত জৈবনিকের রাসায়নিক উপাদান ঠিক্ ঠাক্ কি রকমের, তাহা এখনও ধরা পড়ে নাই বটে, তবে জৈবনিকের মরণের পরের বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে, উহাতে অর্দ্ধ তরল অবস্থায় সেই (albuminous) পদার্থ আছে, যাহা আমরা একটি ডিমের ভিতরকার সাদা ভাগে পাই। যে দিন পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ হইতে পারিবে, সে দিন জানা যাইবে যে, কি কি জড় পদার্থের রাসায়নিক যোগে জৈবনিকের উৎপত্তি। এখনও জৈবনিকের ধাতু নির্ণীত হইতে পারে নাই বলিয়া উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে অসম্ভব অপার্থিব কল্পনা চালান যায় না ; যদি এখনও জানা না যাইত যে, কি কি বাষ্পীয় পদার্থের যোগে জলের উৎপত্তি হয়, তবে জলকে পৃথিবীর উপাদানের বাহিরের পদার্থে প্রস্তুত, বলা অসঙ্গত হইত না।

যে রসায়নিক সামগ্রী (colloidal substance) জৈবনিকের ধাতু বা ভিত্তি তাহার যে যে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা এই:—জৈবনিক, তাহার নিজের প্রকৃতির ফলে নিজে নিজে বাড়িয়া উঠিতে পারে, নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, ও নিজের শরীর হইতে অন্য জৈবনিক উৎপাদন করিতে পারে। জৈবনিকে এই যে বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, উহা জড় পদার্থে লক্ষ্য করা যায় না। মাটির ডেলাকে বাড়াইতে হইলে আর খানিক মাটি আনিয়া ডেলাটির উপরে বোঝাই করিতে হয়,—মাটির ডেলাটি নিজে তাহার ভিতরে কোন রস শুষিয়া তাহাকে মাটিতে পরিণত করিয়া মাটির অঙ্গ বাড়াইতে পারেনা; ডেলাটি ভাঙ্গিতে গেলে উহা কুঁচ্‌কাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না; আর মাটির ডেলা নিজের শরীর হইতে ডেলা শিশুর জন্ম দেয় না।

সকল রকমের গাছ পালা ও জীব জন্তু যে এই জৈবনিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিকাশের ফল, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ বা মতভেদ নাই; কারণ নানা দিক্ দিয়া নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জীবনের এই ক্রম বিকাশ নির্ণীত হইয়াছে ও হইতেছে। সন্দেহ আছে ও জ্ঞানের অভাব আছে জৈবনিকের উৎপত্তি অথবা উহার রাসায়নিক প্রকৃতির যথার্থ তথ্য সম্বন্ধে। সৃষ্টির যে বিধানে বা যে আইনে বা যে নিয়মে জড় জগৎ শাসিত, তাহাতেই সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ শাসিত।

পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছি যে, এরূপ প্রশ্ন অতি নিরর্থক, যে কোথা হইতে জড়ের প্রকৃতিতে এমন কিছু আসিল, যাহার ফলে নানা গতি নানা ক্রিয়া ও নানা ফল ফলিয়া বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, কারণ, জড়ের উপদানের জন্মের হেতু জিজ্ঞাসা করাও যাহা, ঐ অবস্থাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করাও তাহাই। কি নিয়মে, কি পদ্ধতিতে, কিরূপ সংযোগের ফলে বিশ্ব গড়িয়া ওঠে, তাহাই বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধেয়।

জীবনের বেলায়ও সেই একই কথা। কি পদ্ধতিতে ও নিয়মে জৈবনিকের ক্রিয়ায় প্রথমে এক রকমের জীব বা উদ্ভিদ হইল, ও পরে তাহা হইতে ক্রমবিকাশে উচ্চতর জীব ও উদ্ভিদ জন্মিল, তাহাই বিজ্ঞানে নির্দ্ধারিত হয়। যেখানে স্নায়ুচক্রের বিকাশ হয় নাই, বা মস্তিষ্কের বিকাশ হয় নাই, অথবা শরীর একটি বিশিষ্ট রকমের কাঠামে গড়িয়া ওঠে নাই, সেখানে জৈবনিকের যে ক্রিয়া পাওয়া যায় না ও যে লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে না, তাহা যদি বিশিষ্ট কাঠামের শরীরে স্নায়ুচক্র প্রভৃতির বিকাশে প্রকাশ পায়, তবে নিতান্ত অদ্ভুত রকমে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। উচ্চ জীবে যে "আমি" বলিয়া একটা জ্ঞান ফোটে; বেদনা ও চেতনা জন্মে, প্রেমের উচ্ছ্বাস বহে, ও জ্ঞানের কৌতূহল জাগে, সে সকলই জৈবনিকের ক্রমবিকাশে বিশিষ্টরূপ শরীর পরিগ্রহের ফলে।

আত্মা বলিতে কি বুঝি ও তাহা কেন বুঝি, তাহার বিচার এখানে হইবে না। গোড়ার অতি উত্তপ্ত পৃথিবীতে যাহা পুড়িয়া ধ্বংস হয় নাই, অনুকূল অবস্থায় চিতা-ভস্ম পার হইয়া জীবন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনের মৃত্যুর পরের দাহে কিরূপ পরিণাম পাইবে, সে তত্ত্বের বিচার স্বতন্ত্র।

পার্থিব উপাদানেই পৃথিবীর উৎপত্তি, আর সেই উপাদানই এই পৃথিবীর জীবন ও জীবের উৎপত্তি। আমরা পায়ের তলায় মাটি দলাই আর মাটিকে ঘৃণ্য ভাবি; তাই সেই মাটি হইতে জীবনের উৎপত্তি ভাবিতে অনেকের মনে বাধে। কোন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে না যে, জড় গড়িয়াছিল একটা শয়তান্, আর জীব গড়িয়াছিলেন—অন্যে। সসম্মানে ও সবিস্ময়ে যাঁহারা জড়ের দিকে চাহিতে পারেন না, তাঁহারাই নাস্তিক ও পরমার্থ তত্ত্বের বিরোধী। জড়ের মাহাত্ম্য বুঝিলেই সৃষ্টির ও স্রষ্টার গৌরব বুঝিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাচ্যে গুপ্তসন্ধি

প্রাচ্যে একটা গুপ্ত সন্ধির খবর বাহির হইয়াছে, এবং ইহা লইয়া সবিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। গুপ্তসন্ধি যে কতরূপে, কত দিক দিয়া হইতে পারে, তাহা যুদ্ধের সময় জানা গিয়াছে। যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে কত গুপ্তসন্ধি হইয়াছিল, তাহা অল্প-বিস্তর সকলেই জানেন।

তখনকার গুপ্তসন্ধিগুলো সাধারণতঃ ইয়োরোপের রাজ্য-সমূহের মধ্যে হইয়াছিল। এসিয়া সেখানে স্থান পায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সন্ধির কথা বাহির হইয়াছে, তাহা প্রাচ্যসম্পর্কিত ঘটনা। এই গুপ্তসন্ধিটির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :—

রুশিয়া, জাপান, এবং চীনের মধ্যে একটি সন্ধি হইয়াছে, এবং এই সন্ধিপত্রে সকলে পিকিনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সন্ধিপত্রের প্রধান একটি কথা এই যে, যদি বৃটেন্, ফ্র্যান্স, বা আমেরিকা পিকিন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, বা অন্য কোন চীনপ্রদেশের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করে, তাহা হইলে রুশিয়া চীনের হাতে ২০০,০০০ সৈন্য প্রদান করিবে এবং জাপান তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবে। চীনদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে রুশিয়ার অনেক রেলপথ আছে, তাহার অর্দ্ধেক রুশিয়া জাপানকে ছাড়িয়া দিবে। এই সন্ধির আর একটি আবশ্যকীয় কথা এই যে, সমস্ত Sakhalian প্রদেশটা এই সর্ত্তে জাপানকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাপান রুশিয়াকে পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ, ত্রিশটি 'সাব্‌মেরিন্' এবং সাতটি 'ডেস্‌ট্রয়ার' প্রদান করিবে। ভ্লাডিভস্টককে (Vladivostock) একটি সুন্দর এবং এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বোত্তম বন্দর করিতে হইবে। ইহার নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু অধিক (শতকরা ৬০ ভাগ) খরচা দিবে জাপান, এবং বাকী দিবে রুশিয়া। চীন ৮০০,০০০ জন সৈন্য শান্তি রক্ষার্থে রুশিয়া এবং জাপানের উপদেশের অধীনে প্রদান করিবে। অতঃপর চীন কোন যুদ্ধ সরঞ্জাম জাপান এবং রুশিয়ার বাহির হইতে কিনিতে পাইবে না। এই সন্ধির স্থায়িত্ব ত্রিশ বৎসর কাল থাকিবে।

জাপান এবং চীন সরকার পৃথকভাবে এই খবরের প্রতিবাদ করিয়া ইহা মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এদিকে শোনা যাইতেছে জাপানের বাণিজ্য-সঙ্ঘ রুশিয়াকে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য ধন্যবাদ পাঠাইয়াছে।

সাধারণতঃ গুপ্তসন্ধি হয় কোন যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিবার জন্য, বা কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য। বিগত মহাযুদ্ধের পর জগতের অবস্থার ও মানুষের চিন্তাপ্রণালীর একটা বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন পরিবর্ত্তন শান্তভাবে আসে না, কোন নূতন একা আসে না,—তাহার সহিত পুরাতনকে নষ্ট করিবার জন্য নানা আন্দোলন আসে। মহাযুদ্ধের পর একটা অশান্তি নানা দিকে গুম্‌রাইতেছে, তাহার আভাস চারিদিকেই পাওয়া যাইতেছে।

আমেরিকা ইমিগ্রেশন্ আইনে জাপানকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইল। জাপানের তখন ভূমিকম্প প্রভৃতি হেতু অবস্থা খারাপ না থাকিলে বোধ হয় এত সহজে এত বড় একটা অপমানকে গা পাতিয়া লইত না। কিন্তু চিরকাল জাপান চুপ করিয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচ্যে জাপানের অবস্থা বড় খারাপ। বৃটিশ্, আমেরিকা, ফ্রান্স, সকলেই এশিয়ায় প্রভু হইয়া আছে। তাহাদের এক একটির শক্তির নিকট জাপানের শক্তি নিতান্ত অল্প। তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে হইলে অন্য অন্য শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া বলশালী হইতে হইবে। একথা জাপান অতিপূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিল এবং জাপানের সহিত রুশিয়ার একটা সন্ধির কথা পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল।

ইংরেজ সিঙ্গাপুরে বন্দর স্থাপনা করিতেছে। ইহা যে জাপানের কতখানি ভয়ের কারণ, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বন্দরে যে সমস্ত রণতরী থাকিবে, তাহা যদি কোনদিন জাপানকে আক্রমণ করে, আর যদি আমেরিকা অন্য দিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত। ইংরেজ বা আমেরিকা, কেহই জাপানকে সুনজরে দেখে না। এই ক্ষুদ্র ক্রমোন্নতিশীল দেশটী ব্যবসাবাণিজ্যে প্রাচ্যে ইংরেজ ও আমেরিকার কণ্টকস্বরূপ হইয়া আছে। সুতরাং ইরেজ বা আমেরিকার জাপানের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা অসম্ভব নহে। জাপান যদি নিজেকে বলশালী করিবার জন্য রুশিয়ার সহিত গুপ্ত সন্ধিস্থাপনা করে, তাহা অসম্ভব নহে। ইতঃপূর্ব্বে জাপান এবং রুশিয়ায় যে প্রকাশ্য সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহা এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই জাপান করিয়াছে। চীন, জাপান এবং রুশিয়ার মধ্যে যে গুপ্তসন্ধির কথা চলিতেছে, তাহা অসম্ভব বলা চলে না।

চীনদেশে বৃটিশ্ ও আমেরিকার অনেক প্রভুত্ব আছে। জাপানের বিরুদ্ধে কিছু করিতে হইলে, চীনের মধ্য দিয়া করাই সম্ভবপর। কারণ ইহাই সুবিধার পথ। গত রুশো-জাপান যুদ্ধের সময় রুশিয়া চীনে কত সুবিধা পাইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে আছে। বিশেষতঃ এখন

চীনে গোলযোগের অন্ত নাই। এই সময়ে চীনের মধ্য দিয়া জাপানের অনিষ্ট করার অনেক সুবিধা আছে। এই জন্য বর্ত্তমান গুপ্তসন্ধি সত্য হইলে, চারিদিক ভাবিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজ বা আমেরিকা যে-কোন সময়ে জাপানের বিরুদ্ধে যাইতে পারে। ফ্রান্স বর্ত্তমান অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজের সহিত ফ্রান্স যতই বন্ধুত্ব দেখাক, একটা গোলমাল থাকিবেই। ইংরেজ ফ্রান্সের সহিত মিতালি করিতেছে তাহার নিজের স্বার্থ লইয়া। রুড় দখল করার দরুণ জার্ম্মাণি হইতে ইংরেজের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ কয়লা ফ্রান্স লইতেছিল, ইংরেজের ভাগে খুব কমই পড়িতেছিল।

এই সমস্ত নানা কারণে ইংরেজ হঠাৎ ফ্রান্সের বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স সহজে ইংরেজের কথায় ভুলিবে বলিয়া বোধ হয় না। সে জার্ম্মাণিকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেছে, অথচ ইংরেজ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেছে না। ভূমধ্যসাগর লইয়া ইংরেজের সহিত ফ্রান্সের গোলযোগ সহজে মিটিবে না। প্রাচ্যে যাইবার এই পথটিতে সকলেরই স্বার্থ আছে, সকলেই এখানে বড় হইতে চাহিবে। এস্থান লইয়া দুইটা বলশালী জাতি,—ইংরেজ এবং ফ্রান্সের—মনোমালিন্য চলিবেই।

যদি কখন ইয়োরোপে আবার যুদ্ধ বাঁধে, তাহা হইলে ফ্রান্স প্রাচ্যদেশস্থিত তাহার উপনিবেশগুলির রক্ষার জন্য জাপানের সহিত সন্ধিস্থাপনা করিতে পারে। যুদ্ধ বাধা অসম্ভব নহে, বরং বহু অংশে সম্ভব। কাজেই ফ্রান্স হঠাৎ জাপানের বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।

ফ্রান্সের জন্য আকস্মিক ভয় না থাকিলেও বৃটিশ এবং আমেরিকার জন্য জাপান এবং চীনের ভয় আছে। রুশিয়াও জগতে নিজেকে পরিচিত করিতে চায়, জগতে সে লেন-দেন চায়। কাজেই চীন, জাপান এবং রুশিয়ার এই গুপ্ত সন্ধিটি একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ

অজাতশত্রু একটা কথার কথা মাত্র! কাযের জগতে দেখি—যে যত বড়, তার তত শত্রু, যে যত অনিন্দনীয়—নিন্দুকের দল তার তত বেশী, এই সত্যটা যাঁর নাম করে এই সভা সেই লোকান্তরিত আমাদের সকলের বরেণ্য আশু বাবুর জীবনটির দিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই। মৃত্যুকে আমরা অনেকেই অতি বড় শত্রু বলে জানি কিন্তু মৃত্যুতো মারেনা—সে কর্ম্মক্ষেত্রের

সব মলা, সব ক্লেদ ধুয়ে মানুষটিকে আমাদের মনের সিংহাসনে চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যায়। কিন্তু নিন্দুক সেই মৃত্যুর আপন হাতের অমৃত দিয়ে অভিষিক্ত মানুষের স্মৃতির উপরেও গরল বর্ষণ করে থাকে—এও প্রমাণ করছে আশু বাবুর জীবনে।

এক রকমের ছোট আছে তারা নিজের মাপে যা কিছু পৃথিবীতে বড় তাদের দেখেই চলে। বড় থেকে তারা অনেক দূর তাই ধরাকে সরা না দেখে তাদের অন্য গতি নেই, তারা সহজ চোখে দেখে না, দূরবীণের ছোট কাচের দৃষ্টি নিয়ে তারা বসে থাকে, এইভাবে দেশের অনেকে যে একদিন ৺আশু বাবুকে দেখেছে এবং এখনো দেখছে তাতে দুঃখ করার কারণ নেই, কেননা এই হল নিয়ম। তিনি খুবই বড় ছিলেন তাই তাঁকে এত শত্রুতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে, যদি খুব ছোট হতেন তিনি, তবে হয়তো চোখ এড়িয়ে যেতেন নিরুপদ্রবে; কিন্তু তাতো হ'ল না; সয়বার জন্যে বিধাতা তাঁকে নির্ম্মাণ করেছিলেন,—আঘাত সয়বার, ভার সয়বার, দুঃখ সয়বার এমনকি সুখকে, আনন্দকে, গৌরবগরিমাকে অটলভাবে সয়বার বিপুল ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এই মহাপুরুষকে বিধাতা বাংলা দেশে। তাঁর কতখানি ধৈর্য্য ছিল, শক্তি ছিল তার পরিচয় তাঁর সহচর হয়ে যাঁরা কায করেছেন তাঁদের কারু কাছে অজানা নাই।

রূপরাজত্বের দিকে প্রতিকূল স্রোত বেয়ে আমাকে এখনো একখানা নৌকা চালিয়ে যেতে হচ্ছে দেশবিদেশের গুটিকয়েক যাত্রি নিয়ে, কিন্তু একথা স্বীকার করছি যে, মন আমার বহুবার বলেছে—আর পারিনে, যাত্রিদের ডেকে বলেছি তোমরা হাল ধর আমায় অবসর দাও! কিন্তু অসীম জ্ঞানসাগর—তার কাণ্ডারি হ'য়ে ৺আশুবাবু ঝড়ের পরে ঝড় ঠেকিয়ে চল্লেন দেখেছি—কোন দিন তাঁকে শ্রান্ত হ'তে দেখলেম না!

সে একটা গ্রীষ্মের দিন সপ্তাহের দারুণ পরিশ্রমের পরেও একটা রবিবারে তিনি আমারি একটা লেক্‌চার শুনতে এলেন। সভাগৃহে এসে দেখা গেল জন আষ্টেকের বেশী শ্রোতা নেই—লাইব্রেরীর আলমারী আর থামগুলো আর খালি চৌকি কটা আমার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে! আমার বেশ মনে আছে সেদিন লেক্‌চার বন্ধ করে আমি তাঁকে বাড়ী ফেরার কথা বলেছিলাম। তাতে উত্তর পেয়েছিলাম—"সে কি হয়, তুমি কষ্ট করে এসেছো, কেউ না শোনে আমি আছি! সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত সেই সভায় প্রায় একা বক্তা একা শ্রোতার কাটলো, সাতটার পর বাড়ী চলেছি, দেখলেম আশুবাবু তাঁর আফিস ঘরের দিকে চলেন। আমি বল্লেম বাড়ী ফেরবার সময় হল যে! তিনি হেসে বল্লেন, আমার ছুটি নেই, তুমি যাও! সেই একদিনের কথা থেকে আমি চিনে নিলেম এই অক্লান্ত কর্ম্মি-পুরুষকে! যে লোক সব দিকে তাঁর কাছে ছোট, তার মুখে প্রশংসা স্তুতিবাদের মতো শোনায়, নয় শোনায় যেন বড় লোকটিকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি; সুতরাং এই ভাবে আশুবাবুর জীবনের নানা খুটিনাটি পরিচয় তোমাদের সকলের সামনে ধরে দিতে আমি ইতস্ততঃ করি। আমার সৌভাগ্য যে, তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দেশের ছাত্রজীবনের

সঙ্গে আমাকে মেলবার অবসর করে দিলেন। আমাকে কেন যে তিনি ডেকে নিলেন তা আজও আমি বুঝ্তে পারি নে। যে লোক জাহাজ চালিয়ে চলেছে সে যে ডিঙ্গার মাঝিকে সঙ্গী করে নিলে, তার কারণ—যে ডাকলে সে ছাড়া যাকে ডাকলে সেতো বল্তে পারে না! অনেক বড় ছিলেন যে তিনি, আর অনেক ছোট ছিলেম যে আমি! সেই আমাকে ডাক দেবার ধারাটা তাঁর কেমন ছিল তা বলি—মাথা তাঁর পায়ের কাছে নুইতে না নুইতে তাঁর হাত এগিয়ে এল—আমাকে একেবারে তাঁর বিছানার একধারে বসিয়ে দিলে, তারপর একেবারে কাজের কথা—তোমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিই এমন সাধ্য আমার নেই, কিন্তু এ কায তোমাকে নিতে হবে। আমি জানতে চাইলাম কি কর্তে হবে? উত্তর হল, তা আমি জানিনে তোমার উপর নির্ভর! আমার মন তখনো পালাবার পথ দেখ্ছিলো, আমি আপত্তি তুল্লেম—ছেলেরা এম্, এ ও বি, এ নিয়েই ব্যস্ত, ছবিটবি নিয়ে তারা তো সময় নষ্ট করতে পারবে না? উত্তর হল—সে আমি জানি কিন্তু এ কাজ আরম্ভ করাত চাই! আমি উত্তর দিলেম "আমি যতটুক পারি ততটুকু পর্য্যন্ত ছেলেদের মন এদিকে দেওয়াই!" তিনি বল্লেন—"এই আমি চাই আপাততঃ—ক্রমে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে!" অত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যাপার তার কোনখানে একটুখানি ফাঁক ছিল, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যখন তিনি আমাকে সেই জায়গাটা নির্দ্দেশ করে দিয়ে বল্লেন—"ওদিকটা দেখ।" তখন আমার চোক পড়লো সেদিকে, আমি দেখ্লেম সত্যিই একটা স্থান আছে রূপবিদ্যার ওখানে।

এইতো গেল তাঁর কর্ম্মের দিকে একটু পরিচয় যা আমার কাছে ধরা পড়লো। এইবার লোককে কাযের ভার দিয়ে একেবারে লোকটির বিষয়ে চোখ বন্ধ তিনি যে রাখতেন না তার কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের চেয়ার খোলার দু'চার দিন আগের কথা—আমি বাংলায় বলবো স্থির করেছি জেনে তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন—দেখ, লাট সাহেবের ইচ্ছে—নিদেন প্রথম বক্তৃতাটা ইংরাজীতে হোক্, কি বল? আমি সোজা আপত্তি জানালেম—হবে না, আমি ইংরাজী জানি নে, এ আমার সাধ্যের বাহিরে! তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না, যথাসময়ে চেয়ার খোলা হল বাংলা ভাষায়! লেক্চারের পর তিনি আমায় কাছে ডেকে বল্লেন—"তুমি বাংলায় বলে ভালই করেছ, আমি চাই এখানের সব কটা লেক্চার বাংলায় হয়।" তখন আমি বুঝ্লেম এমনি করে তিনি আমায় যাচিয়ে নিলেন, এরপর থেকে কোন দিন আর তেমন পরীক্ষায় আমাকে পড়তে হয় নি। বাংলা ভাষার উপর কতখানি টান তাঁর মনে ছিল এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমি অনুভব করলেম। এই মাতৃভাষাকে শিক্ষা দেবার ভাষা করে যাওয়া একেবারে তাঁর শেষ কাজ বলতেও পার। আমি নিজের মধ্যে দিয়ে তাঁকে কতখানি পেয়েছি সেইটুকুই বলতে পারি, দেশের মধ্যে দশের মধ্যে তাঁর কি ভাবের কতখানি অধিকার বিস্তৃত হল সব দিকে তার ইতিহাস জানাবার সাধ্য আমার নেই। সুতরাং আমার সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর কথা তোমাদের বলছি

বলে আমার অপরাধ নিও না। এ ছাড়া আমি বলার সময় তাঁকে বার বার আশুবাবু বলে চলেছি এতেও হয়তো তোমরা আমায় দুষছো, কিন্তু বাবু কথার চেয়ে বড় কথা কোন ভাষায় নেই এটা তোমরা মনে রেখো। 'মহারাজ,' বল্লে মানুষ রইলো সিংহাসনে, আমি রইলেম দেউড়িতে, 'মহাত্মা,' মানুষকে স্বর্গে রেখে দিলে আমাকে ঠেলে দিলে পাতালে, এই ভাবের দূরত্ব ও পার্থক্য তিনি আমাদের কোনো দিন অনুভব করতে দেন নি। তিনি বড় হয়েও যেমন ছোটদের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিলেন, একমাত্র বাবু শব্দটি তাঁকে ঠিক্ তেমনি পদবীতে ধরে দেখায় তাই আমি বার বার বলছি—আশুবাবু। এই বাবু শব্দ দিয়ে তাঁকে আমি মনিব, তাঁকে আমি বন্ধু বলে আনন্দ পাই, এর মতো সুন্দর কথা আর কি আছে বাংলা ভাষায় যা বড়কে বড়, গুরু-জনকে গুরু-জন বুঝায় এবং অত্যন্ত নিকট অত্যন্ত আত্মীয় করেও মানুটিকে দেখায়। ছেলেবেলায় শুন্‌তেম অঙ্কশাস্ত্রে মস্ত পণ্ডিত আশু বাবু। তাঁর কাছে পড়বো এইটে ছিল সব স্কুল-বয়ের লক্ষ্য তখনকার দিনে। আমার কাছে ছিল অস্ত্রশাস্ত্র-বাঘ, অঙ্কশাস্ত্রবিদের হাতে পড়তে হবে একদিন একথা ভাবলে ছেলেবেলায় আমার হৃৎকম্প হতো। কিন্তু সত্যিই যেদিন তাঁর হাতে পড়লেম তখন অঙ্কবিদ্যার ভয় গেছে, অঙ্কের কোঠায় এসে পড়েছি, মনে করে ছিলেম বুঝি হাত এড়িয়েছি। কিন্তু পরীক্ষা দিতে হল একদিন, লেক্‌চারের পরে তিনি বল্লেন—দেখ, আগে আমিও একুটু আধটু আর্ট সম্বন্ধে চর্চ্চা করেছি! এর পর থেকে প্রত্যেক প্রবন্ধ আমাকে অতি সাবধানে লিখতে হতো; এই যে তিনি বলেছিলেন তিনি আর্টচর্চ্চা করেছেন, তার প্রমাণ হঠাৎ পেলেম একদিন তাঁর বাড়ীর ঘরে একটা আলমারি ঠাসা আর্টের বই দেখে—চিত্র-বিদ্যার অমূল্য সমস্ত পুস্তক—খুব পুরাতন, খুব আধুনিক সমস্ত ধরা সেখানে! সকল বিষয়ে জানার জন্য কি একান্ত উৎসাহ ছিল তাঁর মনের মধ্যে। বিষয় যতই সামান্য সেটিকে বড় এবং পরিপূর্ণরূপে দেখার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল তাঁর। রূপবিদ্যা—বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যে তাকে স্থান দিলেও চলে, না দিলেও সংসার চলে যায় এই তো আমাদের ধারণা, রূপবিদ্যার চেয়ে ডাক্তারি অস্থিবিদ্যা বেশী কাযে আসে জীবনে এধারণাও সাধারণ, কিন্তু এই অসাধারণ মানুষটি রূপতত্ত্বের স্থান আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী, এটা ধরলেন এবং সেইভাবে কাজ আরম্ভ করলেন!

দেশ-জোড়া বিদ্যানুশীলনের ব্যবস্থার ভাবনা ভাবতে হচ্ছে যাঁর, তাঁকে যখন দেখি দেশের সুকুমার শিল্প ছবি কবিতা গান এসবের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন তখন আমার বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। এসব দিকে তাঁর কত দরদ ছিল তার প্রমাণ আমি একদিন পেয়েছি। আমার সংগ্রহ যা কিছু প্রাচীন ছবিমূর্ত্তি তখন বিক্রয় করবো স্থির করে যেমন আর সকলকে তেমনি তাঁকেও সমস্ত সংগ্রহের একটা ছাপানো তালিকা দিতে গেলেম, কথাবার্ত্তার পর ফেরবার সময় তিনি বল্লেন, দেখ এ সব বেচে ফেলে তুমি বাড়িতে কি নিয়ে থাকবে বলতে পারো? এর চেয়ে দরদ আমার জন্যে আমার শিল্পের জন্যে আর কেউ জানায়নি এ পর্য্যন্ত—কিনতে চেয়েছে দর দস্তুর

পর্য্যন্ত করেছে কিন্তু এ ভাবে দরদ দিয়ে বেচতে নিবারণ কেউ করেনি। এই দরদটুকু হারানো সে যে শুধু আমার পক্ষেই মস্ত অভাব সৃজন করেছে তা নয়, দেশের আর্টের দিকে এটা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি রেখে গেছে।

লোকে একদিন তাঁকে অপব্যয়ের অপরাধ এবং অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু এক গোছা ধানের শীষ গজাতে আকাশ কতখানি জলের এবং আলোর অপব্যয় করে; গোটা কতক বনের গাছ, মুষ্টিমেয় মানুষ আর জীবজন্তু—এরি জন্যে এত বড় পৃথিবী এই আকাশ এই সমুদ্র এই নদী পর্ব্বত উপত্যকা বাতাস আলো গ্রহ চন্দ্র তারা, একি দেখেও দেখিনা কেউ। সৃষ্টির গোড়ার কথাই হল সর্জ্জন। যেমন বর্ষার মেঘ অপব্যয়ী, আকাশের তারা অপব্যয়ী, তেমনি এতটুকু জ্ঞান ফোটাতে বিরাট ভাবে অপব্যয়ী ছিলেন এই মহাপুরুষ বলতে পারি, ছোটর জন্যে তিনি নিজকে ঢেলে দিতে কৃপণতা করেননি কার্পণ্য কোন দিন আসেনি তাঁর মনের ত্রিসীমানাতে। সব দিকে কৃপণ ও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু বড়লোক, ছোটদের তুলনায় অনেক বড় এমন বড়লোক বড়লোকের ছায়া ধরে আছে এবং যথেষ্ট থাকবেও। কিন্তু—ছোটদের সঙ্গে পার্থক্য নিয়ে বড় হয়ে ওঠাতেই তো যথার্থ বড়লোকের পরিচয় নয়—আগাছা মাটিকে তুচ্ছ করছে বলেই বনস্পতি হতে পারে না যদিও অনেক উপরে সে বাতাসে শিকড় মেলিয়ে বড় হতে চাচ্ছে। আপনার চেয়ে যারা অনেক ছোট তাদের সবার কতখানি নিকট হয়ে উঠলো মানুষটি এতেই বড়লোকের যথার্থ পরিচয় পাই।

সব গাছের মাথার উপরে নিজের মাথাটা ঠেলে প্রায় মেঘের কাছাকাছি পৌঁছায়, ফল ধরেনা ছায়া দেয় না এমন গাছ বনস্পতি বলে আপনাকে বলাতে পারেনা সে, যে গাছ নিজের পায়ের তলাকার ছোটখাটো যা কিছু তাদের কাছে অনেক উপরে থেকেও অনেকখানি ছায়া দিলে ফুল ফলের আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দিলে তাকেই তো বল্লেম বনস্পতি। জাহাজের মাস্তুল, বিনাতারে টেলিগ্রাফের দাণ্ডা, বাজ পড়ার শিক—সবাই বড়, কিন্তু একটিও ছোট পাখীর আশ্রয় হলনা এরা। গাছের বেলাতে যেমন তেমনি মানুষের বেলাতেও দুই রকমের বড়লোকের দেখা পাই। এক শ্রেণীর বড়লোক সে হল যাকে ইংরাজীতে বলে Towering personality, নিজেকে সে ঠেলে তুল্লে সমান আকাশের দিকে আশপাশের দিকে কোনো লক্ষ্য নেই, তলায় যারা রইলো তাদের বিষয়ে চিন্তাও নাই, এই ভাবের সব দিকে সঙ্কীর্ণ কিন্তু আকাশপ্রমাণ বড়লোক আমার চোখের সামনে অনেকবার এসেছে এবং গেছে; সে দলের মধ্যে আমি আমার পরলোকগত মনিব এবং বন্ধু স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে পাইনে। আমি তাঁকে দেখতে পাই যাঁরা দেশের বুক জোড়া ছায়া বিস্তার করে কালে কালে এসেছেন গেছেন এবং আসবেনও তাঁদের মধ্যে। আমার একথার সত্যতা তাঁর জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে এবং তাঁর জীবনের সব চেয়ে যে বড় কাজ—শিক্ষা বিস্তার—সেও এই সত্যের সাক্ষি দেয়। মাত্র দু তিন বছরের তাঁর পরিচয় সেই পরিচয়টুকুর বলে তাঁর গুণাগুণ বিচার করে তাঁর স্মৃতির উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া

আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু এই ছোটর বড়র যে সত্য মিলন নিয়ে তিনি সত্যই বড় ছিলেন তার সাক্ষি আমার নিজের এবং অপরের কাছ থেকে আমি পেয়েছি—এইটুকু বলতে দ্বিধা নেই আমার। যে দিন সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছালো—রসারোডের বাড়ির সামনে এসে দেখলেম লোকে লোকারণ্য! গাড়ি ছেড়ে হেঁটে চলেছি পথের ধারে দোকানীকে দেখলেম কপালে করাঘাত করে বলছে—আজ অনাথ হলেম। ঝড়ে যে দিন হঠাৎ গাছ পড়ে, সে দিন তার কোলের পাখিরা যে ভাবে হাহাকার করে শূন্য খুজে বেড়ায় সেই ভাবের ক্রন্দন শুনেছিলাম সেদিন—অজানা দোকানীর অজানা ভিখারীর অজানা ছাত্র অজানা সবার কাছ থেকে। যথার্থ বড়লোক না হলে এত বড় সত্য সম্বন্ধ ঘটনা ছোটর সঙ্গে অজ্ঞাত অখ্যাতের সঙ্গে আত্মীয়তা সহজ মানুষের কর্ম্ম নয়! এই এক বৎসর হল তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এই এক বৎসরের মধ্যে আমি তাঁর সম্বন্ধে নিজে কোনো কথা কাগজে লিখিনি, সভাতেও বলিনি, তার জন্যে অকৃতজ্ঞ বলে হয়তো কেউ কেউ আমাকে ঠাউরে নিয়েছেন, কিন্তু আমি বলছি তাঁর কথা ভাবলে সত্যিই আমার ব্যথা লাগে, লিখতে গেলে লেখা আমার ছন্দ হারায় ভাষা স্তব্ধ হয়ে থাকতেই চায়!

বেদনা তাঁর জন্যে যে আমি অনুভব করেছি এটা বল্লেই তো বিশ্বাস করবেনা অনেকে তাই আমি নীরব রই। এক রকম বেদনা আছে—তাতে মনের তার বেজে ওঠে,—বলা যায় সে বেদনার কথা, লেখা যায় সে বেদনার কথা কিন্তু আর এক রকম বেদনা আছে তার পীড়ন এমন যে তাতে করে প্রকাশ-চেষ্টা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং দ্রুত হতে দ্রুততর কম্পন পায় এমন এই মনের তার যে তাকে স্পর্শ করে সুর ওঠাতে গিয়ে আঙুল ভয়ে পিছিয়ে আসে, এই ভাবের পীড়ন বুকের মধ্যে আমি অনুভব করেছিলেম—এতদিন তাই চুপ্ ছিলেম। ব্যথা সহে গেছে কালে, তারের কম্পন শান্ত হয়েছে—বুকের বীণা নিয়ে এই স্মৃতি-সভায় তাই আজ তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে সাহসী হ'য়েছি। ছোটর সঙ্গে বড়র মিলনের স্বাদ শুধু তিনি পান্‌নি আমাদেরও পাবার অবসর দিয়েছিলেন এই তাঁর সম্বন্ধে আমার বলবার—একটি কথা তোমাদের জানালেম। আর একটি কথা—সেটি হচ্ছে তাঁর কাযের মহত্ত্ব সম্বন্ধে—সেখানেও দেখি এই ছোটদের জন্যে বড়র বেদনা—জ্ঞানের রাজত্বে যাতে আমাদের প্রবেশ সহজ হয় সুগম হয় তারি জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা—এই তাঁর কাযের বিশেষত্ব। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন দেশের ছেলের সামনে বিদ্যামন্দিরের সকল দ্বার বন্ধ রেখে কেবল যেটুকু দিয়ে তারা সোজা গিয়ে চাকরী এবং উমেদারির দেউড়িতে হাজির হয় হাত-জোড় করে সেই পর্য্যন্তই উপায় করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবতারা। এই একটী মানুষ এঁর চোখে এড়ালোনা এই অবিচার এই অত্যাচার দেশের ছেলে যারা শিখতে চাচ্ছে তাদের উপর। বিদ্যামন্দিরের সিংহদ্বারে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন—ছোটদের নিয়ে, বিদ্যায় ছোট, বয়সে ছোট ছাত্রদের তিনি ভার দিলেন দেশের ছেলের সামনে জ্ঞান রাজ্যের বিচিত্র দিকের সব দুয়ার খুলে দেবার! এই জ্ঞানের দুয়ার যেখানে যে কেউ বন্ধ করতে এসেছে সেইখানেই এই মহাপুরুষ আপনার

বিরাট কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ নিয়ে বাধা দিয়ে বলেছেন—না বন্ধ হবে না আরো যে কটা দ্বার বন্ধ আছে তা খুলে দাও! শত শতবার ধাকা দিলেও ছোটদের জন্যে যেসব জ্ঞানের দুর্গ বন্ধই থাকতো সেই সব দুর্গ জয় করে গেছেন ইনি, দেশের বড়লোকদের জন্যে নয়—ছোট ছোট ছেলেদের মেয়েদের জন্যে, ঘরে যাদের শিক্ষা পাবার কোন উপায় নেই তাদের জন্যে। যাকে আমরা বলছি পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা, সেই শিক্ষার ভিত্তি টাকার উপরে কিম্বা গভর্ণমেণ্টের কৃপার উপরে কিম্বা সেনেটের মেম্বরদের রচা নিয়মাবলীর মোটা মোটা পুঁথির উপর তো তিনি স্থাপন করেন-নি—এই ছোটর জন্যে বড়র যে বেদনা অশিক্ষিতের জন্যে সুশিক্ষিতের যে বেদনা—এবং বড়র প্রতি ছোটর যে টান এবং নির্ভর তারি উপরে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কায এবং বড় আশাকে স্থাপিত করে চলে গেছেন তিনি যে বড় দরবারের উপরে আর কোনো দরবার নেই সেইখানে! আমাদের দেশের ছোট ছোট যারা এসেছে ও আসবে তাদের জন্যে দরবার জানাতে তিনি এলেন এবং গেলেন কাল একথা ভুলতে দেবেনা—আমরা যদিবা ভুলতে চাই। নিজের কায রেখে বিদেশ থেকে আসছিলেন এই মহাপুরুষ আমাদের শিক্ষার ভাবনা ভাবতে সে আশার মুখে তাঁকে মৃত্যুই একমাত্র নিরস্ত করেছে—কাদের কাযে আসতে ব্যস্ত হয়েছিলেন তিনি—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের কাযে। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপের ভয়ে আসা বন্ধ করে বসেন নি তিনি,—অন্য বড়লোক হলে মিটিং বন্ধ হতো নিশ্চয় গরমী যতদিন না কাটে, কিম্বা মিটিং হতো বড়লোকটি আসতেন না! যে মহাপুরুষের স্মৃতি উপলক্ষ করে এ সভায় এসেছি তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র লিখে দিই এমন বড়লোক আমি তো নই দেশে কেউ আছে কিনা তাও আমি জানিনে, যিনি নিজেই ছিলেন বিচারপতি তার সম্বন্ধে বিচার করতে আছে একমাত্র এই মহাকাল যা চিরদিন ছোট বড় দুয়েরই বিচার করে চলেছে।

মাথার উপর থেকে ছাত বা ছাতা যাই সরে যাক্ দুটোকেই আবার জোগাড় করে নেওয়া চলে, কিন্তু আকাশ সরে গেলে মাথার উপরে সাত থাক্ চাঁদোয়া খাটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না। আকাশের মতো বৃহৎ এবং উদার সেই মহাপুরুষের অভাবে আমাদের জ্ঞানের রাজত্বে কতখানি অন্ধকারের সৃষ্টি হল কত ভয়ের লক্ষণ সমস্ত দেখা গেল তা এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা আজও নাড়া-চাড়া করছেন তাঁরাই জানেন।

রূপবিদ্যার একটা দিকের ভার তিনি আমাকে ডেকে দিয়ে গেছেন সে ভার কত লঘু ছিল আমার পক্ষে যতদিন তিনি আমার কাছাকাছি ছিলেন, আর আজ সে ভার কত ভারিই ঠেকছে তাঁর অভাবে। বেঁচে থাকতে তাঁর কাছে সম্ভ্রমে মাথা আপনি নুইতো—এখানে, আজকেরও মন আমার সেখানে ওপারের দিকে প্রণতি দিচ্ছে এই মহাপুরুষের উদ্দেশে যিনি খুব ছোটদের সঙ্গে মিলতে দ্বিধাবোধ করেন নি, ছোটদের বড় কাজে তুলে নেবার জন্যে সক্ষম করে তুলতে যাঁর প্রাণপণ যত্নের শেষ ছিলনা, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যিনি এক ভাবনা ভেবে গেছেন—ছোটরা বড় হয় কিসে, কিসে জ্ঞানের রাজত্বে মুক্তি পায় অজ্ঞানরা।*

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে প্রথম বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।

সুন্দরীর হাসি

কুশীলব।

বসন্তক—বৌদ্ধ চিত্রকর, পুষ্পরাগ—বৌদ্ধ শিষ্য, অমিতাভ,—
বৌদ্ধ শিষ্য, ইন্দ্রজিত—হিন্দু শ্রেষ্ঠী, মাধবিকার ভৃত্য,
দৃশ্য—মগধ।

বসন্তকের চিত্রাগার।

ইন্দ্রজিত। এই যে পুষ্পরাগ, এই যে অমিতাভ। আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হোল।

অমিতাভ। কবে ফিরে এলে বন্ধু, মগধ নগরে?

ইন্দ্রজিত। আজই। তোমাদের গুরু বসন্তক কোথায়?

অমিতাভ। এখুনি আসবেন তিনি। আমরা তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করচি। তিনি এতক্ষণ পথে শ্বেতহস্তী দেখবার জন্যে ভিড় ঠেলছেন আর কি!

ইন্দ্রজিত। ওঃ! আমি যেটা এনেছি রাজাকে উপহার দিতে? তোমরা বুঝি এখনো দেখ নি?

পুষ্পরাগ। সে কৌতূহল আমাদের নেই বন্ধু! কেন না মনের শান্তি আর আনন্দ না থাকলে কৌতূহল হতে পারে না। এই দুটোরই যে অভাব আমাদের।

ইন্দ্রজিত। কেন, ভাগ্যলক্ষ্মী কটাক্ষ করেছেন নাকি?

পুষ্পরাগ। তিনি যে আমাদের একেবারে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয়ে গেছে।

অমিতাভ। সেই তো হয়েছে বিপদ। শান্তির আতিশয্য আমাদের প্রাণটাকে একেবারে জমাট করে দিয়েচে।

ইন্দ্রজিত। তোমাদের গুরুর ভাগ্যের সঙ্গেই তো তোমাদের ভাগ্য বাঁধা। তোমাদের গুরুর কি আর্থিক উন্নতি হয় নি?

পুষ্পরাগ। তা' হবে কি করে বল? সকলেই তো চেষ্টা কচ্ছে যা'তে তাঁর অবস্থা ফেরে। কিন্তু তিনি যে নিজে মুখ ফিরিয়ে আছেন। তাঁর লেখা চিত্রপটগুলোর যশঃ সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কাজের ওপর কাজ আসবে তাঁর কাছে; অন্য কেউ হ'লে এই সুযোগে একটা নাম করতেও পারতো, অর্থেরও অভাব থাকতো না; কিন্তু তাঁর সেদিকে খেয়ালই নেই; খরচ রোজই

---

* আনাতোল ফ্রাঁসের "দি স্মাইল অফ মোনা লিসা" নাটকের অবলম্বনে এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটিকা।

বেড়ে চলেছে। নগরের শ্রেষ্ঠ ধনী যাঁরা তাঁরা বেজায় চটেছেন; শুধু তাই নয়, দস্তুরমত গুরু বসন্তকের ওপর ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছেন। কাজেই আমাদের গুরুর এত অর্থাভাব হয়েছে যে দুর্দ্দশার একশেষ হতে তাঁর খুব বেশি দেরী হবে না বোধ হয়।

ইন্দ্রজিত। বসন্তক তো শুধু চিত্রকর নয়। চিত্রকলা, কারুকার্য্য, যন্ত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, জ্যোতিষ বা দর্শনশাস্ত্র—তার প্রতিভার বিকাশ কিসে হয় নি। এতবড় অমানুষিক ক্ষমতা যার, এত ধনকুবের যার সহায়, সে কিনা আজ অর্থের কাঙাল, সামান্য অর্থের জন্যে তাকে আজ ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছে। এ তো বড় আশ্চর্য্য! আর হবেই বা না কেন? বিলাস যে একেবারে বসন্তককে ছেয়ে ফেলেছে। আগে দেখেছি যে, এই চিত্রাগারের সবই অগোছাল অবস্থায় থাকতো, কত শিল্পী, কত চিত্রকর, কত খোদাইকর, কত বিজ্ঞানবিদ এখানে বসে কাজ করতো দেখেচি; সবই থাকতো লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে। আর আজ আমায় বিস্মিত করে দিচ্ছে বিলাসের সাজ-সজ্জা, একটা মাধুর্য্যের ছায়া, যা এ ঘরটাকে ঘিরে রেখেচে। দামী দামী আস্তরণ, নানারকম বাদ্যযন্ত্র, দুর্লভ ফল ফুল এমন সুন্দরভাবে সাজানো দেখচি, মনে হয় যেন দেবতার দেউলে একটা বিশেষ পূজার আয়োজন হয়েছে।

পুষ্পরাগ। তোমার পক্ষে সেটা মনে হওয়া স্বাভাবিক বটে। কিন্তু এ দেব-পূজার আয়োজন নয় বন্ধু, নারীর চরণে অর্ঘ্য এ সব।

ইন্দ্রজিত। বসন্তক তা'হলে প্রেমে পড়েচে বল?

পুষ্পরাগ। প্রেম? তাঁর হৃদয়ে প্রেমের অভাব কখনো ছিল কি? প্রতিদিন এমন কি প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁর কাছে প্রণয়-পবিত্র। কোন্ জিনিসকে তিনি ভাল না বাসেন? বাংলা দেশের ফুটন্ত গোলাপ, রক্তজবা, প্রেমের নেশায় তাঁকে মাতিয়ে তোলে। তাঁর উদ্যানের মধ্যে রাজহাঁস সাঁতার কাটবে, তারাও তাঁর ভালবাসার পাত্র। তাঁর সেই একগুঁয়ে ঘোড়াটিকে তিনি কত ভালবাসেন। এমন কি, বিষধর সর্পও তাঁর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় নি। তুমি জানো বোধ হয় যে তিনি অনেক যত্নে একটা গাছ পুতেছিলেন, সোনার মতো তার ফল। লোকে বলে সে ফল একটু ঠোঁটে দিলে মানুষ আর বাঁচতে পারে না, কিন্তু মৃত্যুটা আসে বেশ স্বাভাবিকভাবে, কোনো যন্ত্রণা না দিয়ে। কোনো ভিষক কিন্তু পরীক্ষা করে গাছ কিম্বা ফল কিম্বা মৃতব্যক্তির শরীরের ভিতর কণামাত্র বিষ আবিষ্কার করতে পারে না। গুরু সেই ভীষণ ফলগুলোকেও কম ভালোবাসেন না। সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক মূর্ত্তিই তাঁর প্রাণটাকে ভরিয়ে তোলে; যে গোলাপ বাতাসকে গন্ধে মাতাল করে দেয়, তা'ও,—যে পাখী গানে গানে বাতাস ভরপূর করে, তা'ও,—আবার যে সর্প নিঃশ্বাসে বায়ুকে পর্য্যন্ত বিষাক্ত করে তোলে, তা'ও। সর্ব্বত্রই তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন,—তা' সে পাখীর ক্ষিপ্রগতিতেই হোক আর সর্পের কুটিল অথচ মধুর ভঙ্গিমাতেই হোক। দেশবিদেশের কাহিনীর মধ্যে যেখানেই তিনি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান, প্রণয় যেখানে মৃত্যুকে

বরণ করে নিয়েচে কি এই রকম কিছু, প্রাণের ভালোবাসা দিয়ে গুরু বসন্তক সে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন।

ইন্দ্রজিত। তোমরা কি সকলেই বসন্তকের মতো পাগল হ'লে না কি ?

অমিতাভ। বলি, যদি বুদ্ধিটাই না থাকবে আমাদের, তাহ'লে সুদে টাকা খাটাতে হয় কেমন করে সেটা তোমায় শেখানোর কি হবে ?

ইন্দ্রজিত। দেখ, তোমরা বৌদ্ধ বলে যে নিজেদের খুব বড়াই কর। তোমরা তো কোনো জীবকেই ঘৃণা কর না। কিন্তু আমি সুদে টাকা খাটাই বলে মনে এত ঘৃণা আসচে কেন ?

অমিতাভ। ঘৃণা! নিশ্চয়ই না! তুমি তো একজন অতি দয়ালু মহাজন।

ইন্দ্রজিত। তোমাদের বুদ্ধ তো সর্ব্বজীবে প্রেমের তথ্য শিখিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা তো তোমাদের হয়েছে খুব দেখচি। ভুলে গেলে কি, কতবার অর্থ দিয়ে তোমাদের গুরুর সাহায্য করেচি, নিজের কি লাভ হয়েচে তা'তে ?

পুষ্পরাগ। লাভ না হ'তে পারে। ক্ষতি তো হয় নি। বসন্তক যে তোমাকে খুবই ভক্তি করে— সে ভক্তি তো হারাও নি ?

ইন্দ্রজিত। তা'তে কি ? সে তো সবই ভালোবাসে—এমন কি সর্প পর্য্যন্ত!

অমিতাভ। তা' কেন ভালবাসবেন না ? ধর্ম্মের বুজরুকী তাঁর নেই। ভালো কথা; ইন্দ্রজিত, তোমার মুখ আর চেহারাতে তোমাদের বেণের জাতের ছাপ চমৎকার আছে। হয় তো গুরু বসন্তক কোন্‌দিন তোমার ছাঁচে তাঁর কোনো সুন্দর কল্পনা ঢালাই করতে চাইবেন। তার চেয়ে বেশি গৌরব কি তুমি আশা করতে পারো ?

ইন্দ্রজিত। বৌদ্ধ চিত্রকরের ছবি তৈরী হবে আমার চেহারার আদল দিয়ে ? তুমি কি পাগল হয়েছ ? সে ছবির প্রশংসা যে করবে তোমাদের সঙ্ঘ যে তাকে সমাজচ্যুত করে দেবে গো!

অমিতাভ। বসন্তক যদি সে ছবি আঁকেন তাহ'লে তা এত সুন্দর হবে যে তা'কে ভালো না বেসে কেউ থাক্‌তে পারবে না।

ইন্দ্রজিত। তোমাদের পুরোহিতরা, তোমাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষরা আমাদের জাতকে সুনজরে দেখবে,—একাজ মানুষের অসাধ্য। (বসন্তকের প্রবেশ) এই যে বসন্তক! নমস্কার!

পুষ্পরাগ। প্রণাম, গুরুদেব।

বসন্তক। নমস্কার, নমস্কার! এস বন্ধু ইন্দ্রজিত! তুমি যে মগধে ফিরেছ, এ আমি শুনেচি। বসন্তককে ভোলো নি দেখচি।

ইন্দ্রজিত। ভুলিনি,—যদিও, বন্ধু, তোমার শিষ্যেরা আমায় ঘৃণা করে!

বসন্তক। ঘৃণা করে ?

অমিতাভ। উনি আমাদের অবিশ্বাসী বলেছেন, পৌত্তলিক বলেছেন!

বসন্তক। অবিশ্বাসী হাঁ, এ কথায় রাগ হতে পারে বটে! কিন্তু পৌত্তলিক বলায় তো রাগের কোনো কারণ নেই। পৌত্তলিকতা সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম! আমরা চিত্রকর,—সৌন্দর্য্যই আমাদের দেবতা; সৌন্দর্য্যকেই আমরা ভালোবাসি, তাই বুঝি। আর এই সৌন্দর্য্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া সব ধর্ম্মেরই উচিত।

ইন্দ্রজিত। কোথা থেকে আসছ তুমি, বসন্তক?

বসন্তক। হয়তো তোমারি মতন কোনো দূর দেশ থেকে। কিন্তু আপাততঃ আমি মগধেই আছি। আর এখন আসছি শ্বেতহস্তী দেখে। কি সুন্দর রং—কি সুন্দর চোখদুটি—নগরের সব লোকই প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমাদের রাজা অন্য হিসাবে যাই হোন না, অর্থ ব্যয়ে তিনি কাতর নন, আর তোমার এই শ্বেতহস্তী যে রকম লোকচক্ষু আকর্ষণ করেছে, এর মূল্য সম্বন্ধে তিনি কার্পণ্য করবেন না মোটেই। এ দুর্লভ জিনিস নগরবাসীদের দেখবার সুযোগ দিয়ে তিনি সকলকে ধন্য করেছেন। সুন্দরীরা গবাক্ষের ভিতর দিয়ে তাদের সুন্দর হাত বাড়িয়ে কত সুস্বাদু খাদ্য দিচ্ছিল তোমার শ্বেত হস্তীটিকে, তাদের আনন্দের হাসি আর সভয় চীৎকার মিলে একটা দেখবার জিনিস তৈরী হয়েছিল। হাঁ, ভালো কথা! কোথা থেকে আন্‌লে একে? জীবিত অবস্থায় জানোয়ারটিকে নিয়ে আসতে বড় বেগ পেতে হয়েছিল বল?

ইন্দ্রজিত। তা' ঠিক! রাজার জন্যে যে সব জিনিস এনেছি এইটি তার মধ্যে সব চেয়ে দামী। মরে গেলে আমাকে ফতুর হতে হোত।

বসন্তক। কোন্ দেশ থেকে আন্‌লে?

ইন্দ্রজিত। কৃষ্ণবর্ণ জাতির দেশথেকে এনেছি। আরো অনেক সুন্দর মহার্ঘ্য রত্ন এনেছি, সেগুলো তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি বন্ধু।

বসন্তক। বড় দুঃসময় পড়েছে, বন্ধু। কর্জ্জ করে অর্থ সংগ্রহ করলেও তার একটারও মূল্য হবে না। দেখতে ইচ্ছা করে বটে,—কিন্তু দেখতেও আমার ভয় করছে তোমার রত্ন-সম্ভার।

ইন্দ্রজিত। তুমি যদি দয়া করে সেগুলো গ্রহণ করো বন্ধু, তা'হলেই আমি কৃতার্থ হব।

বসন্তক। এ তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়, ইন্দ্রজিত।

পুষ্পরাগ। উনি জানেন, প্রভু, যে, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, একদিন না একদিন সেগুলো উনি ফেরত পাবেন, আর আপনার কাছে ছিল বলে সে গুলোর মূল্য বহুগুণ বেড়ে যাবে।

ইন্দ্রজিত। (পুষ্পরাগের প্রতি) চিরকালই নীচু মন তোমার,—অভদ্র কোথাকার!

বসন্তক। ঠিক বলেছ, সখা ইন্দ্রজিত। নিজেকে প্রবঞ্চিত হ'তে দেওয়া মানব হৃদয়ের একটা সেরা জিনিস। সে জিনিস যাদের নেই; তাদের মন নীচু তো বটেই। আমি জানি যে তুমি আমার তোষামোদ কর। কিন্তু এটাও জানি চাটুবাদ না করলেও তুমি আমার সম্বন্ধে এখন যা বল তখনও তাই বলতে। কেন জানো? চাটুকারের প্রদত্ত সম্মানেও বসন্তকের ন্যায্য অধিকার আছে।

ইন্দ্রজিত। তোমার গর্ব্বও অতি সুন্দর! এমন আমি কখনো দেখি নি।

বসন্তক। তার কারণ আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে আমার নিজের পরিচয় যতটা ঘনিষ্ট অপরের তো সে রকম হ'তে পারে না। আমি জানি আমি কত ক্ষুদ্র। কিন্তু এদের মধ্যে তো আমি ছোট নই। তোমার ঐ শ্বেতহস্তী তার নিজের দেশে জঙ্গলের ভিতর প্রকাণ্ড গাছগুলোর মাঝখানে যখন দাঁড়িয়ে থাকতো তখন তো সে নিজেকে খুব উঁচু বলে কল্পনা করতে পারতো না, কিন্তু আজ যে সে এই মগধ নগরীর পথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিস্ময় দৃষ্টির মাঝখানে দর্শকদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, এখন সে নিশ্চয়ই নিজেকে খুব প্রকাণ্ড বলেই ভাবছে,—নয় কি?

ইন্দ্রজিত। তা' ঠিক। আর তোমার বাস্তবিক গর্ব্বিত হওয়াই উচিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মধ্যে তুমিই হোচ্ছ সর্ব্বপ্রধান। (পুষ্পরাগের ও অমিতাভের প্রতি) এই সব ভবঘুরেরা,—কেমন করে বিশ্বাস করে যে আমি তোমায় তোষামোদ করি? আর তুমিও তাই বিশ্বাস কর? কিন্তু জানো কি, বন্ধু, দূর দেশ থেকে যে সব বহুমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে এনেছি, রাজা রাজড়া ছেড়ে তোমায় উপহার দিচ্ছি সেগুলো, কেন? কারণ আমার চোখে তোমার কাছেই সেগুলো মানায় ভালো। তোমার চিত্রাগার বড় সুন্দর সাজিয়েছ। পারস্যের আস্তরণগুলো, আমি যা' এনেছি, তোমার জন্যে, এঘরে মানাবে বেশ। আর চন্দনকাঠের সিন্দুক, মুক্তাজড়িত মর্ম্মরের পেটিকা, যা'র ভিতর গুপ্ত খাপ আছে এমন ভাবে, যে বাইরে থেকে তা' বোঝবার জো নেই,—এসব কাদের জন্যে জান? যা'রা ভালবাসার ব্যবসা করে তা'দের—আর তুমিই তো এখন তাদেরই একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছ।

বসন্তক। ওঃ! তুমিও শুনেছ এই অর্থহীন মিথ্যা জনরব? না, আমার শিষ্যেরা, এই পুষ্পরাগ আর অমিতাভ—

ইন্দ্রজিত। না, না, মিথ্যা সন্দেহ তোমার। আমি শুধু তোমার চিত্রাগারের শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেহারার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছি। প্রণয়ের যাদু ছাড়া আর কিছুর দ্বারা কি এ সম্ভব! আমি কি তোমায় চিনি না, না, তোমার প্রতি আমার ভক্তি নেই, যে মিথ্যা অপবাদে কাণ দিব? তোমার আঁকা সেরা ছবিগুলোর মধ্যে অন্ততঃ কুড়িটা যে আমার শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে,—তা' কি তুমি জানো না?

বসন্তক। সেরা ছবি? কি বলছো তুমি? ওসব তো মক্‌সোর কাজ?

ইন্দ্রজিত। আচ্ছা, তোমার সব চেয়ে ভালো ছবি কোন্‌টা?

বসন্তক। সব চেয়ে ভালো? দেখ, ইন্দ্রজিত, আমার অতৃপ্ত বাসনা কেবলই ছুটেছে নিখুঁৎ যা' তারি সন্ধানে। কাজেই নিজের আঁকা হিজি-বিজিতে আমার প্রাণ শান্তি পাচ্ছে না। যদি লোকের প্রশংসা আমার লক্ষ্য হোত তাহ'লে এতদিনে অসীম ঐশ্বর্য্য অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হতে পারতাম,—এ আমি স্থির জানি। লোককে ঠকানো তো বিশেষ শক্ত কাজ নয়। কিন্তু

সে সৌভাগ্য আমি চাই না। আমি কাজ করে যাই শুধু আমার নিজের জন্যে,—অন্যে তা' বুঝুক আর না বুঝুক তাতে আমার বড় যায় আসে না।

ইন্দ্রজিত। কোন্ সুন্দরীর ছবি আঁকছো তুমি এখন, যে, তাঁর আবাহনের জন্যে তোমার চিত্রাগার এত সজ্জিত করে রেখেছ ? নিশ্চয় কোনো গুণবতী মহিলা হবেন তিনি।

বসন্তক। তা' জানো না তুমি ? শ্রেষ্ঠী গণপতির পত্নী দেবী মাধবিকার ছবি আঁকছি।

ইন্দ্রজিত। শ্রেষ্ঠী গণপতির পত্নী !

বসন্তক। হাঁ, মাধবিকা দেবী। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

ইন্দ্রজিত। নেই ? কত শত সুন্দরীর সেরা এ নগরে আছে ; যাদের রূপে চোখ ঝল্‌সে যায়,—তাদের ছেড়ে শেষে মাধবিকাকে বেছে নিলে ?

বসন্তক। সুন্দরী আছে বটে অনেক,—কিন্তু তাদের জীবনে তো রহস্য নেই ? তাদের জীবনের চিরন্তন ছোটখাটো ঘটনা কেই বা না জানে ? অমুক সুন্দরীর সুন্দর চরিত্র, অমুক সুন্দরীর জগদ্ধাত্রীর মতো রূপমাধুর্য্য, অমুক সুন্দরীর হিংসুটে স্বভাব, আর প্রায় সকলেরই একটা না একটা দোষ ;—এসব তো জানা কথা। এদের ছবি যে-কোনো চিত্রকরই তো তার তুলি দিয়ে তুলে নিতে পারে। কিন্তু মাধবিকা দেবী ! কতখানি রহস্য যে তাঁর মধ্যে আছে ! অনেকের কাছে তিনি এ নগরীর সতী শিরোমণি ; আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁর হৃদয় চাতুরীতে ভরা। অথচ এই দুটো জনরবের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, আর কোন্‌টা ঠিক নয় তা' কেউ জোর করে বলতে পারে না।

ইন্দ্রজিত। আর তুমি কি বল ? তোমার তো চোখ কাণ দুইই আছে।

বসন্তক। আছে বটে। কিন্তু মাধবিকা দেবীর সামনে চোখ আমার অন্ধ হয়ে যায়, কাণে কিছুই শুন্‌তে পাই না। যখন তাঁর ছবি আঁকি, একদিন মনে হয় তাঁর হৃদয়ের রহস্য বুঝতে পেরেছি, আবার ঠিক তার পরের দিন দেখি যেন অপর কোন মানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আহা সেই হাসি,—সেই প্রাণমাতানো হাসি। তাইতেই কি তাঁর অন্তরাত্মার প্রকাশ ! বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না। আমার তুলিকা সেই হাসিটিকে রঙের জালে বাঁধতে গিয়ে বারবার আছড়ে মরছে নিরাশার বেদনায়।

ইন্দ্রজিত। কিন্তু তুমি তো সবে ছবির পেছন দিকটা শেষ করেছ ? আচ্ছা, ওখানে সমুদ্র আঁকলে কেন ? হয়তো তোমার মাধবিকা দেবী কখনো সমুদ্র যাত্রা করেন নি,—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। আর মগধে সমুদ্র পেলে কোথা ?

বসন্তক। হাস্যময়ী সুন্দরীর চিত্র সমুদ্রের পাশে যেমন ফুটে ওঠে এমন আর কোনো দৃশ্যের পাশে ফোটে কি, বন্ধু ? সুন্দরীর হাসি,—ঠিক তারি মতো জিনিস সমুদ্র ছাড়া আর কি আছে ? সমুদ্র যখন হাসে, তার বুকের ওপর দিয়ে তখন তুমি পাড়ি দাও ; সুন্দরী হাসে, আর

অমনি তা'র হৃদয়ের সন্ধান নিতে ছোটো। সুন্দরীর হাসি যেমন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থাকে না, সমুদ্রের হাসিও ঠিক তাই। আর তুমি কি মনে করো, বন্ধু, মাধবিকা দেবীর যে ছবি আমি আঁকতে যাচ্ছি,—সেটা শুধুই একটি সুন্দরীর গৃহচিত্র; বন্ধুরা যা' হয়তো কখনো কখনো দেখবে আর দেখে 'মুখটা ঠিক আঁকা হয়েছে কি না,' 'সাড়ীটা ঠিক পাটে পাটে বেশ সুন্দরভাবে বসেছে কি না,' কিম্বা 'তাঁর পোষা হরিণটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে কি না,' এই সব খুঁটিনাটি নিয়ে নিজেদের মনোমত সমালোচনা করবে। জানি আমি, মাধবিকার ছবি দেখে শ্রেষ্ঠী গণপতি চক্ষু রক্তবর্ণ করবেন। তিনি একবার কাছ থেকে সেটা দেখবেন,—একবার দেখবেন দূর থেকে। একবার এদিককার আলোতে ধরবেন,—একবার ধরবেন ওদিককার আলোতে। কখনো বা ভুরুতে হাত ঠেকিয়ে দেখবেন এমনি করে,'—কখনো আবার হাতটাকে আরো নামিয়ে দিবেন আলো কমাবার জন্যে। এদিক ওদিক দুচারবার ঘাড়টা বেঁকাবার পর ভারী গলায় তিনি বিজ্ঞের মতো নিজের মত প্রকাশ করবেন;—হয়তো বলবেন,—"হুঁ হুঁ, আমার স্ত্রীর ছবি বটে, তবে একটু দোষ হয়েছে! মুখের ভাবটা ঠিক তার মতো ফোটে নি। তাই বা হবে কি করে' বল? আমি চব্বিশ ঘণ্টা তাকে দেখছি, তুমি তো আর তা' দেখনি। আমার স্ত্রী গম্ভীর প্রকৃতি,—তার মুখে হাসি নেই।" এমন কি, মাধবিকা দেবীও তাঁর ছবি দেখে হয় তো বলবেন,—"হাঁ, আমিই বটে। তবে বয়সটা বেশি দেখাচ্ছে। আর ছবির সাড়ীটিও আমার নয়,—বড় দামী ঠেকছে।" কিন্তু এসব সমালোচনায় কি যায় আসে? অনেক বৎসর পরে যখন গণপতি, মাধবিকা কিম্বা বসন্তক কেউ থাকবে না, যখন আমাদের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে এ পৃথিবীর বুক থেকে, সে সময় লোকে আমার এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলাবলি করবে,—"কি বিচিত্র হেঁয়ালী! এই হাস্যময়ী সুন্দরীর হাসির ভিতর কি রহস্যই না লুকিয়ে আছে? ও হাসি কি নির্ম্মল, না বিষময়? সতীত্বের আবরণে নিরাপদ যে প্রণয়, এ হাসি কি তারি প্রকাশ. না, কুচরিত্রা নারীর পুরুষ-মৃগয়ার প্রধান অস্ত্র এ? এই যে সুন্দরী,—কে বলতে পারে, এর জীবন বেশ নির্ম্মল সেবাব্রত ছিল, না, অপবিত্র কলুষিত জীবন নিজের ভারে নিজে নুয়ে পড়েছিল?" এই যে নানান্ সন্দেহ আমার ভবিষ্যৎ সমালোচকদের মনে তোলপাড় করবে, তার মধ্যে তারা এটাও বল্‌বে যে, বসন্তক শুধু মাধবিকা দেবীর চিত্র আঁকে নি,—সুন্দরীর হাসি,—যার গোপন অর্থ ধরা-ছোঁয়ার ভিতর থাক্‌তে পারে না,—সেইটে তুলির লিখনে ফুটিয়ে তুলে তার অন্তরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছে।

পুষ্পরাগ। প্রভু, দেবী মাধবিকার ভৃত্য দেবীর আদেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ চান।

বসন্তক। আচ্ছা, আস্‌তে বল।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। প্রণাম, ভদ্র।

বসন্তক। তোমার কল্যাণ হোক। তারপর; তোমার মনিবের কাছ থেকে আসছো? তিনি আজ বসতে পারবেন না বলে পাঠিয়েছেন নিশ্চয়।

ভৃত্য। তা' আমি বলতে পারিনা। এই পত্রে আপনি সমস্তই জ্ঞাত হবেন। আমাকে আপনার উত্তর নিয়ে যেতে হবে।

বসন্তক। (পত্র পাঠ করিয়া) চিঠিটা রসিকতায় ভরা। শোন, বন্ধুগণ। তাহ'লে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে যে, আমি প্রেমে পড়েচি। (পত্র পাঠ)

"সবিনয় নিবেদন,

আজ আপনার চিত্রাগারে গিয়ে আপনার সাহায্য করতে অক্ষম,—সে জন্যে ক্ষমা করবেন। আজ দু'বছর ধরে আপনি আমার ছবি আঁকছেন, কিন্তু আপনার কাজ এ পর্য্যন্ত বিশেষ অগ্রসর হয় নি! তাই এ নগরের যত নিন্দুকের দল আমার ছবি আঁকা নিয়ে নানান্ রকমের সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েছে। এ কথা আমার স্বামীর কাণে পৌছিয়াছে। আর আপনার ওপর তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আমার ওপর গভীর বিশ্বাস থাকা সত্বেও, তিনি বেশ রাগ করেছেন দেখছি। সব চেয়ে দুঃখ আমার এই যে, আপনি কখনোই আমার ছবি আঁকা শেষ করতে পারবেন না। তা' যাক। আমার পক্ষে আপনার ওখানে যাওয়া সম্ভবপর হবে না বটে; কিন্তু আমি আমার ভৃত্যকে পাঠাচ্ছি আমার বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে। লোকে বলে,—এবং জোর করেই বলে যে, আমার ভৃত্য ঠিক আমারি মতো দেখতে। এ কথা সত্য কিনা, চিঠির উত্তরে আপনি আমাকে জানাতে পারেন। যদি লোকের কথা সত্য হয়, অর্থাৎ যদি আমার ভৃত্য আমারি মতো দেখ্‌তে লাগে আপনার চোখে, তাহ'লে এই নকল মাধবিকার ছবি এঁকে আমার চিত্র সম্পূর্ণ করুন। আর যদি চেহারার কোনো অংশে আমাদের দুজনের মধ্যে গরমিল থাকে, আপনার স্মৃতি ও কল্পনা থেকে সেটা মানিয়ে নিতে পারবেন। আপনি আমার মুখ ও হাবভাব এতকাল ধরে শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখে আস্‌ছেন যে, ছবি আঁকার সময় আমার থাকা অনাবশ্যক। যদি খুবই বিপদে পড়েন এ নিয়ে, তা' হ'লে আমার চেহারাটা স্মরণ করে সেই স্মৃতির দ্বারা নিজের কাজ সেরে নিবেন।" (বন্ধুদের প্রতি) তোমরা কি বল?

পুষ্পরাগ। এই বালক ভৃত্য যেন তার মনিবের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

অমিতাভ। দুজনের মধ্যে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই।

বসন্তক। (ভৃত্যের প্রতি) তোমার মনিবঠাকরুণের চিঠি শুনলে। তা হ'লে তোমারি ছবি আঁকতে হবে আমায়।

ভৃত্য। সেকি?

বসন্তক। অমিতাভ, পুষ্পরাগ, তা হ'লে একে সাজঘরে নিয়ে যাও।

অমিতাভ। (ভৃত্যের প্রতি) এস। গুরু বসন্তক তোমার মনিবঠাকরুণের খেয়াল বজায় রাখবেন। (অমিতাভ, পুষ্পরাগ ও ভৃত্যের প্রস্থান)

ইন্দ্রজিত। বসন্তক, তুমি যখন কাজ কর তোমার চিত্রাগার গীতবাদ্যে মুখর করে তোল।

বসন্তক। দেবী মাধবিকার মনে সুখ দিতে পারে এমন সব জিনিষ দিয়ে আমার এই ছোট ঘরখানি ভরিয়ে রাখি। কেন না, আমি চাই, তাঁর সেই চিরন্তন হাসির রেখা তাঁর মুখে ফুটে থাকুক! যা দেখ্‌লে সুখ, যা শুন্‌লে সুখ—মধুর সুর, ফোয়ারার জলে ইন্দ্রধনুর রঙের খেলা, পাখীর প্রাণমাতানো গান, ছোট ছোট হরিণের নাচের পর নাচ,—সব দিয়ে তাঁকে আমি ঘিরে দিই,—আর সব চেয়ে বেশি তাঁকে ঘিরে রাখে আমার ভালবাসা। যে ভালোবাসার ওপর মর্ম্মান্তিক আঘাত করতে দেবীর অভিলাষ। তিনি তো জানেন না, জানবেন নাও কখনো যে, বসন্তক চিত্রকলাকে যেমন ভালোবাসে কোনো সুন্দরীকে তেমন ভালো সে কখনো বাসেনি।

(অমিতাভ, পুষ্পরাগ ও দেবী মাধবিকা বেশে সজ্জিত ভৃত্যের প্রবেশ।)

পুষ্পরাগ। দেবী মাধবিকা এসেছেন।

বসন্তক। (বিস্মিত ভাবে ভৃত্যের প্রতি) তুমি!

অমিতাভ। আশ্চর্য্য মিল, নয়?

পুষ্পরাগ। নিশ্চয়। কে বলবে যে দেবী মাধবিকা নয়?

বসন্তক। দেবী মাধবিকা তুমি,—না তার ভৃত্য? কে তুমি? কথা কও! না, তাতে কি হবে? হাস যেমন তিনি হাসেন। আজকের আগে নারী হৃদয়ের রহস্য বুঝতে পারিনি আমি। হাসো,—বসন্তক তোমার হাসিটিকে অমর করে রাখবে। (সুগন্ধ বাতাসে মধুর অস্পষ্ট একটা সুর ভেসে বেড়াতে লাগলো। বসন্তক তুলি-হাতে ছবির কাছে গেলেন।)

যবনিকা

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল

স্মৃতি-পূজা

ভীমকান্ত সমুচ্চয় গুণ সমবায়ে
ছিলে তুমি আশুতোষ পুরুষ-ললাম—
প্রকৃত মানুষ!—না, না, প্রকৃত দেবতা!
আছিল অন্তর তব শিরীষ পেলব—
বাহিরে যদিও ছিলে শার্দ্দূল প্রকৃতি!
তা' না' হ'লে তুমি দেব এ বিষম যুগে
প্রাচীন বিন্ধ্যের মত—অগস্ত্য যখন
আসেনি করিতে তার গৌরব লাঘব!—
পারিতে কি দাঁড়াইতে? পারিতে কি কভু
চরিত্র-বিভূতি নিষ্ঠা মনীষার বলে
ঐরাবত সম বাধা বিঘ্ন রাশি রাশি
ভাসাইয়া দিতে পূত কর্ম্মের প্রবাহে?
স্বদেশে বিদেশে কিংবা সমাজে বা গেহে
ধর্ম্মাধিকরণে কিংবা পূত বিদ্যাপীঠে—
সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা নিজ অক্ষুণ্ণ অটুট
রেখেছিলে তুমি! তব প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ
থাকিত না—থাকিতে যে পারিত না কভু!
প্রতিজ্ঞায় ছিলে ভীষ্ম, জ্ঞানে বেদব্যাস,
ছিলে কর্ম্ম-ক্ষমতায় ক্ষত্রিয় অগ্রণী।
এ দিকে আছিলে তুমি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ—
অথচ উদার-পন্থী—সত্যের সাধক,
আশ্রিতবৎসল দাতা—দয়ার সাগর।
দুর্ভাগ্য এ বাঙালার গেছ তুমি চলে'।
আবার তোমার মত জন্মিবে কি কেহ?
আজি তব তিরোধান-বার্ষিক বাসরে
দরিদ্র এ বঙ্গ কবি ছন্দোবন্ধহীন
ভাষায় রচিয়া অর্ঘ্য—ভক্তি প্রেরণায়
উদ্দেশে চরণে তব করিছে অর্পণ!
আর কিছু নাই চায় একবার শুধু
চাহ দূর স্বর্গ হ'তে করুণ নয়নে
তার পানে—হইবে সে পূর্ণমনোরথ!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় মুদ্রা-সমস্যা

বর্ত্তমান কালে ভারতীয় রাষ্ট্রে এবং সমাজে যে কয়েকটি সমস্যার সংবিধান আশু প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুদ্রা সম্বন্ধীয় সুব্যবস্থা অন্যতম। সমাজ-জীবনে এমন এক যুগ ছিল যখন মুদ্রার অস্তিত্বমাত্র ব্যতিরেকেও ব্যবসায় বা বিনিময় অসম্ভব ছিল; কিন্তু সে যুগ বহুকাল পূর্ব্বে অতীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কি জাতীয় রাষ্ট্রে, কি আন্তর্জ্জাতিক সংঘে, ব্যবসায় বা অন্য প্রকার আদান প্রদানে, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, মুদ্রা বা তাহার প্রতিরূপ নোট, চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি, প্রধান অবলম্বন। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বহুল অংশ, আনীত এবং প্রেরিত দ্রব্যের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইলেও, সেই আমদানী এবং রপ্তানীর দ্রব্যের মুল্যের পরিমাপ মুদ্রার সাহায্যেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; এবং শেষ মণ বা প্রাপ্তির সমাপ্তি মুদ্রার সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং জাতীয় মুদ্রার কার্য্য দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। জাগতিক বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতির মুদ্রার ন্যায়, আমাদের এই ভারতীয় মুদ্রার কার্য্যও আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জ্জাতিক; এবং ইহার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার পরিমাপ, উপরোক্ত দুই বিষয়ে ইহার কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করে।

সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি, আধুনিক কালেও, অনেকের মতে, সাধারণ জনপদ হইত বিভিন্ন এবং মহাদেশের সহিত তুলনীয়। পুরাকালে যখন এই হিন্দুস্থান বহুসংখ্যক রাষ্ট্রখণ্ডে বিভক্ত ছিল, তখন প্রত্যেক নরপতির মুদ্রাকে শুধু যে তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কার্য্যই করিতে হইত তাহা নহে, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বর্ত্তমান কালের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অনুরূপ, যে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহাতেও ব্যবহৃত হইতে হইত। তাহার পর মুসলমান আমলেও যখন প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মোগল সম্রাট-গৌরব আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল, তখন সামন্ত নৃপতিবর্গের প্রাদেশিক মুদ্রাগুলি সাম্রাজিক আকবরী মুদ্রার সহিত প্রচলিত থাকিয়া ভারতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায়তা করিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনের সময় তাহার পর প্রায় শতাব্দ কাল ধরিয়া, ব্রিটিশ-ভারতীয় মুদ্রার সহিত বহুপ্রকার দেশীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল; এবং অধুনাও হিমালয় কুমারিকা ব্যাপী ব্রিটিশসাম্রাজ্যে কর্তৃত্বাধীন করদমিত্র রাজন্যবর্গের অনেকে স্বরাষ্ট্রীয় বিশেষ মুদ্রার প্রচলন বজায় রাখিয়াছেন। তবে জাগতিক বাণিজ্যে এবং সমগ্র ভারতব্যাপী বাণিজ্যে এই সকল সামন্ত নৃপতির মুদ্রাগুলির কোন স্থান নাই; এবং ব্রিটিশ সাম্রাজিক মুদ্রার প্রতিপত্তি করদ মিত্র রাষ্ট্রগুলিতে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ রাষ্ট্রীয় মুদ্রাও ক্রমশঃ নগণ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের কার্য্য এক্ষণে কেবলমাত্র স্ব স্ব রাষ্ট্রের পরিসরের মধ্যেই নিবদ্ধ। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রা বলিলে ব্রিটিশ রাজশক্তির মুদ্রিত সাম্রাজিক মুদ্রা 'টাকার' উল্লেখ হইতেছে বুঝিয়া লইতে হইবে।

১৮৩৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ভারতের ইংরাজ

শাসনকর্ত্তৃগণ স্বর্ণ এবং রৌপ্য, উভয় প্রকারের মুদ্রারই অবাধ প্রচলন বজায় রাখিয়াছিলেন। ঐ বৎসর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে স্বুবর্ণমুদ্রার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের দাবী রহিত করিয়া, প্রচলিত বিভিন্ন ওজনের এবং মূল্যের রৌপ্যের টাকার স্থলে বর্ত্তমান কাল প্রচলিত ১ তোলা ওজনের (১৬৫ গ্রেণ রৌপ্য+১৫ গ্রেণ খাদ) রৌপ্য মুদ্রা—টাকাকে—রাজশক্তির অনুমোদিত এবং আদান প্রদানে অবশ্য গ্রহণীয় মুদ্রাতে পরিণত করা হয়। সুতরাং ১৮৩৫ সালে ভারতীয় মুদ্রার পক্ষে একটা যুগান্তর কাল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; কেন না ঐ বৎসর, ভারতের চিরপ্রচলিত সুবর্ণ মুদ্রাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রৌপ্য মুদ্রাকে একেশ্বরভাবে রাজত্ব করিতে দেওয়া হয়। ১৮৩৫ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত রৌপ্যমুদ্রার এই অবাধ রাজত্ব বজায় থাকে; এবং ১৮৬১ সালে এই রৌপ্য মুদ্রার প্রতিরূপ গর্ভমেণ্টের 'নোট' ইহার সাহায্যকারী-রূপে আবির্ভূত হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে পুরাতন ভারতীয় বা বৈদেশিক নূতন আমদানী সুবর্ণ মুদ্রার মোহর, গিনি প্রভৃতির প্রচলন যে একবারে ছিল না, তাহা নহে কিন্তু রাজবিধি অনুসারে আদান প্রদানে তাহাদের গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না; এবং এই সময়ে পয়সা প্রভৃতি অন্য যে সকল স্বল্পমূল্যের খণ্ডমুদ্রার প্রচলন ছিল, তাহারাও রৌপ্যমুদ্রা টাকাকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুগতভাবে কার্য্য করিত ও তাহাদের অবাধ গ্রহণও বাধ্যতামূলক ছিল না। সুতরাং ইহা বেশ বলিতে পারা যায় যে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এ দেশে রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রাসম্বন্ধীয় যাবৎ কার্য্যের কর্ণধারস্বরূপে বিরাজ করিয়াছিল।

দেশের আভ্যন্তরীণ কার্য্যে এই রৌপ্যের টাকার উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে প্রথমেই মনে হইবে যে, ইহাতে দেশের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। কেন না, মুদ্রার প্রধান সার্থকতা আদান প্রদানে মধ্যবর্ত্তীরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দেওয়ার উপর নির্ভর করে। বহুমূল্য সুবর্ণেরই হউক, রৌপ্যেরই হউক বা তুচ্ছ মূল্যের কাগজেরই হউক যে মুদ্রাকে সাধারণে নিঃসন্দেহে এবং বিনা বাধায় আদান প্রদানে ব্যবহার করিতে পারে তাহাই উৎকৃষ্ট মুদ্রা। এদেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন বহুযুগব্যাপী; তদ্ব্যতীত এই সুলভ দেশে অনেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে স্বল্পমূল্যের রৌপ্যমুদ্রা সুবর্ণমুদ্রার অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আদান প্রদানের অপর একটা দিক আছে যেখানে সব দেশেই রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা সুবর্ণ মুদ্রার সার্থকতা অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ধনের পরিমাপ মুদ্রার অন্যতম প্রধান কার্য্য; এবং এই পরিমাপের 'মাপকাঠি'-রূপে ব্যবহৃত মুদ্রার নিজের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অত্যন্ত গোলযোগের বিষয়। যাহাকে আমরা দীর্ঘতা নির্দ্দেশে অবলম্বন করি সেই 'গজ' কাঠিটির পরিমাণ যদি সময় বিশেষে বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা হইলে দীর্ঘতার পরিমাপ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেইরূপ এক টাকায় আজ যদি পাঁচ সের চাউল হয় এবং একমাস পরে যদি দশসের চাউল হয়, তাহা হইলে আজ যে কৃষক এক টাকা ঋণ করিয়া পাঁচসের চাউল উপভোগ করিয়াছে একমাস পরে ঐ এক টাকার দেনা শোধের জন্য তাহাকে

দশ সের চাউল বিক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাকে দ্বিগুণ দ্রব্য দিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সুতরাং মুদ্রার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে।

মুদ্রার মূল্য যে তাহার উপাদান স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে, সে কথা বলাই বাহুল্য। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া দেখা গিয়াছিল যে, ঐ সময়ের মধ্যে রৌপ্যের মূল্যের যত হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছিল, স্বর্ণের মূল্যের তত হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণে ক্রমে ক্রমে ইয়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই রৌপ্যের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ দ্রব্যাদির মূল্যের মাপকাঠিরূপে এবং মুদ্রা সম্বন্ধীয় কার্য্যের কর্ণধাররূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বেশ বলিতে পারা যায় যে, সুবর্ণমুদ্রা যে রৌপ্য মুদ্রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা ইতিহাসের সাক্ষ্যে এবং অর্থবিজ্ঞানের যুক্তিতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে এবং এই কারণেই ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রাকে সুবর্ণমুদ্রার প্রতিরূপ রূপে চালাইতে হইয়াছে, অর্থাৎ টাকাকে তাহার প্রকৃত উপাদান রৌপ্যের মূল্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া সুবর্ণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইয়াছে।

উপরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে রৌপ্যমুদ্রার উপযোগিতার কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ইহার কার্য্যকারিতার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে সম্পৃক্ত দুই বা বহু দেশের মধ্যে যদি এক জাতীয় মুদ্রার প্রচলন থাকে তাহা হইলে আমদানী বা রপ্তানির শেষ দেনা পরিশোধের সুবিধা হয়। একদেশ হইতে প্রয়োজনমত অন্যদেশে মুদ্রা পাঠাইবার যে খরচ, বাটার পরিমাণ তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ভারতে এবং বিলাতে যদি একই সুবর্ণমুদ্রা গিনির প্রচলন থাকে এবং যদি এক গিনি পাঠইবার বা আনিবার খরচ ১ পেনি হয়, তাহা হইলে ঐ দুই দেশে এক 'গিনি'র আন্তর্জ্জাতিক মূল্য কখন ১ গিনি+১ পেনির অধিক বা ১ গিনি−১ পেনির অল্প হইতে পারে না। কিন্তু যদি উভয় দেশে একজাতীয় মুদ্রার প্রচলন না থাকে, যদি ভারতীয় মুদ্রা রৌপ্যের হয় এবং ইংলণ্ডের মুদ্রা স্বর্ণের হয়, তাহা হইলে দুই দেশে মুদ্রার আদানপ্রদানে একটা বিষম 'বাটাবিভ্রাটে'র সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। হয়ত রৌপ্যের 'সাধারণ' মূল্য (অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাপে) হ্রাস হইতেছে, তখন সুবর্ণের 'সাধারণ' মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে উভয় দেশেরই ব্যবসায় বাণিজ্য এবং মুদ্রা সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য বিশেষ অসুবিধা এবং অনিশ্চিততার মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং অযথা ক্ষতি বা অন্যায্য লাভ ঘটিবার সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান থাকে। যে ব্যক্তি বিলাত হইতে ১ গিনির দ্রব্য ধারে আনাইয়া সেই সময়ে ১ গিনির মূল্যের অনুপাত ১৫ টাকায় সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে, তাহার ঋণ পরিশোধকালে যদি ১ গিনির জন্য ১৭৲ টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে এই বাটাবিভ্রাটের দরুণ তাহাকে যে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

ভারতে রৌপ্যমুদ্রার এবং ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকাতে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে; ইংলণ্ডকে দেয় রাষ্ট্রীয় ব্যয় (হোম চার্জ্জ) সম্বন্ধে, ইংরাজরাজকর্ম্মচারিগণের ও অন্যান্য

প্রবাসী ইংরাজগণের উপার্জ্জনের যে অংশ বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক বিষম বাটাবিভ্রাট ঘটিয়া উঠে। টাকা এবং গিনির বিনিময়ের হার প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হওয়াতে উভয় দেশের সম্পৃক্ত অর্থীপ্রত্যর্থীরা অত্যন্ত ক্ষতিকর অনিশ্চিততার মধ্যে আসিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই বাটা-বিভ্রাট নিবারণের জন্য একাধিক অনুসন্ধান সমিতি সৃজিত হয় ; এবং ১৮৯৯ সালে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে (১) ১৮৩৫ সালের ব্যবস্থা রদ করিয়া দেশে বাধ্যতামূলক স্বুবর্ণমুদ্রা ক্রমশঃ প্রচলিত করিতে হইবে; (২) এই সুবর্ণমুদ্রা নামে, আকারে, এবং মূল্যে বিলাতী গিনির (সভারেণ বা পাউণ্ড) সহিত অভিন্ন হইবে এবং ইহাই ভারতীয় আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের মূল্যের একমাত্র 'মাপকাঠি' হইবে; (৩) ভারতে সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য টঙ্কশালা স্থাপিত হইবে। রৌপ্যমুদ্রার অবাধ এবং বাধ্যতামূলক প্রচলন থাকিবে বটে কিন্তু তাহার নিজের কোন প্রকৃতিগত মূল্য থাকিবে না, তাহা কেবল মাত্র সুবর্ণমুদ্রার প্রতিরূপরূপে কার্য্য করিবে; অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত টাকার মূল্যের (দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতার) হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। যেমন দশ টাকার একখানা নোটের সহিত তাহার আধার কাগজ খানার প্রকৃত মূল্যের কোন সম্পর্ক থাকে না এবং তাহা রাজবিধির বলে দশ টাকার প্রতিরূপ বলিয়া অবাধে গৃহীত হয়, সেইরূপ একটি টাকার সহিত তাহাতে যে রৌপ্য আছে তাহার মূল্যের কোন সম্পর্ক থাকিবে না এবং টাকাটি সর্ব্বদাই আইনের বলে একটি গিনির $\frac{1}{15}$ প্রতিরূপ বলিয়া (১৫৲=১ গিনি) গৃহীত হইবে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৮ সাল হইতে বহুকাল ধরিয়া এক টাকা ষোল আনার সমান হইলেও উহার ভিতর যে রৌপ্য থাকে তাহার মূল্য দশ আনা এগার আনার অধিক কখনও হয় নাই। যাহাতে টাকার মূল্য সর্ব্বদাই গিনির মূল্যের $\frac{1}{15}$ থাকে, অর্থাৎ যাহাতে এক টাকা বিলাতের সহিত আদান প্রদানে সর্ব্বদাই ১ শিলিং ৪ পেনির সমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাধারণের পক্ষে রৌপ্যের অবাধ মুদ্রণের অধিকার রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৮৩৫ সাল হইতে টাঁকশালে রৌপ্য এবং নামমাত্র বাণী দিয়া যে টাকা প্রস্তুত করাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে এবং দেশে টাকার 'চাহিদা' অনুসারে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং যখনই বাজারে এক টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা হইত, তখনই তাহার মুদ্রণ রহিত করিয়া রাজস্ব প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে টাকা গভর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে আসিয়া পড়িত তাহার পুনর্বহির্গমন রোধ করিয়া, দেশের আভ্যন্তরীণ আদান প্রদানে টাকার আইন-নির্দ্ধারিত মূল্য বজায় রাখিবার ব্যবস্থায় সতর্ক থাকিতেন। আন্তর্জ্জাতিক আদান প্রদানেও যাহাতে টাকার নির্দ্ধারিত মূল্য (১ শিলিং ৪ পেনি) সর্ব্বদা বজায় থাকে তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। মুদ্রিত রৌপ্যের (টাকার) মূল্য রৌপ্য ধাতুর মূল্য অপেক্ষা অধিক করিয়া দেওয়াতে প্রতি টাকায় গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট লাভ থাকিত।

এই উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে একটি ভাণ্ডার সংগঠন করা হইয়াছিল। যখন আন্তর্জ্জাতিক আদান প্রদানে টাকার বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা কম হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হইত, অর্থাৎ যখন টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত, তখন গভর্ণমেণ্ট এই " স্বুবর্ণ বিনিময় হার সংরক্ষক " ভাণ্ডার হইতে ক্ষতিপূরণ দিয়া টাকায় ১ শিলিং ৪ পেনি মূল্য বজায় রাখিতেন। (যদি আমদানী রপ্তানীর গতিতে বা অন্য কোন কারণে ভারত হইতে বিলাতে দেনা পরিশোধের জন্য স্বুবর্ণ মুদ্রা প্রেরিতব্য হইত এবং যদি ১৫৲ দিলে এক গিনি বাজারে না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৫৲ টাকা জমা দিলে তাঁহারা বিলাতে ১ গিনি স্বর্ণ পরিশোধের ভার গ্রহণ করিতেন। ইহার ফলে সময়ে সময়ে গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় দেনাদারগণের নিকট ১৫৲ ১৬৲ বা ১৭৲ টাকা মূল্যের গিনি সংগ্রহ করিয়া বৈদেশিক দেনা শোধ করিতে হইত। এইরূপ করাতে যে ক্ষতি হইত পূর্ব্বোক্ত ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ হইতে তাহার পূরণ হইত। আবার যদি কখন ১৲ টাকার স্বুবর্ণ মূল্য (বিনিময়ের হার) ১ শিলিং ৪ পেনি অপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা হইত তবে বিলাতে ১ শিলিং ৪ পেনি জমা দিলে গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ১৲ টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিতেন)।

উপরোক্ত দুইটি ব্যবস্থার ফলে ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত টাকার আইন নির্দ্দিষ্ট স্বুবর্ণ মূল্য (বিনিময়ের হার) ১ শিলিং ৪ পেনি বজায় ছিল। কিন্তু ইহার জন্য ১৯০৭-৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টকে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ হইতে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। আবার যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতের রপ্তানীর রোধ হওয়াতে এবং এ দেশ দেনাদার হইয়া পড়াতে এই বিনিময়ের হার রক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এত অর্থনাশ করিয়া যুদ্ধকালের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির মধ্যে নির্দ্ধারিত বিনিময়ের হার (টাকার স্বুবর্ণ মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি) বজায় রাখা সাধ্যায়ত্ত রহিল না।

যুদ্ধের সময়ে সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতে টাকার সংখ্যা বাড়াইতে হয়। আবার সেই সময়ে নানা কারণে রৌপ্যের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। স্বুতরাং রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত যে লাভ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা বাহির হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে প্রতি টাকার মুদ্রণে লোকসান হইতে আরম্ভ হয়। (অর্থাৎ ১৲ টাকার বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৪ পেনি হইলেও তাহার আধাররূপী যে রৌপ্য তাহার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি বা আরও অধিক হইয়া পড়িয়াছিল।) এই ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক হইয়া পড়িল যে, অবশেষে গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্ধারিত বিনিময়ের হার ত্যাগ করিয়া টাকার নূতন স্বুবর্ণ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইল। এই নূতন হার ১ শিলিং ৪ পেনি হইতে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে ১৯২০ সালে ২ শিলিংএ গিয়া পৌঁছিল। অর্থাৎ এক গিনির আইন-নির্দ্ধারিত মূল্য ১৫৲ হইতে ১০৲ টাকায় আসিয়া পৌঁছিল। এখনও আইনতঃ এই মূল্যই বজায় আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ নাই। কারণ যুদ্ধের পর রৌপ্যের মূল্য

কমিয়া যাওয়াতে টাকার প্রকৃত (ধাতুগত) মূল্য কমিয়া গেল এবং বাজারে ১০৲ টাকাকে ১ গিনির সমান (১৲=২ শিলিং) বলিয়া কেহ গ্রহণ করিতে চাহিল না। গভর্ণমেণ্ট কিছুকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট হার (১৲=২ শিলিং) বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন। অর্থাৎ ১০৲ টাকা লইয়া বিলাতে ১ গিনির ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা লোকসান হইয়া গেল। পরিশেষে এই নির্দ্ধারিত হার বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং টাকার বিনিময়ের হার বাজারের উপর অনিয়ন্ত্রিত ভাবে নির্ভর করিল। এখনও সেইরূপ চলিতেছে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বর্ত্তমান ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য কয়েকটি সংগৃহীত হইতে পারে।—(১) রৌপ্যের টাকা দেশের আভ্যন্তরীণ আদান প্রদানের প্রধান অবলম্বন। (২) টাকার নিজের (ধাতুগত) কোন মূল্য নাই; ইহা বিলাতী স্বর্ণমুদ্রার গিনির বা সভারেণের—খণ্ড প্রতিরূপ মাত্র এবং তাহার মূল্যের উপর ইহার মূল্য নির্ভর করে। (৩) আইন অনুসারে ইহার বিনিময়ের হার ১৲=২ শিলিং অথবা ১ গিনি=১০৲; কিন্তু বাজারে এই হার বজায় নাই। (৪) এই বিনিময়ের হার এক্ষণে বাজারে টাকার 'চাহিদার' উপর নির্ভর করিতেছে, এবং বিলাতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইয়া তাহার প্রতিরূপ "ষ্টারলিং" নোটের প্রচলন হওয়াতে টাকার বিনিময়ের হার বিলাতের নোটের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে এবং কমিতেছে।

এই অনিশ্চিত অবস্থা যে সন্তোষজনক নহে সে বিষয়ে দ্বিমত নাই; কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন ১৮৯৮ সালের নিয়মের (১৲= ১ শিলিং ৪ পেনি হারের) পুনঃ প্রবর্ত্তন প্রয়োজনীয়; আবার অনেকে মনে করেন ভারতে স্বর্ণের মুদ্রণ এবং তাহার অবাধ প্রচলন ব্যতিরেকে এ দেশে মুদ্রা সম্বন্ধীয় গোলযোগ নিবারণের কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাস হইতে মনে হয়, ১৮৩৫ সালে যখন এ দেশের চির-প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাকে বাতিল করিয়া রৌপ্যকে আদান প্রদানের মূল্যের একমাত্র 'মাপকাঠি' করা হয়, তখন হইতে যত গোলযোগের সূত্রপাত। তাহার পর আবার ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৯ সালের মধ্যে পুনরায় স্বর্ণকে মূল্যের "মাপকাঠি" বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড করিয়া তোলা হয় বটে কিন্তু দেশের আদান প্রদানে তাহার অবাধ প্রচলনের বা মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; সুতরাং স্বর্ণমুদ্রা নামে মাত্র ভারতের প্রধান মুদ্রা হইলেও অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে তাহার প্রতিরূপ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনই পূর্ব্ববৎ বজায় থাকে এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে এই রৌপ্যের 'টাকার' অপ্রকৃত মূল্য (১৲=১শিলিং ৪ পেনি) বজায় রাখিবার জন্য একটা জটিল ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থায় ভারতীয় মুদ্রা সমস্যার সুমীমাংসা হয় নাই এবং এ সম্বন্ধে এই দুর্ভাগ্য দেশ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে "তিমিরে" ছিল এখন আবার সেই তিমিরেই আসিয়া

পড়িয়াছে। সুতরাং এ কথা মনে করা অসঙ্গত নহে যে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ব্যতীত এই গোলযোগের মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই সুবর্ণ মূল্যের মাপকাঠি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; ভারতবর্ষের সহিত সেই সকল দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে; সুতরাং এ দেশেও সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন হইলে এ দেশের সহিত সেই সকল দেশের "বিনিময়ের হার" সম্বন্ধে গোলযোগের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যাইবে। রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির যত সম্ভাবনা সুবর্ণের মূল্যের তত নহে বলিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সুবর্ণমুদ্রাকে অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

ছিটে-ফোঁটা

বোকারাম—বকু বাবুটি আস্ত বোকারাম; তিনি ভাবেন, তিনি বুদ্ধিমান বড় মানুষ, আর আমি নাকি আহাম্মক ও ছোটলোক। বকুবাবু অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, আর সেই টাকা কিসে চুরি না যায় তাহার জন্য প্রথমে গড়িলেন ইট-পাথরের পাকা বাড়ী, আর সেই বাড়ীতে রাখিলেন লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া টাকা ও ঘরে চাবি দিয়া রাখিলেন নানা রকম আহার্য্য সামগ্রী। তবুও সে সব চুরি যাওয়ার ভয়ে বাবুর শান্তি নাই,—তিনি বাড়ীতে দর্ওয়ান রাখেন ও রাত্রে চাবি দিয়া বাহিরের ফটক বন্ধ করেন! আমার এ সব দুশ্চিন্তা নাই,—আমি টাকাও পুষি না, ধান-চালও রাখিনা, পাকা বাড়ী ঘরও করবার দরকার হয় না। আমি আনন্দে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাবুর বাড়ীতে গিয়া কাঠ কাটি, জল তুলি ও কাজ করিয়া দেখাই যে বাবু দুর্ব্বল শরীরে তাঁহার প্রয়োজনের যে কাজ করিতে পারেন না আমি সবল শরীরে তাহা করিতে পারি; আমি আনন্দে স্বাস্থ্য বাড়াই, আর আমার যে টাকা বোকা বাবুদের ঘরে ঘরে সঞ্চিত আছে, তাহা প্রয়োজনমত নিয়া থাকি! পৃথিবীর বাজারে দোকানে দোকানে আমার জিনিষ পত্র মজুদ আছে ও সেগুলি রক্ষা করার চিন্তা আমার নাই। সকল দোকানদারেরা আমার চাকর, অথচ প্রতি মাসে মাহিনার টাকার জন্য আমাকে বিরক্ত করেনা। আমার যখন যে জিনিস যতটুকু দরকার হয়, তাহা আমার চাকরদের দোকান হইতে আনি, আর সেই সময়ে চাকরদের মাহিয়ানা বাবদে কিছু কিছু দিয়া থাকি। পৃথিবীর সকল সম্পদ আমার, কাজেই আমি বড়লোক; প্রয়োজনমত চাকরদের মাহিয়ানা বাবদে কিছু কিছু দিলে আমার দরকারের জিনিস আমি নির্ভাবনায় পাই। আমি নিরাপদ ও বুদ্ধিমান্, আর বকুবাবু যখন ভূতের বোঝা বহিয়া দুর্ভাবনায় সময় কাটান, তখন তিনি আস্ত বোকারাম।

চালাক ছাত্র—বিদ্যালয়ের গুরু তাঁহার ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে গ্রীষ্মকাল হয় কেন? ছাত্র উত্তর দিল যে, ঐ সময়ে গ্রীষ্মের তাপ না বাড়ীলে বিদ্যালয় বন্ধ হয় না বলিয়া গরম পড়ে। গুরু বলিলেন যে, মাঘ মাসে গ্রীষ্ম হইলেও ত সে সময়ে ছুটি দেওয়া যাইতে পারিত। ছাত্র বলিল, তাহাও কি হয়? মাঘ মাসে গ্রীষ্মকাল হইলে যে কেবল আমের বোলগুলিই পাকিয়া যাইত,—আর পাকা আম মিলিত না।

অমর হইবার উপায়—সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনি নাকি তুক্ তাক্ করিয়া মানুষের মরণ বন্ধ করিতে পারেন? আমাকে অমর করিয়া দিন্ না? "আচ্ছা, ভক্ত! তোমাকে অমর করিয়া দিব,—আমার দক্ষিণা ও প্রণামীর টাকা দাখিল কর। তুমি পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, তুমি আর মরিবে না"। সেত ভাল কথা, ঠাকুর; তবে দক্ষিণা ও প্রণামীর টাকাটা পরীক্ষার পরে দিলেই ভাল হয়; যে দিন দেখিব আমার আর মরণ হইল না, সেই দিন আপনার দক্ষিণা ও প্রণামী কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিব।

সন্ন্যাসী হাই তুলিয়া ধ্যানে বসিলেন।

প্রশ্নোত্তর—(১) গোবর্দ্ধন মাষ্টার ছেলে পড়ানো ছাড়িয়া ডাক্তারি ধরিল কেন? বেতের আঘাতে শিশুরাও মরে না,—তাই। (২) লোকে বলে, চোরায় না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী; কেন? চোরেদের দিনের বেলায় ঘুমাইতেই হয়; রাত্রে সে কাহিনী শুনিতে বসিলে ঘুম পাওয়ার ভয় আছে। (৩) লোকে বলে, উকিলের কাঁচা পয়সা; কেন? উহারা মকর্দ্দমার ফল পাকিবার আগেই পয়সা আদায় করে বলিয়া। (৪) চোরেরাই ডাকে হাঁকে; চুরি করিলে কি ডাকাত নাম পায়? না; তাহা হইলে ত সাধু ও মহাজনেরা সেই নাম পাইত। (৫) ধার্ম্মিকেরা সদাই হরি হরি বলেন কেন? উঁহাদের কপটতা নাই,—যাহা করেন তাহাই বলেন। (৬) গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে হয় কেন? সকলসময় বয়স্কদের ঘাড় পর্য্যন্ত হাত পোঁছায় না বলিয়া। (৭) ছিদামবাবু বলেন তাঁহার মরিবার অবসর নাই; কেন? পূরা মাত্রায় তাঁহার শ্রাদ্ধের টাকা জমে নাই বলিয়া। (৮) পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বলে, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দিতে নাই; কলিকাতায় সরস্বতী বিসর্জ্জন দেয় কেন? লক্ষ্মী ত নিজেই ডুবিয়া মরিয়াছেন, এখন সরস্বতী বিসর্জ্জন দিলেই আপদ চোকে বলিয়া।

আষাঢ়ে

স্যর্ আশুতোষ স্মৃতি—গত বৎসর এই আষাঢ় মাসের বঙ্গবাণী যে মহাত্মার গুণের অনুধ্যানে ও সুকৃতির আলোচনায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, গত ২৪শে ও ২৫শে মে তারিখে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে তাঁহার ইহলোক ত্যাগের প্রথম বার্ষিকী স্মৃতি সভা আহূত হইয়াছিল।

এই সভাগুলিতে হাইকোর্টের বিচারপতি, উকিল-বারিষ্টার, ডাক্তার, কলেজের প্রোফেসর্ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সম্মানিত পদস্থ ব্যক্তিগণ ও বহুসংখ্যক সহরবাসী উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে যে সভা হইয়াছিল তাহার অধিনায়ক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর্ স্যর্ এওয়ার্ট গ্রীভস্, যিনি হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতি; এখন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ চলিতেছে, তবুও বহুসংখ্যক সেনেটর্, অধ্যাপক ও ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। পরলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নরূপে ভাইস্-চান্সেলর্ শ্রীযুক্ত গ্রীভস্ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত স্যর্ আশুতোষের প্রস্তর মূর্ত্তির গলায় ফুলের মালা পরাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এখন যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, ও উন্নত হইয়াছে তাহা যে স্যর্ আশুতোষের সুচিন্তিত বিচারের ফলে, কর্ম্মদক্ষতায় ও হিতৈষণায় সাধিত,—আর এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা স্যর্ আশুতোষের অনুষ্ঠিত পদ্ধতির অনুসরণে, এবং আরও বহু বৎসর পর্য্যন্ত যে স্যর্ আশুতোষের অভাব এ দেশে পূর্ণ হইবার নয়, এই কথাগুলি ভাইস্ চান্সেলর্ মহাশয় অতি মর্ম্মগ্রাহী ভাষায় বলিয়াছিলেন। মহাত্মার গুণের অনুধ্যানে আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি—তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূত সমাধিনা।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের গৃহে যে সভা হইয়াছিল তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। ভবানীপুরের সাউথ সুবর্ব্বণ স্কুলের সভায় সভাপতি ছিলেন ডক্টর্ স্যর্ নীলরতন সরকার ও বক্তা ছিলেন অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও এদেশীয় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ব্যক্তি। ভবানীপুরের এই সভায় মহাত্মা গান্ধিজি বলিয়াছিলেন যে, স্যর্ আশুতোষের স্মৃতিরক্ষার জন্য যদি দরিদ্র ছাত্রেরা ও সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের শ্রদ্ধায় অল্প অল্প করিয়াও কিছু দান করেন তবে স্মৃতিভাণ্ডারের যথার্থ গৌরব বাড়িবে। মহাত্মার এই উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে, যাঁহার স্মৃতিরক্ষা হইবে, এ দেশে সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার নামে কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তি অর্থদানে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। স্যর আশুতোষের পুণ্যস্মৃতি লোকহিত সাধনের অনুষ্ঠানে চিরস্থায়ী ও উজ্জ্বল হউক।

সেনেটে বিদ্যার মূল্যের তর্ক—স্যর্ আশুতোষের নিয়ন্ত্রিত ইউনিভর্সিটির উচ্চতম শিক্ষা বিভাগগুলি কি ভাবে রক্ষিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহার বিচারের জন্য যে সভা বসিয়াছিল, সেই সভার রিপোর্টের বিচারের সময় সেনেট্ সভায় কয়েকজন ব্যক্তি যে সকল বিস্ময়কর তর্ক তুলিয়াছিলেন, তাহার দু-একটির উল্লেখ করিব। যে অদ্ভুত প্রস্তাবগুলির সম্পর্কে ঐ তর্ক উঠিয়াছিল সে প্রস্তাবগুলি সেনেটে গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা পরিচালকদের সভায় যে সেরূপ তর্ক উঠিতে পারে তাহাই আশ্চর্য্য।

মহামহোপাধ্যায় ও শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত পণ্ডিত হরপ্রসাদ এ দেশের প্রাচীন ভাষা ও ইতিহাস জানেন বলিয়া খ্যাতি আছে। ইনি এই অজুহাতে পালি ভাষার শিক্ষা তুলিয়া দিবার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(২৫শে মে, ১৯২৫

প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা অতি অল্প। পালি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে কি বৌদ্ধদের আদমসুমারি করিয়া ? এ দেশের ভাষার ও অন্য সকল বিষয়ের ইতিহাসের জন্য যে পালি সাহিত্য অমূল্য,—পালি সাহিত্য না জানিলে যে প্রাচীন ইতিহাসের অতি অধিক ভাগ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে, ইহা যিনি জানেন না তিনি কিরূপ ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, তাহা ধরা কঠিন।

সেনেট্ সভায় যাঁহাদের আসন আছে তাঁহদের মাধ্য যে দু'চার জন ব্যক্তিও নৃতত্ত্ববিদ্যার উপযোগিতায় সন্দেহ করিতে পারেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। নৃতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন না হইলে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারের পথ মুক্ত ও প্রশস্ত হয় না, শিক্ষিতদের মধ্যে সেই জ্ঞানটুকুর অভাব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। চিকিৎসা বিদ্যা না শিখিয়া লোকের পক্ষে ডাক্তার বৈদ্য হওয়া যেমন সম্ভব, নৃতত্ত্ব না শিখিয়া দেশ-সংস্কারের কাজ করাও হিতৈষীদের পক্ষে সেইরূপ সম্ভব। যে নিয়মে বা আইনে মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে সেই নিয়ম না ধরিয়া যাঁহারা সমাজের গতি পরিবর্ত্তন করিতে চান বা সমাজ মেরামৎ করিতে চান্ তাঁহাদের বক্তৃতায় ও আন্দোলনে উত্তেজনা ও কোলাহল জাগিতে পারে, কিন্তু এক তিল মাত্রও স্থায়ী কাজ হইতে পারে না। সুশিক্ষার এমন অমূল্য বিদ্যাকে যাঁহারা দূরে ঠেলিতে চা'ন তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ব্যবস্থা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কোলাহলের দিনে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন যে, অত্যধিক ব্যয় করিয়াও এই নৃতত্ত্ব বিভাগটি রক্ষা করা।

গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে কত টাকা দিবেন বলিয়া যখন প্রথম গোল উঠিয়াছিল, সে বৎসরেও তিন লক্ষ টাকা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কল্পে তোলা ছিল; যদি গোলটুকু বা সংঘর্ষটুকু না ঘটিত তবে প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে ঐ হারে টাকা পাওয়া যাইতে পারিত। এখন যখন মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর একাধিক বার জানাইয়াছেন যে, উপযুক্ত পরিমাণে টাকা দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না, তখন সেনেটের মঞ্জুরি তিন লক্ষ টাকা দিতে কিছু মাত্র বাধা ঘটিবে না, মনে হয়।

মিনিষ্টার না রাখার জের—দেশের শাসন হইয়াছে বেহাত; উহাকে পূরা মাত্রায় স্বহাতে না পাইলে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যেরা আংশিকভাবে প্রদত্ত অধিকার চালাইবার জন্য মিনিষ্টার নিয়োগ করিবেন না বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় মিনিষ্টার নিয়োগের প্রস্তাব রদ করিয়াছিলেন। মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর ইহাতে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যতটুকু শাসনের ক্ষমতা এদেশের লোককে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও যাহাতে তাঁহার নিজের হাতে থাকে, তিনি সে উদ্যোগ করিবেন। উদ্যোগ হইয়াছিল, ও তাহার ফলে ষ্টেট্ সেক্রেটারি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, এদেশের লোকের হাতে শাসনের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইল, আর এখন বাঙ্গলার গবর্ণর নিজেই সকল বিভাগের কাজ করিবেন। যাঁহারা স্বহাত-শাসন চান্, তাঁহাদের কাছে এ ফল ছিল প্রত্যাশিত; তাঁহাদের কথা এই যে, আংশিক অধিকার দেওয়ার অর্থ যখন কোন অধিকার না দেওয়া, তখন কাজে যাহা হইতেছে তাহা স্পষ্টভাবে অনুষ্ঠিত হইলে

ক্ষতি নাই, বরং অধিকারের নামে যে কল্পিত মোহ আছে, লোক-সাধারণে সে মোহ কাটাইতে পারিবে। এখন দাঁড়াইল এই যে, শাসন-সংস্কারের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল তাহাই প্রবর্ত্তিত হইল; ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের আর বড় কোন কাজ রহিল না। তবে স্বহাত-শাসন প্রার্থীরা যদি খাঁটি কাজে (মুখের কথায় বা বক্তৃতায় নয়) প্রমাণ করেন যে, তাঁহারা সরকারের সঙ্গে ভাব রাখিয়া কাজ করিবেন তাহা হইলে ১৯২৬-এর এপ্রিলে বিষয়টির পুনর্বিচার হইতে পারিবে বলিয়া ইঙ্গিত আছে। দেশের লোকেরা এই ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করিবেন, না ১৯২৯-এর পাকা ফলের প্রত্যাশায় থাকিবেন, তাহা জানা যায় নাই।

বল্‌শেভিক্ কাহিনী—মানুষের সমাজে পাপ আছে, রাষ্ট্রনীতিতে দোষ আছে, দরিদ্রের উপর ধনীর উৎপীড়ন আছে; এগুলি কি তরোয়ালের আঘাতে ও বন্দুকের গুলিতে নাশ করা যায়? যে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই ধীরভাবে অনুসরণ করিয়া সংস্কার না চালাইলে কি সুফল লাভের বিন্দুমাত্র আশা আছে? পরের দুঃখ দেখিয়া যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহারা মহৎ; মার্ক্‌স্ ছিলেন সে হিসাবে মহৎ, তাঁহার একালের অনুবর্ত্তীরাও সে হিসাবে মহৎ; কিন্তু ব্যবস্থা উপযুক্ত না হইলে, মহৎ ব্যক্তিদের উত্তেজিত অনুষ্ঠান নিষ্ফল হয়। রুষিয়ায় বলশেভিক্‌দের অনুষ্ঠানে যে শতগুণে দরিদ্রের উপর পীড়ন বাড়িয়াছে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নামে লোকসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একেবারে পদদলিত হইতেছে, ও মনুষ্যত্বের বিকাশ বন্ধ হইয়া নৃশংসতার লীলা বাড়িয়াছে, তাহা Observer নামে বিলাতিপত্রে Mr. Philip Kerr অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। এদেশে যাঁহারা নামের মহিমায় ও চক্‌চকে আন্দোলনের মোহে মাতেন, তাঁহাদের পক্ষে বল্‌শেভিক্ জাতীয় বিদ্রোহকে মনে মনে আদর করা আশ্চর্য্য নয়। দুঃখ হয়, পৃথিবীতে যখন এই উন্মত্ত বিদ্রোহের বাতাস বহিতেছে, সে সময়ে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব শিখাইবার ব্যবস্থা অধিকতর পাকা করিবার দিকে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি নাই। সমাজের উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধন যে মানুষের বজ্জাতির ফলে নয়, আর উহার সংস্কার যে যুদ্ধবিগ্রহে হয় না,—সংস্কার চালাইতে হইলে যে বিধাতৃ-বিহিত নিয়ম শিখিয়া গাছপালা প্রভৃতি বড়াইবার মত প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি ও বিশদভাবে কয়েকটি প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি বিলাতের গ্লাস্‌গো নগরে বল্‌শেভিক্‌দের বিপ্লবনীতির পোষকেরা এক সভা করিয়াছিলেন; ইহাতে ইংরেজেরা তেমন বিচলিত হন্ নাই দেখিয়া মনে হয়, ব্রিটিশরাজ্যে বিপ্লবকারীদের প্রভাব অধিক নয়। অন্যদিকে কিন্তু আবার রুষ বিপ্লবের একজন নেতা ভবিষ্যদ্বাণী শোনাইতেছেন যে, ইংলণ্ডেই বল্‌শেভিক্‌রীতির বিপ্লব স্থায়িভাবে বাড়িবে। ফরাসি বিপ্লবের যুগেও ফরাসিরা এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজে তাহা হয় নাই।

Printed by Satyakinkar Bondopadhaya at the Cotton Press, 57 Harrison Road Calcutta.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77 Russa Road North, Bhawanipur Calcutta.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

জন্ম—৫ই নভেম্বর, ১৮৭০ মৃত্যু—১৬ই জুন, ১৯২৫

"আবার তোরা মানুষ হ"

৪র্থ বর্ষ
১৩৩১-'৩২

শ্রাবণ

প্রথমার্দ্ধ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অপ্রকাশিত গান

(১)

[illegible]

(১)

মিটাওনা এই পিয়াসা

এই ত' আমার মিষ্টি লাগে !

ওগো বিরহী ! চির-বিরহী

এই তৃষা যেন নিত্য জাগে !

মিলন আমি চাইনা হে

এই তিয়াসা যেন থাকে !

চোখের জলে এত মধু !

প্রাণ বঁধু হে ! প্রাণ বঁধু !

মুছায়োনা চোখের বারি !

নাইবা এলে আঁখির আগে !

নাইবা হ'ল মিলন, যদি

এই বিরহ নিত্য জাগে !

(২)

লোকে বলে চাই চাই
এরে ওরে তাহারে
প্রাণ জানে কেঁদে কেঁদে
চায় প্রাণ কাহারে।—
সে যে আমার আধেক দেখা
মেঘের মত আঁধারে।
পরশ নিতে পারিনি যে
হৃদয়-মন-মাঝারে।
দাঁড়ায় সে যে মাঝে মাঝে
ছায়ার মত, দুয়ারে!
ধরতে গেলে দেয়না ধরা
মিলিয়ে যায় আঁধারে!
কোথা হতে ডাকে যে তবু
কোন্ বনের মাঝারে!
তাই ত' প্রাণ দিবস যামি
খুঁজে মরে তাহারে!

দেশবন্ধু সম্বন্ধে

মহাত্মা গান্ধী

একখানি চিঠি

ভাই রমাপ্রসাদ,—

তোমার 'বঙ্গবাণীর' 'দেশবন্ধু' সংখ্যায় দেশবন্ধুর সম্বন্ধে আমায় কিছু লিখিতে বলিয়াছিলে। আমি আজ কয়দিন শয্যাগত। তার মাঝেও দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত কাজের কিছু কিছু সম্পন্ন করিতে হয়। তাই সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। আর সময় থাকিলেও সেই বীরপুরুষের সম্বন্ধে কি লিখিব, তাও ঠিক্ করিতে পারি নাই। তথাপি ভাই, তোমার অনুরোধ রাখিতে গিয়া দু'এক কথা লিখিতেছি।

আমি যখন পল্লীগ্রামের লোক, দেশবন্ধু তখন কলিকাতা সহরের অধিবাসী। আমি যখন হাইকোর্টের একজন জুনিয়ার উকীল, দেশবন্ধু তখন হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। সুতরাং দেশবন্ধুর সাংসারিক সুখের দিনে আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। হাইকোর্টে বড় ব্যারিষ্টারকে একজন জুনিয়ার উকীল যেভাবে জানিতে পারে সেই ভাবেই জানিতাম। যদিও জীবনের প্রারম্ভ হইতে জন্মভূমির স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বের কংগ্রেসে জীবনীশক্তি দেখিতে পাইতাম না বলিয়া কখনও ভাল করিয়া যোগ দিই নাই। দেশবন্ধুকে প্রথম চিনিলাম রৌলাট এক্টের পর ; যখন মহাত্মা সবরামতিতে সত্যাগ্রহ প্রচার করেন তখন। তখন শুনিলাম কুমিল্লাতে কন্‌ফারেন্সে কেবল মাত্র দেশবন্ধু ও তাঁর স্ত্রী বাঙ্গলায় সত্যাগ্রহ গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন। তখনই আমার মনে ধারণা হয় বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ নেতা কে হইবেন ? তারপর পঞ্জাবে বিপ্লবের পরেই দেশবন্ধু enquiry committeeর (অনুসন্ধান সমিতির) সদস্যরূপে গিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার মনের কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা তাঁহার জীবনের পরের কয়েক বৎসরে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শুনিয়াছি চিত্তরঞ্জন বিলাসী ছিলেন। তাঁর বিলাসিতার জীবন দেখি নাই। কিন্তু যেদিন নাগপুর সহরের ধূলিপূর্ণ রাস্তায় মৃত বাঙ্গালী ডেলিগেটের শবের পার্শ্বে চিত্তরঞ্জনকে অশ্রুপূর্ণনেত্রে ৬। ৭ মাইল হাঁটিতে দেখিলাম, সেইদিন বুঝিলাম বিলাসী চিত্তরঞ্জন সন্ন্যাসী হইলেন। সেইদিন তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিলাম এবং বাঙ্গলার নেতা বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়া লইলাম। সেইদিন হইতে তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আর কাহাকেও এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নেতৃত্বের আসন প্রদান করি নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন জীবন থাকিতে সে নেতৃত্ব বিস্মৃত না হই। অথবা যেদিন সেই নেতার নেতৃত্ব বিস্মৃত হইব যেন তার বহু পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয়।

তারপর দেশে ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের মাঝে সেই অতুল বীরকে স্থির চিত্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছি। একদিনও বিচলিত হইতে দেখি নাই। একদিনও এই জাতীয় যুদ্ধে তাঁর

সৈন্যগণকে পশ্চাৎপদ হইতে বলিতে শুনি নাই। যতই বিপদের পর বিপদ আসিয়াছে ততই তাঁর আনন্দ দেখিয়াছি, ততই আনন্দে তিনি আমাদের অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। তখনই বুঝিলাম চিত্তরঞ্জনই বাঙ্গলার প্রকৃত নেতা; তাই ন্যায় ও সত্য স্থাপনের জন্য সংঘর্ষে তাঁর এত আনন্দ। আমার চিরকালই ধারণা বাঙ্গালী-জাতির বিশেষত্ব এই যে, সংঘর্ষ ভিন্ন বাঙ্গালী জাতির জাতীয়তার উন্মেষ হয় না। দেখিলাম বাঙ্গলার নেতা দেশবন্ধুও সংঘর্ষ ভিন্ন থাকিতে পারেন না। বুঝিলাম বাঙ্গলা আজ প্রকৃত নেতা পাইয়াছে। নিভৃতে লুটাইয়া তাঁহাকে কোটী কোটী নমস্কার করিলাম।

জাতীয় যুদ্ধের প্রথম বৎসরের শেষে, অর্থাৎ ১৯২১ সালের নভেম্বরের শেষে, বাঙ্গলায় যে বিপ্লব আরম্ভ হয় তাহা কাহারও স্মৃতি হইতে আজিও মুছিয়া যায় নাই। সেই সময় দেশবন্ধুর নায়কত্ব আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কে আগে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকভাবে সরকারের হুকুম অমান্য করিবে এই কথা উঠিলে, দেশবন্ধু নিজের পুত্রকে আগে না পাঠাইয়া অপরকে পাঠাইতে রাজী হন নাই। কেহ এ বিষয়ে তাঁহাকে অন্যমত করিতে পারেন নাই। সকলের কথায় বাঙ্গলার নেতার একই উত্তর ছিল, "নিজের ছেলে ঘরে থাকিতে পরের ছেলেকে জেলে যেতে বলিতে পারিব না।" হায় চিত্তরঞ্জন, যদিও তোমার নিকট 'নিজ' ও 'পর' ছিল না, তথাপি প্রকৃত নেতার ন্যায় তুমি লোকমত লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতে ভুল নাই।

চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের আর একটী জ্বলন্ত উদাহরণের কথা বলি। তিনি তখন জেলে। বাঙ্গলার প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটির সম্পাদকরূপে আমি তখন সংঘর্ষ চালাইতেছি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য-জীর দ্বারা সরকার বাহাদুরের সঙ্গে একটী মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলে। জেলের মধ্যে বৈঠক বসিয়াছে। বাহির হইতে আমরা গিয়াছি। জেলের মধ্যে যত প্রধান নেতৃবৃন্দ ছিলেন সকলে বসিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমরা কি সর্ত্তে মীমাংসা করিতে পারি স্থির হইল। যদিও দেশবন্ধু তাহা অপেক্ষা আরও কম সর্ত্তে রাজী ছিলেন কিন্তু মহাত্মা যাহা জানাইয়াছিলেন তাহার উপরে নির্ভর করিয়া সর্ত্ত স্থির হইল। মালব্য-জী বলিলেন, দেশবন্ধু উহাতে দস্তখৎ না করিলে সরকার বাহাদুর উহা গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু বলিলেন এখন ত বাঙ্গলায় আমি নেতা নই, আমি জেলে। যাঁহারা এখন নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন তাঁহারা দস্তখৎ করিবেন। কিন্তু মালব্য-জী পীড়াপীড়ি করায় দেশবন্ধু আমায় বলিলেন, "সাতকড়ি, তুমি যদি দস্তখত কর তবে আমি করিব, নচেৎ নহে।" আমি দস্তখৎ করিলে আমার নামের নীচে তিনি সহি করিলেন। মনে মনে বলিলাম, "নায়ক, আজ হৃদয়ে যে দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে তাহা জীবনে মুছিবে না।"

তারপর, জাতীয় সংঘর্ষের মধ্য দিয়া প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দূরে কিম্বা নিকটে থাকিয়া সেই মহাপুরুষের যুদ্ধ দেখিয়াছি। কিরূপ অর্থাভাবের মধ্য দিয়া, কিরূপ লোকাচারের

মধ্য দিয়া, তিনি এই যুদ্ধ চালাইয়াছেন তাহা যাহারা দেখিয়াছে তাহারা চমৎকৃত হইয়াছে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল সৎকার্য্যের জন্য অর্থাভাব হইবে না। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চলিয়াছিলেন। কয় বৎসরে কত রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে কিন্তু কোথা হইতে জানিনা ভগবান তাঁর হস্তে অর্থ আনিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর সাংসারিক উন্নতির সময়ে তাঁর অমানুষিক দানের কথা শুনিয়াছি, আমি তাহা দেখি নাই। কিন্তু এই সাংসারিক দুঃখের সময়ও তাঁর দান দেখিয়াছি, দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা নাই, কোনও কর্ম্মী তার বিশেষ অভাবের কথা দেশবন্ধুকে জানাইয়াছে। দেশবন্ধু জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা নাই শুনিয়া বিচলিত হন নাই, নিজের সংসার খরচের যে সামান্য টাকা আছে তাহা হইতে সেই কর্ম্মীকে দিয়াছেন। এমন অবস্থা দেখিয়াছি পরের দিন নিজের দৈনন্দিন বাজার খরচের টাকা না রাখিয়া নিজের টাকা দিয়া দিয়াছেন। বলিলে বলিয়াছেন, "কাল যেখান থেকে হয় যোগাড় হবে, ওযে খেতে পাচ্চে না।" হায় দেশবন্ধু, তুমি জাতীয় যুদ্ধে কর্ম্মিগণের পিতামাতা, ভাই, বন্ধু এক সঙ্গে সব ছিলে। কর্ম্মিগণ জীবনে তোমার কথা বিস্মৃত হইবে না।

এত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া, এত অভাব অনাটনের মধ্য দিয়া যিনি এত বড় প্রতিকূল পক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ চালাইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার মুখে কখনও নিরাশার বাণী শুনি নাই। মনের কি অভাবনীয় বল লইয়া যে এই জাতীয় যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা এক ভগবানই বলিতে পারেন। কোন এক দিন তাঁর মনে একটু সন্দেহ দেখিয়াছিলাম, সেদিন তাঁর বন্দী হইবার পূর্ব্বদিন। সে সময় প্রত্যহ কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা তাহার পূর্ব্ব দিন রাত্রে স্থির হইত। তাঁর বন্দী হইবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে এইরূপ যুক্তি-পরামর্শের সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাঁহাকে ২।১ দিনের মধ্যে খুব সম্ভব গ্রেপ্তার করা হইবে। তখন তিনি ভবিষ্যতে তাঁর বন্দী সময়ে কিভাবে কাজ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার পর বলিয়া ফেলেন যে, "তাইত, আমি ধরা পড়িলে কি এই কায আর চল্‌বে ?" আমি বলিলাম, "যে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আপনার না ভগবানের ? যদি ভগবানের হয় তবে ভাবিতেছেন কেন ?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ সাতকড়ি—কাজ তাঁর, তিনি চালাইবেন।" তার পর এই চারি বৎসরের মধ্যে কখনও আর তাঁহাকে এরূপ কথা বলিতে শুনি নাই।

নিজে মহৎ হইতে মহত্তর হইলেও তিনি নিজেকে অতিশয় ক্ষুদ্র মনে করিতেন। বেশী দিনের কথা নয় দার্জ্জিলিং যাইবার ২।১ দিন পূর্ব্বে একদিন বলিলেন, "দেখ, মহাত্মার ত কোনও শত্রু নাই, আমার এত শত্রু কেন ? আমি এখন বুঝিয়াছি মহাত্মার মনে হিংসা নাই, তাই তাঁকে কেউ হিংসা করে না। আমার মনে নিশ্চয়ই হিংসা আছে, তাই আমার এত শত্রু।" সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ! আজি স্বর্গ হইতে দেখিতে পাইতেছ তোমার শত্রু ছিল কিনা। আজ সারা জগতের জাতি-

দেশবন্ধুর
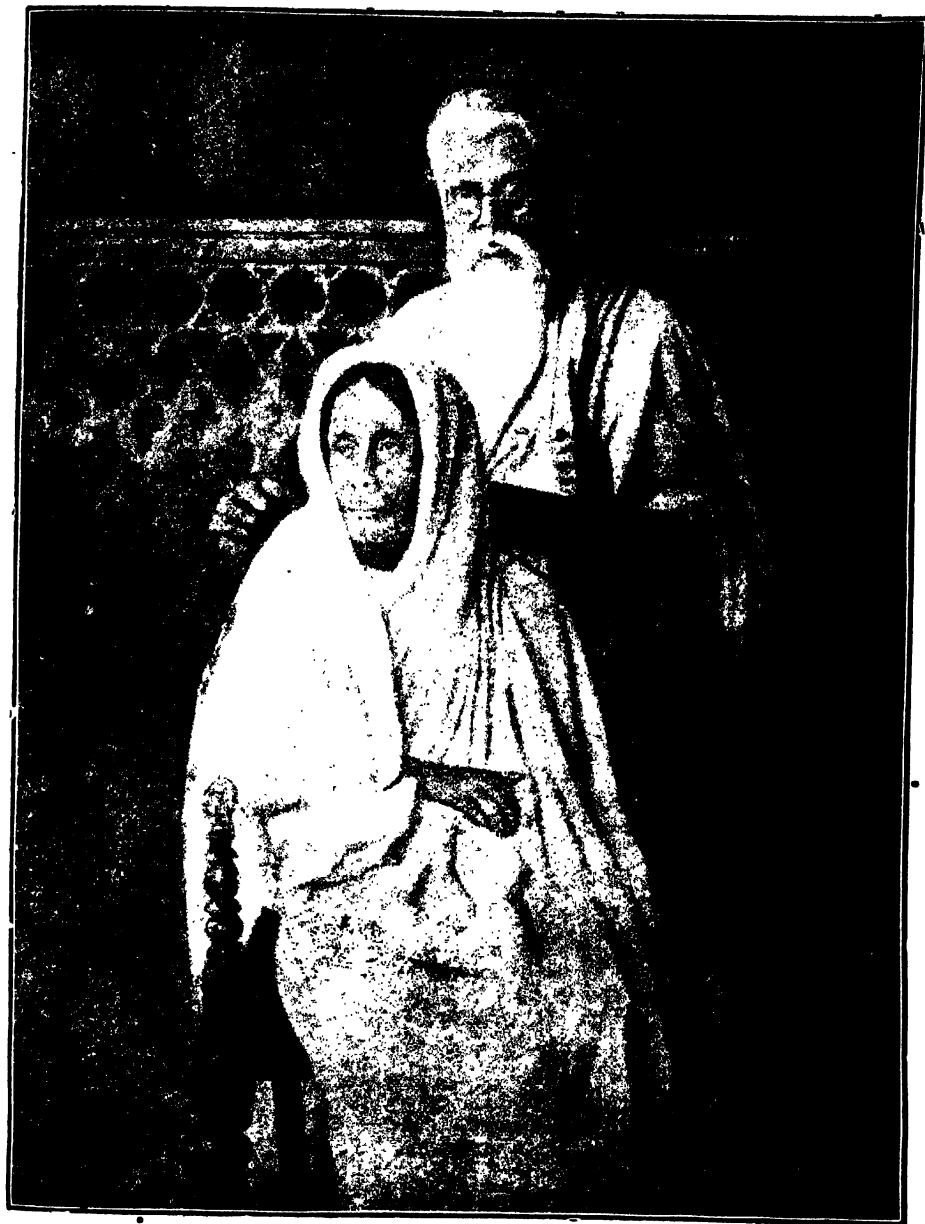
পিতা ও মাতা

সাত বৎসর বয়সে

অক্সফোর্ডে ছাত্ররূপে
১৮৯১

নির্ব্বিশেষে, ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বনিতার চক্ষের জল প্রমাণ করিতেছে, তোমার শত্রু ছিল কিনা। আজ মরিয়া তুমি বুঝিয়াছ তোমারও শত্রু হইতে পারে না।

যাঁহার জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন পাঁচ বৎসর ধরিয়া একত্র জড়িত ছিল তাঁর জীবনের কয়টা ঘটনার বর্ণনা করিলাম। এই প্রত্যেক ঘটনাই অলৌকিক। কত ব্যথা, কত চিন্তা, কত দায়িত্ব মাথায় লইয়া তিনি কার্য্য করিতেছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঁচ মাস দেশবন্ধু পীড়িত হইয়া কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। এই পাঁচ মাস তাঁর বোঝা আমাকে কিছু কিছু লইতে হইয়াছে। তাহাতেই বুঝিয়াছি কত বড় পর্ব্বতের আড়ালে থাকিয়া আমরা এই সংঘর্ষ চালাইতে-ছিলাম। শত শত বর্ষ জীবন হইলেও যাঁর কথা কীর্ত্তন করিয়া ফুরাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না, তাঁর কথা আর বলিয়া লাভ কি? আমাদের খেদ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই। আমাদের মনের অবস্থা কি তাহা প্রকাশ করিতে হইলে মহাত্মা শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরুকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার গোড়ার একছত্র পড়িলেই বুঝা যাইবে। "God has played trick with us." যাহা হউক, যেন দৃঢ়তার সহিত দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে দেশবন্ধুর মৃত্যুজনিত ক্ষতি কতকটা প্রশমিত হইতে পারে।

শ্রীসাতকড়িপতি রায়*

শ্মশান ঘাটে

পুণ্যচিতার বহ্নিপথে কোথায় গেলে চিত্তবীর?
কোথায় গেলে শূন্য করে' লক্ষসখার বক্ষোনীড়,
দীনজননীর দাস্য-হরণ জন্য সুধা আনতে কি
স্বর্গে গেলে বন্ধ-মোচন মন্ত্রটিকে জানতে কি?
জিনতে 'নাচিকেতার' মতন মৃত্যুবিজয় ধনটিরে
আতিথ্য কি করলে গ্রহণ ধর্ম্মরাজের মন্দিরে?
না পেয়ে ন্যায়-বিচার হেথায়—ভবনদীর এই পারে,
গেলে কি আজ দিনদুনিয়ার শাহানশাহের দরবারে?

কোথায় গেলে দেশের ত্রাতা তিরিশ ক্রোটির বাহুর বল,
কোথায় গেলে হৃদয় বিধু? হায় বিজয়ী রাহুর বল!

* দ্রষ্টব্য—এই চিঠিখানি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত।—বং সং

কোথায় গেলে নরের গুরু, নরনারায়ণের দাস
ছিন্ন করি' লক্ষকোটি নিবিড় আলিঙ্গনের পাশ।
জীবন-যাগের হোতা কোথায়? লুপ্ত ধূমে যজ্ঞানল,
তোমার হবির বদলে তায় ঢাল্‌ছি মোরা অশ্রুজল।
তোমার ঋকের সূক্ত ছাড়া হবেনা শেষ মুক্তি হোম,
দেব-অতিথি যাবেন ফিরে না পেয়ে হায় হব্য সোম।
তোমার জটার দীপ্তিহারা আঁধার 'লোকারণ্য' হায়,
আশ্রমে তার অশ্রুকরুণ হরিণ-নয়ন খুঁজ্‌ছে কায়?

হে বিজয়ি, দিগ্বিজয়ে আর ভীরুদের ডাক্‌বে কে?
অশ্বমেধের অশ্ব মোদের দেশবিদেশে রাখ্‌বে কে?
জ্যা-আরোপণ কর্‌বে কেবা তোমার বিশাল কার্ম্মুকে?
সত্যকেতন রথে তোমার বস্‌তে সাহস কার বুকে?

ভক্ত রসিক, চিত্ত তোমার সজীব চিরতারুণ্যে
জীবন তোমার কাব্য সরস রামায়ণের কারুণ্যে।
অশ্রু-প্রাবৃট কাব্য, মরণ, জিনেছে সে মেঘদূতেও,
কায়মনোবাক্ কর্ম্মে কবি, অমর কবি মৃত্যুতেও।
তোমার জীবন-কাব্যখানি ভারতবাণীর কণ্ঠহার
স্বর্গারোহণ সর্গটি তার শেষে চরম চমৎকার।
এযে সদ্যোজাগ্রতদের জীবন উষার নবীন বেদ,
মুক্তিবোধন সূক্তে ভরা এর প্রতি ভাগ পরিচ্ছেদ।

সবারি ভার বইতে তুমি ভারতভূমির ধুরন্ধর
ভক্তি-সোমে বন্দনীয় মনুষ্যলোকের পুরন্দর,
জাতির ব্যথার পাথার পথে জীবনতরীর কাণ্ডারী—
আত্মজ্ঞানের সত্যবলের নিত্যধনের—ভাণ্ডারী,
বঙ্গমাতার বর্ষ শতের তপে জীবন নিগ্রহ
আগ্রহ উৎকণ্ঠা আশা তোমায় পেল বিগ্রহ।
স্বর্গ অপবর্গ হতে কাম্যতর ভাবলে হায়
কুশল যাহার, অশ্রু দিয়ে নূতন করে' গড়্‌লে যায়,
হের তাহার দুর্দ্দশা আজ, তোমার বিদায়-ঝঞ্ঝাবাত
তাহার সাধের কল্পতরুর করল আজি মূলোৎখাত।

আশার কুলায় লুটছে ধূলায় ডিম্বগুলি চূর্ণ তার,
ছিন্ন ভারত-মাতার গলায় ঐক্য-একাবলীর হার !
ধ্বস্ত তোমার হস্তে রচা কল্যাণের ঐ কুঞ্জবন,
লুটায় ভূমে ভাগ্য লতা, স্তব্ধ মিলন-গুঞ্জরণ।
দিক্‌হারা প্রেম-গোষ্ঠে ধেনু, নষ্ট সভায় গোষ্ঠী সুখ,
ভাঙল ন'বৎ-মঞ্চ আজি সানাই বাঁশী মৌনমুক।
নিবে গেছে ভোগ-দেউলে উদ্দীপনার পঞ্চদীপ,
ছিন্ন বোঁটায় ধূলায় লোটায় জয়োল্লাসের পলাশনীপ।
তোমার গড়া স্বর্ণ চূড়া হারা'ল মা'র পূজার মঠ
দ্বারে লুটে রম্ভাতরু গড়াগড়ি বোধন-ঘট।
রণাঙ্গণের 'শিবির ধ্বজা' করছে হের ভূ-লুণ্ঠন,
শ্রেণীব্যূহ ভেঙে পলায় রথ্ বাজিগজ্ যোদ্ধৃগণ।
সোণার স্বপন মিলিয়ে গেল, ভেঙে গেছে চাঁদের হাট,
ভগ্নতরু-শাখায় ভরা খাঁ খাঁ করে আঁধার বাট।
তোমার 'জেতবনে' আজি কাঁদছে 'সারিপুত্রগণ',
সুজাতারা অন্ন নিয়ে করছে তোমায় অন্বেষণ।
মোদের মনের 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার সিংহাসন',
শূন্য আজি, বসবে কেবা ? পারবে ছুঁতে অন্য জন ?
তোমার খড়ম পূজ্য পরম লভুক তা'তে অর্ঘ্যচয়,
ঐ পাদুকা-তন্ত্রশাসন চলুক এখন বঙ্গময়।
আর কাহারো প্রবোধ বাণী শুনবে না এ অবোধ দেশ,
তোমার পানেই চেয়েছিল অটল আশায় নির্ণিমেষ,
যাত্রাপথে মিত্র বারেক ফিরে প্রসাদ নেত্রে চাও,
অসীম আশার সূর্য্য তুমি, যথায় থাক, অভয় দাও।
হাজার হাজার শিখণ্ডীর আজ বিনিময়েও যদিই পাই
ভীষ্ম, তোমায় বিশ্বমানব-রণাঙ্গণে আবার চাই।
গীতার বাণী সবাই শোনে, কেউত তারা পার্থ নয়,
নব্যযুগের সব্যসাচি, তোমার কাণেই ব্যর্থ নয়।
তোমার জীবন—ধর্ম্মে আবার সকল গীতার মর্ম্মসার,
তোমার চরিত সোদাহরণ কর্ম্মখন ভাষ্য তার।

'সত্ত্ব'-মধু, 'রজের' রজে জীবন তোমার পুষ্পিত,
উপবনের বৃন্তকোরক তপোবনেই সুস্মিত।
মুক্তা 'যোগের' ফল্‌ল তোমার 'ভোগের' ধবল শুক্তিতে,
শাক্ত, উপভুক্তি মাঝে, ভক্তত্যাগী, মুক্তিতে।
মিলন তুমি 'শঙ্খগদায়', দীপক এবং মল্লারে,
সন্ধ্যারাগে-চন্দ্রিকাতে, রক্তজবায়-কঙ্কারে।
হৃদিস্থিত হৃষীকেশেই স'পলে নিখিল কর্ম্মফল,
নিষ্কামতায় বাড়্‌ল' আরো ধৈর্য্য দৃঢ় শৌর্য্য বল।
তৃণাদপি সুনীচ, তবু অপৌরুষে ক্লৈব্যে নয়,
সৈন্য দিয়ে নয়ক তোমার, দৈন্য দিয়ে দিগ্বিজয়।
জান্‌তে তুমি বাগ্মিতা—ধী-তীক্ষ্ণ মেধায়, রুগ্নপ্রাণ,
আত্মজ্ঞানে তত্ত্ব লভি' হয় না কভু সত্যবান্‌।
স্বরাজ সুরু আত্মা হতেই, অন্তরে তাই শক্তি চাই,
মসীর বলে অসির বলে পেশীর বলে মুক্তি নাই।
উৎসবে নয়, মন্দিরে নয়, শ্মশানবাসেই খুঁজলে শিব,
জীর্ণচীরের মতন তনু ত্যজ্‌লে যোগে মুক্ত জীব।
মূর্খে তোমায় অল্পায়ু কয়, আয়ুষ্কালেও নওক হীন,
মোদের যাহা একটি বরষ তোমার তাহা একটি দিন।
এম্নি তোমার কর্ম্মনিবিড় চিন্তাঘন দণ্ড পল
এক জীবনেই পেলাম মোরা লাখ্‌ জীবনের বাঁচার ফল।
জীবনই নয়,—পেঁচার জীবন, খাঁচার জীবন লাখ বছর,
শ্বাস গ্রহণই জীবন যদি—হাঙর তবে প্রায় অমর।
দশকোটি দিন শূন্য হলে যোগেও শেষে শূন্য হয়,
তেমন জীবন একটি তোমার মরণপলের তুল্য নয়।
কেন তুমি এমন করে' বাস্‌লে ভালো হৃদয়বীর,
ছিলে ভোগী, মোদের লাগি পরলে কেন যোগীর চীর?
কেন মরুর কঙ্করে হায় করলে বুকের রক্তপাত?
অশ্রুপিছল পথে কেন পরিত্রাতা—ধরলে হাত?
কেন ভীরুর চোখ ফোটালে দিয়ে গুরুর জ্ঞানাঞ্জন,
কেন উদার মুক্তি সুধার দিলে লোভন আস্বাদন?

কিন্‌লে ঝুলি পথ-ভিখারীর, শালদোশালার মূল্যে হায়,
ভিখ্‌মাগা ক্ষুদ মোদের কাছে যেচে খেলে কোন্ ক্ষুধায় ?
ভোগোৎসবের রত্নাকরে মিট্‌লনাক কিসের ক্ষোভ ?
বাংলাগোঠের গোস্পদে হায় তোমার কেন এতই লোভ ?
লক্ষ্মীদুলাল, দুঃখী কাঙাল হরল কিসে তোমার মন ?
নাম্‌লে ধূলায় রথ হতে, তায় দিতে প্রেমের আলিঙ্গন।
অকৈতব এ প্রেমের বিলাস—একি বিষম প্রেমের রোগ ?
কোথায় পেলে নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের ভক্তি যোগ ?
কোথায় পেলে কৃত্তিবাসের আত্মভোলা চিত্তবল ?
তোমার সাথে 'বোল হরি বোল' বল্‌ল শ্মশান-প্রেতের দল।
বাঁধ্‌ল কেন কণ্ঠ মোদের তোমার অবুঝ ভুজের ডোর ?
লুব্ধ করে' ক্ষুব্ধ করে' কোথায় গেলে চিত্তচোর ?
বেশত ছিলাম অন্ধকূপেই সুস্থমনে নির্ব্বিকার,
সত্যজেনে অন্ধকারে পঙ্কহিমে জড়অসাড়,
মুক্তবায়ে আন্‌লে কেন দেখালে সোম রবির মুখ ?
ভাঙ্‌লে কেন সরীসৃপের অনেক যুগের সুপ্তি সুখ ?
মানবতার মর্য্যাদাবোধ—কতদিনের বিস্মরণ—
আবার কেন শূদ্র প্রাণে করলে শুরু উদ্বোধন ?
হঠাৎ ফেলে চল্লে কোথায় ?—অকূল পাথার ! অন্ধকার !!
কোথায় তরী ? কোথা বা তীর ? চলেনা হৃৎস্পন্দ আর।

ফুরিয়ে গেছে দোলঝুলনের উৎসব-রোল পূর্ণিমায়
আজ আষাঢ়ের ঘনঘটায় তোমার রথযাত্রা হায়।
হাজার ফণার ছায়ায় ভরে 'অনন্ত' ঐ যাত্রাপথ,
লক্ষ বুকের উপর দিয়া চল্‌ল তোমার জৈত্ররথ।
অশ্রুভরা কুম্ভমেলায় পথের সুরু এই দেশে
হর্ষবোধন-কুম্ভমেলা মহাপথের ঐ শেষে।
লক্ষ হৃদয়পদ্মদলের পরাগ মকরন্দময়
মধুপুরীর দীর্ঘপথের কাঁকর ধূলি করল জয়।

কি মধুময় ছিলে তুমি, মধুচ্ছন্দা, মধুক্ষর,
আস্তে মধু, হাস্তে মধু, কাব্যে মধু, মধুস্বর।

'সত্য' পেত তোমার মুখে মধুরতায় ভৃগুর বল,
রুক্ষ কথার মৃণাল কাঁটায় ফুটত মধুর পদ্মদল।
স্মৃষ্টি মধুর,—দৃষ্টি মধু-বৃষ্টি সদা করত যে,
ছিলে মধুপ নীলমাধবের রাতুল চরণ-পঙ্কজে।
স্মরি মধুপর্ক-হৃদয়, স্মরি মাধুকরীর বেশ,
হে মধুমাস, করলে তুমি একটি যুগের বর্ষশেষ।

তোমার শোকের সিন্ধুসরিৎ মধুক্ষরা আজ্‌কে হোক্‌,
মধুক্ষরণ করি পাবন দীর্ঘশ্বাসের পবন বোক্‌।
ধরার ধূলি অঙ্গে উঠে হোক মধুময় অঙ্গরাগ,
তৃণৌষধি ক্ষরুক মধু মধুতে হোক পুষ্ট যাগ।
কবির ছন্দে ঝরুক মধু, ক্ষরুক মধু যজ্ঞ-ধূম,
মধুক্ষরণ করুক গগন, পুষ্পিত হোক মধুদ্রুম।
আদিত্যসোম মধুদ্যুতি, বিলাক মধু বিশ্বময়,
ওঁ মধু ওঁ, মধুজীবন, শান্তি! শান্তি! স্বস্তি! জয়!!

শ্রীকালিদাস রায়

চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের কথা নূতন করিয়া আর কি কহিব। ফিরে গোষ্ঠে আর কি গাহিব। তিনি অনেকদিনই তোমাদের চোখের সামনে ছিলেন—তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ, তপস্যা সকলই তোমরা জান। তাঁর অদ্ভুত কর্ম্ম সকলেই দেখিয়াছ; তাই তিনি নাই বলিয়া সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছ। বুকে সকলেরই বেদনা বাজিয়াছে—সকলেই প্রাণের ভিতর থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছ। এমন সত্যকার শোকে ও দুঃখে আমি আর তাঁর কোন্ কার্য্য তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব। ছোট, বড়, রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার শোকে পাগল। তবে নূতন কি শুনিতে চাও? এই দুঃখে সকলেই আপনা থেকে সাড়া দিচ্চে—সাড়া ডাকিয়া আনিবার জন্য কথা গাঁথিবার কোনই দরকার নাই। তবে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এই লোকটার মধ্যে এমন কি নূতন ছিল যে, এই হিন্দুস্থানের ছত্রিশ জাতের সকলেই তার অভাবে এমন নূতনভাবে কাতর হয়ে পড়িল। কথায় বলে "রংএর মধ্যে সাদা, আর নারীর

মধ্যে রাধা—"। বৈষ্ণবেরা বলেন "রাধা সতী"। রাধারাণীর জয় গান করিয়া তাঁরা আশ মিটাইতে পারেন না। কিন্তু এই রাধার রাণীগিরি কিসে? তাঁর সম্পত্তির মধ্যে জগৎ জোড়া কলঙ্ক। দাশু রায়ের পাঁচালীতে শুনিয়াছি—"ননদিনী ব'লো নগরে,—ডুবেছে রাই কমলিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে"। এই কলঙ্কই তাঁর সতীত্ব, এই কলঙ্কই তাঁর সত্য, এই কলঙ্কই তাঁর ঐশ্বর্য্য, এই কলঙ্ক লইয়াই অমর বৈষ্ণব শাস্ত্র। কলঙ্কের মত শোভা আর সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে কিছুই নাই। চাঁদে কলঙ্কটা ভগবানের মোটেই ভুল হয়নি। প্রধান সৌন্দর্য্য স্রষ্টা ও সৌন্দর্য্য দ্রষ্টা নিজেই বলিয়াছেন—"মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষলক্ষ্মীংতনেস্ত"। চিত্তরঞ্জন এই কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াই আজ রাজা হইয়াছেন। কলঙ্কের মহিমাটা এমন নূতন করিয়া প্রচার করিয়াই তিনি সমস্ত দেশের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন। দেশটা বিদেশী চালে চলিতেছে। সমাজনীতি বিদেশী, ধর্ম্মনীতি বিদেশী, সকলের উপরে রাজনীতি বিদেশী। সকলেই এই বিদেশীভাবে মজিয়া হাজিয়া গিয়াছেন, আর বলিতেছেন—"বাহবা! বাহবা!" "আমরা স্বর্গের সিঁড়ির সন্ধান পাইয়াছি।" "এইবার ইউরোপের নাগাল পাইতে আর দেরী নাই"। চিত্তরঞ্জন কলম ধরিয়াই লিখিলেন—মুখ খুলিয়াই বলিলেন "ও পথে যেওনা বঁধু………"। তিনি সাহিত্যে, ধর্ম্মে, নীতিতে এবং সর্ব্বোপরে পলিটিক্সে নূতন সুর ভাঁজিয়া কতই না কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছেন। যে তীব্র অনুভূতি, যে মর্ম্মবেদনা, যে বিচ্ছেদ দুঃখে এই কলঙ্ক অর্জ্জনের সামর্থ্য জন্মে—সেগুলি কেবল তাঁহারই ছিল। উপাধ্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে "সর্ব্বত্র কেবল টোকো পাঁউরুটির সঙ্গে তাঁহার পেটের নাড়ীটি পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইতেছিল"—তাই তিনি ঢালিয়া সাজিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। একালের যা কিছু ভাঙ্গা গড়া তার সবগুলির মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের হাত ছিল। যা কিছু বেখাপ্পা, যা কিছু বেসুরো, যা কিছু বেতালা তাহা তাঁর প্রাণে যেমন বাজিত এমন আর কারো প্রাণে বাজে নাই। রাধারাণী তাঁহার দেবতা, তাই তিনি কলঙ্কের মর্ম্ম বুঝিতেন। কলঙ্কের মূলে যে শ্রদ্ধা, এবং যে শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রে প্রাণের সারবস্তু বলিয়া থাকে, তিনি সেই শ্রদ্ধার রাজা ছিলেন। তাই লোকের চক্ষে যাহা কলঙ্ক বলিয়া বোধ হইল, ভগবানের দৃষ্টিতে তাহাই শ্রদ্ধা বলিয়া ঠেকিল। এই তাঁহার জীবনের রহস্য, এই তাঁহার কর্ম্মের শক্তি—এই তাঁহার অঘটন ঘটনের প্রেরণা। বুঝে নাও যে জান সন্ধান।

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

শেষ বাতি

বাংলা দেশের শ্মশানভূমে
নিব্‌লে তুমি শেষ বাতি !
এখনো ত ঘোর কাটেনি
এখনো যে বেশ রাতি !
এখনো যে কোলের কাছে
তাল বেতালে বেতাল নাচে,
ডাইনী মায়া বিছিয়ে আছে
আঁধার কালো কেশ পাতি !
এখনি কি সময় হ'ল—
নিব্‌লে তুমি শেষ বাতি ?

বাংলা আজি চিত্তহারা—
বাংলা আজি উন্মনা !
হায়রে তোমার বাঁশীর আওয়াজ
আর এ কানে শুন্‌ব না ?
কবি তোমার গানের ভাষায়—
প্রেমিক তোমার ভাল বাসায়—
জ্যোতিষ্ক ওই আলোর আশায়
উঠ্‌বে না আর দেশ মাতি ?
এম্‌নি তুমি নিব্‌লে নাকি
শ্মাশান ভূমে শেষ বাতি ?

আজ্‌কে বটে বধির শ্রবণ
দেশ বিদেশের ক্রন্দনে।
অসাড় দেহ লক্ষ হাতে
লিপ্ত ফুলে চন্দনে !
জ্যোতি তবু হয়নি হারা,
ভাঙ্‌ল শুধু সীমার কারা—
অরূপ রূপে রূপ মিলাল
কমে নি তার লেশ ভাতি !
স্বর্গ আজি শ্মশান ভূমি
নির্ব্বাণে এই, শেষ বাতি !

ঝড় তুফানে ক্লান্ত নাবিক
ঘুমাও মুদে চোখ দুটি !
রোদন বৃথা !—দেবতা দেছেন—
আজ্‌কে তোমার হোক্ ছুটি !
অবশ হাতের নিশান খানি
মৌন মুখের অ-শেষ বাণী
কেড়ে নিয়ে কর্‌তে প্রচার
জেগেছে আজ দেশ জাতি !
ঘুমের আঁধার সেরা আঁধার !—
তাই ভেঙেছ, শেষ বাতি !

নইলে কি আর সইতে পারে
ভবানীপুর আধমরা !
আজ্‌কে এসে আশার কূলে
ডুব্‌ল যে রে তার ভরা !
সে দিন ক্ষত বজ্রবাণে
চেয়ে তোমার মুখের পানে
সাম্‌লে ছিলে ব্যথা প্রাণে,
আজ্‌কে ভেঙে শেষ ছাতি !
নিবিড় আঁধার নাম্‌ল গ্রামে
নিব্‌লে যবে শেষ বাতি !

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

মিঃ সি, আর, দাশ

শবানুগমন—চৌরঙ্গী
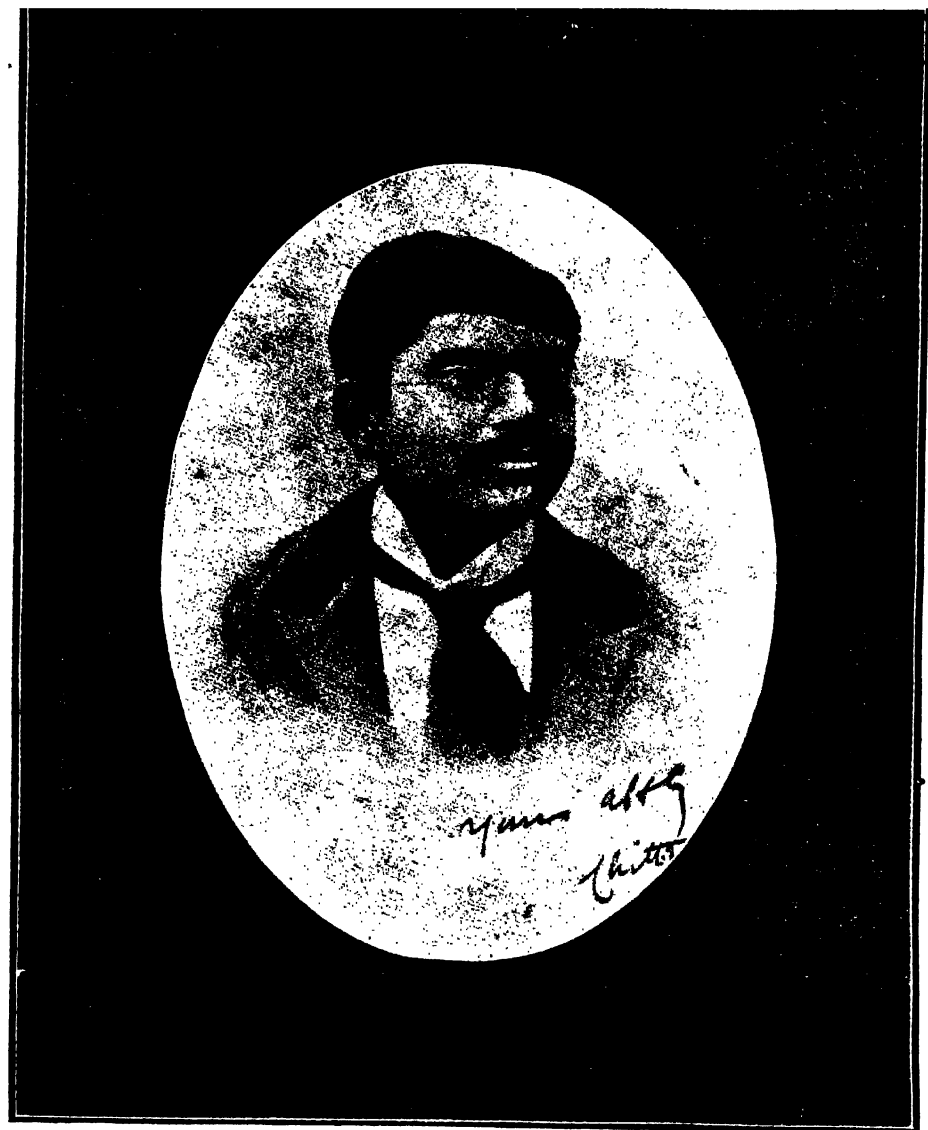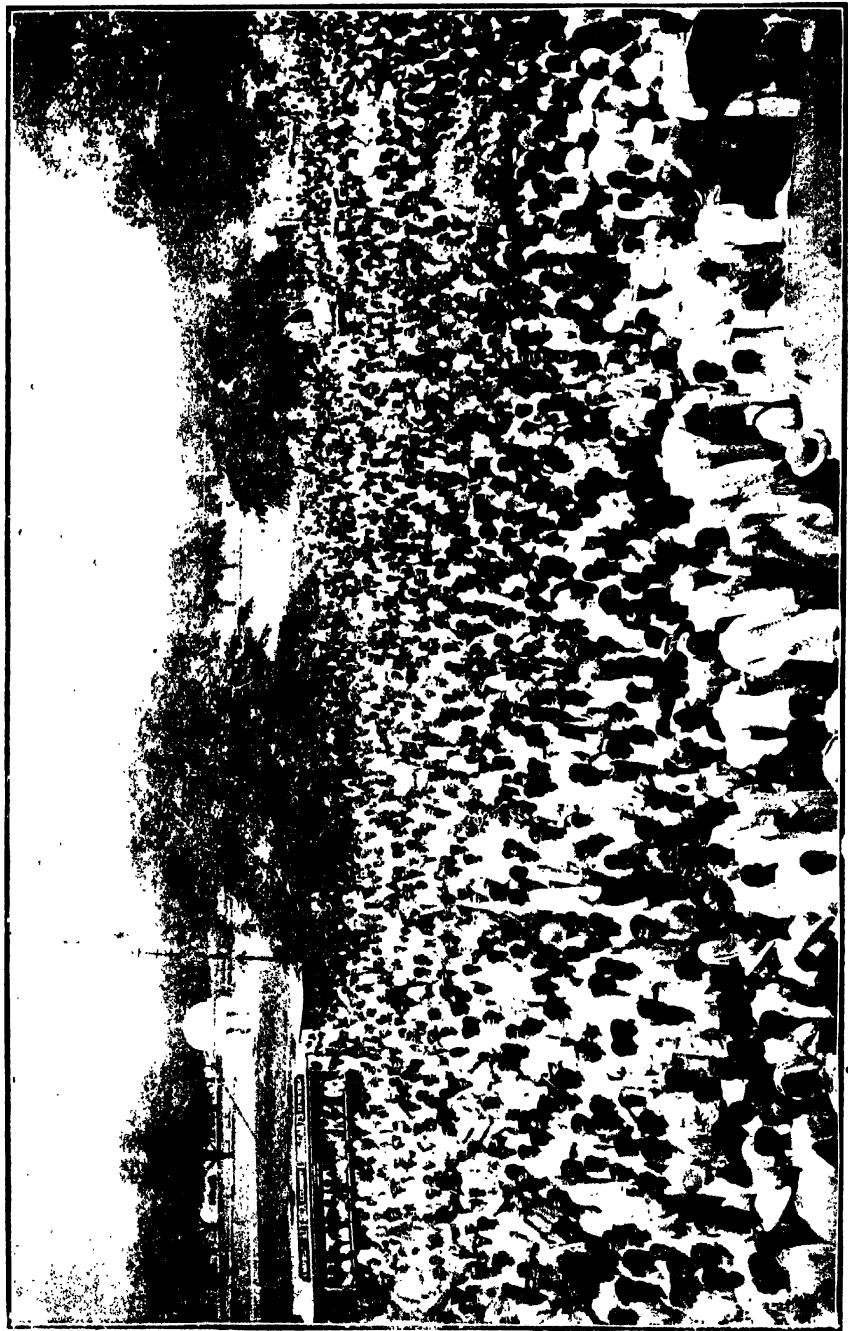
(জনষ্টন ও হফম্যান গৃহীত ফটো হইতে)

চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি

আজ বাংলার ও বাঙালীর চিত্তরঞ্জন নাই। দেশবন্ধু, দেশসেবক, মাতৃভূমির একনিষ্ঠ ত্যাগী সাধক চিত্তরঞ্জন নাই!—বাংলার কর্ম্মবীর পুরুষসিংহ চিত্তরঞ্জন নাই।

চিত্তরঞ্জনের জন্য শুধু বাঙালী নয়—সমগ্র ভারতবাসী হাহাকার করিতেছে। চিত্তরঞ্জন শুধু বাংলার নেতা ছিলেন না—সমগ্র ভারতের নেতা ছিলেন। কিন্তু তবুও চিত্তরঞ্জন বাংলার ও বাঙালীর গৌরব ছিলেন এবং তিনি নিজেও বাঙালী বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন।

আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎভাবে ট্রেণে প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার পিতা ৺ভুবনমোহন দাস এবং আমার পিতা ৺প্রসন্নকুমার সেন্ উভয়েই এটর্ণী ছিলেন। "দাস এণ্ড সেন" নামে ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীটে উভয়েরই এক আফিস ছিল। ৺ভুবনমোহন দাসের নিকট আমার পিতা শিক্ষানবিশ থাকিয়া এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আজীবন তাঁহার সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। ভুবন বাবুর মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে—ইংরাজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমার পিতৃদেব পরলোক গমন করেন। তৎপরে দাসপরিবারের সহিত মিশিবার আমাদের কোনও সুযোগ ঘটে নাই।

ট্রেণে আলাপ করিতে করিতে আমার পিতার নাম শুনিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন, "তবে তো তুমি আমাদের আপনার লোক! তোমাদের কোনও খোঁজখবরই পাই না। তুমি আমাদের ওখানে যেও।"

ট্রেণে আমার পাশে একটী রুগ্না বলিকাকে শায়িতা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মেয়েটী তোমার কে?"

আমি বলিলাম "মামাতো বোন্। মামা দেওঘরে change এ এসেছিলেন। মেয়েটীর হঠাৎ জ্বর ও পেটবেদনা হয়—ডাক্তাররা পেরিটোনাইটিস্ আশঙ্কা কচ্চেন—এখন কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য নেওয়া যাচ্চে। ডাক্তার ও আমার মামারা অপর কামরায় আছেন।"

চিত্তরঞ্জন তখন তাঁহার ঝুড়ি হইতে কতকগুলি আঙ্গুর, বেদানা, আপেল প্রভৃতি ফল বাহির করিয়া বলিলেন "মেয়েটীকে বেদানার রস খেতে দিও—এই ফলগুলিও ওকে দিও।" হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "ঠিক চিকিৎসা হচ্চে। আমিও হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী।"

চিত্তরঞ্জন তখন একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তাঁহার অমায়িকতা ও সহৃদয় ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। পুরুলিয়া যাইবার জন্য আসানসোল ষ্টেশনে যখন তিনি নামিয়া যান, তখন আমাকে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কল্‌কাতায় আমার সঙ্গে

দেখা ক'রো।" কিন্তু নানাকারণে ব্যাপৃত থাকায় এবং অধিকাংশ সময় বিদেশে ভ্রমণ করায় তাঁহার নিকট তৎকালে আমার যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

প্রায় দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রসারোডের বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তখন তাঁহার বাংলা সাহিত্যে এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ। দেশের তাৎকালীন রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন "পাশ্চাত্য অনুকরণে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চল্‌ছে—তাতে আমার কোনও আস্থা নেই। যার যেটা নিজ স্বভাব—সে সেইটে দেশের জনসাধারণের নামে চালাচ্চে। জনসাধারণের ভাব, আকাঙ্ক্ষা বা অভাব বুঝ্‌তে দেশের কোন নেতাই চেষ্টা করেন না। শুধু দেশের নামে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করচেন। এই সব shame agitation এর আমি বিরোধী।"

আমি বলিলাম "Mass এর কি কোনও মত আছে? তারা বক্তৃতা শুনবে, হাততালি দেবে, আর বড় বড় বক্তাদের চেলা হ'য়ে ছোট ছোট Gladstone or Edmund Burke হ'বে।"

তিনি বলিলেন—"এই মোহ থেকে দেশকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেশের জনসাধারণ যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সমস্ত বিষয় জান্‌তে ও বুঝ্‌তে পারে সেইরূপ organisation করা দরকার।—তা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি, জগতের যে কোনও দেশের চেয়ে আমাদের দেশের লোক অনেক গুণে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। তারা দেশের কোন্ কাজটা ভাল, কোন্ কাজটা মন্দ, অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারে। বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে জনসাধারণকে দলবদ্ধ ক'রে কাজ কর্‌লে তার শক্তি কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। প্রাচীন ভাবকে ভিত্তি ক'রে নূতন গড়্‌তে হ'বে।" পরে দেশের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, "পাশ্চাত্য দেশের Industrialism ধীরে ধীরে আমাদের দেশে প্রবেশ কর্‌ছে, কল কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের গরীবেরা ইউরোপের গরীবদের মত নৈতিক চরিত্রহীন হ'য়ে নিষ্পিষ্ট হবে—তা থেকে দেশকে রক্ষা কর্‌তে হ'বে। Cottage industry যাতে revived হয় তার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। মূল কথা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে আত্মশক্তির উপর জাতকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হ'বে।"

পরে অন্য দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, কেহ কেহ বলেন যে, আমরা ধর্ম্ম নিয়ে আছি—রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোনও সংশ্রব নেই—আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী—আমরা ধর্ম্ম বা রাজনীতি বুঝি না। বাস্তবিক আমি এঁদের কথার ভাব বুঝ্‌তে পারি না। জীবনটাকে যে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ভাগ করা হয় তা আমাদের দেশীয় ভাব নয়—ওটা একেবারে পাশ্চত্যভাব। সব নিয়ে আমাদের জীবন।"

আধুনিক সভ্যতা ও অন্যান্য দেশের আচার্য্য ও মহাপুরুষদের আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "বাংলা দেশের সঙ্গে আর কোনও দেশের তুলনা হয় না। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য

জন্মগ্রহণ ক'রে যে সভ্যতা ও culture দিয়ে গেছেন—তা আমার বিশ্বাস সব দেশকে নিতে হ'বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমরা সেটা ঠিক্ গ্রহণ করতে পারলে আর কিছু আবশ্যক হ'বে না।"

বোধ হয় ১৯১৭ খৃস্টাব্দে বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবোপলক্ষে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ দ্রব্য বাবদ ২৫০৲ শত টাকা সংগ্রহ করিতে আমাকে আদেশ করেন। আমি প্রথমে কোনও একজন হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারের নিকট যাই, তিনি ৫০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে আমি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনের নিকট গিয়া বলিতেই তিনি বলেন, "কত টাকা তুলেছ ?" আমি বলিলাম "কোন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৫০৲ দিয়েছেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তোমার আর কোথাও যেতে হ'বে না—বাকী দুই শত টাকা আমি দিব।" এই সংবাদ শুনিয়া মঠের স্বামিজীরা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মহোৎসবে তাঁহাকে মঠে উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ আমাকে অনুরোধ করিতে বলেন। আমি যখন প্রথমে তাঁহাকে স্বামিজীদের অনুরোধ জানাই তখন তিনি বলেন, "শুনেছি সেখানে বেজায় ভিড় হয়। অতো ভিড়ে যাওয়া আমার পোষাবে না। অন্য দিন না হয় সপরিবারে গিয়ে দেখে আসবো—কি বল ?"

উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনি না জনসাধারণের সঙ্গে মিশ্‌তে চান—তবে ভিড় দেখে ভয় পেলে চলবে কেন ? যেখানে হাজার হাজার লোক এক ভাবের প্রেরণায় ও উন্মাদনায় সম্মিলিত হয়—যে নিরক্ষর মহাপুরুষের আবির্ভাবে বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার মধ্যেও প্রাচীন সনাতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা হ'চ্চে এবং যাঁর সাধনার বাণী স্বামী বিবেকানন্দ বজ্র নির্ঘোষে জগতে প্রচার ক'রেছেন—বাংলা দেশের যুবকবৃন্দকে সেবা ধর্ম্মে মাতিয়েছেন—শুধু ভিড়ের ভয়ে সেখানে যাবেন না ? দেশের একটা অপূর্ব্ব ভাবের দৃশ্য দেখ্‌বেন না ?" চিত্তরঞ্জন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—আমি যদি মেয়েদের নিয়ে উৎসবের পূর্ব্বদিন গিয়ে পরদিন উৎসব দেখে সন্ধ্যাকালে চ'লে আসি, তবে আমাদের জন্য আলাদা একটা নিরিবিলি স্থানের ব্যবস্থা কি হ'তে পারে ? তুমি মঠে স্বামিজীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমাকে সংবাদ দিবে।" মঠের স্বামিজীরা ও স্বামী প্রেমানন্দজী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং মঠের উত্তর পার্শ্বের যে বাগান বাড়ী পূর্ব্বেই মহোৎসবোপলক্ষে তাঁহারা ভক্তগণের থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—একণে উহা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। আমি এই সংবাদ দিলে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "তবে নিশ্চয়ই যাব।"

উৎসবের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইতেছে এমন সময়ে চিত্তরঞ্জন বেলুড় মঠে মটরে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও একজন আরদালী। মঠের পার্শ্ববর্ত্তী বাগান বাড়ীতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার কন্যার শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি মেয়েদের লইয়া আসিলেন না—ইহা তিনি স্বামী প্রেমানন্দজীকে বলিলেন।

উক্ত বাগান বাড়ীতে সেদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে নানা আলোচনায় রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান ও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, "প্রাচীন সাহিত্যে যেমন ভাবের জমাট ও রসের বিকাশ দেখা যায়—বর্ত্তমান সাহিত্যে সেরূপ দেখা যায় না। এখনকার সাহিত্য যদিও বেশ জমকালোভাবে সাজানো তবুও যেন কেমন নির্জ্জীব ও প্রাণহীন, শুধু যেন ইংরেজীর আওতায় বাড়্‌চে।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন যে প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে তুমি যা বল্‌লে—তা ঠিক। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যেও সৌন্দর্য্য ও কলাকুশলতা আছে। তবে দেশী আর বিলাতী ফুলে যে প্রভেদ।

আমি বলিলাম "আমার বোধ হয় যে প্রাচীন সাহিত্যে যে রসের ও ভাবের অভিব্যক্তি হয়েছে—যে আর্ট আছে—তা দেশের চাষী থেকে রাজা জমিদার পণ্ডিত সমানভাবে এক আসরে ব'সে রসের আস্বাদন কর্‌তে পার্‌তেন—সৌন্দর্য্যে অভিভূত হতেন। দেশের জনসাধারণের ভিতর তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সাথে প্রাচীন সাহিত্য যেন জড়িত। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের রস আস্বাদ করেন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজ। এখনকার সাহিত্যের রস আস্বাদন কর্ব্বার ক্ষমতা কৃষক কুলি মজুর বা অশিক্ষিত সমাজের নেই।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন "হাঁ। সে ভাবের শেষ হয়েছে দাশু রায় আর ঈশ্বর গুপ্তে। যেদিন থেকে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানী হ'য়ে তাহা আমাদের ভাষায় মিশে যেতে লাগ্‌লো—অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে তা তত দুর্ব্বোধ হ'তে লাগ্‌লো। এখনকার সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হচ্চে যে আমরা শিক্ষিত সমাজ সব বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে পেছনে ফেলে দিয়ে নিজেদের একটা গণ্ডী তৈয়ার কর্‌চি,—ধর্ম্ম, সমাজ রাজনীতি বা সাহিত্য—সব বিষয়ে। তাই কোনটাতে প্রাণের সাড়া নেই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সেটা কেন হয়? ভাষাও কি কঠিন হয়েছে?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "ভাষা কঠিন বা কোমল ব'লে কোনও কথা নেই। আগেকার ভাষার শব্দবিন্যাস দেখ্‌তে গেলে এখনকার অনেক শিক্ষিতের পক্ষেও তাহা দুর্ব্বোধ্য। দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায় যে কোন কবিতার শব্দের অর্থ কর্‌তে পার্‌তো বা বুঝ্‌তে পার্‌তো—এটা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু প্রাচীন কবিরা এমন একটা সুরের সৃষ্টি ক'রে রসের সঞ্চার কর্‌তেন—যে জনসাধারণে তা বুঝ্‌তে পার্‌তো—সে রসের আস্বাদ কর্‌তো—তার প্রাণে সাড়া পড়্‌তো। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবির গান সেভাবে অশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষিত কর্‌তো—যদিও এখানকার মত স্কুলের শিক্ষা ছিল না।" এইরূপে সাহিত্যের আলোচনা হইতে হইতে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল।

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "আমাদের দেশে ধর্ম্মসাধনার একটা গূঢ় মর্ম্ম আছে যেটা না ধর্‌তে

পার্‌লে সে ভাব রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ও সাধকদের ভিতর সেই মর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। বিজয় কৃষ্ণের জীবন আলোচনা কর্‌লে বোধ হয়, তিনিও তাঁর গুরুর সাহায্যে সেই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ ক'রেছিলেন। রামকৃষ্ণের জীবনে সেটা বেশ পরিস্ফুট ছিল। বল্‌তে কি, গৌরাঙ্গের জীবন পাঠ ক'রে আমি প্রাণে একটা সাড়া পেয়েছিলাম। বর্ত্তমান কালের artificial life কিম্বা artificial religion আমাকে বিন্দুমাত্র তৃপ্তি দিতে পারে না। বাংলা দেশকে বুঝ্‌তে হ'লে গৌরাঙ্গ ছাড়া বুঝা যায় না। গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব জীবন ও সাধনা এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী গান আমাকে নূতন আলো দেখিয়েছে। আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় যদি কোনও সাধু মহাপুরুষ আমাকে সেই মর্ম্মস্থলে পৌঁছুতে সাহায্য করেন।"

আমি বল্লাম "তবে সব ছেড়ে দিয়ে আপনাকে সন্ন্যাসী হ'তে হবে।"

হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "কুষ্ঠিতে আমার সন্ন্যাস-যোগ আছে।"

চিত্তরঞ্জন আরও বলিলেন, "আমার জীবনের পরিবর্ত্তন আনিয়াছে গৌরাঙ্গ। সঙ্গদোষে জীবনে নানা রকম দোষ আমার ঘটেছে, কিন্তু গৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেম মূর্ত্তি আমার সব সংস্কার সব দোষ দূর ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। মহাপ্রেমের—মহাভাবের কি মহান্ পরিপূর্ণ আদর্শ! আমার মনে হয় এই সাধন-রহস্য জানা মহাপুরুষদের সাহায্যসাপেক্ষ।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। আমরা সকলেই তখন শয়ন করিলাম। পরদিন প্রভাতে বেলুড় মঠে মহোৎসব। দলে দলে লোক আসিতেছে—দলে দলে কীর্ত্তন সম্প্রদায় উৎসবে যোগদান করিতে আসিতেছে। প্রায় বেলা ৯টার সময় চিত্তরঞ্জনের ঘুম ভাঙ্গিল—তিনি প্রায় বেলা ১১টার সময় মঠ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে গগনভেদী হরিনামের রোল উঠিতেছে—শ্রদ্ধানতহৃদয়ে লোকে সেই নাম শ্রবণ করিতেছে। চিত্তরঞ্জন প্রত্যেক কীর্ত্তন দলের নিকট গিয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইয়া শুনিতেছেন। পরে একস্থানে বহুলোকের ভিড় দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কি হচ্ছে?"

আমি বলিলাম, "প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে।"

তিনি সে দিকে গিয়া দেখিলেন, প্রসাদগ্রহণ করিতে লোক দলে দলে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে এক পংক্তিতে বসিয়াছে। উহার ভিতর দুয়েকটী গরীব মুসলমান ও একটী আমেরিকান ছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্তরঞ্জন মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "বা! এর চেয়ে কোনও সংকীর্ত্তন বড় নয়। কি সুন্দর! মিশন ধীরভাবে কি মহাপ্রেমের প্রচার করচেন।"

স্বামী প্রেমানন্দজী তখন তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য প্রসাদ উক্ত বাগানবাড়ীতে পাঠাইবেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, আমি এখানেই প্রসাদ গ্রহণ কর্‌বো। এমন তীর্থস্থান ছেড়ে বাগান বাড়ীতে খেতে যাব না।"

এই বলিয়া চিত্তরঞ্জন সেই জনসাধারণের সঙ্গে এক পংক্তিতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে আনন্দে বসিয়া গেলেন। পরে উৎসব প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রে উক্ত বাগান বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহার সঙ্গী আরদালী আমাকে বলিল যে, ঐসব খিচুরী খাওয়ায় তাহার সাহেবের তবিয়ত খারাপ হইয়া যাইবে। নিশ্চয়ই সাহেবের কোনও বেমারি হইবে। অপরাহ্ণে কথাপ্রসঙ্গে আমি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনকে বলাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেন আমি কি বাঙ্গালী নই—ওটা কি মনে করেছে?"

পরদিন সন্ধ্যাকালে আমি রসারোডের বাড়ীতে গেলে তিনি শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবীর স্বাক্ষরিত একটী ২৫০৲ টাকার চেক আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, "দেখ ২০০৲ টাকা আমার প্রতিশ্রুত ঘিয়ের দাম দিলাম। বাকী ৫০৲ টাকা যে সব চাকর ও বামুন উৎসবে মঠে কাজ ক'রেছে—তাদের বক্‌সিস্ দিলাম। ইহা স্বামিজীদের বল্‌বে।" আমি বাস্তবিক অবাক্ হইয়া তাঁহার মহানুভবতা ও বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। বাস্তবিক বেলুড়মঠের মহোৎসবে যে দরিদ্র পাচক ও ভৃত্যেরা নীরবে কাজ করে, কে তাহা দেখে? সকলেই মহোৎসবে চাঁদা দেয় কিন্তু তাহাদের কথা কে ভাবে?

একদিন সন্ধ্যাকালে গিয়া দেখি চিত্তরঞ্জন একাকী নিবিষ্টভাবে কি একটী বাংলা লেখা পড়িতেছেন। আমি তাঁহার তন্ময়তা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রবন্ধটী পাঠ শেষ হইবার পর চিত্তরঞ্জন আমাকে দেখিয়া বলিলেন "কখন্ এসেছ?"

আমি বলিলাম, "অনেকক্ষণ এসেছি? তন্ময় হ'য়ে কার লেখা পড়্‌ছিলেন?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন "আচ্ছা আমি প্রবন্ধটী পড়ে শোনাচ্চি কিন্তু তোমাকে বল্‌তে হ'বে কার লেখা।"

দেশবন্ধু যেন সমুদায় হৃদয় দিয়া প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন—প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই যে, আমাদের সনাতন আদর্শ হিমালয়ের শৃঙ্গের ন্যায়, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার আঘাতে হিমালয়ের এক কণা সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে না। যে আঘাত করিবে সেই আঘাত পাইবে। সত্যই চিত্তরঞ্জন প্রবন্ধটী অতি সুন্দরভাবে পাঠ করিলেন। আমি ২।১টী সাহিত্যিকের নাম করিলে তিনি বলিলেন, "না—তুমি বল্‌তে পার্‌লে না। প্রবন্ধটী অরবিন্দ বাবুর লেখা—নারায়ণের জন্য পাঠিয়েছেন।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "প্রবন্ধটী অতি মনোরম। যা সত্য নিত্য সুন্দর—তা কে বিনাশ কর্‌তে পারে? আমাদের প্রাচীন ঋষি বা কবি বা সাধু মহাপুরুষেরা যেটা উপলব্ধি ক'রেছেন এবং যার মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌঁছেচেন সেই সত্যই তাঁরা জগৎকে দিয়ে গেছেন—সেটা সত্য নিত্য শিবময় সুন্দর। আর্টের চরম আদর্শ তাই। এখনকার art artificial—তাই প্রাণ স্পর্শ করে না।"

চিত্তরঞ্জন বাংলার কথায় ও নারায়ণ পত্রে প্রচার করিয়াছিলেন যে, শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমগ্র জগতের মধ্যে বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলার একটা বাণী আছে—একটা ভাবের ধারা আছে যাহা বিশ্ব সভ্যতার পরিপুষ্টির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। চণ্ডীদাসের গানে সে বাণী মুখরিত হইয়াছে—বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলীতে ও সাধক রামপ্রসাদের মালসীতে সে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং বাংলার বাণী বৈশিষ্ট্য প্রেম ও ভাব মূর্ত্তিমন্ত হইয়াছে সোণার গৌরাঙ্গে। সোণার বাংলায় সোণার গৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমবিহ্বল মূর্ত্তি চিত্তরঞ্জনের মনোহরণ করিয়াছিল। যেমনি নারায়ণের পাদপদ্ম হইতে জাহ্নবীধারা জগৎকে পবিত্র করিতেছে—তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবের ধারা—প্রেম মন্দাকিনী—শুধু বাংলা নয়, ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিবে—ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। এই আদর্শের কিরণ সম্পাতে তাঁহার হৃদয়-শতদল প্রস্ফুটিত হইতেছিল। চিত্তরঞ্জনের "অন্তর্যামী"তে এই ভাবের বিকাশ পাইয়াছে এবং পাশ্চাত্যভাব, সভ্যতা ও বিলাসিতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়াও এই মহান্ আদর্শ তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। ধীরে ধীরে তিনি ঘরের সন্ধান পাইয়া ঘরে ফিরিলেন এবং সেই প্রেমমন্ত্রের সাধক হইলেন। তাঁহার সেই সাধনা প্রথমে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিল—"বাংলার কথা"য় তাঁহার মর্ম্ম কথা বলিলেন। সংকীর্ত্তনে তাঁহার দিন দিন অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। সেই মহাপ্রাণের প্রেরণা জাগিয়া উঠিল—দেশ প্রেমে। এই প্রেমেই তিনি রাজা হইয়া ভিখারী হইলেন, ভোগী হইয়া যোগী হইলেন এবং গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী হইলেন। এই প্রেমের মহামন্ত্রই তাঁহার প্রাণে, তাঁহার কর্ম্মে এই অপূর্ব্ব প্রেরণা দিয়াছিল। তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে—দাসত্বের বিরুদ্ধে—দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত: প্রাপ্য বরান্নিবোধত:" "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"। তিনি রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবে দেখিতেন না এবং বারংবার এই সত্যই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কাউন্সিলে যেমন সিংহ বিক্রমে সংগ্রাম করিয়াছিলেন—বাঙালীর তীর্থ তারকেশ্বরের অনাচারের বিপক্ষেও তেমনি রণসাজে সাজিয়াছিলেন। এই সংগ্রাম—এই রণসজ্জা—মহাত্মা গান্ধীর "অহিংসা"র উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জাতির মত নররক্তে—ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া নহে—শুধু প্রেম, ত্যাগ, ক্ষমা ও বৈরাগ্যের উপর এই রণনীতি প্রতিষ্ঠিত। দয়াল নিতাই কলসীর কাণার মার খাইয়াও প্রেম দিয়াছিলেন—এই অহিংস নীতি, সেই প্রেমের একটা আভাস মাত্র। চিত্তরঞ্জনের বৈষ্ণব ভাব-ধারায় এই অহিংসনীতি বেশ সামঞ্জস্য পাইয়াছিল। তাই চিত্তরঞ্জন কায়মনপ্রাণে এই প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া দেশসেবায়, জাতির সেবায়, জীবের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রেম যে বাধা চায় না—প্রেমের রূপই স্বাধীনতা। প্রেম চায় মুক্ত বিহঙ্গের মত নীলাকাশে উড়িতে—প্রেম চায় নিজের ভাবে আনন্দলাভ করিতে। কুলমানশীল ও অভিমান—শতবাঁধনে বাঁধা থাকিয়াও কেহ সেই প্রেমের গতিরোধ করিতে পারে না। তাই যাঁহারা প্রেমিক, সাধক,

তাঁহারা আসক্তির দাস নহে—মান সম্মান ও প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহে, তাঁহারা শুধু প্রাণ ঢালিয়া প্রেম বিতরণ করিয়া আনন্দলাভ করেন। বাংলার গোরার ভাবে আত্মহারা চিত্তরঞ্জন—প্রেম মন্ত্রের সাধক অনাসক্ত চিত্তরঞ্জন—ত্যাগ করিয়া—সেবা করিয়া—মুক্তির আস্বাদ পাইয়া—কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী! এই ভাবের মূল মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর—সোণার বাংলায় সোণার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কর—এই মহা প্রেম মন্ত্র প্রচার করিয়া ধন্য হও।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

মহাপ্রয়াণে

[দেশবন্ধুর স্মৃতি-সভায় গীত]

১

বঙ্গ-ললাটিকা-চন্দন
চিত্তরঞ্জন হে
জননী-চরণ-ধৃত পুষ্প
কোথা তুমি দেশবন্ধু ?

২

বৈভব বিষয় বিসর্জ্জন
বৃত্তি-বর্জ্জন হে
সাধন-সরোবর-হংস
কোথা তুমি দেশবন্ধু ?

৩

ভারত-সুত-ভয়-মন্থন
বৃত-বন্ধন হে
স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ
কোথা তুমি দেশবন্ধু ?

৪

শাসন-পাশ-বিমোচন
গণ-বোধন হে
মুক্তি বিঘোষণ-দূত
কোথা তুমি দেশবন্ধু ?

৫

পীত-অমিয়রস-সঞ্চিত
সুর-বন্দিত হে
মৃত্যু-সমাধি করি ভঙ্গ
ফিরে এস দেশবন্ধু !

৬

পাদ-পতিত-জন-বন্দন
হৃদি-নন্দন হে
ভকত-রুধির-পথ-চারী
ফিরে এস দেশবন্ধু।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

যখন একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনটনের সময় বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহকার্য্য বন্ধ করা হইয়াছিল, এবং যে ব্যক্তি আমার হাতে এই কাজ শিক্ষা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নগেন বসু মহাশয়ের লাইব্রেরী, অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের চিত্রশালা এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতীত বাঙ্গালা পুঁথি ও চিত্রসম্বলিত পাটার যোগান দিতেছিল, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসাএর নিবাসী সেই রামকুমার দত্তের পুঁথিসংগ্রহের কার্য্য যখন স্থগিত হইয়া আসিয়াছিল, তখন সে আসিয়া আমাকে একদিন বলিল, "আমি এখন তাঁতের কাজ সুরু করিয়া দেই; আমি তাঁতীর ছেলে, আর কি করিব? পুঁথি তো আপনারা নিবেন না!" আমি দেখিলাম, রামকুমার ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে নাই, যে এত কম খরচায় পুঁথির যোগান দিতে পারে। "এসিয়াটিক সোসাইটি" প্রতি পাতার জন্য /০ হইতে সুরু করিয়া /১০ এমন কি ৵০ আনা দিয়াও পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে পণ্ডিতের দ্বারা সংগ্রহ করেন, তাঁর বেতন ৫০।৬০ টাকা; তা ছাড়া তাঁর ভাতা বাবদ আরও ৫০।৬০ টাকা পড়ে। রামকুমারের মাহিয়ানা নাই, ভাতা নাই; তাকে পাতা পিছু আমরা ৲১০ কি ৲১৫ দিয়া থাকি, ইহাই সমস্ত খরচ। এ ব্যক্তিকে হাতছাড়া করিলে পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যের একটা বিষম বিঘ্ন হইবে। এদিকে সে এমন দক্ষতার সহিত একাজ করিতে পারে যে, পণ্ডিতেরা তাহা পারিবেন না। যেহেতু, বাঙ্গালা পুঁথি প্রায়ই ছোট লোকদের ঘরে পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে রামকুমার সহজেই ভাব করিয়া লইতে পারে। সে পুঁথিগুলির মোট নিজে মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বটতলার ছাপা বইএর ফেরি দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অনেক সময়ে অতি সহজে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে।

এহেন ব্যক্তিকে হাতছাড়া করা কখনই উচিত নয়,—এই ঠিক করিয়া আমি একদিন দেশবন্ধুর বাড়ী গেলাম। তাঁকে বলিলাম, "আপনি আপনার লাইব্রেরীতে বাঙ্গালা পুঁথির জন্য একটা জায়গা করুন।" তিনি তখনই কবুল। কেবল একটীমাত্র সর্ত্তে আমায় আবদ্ধ করিলেন, "আপনাকে পুঁথির ক্যাট্যালগ্ ক'র্‌তে হ'বে।" বেহালা হইতে আমি প্রায়ই তাঁর বাড়ী যাইয়া পুঁথিগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছি। রামকুমারের দ্বারা এইভাবে তিনি প্রায় দেড় কি দুই হাজার প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে আমি তাঁকে একদিন বলিলাম, "আমি তো আর পেরে উঠ্‌ছিনা। বেহালা থেকে এই বুড়ো বয়সে নানা কাজের মধ্যে এই পুঁথির কাজের অবকাশ ক'রে আনাগোনা করা আমার সাধ্যে কুলোচ্ছেনা। আপনি মাহিনা দিয়ে একজন লোক রাখুন।" তিনি বলিলেন, "আপনিই লোক দিন।" সাহিত্য পরিষদের পুঁথিবিভাগে একজন পণ্ডিত আছেন। তিনি একটু মিহিস্বরে কথা বলেন; আমি তাঁকেই এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া দিলাম।

শেষে স্বদেশী ভাব যখন বন্যার মত তাঁকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, যখন স্বদেশপ্রীতির উন্মাদনায় তিনি ঘর, বাড়ী, ধন দৌলত, ব্যবসায়, সমস্ত ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন, তখন সেই দেড় কি দুই হাজার পুঁথি সাহিত্য পরিষদ কোন্ সুযোগে কোন্ সময়ে যে লইয়া গেলেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ সাহিত্য পরিষদের সেই পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের পুস্তকাগারে এই বহুমূল্য দান বর্ষণের আনুকূল্য করিয়া থাকিবেন।

আর একদিন আমি গিয়াছিলাম, মনোহর সাঁই কীর্ত্তনের প্রসঙ্গে। আমার প্রস্তাবটি ছিল, বৎসর বৎসর ভাল কয়েকদল কীর্ত্তনিয়াকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইবেন, তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে পুরস্কার দেওয়া। আজকালকার বিলিতি হুজুগের দিনে তো আমাদের নিজস্ব বলিয়া যা' কিছু ছিল বা এখনও আছে, তাহার আদর উৎসাহ দেওয়ার কেহ নাই। এজন্য যা' কিছু ভাল জিনিষ, তা' দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

দেশবন্ধু আমার প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "আমি এজন্য দুই হাজার টাকা আপাততঃ দেব।"

আমি এই কথা সার আশুতোষকে বলিলাম। যিনি বীরবিক্রমের জন্য "ব্যাঘ্র" পদবী পাইয়াছিলেন, তিনি যে মনোহর সাঁই কীর্ত্তনের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা তো কল্পনার অতীত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বলিলেন "এ প্রস্তাব অতি উত্তম। আমি কমিটির সভ্য হব।" চিত্তরঞ্জন সার আশুতোষের সম্মতিতে ভারি খুসী হইলেন। তখন সার আশুতোষের বাড়ীতে সমিতির প্রথম বৈঠক আহ্বান করা হইল। সভায় উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন, সার আশুতোষ, ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। আমি সম্পাদক নিযুক্ত হইলাম।

অনেকগুলি কাজের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে সে সকল কাজ না করিতে পারায় কীর্ত্তন সমিতির কোনও কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তার পর, হঠাৎ ধনকুবের ভিক্ষুর দীক্ষা লইয়া যখন দীনহীন বেশে দেশের সেবায় লাগিয়া গেলেন, তখন তাঁর কাছে সেই প্রতিশ্রুত অর্থ চাহিবার কোনও অবকাশ রহিল না।

আর এক দিনের কথা। আমার একটা প্রস্তাব ছিল, একটু বড় রকমের। কলিকাতায় হিন্দুদের নিয়ে একটা দুর্গোৎসব করা। কংগ্রেস প্যাণ্ডালের মত একটা বড় মণ্ডপ স্থাপন করিয়া, কলিকাতাবাসীর কাছ থেকে চাঁদা তুলিয়া একটা মস্ত বড় জাতীয় উৎসবের সৃষ্টি করা। এই উৎসব নানাবিভাগে দেশীয় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি সাধনের কেন্দ্র স্বরূপ হইবে। ইহার সংশ্লিষ্ট মেলা বা প্রদর্শনীতে দেশীয় সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎসাহ দেওয়া হইবে। পূর্ব্বকালে শ্রাদ্ধাদির সময় যেরূপ হইত, এই উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আহুত হইয়া সামাজিক নানা সমস্যার

সমাধান করিবেন। কবি, শিল্পী, ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি গুণীরা পুরস্কৃত হইবেন। দুর্গাপূজার নামে চাঁদা না দেবে, হিন্দুসমাজে এমন লোক বিরল। সুতরাং এই উৎসবে কলিকাতায় পাঁচ লক্ষ টাকা উঠানও খুব শক্ত ব্যাপার হইবেনা। আমার প্রস্তাবটি ছিল যে, হিন্দুসমাজের বারমাসের তের পার্ব্বণ তো মাটী হইয়া গেছে, এই উৎসবটা জাগাইয়া তুলিয়া নব ছন্দে ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে হিন্দু জাতির পক্ষে ইহা একটা সঞ্জীবনী শক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশবন্ধুর একটি বন্ধু আমাকে বলিলেন, "দেশবন্ধু হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপনের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত। এই প্রস্তাব কি তিনি গ্রহণ করিবেন?" আমি বলিলাম, "উৎসবের একটা দিকে পূজা অর্চ্চা থাকিবে। অপর একটা দিক থাকিতে পারে, যাহাতে শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে দেশের হিতচর্চ্চা অনুষ্ঠিত হইবে। পূজা অর্চ্চনার দিক্‌টার সঙ্গে তাহার প্রকাশ্যভাবে কোন সম্বন্ধ থাকিবেনা। সেই বিভাগে আরবী, পার্সী প্রভৃতি ভারত-প্রচলিত বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য পারিতোষিক দেওয়া যাইতে পারে। এই হিসাবে ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টান কোন জাতিই বাদ পড়িবেন না।"

আমি কাঁঠাল পাড়ায় চিত্তরঞ্জনের নিকট নিজে এই প্রস্তাব উল্লেখ করিয়াছিলাম। "আপনি ইচ্ছা করিলে এইরূপ একটি জাতীয় উৎসবের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন। আপনি ইহা যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, বঙ্গদেশে আর এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যিনি তেমন করিয়া ইহা সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারেন।"

দেশবন্ধু বলিলেন, "এই প্রস্তাব খুবই ভাল। কিন্তু এতদিকে আমার কার্য্যক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে যে কর্ম্মক্লান্ত দেহে আমি এই ব্যাপারে হাত দিতে সাহস পাইতেছি না। কিন্তু যদি কেহ এই অনুষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিবার মত পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত হন, তবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাতে যোগ দিতে পারি।"

আমাদের পোষ্ট গ্রাজুয়েটের বঙ্গভাষা বিভাগে তিনি মাসিক দুইশত টাকা দিতে স্বীকৃত ছিলেন। তিনি রাজতক্তা ছাড়িয়া দিয়া যে দিন কাঙ্গাল সাজিলেন, সেদিন সেই দানের মাথায়ও বাজ পড়িল।

বস্তুতঃ তাঁহার দেশসেবার সন্ন্যাসগ্রহণে যেন মস্ত বড় একটা অশ্বত্থবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল; চারিদিক হইতে এই দীনহীন দেশের দুঃস্থ ব্যক্তিরা নৈরাশ্য ও দুঃখের অন্ধকারে দিগন্তবিহারী পক্ষিকুলের ন্যায় কলরব করিয়া এই বৃক্ষের শাখায় আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হইত; তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল। যে মধুচক্রে খোঁচা দিলেই রস পাওয়া যাইত, সে মধুচক্রের ভাণ্ডার ফুরাইয়া গেল। কেউ তো ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া তাঁহার বাড়ী হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। এই যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি, যাদের সহায় নাই, সম্পদ নাই, যাহারা সংখ্যায় সাত কোটি, যাদের দৈন্য এবং প্রাণান্তকর কষ্টও ভাগ্যিত্ব্যের বিবর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেহেতু এই বিরাট ভার গ্রহণক্ষম স্কন্ধ এদেশে একটিও নাই, যাদের দৈন্যের বিশালতাই তাহাদিগকে লোক-সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই

জাতির কাছে চিত্তরঞ্জন যে কত প্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ, দেশ সেবায় সর্ব্বস্বদানের সংবাদ সমস্ত দেশকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। শত শত দীন দরিদ্রের পক্ষে তাঁহার এই নবজীবন একটা মস্ত বড় দুঃসংবাদের মত বুকে বাজিয়াছিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য যে ছিল তাঁর আরও বড়। এবার ব্যক্তিগত হিসাবে দান নহে, সমস্ত দেশের দুর্গতি দূর করিতে হইবে। এবারকার দান ধন নহে, এবারকার দান ধন হইতে বড়,—প্রাণ। এবার কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীতে আর তাঁহার মহতী সমবেদনা ও হৃদয়ের ব্যথা আবদ্ধ রহিল না। তিনি নিজকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দিলেন,—দেশের জন্য। এবার তাঁর প্রাণ শুধু তাঁর সম্প্রদায়ের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিলনা, এবার তাঁর প্রাণ বাঁটিয়া লইল—হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান। ধনভাণ্ডার দান করিতে করিতে শেষ হয়; কিন্তু দানশীলতায় প্রাণ আরও বড় হইয়া মহাপ্রাণ হয়। দেশবন্ধু হইলেন "মহাপ্রাণ"।

তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিজে দরিদ্র না হইলে এদেশের দারিদ্র্য দুঃখ তিনি বুঝিতে পারিবেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাজতক্তা হইতে জনসাধারণের প্রতি সানুকম্প দৃষ্টিপাত করিলে তাহাতে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম হয়না। এজন্য রাজতক্তা ছাড়িয়া তিনি ভিড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ব্বসাধারণের কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেওয়ার জন্য তিনি দীনহীনদের কাছে, তাঁদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনেত্রে তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। তাহারা বুঝিল, তিনি তা'দেরই একজন। এইবার সমস্ত ভেদ দূর হইল। তিনি তো ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু মস্ত বড় জনসাধারণের ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া তিনি আর হিন্দুসমাজ হইতে দূরে থাকিতে পারিলেন না। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের আপনার জন করিবার জন্য তিনি হিন্দুর দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে; তাঁহার বিশাল বক্ষ মুসলমানকে যেরূপভাবে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিয়াছিল, সেভাবে অন্য কোন হিন্দু এপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কোল দিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রতি সার্ব্বজনীন প্রীতি, সমস্ত বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ করাইয়া তাঁহাকে লোকপ্রীতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করাইয়াছিল।

গত বৎসর এমন দিনে আমরা কাঁঠাল পাড়ায় গিয়াছিলাম। তিনি তথাকার বঙ্কিম-স্মৃতি-সভার প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন; আমি সাহিত্যশাখার নেতৃত্বে মনোনীত হইয়াছিলাম। সেদিন সেই প্রখর ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, অশনিপাতের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্নের অভিসম্পাতে যখন আমি ভস্ম হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, সেদিন দেশবন্ধুর মৃদুহাস্যমণ্ডিত উৎসাহ আমার কাছে যে কি অমৃতময় বোধ হইয়াছিল, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিব না। তাঁহার অভিভাষণটি হইয়াছিল ছোট্ট, কিন্তু সেই ছোট্ট কথাগুলি তাঁহার চোখের কোণার জলসম্পৃক্ত হইয়া হীরার মত মূল্যবান্ হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ তাহা শুনিয়াছিলেন,—রুদ্ধনিশ্বাসে, আগ্রহের সহিত। যখন বঙ্কিম-স্মৃতির চাঁদার খাতা উপস্থিত হইল, তখন দেশবন্ধু গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ভিখারী, আমি কি দেব?" এই কথায় বুড় জলধর দা একেবারে কাঁদিয়া

ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি ভিখারী একথা ব'লো না, একথা যে শেলের মত আমাদের বুকে বাজে। তুমি রাজরাজেশ্বর, তুমি আমাদের প্রাণের দেবতা।" তখনই স্বরাজপক্ষ হইতে কোনও ব্যক্তি দেশবন্ধুর নামে একশত টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দেশবন্ধু ছিলেন ব্যবহারাজীব। তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম সাংসারিক জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, সরকারী আইন পদদলিত করিয়া স্পর্দ্ধার সঙ্গে অগ্রসর হইলে আমরা টিকিয়া থাকিতে পারিব না। এইজন্য তিনি ব্রিটিশ সিংহাসন ও বিচারালয়ের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া শাসনতন্ত্রের অত্যাচার শোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হইয়াছিল। তিনি রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে একটা সাম্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রসূত দেশহিতৈষণা ও রাজশক্তির সমন্বয়। যাহারা আপাততঃ স্বশক্তির মোহ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন, তাঁহারা শেষে বুঝিবেন, দেশবন্ধু দেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও বিদেশের শত্রু ছিলেন না। তাঁহার হৃদয় ছিল বিশ্বপ্রেমের ভাণ্ডার, তাঁর মধ্যে একটুও ভেল ছিল না। তিনি মনস্বিতায় এত বড় ছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচার করিয়াও তিনি নিজের মত বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এত বড় মনস্বী হইয়াও দেশবন্ধু দেশবিজয় করিয়াছিলেন, হৃদয় দিয়া। এত বড় হৃদয় বাঙ্গালীর মধ্যে আর কাহারও নাই। বাঙ্গালা দেশের কান্নায় যে হৃদয় নিরন্তর হাহাকার করিত,—যে হৃদয়ের চাপা কান্নায় সমস্ত বঙ্গদেশের নরনারীর আর্ত্তনাদ যেন ভাষায় মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইত, সেই হৃদয়ের স্পন্দন চিরতরে থামিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কোকিল এই শোকগাঁথা সপ্তম সুরে চড়াইয়া গাহিয়া আকণ্ঠ বাতাস বিদীর্ণ কর। বাঙ্গালার কেয়ার ঝাড়, মল্লিকার শ্রেণী সেই হৃদয়ের কথাসুরভি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দাও। পূর্ব্ববঙ্গের ধলেশ্বরী ও পদ্মা তোমাদের উত্তাল তরঙ্গমালা লইয়া আছাড়িয়া পড় এবং তটদেশে মাথা খুঁড়িয়া দেশবন্ধুর বিজয় কাহিনী ঘোষণা কর। আজ নেপথ্যে বায়ু হাহাকার করিয়া গাহিতেছে, 'দেশবন্ধু নাই! দেশবন্ধু নাই!' আজ আমাদের চোখের মণি নিষ্প্রভ হইয়াছে, বঙ্গজননীর কোল শূন্য হইয়াছে। বাঙ্গালার ললাটের রাজটীকা মুছিয়া গিয়াছে। দেশবন্ধুর প্রতিভা,—যা' জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় আমাদের জাতীয় জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, তদভাবে বঙ্গমাতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কাঁদিতেছেন। বঙ্গদেশের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে তপ্তশ্বাস ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও শোকের অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

চিত্তচিতা

১

অরুন্তুদ কি যে ব্যথা মোরে আজ করে দেয় মূক
বক্ষ রাখে অশ্রু চাপি, রহি তাই বন্দন-বিমুখ।
ভাষা নাহি খুঁজে পাই, ভাব যায় হারাইয়া শোকে,
মুখরে নীরব দেখি, কত কথা বলে' যায় লোকে।

২

গৌরবের গৌরীশৃঙ্গ আশুতোষ পড়ে যবে ধ্বসি,
কহি নাই কোনো কথা, মুহ্যমান একা ছিনু বসি।
ভাবরাজ্যে ভূকম্পন গুঞ্জরণ দেয় ভোলাইয়া,
শোকের বৈশুমী বয়, মানসের তল ঘোলাইয়া।

৩

আজিকে আবার সেই সম্মুখেতে শোকের পাথার,
কালের অশনিপাতে হৈমগিরি হল চূরমার।
অহিংসার বোধিদ্রুম, ত্যাগের নীরব নিরঞ্জনা,
সম্মুখে শুকায়ে গেল চক্ষে মোর নাহি অশ্রুকণা।

৪

উর্জ্জ্বল জ্যোতিরাত্মা নয়ন ঝলসি দেয় মোর,
দেখিতে পাইনা ছায়া, উড়ে মরি বিহগ কাঁকর।
চঞ্চল প্লাবন যেন দশ দিক দেয় মগ্ন করি,
বক্ষের মৃণাল ভাঙে শতদল উঠে না মঞ্জরি।

৫

বিত্তহারা 'চিত্ত' সে যে বিধাতার অপার্থিব দান,
ফাল্গুনীর সৌম্য দেহে দধীচির ধ্যানমগ্ন প্রাণ।
তারে গড়েছিল বিধি মিশাইয়া অমৃত বিদ্যুতে
মণিকর্ণিকার ঘাট—জীব শিব, জীবনে মৃত্যুতে।

৬

'মালঞ্চ' ঝলসি' গেল, থেমে গেল 'সাগর সঙ্গীত',
গাণ্ডীবী মূর্চ্ছিত রথে এ কাহার করাল ইঙ্গিত?

যায় নীলচক্র দেখা, রথের যে দেরী নাই, আর,
অনন্ত পথের যাত্রী কোথা তুমি ? ডাকি বারবার।

৭

তুমি কবি; তুমি ধ্যানী, দৃষ্টি তব সৃষ্টি পারে যায়,
বর্ত্তমান সাঁতারিয়া ভবিষ্যের সুমেরু ছায়ায়।
তুমি গরুড়ের মত চিরদিন অমৃত সন্ধানী,
হৃদয় কৌপীন পরা, দীনতা-কৌলিন্যে অভিমানী।

৮

তোমার উদার বক্ষে মিশেছিল হিন্দু মুসলমানে
দেখা দিত আকবর প্রতাপ ও জয়মল সনে।
অসি আর বাঁশী তুমি মিলাইলে পরাইয়া রাখী,
না দেখি ইদের চাঁদ, হে ফকির, তুমি দিলে ফাঁকি।

৯

তোমার যা কিছু ছিল সব তুমি ত্যজেছিলে ত্যাগী,
দেশবন্ধু সর্ব্বহারা নিঃস্ব তুমি স্বদেশের লাগি।
ছিল শুধু স্নিগ্ধ শান্ত, ভীমকান্ত প্রাণটুকু পুঁজি
'বিশ্বজিতে' পূর্ণাহুতি তাও আজ দিয়ে গেলে বুঝি।

১০

বিশ্বাসী বৈষ্ণব তুমি, বংশীরব দংশিয়াছে কাণে,
প্রেমের শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়াছ কাহার সন্ধানে ?
ভীতির শৃঙ্খল ভাঙ্গে, ভাঙ্গে যে কংসের কারাগার
সে আজ দিয়েছে ডাক, মৃত্যু—কি মিলন অভিসার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেশবন্ধু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বড় বেহিসাবী ছিলেন। বেহিসাবী লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা পরের মঙ্গলের জন্য কোন লাভ বা কোন ক্ষতির হিসাব করেন না। কিসে পরের ভাল হইবে, কিসে দেশের উন্নতি হইবে তাহাই ভাবেন, নিজের তাহাতে কতখানি ক্লেশ, কতটা লোক্‌সান সহিতে হইবে তাহা ভাবিবার অবকাশ তাঁহাদের থাকে না। ইঁহারা দুনিয়ার সব ওলটপালট করিয়া দেন, কারণ ইঁহাদের যুক্তির ধারা সাধারণ মানুষে খুঁজিয়া পায়না, ইঁহাদের খেয়ালের বোধ হয় অন্ত নাই, আর খেয়ালের বশে, প্রাণের আবেগে যে ইঁহারা কি করিয়া বসিবেন তাহা হিসাবী মানুষেরা কল্পনাও করিতে পারে না। ইঁহারা দলে বেশী পুরু নহেন। তাহা হইলে বোধ হয় সংসার অচল হইয়া যাইত, নিত্য নিত্য নূতন করিয়া ভাঙ্গিবার ও গড়িবার হাঙ্গামায় বেচারা সাধারণ মানুষেরা অস্থির হইয়া পড়িত। কারণ বেতালে তাণ্ডব নাচিবার শক্তি বা সখ সকলের থাকে না। সাধারণ মানুষ চায় কতগুলি বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিতে ও বাঁধা বুলি আওড়াইতে আর ধীরে সুস্থে এক পা বাড়াইয়াই পিছনে সম্মুখে আশেপাশে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানিয়া তবে আর এক পা তুলিতে। কিন্তু যেমন বেজায় বে-নিয়ম সমাজের বরদাস্ত হয় না, তেমনই বেজায় নিয়মের কড়াকড়ি মানিয়া চলিবার মত জড়তাও কোন সমাজের দেহে নাই,—প্রকৃতির রাজ্যে ত নাইই। তাই দু'দশ বছর দিনের পর দিন আর রাত্রির পর রাত্রি, জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্ম আর পৌষ মাসে শীত যথানিয়মে চলে, রোজ পৃথিবী নিজের কক্ষে, নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন তার গা ঝাড়া দেয়। কিসের খেয়ালে ঠিক বলা যায় না কিন্তু তাহাতে মানুষের সৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে ওলটপালট হইয়া যায়, লোকবল ডুবিয়া যায়, টোকিয়ো পুড়িয়া যায় আর ছোটখাট কত দ্বীপ যে ভাসিয়া উঠে বা সাগরের অগাধ সলিলে হারাইয়া যায় তাহার ত হিসাবই নাই। পাহাড়গুলা বৎসরের পর বৎসর বেশ নিরীহভাবে দাঁড়াইয়া আছে, রাগের বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না, মানুষেরা বিনা উপদ্রবে তাহার গা চষিয়া আঙ্গুরের ক্ষেত বানাইতেছে। কিন্তু হঠাৎ বিশ পঞ্চাশ বৎসর পরে সে একদিন ফোঁস করিয়া উঠে, তাহার জলও নিঃশ্বাসে আশেপাশের বাড়ীঘর জমিজিরাত সব নষ্ট হইয়া যায়, ছাই ছুড়িয়া সে মানুষের গড়া শহরের কবর রচনা করে আর গলিত ধাতুর কঠিন আবরণে সে কবরের এমন মজবুদ আস্তরণ গাঁথিয়া দেয় যে তাহার স্তর ভেদ করিয়া হারাণ শহর খুজিয়া বাহির করিতে শ্রান্ত মানুষের অনেক দিন লাগে। কিন্তু ইহাতে কি কেবল প্রকৃতির ধ্বংসের অহেতুক আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না? লণ্ডন আগুনে পুড়িবার পর নাকি সেখানকার আবহাওয়ার উন্নতি হইয়াছিল। আর ভূমিকম্পের পরে নাকি রঙ্গপুর হইতে ম্যালেরিয়া একেবারে দূর হইয়াছে। দেশের সামাজিক ও

দেশবন্ধু ও শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

নৈতিক আবহাওয়াও অনেক সময়ে এই রকম তথাকথিত বে-নিয়মের দ্বারা শোধন করিয়া লইতে হয়, এবং সেই জন্যই যুগে যুগে সকল দেশেই দু'চার জন বে-হিসাবী লোকের দেখা পাওয়া যায়। যে রাজার প্রাসাদ ছাড়িয়া দুনিয়ার যত অপরিচিতের কল্যাণকামনায় অজানা জগতের যাবতীয় দুঃখক্লেশের পরিচয় লইতে বাহির হয়, সেত সাধারণের ধারণায় বেজায় বে-হিসাবী, নিতান্ত বোকা। কিন্তু আজ অর্দ্ধেক পৃথিবী গৌতমের বোকামীর জয় গান করিতেছে। চিত্তরঞ্জন নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া সমস্তই দেশের কাজে দান করিলেন, নিজের মাথা রাখিবার জায়গাটুকু রাখিলেন না, যে ব্যবসায় তাঁহাকে রাজার সম্পদ আনিয়া দিয়াছিল তাহাত পূর্ব্বেই একেবারে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, পত্নী, পুত্র, দুহিতা, দৌহিত্র কাহারও কথা ভাবিলেন না,—এমন মহৎ দান অসাধারণ ত বটেই, হিসাবী লোকের চক্ষে অনিয়মও বটে। কিন্তু বাঙ্গালার রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিশোধনের জন্য এমনই একটা অনিয়মের দরকার হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের আগে যাঁহারা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বেশ হিসাবী লোক। লিয়াকত হোসেনের কথা ছাড়িয়াই দিতে হয়, কেননা তাঁহাকে দেশের লোক নেতা বলিয়া মানে নাই, বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকে বাতুল বলিয়া অনুকম্পা করিতেন। বুদ্ধিমানের অভিধানে একনিষ্ঠতার মানে বাতুলতা। যাহা হোক আমাদের সে যুগের দেশ-নায়কেরা আদালতে ওকালতি করিতেন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেন, যৌথ কোম্পানী খুলিয়া তাহার ডিরেক্টর হইতেন, বিলাতী আসবাব না হইলে তাঁহাদের গৃহসজ্জা হইতনা, নিজের, স্ত্রীপুত্রের আত্মীয় স্বজনের সুখ সাচ্ছন্দের জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা অবসর মত বক্তৃতার দ্বারা দেশের সেবা করিতেন। হিসাব করিয়া জাতীয় ভাণ্ডারে কিছু কিঞ্চিৎ দিতেন। কিন্তু এরকম হিসাব করা সেবায় ত একটা পরাধীন জাতির উন্নতি সম্ভব নহে। অনেক পাপ না করিলে, জাতীয় চরিত্রে অনেক গলদ না থাকিলে ত একটা জাতি আর একটা জাতির পায়ের নীচে পড়িয়া যায়না। অবসরের সেবায় সে ত্রুটি, সে গলদ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কি করা যায়? পতিত ইটালীর যাঁহারা দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন সকল-ছাড়া সকল-হারা বেপরোয়া ফকির। দক্ষিণ আমেরিকার নির্ব্বাসনে গরীব গ্যারিবল্ডী রাত্রিতে আলো জ্বালিতে পারিতেন না, পয়সার অভাবে। য়ুরোপের সাত সাতটা দেশ হইতে তাড়িত হইয়া ম্যাটসিনি শেষে বিলাতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সেখানকারের ডাকঘরের কর্ত্তারাও আবার তাঁহার চিঠিগুলি খুলিয়া দেখিতেন। ধনীর সন্তান হইয়াও কেভুর বিবাহ করিবার অবসর পান নাই, দেশ সেবার মধ্যে তাঁহার আরাম বিরামের অবকাশ ছিল না। ভারতবাসীরও আজ এই রকমের অনন্তকর্ম্মী দেশ-সেবকের প্রয়োজন। তাই চিত্তরঞ্জন আসিয়া হাজার হাজার টাকা আয়ের ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন। সঞ্চিত অর্থ, ঘর, বাড়ী, মোটর গাড়ী বড়মানুষীর সকল উপকরণ হেলায় বিলাইয়া দিয়া ফকির সাজিলেন। আজ আর অবসর মত দেশসেবা করিয়া কেহ নেতৃত্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবেন না। এই ত্যাগের

আদর্শ ধর্ম্মজীবনে ভারতবর্ষ চিরকালই পূজা করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে চিত্তরঞ্জনই রাজনীতিতেও ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

কিন্তু বাঙ্গালার রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের ইহাই একমাত্র দান নহে। তিনি আইন মজলিসে এবং কংগ্রেসে একটা সুনিয়ন্ত্রিত দল গঠন করিয়া গিয়াছেন। এরকমের দল বিলাতে আছে, আমাদের দেশে এই নূতন। এই দল গঠনের জন্য তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রফা করিতে গিয়া তিনি মুসলমানদের প্রায় সকল দাবীই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেশের কথা—কোন সম্প্রদায়ের কথা ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন দেশ সকল সম্প্রদায়ের উপরে। একেবারে বেপরোয়া না হইলে তিনি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। হিন্দুসমাজের তরফে চিত্তরঞ্জন যে সর্ত্তে মুসলমানদের সহিত রফা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিজের দলের মধ্যেও অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে চাঞ্চল্য দূর হইয়াছে যখন লোকে কার্য্যতঃ চিত্তরঞ্জনের নীতির সার্থকতার পরিচয় পাইয়াছে। যাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে দলগত সঙ্কীর্ণতার দোষ দিয়াছেন তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এদেশে যে সকল দল আছে তাহাতে শৃঙ্খলার বন্ধন মোটেই নাই। সকলেই নিজের কথা ভাবেন নিজের দলের কথা ভাবেন না। সহজভাবে দেখিলে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, মৌলবী ফজলুল হক ও নবাব নবাব আলি চৌধুরী একই দলের লোক। ইঁহারা সকলেই নেতা, কে ছোট কে বড় তাহা অবশ্য জানিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রথমবার যখন স্যার প্রভাসচন্দ্র ও নবাব নবাব আলি মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং আইন মজলিসে তাঁহাদের দলের লোকেরা তাহাতে আপত্তি করেন নাই, তখন ধরিয়া লইতে হইবে তাঁহারাই বড় নেতা। কিন্তু দ্বিতীয় বার যখন লাট সাহেব প্রথম বারের মন্ত্রীদের না ডাকিয়া সেই দলেরই অন্য লোকদের মন্ত্রীগিরি দিতে চাহিলেন, তখন তাঁহারা সে চাকুরী লইতে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না। বিলাতে ইহা সম্ভব হয় না। এমন আচরণ করিলে সেখানে যত যোগ্যতাই থাকুক কাহারও কোন রাজনৈতিক দলে স্থান হয় না। বেপরোয়া চিত্তরঞ্জন জনসাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিচলিত না হইয়া এই যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত দল গঠন করিয়া গেলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে দেশের অনেক উপকার হইবে আশা করা যায়। দলের মধ্যে এখন হয়ত অনেক ত্রুটি আছে, সকল কাযেই প্রথম প্রথম অনেক ত্রুটি থাকে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার দৃঢ়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবার লোকের অভাব না হইলে অচিরেই এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর মনোরম মন্দির রচিত হইবে।

যাহাদের কথায় ও কাযে মিল আছে এমন লোক খুব কম। চিত্তরঞ্জনের কথায় ও কাজে মিল ছিল। এদেশে আজকাল শিক্ষিত লোকদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার কথা খুবই শোনা যায়। কিন্তু যাঁহারা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাঁহারাই ভুলিয়া যান যে, সাম্যই হইতেছে স্বাধীনতার ভিত্তি।

যদি নারীদিগকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হয় তবে তাহাদিগকে দুঃখ ক্লেশ অপমান অত্যাচার সহিবারও সমান অধিকার দিতে হইবে। দেশের জন্য যখন বহুলোক কারাবরণে অগ্রসর হইয়াছিল তখন চিত্তরঞ্জন তাঁহার পত্নী ও সহোদরাকে সেই পথে যাইতে অনুমতি দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই সকল বিষয়ে নর ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেন।

চিত্তরঞ্জন মানুষ সুতরাং তাঁহার দোষত্রুটিও ছিল। কিন্তু সাধুত্বের অভিনয় করিয়া তিনি কখনও ভণ্ডামীর অপরাধী হয়েন নাই। সূর্য্যমণ্ডলেও কলঙ্ক চিহ্ন আছে। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। একদল বুদ্ধিমান পণ্ডিত আছেন যাঁহারা প্রতিদিন অতুলনীয় অধ্যবসায়ের সহিত দূরবীক্ষণ লইয়া সূর্য্যের কলঙ্ক চিহ্নের সংখ্যা, পরিমাণ ও আয়তন স্থির করিতে ব্যস্ত থাকেন। সূর্য্যের প্রখর আলোকে ও উত্তাপের কথা তাঁহারা গভীর গবেষণার মধ্যে একেবারেই ভুলিয়া যান। সুতরাং যদি কেহ প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে চিত্তরঞ্জনের কলঙ্ক রটনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। চিত্তরঞ্জনের তিরোধানে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কতদিনে পূরণ হইবে বলা যায় না, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন—কবির ভাষায় তাহা বিশ্বের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কখনও তাহার কণা মাত্রও হরণ করিতে পারিবেনা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—কাণেই শুনিয়াছিলাম, ইতিহাসেই পড়িয়াছিলাম। গৌরাঙ্গ গৃহ ছাড়িয়া প্রেমধর্ম্ম বিলাইয়াছিলেন, সংসারের সকল মায়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দারিদ্র্য আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাহাও দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু আমরা এমন যুগে জন্মিয়াছি যে, সেই সিদ্ধার্থের রাজ্যত্যাগ সেই প্রেম বীরের গৃহত্যাগ সব একাধারে এক চিত্তরঞ্জনের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই আবার এত শীঘ্র চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়া বসিলাম। একমাত্র ত্যাগই যেন জীবনের মূলমন্ত্র লইয়া চিত্তরঞ্জন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেদিন ১৯০৯ খৃঃ অব্দে অরবিন্দকে বোমার মামলায় সমর্থন করিয়াছিলেন, সেদিনও যেমন ত্যাগ, যেদিন পিতার বিপুল পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিয়া দেউলিয়া অপবাদ মোচন করিয়াছিলেন সেদিনও যেমন ত্যাগ, আবার সমগ্র দেশবাসীকে স্বাধীনতার অমৃত পান করাইবার জন্য বঙ্গের দ্বারে দ্বারে স্বদেশ প্রেম বিলাইবার জন্য যেদিন নিজের সমুদয় ঐশ্বর্য্য ব্যারিষ্টারির উচ্চ পদ, পশার প্রতিপত্তি ছাড়িয়া রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন সেদিনও ঠিক সেই একই ত্যাগের আদর্শ পূর্ণরূপে দেখাইয়াছিলেন। ত্যাগই তাঁহার জীবনের সারধর্ম্ম। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে

বাসের বাড়িখানি অবধি দেশের কার্য্যে দান করিয়া একেবারে রিক্ত হইয়া গেলেন। মুক্তি লাভের যেন আর কোন বাধাই রাখিলেন না। এইরূপে আজীবন ত্যাগের মধ্য দিয়া যে গৌরবের উচ্চাসনে আসিয়া তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই গৌরবের পূর্ণ জ্যোতিঃতেই মহাপুরুষ স্বর্গের সন্নিকটে হিমালয় শিখরে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

কর্ম্ম জীবনের এই পূর্ণ গৌরবের মধ্যে লয় হইয়া যাওয়াটাই যেন মহাপুরুষের লক্ষণ। তাঁহাদিগের আবির্ভাবও যেমন দেশের দুর্দ্দশার অন্ধকারের দিনে দারুণ সঙ্কটের সন্ধি স্থলে,—তাঁহাদিগের তিরোধানও তেমনি, দিনের পরিণতি আসিবার, সায়াহ্ন হইবার, পূর্ব্বেই জীবনের মধ্যাহ্নলোকে আরব্ধ কর্ম্মের পূর্ণ দীপ্তির মধ্যে। কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য যেন এতটুকু অপেক্ষা সহেনা। যে অভাব দূর করিবার জন্য আসেন তাহার আরম্ভ করিয়া দিয়াই কেন যে এত দ্রুত তিরোহিত হইয়া যান তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। এই মর্ম্মান্তিক তিরোধান একাধিক মহাপুরুষের জীবনে দেখিতে পাই। অনাধিক এক বৎসর পূর্ব্বে এমনি করিয়া ভারতের অদ্বিতীয় পুরুষ স্যার আশুতোষের জীবন লীলা সম্বরণেও ইহার নিদারুণতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাই যদি ভগবানের ইচ্ছা তবে আর তাহার জন্য দুঃখ করিয়া করিব কি? তাঁহারা যে কার্য্য করিয়া গেলেন তাহার মধ্য দিয়াই ভগবান তাঁহাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিবেন। তাঁহারা স্বদেশের হৃদয়ে চিরজীবী হইয়া থাকিবেন। আমরা শুধু একটা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লইয়া তাঁহাদিগকে একবার স্মরণ করিতে পারিলেও আমাদিগের অনেক দুঃখের লাঘব হইবে।

লাখ লাখ টাকা উপার্জ্জন করিয়া একেবারে স্বেচ্ছায় সব ত্যাগ করিয়া পথে বসা কি কথার কথা। প্রাণে কত বড় অনুপ্রেরণা আসিলে, দেশের প্রতি কত বড় প্রেম জাগিলে, তবে মানুষ এই পথের পথিক হইতে পারে—এই সাধনার সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে। ভারতে ত্যাগের আদর্শের অভাব নাই। ত্যাগই ভারতের ধর্ম্ম কিন্তু যে ধর্ম্ম বহুদিন হইল শুধু মহাভারতের পত্রাঙ্কেই স্থানলাভ করিয়াছিল আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে তাহার নানা প্রকারে পরিচয় পাই। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে জানিতাম না পুরুলিয়াতে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে প্রতি মাসে দুহাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। নবদ্বীপের নিত্যানন্দ আশ্রমে দু'লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে আশাতীতরূপে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, কত দরিদ্র সাহিত্য-সেবক কবির গ্রন্থ ছাপাইবার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, কত দুঃস্থ ব্যক্তিকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিয়াছেন। জীবনে কত পুণ্যই না সঞ্চয় করিয়াছেন। জীবনে যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ অর্থ বিলাইবার জন্য নিজেকে কোনদিন এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন নাই। ইহা যে কত বড় উচ্চ সহৃদয়তার ও স্বদেশ-প্রীতির কথা তাহা সাধারণের ধারণাতীত।

যাঁহার হৃদয় জন্মাবধি এইরূপ পরদুঃখকাতরতায় দীক্ষিত, সিক্ষিত, সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা

দীনা লাঞ্ছিতা প্রপীড়িতা নিজের সেই দেশমাতৃকার দুঃখ বেদনা যে সর্ব্বগ্রাসী হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ত্যাগ মন্ত্রের গুরু মহাত্মা গান্ধি দেশের মধ্যে প্রতি দ্বারে দ্বারে যে সাড়া আনিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রাণ শুধু সে আহ্বানকে একটী জীবন্ত মূর্ত্তি প্রদান করিয়া দেশের কর্ম্মযজ্ঞে নিজেকে একেবারে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন মাত্র। দেশের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার এই আত্মাহুতির প্রভাবে, কত বাঙ্গালী যুবক মায়ের মুখের দিকে চাহিতে শিখিয়া তরুণ সন্ন্যাসী সাজিয়া তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি আজ সকলকে অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই চলিয়া যাওয়াটা যে দেশের পক্ষে কত বড় ক্ষতি তাহার পরিমাণ করিব কেমন করিয়া ! গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে রিফরম্‌ দিয়াছেন বলিয়া কত জাঁক করিয়া থাকেন, কত বাঙ্গালীও সেই রিফরমের গুমর করিয়া থাকেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাঁহার প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, সে রিফরম্‌ (Reform) তথাকথিত মাত্র, তাহা অন্তঃসারশূন্য, তাহার অভাবে দেশের কিছুই যায় আসে না। তেমনি সাহসে, বুদ্ধিতে, বাগ্মিতায় দূরদর্শিতায় বুরোক্রেসির (Bureaucracy) সম্মুখীন হইবার আর রহিল কে ? গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ রিফরম্‌ দানের ব্যর্থতা প্রতিপন্নই বা আর করিবে কে ? তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে কেহ Napoleonএর সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাঁহাকে Tribune আখ্যা দিয়াছেন। তিনি যে বীর ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু তাঁহার বীরত্ব এই ভারত বর্ষেরই অস্থিমজ্জাগত। ত্যাগের নৈতিক বলে তাহা অনুপ্রাণিত—বৈরাগ্যের গৈরিকস্রাবে তাহা পরিপ্লুত স্বচ্ছ সরস কল্পনায় উদ্ভাসিত। তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বরাজ্য লাভের সংগ্রাম মধ্যে তাঁহার এই কল্পনা রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পুরুষকার প্রতি পদে এই কল্পনার হস্ত ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই কল্পনার মধুরালোকে তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের আঁধার পথ দূরান্তর অবধি দেখিয়া লইয়াছেন এবং ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবনে লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিয়াও নির্ভিকচিত্তে চলিয়া ছিলেন। এই কল্পনার কোলে বসিয়াই তিনি আবার "নারায়ণের" সেবক হইয়াছিলেন, তাঁহার "সাগরসঙ্গীত" গাহিয়াছিলেন, বঙ্গকবিতাসাহিত্যে "কিশোর কিশোরী", "অন্তর্য্যামী", "মালঞ্চ" ও "মালা" গাঁথিয়া—বাণীর চরণ পূজা করিয়া গিয়াছেন। এ হেন চিত্তরঞ্জনকে আমরা হারাইয়াছি। যে ব্যবহারাজীবের জীবন তিনি পরিহার করিয়াছিলেন তাহার কৃতিত্বের কথা এখানে না বলিলেও চিত্তরঞ্জন যে তাঁহার জীবনের কত দিক দিয়া দেশের চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেশের কাযে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা আজ আমরা তাঁহার মৃত্যুতে বুঝিতে পারিতেছি। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার কল্পনার আহ্বান অনেক সময়ই আমাদিগের কাণে পৌঁছায় নাই। আজ তিনি দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। তাই কবির ভাষাতে বলিতে ইচ্ছা হয়,—

হেথায় সে অসম্পূর্ণ
সহস্র আঘাতে চূর্ণ
　　বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার
সম্পূর্ণতা আছে তাঁ'র
　　জীবিত কি মৃত ;

জীবনে যা প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
　　ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি
তাঁ'রে গাঁথিয়াছে আজি
　　অর্থপূর্ণ করি।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

———

"স্মৃতি-তর্পণ"

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আজ বাংলায়—এমন কি সমগ্র ভারতে—হাহাকার পড়িয়াছে কেন? রাজা মহারাজা বল, নরমপন্থী চরমপন্থী বল, দোকানী পসারী বল, সকলের মধ্যেই ক্রন্দনের রোল কেন? যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কখনই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এমনকি বিপরীত মতাবলম্বীও ছিলেন, তাঁহারাও আজ সমস্বরে তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল শোক প্রকাশ করিতেছেন তাহা নয়—তাঁহার গুণকীর্ত্তনেও শত মুখ। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা দেখিতেছি; অনেকেই ইঁহার পূর্ব্বে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সত্য কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্ম্মা ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এইপ্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি নাই। যিনি ভোগলালসা ও বিলাসিতার মধ্যে আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সেও তাহাতে ডুবিয়াছিলেন তিনিই এক মহাশুভ মুহূর্ত্তে দেশের পক্ষে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণে, সকল ছাড়িয়া রিক্ত হইয়া, বহুশতাব্দী পূর্ব্বেকার কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের ন্যায় পরিণাম বিবেচনা না করিয়া, ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। হয়ত তিনি আর্ত্তা, বিপন্না, লাঞ্ছিতা দেশমাতার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। দেশের কাজে এ প্রকার আত্মোৎসর্গ, এ প্রকার জীবনাহুতি কখনও দেখি নাই—আর দেখিব কিনা তাও জানিনা। সকলেই আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, হাঁ, বাঙ্গালীর ঘরে একটা মানুষ জন্মেছিল বটে! যে নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসান গণনা না করিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায়, স্বরাজ সাধনায় তাঁর সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন—সেই নিয়োগের ফলেই আজ এমন অসময়ে তাঁর বিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবন্ধু মরেন নাই—তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মে ও বাষ্পে পরিণত—পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে মাত্র। তাঁহার অমর ও সাধু দৃষ্টান্ত আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই মধ্যে জাজ্বল্যমান। এই প্রকারের মানুষ মরিয়াও অমর হয়। ভগবান করুন যেন তাঁর চিতা-বাষ্প সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাসে মিলাইয়া গিয়া নিশ্বাসের সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁর সুমহান আদর্শে ও অনুরাগে, প্রদীপ্ত প্রতিভা ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে। ভারতের জননীগণ যেন এই প্রকার সন্তানই গর্ভে ধারণ করেন।

" সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে।
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন ॥ "

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

কবি চিত্তরঞ্জন

ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন, ত্যাগী, কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনের পরিচয় বাঙ্গালী ভাল করিয়াই জানে; কিন্তু কবি চিত্তরঞ্জনের পরিচয় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কেন, শিক্ষিত বাঙ্গালীও ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টা করে নাই। চিত্তরঞ্জন জন্ম কবি—কবিতার প্রভাব তাঁহার সমগ্র জীবনে চিরভাস্বর প্রভায় দীপ্যমান ছিল। কবিপ্রতিভা, কবিহৃদয়, কবির গভীর অনুভূতি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কবি—বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সমগ্র বঙ্গের প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর প্রাণের ধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম ও প্রচেষ্টার মূল উৎস স্বরূপ যে কবিপ্রতিভা ও কবিহৃদয়, বাঙ্গালী তাহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করে নাই। চিত্তরঞ্জনের রচিত কাব্য গ্রন্থাবলীর সম্বন্ধে বাঙ্গালী উপযুক্ত আলোচনা করে নাই। তাঁহার বিরাট ত্যাগ ও অনাবিল প্রেমের বন্যা কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়া হিমকিরীটী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে কন্যা কুমারীর তটপ্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া দিয়াছে তাহার মূলসূত্র আলোচনা করা বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সমালোচকের একান্ত কর্ত্তব্য। চিত্তরঞ্জনকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে কবি চিত্তরঞ্জনকে ভাল করিয়া জানা দরকার।

বীণার সুরে ঝঙ্কার তুলিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ সূর্য্য করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্ত্তের
লীলা? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে?"

ইহা শুধু গান নহে—চিত্তরঞ্জনের জীবনের ইতিহাস। বাঙ্গালী, চিত্তরঞ্জনের কবিতাবলীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই তাঁহাকে ধরিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে। জানিতে পারিবে, চিত্তরঞ্জনের জীবনে—তরুণ প্রভাতে যে সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, অপরাহ্নের আকাশে সেই একই সুর। ত্যাগ, প্রেম ও ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গমের তীর্থে, বিপুল উচ্ছ্বাসে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের জীবনের ধারাবাহিকতা তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে স্ফুটতর হইয়া আছে।

আমারে এক কবিবন্ধু বলিতেছিলেন, 'বাঙ্গালাদেশের কবির মত দুর্ভাগ্য জীব আর নাই। জীবদ্দশায় কদাচিৎ কেহ সমাদর পাইয়া থাকেন।' কথাটা মিথ্যা নহে। কবি চিত্তরঞ্জন প্রশংসা ত

পানই নাই, বরং তাঁহাকে অনেক স্থানে কঠোর নিন্দার গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। "মালঞ্চের" কবি "বারবিলাসিনী" কবিতা লিখিয়া ছিলেন বলিয়া কোনও প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকের সম্পাদক এমনই তীব্র, অনুদার এবং যুক্তিহীন সমালোচনা করিয়াছিলেন যে, এতদিন পরেও সেদিনের কথা মনে করিতে হাসি পায়। "বারবিলাসিনী" সম্বন্ধে কবিতা ? শুচিতা, আতঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে।

কবি চিত্তরঞ্জন যে, প্রগাঢ় অনুভূতি ও হৃদয় দিয়া বারবিলাসিনীর মর্ম্মন্তুদ বেদনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা শুধু চিত্তরঞ্জনেই সম্ভবে। পড়িতে পড়িতে নয়ন পল্লব অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয়ে বেদনার রেখা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়।

"কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা—
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম বিলাসিনী!
*   *   *   *
তারি শাপে চিরকলঙ্কিনী!"

গভীর সহানুভূতি, প্রবল ব্যথা, মহৎ হৃদয়ে ফুলিয়া দুলিয়া না উঠিলে এমন কথা এমন ভাবে কোনও কবি প্রকাশ করিতে পারেন না।

আশৈশব ভোগ বিলাসে পুষ্ট হইলেও, চিত্তরঞ্জনের কাব্যে ভোগ বিলাসের কোনও চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা যেমন সংযত ও বিশুদ্ধ তেমনই গভীর ভাবব্যঞ্জনাপূর্ণ। 'মালঞ্চ', 'মালা', 'সাগর সঙ্গীত', 'কিশোর কিশোরী' ও 'অন্তর্যামী' পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সর্ব্বত্রই একই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ যাহা অস্পষ্ট ছিল, ক্রমে তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে—গোমুখী নির্গত জাহ্নবীধারা ক্রমে বিশালাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কবি চিত্তরঞ্জনের তরুণ হৃদয়ে, সমগ্র বিশ্বের বেদনার ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। 'অভিশাপ' শীর্ষক কবিতায় তাহা তিনি কি সুন্দর ভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বর্গের দেবতা, নন্দনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনন্ত উৎসবে সময়ক্ষেপ করিতেন। ধরণীর আর্ত্তনাদ কোনও দিন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। খেয়ালবশে একদিন নবনব জগতের স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেবতা স্বর্গের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। অমনই "হুহু করিয়া আর্ত্ত ক্রন্দনের মত ঝটিক বহিয়া আসিল। নৃত্যগীত থামিয়া গেল, 'সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল' মুহূর্ত্তমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—প্রদীপমালা নির্ব্বাপিত হইল, 'সুরসভা' স্তম্ভিত ও মলিন!

"বিষাদ কম্পিতকণ্ঠে কহিলা স্বর্গের রাজা
হে নন্দন বাসী!
আজি হ'তে মোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীতগান
শত উচ্চ হাসি।
আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এত দিন
ক্রন্দন ধরার।
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মতার।"

মারী শৈলাবাসে
১৯২২

মারী শৈলাবাসে
১৯২২
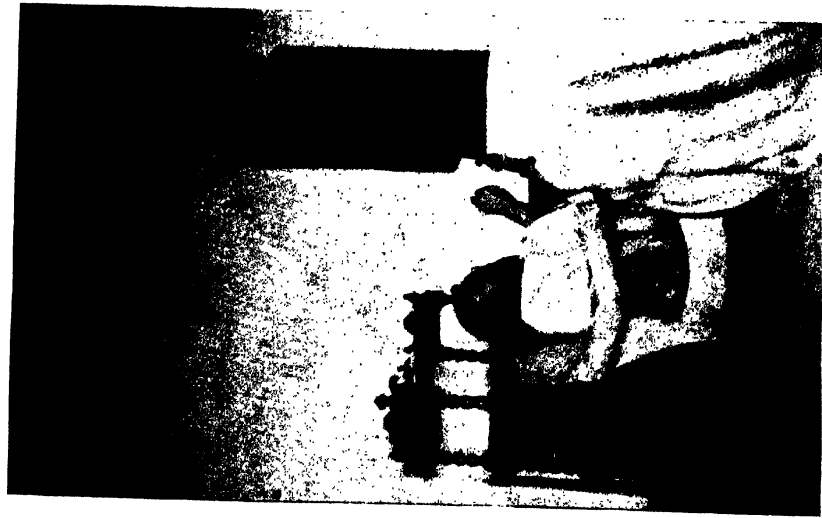
সিমলায় সপরিবারে
১৯২৪

সিমলা শৈলাবাসে
১৯২৪

কবির লেখনী দিয়া যাহা যৌবনে নির্গত হইয়াছিল তাহা অচিরকাল পরে চিত্তরঞ্জনের জীবনেই মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয় নাই কি ?

আমার কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধুর নিকট পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, চিত্তরঞ্জন আপনাকে বড় দরের কবি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার সহিত আমি একমত নহি। কবি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমি বহুবার ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছিলাম, কাব্য সম্বন্ধে—সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকবার নানাপ্রকার আলোচনা হইয়াছিল; কিন্তু কখনও তাঁহাকে অস্মদ্‌শব্দের সাহায্য লইয়া নিজের কবিতার জয়গান করিতে শুনি নাই। বরং এ বিষয়ে তাঁহার অতিরিক্ত বিনয়ই প্রকাশ পাইত। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যদি নিজের কাব্য রচনার সম্বন্ধে সাধারণ কবিদিগের ন্যায়ও অভিমত প্রকাশ করিতেন তাহা একেবারেই অশোভন হইত না। চিত্তরঞ্জন যে, উচ্চশ্রেণীর কবি, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতেই পারে না। আমরা যাহাকে আর্ট বলি, সে হিসাবে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহার সমকক্ষ শিল্পী বা কবি অনেক আছেন; কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে—বিংশ শতাব্দীতে তাঁহার সমকক্ষ কবির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, এ কথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

চিত্তরঞ্জনের ঈশ্বরানুরাগী চিত্ত সংশয় ও সন্দেহের ঘূর্ণাবর্ত্ত এড়াইয়া একটানা স্রোতে মহামিলনের মহাসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছিল। 'মালঞ্চে'র কবি "আমার ঈশ্বর" শীর্ষক কবিতায় সন্দেহ দোলায় দুলিয়া দুলিয়া বলিতেছেন—

"তুমি থাকিওনা আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতিভরা প্রেতের মতন।
* * * *
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন।
* * * *
যত্ন করে গড়ে তুলি আমার ঈশ্বর।
আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণ তলে আসিব না আর।"

'মালায়' কবির হৃদয় প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে। তিনি নিত্যসুন্দরের অনুভূতি লাভে তখন ধন্য হইয়াছেন। তখন তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে—

"আমার পরাণভরি উঠে যতগান
তোমার পরাণ হতে পায় যেন প্রাণ।"

'প্রার্থনায়' কবি জানাইতেছেন—

"নিও পাপ নিও পুণ্য
হৃদয় করিও শূন্য
ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়।
মহান করিয়া দিও তব মহিমায়।"

চিত্তরঞ্জনের ধর্ম্মপিপাসুচিত্ত, লৌকিক অতিলৌকিক সকল বিষয়ে সমান বিশ্বাসী ছিল। কোনও বন্ধুর মুখে গল্প শুনিয়াছি, একবার ট্রেণে যাইবার সময় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সেই বন্ধুটিও ছিলেন। সঙ্গে আরও একজন নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। বন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ ক্রমে সাধক রামপ্রসাদের গল্প বলিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন একমনে শুনিতেছিলেন। ভক্ত সাধকের গান শুনিবার জন্য মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীমাতার মূর্ত্তি বিপরীত দিকে মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছিলেন। এই কাহিনী শুনিবার পর চিত্তরঞ্জনের সমভিব্যাহারী আত্মীয়টি কাহিনীটিকে অবিশ্বাস্য এবং গঞ্জিকা সেবীর খেয়াল প্রসাদাৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। চিত্তরঞ্জন স্বভাবতঃ ধীর স্বভাব, সংযতবাক্ এবং বিনয়ী হইলেও, আত্মীয়ের এই অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সহ্য করিতে পারেন নাই। তীব্রভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "তুমি ধর্ম্মের কি জান, বাপু। ও রকম অর্ব্বাচীনের মত মন্তব্য প্রকাশ করিও না।"

এই যে বিশ্বাস, ইহা উত্তরোত্তর চিত্তরঞ্জনের জীবনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় প্রেম ও ভক্তির সমুদ্রে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতে চাহিয়াছিল। ভগবান তাঁহার সে সাধ মিটাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের ভক্তি, চণ্ডিদাসের প্রেম চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়াছিল—তাঁহার লেখনীমুখে তাহার পরিচয় বিকসিত হইয়াছে, জীবনের কর্ম্ম ক্ষেত্রে তাহার মূর্ত্ত প্রকাশও দেখিয়াছি।

যৌবনে চিত্তরঞ্জন অধীর আগ্রহে গাহিয়াছিলেন—"তোমার স্বপন ছাড়ি' তোমারে চাহিছে।" ভক্ত ও সাধক কবি পরবর্ত্তী জীবনে, পরিণত বয়সে গাহিয়া উঠিলেন,

"সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই!
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারে শুধু; "পাই বা না পাই,
বঁধুহে! তোমারি লাগি আকুল পরাণ!
বঁধুহে! বঁধুহে! আমি তোমারেই চাই!—
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই!"

সাধক বৈষ্ণব কবিদিগের পর এমন কথা আর কোনও কবির রচনায় এমন ভাবে দেখিতে পাইনা। ইহা শুধু কথার সমষ্টি নহে, শুধুই ভাবের উচ্ছ্বাস নহে। একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে শুধু ভক্তের হৃদয় হইতেই এমন কথা বাহির হইতে পারে।

'অন্তর্যামীর' ভক্তিবিগলিত কাব্য প্রবাহের পুণ্য স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কবি চিত্তরঞ্জন আমাদিগকে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন ?

"যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর আত্মা বাসনা বিভোর ;
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে !
প্রাণ মোর ভরপূর কি কাতর গানে !
কেন হাসিতেছ তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর ?
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর ?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর।
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোর।
পথখানি যেথা থাক পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব।"

চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন—দেবতার দর্শন মিলিয়াছে, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পথ যেখানেই যেমন ভাবেই থাকুক না কেন তিনি সন্ধান করিয়া তাহা পাইয়াছেন এবং তাহার বার্ত্তা আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সে পথ আপাততঃ কণ্টকাকীর্ণ হইলেও তাহার শেষ প্রান্ত সরল, প্রশস্ত ও মহান্। সেই জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেনা, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার চেষ্টা করিয়া ধন্য হইবে।

কবি চিত্তরঞ্জন, কবিজনের চিরপ্রিয় আষাঢ়ের প্রারম্ভে জীর্ণদেহ রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত কবির শ্রাদ্ধবাসর, জগন্নাথের পুনর্যাত্রার পুণ্যময় দিনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের যাবতীয় অনুষ্ঠান কাব্যপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, পারলৌকিক ক্রিয়া ত ভক্তকবির যোগ্য সমাদরে, শ্রদ্ধা ও পূজার অঞ্জলি লাভ করিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিপূজা—তর্পণের দৃশ্য বাঙ্গালীকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কবি চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভা ও কবি-হৃদয়ের যোগ্য আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। তাঁহার কাব্যপ্রসূনগুলির আলোচনা যোগ্য ব্যক্তির লেখনীমুখে আলোচিত হইবার আশা বাঙ্গালী নিশ্চয়ই করিতে পারে। আজ ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া অমর কবির সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। চিত্তরঞ্জনের ন্যায় বাঙ্গালীভাবে পূর্ণ বাঙ্গালার কবি ও সাহিত্যিকের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালার প্রাণের সন্ধান পাইয়া বাঙ্গালীকে জীবন্ত জাতিতে পরিণত করিতে পারিবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্মশানেতে সব শেষ ?—সেত মিথ্যা ভয়,
শ্মশানেরি না মানি' শাসন,
মৃত্যুরণে জীবনের নিত্য পরাজয় ?
মরণের না মানি' বারণ,
যুগে যুগে দেশে দেশে হে অমর ! অম্লান ! অক্ষয় !
গাও স্বাধীনতা গান, গাও তুমি জীবনের জয় !
গাও তুমি গীতি-চিরন্তন
দেশবন্ধু হে চিত্তরঞ্জন !

মৃত্যু নিল পদধূলি ভৃত্য সম এসে ;
অনন্তের বিশ্রাম মন্দিরে
শ্রান্ত দেহখানি নিল বিস্মৃতির দেশে ;
সে অক্লান্ত 'চিত্ত' হেথা ফিরে।
সঞ্চারে সে উন্মাদনা আত্মা মাঝে অশরীরী বেশে,
সর্ব্বত্যাগী সে তাপস দেশ জননীরে ভালোবেসে,
সে অনন্ত দেহমুক্ত মন ;
দেশপ্রেমী হে চিত্তরঞ্জন।

লক্ষ দেশবাসী বুকে তুমি নববল
জীবনের তুমি যে জীবন,
ত্যাগব্রত হে আদর্শ পুণ্য সমুজ্জ্বল !
ভয়হীন জ্বলন্ত যৌবন !
অজর অমর তুমি ! পুণ্য স্মৃতি পাথেয় সম্বল,
নিবেদিলে দেশ মায়ে জীবনের রক্তজবাদল ;
প্রণমিছে তব ভক্তগণ,
দেশপূজ্য হে চিত্তরঞ্জন।

দেশ-আত্মা-বেদী পরে চিতা হোমশিখা
পুণ্য অগ্নি নিভিবেনা কভু,

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভস্ম হয়, যায় অহমিকা
জড়ে প্রাণ জেগে ওঠে তবু।
দেশ মাতা তব ভালে এঁকে দিল জ্যোতির্ম্ময় টীকা,
ভারতের ইতিহাসে রবে নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা
দেশবাসী করিবে বন্দন;
মৃত্যুঞ্জয়ী হে চিত্তরঞ্জন!

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

"চিত্তরঞ্জন"

কবি বায়রণের মৃত্যুর পর টেনিসন কল্পনা কর্ত্তে পারেননি যে, বায়রণের মৃত্যু হয়েছে—তাই তিনি চারিদিকে লিখেছিলেন "বায়রণ আর ইহলোকে নাই"। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গত চারিংবৎসর বাবৎ দেশের হৃদয়ের এতটা স্থান অধিকার ক'রে বসেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর কথা আজ আমরা কল্পনার মধ্যে আনতে পার্চ্ছিনা। "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" নাম উচ্চারণ কল্লেই হৃদয়ে এমন একটা ভাবাবেগ হয়, যেটা মৃত্যুর সঙ্গেই কিছুতেই সমঞ্জস হয়না। সেদিন নিজের চক্ষে তাঁর মৃতদেহ চিতায় শায়িত দেখেছি, সেই শব অগ্নিতে ভস্মীভূত হ'তে দেখেছি—কিন্তু তবুও এখনও যেন উপলব্ধি কর্ত্তে পার্চ্ছিনা—যে চিত্তরঞ্জন আর ইহলোকে নাই।

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার রাজনৈতিক নেতা—একথা বল্লে যেন তাঁকে ছোট করা হয়। একথা ঠিক যে, দেশের জনসাধারণ তাঁকে রাজনৈতিক নেতা বলেই জানেন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, তিনি কোনদিনই রাজনীতিকে জীবনের, নিজের বা জাতির চরম উদ্দেশ্য বলে বরণ করেন নাই। রাজনীতি তাঁর জীবনে এসেছিল তাঁর ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে তাঁর স্বাধীনতাস্পৃহার আধাররূপে। পরাধীনতার নির্ম্মম দুঃখ তিনি যেরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন, বোধ হয় অল্প লোকই সেরূপ করেছেন। সেইজন্যই যতদিন রাজনীতি আমাদের জাতীয় জীবনে একটা খেলার সামগ্রী ছিল, অন্য কর্ম্মনিরত ধনীদের অবসর বিনোদনের বস্তু ছিল, ততদিন চিত্তরঞ্জন রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু যেদিন মহাত্মা গান্ধী প্রচার কল্লেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন কর্ত্তে হ'লে ত্যাগ চাই—একনিষ্ঠা চাই—যোগ চাই—সেইদিনই চিত্তরঞ্জন রাজনীতক্ষেত্রে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। তিনি যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, "ভূমৈব আনন্দয়ে নাল্পে সুখমস্তি।" তিনি চিরদিনই 'ভূমার' প্রার্থী। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি ভূমার স্বাধীনতার আদর্শই আমাদের সম্মুখে ধরেছিলেন, এবং নিজে সেই আদর্শ সাধনে যে তন্ময়তা, যে ত্যাগ, যে নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তাহা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব এবং এই আদর্শ দেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্য তাঁকে অমর করে রাখবে।

চিত্তরঞ্জনের চরিত্র বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র অল্পপরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়, কারণ তাঁর চরিত্রের বিকাশ পেয়েছিল বহুর ভিতর দিয়ে। তিনি ছিলেন কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক—তিনি ছিলেন ভোগী—"বসুধার মৃত্তিকার পাত্র খানি" স্বাদে গন্ধে ও গানে ভরিয়া উজাড় করিয়াছিলেন—তিনি ছিলেন ভাবুক দার্শনিক তাই তিনি আদর্শের সন্ধানে নিজের রাজৈশ্বর্য্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য অকাতরে বরণ করতে পেরেছিলেন—আর সকলের উপর তিনি ছিলেন কর্ম্মী—অক্লান্ত ও অদম্য কর্ম্মী। ক্ষুদ্রতার ছায়া কোন ত দিন তাঁকে মলিন করিতে পারেনি। তাঁর দানে কোনদিন পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না—তাঁর যথার্থ বৈষ্ণব প্রেমে তিনি নিজেকে "তৃণাদপি" নীচ মনে করতে পারতেন—আবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে যথার্থ বীরের মত যুদ্ধ করতেন।

আজ মনে পড়ে সেই দিনের কথা—যে দিন রোগ শয্যায় শায়িত হয়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর চক্ষের সেই ভাস্বর দীপ্তি—মুখের সেই জয়দৃপ্ত ভাব, বোধ হয় ইহজীবনে ভুলতে পারব না। সে দিন যেন আমার চক্ষের সম্মুখ হতে একটা যবনিকা সরে গিয়েছিল—সে দিন বুঝেছিলাম, আমার দেশমাতৃকা ভাগ্যবতী—সে দিন বুঝেছিলাম, বাঙ্গালি জাতি ধন্য—সে দিন অনুভব করেছিলাম যে, এতদিন পরে আমাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত। স্বাধীনতার যুদ্ধে যখন একজন বাঙ্গালীও স্ফীত বক্ষে নিজের জিবনকে তুচ্ছ করে দাঁড়াতে পেরেছেন তখন আর আমাদের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে কার সাধ্য! স্বাধীনতার বীজ যখন উপ্ত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সে বীজ শস্যে পরিণত হবে। তাই আবার বলি, বাঙ্গালী তুমি ধন্য—কারণ চিত্তরঞ্জনের মত ভাই পেয়েছ—দেশমাতৃকা তুমি ভাগ্যবতী চিত্তরঞ্জনের মত সন্তান বক্ষে ধারণ করেছ!

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে এই যে একটা বিপুল ব্যথা দেশের বুকে লেগেছে, তার কারণ কি? রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁহার পদতলে বসে শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁদের ব্যাকুলতা সহজবোধ্য, কিন্তু যাঁহারা কোনও দিন রাজনীতির কোনও সংবাদই রাখতেন না বা যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের বিপক্ষে ছিলেন তাঁহারাও আজ শোকার্ত্ত। আজ তাঁহারা রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনকে ভুলে গিয়ে মানুষ চিত্তরঞ্জনকে শোকাশ্রুর অঞ্জলি দানে পূজা করছেন। তাইত পূর্ব্বে বলেছি যে, চিত্তরঞ্জনকে শুধু রাজনৈতিক নেতা বল্লে তাঁকে ছোট করা হ'বে—তাঁর মহান্ চরিত্রের শুধু একটা দিক দেখান হ'বে। হয়ত কালক্রমে বাঙ্গালী কংগ্রেসের ও ব্যবস্থাপক সভার বীর চিত্তরঞ্জনকে ভুলে যাবে—হয়ত তাঁর ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবলী বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে বিঘ্ন বলে মনে হবে—কিন্তু বাঙ্গালী কোনও দিনই ভুল্‌তে পারবেনা যে, চিত্তরঞ্জনই প্রথম এই বহুকাল অধীনতা-নিপীড়িত অধঃপতিত জাতির বুকে স্বাধীনতার বাসনা জাগরিত করে দিয়ে ছিলেন—চিত্তরঞ্জনই প্রথম বাক্যের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা, জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তিনিই আমাদের বুঝিয়েছেন যে, স্বাধীনতা ভিক্ষার দ্বারা পাওয়া যায় না—স্বাধীনতা

অর্জ্জন করতে হ'লে ত্যাগ চাই, বিসর্জ্জন চাই। যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "ফরিসিরা যেরূপ উপদেশ দেন সেইরূপ কার্য্য করিবে কিন্তু তাঁরা যেরূপ কার্য্য করেন সেরূপ কার্য্য করিও না।" চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি যেরূপ উপদেশ দিতেন নিজেও সর্ব্বস্বদানে তাহাই সাধন করতেন—বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। রাজনীতিকে তিনি কোনও দিন ব্যবসা বলে মনে করেন নাই—তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনও স্বার্থের বা ক্ষুদ্রতার ছায়াও স্পর্শ করতে পারে নাই—রাজনীতি ছিল তাঁর দেশমাতৃকার পূজার উপকরণ মাত্র। মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, রাজনৈতিক হিসাবে দেশবন্ধুকে উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না—কথাটার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে তাহা ঠিক করা সম্ভব নয়। রাজনীতি যদি কূটনীতি হয়—রাজনীতি যদি গোলোক ধাঁধার খেলা হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই দেশবন্ধু রাজনৈতিক ছিলেন না—কারণ তাঁর রাজনীতি ছিল সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাজনীতি যদি মাতৃপূজা হয়, তাহ'লে অসন্দেহ দেশবন্ধু সেই মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক ছিলেন। তাঁর মাতৃপূজার অঞ্জলি ছিল—ত্যাগ আর প্রেম। তিনি মাকে কল্পনা করেছিলেন দেশমাতৃকারূপে—তিনি শুধু হিন্দুর বা মুসলমানের বা খৃষ্টানের জননী ন'ন—তিনি যে আমাদের সকলের জন্মভূমি—তাঁর মন্দির দ্বার অবারিত—তাই দেশবন্ধু সকলকে আহ্বান করেছিলেন।

"সেই সাধনার সে আরাধনার,
যজ্ঞ শালার খোল আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহা মানবের সাগরতীরে।"

তাঁর তূর্য্যধ্বনি তাই আজও কানে বাজছে—আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরাজ-খৃষ্টান সকলেই সে আহ্বান শুনেছে—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কবির এই মিলিত ভারতের স্বপ্নকে তিনি সত্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করেছিলেন—এই বিসর্জ্জন কি মিলিত ভারতের পক্ষ হ'তে পুষ্পাঞ্জলি রূপে ভারত-ভাগ্য-বিধাতার চরণে পৌঁছিবে না?

আজ দেশবন্ধুর তিরোধানে একটা কথাই বিশেষভাবে মনে হয়। বঙ্গজননীর সুসন্তানের

অভাব নাই। বাঙ্গলা দেশে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ভাবুকের কোনদিনই অভাব ছিলনা বা হইবেনা। কিন্তু বাঙ্গলার মাটীর গুণে বাঙ্গলার ঐকান্তিক অভাব—কর্ম্মীর ও কর্ম্মবীরের। গত দুইশত বৎসরের মধ্যে বঙ্গমাতা বোধ হয় পাঁচজন—যথা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষ ও চিত্তরঞ্জন—যথার্থ কর্ম্মী সন্তান লাভ করেছেন। কে বলিতে পারে আবার কবে একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর আমরা পাইব? চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে আমরা যে ভাব ও শক্তির সমন্বয় দেখিতে পাই—তাহা যথার্থই অদ্ভুত। তাঁহার ছিল কবির ভাবুকের ও দার্শনিকের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি—আর তাহার সঙ্গে ছিল দৃষ্ট ছবিকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার অপূর্ব্ব শক্তি। তাঁর চরিত্রে ছিল এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি—যে শক্তিতে তিনি তাঁর শত শত ভক্তকে নিজের করে টেনে নিতে পেরেছিলেন এবং যাহার জন্য ভক্তরা বোধ হয় তাঁকে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর বলে মনে কর্ত্তেন। মনে পড়ে কতবার তাঁর অনুচরেরা জয়ের আশা ত্যাগ করে ম্রিয়মান হ'য়ে বসে আছেন—কিন্তু তাঁর আগমনে ও আশ্বাস বাণীতে "Never fear, we shall win"—সকলে যেন এক তাড়িৎশক্তি প্রভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে জয়লক্ষ্মীকে করতলগত করেছেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তিনি যেথা দিয়ে গিয়েছেন—সেইখানেই নিজের ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন এক অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার, যে ভাণ্ডার থেকে সমস্ত বাঙ্গলায় শক্তির সঞ্চার হ'ত। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রেছিলেন,—শক্তিহীনের দৈন্য, তাই তাঁর প্রথম উপদেশ ছিল—শক্তির সঞ্চার কর, যদি জীবন যুদ্ধে জয়ী হ'তে চাও তবে শক্তিমান হও। কিন্তু তিনি আরও বলতেন যে, এ শক্তির অসদ্ব্যবহার কোরনা—যদি এ শক্তিকে পূর্ণ কর্ত্তে চাও—তা হ'লে এ শক্তিকে মিলিয়ে দিতে হবে বিশ্বজনীন প্রেমের সঙ্গে। মহাত্মা গান্ধী নিজে বলেছেন যে, চিত্তরঞ্জনের চিত্তে হিংসা, বিদ্বেষ মলিনতার রেখাও ছিলনা—তাঁর প্রেম ছিল সর্ব্বজনীন। ত্যাগ ও কর্ম্ম এবং প্রেম ও শক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে চিত্তরঞ্জনের চরিত্র গঠিত। তাঁকে একদিক হ'তে দেখলে তাঁকে অসম্পূর্ণ ভাবে দেখা হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন,

"বীরের এ রক্তস্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?"

আজ স্বতঃই এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগছে। চিত্তরঞ্জনের আরব্ধ কার্য্য কি আর সম্পূর্ণ হ'বে না? তাঁর দধীচি তুল্য ত্যাগ কি বৃথাই যাবে? মাতৃপূজা-যজ্ঞে হোতা নিজেকেই ত' বলি দিয়েছেন—সে যজ্ঞ শেষ কর্ব্বার জন্য কি আর হোতা পাওয়া যাবে না? এ সকল প্রশ্নের সমাধান ত' হিন্দুর নিকট বিশেষ কষ্টসাধ্য বলে মনে হয় না। আমরা বিশ্বাস করি, শক্তি অমর—আমরা বিশ্বাস করি, কর্ম্মের শেষ হয় না—আমরা বিশ্বাস করি, ত্যাগের পরিণতি পূর্ণতায়—তা যদি হয় হে দেশবন্ধু, হে কবি, হে মনিষী, হে স্বয়ম্ভু তুমি আজ দেবলোক হ'তে আমাদের আশীর্ব্বাদ

কর, আমরা মিলিত বাঙ্গালী আজ তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার ও আমাদের দেশমাতৃকার পূজা সমাপ্ত করবো। তোমার ত্যাগ আমাদিগকে অক্ষয় কবচরূপে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা কর্ব্বে। তুমি বিশ্বের ভাণ্ডারে যে অপূর্ব্ব রত্ন দান করে গেছ, এ বিশ্বের ভাণ্ডারী নিজে সে ঋণ শোধ করবেন।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধুর দেহত্যাগে

(১)

কোথায় গেলে চিত্তরঞ্জন দেশের বুকে শেল দিয়া!
আর কি তোমায় দেখ্‌তে পাব! আজ যে হিয়া যায় ফাটিয়া!
রোগে শোকে ভারত কাঁদে, পীড়ন চলে নির্ব্বিবাদে,
দুখের কালে মায়ের ছেলে যায় কি চলে' মা ফেলিয়া!
আজ যে হিয়া যায় ফাটিয়া!

(২)

জাতির দুঃখ কর্‌তে মোচন, ছাড়্‌লে তুমি অনুশোচন,
অর্থ দিলে, স্বার্থ দিলে, শেষকালে দাও প্রাণ সঁপিয়া!
আজ যে হিয়া যায় ফাটিয়া!

(৩)

তোমার ত্যাগে জাগ্‌লো জাতি, স্বরাজ পেতে উঠ্‌লো মাতি',
আত্মঘাতী পাগ্‌লা হাতী মাথায় তোমায় নেয় তুলিয়া!
আজ যে হিয়া যায় ফাটিয়া!

(৪)

কাজ করেছ বিঘ্ন দলি', ফল না পেতেই যাও যে চলি'!
তিলে তিলে মর্‌লে তুমি, আম্‌রা মরি তাই কাঁদিয়া!
আজ যে হিয়া যায় ফাটিয়া!

(৫)

ক্লান্ত হৃদয় শান্ত করি', এস নূতন মূর্ত্তি ধরি',
স্বরাজ ভোগের সময় হ'লে আস্‌তে পাছে যাও ভুলিয়া!
আজ যে হিয়া যায় ফাটিয়া!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার এক সময়ে একটু ঘনিষ্ঠতা থাকার সংবাদ পাইয়া আমার কোন কোন বন্ধু তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধ আমার উপেক্ষণীয় নহে; কিন্তু লিখি কি? স্বদেশের স্বাধীনতাকল্পে তাহার রাজনৈতিক জীবনই দেশবন্ধুর জীবনের সারাংশ; কিন্তু সে অংশের সহিত আমার কোন সংস্রবই ছিল না। পাছে কেহ মনে করেন যে, আমি বুঝি দেশবন্ধুপ্রমুখ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধ পক্ষীয় অপর কোন দলভুক্ত, তাই আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের দেশে যে কয়টী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে তাহার কোনটীর সহিত আমার সম্পর্ক বা সহানুভূতি নাই। প্রত্যেক দলেরই নেতৃগণ বা তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ সকলেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থায় দেশের শাসনপ্রণালীর আমাদের অভিলষিত পরিবর্ত্তন বা দেশবাসিগণের প্রকৃত রাজনৈতিক মঙ্গল সাধন সম্ভবপর বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিলনা ও নাই। তবে ইদানীং মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অক্লান্তকর্ম্মা সহকর্ম্মী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র Khadi Movementএর আবরণে যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে যেন প্রকৃত পন্থা অবলম্বনের কথা মনে হইয়াছিল; আবার দেশবন্ধুর Village-organisation scheme এর কথা শুনা অবধি মনে আরও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু সে আশা বোধ হয় অঙ্কুরেতেই বিনষ্ট হইল। যাহা হউক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের অনেক কথাই বর্ত্তমান সময়ের পাঠকপাঠিকার জানা আছে এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারাই আলোচনা করিতেছেন ও করিবেন। আমি কেবল তাঁহার জীবনের অপর দিক লইয়া দুইএকটী কথা বলিব।

পল্লীগ্রামে আমার জন্ম; শিশুকালে আমি পল্লীগ্রামেই থাকিতাম এবং পল্লীগ্রামস্থ বাংলা স্কুলে পড়িতাম; ভবানীপুরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের শিশুকালের কথা কিছুই বলিতে পারিব না। ইংরাজী পড়িতে ভবানীপুরের লণ্ডন-মিশনরী স্কুলে আসিয়া চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সেও অবশ্য খুব বাল্যকালের কথা। আমি যখন বোধ হয় উক্ত স্কুলের স্কুল-ডিপার্টমেণ্টে fourth standard অর্থাৎ এখনকার sixth classএ পড়ি, তখন চিত্তরঞ্জন প্রথম আসিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি ঠিক্ আমার নীচের ক্লাসেই ভর্ত্তি হন। লণ্ডন-মিশনারী স্কুল সাধারণতঃ দরিদ্র বালকদিগের স্কুল। বড়লোকের ছেলে হইলেও অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কোমল স্বভাব ও সরল ব্যবহার ক্লাসের সকল ছাত্রকেই মুগ্ধ করে। স্কুলে নবাগত বালকটির স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌম্য মুখখানি দেখিয়া আমারও তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। আমি ভিন্ন ক্লাসের ছেলে হইলেও আমার অবিলম্বে চিত্তের সহিত পরিচিত

হইবার ও আলাপ করিবার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তাহার কারণ আমার স্বর্গীয় মণিকাকা; আজ কত বৎসরের পর আবার মণিকাকার কথা, মণিকাকার মুখখানি মনে পড়িতেছে। মণিকাকা ও আমি এক গ্রামের ছেলে। দুই জনেই, হাতে খড়ি হওয়া অবধিই, আমাদের গ্রামের বাংলা স্কুলে পড়িতাম এবং বরাবরই এক ক্লাসে পড়িতাম। ক্লাসের পড়াশুনায় আমরা সব চেয়ে ভাল ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্যতা ছিল। দৈবদুর্বিপাকে আমি ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাই, মণিকাকা ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। আবার যখন কিছুদিন পরে আসিয়া লণ্ডন-মিশনরি স্কুলের sixth class এ ভর্ত্তি হই, মণিকাকা তখন seventh classএ পড়েন, সুতরাং তিনি ও চিত্তরঞ্জন এক ক্লাসের ছাত্র হইলেন। চিত্তরঞ্জন ভর্ত্তি হইবার অতি অল্পদিন পরেই দেখিলাম যে মণিকাকার সহিত চিত্তের একটু বিশেষ রকমের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। দুই জনে ক্লাসে ঠিক্ পাশাপাশি বসিতেন, দেড়টার ছুটীর সময় দুইজন একসঙ্গে বেড়াইতেন এবং বিকাল-বেলা স্কুলের ছুটী হইলে চিত্তরঞ্জনের জন্য যে গাড়ী আসিত সেই গাড়ীতে তাহার সঙ্গে মণিকাকা যাইতেন; ফলকথা স্কুলে আসিয়া মণিকাকা ও চিত্তরঞ্জন তিলার্দ্ধকাল তফাৎ থাকিতেন না। Entrance পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই মণিকাকার মৃত্যু হয়; কিন্তু আমি বিশেষ জানি যে, ভবিষ্যৎ জীবনে চিত্তরঞ্জন মণিকাকার কথা ভুলেন নাই।

মণিকাকা যে দিন আমাকে তাঁহার বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়া দিলেন সেই দিনই আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় ও তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে অতীব মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে স্কুল বসিবার আগে যতটুকু সময় পাইতাম সেই সময়ে বা মধ্যাহ্ন ছুটীর সময়ে আমি উহাদের সঙ্গে মিলিতাম। বিকাল বেলা আমার সহিত উহাদের আর দেখা হইত না, কারণ আমি থাকিতাম খিদিরপুরে। আমি ও চিত্তরঞ্জন একত্র হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশীর ভাগ কবিতা লইয়া আলোচনা হইত। আমাদের কবিতার আলোচনার অর্থ আমরা সে সময়ে আমাদের ন্যায় বালকের পাঠ্য যে কবিতা পড়িয়াছি তাহাই আবৃত্তি করিতাম এবং কোন্‌টী কেমন রচিত ও কেমন মধুর সেই সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা কহিতাম। চিত্তরঞ্জনের অনেক কবিতা মুখস্ত ছিল এবং আমার নিজের বোধ হয় চিত্ত অপেক্ষাও বেশী মুখস্থ ছিল। অল্প কথায় এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি পদ্যপাঠ প্রথম ভাগের "এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান" হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের শেষ কবিতার শেষ ছত্র পর্য্যন্ত তখন মুখস্ত বলিতে পারিতাম। ইহা বোধ হয় আমার ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়ার ফল; অথবা আমার সেই স্কুলের পূজ্যপাদ শিক্ষকগণের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। পুস্তকে পড়া কবিতার আলোচনা করিতে করিতে আমাদের আর এক দোষ আসিয়া পড়িল। আমরা আবার নিজে নিজে ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম।

এক একদিন চিত্ত বাটী হইতে একটী কবিতা লিখিয়া আনিত এবং আমার ও মণিকাকার নিকট পড়িত আমরা তাহার সমালোচনা করিতাম; আবার একদিন আমি একটী কবিতা লিখিয়া আনিতাম,

মণিকাকা ও চিত্ত তাহার সমালোচনা করিতেন। মণিকাকা বড় লিখিতেন না, কিন্তু তিনি সমালোচক ছিলেন খুব ভাল। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, চিত্তের প্রত্যেক কবিতাই অত্যন্ত সুন্দর ভাবপূর্ণ ও মধুর হইত, কিন্তু আমার কবিতা সেরূপ হইত না, যদিও মণিকাকা ও চিত্ত আমার কবিতারও বিশেষ প্রশংসা করিতেন। চিত্তের রচনা যে গভীর ভাবপূর্ণ ও মধুর হইত তাহা পাঠক পাঠিকা সহজেই অনুমান করিতে পারেন, কারণ চিত্ত তাহার মধ্য জীবনে লিখিত "মালা", "মালঞ্চ" 'সাগর সঙ্গীত' "কিশোর-কিশোরী" ও "অন্তর্য্যামী"-প্রমুখ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে একজন প্রকৃত কবিরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর কবিত্ব সম্বন্ধে আমার নিজের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন এক সাহিত্য সম্মিলন হইতে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। অনুরোধের কারণ সম্মিলনের সম্পাদক ছিলেন আমার বাল্য পরিচিত। আমি দুই তিন দিন অবসর মত কাগজ কলম লইয়া যাহা লিখিলাম তাহা আমার মনঃপূত হইল না, কাজেই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম এবং অবশেষে একটী ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া আমার অক্ষমতা জ্ঞাপনে তাঁহাদের অনুরোধ পত্রের জবাব দিলাম। সেই পত্রের কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই সকলে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

"প্রত্যক্ষ দেখেছি যাহা, কিম্বা কল্পনায়,
কোন চিত্র আঁকিবার নাহিক শকতি।
নিভৃতে নির্জ্জনে যদি থাকি কিছুকাল,
কত ভাব ভেসে ওঠে মানস নয়নে
পুঞ্জীভূত হয়ে, সরসীর স্বচ্ছ নীরে
মীন শ্রেণী মত; কিন্তু ধরিবার আঁশে,
স্পর্শ মাত্র লেখনীর জাল, ডুবে যায়
তারা, নিমেষের মাঝে, অতল সলিলে।"

যাহা হউক এইভাবে আমরা তিন বৎসর কাল বড়ই আনন্দে লণ্ডন মিসনরি স্কুলে কাটাইয়াছিলাম। চিত্তের কবিতায় রচনা-কৌশলের মাধুর্য্যের ও ভাব গাম্ভীর্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। এখানে একটু কথা বোধ হয় বলা উচিত যে, আমরা কেবল কবিতা লিখিয়া বা আলোচনা করিয়া বেড়াইতাম না; স্কুলের পড়া শুনায়ও আমরা খুব ভাল ছিলাম। আমার ক্লাসে আমি ছিলাম সর্ব্বপ্রথম এবং চিত্তদের ক্লাসে বোধ হয় মণিকাকা প্রথম ও চিত্ত দ্বিতীয় ছিল। এখানে একটী কথা বলা উচিত। মনীষীরা বলেন প্রত্যেক মনুষ্যেরই বাল্য জীবনের কার্য্যকলাপে তাহার ভবিষ্য জীবনের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। আমি কিন্তু চিত্তের বাল্যজীবনে তাহার ভবিষ্য জীবনের কোন আভাসই বুঝিতে পারি নাই। তবে আমার বোধ হয় এ আভাস বুঝিতে পারেন তিনি, যাঁহার বুঝিবার শক্তি হইয়াছে এবং যিনি প্রকৃত জ্ঞানী। একজন বালক বোধ হয় বিশেষ বন্ধুত্ব থাকিলেও তাহার সঙ্গী ও সহপাঠী অপর বালকের বাল্যজীবনে তাহার ভবিষ্য জীবনের কোন চিহ্ন বা লক্ষণই ধরিতে পারে না। তবে, আমার বেশ মনে আছে যে, প্রথম প্রথম স্বর্গীয় কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের রচিত—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়॥"

এই দুইটী পদ-শীর্ষক সুললিত কবিতাটী চিত্তরঞ্জনের আগাগোড়া মুখস্ত ছিল ও অনেক সময় অতি মধুরভাবে আমাদের নিকট আবৃত্তি করিত এবং তাহার পর আমরা আর একটু বড় হইলে স্বর্গীয় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত সঙ্গীত" কবিতাটী চিত্ত বড় উৎসাহের সহিত পড়িত ও আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত এবং অত বড় কবিতাটী সমস্তটাই সে মুখস্ত বলিতে পারিত। কিন্তু তাহাতে তাহার ভবিষ্য জীবনের কোন আভাস ছিল তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? কারণ আমারও ত ঐ দুইটী কবিতা বা ঐ ভাবের অনেক কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল এবং আমারও ত ঐ সকল কবিতা পড়িতে বা অপরকে শুনাইতে কত ভাল লাগিত; তবে আমার এ দুর্দ্দশা কেন?

তিন বৎসরে পরে আমি যখন 2nd class অর্থাৎ লণ্ডন-মিশনরীস্কুলের preparatory class-এ পড়ি তখন সংসার-সমুদ্রের এক ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আমাকে স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকেরই আমি অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলাম বলিয়া তাঁহারা সমবেত হইয়া আমাকে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে রাখিতে পারিলেন না, আমাকে স্কুল ত্যাগ করিতেই হইল; কোথায় গেলাম কাহারও জানিবার আবশ্যক নাই। তবে আমার সেই স্বর্গগত শিক্ষকগণের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমার স্কুল ছাড়িয়া যাইবার শেষ দিন যখন উপস্থিত হইল তখন স্কুলের Principal সেই শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু সৌম্যমূর্ত্তি খ্যাতনামা পাদরী জনসন সাহেব সমস্ত শিক্ষকগণের সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিয়া আমার হস্তে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি Certificate দিলেন। সেই Certificate খানি দিবার সময় সেই প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি পাদরী সাহেবের চক্ষুর্দ্বয় আমি অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া নিজেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেই Certificateএ তিনি যে কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে বলিবার স্থান নহে, তবে আমি তাহার একটী বর্ণও এ জীবনে ভুলিব না। সেই দিন স্কুল হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময় আমি আর এক জনের চক্ষে জল দেখিয়াছিলাম—সে চিত্তরঞ্জনের। সেই দিন আমার স্কুলের ছাত্র জীবনের শেষ হইল এবং চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখাশুনাও প্রায় শেষ হইল।

অতি অল্প বয়সেই ছাত্রজীবন ত্যাগ করিয়া আমি অন্য জীবন অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার প্রায় একবৎসর পরে চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার একদিন সাক্ষাৎ হইল। চিত্তরঞ্জন বোধ হয় সন্ধান লইয়াই গড়ের মাঠের ভিতরে আমার প্রাত্যহিক গন্তব্য পথের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। চিত্তরঞ্জন বলিল "আমি এখন Preparatory classএ পড়িতেছি, আর Entrance classএ না পড়িয়া এই বৎসরই Private student হইয়া Entrance পরীক্ষা দিব সংকল্প করিয়াছি; তুমিও ত তাই দিতে পার, তুমি যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই তোমার হইবে, আর পড়িবার আবশ্যক নাই।" এতদিন পরে চিত্তরঞ্জনের এত চেষ্টা করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ

ও আমাকে ঐ কয়টী কথা বলায় তাহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার মনে মনে ঐরূপ সংকল্প ছিল সুতরাং চিত্তের কথায় আমি স্বীকৃত হইলাম। তাহার পর আর দুজনে দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। ইহা বোধ হয় আমারই দোষ; কিন্তু আমার এ দোষ স্বভাবজাত, ইহা আমি জীবনে কখনও সংশোধন করিতে পারিলাম না। যথাসময়ে Test Examination দিবার জন্য কলিকাতার স্কুল ইনস্পেক্টর আফিসে দুইজনেই উপস্থিত হইলাম। দুইজনের আবার সাক্ষাৎ হইল। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া Test Examination দিলাম। বোধ হয় দুই দিন বা তিন দিন দুইজনেরই উক্ত আফিসে যাইতে হয় এবং সমস্ত দিন বসিয়া প্রশ্নোত্তর লিখিতে হয়। যাহ'ক যথাসময়ে আমরা Entrance পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলাম এবং পরীক্ষা দিলাম। সে বৎসর ১৮৮৪ সালে আদৌ Examination হইল না, নূতন নিয়মানুসারে ১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে হইল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া এক একটী বিষয়ের প্রশ্নোত্তর লিখিতে হইত, এইভাবে পরীক্ষা চলিল নয় দিন। আমি আসি এক দিক হইতে, চিত্ত আসে অপর দিক হইতে; সুতরাং অবসর মত দেখাসাক্ষাতের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তবে প্রত্যহ পরীক্ষা-মন্দির হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়াই সংস্কৃত কলেজের পার্শ্বস্থ রাস্তার উপর আমার সেই স্নেহময় শিক্ষকদ্বয় স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাদের আহ্বানে আমাকে ও চিত্তকে তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যহই উপস্থিত হইতে হইত। তাঁহারা প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে আমাদের দু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং তাহার পর আমরা আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতাম। এই এণ্ট্রান্স পরীক্ষার শেষ দিনের পর হইতে চিত্তরঞ্জনের বিলাত যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর দিনই আমি চিত্তরঞ্জনের একখানি পত্র পাই; সে পত্রে চিত্ত বড় মিষ্ট ভাষায় তাহার হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল। আমি অবশ্য এই পত্রের উত্তরে চিত্তের কৃতকার্য্যতায় আমার আনন্দ ও চিত্তের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। চিত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে F. A. পড়িতে গেলেন, আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই রহিলাম। কলেজে পড়া আমার ভাগ্যে না থাকিলেও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যথা-সময়ে আমি F. A. পরীক্ষার উপস্থিত হইয়াছিলাম। চিত্তও পরীক্ষা দিয়াছিলেন। যদিও এই দুইবৎসরের মধ্যে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পরই চিত্তের আনন্দজ্ঞাপক ঠিক সেইরূপ একখানি পত্র পাই। আমিও যথাসাধ্য তাহার অনুরূপ জবাব দিই। আবার দুইবৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যথাসময়ে আমি B. A. পরীক্ষা দিলাম। কোন কারণে চিত্ত এইবার B. A. পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলেই আমি সকলমনোরথ হইয়াছি দেখিয়া চিত্ত আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ পত্র এজীবনে আমি কাহারও নিকট পাই নাই।

আমি তৎক্ষণাৎ চিত্তর প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক একখানি উত্তর দিয়াছিলাম। আমার কতবার ইচ্ছা হইয়াছিল, একবার চিত্তর বাটী আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি; কিন্তু তাহা করি নাই। আমার এ দোষের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বড় দুঃখের বিষয় যে, উল্লিখিত তিন খানি চিঠির একখানিও আমি আজ খুঁজিয়া পাইলাম না; যদি তার একখানিও আজ আমি বাহির করিতে পারিতাম তাহা হইলে তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকা চিত্তরঞ্জনের বাল্যহৃদয়ের কোমলতা, মধুরতা ও উচ্চতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেন। পর বৎসর ১৮৯০ সালে চিত্তরঞ্জন B.·A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বোধ হয় সেই বৎসরেই বিলাত যাত্রা করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়ে চিত্তরঞ্জনের কার্য্যকলাপের কোন পরিচয়ই আমি দিতে পারিব-না। বিলাতে থাকা সময়ে চিত্তরঞ্জনের ছাত্রজীবন তাঁহার সেখানকার সঙ্গী ও সহপাঠীরা বিশেষভাবে অবগত আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বোধ হয় সে পরিচয় দিয়াছেন বা দিতেছেন। তবে আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, বাল্যকাল হইতে তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে বীজ লুকায়িত ছিল তাহা স্বাধীন দেশের নির্ম্মল বায়ুতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত ও বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বিলাতে দুইটী সাধারণ সভায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে দুইবার বক্তৃতা করেন তাহাতেই তাহার পরিচয় এবং সেই বক্তৃতা হইতেই চিত্তরঞ্জনের ভবিষ্যৎ জীবনের সুস্পষ্ট সূচনা। শুনিতে পাওয়া যায় যে, চিত্তরঞ্জন যে বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সে বৎসর যতজন সার্ভিসে নিযুক্ত হন তিনি সেই সংখ্যার মধ্যে একজন হইলেও তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার নিম্নস্থ একজনকে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাহার কারণ তাঁহার সেই দুই বক্তৃতা। যাহা হউক নির্ব্বাচনকারী বা নিয়োগকারী মহাত্মাগণের এ সুমতি ভারতের ও ভারতবাসীর কল্যাণের জন্যই হইয়াছিল এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি ১৮৯১ সালে ওকালতী পরীক্ষা পাস করিয়া ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্টে প্রবেশ করি এবং চিত্তরঞ্জন তাহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যারিষ্টারস্বরূপে হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। অনেকদিন পরে আবার আমাদের এই কোর্টে সাক্ষাৎ। এখন চিত্তর চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ দেহ পূর্ণাবয়ব যুবা পুরুষ—কিন্তু মুখে সেই বাল্যকালের কান্তি ও কোমলতা সমভাবেই আছে। তবে অপেক্ষাকৃত তেজব্যঞ্জক। প্রথম সাক্ষাতে সেই সুমিষ্ট হাসি ও সাগ্রহ আলিঙ্গন একেবারেই আমাকে লণ্ডন মিসনরী স্কুলের বাল্যজীবন স্মরণ করাইয়া দিল। যাহা হউক ব্যবহারজীবী-জীবনের প্রথম দুর্দ্দশা চিত্তরঞ্জনের বেশী দিন ভুগিতে হয় নাই; না হইবারই ত কথা। তাঁহার পিতা সে সময়ে হাইকোর্টে একজন খ্যাতনামা এটর্ণী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত একজন প্রসিদ্ধ উকীল। অল্পদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। পিতা এটর্ণী

হইলেও চিত্তরঞ্জন Original sideএ বিশেষ কাজ করিত আমার মনে হয় না। তবে হাইকোর্টের ফৌজদারী বেঞ্চে এবং মফঃস্বলে ফৌজদারী আদালতে তাহার কাজ বেশী হইল এবং তাহা হইতেই অর্থাগম।

আমিও প্রথম কয়েক বৎসর বেশী ভাগ ফৌজদারীতে ছিলাম এবং অনেক ফৌজদারী মকর্দ্দমা করিতে মফঃস্বল যাইতাম, সুতরাং চিত্তরঞ্জনের কাজ কর্ম্ম লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল। দুইটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন, প্রথমতঃ, চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিয়া কখনও কোন হাইকোর্টের জজ বা মফঃস্বলের হাকিমকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই এবং কোন জজ বা হাকিম বা বিরুদ্ধ পক্ষীয় উকীল বা কৌন্সলীর কথায় চিত্তরঞ্জনের কখনই ধৈর্য্যচ্যুতি দেখি নাই। দ্বিতীয়তঃ, চিত্তরঞ্জনের মুখ সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন থাকিত, তাঁহার ব্যবহারে বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বী কোন উকীল বা ব্যারিষ্টারের কখনও মনঃকষ্টের কারণ হয় নাই। ব্যারিষ্টারীতে চিত্তরঞ্জনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, প্রচুর অর্থাগম ও যশোবিস্তার হয় ইহা সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ এই যে চিত্তরঞ্জন, মোকর্দ্দমার কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন এবং মক্কেলের কার্য্য তিনি একাগ্রচিত্তে ও ঐকান্তিক পরিশ্রম সহকারে করিতেন। কয়েকটী বড় ও জটিল দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধ পক্ষে থাকিয়া আমি তাঁহার অসীম উন্নতির উল্লিখিত কয়টী গূঢ় কারণ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমি বিশ্বাস করি তাঁহার ঐকয়টী গুণই শেষে তাহার রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাকে দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তির শীর্ষস্থানীয় ও একছত্র নেতা করিয়াছিল। বোধ হয় ১৯০৩ কি ১৯০৪ সালে (ঠিক সনটী আমার স্মরণ হইতেছেনা) আমি ও চিত্তরঞ্জন উভয়ে একটী মোকর্দ্দমা উপলক্ষে ধুবড়ী যাই। এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে আমাদের উভয়কে প্রায় তিন সপ্তাহকাল ধুবড়ীতে থাকিতে হয়। চিত্তরঞ্জন ছিলেন বিজনীরাজ পক্ষে, আমি ছিলাম বিজনীরাজের বিরুদ্ধ পক্ষে অর্থাৎ গারোদিগের পক্ষে। অনেক দিনের পর আবার একত্র হইয়া এই তিন সপ্তাহকাল কি আনন্দে কাটাইয়াছিলাম তাহা মনে করিতে আমার চক্ষে জল আসে। সমস্ত দিন অবশ্য দুইজনে দুইপক্ষের মোকর্দ্দমার কার্য্য লইয়া থাকিতাম; কিন্তু প্রত্যহ অপরাহ্নে দুইজনে একত্র হইয়া সুন্দর সুপ্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বেড়াইতাম আর বাল্যকালের কতকথারই আলোচনা করিতাম। আবার সন্ধ্যার পর একত্র বসিয়া প্রায়ই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাল্যকালের মত কবিতার আলোচনা করিতাম। এই সময়ে আবার যেন আমাদের সেই লণ্ডন মিসনরী স্কুলের বাল্যজীবন ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এসময়ের আলোচ্য কবিতা সেই বাল্যকালের কবিতা নহে; এসময়ের আলোচনা কেবল বঙ্গের চিরগৌরবের জিনিস বৈষ্ণব কবিগণের সুমধুর পদাবলী লইয়া। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী চিত্তরঞ্জনের একপ্রকার কণ্ঠস্থ ছিল; আমার সেরূপ ছিলনা। সুতরাং এই মধুর পদাবলীর আবৃত্তি সময়ে আমি কেবলই শ্রোতা ছিলাম। বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়তত্ব এবং কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য চিত্তরঞ্জনের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। ধুবড়ী হইতে ফিরিবার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে তাহার

চিত্তরঞ্জন পরিজন

পশ্চাদ্ভাগে—১। মধ্যমা ভগিনী ঊর্ম্মিলা দেবীর কন্যা, ২। জ্যেষ্ঠা ভগিনী তরলা দেবীর কন্যা, ৩। চিররঞ্জন দাশ (একমাত্র পুত্র), ৪। মিসেস পি, আর, দাশ, ৫। দেশবন্ধু, ৬। বাসন্তী দেবী, ৭। জ্যেষ্ঠাকন্যা অপর্ণা দেবী, ৮। তরলা দেবীর কন্যা, ৯। তরলা দেবীর কন্যা। ১০। কনিষ্ঠা ভগিনী মুরলা দেবী।

মধ্যভাগে—১। সপুত্র সুধীর রায় (জ্যেষ্ঠ জামাতা), ২। ঊর্ম্মিলা দেবী, ৩। তরলা দেবী, ৪। কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবী, ৫। কনিষ্ঠ জামাতা ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, ৬। বিমলা দাশগুপ্তা, ৭। প্রফুল্লরঞ্জন দাশ।

সম্মুখে—১। ঊর্ম্মিলা দেবীর পুত্র, ২। তরলা দেবীর পুত্রবধূ, ৩। প্রফুল্লরঞ্জনের পুত্র—শঙ্কর, ৪। ঐ কন্যা—উমা, ৫। ঐ কন্যা—গৌরী, ৬। দেশবন্ধুর পুত্রবধূ।

দেশবন্ধু
কারামুক্তির অব্যবহিত পরে

বাটীতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন শুনিতে যাইতাম; একসঙ্গে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতাম, বুঝিতাম প্রকৃত ভগবৎপ্রেম চিত্তর হৃদয় আচ্ছন্ন করিতেছে। এই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে প্রায়ই চিত্তর নিকটে দেখিতাম।

ক্রমে চিত্তরঞ্জনের ব্যবসায়ে উন্নতি ও অর্থাগমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে দেশে নানা প্রকার রাজনৈতিক বিপ্লব আরম্ভ হইল। চিত্তরও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ক্রমশঃ সংস্রব আরম্ভ হইল ও তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশমাতৃকার কল্যাণে চিত্তরঞ্জন অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মোকর্দ্দমা হইতে চিত্তরঞ্জনের দেশের কাজের জন্য অকাতরে স্বার্থত্যাগ আরম্ভ হইল। চিত্তরঞ্জনের স্বার্থত্যাগের সূচনা বুঝিতে গেলে আমার মনে হয় চিত্তরঞ্জনের পরদুঃখকাতরতা ও অনুপমেয় দানশীলতায় তাহা পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই চিত্তরঞ্জন অপরিমেয় অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহার অপরিমেয় দানে এবং তদুপরি নিজের পরিবারবর্গের শারীরিক সুখসচ্ছন্দতার জন্য ও পরহিতে তাহা নিঃশেষিত হইতে লাগিল। একটী কথা আমার স্মরণ হইতেছে তাহা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের বকুল বাগানে যে Upper Primary Schoolটী আছে ঐ স্কুলটীর জন্য একখানি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ আবশ্যক হইল। প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইল। আমিই উদ্যোগ করিয়া কার্য্যটী আরম্ভ করিলাম। চিত্তরঞ্জনের নিকট কিছু বেশী সাহায্য পাইব মনে করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম এবং চিত্তকে তাহা বলিলাম। আমি একবার মাত্র বলায় চিত্ত স্বীকৃত হইল। কিন্তু মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়াও যখন চিত্তর সাহায্য পাই নাই তখন একদিন রাগ করিয়া চিত্তর বাটীতে গেলাম। রাগ ও দুঃখ করিয়া দু'চারি কথা বলিতেই চিত্ত আমার হাত ধরিয়া বসাইল এবং যাহা আমাকে দেখাইল তাহাতে আমি নির্ব্বাক হইলাম। দেখিলাম প্রতি মাসেই চিত্তর যে কত প্রকারের দান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চিত্ত প্রচুর অর্থ উপায় করিলেও প্রায় রিক্তহস্ত। আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না; তাহার সাধ্যমত সে যাহা দিবে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে চিত্ত দেশের কল্যাণ জন্য নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনে মজিয়া গেল। ক্রমে তাহার প্রচুর অর্থপ্রসবিনী ব্যবসা ত্যাগ, ক্রমে তাহার দেশ মাতৃকার জন্য সন্ন্যাস ব্রতগ্রহণ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশের উন্নতির জন্য দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য চিত্তের অবলম্বিত পন্থাকে আমি কখনও সমীচান বলিয়া মনে করি নাই, সুতরাং রাজনৈতিক জীবনে আমি চিত্ত হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইলাম। তবে আমার বোধ হয় আমাদের একের প্রতি অপরের প্রীতি ও ভালবাসা কখনও বিন্দুমাত্র মলিন হয় নাই। আমার পুত্রগণ সর্ব্বদা চিত্তর নিকট যাইত এবং চিত্ত ও বাসন্তী দেবীর নিকট সন্তানের স্নেহ ও বাৎসল্য পাইত। শ্রীমান্ চিররঞ্জনও আমাকে পিতার অগ্রজের ন্যায় সম্মান করিত এবং আমার নিকট সেইরূপ স্নেহের দাবী করিত ও পাইত।

যেদিন শুনিলাম চিত্ত আর ব্যারিষ্টারি করিবেন না, সেদিন তাহার ত্যাগ আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল সন্দেহ নাই, কিন্তু চিত্তর এ সঙ্কল্প ভ্রমাত্মক মনে করিয়া মনে অশান্তি বোধ করিতে লাগিলাম। চিত্ত জীবনে কষ্ট কাহাকে বলে জানে নাই; বাল্যকালে সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, শেষে নিজে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও পরিবারবর্গের সাংসারিক সুখ সাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা অনেক বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ এত উপার্জ্জিত অর্থের উদ্বৃত্ত বেশী কিছু নাই, সুতরাং চিত্ত জীবনের শেষে কষ্ট পাইবে ইহাই মনে করিয়া অশান্তি অনুভব করিতাম। এ সম্বন্ধে চিত্তর সহিত আমি কখনও আলাপ করি নাই—শুনিবে কে? আবার যখন শুনিলাম চিত্ত ইচ্ছা করিয়া কারাদণ্ডগ্রহণ করিলেন, তখন হৃদয়ে যে আঘাত পাইলাম তাহা কাহাকেও জানাইবার নহে। নীরবে সহ্য করা ভিন্ন উপায় কি? আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ তৃপ্তিকুমার চিত্তকে পিতৃতুল্য মনে করিত, সে সহ্য করিতে পারিল না। 'কারাগারে চিত্তর সেবা করিতে পাইবে মনে করিয়া সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কারাগারে গেল। আমি নীরবে সকল যন্ত্রণাই ভোগ করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে চিত্ত কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিল। একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। নির্জ্জনে দেখিতে না পাইলে আমার মনে তৃপ্তি হইবে না কিন্তু তাহা ঘটিবে কিরূপে? কয়েক দিন যাবৎ চিত্তর বাটী জনকোলাহলে পূর্ণ। একদিন চিররঞ্জন আমার সুবিধা করিয়া দিল, আমি দুই মিনিটের জন্য চিত্তকে একাকী পাইলাম। চিত্তকে দেখিয়াই আমি হৃদয়ে বিশেষ আঘাত পাইলাম, মুখখানি দেখিয়াই বুঝিলাম চিত্তর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।

দুইখানি হাত ধরিয়া কেবল এই কয়টী কথা বলিলাম—ভাই, দেশের কার্য্যই বল, জাতির কার্য্যই বল বা দেশমাতৃকার কার্য্যই বল কোন কার্য্যই নিজের শরীর সুস্থ রাখিতে না পারিলে মনের আকাঙ্খামত সংসাধিত হয় না। চিত্ত কেবল বলিল, শরীর সুস্থ রাখিতে ত ইচ্ছা করি, পারি কই। আর আমাদের কোন কথাই হইল না, আমি চলিয়া আসিলাম। তাহার পর চিত্তকে কতবার দেখিয়াছি কখনও বা এক আধ মুহূর্ত্তের জন্য সাক্ষাৎও হইয়াছে, মনের আবেগে চিত্তর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কখনও কোন কথা বলি নাই। চিত্তর শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছিল দেখিয়াছি কিন্তু তাহার মুখখানি হইতে সেই স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণটী একেবারে বিলুপ্ত হইতে দেখি নাই। কিন্তু দূরে দূরে থাকিলেও আমি মনের মধ্যে চিত্তর স্বাস্থ্যের জন্য কেমন এক দুশ্চিন্তা সর্ব্বদাই পোষণ করিতাম। আজ এক বৎসর যাবত চিত্তর শারীরিক বিশেষ অসুস্থতার কথা প্রায়ই শুনিতেছিলাম। চিররঞ্জন মাঝে মাঝে আমার নিকট আসিত এবং শরীরের প্রতি পিতার অযথা অবহেলা এবং অসুস্থতা বৃদ্ধির কথা জানাইয়া কত দুঃখ করিত। আমার কেবল শুনিয়া দুঃখ পাওয়া সার হইত। চিত্ত দেশের, চিত্ত দশের, আমি কে? তাহার প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী তাহাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাহার প্রাণাধিক সহোদর

প্রফুল্লরঞ্জন, তাহার স্নেহাস্পদ জামাতা সুধীরচন্দ্র ও পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জন কেহই তাহাকে বিরত করিতে পারিতেছে না, আমি কি করিব? আমার হৃদয়ে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুনিলাম বাঁকীপুরে চিত্ত অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইতেছে তাহার পর শুনিলাম দারজিলিঙে চিত্ত অনেক ভাল আছে কিন্তু কি জানি কেন ইহার কোন সংবাদেই আমি কোন দিন শান্তি বা সোয়াস্তি অনুভব করিতে পারি নাই।

তাহার পর এই অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গদেশের—বঙ্গদেশের কেন সমগ্র ভারতের—সেই ঘোর অমঙ্গল সংবাদবাণী। মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে সহসা মা অপর্ণার ক্রন্দনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। তখনই বুঝিলাম সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দৌড়িয়া শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্রের বাটীতে গেলাম। সেখানে খানিকক্ষণ বাক্‌শূন্য অবস্থায় বসিয়া হৃদয়ের অসহ্য যাতনা ভোগ করিলাম। ক্রমে কংগ্রেসের দুই একজন, স্বরাজ্যদলের সহকর্ম্মিগণ ও মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ও আমাদের পাড়ার অনেকে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেশবন্ধুর মৃতদেহ দারজিলিং হইতে কলিকাতায় আনিবার ও তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমার সহসা স্বর্গীয় স্যার আশুতোষের সেই চিরপ্রফুল্ল মুখের বিকৃত অবস্থা মনে পড়িল। একবার মাত্র বলিলাম, দারজিলিং হইতে এখানে সে দেহ আনিতে দুইদিন লাগিবে, তখন সেমুখ দেখিলে কাহারও হৃদয়ে যাতনার বৃদ্ধি বই উপশম হইবে না। যাহা হউক সকলেরই মত আনা এবং তাহারই ব্যবস্থা হইতে চলিল। তাহার পর বৃহস্পতিবার প্রাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে, মধ্যাহ্নে রসারোডে এবং অপরাহ্নে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি আমারই ভুল, চিত্তরঞ্জনের শবদেহ কলিকাতায় আনাই সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। সেই দিন যাহা দেখিয়াছি, আবার শ্রাদ্ধবাসরে যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মনের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দেশের যতটুকু মঙ্গলসাধন করিয়াছেন তাঁহার দেহত্যাগে তদপেক্ষা অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। চিত্তর আচ্ছাদন জীর্ণ হইয়াছিল তাই সে নূতন আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া আমাদের চক্ষের অগোচর হইয়াছে; কিন্তু আমাকেও ত শীঘ্র নূতন আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হইবে সুতরাং আমার সহিত বাল্যবন্ধুর পুনর্ম্মিলনের বিশেষ বিলম্ব নাই, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

উপসংহারে আমার আর একটী কথা। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রতের একনিষ্ঠ সহকর্ম্মী সহোদরাধিক চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষাকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য আজ কয়দিন ধরিয়া যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে অচিরে তাঁহার অভীষ্ট পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহাতে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেশের ধনী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ সকলের হৃদয়ে চিত্তরঞ্জনের প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বা ভক্তির পরিচয় আজ কয়দিন হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অর্থ সংগ্রহ না হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। তবে এই অর্থ দ্বারা হইবে কি? শুনিতেছি মহাত্মা স্থির করিয়াছেন, সেই বিপুল অর্থ ব্যয়ে চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে তাঁহারই নামে একটী Female

Hospital স্থাপিত হইবে। তাহাতে চিত্তরঞ্জনের তৃপ্তি হইবে কি ? যে কার্য্যের জন্য চিত্তরঞ্জন যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অবশেষে আপন জীবন উৎসর্গ করিল সেই কার্য্যের যাহাতে সহায়তা হয় সেই কার্য্য যাহাতে অগ্রসর হয় এরূপ একটা কিছু করিতে কি চিত্তরঞ্জনের স্বর্গগত আত্মা অধিকতর তৃপ্তি পাইত না। আমার মনে হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জীবনের শেষকালে যে "Village Organisation Scheme" কায়মনোবাক্যে আরম্ভ করিব মনে করিয়া আর করিতে পারিলেন না এই সংগৃহীত অর্থের দ্বারা এবং প্রয়োজন হইলে আরও অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে সেই কার্য্য বিধিমত আরম্ভ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইত ; দেশবন্ধুর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সত্বর পূর্ণ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইত এবং সমগ্র ভারতের নরনারীর হৃদয়ে বংশ পরম্পরায় আবহমানকাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি প্রোথিত থাকিত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী*

তর্পণ

কি দিয়ে পূজিব কোন মুরতি
আজ শুধু মোদের নহ
শত রূপে আজ বিরাজিত তুমি
আজ তুমি একটী নহ।
বংশের গরব নহতো শুধু
শুধু আত্মীয়ের স্মৃতির ধ্যান!
দশের তুমি, দেশের তুমি,
ভারতের তুমি, ওগো মহান্!
স্বার্থ ত্যাগের আদর্শ তোমার
আত্মাহুতি দেশের কাজে।
চীরঞ্জীব যে করেছে তোমায়
মহত্ব এই ভুবন মাঝে।
কর্ম্ম রথের তুমি ছিলে রথী
সারথী তোমার বীর্য্য বল
ভুবনজোড়া উদার অন্তর
ছিল যে বিছায়ে বিশ্বকোল!

কত ভাল ওগো বেসেছিলে তুমি
এই ভারত, এই পুণ্য ভূমি!
মৃত্যু যে আজ দিয়েছে দেখায়ে
তব স্থান, কত উর্দ্ধে তুমি!
কোন রূপে আজ পূজিব তোমায়
রূপ যে তব বিশ্ব জোড়া
অনন্তের মাঝে হয়েছ লীন
অসীমের মাঝে হয়েছ হারা।
হে দেব! তোমার মহিমার গান
হয় কি সমাপ্ত একটী গানে।
চিত্র কি কভু ওঠে গো ফুটিয়া
একটী তুলির একটী টানে?
তোমার স্মৃতি হউক তীর্থ
বাংলার প্রতি বাঙ্গালীর বুকে
শক্তি তোমার শতধা হইয়ে
উঠুক জাগিয়া আরো শতদিকে।

শ্রীমতী সাহানা দেবী

---

* এই প্রবন্ধের লেখক ভবানীপুরস্থিত এল্, এম্, এস্, স্কুলে দেশবন্ধুর সহপাঠী ছিলেন।—বং সং।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

(জীবন-কথা)

ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতার প্রথম সন্তান। তিনি যে বংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশ। কিংবদন্তী আছে যে এই বংশের বহুলোক পুরাকালে বাঙ্গলার কোন কোন অংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদারতা, মনস্বিতা, জ্ঞান, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ মানুষের থাকিতে পারে—এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করিয়া এই প্রাচীন বংশটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়াল বিলের পার্শ্বে তেলিরবাগ নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বপুরুষগণ ইদানীং এই গ্রামে আসিয়াই বসবাস করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর দাস মহাশয় একজন জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং সেইহেতু গ্রামের সকল লোকই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। কাশীশ্বরের তিন পুত্র,—দুর্গামোহন, কালীমোহন ও ভুবনমোহন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র, পরলোকগত সত্যরঞ্জন, রেঙ্গুনের জজ জ্যোতিষরঞ্জন, ও বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট্ জেনারেল সতীশরঞ্জন। ভুবন মোহনেরও তিনটি পুত্র, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। কালীমোহনের কোন পুত্রাদি হয় নাই, এজন্য তিনি বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনকালে তিন ভ্রাতাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কালীমোহন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন। রসারোডের উপর যে গৃহটি চিত্তরঞ্জন সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন সেটি কালীমোহনেরই আবাস ছিল।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ও পিতামহ বিপন্নের সাহায্যার্থে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন এইরূপ অত্যধিক দানের জন্য অবশেষে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কলিকাতাতে থাকিয়াই চিত্তরঞ্জন বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশ্‌নারী কলিজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন্। উক্ত কলেজ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সসম্মানে বি, এ, পাশ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে সাহিত্যে ও বাগ্মীতায় অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া তিনি সহপাঠী ও অধ্যাপকগণকে বিস্মিত করিয়া তোলেন। বি, এ, উপাধি গ্রহণ করেয়া তিনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যান্। সেই সময় দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিলাতে অনেকগুলি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এত সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছিল যে, ভারতের ও বিলাতের অনেকে সেই বক্তৃতাপাঠ করিয়া বিস্মিত

ও মুগ্ধ হইয়া উঠেন। ভবিষ্যৎ জীবনের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় যশশিখরের ইহাই যেন ভূমিকামাত্র। ইহারই কিছুদিন পরে পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জন্ ম্যাক্লীন্ ((Mr. John Maclean) ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই মন্তব্যের প্রতি অক্ষরটি পর্য্যন্ত যেন চিত্তরঞ্জনের বুকে বিঁধিয়া যায়। তিনি ইহার প্রতিবাদার্থে একদিন সকল ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে এক সভায় আহ্বান করিয়া ততোধিক তীব্র একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার অভীপ্সিত ফল ফলিল। মিঃ ম্যাক্লীন ক্ষমা চাহিতে ও পার্লামেন্টের সদসস্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরে তিনি একটি সভায় ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। এই সভার সভাপতি ছিলেন, মিঃ গ্লাড্ষ্টোন (Mr. Gladstone). ভারতের যে হীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থা তিনি বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছেন, যাহা সুতীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়নিভৃতে বিঁধিয়া থাকিত তাহা তিনি এই সভায় বিশদভাবে বুঝাইয়া বলেন। ইহার ফল ফলিতে দেরী হইল না। শোনা যায়, তিনি কৃতিত্বের সহিত সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও এই বক্তৃতার জন্য তাঁহার নাম শিক্ষানবিশের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশলাভ করিতে না পরিয়া চিত্তরঞ্জন 'ইনার টেম্পলে' ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সসম্মানে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বারে যোগদান করেন। সহায় না থাকিলে শক্তির বিকাশলাভ সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা সহায়-সম্পদ্ অভাবে রুদ্ধ হইয়া রহিল। দেউলিয়া আইনের যে গভীর ছাপটি তাঁহার পিতৃদেবের এবং তাঁহার নাম কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই কলঙ্ক তাঁহার ব্যারিষ্টারী নামের বিশেষ প্রতিকূল হইয়াছিল। এইরূপে ষোলটি বৎসর তিনি কষ্টে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি সামান্য যাহা কিছু আয় করিয়াছিলেন, সমস্তই মফঃস্বলে ঘুরিয়া করিতে হইয়াছিল। এই কয়বৎসরের সামান্য আয় হইতে তিনি ৬৭,০০০৲ টাকা সংস্থান করিতে সমর্থ হন। ইহাই তাঁহার পিতৃ-ঋণের পরিমাণ। এই ঋণ গলিত সীসার মত দিবারাত্র তাঁহার মনে সুতীব্র বেদনা জাগাইয়া রাখিত। সুতরাং প্রথম হইতেই তাঁহার চেষ্টা ছিল, এই ঋণ পরিশোধ করা। যখন তিনি উক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন পিতার উত্তমর্ণদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ দিয়া দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার গুণের মূল্য চিরকাল অপ্রকাশ রহিল না। তাঁহার উপেক্ষিত শক্তি একটি উপলক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বপ্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত রাজনৈতিক ষড়্যন্ত্রের মামলার বিখ্যাত আসামী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন। অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি যে কয়টি জ্বলন্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ব্যবহার

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ময়মনসিংহে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়া আছে। এই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার মতে দেশের কার্য্য করিতে হইলে, ইয়োরোপীয় রাজনীতির আলোচনা করিলে চলিবে না। দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অংশ মাত্র। ইহা আমার জীবনের অঙ্গীভূত। আমার স্বদেশ সম্বন্ধে ধারণায় দেবত্বের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। দেশের সেবা এবং জাতির সেবা—মানুষের সেবা।"

ঠিক্ এই ভাবটি কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আর এক বাঙ্গালী বীর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি সেই বক্তৃতাতেই বলিয়াছিলেন,—"আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে অবদান স্বরূপ একটি মহতী সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এক আধ্যাত্মিকতার রক্ষক হইয়া আছি। সেই আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দান করিতে হইবে। আমরা সেই অগ্নি পুনরায় উদ্দীপ্ত করিব। যাহা সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহাকে জীবন্ত এবং উজ্জ্বল করিতে হইবে।"

এইরূপে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (২০শে আগষ্ট) ভারত সচিবের ঘোষণা-বাণীর পর চিত্তরঞ্জন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ধারা ছিল না। মর্লে-মিণ্টোর (Morley-Minto) সংস্কার কংগ্রেসকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। একদল ইহাকে মানিয়া লইয়া কার্য্যধারা স্থির করিতে ব্যস্ত ছিল, আর একদল এই সংস্কারকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃত ছিল। চিত্তরঞ্জন শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দলটি যখন মর্লে-মিণ্টো সংস্কার মানিয়া লইয়া দেশে তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছিলেন, তখন চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক গগন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে ভারত সচিবের ঘোষণা বাণীর পর উনিশজন চিন্তাশীল ব্যক্তির স্বাক্ষরিত সংস্কারের খসড়া (Memorandum of the nineteen) যখন ভারতের সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছিল, তখন দাশ মহাশয় আর একবার রাজনৈতিক গগনে দর্শন দিলেন। লর্ড মণ্টেগু তখন ভারতে আসিতেছিলেন। মণ্টেগু ভারতের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া একই সঙ্গে সানুচর ভারত প্রবাসী ইংরেজ এবং ভারতবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিবার মন্ত্র স্থির করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন বিলম্ব ঘটিলে তাঁহার সংস্কারের খসড়া সম্বন্ধে অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। সেইজন্য অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই তিনি পার্লামেণ্টে তাঁহার সংস্কার আইন পাশ করাইয়া লইলেন। অমৃতসরে কংগ্রেস বসিলে অনেক ভারতীয় নেতা এই মণ্টেগু সংস্কারের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি, মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এই সংস্কারে সন্তুষ্ট হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহিয়াছিলেন। তখন এই বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। হয়ত আর একবার তাঁহাকে নিজ আদর্শ লইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সরিতে হইত, কিন্তু তাহা হইল না। ইহার পরে ঘটনাক্রমে ভারতে

অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্রোতে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ত্যাগ-বীর মূর্ত্তিতে ভারতের উচ্চ প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন।

রাউলাট্ আইনের পাণ্ডুলিপির পর পঞ্চনদের হাঙ্গামা ও জালিয়ান্ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য দেশে মহা অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হয়। 'হাণ্টার কমিটি' এবং 'কংগ্রেস এনকোয়ারী কমিটী,'—এই দুই তদন্ত সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে, চিত্তরঞ্জন তাহাতে যোগদান করেন নাই। নাগপুর কংগ্রেসেও প্রথম প্রথম তিনি এই নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু পরে এই নীতি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করেন।

তিনি যুবরাজের আগমন উপলক্ষে ভারতব্যাপী হরতালের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। যে সময় সরকার স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন, সে সময় তিনি সরকারের ঘোষণাকে অবৈধ বলিয়া প্রচার করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র ধৃত হন্ ও ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন্। পুত্রের গ্রেপ্তারের দুইদিন পরে তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনী ধৃত হন্ কিন্তু পরে মুক্তি লাভ করেন। শুনা যায় ঠিক্ সেইদিনই চিত্তরঞ্জন লর্ড রোণাল্ড্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং এই ঘটনার ইঙ্গিতমাত্র তিনি জানিতেন না। এই ঘটনার ঠিক দুই দিন পরে সহরময় প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, দাশ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁহাকে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অভিভাষণের খসড়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই অভিভাষণে তিনি তাঁহার অসহযোগ-নীতি গ্রহণের কারণ দেখাইয়া দেন। অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা ভারতীয় শাসনসংস্কার আইন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এ আইন আমাদের কোন উপকারই করিতে পারে না।

তিনি যখন জেল হইতে বাহির হইলেন, তখন দেশ নেতৃ-শূন্য। দেশবাসী তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসে যে কাউন্সিল বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, দাশ মহাশয় সেই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া কাউন্সিল গ্রহণ প্রস্তাব গ্রাহ্য করাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সফলকাম না হইয়া স্বরাজ্যদল গঠন করেন। একদিন যে ক্ষুদ্র দলটির সূচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে একটি বিশালরূপ ধারণ করিয়া সামান্য ভ্রূকুটী-ইঙ্গিতে সিন্ধুপারের ভারত-ভাগ্য-বিধাতাদের কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা যে কোন উপায়েই হউক কার্য্যে পরিণত করিতেন। যেদিন তিনি কাউন্সিল গ্রহণ পন্থাকে ন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিলেন, সেইদিন হইতে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা এই নীতি দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গ্রাহ্য করাইয়া লইলেন। ইহার পর কোকনদ কংগ্রেসেও এই নীতি গৃহীত হয়। এইবার স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন।

চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশলাভ করেন। বাঙ্গলা এবং মধ্যপ্রদেশের দ্বৈতশাসনের সংহার-প্রচেষ্টার সাফল্য চিরদিন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে লিখিত থাকিবে। পরে আমেদাবাদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনপ্রমুখ স্বরাজ্যদল ঘরে-বাহিরে যে প্রবল উত্তেজনা ও কর্ম্মের সৃষ্টি করে, তাহা ভারত ইতিহাসের একটি অধ্যায় হইয়া থাকিবে। ইহার যবনিকাপাত আজিও হয় নাই।

অত্যধিক পরিশ্রমহেতু চিত্তরঞ্জনের শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি পাটনায় যান। কিন্তু সরকারের প্রস্তাবিত অর্ডিনান্স আইন তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনে। অসুস্থদেহে তিনি কাউন্সিলে উপস্থিত থাকিয়া সরকারকে পরাজিত করেন। তাহার পর ফরিদপুর প্রাদেশিক সমিতিতে সভাপতি হইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরকারের সহিত কি কি সর্ত্তে সহযোগিতা করা যাইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিয়াছিলেন। এ সকলের স্মৃতি আজ সকলের মনে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

মৃত্যুর প্রায় মাসাধিকপূর্ব্বে তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতেছিল। কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। আচম্বিতে বাঙ্গলার এবং ভারতের মস্তকে বজ্র হানিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চিরজীবনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। সেইদিনই ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতায় খবর আসিল, বাঙ্গলার যে আলোক-বর্ত্তিকা সমগ্র ভারত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বিধাতার সামান্য একটি ফুৎকারে নিমেষে নিবিয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুরের প্রস্তাবে সরকারকে পরাভূত করিয়া দেশবন্ধু দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজ চারিদিক হইতে প্রশ্ন হইতেছে,—ইহার পর কি হইবে? এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে,—জাতির আত্মসম্মান রাখিতে হইবে, স্বরাজলাভ করিতে হইবে।"

তাঁহার তিরোধানে বাঙ্গালী গভীর তমসায় পথ সন্ধান করিতে করিতে বার বার আর্ত্তস্বরে ঠিক্ সেই প্রশ্নই করিতেছে,—"ইহার পর কি হইবে?"

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধুর প্রয়াণে

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো,—বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদী-মাতা।
কাল বৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইত রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল উর্ম্মির তালে,—বক্ষে তব লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
উদ্ধত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জ্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি',
ত্র্যম্বক-পিণাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু-অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি',
এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্ম্মন্তুদ,—ক্লৈব্যের সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালীর সর্ব্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধূলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভাণ্ড তীব্রদর্পে,—বৈরাগের রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে—পৃথ্বী-পুরোভাগে
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি'
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাব-গঙ্গোত্তরী
আর্ত্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি ;
বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভি নিনাদ,
শান্তিপ্রিয় মুমূর্ষুর শ্মশানেতে এনেছিলে আহব-সংবাদ,
গাণ্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে,—"আছি, আমি আছি!
কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।"
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষ সত্তম।
ছিলে তুমি রুদ্রের ডম্বরুরূপে বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে,—
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
শিবাকুল-শঙ্কুলিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে।
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরি' একাকী
স্তব্ধশিলা সন্ধিতলে ঘন ঘন গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি মাখি'।

ছিলে তুমি নীরবতা-নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিওরে
উন্মত্ত ঝটিকা সম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে ;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শব-সাধকের বেশে,—সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রঞ্জনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত ভারতী ;
কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দগ্ধ হলে দেশ-অধিপতি।
বিধিবশে দূরগত বন্ধু আজ,—ভেঙে গেছে বসুধা-নির্ম্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোক।
মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বৃন্তহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতট, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন,—উচ্ছ্বাস-উচ্ছল।
যৌবনের জলরঙ্গ এসেছিল ঘনস্বনে দরিয়ার দেশে,
তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে এসেছিল ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চ্চনার হোমকুণ্ডে হবি সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি',
বামদেবতার পদে অকাতরে দিয়ে গেল মেধ্য হিয়া ডালি।
গৌরকান্তি শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে চুপে রেখে এল পুঞ্জীভূত রক্তস্রোত রেখা।

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

দেশবন্ধু-কথামৃত

বাঙ্গালার কথা

(১)

বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ।

(২)

ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব তাহার সাক্ষাৎ

পাইলাম। এমন করিয়াই ত মনুষ্য-জীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু।

(৩)

আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালীর স্বভাব-ধর্ম্মের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলন অসম্ভব।

(৪)

কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইব।

(৫)

আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গলা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলায় সুখ-দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গিয়াছে, আছে শুধু সুখের মোহ, আর দুঃখের যন্ত্রণা ও অবসাদ।

(৬)

জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়—ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ-জনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে।

(৭)

এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না; খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি—(cousin) হইয়াছে—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন আরও দুর্ব্বল শতছিন্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি।

(৮)

Industrialism বাঙ্গালা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতি-ফ্যাক্টরি-রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় আমাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে।

(৯)

আমাদের এই ইউনিভারসিটি-ফ্যাক্টারিতে বি-এ, এম্-এ, পি-এচ-ডি, পি-আর-এস, এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ারী হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয় না। এই শিক্ষাতে আমাদের ছাত্রদিগের আত্মসম্বিতকে জনমের তরে বিসর্জ্জন দিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী; সে আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয়, আর বিজ্ঞানের বড়াই করে।

(১০)

আমাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বাধীনতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, তবেই স্বাধীনতা আসিবে।

(১১)

গভর্ণমেণ্টের হিংসামূলক শাসন-পদ্ধতিই বাঙ্গালাদেশের প্রজা-শক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

(১২)

আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

(১৩)

বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই। পৃথিবীর এই মহাপ্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। ইহা পলাশী প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জীর্ণ দ্বারে ক্লাইবের পদাঘাতও নয়। আমি মানস-চক্ষে দেখিতেছি, ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম,—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,—তাহা অপেক্ষাও শোণিত-পিচ্ছিল।

সাহিত্য-কথা

(১)

সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।

(২)

না পাওয়ার জন্য যে ক্রন্দন, সেই ক্রন্দনে এক অপূর্ব্ব সুর উঠে, সেই সুর গানে পরিণত হয়।

(৩)

কলাকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য।

(৪)

যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য।

(৫)

শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজ। তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না।

(৬)

কবিতা ও গানে কিছু প্রভেদ আছে; গানে যখন আমরা নিজেদের ব্যক্ত করি, তখন সুরই আমাদের প্রধান সহায়, কথা ভাবানুযায়ী উপলক্ষ্য মাত্র।

(৭)

যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির সকল সৃষ্টি, কল্প-কলা-সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া স্রষ্টা এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাস-লীলা সাধন করিতেছি।

(৮)

এ জীবন অণু হইতে অণীয়ান, মহৎ হইতেও মহীয়ান; জীবন ও মৃত্যু একই সুরের খেলা। আন্তরিকতা সেই জীবন ও মৃত্যুর বন্ধনী। আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবক-শিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি, ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলন-মাধুর্য্য।

(৯)

ভাগবতে ভগবানকে শুধু যুগলরস-মূর্ত্তিতে দেখে নাই, তাঁহার ভিতর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রসাবতারণা আছে।

(১০)

বস্তুর অন্তরের যে রূপ, তাহার উৎসকে খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেইরূপ চিন্তামণির অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া তোলাই কল্প-কলার শেষ রঙের খেলা।

(১১)

যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে।

(১২)

বাঙ্গলার আধুনিক উপন্যাস-সমুদ্র যদি কেহ মন্থন করিতে চান, তবে দেখিবেন রিরংসার বিষে,—এবং তাহাও আমি বলি, কেরঙ্গ-রিরংসা,—বাঙ্গলার তরুণ-তরুণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান। এত যে বিষ,—তাহা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সহ্য হয়, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি—"লাখে না মিলিল এক"—একটাও নীলকণ্ঠ আমি বাঙ্গলায় পাইলাম না, এই আমার আক্ষেপ।

(১৩)

বঙ্কিম ও গিরীশ-সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও বাঙ্গালীর সাহিত্য হইয়াছে। এই দুই মহাকবির সৃষ্ট বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্যে একটা মৌলিক ও যৌগিক সম্পর্ক আছে।

বোম্বাই ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা
১৯২২

(১৪)

বাঙ্গলা ইউরোপ নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল ইউরোপের সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্যের এ রকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বাঙ্গালা তাহার সুরে ও রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেই প্রস্ফুটিত, পূর্ণ বিকশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গলা ও জগত ভরপূর হইবে। যদি তাহা না হয়,—যদি বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে, তবে বাঙ্গলা সাহিত্য লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি ?

(১৫)

জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়; নবযৌবনের দলের লীলা নয়; ইহা বিলাতী Coquetry,—জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

(১৬)

ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া, সেই কথাগুলিই রসান দিয়া, বাঙ্গালায় বলিলেই বাঙ্গালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংঘাত-জনিত শত খণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে ফিরিতে বলিতেছি, আমি যে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে বলিতেছি, বাঙ্গলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া, নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজেকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্বভাবে বিচিত্র হইয়া বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণ-ধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাব-মোহ, এই 'বিশ্ব-মোহ', যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে, নাড়ী-চক্রকে ব্যাধিপীড়িত মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার হইতেই হইবে।

নানা কথা

(১)

সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ; এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পৌঁছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়,—সুখ।

(২)

ভাগবতে যে মধুর ও মঙ্গলের আভাস আছে, চৈতন্যে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল।

(৩)

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের প্রাণের সম্পর্ক, সকলই ছিল—আছে। অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আছে, খেলা চলিয়াছে, এখন একুল ও ওকুল দুকুলেরও ভাবনা নাই, লীলা-সাগরে দেহ পড়িয়া ভাসিতেছে। চিরজন্ম চিরকাল কল্পকাল ধরিয়া তুমি আর আমি এই খেলার রসে মজিয়া

আছি। এ কেহ বুঝে না, যে রসিক হইয়াছে, যে ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে, সেই সে জানে ঘরের কথা।

(৪)

সাধনার পথে সাধক বিশ্বের দর্পণে তাহার নিজের মুখের ছায়া যখন দেখে, তখন তাহার সত্যরূপ প্রকটিত হয়।

(৫)

সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বের আত্মা জাগ্রত, মুখরিত, বিকশিত, সৌন্দর্য্য লীলায় লীলায়িত।

(৬)

অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না।

(৭)

সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি।

(৮)

সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ।

(৯)

শত প্রকারের বিরোধ বাদ-বিসম্বাদের মধ্যেই মানুষ, মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়।

(১০)

ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির নিজস্ব সম্বিত; সমাজ জাতির আত্মস্থ সম্বিত। সত্য কাহাকেও ত্যাগ করিয়া ফুটিয়া উঠে না।

(১১)

মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসম্বিত, তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য।

(১২)

অত্যাচারই অত্যাচারের সৃষ্টি করে।

(১৩)

প্রত্যেক সৎব্যক্তিই বলিতে বাধ্য যে,—'আমার দেশকে ভালবাসি, আমি আমার স্বাধীনতাকে ভালবাসি, আমার নিজের ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার, আমার নিজের দেশকে শাসন

করিবার অধিকার—জন্মগত অধিকার, আমার আছে।" যদি তাহা অপরাধ হয়, তবে সেই কর্ত্তব্য পরিহার করার চেয়ে আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতেও ইচ্ছুক।

(১৪)

আমার হাতে হাতকড়ি ও দেহে লৌহ-শৃঙ্খলের ভার অনুভব করিতেছি। ইহা দাসত্বের যন্ত্রণা। অখণ্ড ভারত আজ একটি বৃহৎ কারাগার।

(১৫)

জীবন এক অখণ্ড সত্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মস্ত ভুল। পঞ্চ-প্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলোকে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত জীবনকে সেই ঈশ্বরের অনুমুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য।

(১৬)

ইতিহাস কি ভগবানের লীলার বাহিরে? যারা তাহা মনে করে, তারা ইতিহাস জানে না, ভগবানের লীলা বুঝে নাই। প্রত্যেক জাতি ভগবানের লীলার বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভগবানের বিচিত্র লীলার সহচর।

(১৭)

শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসিবে, যখন রাজনীতি বলিয়া পৃথক কোন জিনিষ থাকিবে না। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সকল নীতিই এক হইয়া যাইবে।

(১৮)

মানুষ হইয়া পৃথিবীর উপর বাঁচিতে গেলে স্বরাজ আমাদিগকে পাইতেই হইবে। স্বাধীনতালাভ না করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আগে নিজের উদ্ধার প্রয়োজন, সেই উদ্ধার না লাভ করিলে আমরা জগৎকে কি করিয়া নিজের বাণী শুনাইব? সেজন্য আমাদের উদ্ধারে জগতেরও প্রয়োজন আছে।

(১৯)

জয়ী যে, সে দম্ভ করে না। বীর যে, সে জয়ের পর বিনয়ে অবনত হয়।

(২০)

ইতিহাসের পথ—গতি-মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস—তাহাও এক প্রচণ্ড গতি-পথে—যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তি-পথে পুনঃ পুনঃ অতি দুর্দ্দম গতি-বেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে,—শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।

(২১)

ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড় জগতের পরিবর্ত্তনশীল মায়া-প্রপঞ্চ-প্রকৃতির দাসত্ব হইতে জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে।

(২২)

সকলেই বলে যে দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই—পাপ হইতেও মুক্তি। কে এই পাপ করে? আমি বলি, যে দাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সেই পাপ করে। আমি আরও বলি, যে ক্লীব ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সেও পাপ করে।

(২৩)

ভারতবর্ষে এক জাতীয়তা কঠিন হইলেও সম্ভবপর। বৈচিত্র্য বাধা নহে। বৈচিত্র্য যত বেশী, ঐক্যও তত দৃঢ় হইবে।

(২৪)

আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।

(২৫)

আমি জগতের পরিণামে একটা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সমগ্র মানব-জাতির একটা মহা মিলনের যে স্বপ্ন,—তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

(২৬)

উপায় আদর্শেরই একটা অংশ। কেননা; যখনি আমরা উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনি আমাদের মনের সম্মুখে উদ্দেশ্য বা আদর্শ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

(২৭)

জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে।

(২৮)

আমার নিজের যেটুকু অধিকার, তাহা ভগবানের দান, কোনও মানুষের তাহা কাড়িয়া লইবার অধিকার নাই।

(২৯)

আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন বলিব, এমন সংস্কার আমি চাহি না, যাহাতে এ দেশের জনসাধারণ মানুষের প্রকৃতিগত, জন্মগত অধিকার পাইয়া ধন্য না হয়।

(৩০)

দুই আর দুই যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, আমাদের সকলের দেশ-জননীর সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

বিজয়-সম্বর্দ্ধনা

পথের কাঙাল রাজা-সন্ন্যাসী
আবার এসেছ ফিরে,
তব চরণের ধূলি ধুয়ে দেব মোরা
আকুল নয়ন নীরে।

প্রীতি চন্দনে করি প্রসাধন
অযুত বক্ষে পেতেছি আসন
লক্ষ প্রাণের প্রদীপে আরতি
আজিকে তোমায় ঘিরে।

পথকণ্টক বিঁধিয়াছে পায়
কত যে আঘাত লাগিয়াছে গায়
বিশাল বক্ষে বজ্র চাপিয়া
চলিয়াছে ধীরে ধীরে।

ধৈর্য্য-বীর্য্যে তুমি হিমাচল
ঝঞ্ঝা বাদলে রয়েছ অচল
নিজ বাহুবলে করিয়াছ পথ
আঁধারের বুক চিরে।

তব জয়ভেরী রাজা-সন্ন্যাসী
শঙ্কাহরণ সংশয়-নাশী
উন্নত ভালে বিজয় তিলক
দীপ্ত হয়েছে ফিরে!

শ্মশানের বুকে হোমের আগুন
পরশে তোমার জ্বলিবে দ্বিগুণ
মৃত্যু নাচিবে জীবনানন্দে
মরা গঙ্গার তীরে।*

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মৃত্যু ও অমরত্ব

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে?"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খৃঃ ৫ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯২৫ খৃঃ ১৬ই জুন তিনি দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই জন্ম ও মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া কে আসিয়াছিল,—কে চলিয়া গেল, এত দ্রুত সহসা কেহই তাহা বলিতে পারিবেনা। বলা কঠিন। কালের কষ্টি-পাথর, চিত্তরঞ্জনের জীবন গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। আশা হয়, ইতিহাসের বক্ষে কৌস্তুভ মণির মত তিনি শোভা পাইবেন। অনাগত ভবিষ্যবংশীয়েরা তাঁহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে দেখিতে পাইবে। কেননা মৃত্যু তাঁহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, প্রকট করিয়াছে। যাহারা মরিয়াও মরেনা,—ইতিহাস সেই সমস্ত অমরদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন দিয়াছে। দেহ ধারণ করিয়া যদিও বা মৃত্যু ভয় ছিল, দেহত্যাগ করিয়া তিনি সম্পূর্ণ অমরত্ব লাভ করিলেন। ইতিহাস এই অমরত্বের পাদপীঠ।

* ২৬শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩২৯ সাল ভবানীপুর হরিশ পার্কে দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর সর্ব্বপ্রথম সম্বর্দ্ধনা-সভায় দক্ষিণ কলিকাতা স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক গীত।

তারপর ?

তারপর দেখা গেল হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের দেহত্যাগে, একটা বিরাট প্রাণী আচম্‌কা আহত হইলে যেমন করিয়া উঠে,—তেমনি করিয়া উঠিয়াছে। কোন একজন মানুষের মৃত্যুতে এত বড় বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মহাদেশে, এত বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে, এক সঙ্গে এমন একটা প্রবল শোকের বন্যা প্রবাহিত হইতে সম্প্রতি দেখা যায় নাই। চিত্তরঞ্জন সেই শ্রেণীর একজন মনুষ্য, যাহার অভাবে একটা জাতি ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে। ইহা প্রত্যক্ষ। ইহাও ইতিহাস। কিন্তু—তবু—তথাপি—এখন—তারপর— ?

আমরা কি করিব ?

শুধু ক্রন্দন—আর ক্রন্দন—আর ক্রন্দন ? সমগ্র জাতি কি একটা সদ্যঃজাত শিশু ? না—কতকগুলি নিঃসহায় স্ত্রীলোকের সমষ্টি মাত্র ? আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি এমন সময়ে দেহত্যাগ করিলেন যে, দুদণ্ড বসিয়া শোক করিবার অবসর পর্য্যন্ত দিয়া গেলেন না। এইত মাত্র সেদিন ফরিদপুরে তিনি নিজ মুখে আমাদিগকে বলিয়াছেন—"এখনো সময় আসে নাই—যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনো তোমাদের অপেক্ষায় কল-কোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা—তাহা কদাপি ভুলিওনা।" তবে ? সেনাপতি হত বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সৈনিক আমরা কি করিব ? ক্রন্দন ? তাহাতে ত তাঁহার আদেশ পালন করা হইবে না, আদেশ লঙ্ঘন করাই হইবে। চিত্তরঞ্জন একটা জাতিকে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিয়া সমরাঙ্গনে চতুরঙ্গে সুসজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। নব কুরুক্ষেত্রের—নূতন ভারতের,—হে নব অক্ষৌহিণী, নিরস্ত্র এবং অহিংস বর্ম্মে আবৃত সৈনিকবৃন্দ—কি কঠিন পরীক্ষা আজ তোমাদের সম্মুখে! তোমরা কি ঘরে ফিরিয়া যাইবে ? পলায়ন করিবে ? পৃষ্ঠ দেখাইবে ? অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া হীনপ্রাণ কাপুরুষের মত কেবল শোকাশ্রু মোচন করিবে ? যুদ্ধক্ষেত্রে শোকের অবসর নাই। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং গাণ্ডীবীকেও শ্রীভগবান সে অবসর দেন নাই। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের দেহত্যাগে, হে বাঙ্গালী, তুমি আর অধিকক্ষণ শোকবিলাসী হইয়া কালক্ষয় করিওনা। শোক করা কঠিন নহে, শোক দমন করাই কঠিন।

চিত্তরঞ্জনের চিতা ও মহাত্মা গান্ধী

চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহকে ভস্মীভূত করিবার জন্য চিতায় যখন অগ্নিসংযোগ করা হইল,—মহাত্মা গান্ধী সেই অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই গভর্ণমেণ্টকে স্পষ্ট অনুরোধ করিয়া লিখিতে বসিলেন যে, দেশবন্ধুর স্মৃতির সম্মানের জন্য যে সমস্ত রাজবন্দীকে তিনি নির্দ্দোষ মনে করিতেন তাঁহাদিগকে যেন গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট দেশবন্ধুর স্মৃতির সম্মানের জন্য কি করিবেন এরূপ কোন সুপরামর্শ মহাত্মার নিকট চাহিয়া পাঠান নাই।

মহাত্মা উপযাচক হইয়া গভর্ণমেণ্টকে এই সুপরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অনন্তসাধারণ মহাপ্রাণতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষও ইহাতে কেহ কেহ লক্ষ করিবেন, কিন্তু—স্থান, কাল ও পাত্র এইরূপ অনুরোধের যোগ্য হয় নাই। চিত্তরঞ্জনের জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমরা বাঙ্গালী জাতি কি পৃথিবীতে আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইলাম না? সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্বপ্রথমে চিত্তরঞ্জনের জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যে মনুষ্য গভর্ণমেণ্টকে সাশ্রুনেত্রে করযোড়ে অনুরোধ করিতে পারেন, তিনি চতুর হইতে পারেন, রাজনৈতিক হইতে পারেন, এমন কি—দুঃখের বিষয় মহাত্মা গান্ধীও হইতে পারেন—কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলে লজ্জার অবধি ছিল না।

লর্ড বার্কেনহেড্ ও ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস

চিত্তরঞ্জনের চিতার আগুন নিভিতে না নিভিতেই লর্ড বার্কেনহেড্ এক ভোজের বৈঠকে, তাঁহার কোষবদ্ধ দৃঢ় তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধারের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনৈতিহাসিক অসম্বদ্ধ ও অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। এই ত সেদিন চিত্তরঞ্জন ফরিদপুরে স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন যে—উক্ত লর্ড তাঁহার নিজের দেশের ইতিহাসই ভাল করিয়া পড়েন নাই, পড়িলেও বুঝিতে পারেন নাই। হইলে কি হয়, তলোয়ার যাহার আছে সে তাহার তীক্ষ্ণ ধার পরীক্ষা করিবেই। বাঙ্গালী, বিদেশীর এই তীক্ষ্ণ ধার তলোয়ারের পরীক্ষার জন্য এবার সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই আহ্বান করা হইবে। কেননা, তোমার বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন ব্রিটিশ কেশরীকে পৃথিবীর সম্মুখে বড়ই লজ্জা দিয়াছে। অতএব—প্রস্তুত হও। অগ্রে লর্ড বার্কেনহেডের তীক্ষ্ণ ধার তলোয়ারের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আইস, পরে শোক করিও। যাও বীর, যাও।

একটা জাতি শোক করিবে কেবল অশ্রু ত্যাগ করিয়া ইহা আমি বিশ্বাস করি না। চিত্তরঞ্জনের জাতি কি কেবল স্ত্রীলোক আর বালকের জাতি? তবে বন্ধ কর এই শোকের বিলাস। চিত্তরঞ্জনের জন্য শোক করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই বা তাঁরই আছে, যাঁহারা বা যিনি লর্ড বার্কেনহেডের এই অযথা মিথ্যা দম্ভভরা অপমানকর বাক্যকে, কথা দ্বারা, কার্য্য দ্বারা—চিত্তরঞ্জনের মত উত্তর দিতে সক্ষম। বাঙ্গলায়—ভারতে তাঁহারা বা তিনি কে?

সদ্য শোকে মুহ্যমান আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট সুযোগ বুঝিয়া আমাদের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতেছেন। লর্ড বার্কেনহেডের উপর যে বিশ্বাস রাখিয়া ফরিদপুরে দেশবন্ধু কথা বলিয়াছেন,—তাঁহার মৃত্যুতে মনে হয় মহামান্য লর্ড কিঞ্চিৎ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। ইহার উত্তর কি? ইহার উপায় কি?

যদি বাঙ্গালী, ইহার উত্তর দিতে না পার, যদি ইহার উপায় করিতে না পার, তবে দেশবন্ধুর জন্য অযথা শোকের ভাণ করিয়া, তাঁহার পুণ্য-স্মৃতিকে অপমান করিওনা। অক্ষমের শোক ভগবান পর্য্যন্ত শুনেন্ না।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ

'শ্রী-ঐশ্বর্য্য-বলশালী যা' আছে যথায়,
আমারি তেজের অংশ।'—কহেন গীতায়,
অর্জ্জুনে শ্রীকৃষ্ণ ; কালে এ মর্ত্তমাঝারে,
প্রকাশে বিভূতি তাঁ'র মনুষ্য-আকারে।

জনের নায়ক যাঁরা তাঁ'রা অবতার,
ভগবদ্-বাক্যে ; ছুটে না করি' বিচার,
জনসঙ্ঘ, যাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া,
তাঁ'দের পশ্চাতে, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ যেন,
তব বাক্য আজ্ঞা মম মানিবে বা কেন ?
হে চিত্তরঞ্জন ! চিত্ত রঞ্জিয়া সবার,
পিতৃদত্ত নাম আজি সার্থক তোমার !
সাধিতে আরব্ধ ব্রত অক্লান্ত উদ্যম,
দেশহিতে তব স্বার্থত্যাগ অনুপম,
প্রশংসে পরম শত্রু ; সকলে মিলিয়া,
সম্মানিল তোমা 'দেশবন্ধু' নাম দিয়া।
প্রসবিয়া মাতৃভক্ত হেন সুসন্তান,
অবজ্ঞাতা বঙ্গমাতঃ ! তোমার সম্মান,
প্রথিত পৃথিবীময় ! ইংলণ্ড এখন,
পার্শ্বে তাঁ'র সখীভাবে দিবেন আসন।

যাও কর্ম্মবীর ! নাহি অসম্পূর্ণ আর,
এসেছিলে যেই কার্য্যে ; নিশ্চিন্তে এবার,
যাও সে ভাস্বর ধামে, বসেন যথায়,
আশুতোষ সুরসভে মহামহিমায়।
বলগে তাঁহারে,—"অস্থি রাখি গঙ্গানীরে
আসিনু নিকটে তব মন্দাকিনী-তীরে,
সম্পাদিয়া মাতৃপূজা ; শিখা'নু সবারে,
সে ভাষায় মাতৃস্তব, জীবিতা যাহারে
করিয়াছ তুমি দেব ! নশ্বর সে কায়,
তব পার্শ্বে হয় দগ্ধ অক্ষয় চিতায় ;
নিভায় অঙ্গার মম কোটি নরনারী,
তোমার চিতাগ্নি সম, ঢালি' নেত্রবারি।
করেছেন ভগবান্ আমারে অর্পণ,
দেশভক্তি-পুরস্কার—স্বধর্ম্মে নিধন।"
নাহি সেই স্থূল দেহ ; এবে মহাপ্রাণ,
সমুজ্জ্বল সূক্ষ্ম দেহে করে অবস্থান,

জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধ লোকে ; বিশ্ববাসী জন,
মানসে সে দেবমূর্ত্তি করিছে দর্শন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চিত্তরঞ্জনের কাব্য-পরিচয়

আজ বাঙ্গলার চোখে বুকফাটা অশ্রু। বাঙ্গলার চিত্তরঞ্জন, বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন, ভারতের চিত্তরঞ্জন, দেশমাতৃকার ভক্ত সন্তান সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশনায়ক দেশবন্ধু আর নাই। দেশনায়ক! শুধু কি তাই? একদিক দিয়া তাঁর জীবনের পর্য্যালোচনা করা চলেনা, নানাদিকে তার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার মানসপটে যে তাঁর বিভিন্ন ছবি প্রতিফলিত। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জন, স্বদেশ-প্রেমিক সুকণ্ঠ বক্তা চিত্তরঞ্জন, সুপণ্ডিত প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক কবি চিত্তরঞ্জন, রাজৈশ্বর্য্যশালী ভোগী চিত্তরঞ্জন, সর্ব্বত্যাগী বিরাগী চিত্তরঞ্জন, স্বরাজকামী বাঙ্গলার কর্ম্মবীর অপূর্ব্ব যোদ্ধা দেশনায়ক চিত্তরঞ্জন। সব জড়াইয়া তিনি, সব ছাড়াইয়া তিনি, সবার সঙ্গে তিনি, সবার উর্দ্ধে তিনি। আজ যখন মর্ম্মাহত শোকাকুল বাঙ্গালী তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী দেশনায়কের স্মৃতির তর্পণে সমুদ্যত, তখন যদি আমি কবি চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করিয়া এক ফোঁটা অশ্রু পাতিত করি হয়ত বা তাহা অশোভন হইবে না।

দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে অচিন্তনীয় অপরিসীম ক্ষতি হইয়া গেল তার পূরণ কোন দিনই হইবে না নিঃসন্দেহ, কিন্তু সাহিত্যজগতের ক্ষতির কথাটাও চিন্তার বিষয়। প্রথম যৌবনে চিত্তরঞ্জন যখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই, যখন ব্যবসার ক্ষেত্রেও কুবেরের সিংহদ্বারের সন্ধান পান নাই, তখন তাঁর প্রেমিক মন লুব্ধ ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিয়া ফিরিত—বাণীর কুঞ্জবনে। বাণীর সাধনায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা যদি তাঁর একনিষ্ঠতায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত তাহা হইলে যে সাহিত্য জগতে তিনি অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে স্বদেশ-প্রেম পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে সর্ব্ব-ত্যাগী বিরাগী করিয়া তুলিয়াছিল, তার আভাষ ছিল তাঁহার রচনায়। বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার ভাষা, বাঙ্গলার ধর্ম্ম, বাঙ্গলার জীবন, বাঙ্গলার আচার, বাঙ্গলার যা কিছু নিজস্ব সবই তাঁহার প্রাণে আনন্দের বাঁশী বাজাইত; বাঙ্গলাকে যে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার লেখনীর মুখে "বাঙ্গলার গীতি কবিতার" প্রারম্ভে। বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনার প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে ও নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে, শত সহস্র আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে।" সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার ঢেউখেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুর গন্ধবহ

মুকুলিত আম্রকানন,, মন্দিরে মন্দিরে ধূপধূনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর-প্রাঙ্গণ বাঙ্গলার নদ নদী, খাল বিল, বাঙ্গলার মাঠ, তালগাছ-ঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলে ভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে বিধৌত-চরণ জগন্নাথের শ্রীমন্দির। বাঙ্গলার সাগরসঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা, বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন আচারব্যবহার, বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। এই সবই যে সেই প্রাণধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে দুলিতেছে।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে তিনি বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অপরূপ মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"সেই মাকে চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়—বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। ....অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটী বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সেরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সে রূপ বিশিষ্ট, সেরূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে হয় কর—আমি সেই রূপের বালাই লইয়া মরি।"

চিত্তরঞ্জনের প্রাণের ভাবধারা তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন-বসন্তে যখন মন রঙ্গীণ, পৃথিবীটা শুধু হাসি, আলো আর আনন্দের সংমিশ্রণ, সেই সময় কবি গাহিয়াছিলেন তাঁর প্রেমের সঙ্গীত। যা কিছু আনন্দ আছে বর্ণে, গন্ধে, গানে—কবি সবই উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর সেই সময়কার রচিত কবিতা প্রকাশিত হয় "মালঞ্চে"। ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ। ভাষার লালিত্যে, ভাবের বিন্যাসে, ছন্দের মাধুর্য্যে মনোরম, উপভোগ্য। মালঞ্চের প্রথম কবিতা "তোমার প্রেম"—কিরূপ সে প্রেম, কিসের সহিত তাহার তুলনা করা চলে :—

"তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান।
নিত্য নব, সুখভারে
ঝলসিছে রবিকরে
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ।"

তারপর কবি গাহিয়াছেন—সে প্রেম, স্বপনের মত, আঁধিয়ার নিশির মত; সে প্রেম অনলের প্রায় হৃদয়ের ফুলবন দগ্ধ করে যায়। সে প্রেম মৃদু মধু আলো, নিষ্ঠুর অদৃষ্টের মত,

ভিখারীর মত, অমর জীবনের মত শান্তিরূপী, মরণের সমান জীর্ণ শ্রান্ত জীবনের শান্তি আবরণ। কোথাও তুলনা মিলিল না, অবশেষে কবি বলিলেন :—

"তোমার ও প্রেম সখি! তোমারি মতন
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন
অধর, প্রশান্ত ধীর
আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর
পুষ্পিত হৃদয়তীর, সৌরভ-স্বপন।
এই কাছে এসে চাও
ঐ দূরে চলে যাও
এ সকল ক্ষণিকের অর্দ্ধ-আলিঙ্গন।
সমস্ত হৃদয় তব
অজানিত নিত্য নব
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন
তোমার ও প্রেম সখি তোমারি মতন।"

'জাগরণ' শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

"আমার এ প্রেম তুমি রেখোনা বাঁধিয়া
হৃদয় মন্দিরে গন্ধ বদ্ধ কুসুমের
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পাক্ প্রেম মরমের।"

প্রেম-ভিখারী-সুন্দরী পাগলিনী 'ওফিলিয়ার' প্রাণের বেদনা কবিকে বিচলিত করিয়াছে :—

"দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক পরে সুন্দর তরুণ!
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ!
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ-পাগলিনী!
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী!

মালঞ্চে যে কবি শুধু পার্থিব প্রেমের গান গাহিয়াছেন তাহা নয়—"আমার ঈশ্বর" কবিতাটী, ভগবানের নিকট কবির অভয় প্রার্থনার ব্যাকুল নিবেদন,—জীবন ব্যাপিয়া যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে তখন হে ভগবান তোমার বরাভয়াকর প্রসারিত করিয়া আমায় অভয় দিবে কি ?

"............সহস্র-সঙ্কল্প-ভরা
তরুণ জীবন, আশা দিয়ে, প্রেম
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে নিত্য রচিতেছে
কত না আগ্রহ ভরে সুবর্ণ স্বপন।"

সে স্বপন সফল হইবে কি ?

".........আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা,—কিন্তু ওহে দেব !
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হতে প্রিয়তর অপূর্ব্ব স্বপন !
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান।"

কিন্তু তুমি কি আমার এ বেদনা বুঝিতেছ, এ কাতর আহ্বান তোমার কর্ণে প্রবেশ করে কি ?

"শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণ-বিহীন,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাষাণের মত,
এই যে বেদনা-ভরা কম্পিত ধরণী
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের
মর্ম্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যাকুল কণ্ঠে, আকুল পরাণে
কেমনে শুনিবে ? তুমি সুখের সম্রাট্ !
স্বর্গের রাজন্ ! তোমার নন্দন মাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে ?"

আমার এ আকুল ক্রন্দন যদি তোমার কর্ণে না প্রবেশ করে হে অন্তর্য্যামী, কিসের দুঃখ তায় :—

"আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন !
তার পরে শেষে আনন্দ উজ্জ্বল করে
করুণা মলিন করে' সর্ব্বপ্রাণ ভরে'
যত্ন করে গড়ে তুলি আমার ঈশ্বর !
আকুল পরাণ লয়ে ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণ তলে আসিব না আর।"

'ঘুম ঘোর' একটী সুমধুর ছোট কবিতা :—

"আমি ত সঁপিনি হৃদি
আপনি পড়েছে চুলে
নিশীথের ঘুম ঘোরে
তোমারি চরণ মূলে !
মরণেরে দেব বলে
পরাণ খুঁজিনু হায়
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
সে প্রাণ তোমারি পায়।"

'অহঙ্কার' শীর্ষক কবিতায় কবি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—হে ধার্ম্মিক, হে উচ্চ, তোমার কি পৃথিবীর ক্রন্দনে কাণ নাই, শুধু উর্দ্ধ মুখে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া আছ। তাঁহার পূজাই কি জীবনে সর্ব্বস্ব, এই পৃথিবী, এই মানব এরা কি কিছু কেহ নয় :—

"ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া
ধরণীর দুঃখ-দৈন্য আছে যাহা থাক্ !
উর্দ্ধ মুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।"

'আকাঙ্ক্ষায়' কবি বলিতেছেন যদিও তোমার কথা আমার প্রাণে বসন্ত রাগিণী সৃজন করিয়াছে, আমার হৃদয়ের রক্তফুল ফুটাইয়াছে, তবুও আরও চাই—আরও চাই :—

"আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর
তোমার স্বপন ছাড়ি তোমারে চাহিছে ;
মধু দেহে সুখস্পর্শ রহস্য গভীর
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে।
কোথা তুমি ? কাছে এসো করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন কানন!"

'প্রেম-চতুষ্টয়' একটী সুন্দর কবিতা :—

"আমার হৃদয়-দেহ গীত ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক অঙ্গুলি
আছি মোহ অন্ধকারে তোমাতেই লীনা
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত বিজুলি।
মধুর মৃদুল ভাষে কও কথা কও,
চেয়োনা কাতর কণ্ঠে লও সব লও।"

'চিরদিন' নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

"রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেমভরা অশ্রুভরা বিষাদ-চুম্বন"

আর তার সাথে রাখিয়া গেছ সজল নয়নের চিরস্মৃতি, প্রকৃতির বুকে তোমারি সে স্মৃতির ছায়া :—

"সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন,
ছুটী দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল
মিলনের মধু স্মৃতি স্বপনের ভুল।"

"সে"—কবি বলিতেছেন সে "এসেছিল, কেঁদেছিল, পাশে বসেছিল" আবার :—

"দুটী হাত ধরে মোর
　　কি যে ভেবেছিল
বিদায় বলিয়া, শুধু
　　কেঁদে গেয়ে গেল।"

"চলে গেছে সে;" তার যাবার পথপানে চেয়ে বসিয়া আছি, আর কি সে আসিবে ? আর কি হৃদয় উজলিবে ?

'সোঽহং' কবিতায় তিনি বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মজ্ঞানী, সব জ্ঞানই ত অসার, তবে কার অহঙ্কার কর। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার ক্ষীণ প্রাণে অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতাকে কেমনে ধরিবে :—

"কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা ?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা ?"

'সাগর-তীরে' দাঁড়াইয়া কবির প্রাণে জাগিতেছে—প্রিয়ার অতীতের স্মৃতি, কোথা আজ সে—

"আজ তুমি এত দূরে ? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দুজনার
ওপারে দাঁড়ায়ে তুমি দুরাশার মত
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।"

'লালসা'য় কবি বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়া।"

সাবধান, সখি ভুল ক'রোনা :—

"সুন্দর মরমভরা শুভ্র তনু সখি
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা।
এখনও সময় আছে
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা।"

"মোনা"য় কবি গাহিয়াছেন অতীত প্রেমের স্মৃতি, সে দিন ভাসিয়া গিয়াছে। "আর কেন ? গেছে প্রেম মিছে আনাগোনা।"

"তোমার আমার মাঝে
রয়েছে পড়িয়া
নিষ্ফল স্বপন, আর
শত শুষ্ক ফুল ভার
কত বড় লালসার
শ্বেত ভস্মরাশি।"

'কবিভ্রাতা দেবেন্দ্র সেনের প্রতি' একটী সুললিত সুমধুর সনেট—

"তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি
সুখ ভরা শান্তি ভরা স্বপ্ন ভরা সবি,
ব্যঙ্গ ভরা বাক্য আর রঙ্গ ভরা হাসি।"

"বারবিলাসিনী" কবি চিত্তরঞ্জনের একটী শ্রেষ্ঠ কবিতা, করুণ মর্ম্মস্পর্শী, প্রাণের রক্তে

রঞ্জিত। সুসজ্জিতা, সুন্দরী, রূপ-বিক্রেতা বারবনিতার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যে হাহাকার, যে জ্বালা, যে তীব্র বেদনা—কবি তাহাই ফুটাইয়াছেন।

"শুভ্র রক্ত চরণ দুখানি
কনক কিঙ্কিনী হাতে
কনক কিরীট মাথে
রজনীর রাজ্যে আমি রাণী
ওগো অন্ধ-রজনীর রাজ্যে আমি রাণী।"

রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র বারাঙ্গনা বলিয়াছিল,—বড় দুঃখে বলিয়াছিল, "তা বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া তাকি কথার কথা।" চিত্তরঞ্জনের কথিত, "বারবিলাসিনী" অশ্রুজলে বক্ষ সাইয়া বলিতেছে—

"যাহা আছে, সব লও তুলে!
রেখে যেয়ো রক্তজ্বালা
তুলে নিয়ো পুষ্পমালা
রজনী প্রভাতে যেয়ো ভুলে
আমার সকলি লও তুলে।"

আমার হৃদয়ের জ্বালা কে বুঝিবে! কে বুঝিবে এ মর্ম্মদাহ।

"ওগো আমি যৌবনে যোগিনী
এ বিশ্ব লালসা ছাই
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্ক-বাহিনী!
মর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী
চিরদিন, যৌবনে যোগিনী।

কার অভিশাপে নাহি জানি
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা—
দিয়াছিনু তাই হেথা—
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসী তাই বার-বিলাসিনী।
তারি শাপে চিরকলঙ্কিনী।"

'অভিশাপে' কবি আঁকিয়াছেন যে, সুখ স্বর্গের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত বিলাস এক মুহূর্ত্তে ধরিত্রীর বুকফাটা ক্রন্দনে নিষ্প্রভ মলিন হইয়া গেল। স্বর্গের রাজন্ নন্দবাসীকে ডাকিয়া কহিলেন—

নিষ্ফল স্বর্গের শোভা　　অনন্ত বসন্ত তাল
নাহি লাগে আর
নব নব জগতের　　পরশ লভিব আজি
আকাঙ্ক্ষা আমার।"

প্রহরী স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া দিল, তারপর—

"বসি স্বর্ণ সিংহাসনে　　সুধা হস্তে স্বর্গপতি
সৌন্দর্য্য বেষ্টিত—

কিন্নরীর নৃত্য তালে অপ্সরার গীতজালে
নিতান্ত জড়িত।
হেন কালে হু হু করে আসিল ঝটিকা, আর্ত্ত
ক্রন্দনের মত
বহিয়া জগত হতে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত শত।
থেমে গেল নৃত্য গীত! সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল
স্বয়ং সঙ্কিত,—
নিমেষে টুটিয়া গিয়া আপনার মোহ হতে
করিল বঞ্চিত।
নিভিল প্রদীপমালা ; চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন
যেন কোন মহাশূন্য অন্ধকার পরিপূর্ণ
নিত্য সুখহীন।"

এক মুহূর্ত্তে স্বর্গ কাঁপিয়া উঠিল, দেবতার প্রাণে হাহাকার, সুখ স্বর্গে শ্মশানের ঝটিকা বহিয়া গেল—

"তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত ক্রন্দন স্রোত
আসিল ছুটিয়া,
নন্দনের কূলে কূলে নতশির দেবতার
চরণ ঘিরিয়া।"

'মালঞ্চে'র শেষে কবি লিখিয়াছেন—

"ওগো আর নাই এই শেষ—
মালঞ্চের পুষ্প-রাজি
সকল দেখেছ আজি—
আর কিছু নাই অবশেষ—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ—
এই শেষ!"

মালঞ্চের আলোচনায় দেখা যায় যে, চিত্তরঞ্জনের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর নিজের মৌলিকত্ব, বিশিষ্টতা সেই প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছে। সেই নিজস্ব বিশিষ্টতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির পরবর্ত্তী কবিতা পুস্তক "সাগর সঙ্গীতে।" সাগর সঙ্গীত ঠিক মালঞ্চের পরেই প্রকাশিত।

অর্ণবপোতে ভ্রমণকালে অনন্ত পারাবারের বিভিন্নরূপ তাঁহার হৃদয়-তীরে যে তুফান

রুগ্নাবস্থায়—দার্জ্জিলিংয়ে

(মৃত্যুর দু'একদিন পূর্ব্বে শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে)

রুগ্নাবস্থায়—দার্জ্জিলিংয়ে

মৃত্যুর দু'একদিন পূর্ব্বে শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে

তুলিয়াছিল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার "সাগর সঙ্গীতে"। অনন্ত অসীম জলধি, কতরূপে, কতভাবে কবির হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, কখনও শান্ত, কখনও রুদ্র, কখনও ভীষণ, কখনও মধুর, আর তার সাথে মিশিয়াছে কবির অন্তরের বিভিন্ন ভাবধারা সেই অসীমের সহিত আত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ওই অনন্তের ওপারে আধ-চেনা ভূমির সন্ধানের তীব্র ব্যাকুলতা।

প্রথমেই কবি বলিয়াছেন :—

"হে আমার আশাতীত, হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা, ছন্দে গেঁথে লই!
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টল মল কি যে স্বপ্নভরে!
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও অন্তর মাঝে, ছন্দে গেঁথে লই।

দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ, শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব!
তুমি কি রবেনা সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা!
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য অচঞ্চলা?

কবি কান পাতিয়া আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে অর্ণবের গান শুনিয়াছেন, তাঁর প্রাণ আজ ভরপুর—

"তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে
আমার সকল অঙ্গ শিহরে শিহরে!
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে,
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।"

আনন্দে উৎসবে ভরা প্রভাতের বাঁশী বাজিয়াছে, গীতভরা স্বর্গালোকে পুষ্পদল ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর অর্ণবের সঙ্গীত বিহঙ্গের প্রায় কবির হৃদয় আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে "প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে।"

পরক্ষণেই কবি গাইয়া উঠিলেন—

"কোথায় রাখিব আর এ সুখের ভার
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার।
এই অজানিত সুখ এ দুঃখ অজানা—
বাধাহীন এ উৎসবে মানেনা যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে;
সব দুঃখ আজ মোর, গীত হয়ে উঠে।"

অনন্দে জাগিয়া উষা আসিয়াছে, শুভ্রালোক তরঙ্গে তরঙ্গে স্বপ্নলোক রচনা করিতেছে—

"পূর্ণ আজ এ আলোকে সকল আকাশ
অনন্ত সঙ্গীত মাঝে নীরব বাতাস;
নিঙাড়ি ও বক্ষ-ভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীত ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা!

হে গায়ক অনন্তের! কোথা গীত বাজে?
শব্দহীন কোন লোকে? কোন ঊষা মাঝে?

কবি বলিতেছেন, আমি কথার মোহ জানিনা, ভাষার বিন্যাস জানি না, গানের সুর, তান, লয়, মান কিছুই জানি না। জানি শুধু এই জানি যে—

"আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ
অনন্তের ছায়াভরা আমার পরাণ।
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁঝের আঁধারে।"

ওগো যন্ত্রি, আমি তোমার যন্ত্র, আমায় বাজাও, আমায় বাজাও:—

"মায়ালোকে ছায়ালোকে, তরুণ ঊষায়
বাজাও বাসনাহীন উদাসী সন্ধ্যায়।
ওগো যন্ত্রি! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে।"

হে মহান্, হে বিরাট্, আমার জীবন লয়ে তুমি কি খেলা খেলিতেছ, আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে, ওগো সিন্ধু তোমার গীতে আমার "সমস্ত জনম যেন অনন্তরাগিণী", হে চিত্রকর কত রসে তুমি রচনা করিতেছ, কত বর্ণে বর্ণে ফুল ফুটাইয়া তুলিতেছ কিন্তু আমি চাই—

"সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া
আমার নয়নপটে! আমি অন্ধ হব
শবদ সাগর মাঝে আমি ডুবে রব
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।"

পূর্ব্ব জনমের স্বপনের ছায়া তোমার হৃদয়তলে ভাসিয়া উঠিয়াছে, জ্যোছনা-তরঙ্গে শত-স্মৃতি পুষ্পদল ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভার
পরাণ উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে
একটী পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।"

আজি মহাপারাবারের সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুরতি আর নাই। মেঘপূর্ণ দিন, ধূসর আঁধার আজ চারিদিকে ঘেরিয়াছে। অশান্ত বেদনাভরে তরঙ্গ তরঙ্গপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—

"আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার,
একি সুখ? একি দুঃখ—প্রণয় গভীর
একি? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত, অধীর

কি গাহিছে, কি চাহিছে হৃদয় আমার
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার !

আজ তোমার গান অন্তহীন দিশাহারা উন্মাদের মত আমার হৃদয়ে গরজিয়া উঠিয়াছে—

"তবে এস ভেসে এস, উন্মাদ আমার—
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব আজ প্রলয় আভাসে,
মরণ আঁধার-ভরা আকাশে বাতাসে।"

অর্ণববক্ষে কোমল যন্ত্রে আর মধুর ঝঙ্কার নাই—

"এযে গো নির্দ্দয় রুদ্র ! মরণের রঙ্গে
চরাচর ডুবে যায় প্রলয় তরঙ্গে
যেন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে ;"

হে রুদ্র, হে তাণ্ডব, আজ তুমি আসিয়াছ মরণের রূপ নিয়া—

"এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ।"

হে রুদ্র মরণদেব তোমার প্রলয় ত্রিশূল সম্বরণ কর। হে অন্ধবিজয়ী, তোমার হাতের অস্ত্র নামাও—

" * * * সন্ধ্যা আসে ওই
শান্তিময়ী ধীরে ধীরে মৃদুল চরণে
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে !
রাখ রথ ! শান্ত হও ! ওগো রণশ্রান্ত
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত।"

আজ জননীর বুকে এক করুণ সুর, সব চুপ, শান্ত নীরব—

"আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে।
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরে
করুণ সুরে।"

"হে বন্ধু, হে সিন্ধু, নির্জ্জন গগনতলে, গীত-শ্রান্ত চোখে তুমি ঘুমাও ঘুমাও, আমি প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব কখন তুমি আবার জাগিবে।" এখনও রবি উঠে নাই, এখন আঁধার জাল তোমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তুমি শান্ত সুন্দর চোখে এই মোহ আঁধারে আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছ—

"কথা মোর ভাষা মোর, সঙ্গীত আমার
স্তব্ধ হয়ে গেছে এই সন্ধ্যার মাঝারে।"

হে সিন্ধু, কত যুগ ধরিয়া তোমার বক্ষে এ বেদনার রাশি তুমি বহন করিয়া চলিয়াছ, কত জন্ম জন্মান্তর, কত যুগ যুগান্তর—

কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার
কত জন্ম জন্মান্তর
কত যুগ যুগান্তর।"

ওগো পারাবার তোমার আমার মিলন ত এই ত প্রথম নয়, কতবার কত জনমে আমরা মিলিয়াছি, তুমি অনন্তের পানে ভাসিয়া যাও আর আমি শুধু তোমারি এ গানে ভাসিয়াছি—

"অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ স্রোতে!
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,"

আমার প্রাণে জাগিতেছে কত শব্দহীন বাণী, কত নীরব সঙ্গীত—

"কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা!—
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী,
সকল সঙ্গীত-মাঝে অগীত কি জানি!"

কবি বলিতেছেন যে, আমি আমার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে নিজেকে লইয়া বদ্ধ ছিলাম। নিজেই ছোট ছোট স্বপ্ন আঁকিতেছিলাম। হে অনন্ত, হে সিন্ধু তোমাকে আমি ভুলিয়াছিলাম, হঠাৎ তোমার গান আমার কর্ণে প্রবেশ করিল,—

"ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম
গুণ গুণ গাহি গান ঘরের ভিতরে—"

তারপর হৃদয়-মন্থন-করা তোমার আহ্বানে আমাকে আবার ফিরাইয়া আনিল—

"যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে
অনন্ত রাগিণী ভরা—ধ্বনিতে তোমার,
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার।
ভাঙিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল!
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল!"

হে অর্ণব, এপারে ত আমার আশার স্বপন মিটিল না, আমার অন্তরের ক্ষুধা, আমার তৃষ্ণার ত অবসান হয় নাই। এই অসীমের ওই অনন্তের ওপারে আমার তৃষ্ণার বারি মিলিবে কি?

"আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ!
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে!
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন?
কাঙাল পরাণ হবে রাজার মতন?"

ওপারের ও অজানা ভূমিতে আমাকে লইয়া যাও, ওই রহস্তের মাঝে আমাকে ডুবাইয়া দাও, তৃষিত আমি আমাকে শান্তি দাও, শান্তি দাও—

"ওপারে কি আলো জ্বলে রহস্তের মত
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায়?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবস নিশায়?
ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল,
পরাণ-পরশ তরে আমারি মতন?
ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর-ছায়া পরাণ স্বপন?
আমি যে তৃষিত বড়; ওগো মহাপ্রাণ!—
আমি যে তৃষার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে!"

কবির প্রাণের ভাবের ধারা, হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে "সাগর সঙ্গীতে"। কবিতায় তুলনামূলক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাগর সঙ্গীতে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ন্যূন নহে—যদিও কবি নিজে পুস্তকের প্রথমেই লিখিয়াছেন "গণইতে দোষ গুণ-লেশ ন পাওবি যব তুহুঁ করবি বিচার"।

"সাগর-সঙ্গীতে"র পরেই চিত্তরঞ্জনের কবিতা পুস্তক "মালা" প্রকাশিত হয়। "মালার" নিবেদনে কবি বলিয়াছেন "এই সবগুলি কবিতাই সাগর সঙ্গীতের অনেক আগে লেখা। শুধু একটী মালঞ্চের আগে। মালায় প্রেমের কবিতার আধিক্যই বেশী।

"প্রেম ও প্রদীপের" একস্থানে কবি বলিয়াছেন—

"আমি মুগ্ধ চেয়ে আছি! ওগো মোর বাক্যহীনা!
ওগো মোর নেত্রাতীত চির-অন্ধকার-লীলা!
একি তব চির জনমের অগীত সঙ্গীত?
একি তব দীপ্ত হৃদয়ের অলস্ত ইঙ্গিত?
একি তব নির্জ্জনের নীরব প্রস্ফুট বাণী?
তুলিছে সকল করি আপন সাধন খানি!"
একি তব মরমের সঞ্চিত স্বপনরাজি
পরাণ ছাপায়ে কি গো উছলি উঠিছে আজি?
একি গো অনন্ত পূজা! একি গো জীবন্ত আশা!
গুপ্ত-প্রাণ-কুঞ্জে কিগো আলোকিত ভালবাসা?
একি তব সুখ? ওগো একি তব দুঃখে গড়া
এ পুণ্য প্রদীপখানি?
একি তব অন্তরের সকল সৌরভ ভরা
আলোক গৌরব-বাণী?"

"প্রেম-প্রতীক্ষায়" কবি তার প্রিয়ার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন? সন্ধ্যার অন্ধকার প্রেয়সীর কুন্তলের মত তাঁহাকে ঘেরিয়াছে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল প্রিয়া ত আসে নাই :—

"...........প্রিয়া আসে নাই
প্রিয়ার কুন্তল স্বপ্ন এসেছে রজনী
তখন বহিল ক্ষুব্ধ বসন্ত বাতাস
তৃষ্ণার্ত্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ।"

"স্বর্গের স্বপনে" কবি গাহিয়াছেন :—

"হে মোর প্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা।
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা।
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্ত রঙ্গিণী!
হে আমার যৌবনের স্বপন-সঙ্গিনী!
হে আমার আপনার হে আমার পর
হে আমার বাহিরের হে মোর অন্তর!"

"প্রেম-সত্য" কবিতায় কবি বলিয়াছেন :—

"জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনি প্রিয়ে!
তোমারে দেখেছি শুধু
হৃদি-নেত্র দিয়ে!
তাই মোর এত ভালবাসা!"

"রাগ" শীর্ষক কবিতা একটী সুন্দর উপভোগ্য সনেট্ :—

"রাগ করেছ কি'? ওগো কার নাই রাগ
হৃদয়ে জ্বলিছে দেখ কত অনুরাগ!"

সমস্ত সকাল সারা দিনমান তোমারই জন্য যে আমার এ পোড়া পরাণ কাঁদিয়াছে তারপর তুমি যখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে :—

"ব্যথা-ভরা আঁখি দিয়ে চেয়ে আছি তাই
ভাবিছি আমারে আমি কেমনে বুঝাই!
রাগ করি নাই ওগো! করি নাই রাগ
আমার যে পোড়া প্রাণে ভরা অনুরাগ!"

"মহাশূন্যে" কবি বলিতেছেন, কোথা সুখ, কোথা জীবন, এ শুধু স্বপ্ন, এ ভ্রান্তি :—

"জীবন, জীবন কোথা? ভ্রান্তি স্বপনের—
সথ সুরা পান করে শুধু ভুলে থাকা!
একি হাসি একি কান্না! শুধু বসে বসে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতের আঁকা!"

কবি বলিতেছেন যে জীবন খণ্ড'ত গিয়াছে, সব "স্বপ্নের মত শূন্য হয়ে গেছে" কিন্তু অতীতের স্মৃতি ত ভুলিবার নয়, তোমায় ত ভুলি নাই প্রিয়া :—

ভুলেছি কি ? ভুলি নাই ; ভুলিনি তোমায়,
ভুলি নাই সে দিনের বসন্ত রজনী !
কত সুখদুঃখ ভরা বসন্তের বায়
পূর্ণ পালে বহে যেত অন্তর তরণী
তবে প্রিয়ে আজ তুমি সত্য হয়ে এসে
সত্য কর এ জীবন বসন্তের শেষে !"

"প্রার্থনায়" কবি লিখিয়াছেন :—

"ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়
মহান্ করিয়া দিও তব মহিমায় !
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহা আবরণ ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !"

"নীরবতা" কবিতাটী "মাল্যের" শেষ কবিতা :—

"আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরুলতা !
প্রশান্ত গগন কোলে তপন জ্বলিছে !
পরাণ মন্দিরে আজি মহা নীরবতা
হে নীরব, হে মহান্ ! তোমারে বরিছে !
পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত, হে সম্পূর্ণ ! নিরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে ।"

"মালা"র পরেই প্রকাশিত হয় "কিশোর-কিশোরী।" 'কিশোর-কিশোরীতে' কবি যে প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ঐহিক প্রেম নয়, রক্তের লালসা তাতে নাই, হৃদয়ের আবিলতা নাই, এ প্রেম অনাবিল স্বচ্ছ, মধুর, শান্ত। প্রথমেই কবি গাহিয়াছেন :—

"কাছে কাছে নাই বা এলে—তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল
দুটী প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম্ জ্বাল ।
এ পার থেকে গাইব গান ওপার থেকে শুন্‌বে বলে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে ।"

কবি বলিতেছেন আর ত সে দিন নাই যখন আমি শুধু আমার হৃদয়ের ভালবাসাকেই ভালবাসিতাম :—

"ভালবাসি ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম !
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম !
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে ।"

তখন আমি কল্পনার গগনতলে উড়িয়া বেড়াইতাম, কল্পনাকেই সত্য বলিয়া বরণ করিয়া লইতাম, কিন্তু সেই নিরাকার প্রেম আর কতদিন থাকে :—

"নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার
নির্জ্জন পরাণ ভরে উঠিলরে হাহাকার!"—
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে।

তারপর সেই সাঁঝের আঁধারে তোমায় আমায় দেখা, সে কোন কুসুমের মত তুমি আমার মর্ম্মে ফুটিয়া উঠিলে "অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে!" সেই ত প্রথম তোমার আনন্দ-মূরতি আমি দেখিলাম :—

"সেই সে প্রথম দিন! আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়—
আনন্দ মূরতি তব! কাহার লাগিয়া,
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কেবা
কাহার পূজার লাগি—কে করিছে সেবা।"

কেন আমি তোমার আহ্বানে ছুটিয়া আসিলাম? শুধু তোমার মোহিনী মূরতি দেখিবার জন্য? শুধু কৌতূহল-পরবশে? তস্করের মত তোমার সৌন্দর্য্য সম্পদ অপহরণ করিতে? তা নয়, এ কল্পনা নয়, এ ছলনা নয়, সে বাসনা ত আর জাগে না :—

কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁদিত সেই যে চির সুন্দর।

যার মোহে ফুলের পানে তাকাইয়া ভাবিতাম, এ ফুল এখনি প্রাণে ফুটিবে, নারীর সৌন্দর্য্য, বাসনার স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত :—

"সে চির-সুন্দর মোর নাই আর নাই!
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই!"

তবে কেন ছুটিলাম? সে আহ্বানে সাড়া দিলাম কেন? কবি নিজেই উত্তর দিতেছেন,—

"তবে কেন ছুটে গেনু দেখিতে তোমারে
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে,
শুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল।
জ্বলন্ত প্রদীপ হতে যেমন জ্বালায়,
আর একটী প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখা'পরে জ্বলিনু তখনি।"

এত কি সব মিথ্যা, সব অলীক, শুধু স্বপ্ন, সেই চক্ষের চাহনি, সেই বক্ষের দোলনি, সবই কি মায়ার খেলা :—

"মিথ্যা সেই সত্যরূপী মূরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবি মিথ্যাকার
জগৎ সংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা।
বল কোন প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা ?"

কিন্তু আজও ত তোমার সেই রূপ হেরিতেছি, সুখে, স্বপ্নে, ধ্যানে, ঘুমের মাঝারে :—

"মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যা তলে
সেই মধু জল জল শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
অবাক নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায়! সেই সে তখন
অনিত্য কালের মাঝে একটী নিমেষ,
চমকি থমকি যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরব ভরে চিরনিত্য হয়ে ;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে!"

পরবর্ত্তী কবিতায় কবি আঁকিয়াছেন যুগ যুগান্তরের প্রণয়চিত্র। এই যে সন্ধ্যাকাশ তলে দোঁহার মিলন, এত শুধু অকস্মাৎ ঘটনা নয়, মুহূর্ত্তে আরম্ভ মুহূর্ত্তেই শেষ নয়। এ মিলন চলিয়া আসিতেছে সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে। তখনও পৃথিবীতে প্রাণের সৃজন হয় নাই—সব ছিল জড়, প্রাণশূন্য। সেই সময় হইতে তোমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি। 'তোমারে বেসেছি ভালো কতরূপে শতবার যুগে যুগে অনিবার।' হে আমার প্রিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মাঝে তোমাকে কত জন্মে কতরূপে পাইয়াছি, হারাইয়াছি।—

"জীবন লীলার সেই প্রথম প্রত্যূষে
মনে হয় ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটী!
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটী উপল খণ্ড সৃষ্টি পারাবারে!
বুকে বুকে লাগা সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক্ অবাক্
দুইটী পরাণ!"

তারপর কত যুগ কালের তিমির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকারের অন্তর হইতে ফলে পুষ্পে ভরা নব বসুন্ধরা হাসিয়া উঠিয়াছে—

"মোরাও জাগিনু দোঁহে! মধুবন মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো! তুমি বনলতা
কি আনন্দে, কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি!
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে।"

তার পর জড়ের ভিতর হইতে পৃথিবীতে প্রাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেবার সে আমার ভ্রমর জনম, আনমনে গুণ গুণ গান গাহিয়া ভ্রমিয়া বেড়াইতাম :—

"অকস্মাৎ একদিন কানন প্রান্তরে
অপূর্ব্ব কুসুম রূপে উঠিলে ফুটিয়া!

আনন্দেতে আগুসারি মিলন-তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন ঝটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তুমি কোথায় লুকালে ?
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর জনম।"

তার পর তুমি আমি নর নারী জীবন সাগরে ভেলায় ভাসিলাম—

"আশ্চর্য্য অবাক হয়ে আমি চেয়ে ছিনু,
কি জানি কেমন করে তুমি চেয়ে ছিলে ?"

কিসের আকর্ষণে এমন চাহিয়া থাকা—

"সে কি প্রেম ? ভালবাসা ? আকাঙ্ক্ষা ? বাসনা
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে ?"

তার পর আমার সেই ব্যাধের জনম। বনপ্রান্তে হরিণীকে বাণবিদ্ধা করিলাম। সজল সরোষ আঁখিভরা বেদনায় তুমি আমার পানে চাহিয়াছিলে, আমি নতজানু হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম, তুমি কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলে—

".........ওগো করুণারূপিণী
সে জনমে আর কভু করিনি শিকার।"

তার পর আমি ছিলাম কাঠুরিয়া, বনশকুন্তলা তুমি ফলমূল বহিয়া আনিতে। পর জনমে তুমি রূপসী রাজার নন্দিনী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলে আমি "তব মালঞ্চের ছিনু মালাকর।" তোমার জন্য মালা গাঁথিতাম আর শিরায় শিরায় কি জানি কি বহিয়া যাইত। তার পর—

"একদিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি!
ধরা পড়ে গেনু! পরদিন বধ্যভূমে
যবে নিবু নিবু প্রাণ, ঊর্দ্ধে চেয়ে হেরি
জলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি।"

তারপর কোন জনমে সৈনিকের বধূ তুমি ছিলে, মোর বক্ষ ভরে—

"অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া
শত্রুর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হল আছে যত্নে রাখা
চিত্ত মাঝে তব মূর্ত্তি ছিন্ন হয়ে যায়!
পরক্ষণে হাসিলাম ; ফুরাল জনম!"

তারপর আমি কবি, রাজগৃহে গান গাহিতাম, প্রত্যেক গানের মাঝে কাহারে খুঁজিতাম জানিনা, অকস্মাৎ লতার আড়ালে তোমার কাল চোখ দুটী দেখিলাম আর আমার গান বন্ধ হইয়া গেল। পর জনমে আমি চিত্রকর, "রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে"। আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল তোমার চিত্র আঁকিতে, নয়ন বাঁধিয়া লইয়া গেল——

" * * * * সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি।"

তারপর আমি ছিলাম মন্দিরে দেবতার পূজারী আর তুমি সেবাদাসী——

"একদিন পূজা শেষে, আকুল অধীর
মত্ত প্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,
চূর্ণ হয়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
সেই জনমে সেই শিবের মন্দির।"

এইরূপে কত জন্ম জন্মান্তর কাটিয়াছে এ জীবনে যে তোমাকে পাওয়া সে ত মুহূর্ত্তের নহে—

"সৃষ্টির প্রথম হতে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যাপ্ত করি যুগ যুগান্তর!
তারি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা পড়ে গেলে
সেই দিন।........."

বারে বারে এই পাওয়া না পাওয়ার মাঝে, কত কি সুখ দুঃখ, ভুল চুক ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঝরিয়া গিয়াছে, আবার জনমে জনমে এই পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝে যাহা কিছু ঝরিয়াছিল সবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে এই যে মিলন।
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন—
শতেক জনম ধরে
সকল পরাণ ভরে?"

'কিশোর কিশোরী'তে কবির প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার লালিত্যে, ছন্দের মাধুর্য্যে, কল্পনার নূতনত্বে, ভাবের প্রাচুর্য্যে প্রত্যেক কবিতাটী বেশ উপভোগ্য।

এইবার আমরা কবির শেষ পুস্তক "অন্তর্যামীর" কথা বলিব। এই পুস্তকের কবিতাতে আছেন শুধু কবি, আর তাঁর অন্তরের আরাধ্য দেবতা। কবির চিদাকাশে অনন্তের ছায়া, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনের তীব্র ব্যাকুলতা। কবির মনের ভাব হইতেছে—"যা কিছু আনন্দ আছে বর্ণে গন্ধে গানে তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।" হে আমার অন্তর্যামী—

"সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি!
ওগো তুমি মালাকর—
মন-মালিকায়!
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি—
সব সাধনায়!"

যখন জীবনে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, প্রাণ আমার পথের অন্বেষণে দিশাহারা হইয়া যায় তখন তোমার দীপ আমার নয়ন সম্মুখে জ্বলিয়া উঠে। হে আমার বিজন বঁধু তোমার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই আমি চলিব।

"যেখানেই থাক নাথ! আছ তুমি আছ তুমি!
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে; এই দাঁড়াইনু আমি!—
যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্য্যামী!"

যৌবনে প্রমোদের দীপ জ্বালিয়া বঁধু তোমারে খুঁজেছি—সেই আলোক আগারে তুমি আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে—

"সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই।
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু; পাই বা না পাই
বঁধুহে তোমারি লাগি আকুল পরাণ!"

হে বঁধু তুমি আমার প্রাণের মাঝে, বুকের কাছে কেমন করিয়া লুকাইয়া থাক। তোমার দর্শন ত মিলে না। 'দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে।'

"মরম আঁধার বঁধু! প্রদীপ জ্বালাও—
আমার সকল তারে, বাজাও বাজাও।"

অপূর্ব্ব আলোকভরা তোমার নিভৃত মন্দির ওই ছায়ালোকের অন্ধকারে ঢাকা রহিয়াছে কিন্তু—

"ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার!
কোন পথে যেতে হবে?
কে বল আমারে কবে?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার!
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার!"

ওইখানে ত আমাকে যাইতে হইবে কিন্তু কোথা পথ?

"পথখানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায়—
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়।"

হে বঁধু তুমি হাসিতেছ। তোমার হাসি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে সে পথ অতিশয় দুর্গম।

"সেই পথ লাগি আজ মন পথবাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী
সে পথের হইতাম ধূলি কণা যদি!
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি।"

হে অন্তর্য্যামী আমি পাগল হইতে চলিলাম। আর নয় আর নয়—

বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগলেরে আর তুমি, ক'র না পাগল! "

আজ কবির মনে হইতেছে যে পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—প্রাণ আজ আনন্দে ভরপুর—

" পায়ের তলে বাজে পথ! প্রাণ আজিকে রাজা
বাজারে বাজারে তবে জয় ডঙ্কা বাজা।"

আজ কবির হৃদয় মহানন্দে পূর্ণ, চোখের জলে তাঁহার পথ চলা দায় হইয়াছে—

"অনেক দিনের অশ্রু সাধা
এমন পথে এখন বাধা—
পরাণ আমার কিসের তরে
কি জানিগো কেমন করে।
হালহারাণ তরীর মত ভাস্‌ছি অবিরত।"

তারপর কবি গাহিয়াছেন—

হে বঁধু তোমার অনেক সুর আছে আমাকে একটী সুর দাও, সেই সুরের তালে মানে আমি আমার প্রাণ বাঁধিব। হে আমার রাজা, তুমি একবার গান গাও, আমি পুনরায় গাই, আমার মুখে তোমার গান কেমন শোনায় তুমি একবার তাহা শুন। তার পর—

" তুমি যা গাইবে বঁধু আমি দিব তাল
আমি যে ভাসাব তরী তুমি ধর হাল।"

আগে আমি জানিতাম না যে, তোমার পথের মাঝে এত কাঁটা—হোক না কাঁটা তাতে কোন ক্ষতি নাই—

" একটু খানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন
একটু খানি পরশ দিও, হোকনা কাঁটাবন।
একটু খানি আলোক দিও, আঁধার বন মাঝে
একটু খানি বুকে টেন যখন ব্যথা বাজে।"

হে আমার হৃদ-বিহারী, হে ভয়হারী আমার হৃদ্ মাঝারে এস, টিপি টিপি পায়ে আমার মন বাগে এস "চরণ তলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও।"

"এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশী!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয়ে তোমার বাঁশী।
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে চিরদিনের তরে—
নাইক আর আঁধার কোন, আমার আঁখির পরে।
প্রাণের মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভীষিকা যত—
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত।
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ,
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন।"

এইখানে চিত্তরঞ্জনের কাব্য জীবনের পরিসমাপ্তি, রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। এই খানেই বাঁশী ত্যাগ করিয়া তিনি অসি ধরিয়াছিলেন। যে চিন্তাধারা তাঁহার ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই রূপান্তরিত হইয়াছিল তাঁহার কার্য্যে। যে অন্তরের বৈরাগ্য, যে দৈন্যতা—"অন্তর্য্যামীতে" ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাই ভবিষ্যতে দেশের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিল—কাব্যে ছিল তাঁর অসীম আসক্তি। সাময়িক কথপোকথনে বুঝিয়াছিলাম, বৈষ্ণব সাহিত্যে ছিল তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ, প্রগাঢ় ভক্তি, বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর হৃদয়ের গভীর প্রেম, প্রখর চিন্তাশীলতাই তাঁহাকে পরাধীন দেশের স্বাধীনতাপ্রয়াসে কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিল—ভাবের রাজ্য হইতে কর্ম্মের রাজ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। উপসংহারে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যৌবনে যে বাঁশী তিনি হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা মধুর বাজিয়াছিল। যদি বাণীর একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি কালাতিপাত করিতেন তাহা হইলে সাহিত্য-জগতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী

অকাল সন্ধ্যা

(জয় জয়ন্তী কীর্ত্তন—একতালা)

খোলো মা দুয়ার খোলো,
প্রভাতেই সন্ধ্যা হোলো,
দুপুরেই ডুব্‌ল দিবাকর গো!
সমরে শয়ান ওই
সুত তোর বিশ্বজয়ী
কাঁদনের উঠ্‌ছে তুফান ঝড় গো॥

সবারে বিলিয়ে সুধা
সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা
কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো।
তাহারই অস্থি চিরে
দেবতা বজ্র গড়ে
নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো।
ঐ মা যায় সে হেসে,
দেবতার উপরে সে,
ধরা নয়—স্বর্গ তাহার ঘর গো॥

যাও বীর যাও গো চ'লে
চরণে মরণ দ'লে
করুক প্রণাম বিশ্বচরাচর গো।
তোমার ঐ চিত্ত জ্বেলে
ভাঙালে ঘুম ভাঙালে,
নিজে হায় নিব্‌লে চিতার 'পর গো।
বেদনার শ্মশান-দহে
পুড়ালে আপন দেহে
হেথা কি নাচবেনা শঙ্কর গো॥ *

নজরুল ইস্‌লাম

---

* স্বর্গীয় দেশবন্ধুর শোক-যাত্রার গান।

এক দিনের কথা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যু সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে শেলের ন্যায় বাজিয়াছে। সে প্রবল আঘাতে দেশ কিছুক্ষণের জন্য যেন স্পন্দহীন হইয়াছিল। দারুণ শোকে অবসন্নভাব এখনও দূঢ় হয় নাই। নিতান্ত প্রিয়জন হারাইলে, যেরূপ মর্ম্মপীড়া অনুভূত হয়, যাহাদের সহিত তাঁহার আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের প্রাণে সেইরূপ যাতনা হইয়াছে। তবে কালে এ যন্ত্রণার উপশম হইবে। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম।

প্রিয়জন বিয়োগে মানুষ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার গুণ স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া থাকে। তাই আজ আসমুদ্র হিমাচল মহানুভব চিত্তরঞ্জনের গুণগানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় জীবনের ইতিহাসে চিত্তরঞ্জনের স্থান কোথায়, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে তিনি কতদূর সফল হইয়াছেন, এ সকল বিষয় ভবিষ্যতে নিরূপিত হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহার গুণাবলীর বহুলভাবে আলোচনা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু এই সকল উপাদান হইতে ঐতিহাসিক ভবিষ্যতে চিত্তরঞ্জনের চরিত্রচিত্র যথার্থভাবে বিকসিত করিতে পারিবেন।

আমি দেশবন্ধু সম্বন্ধে একদিনের কথা আপনাদিগের বলিতে ইচ্ছা করি। ঘটনাটি অনেক দিনের হইলেও আমার নিকট যেন প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া মনে হয়। যেদিন বাসন্তী দেবী দেশের জন্য স্বেচ্ছায় ইংরাজ পুলিসের হাতে ধরা দেন, ইহা সেই দিনের কথা।

সেইদিন আমি সন্ধ্যার সময় ল্যান্সডাউন রোডে একজন বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম এমন সময় এই সংবাদ আসিয়া পৌছিল। এই সংবাদে মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, একেবারে দেশবন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় গিয়া দেখি, দেশবন্ধু নীচের তলায় একটি ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছেন। দুই তিনটী যুবক বাসন্তী দেবী প্রভৃতির ধরিবার কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছে। তিনি অচঞ্চলভাবে সব শুনিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সেই স্থির নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, উত্তাল তরঙ্গাঘাতে তাঁহার চিত্তসিন্ধু কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হয় নাই। বাস্তবিকই তখনকার তাঁহার সেই শান্ত সমাহিত ভাব আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইহার কিছু পরে ব্যারিষ্টার বিজয় বাবুর প্রবেশ। তাঁহার মুখে চোখে যেন একটা উত্তেজনার ভাব রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আজ আমি লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুর্লে সাহেবকে ছাড়িয়া কথা বলি নাই। আমি স্পষ্টই বলিয়া আসিয়াছি, যে দেখ সাহেব, ইংরাজ এতকাল স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই সম্মানরক্ষা না করিতে পারিলে, ইংরাজ রাজত্বের যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহা সুনিশ্চিত।—গুর্লে সাহেব সদাশয় ও বিবেচক ইংরাজ, তিনি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখিয়া আমাকে দিলেন, সেই চিঠি লইয়া

আমি পুলিশ কমিশনারকে দেখাইয়া উঁহাদের মুক্তির বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। অচিরে তাঁহারা আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।"

চিত্তরঞ্জন ধীরভাবে শুনিলেন। তাঁহার চিরপ্রফুল্ল মুখকমল মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হইয়া গেল। করুণস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বিজয় কেন এমন করিলে? তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে ধরা দিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইল। তাঁহারা অবশ্য জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তুমি তাহার হন্তারক হইলে কেন?" বিজয়বাবু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "বাসন্তী দেবী আমার ভগ্নী (Cousin), আমি কি করিয়া সহ্য করি?"

এইবার চিত্তরঞ্জন তাঁহার স্বভাবসুলভ অমিয়মাখা হাসির জ্যোতিতে ঘর আলোকিত করিয়া বলিলেন, "বাসন্তী দেবী তোমার ভগ্নী বলিয়া এত করিলে, আর কোন মহিলা ধরা পড়িলে বোধ হয় এত করিতে না।" বিজয়বাবুর মুখে আর কথা নাই। আমরাও নির্ব্বাক, বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে মুগ্ধনেত্রে চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে লাগিলাম। এই ছিলেন চিত্তরঞ্জন।

তারপর কৌন্সিল প্রবেশের কথা উঠিল। তাঁহাদের মত ক্ষমতাশালী যোগ্য লোক কৌন্সিলে না যাওয়ায় দেশের যে কত ক্ষতি হইয়াছে বিজয়বাবু এ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনকে অনুযোগ করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন "বিজয়, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, কৌন্সিলে গিয়া যে কোন কাজ হবে, এ বিশ্বাস আমার নেই।" তখনও কৌন্সিলে প্রবেশ করিয়া কৌন্সিল ধ্বংস কবিার সংকল্প তাঁহার মনে জাগ্রত হয় নাই। তখন তিনি পুরামাত্রায় অসহযোগী ছিলেন।

তার পর তাঁহার মনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যদি কৌন্সিলে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে কৌন্সিলে প্রবেশ করা যায়, তাহাতে অসহযোগিতার মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইবেনা। যখন তিনি এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দুইটী কারণে লোকে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়াছিল। প্রথমতঃ, স্বরাজদলের অত্যল্প সংখ্যা কৌন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রবল পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিত্তরঞ্জন যখন যাহা ধরিতেন, সকল মন প্রাণ দিয়া তাহা করিতেন। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" এই মন্ত্রের তিনি সাধক ছিলেন। সত্য সত্যই তিনি বিজয়ী বীরের ন্যায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

আজ তাঁহার অদ্ভূত ত্যাগ, অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা, অপরাজেয় মানসিক শক্তি মৃত্যুতে যেন আরও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য মৃত্যুর পরে, আজ তাঁহাকে স্বপক্ষ বিপক্ষ সমভাবে সম্ভ্রমভরে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে।

চিত্তরঞ্জনকে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্ত সাগরের ন্যায় বিশাল ও উদার ছিল। কোনরূপ ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিতনা। এইজন্য সাম্প্রদায়িক ভাব তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

এই জন্যই এ জগতের কোন জাতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। পৃথিবীতে বিভিন্ন

১৪৮ নং রসারোড নথ,

(চিত্তরঞ্জনের আবাস বাটী—ইহা তিনি সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন)

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে]

শেষ শয়নে

"ফরওয়ার্ড" পত্রের সৌজন্যে]

জাতি তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য সাধন করিয়া সফলতা লাভ করিবে, লীলাময়ের এই লীলা বৈচিত্রের তত্ত্ব তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তুমি সবল বলিয়া দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করিতে পারিবে না। ইংরাজ তুমি বাঁচিয়া থাক। এবং ভারতবাসীকেও বাঁচিয়া থাকিতে দাও। কেহ কাহারও উন্নতির পরিপন্থী হইওনা। ফরিদপুরে তাঁহার শেষ বক্তৃতায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আজ চিত্তরঞ্জনের নশ্বর দেহ ধ্বংস হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার বাণী দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষানুক্রমে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিবে। এই ভাবসম্পদ অপার্থিব—ইহার কোন কালে বিনাশ নাই।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

দেশবন্ধু-শ্রাদ্ধ দিবসীয় স্বস্তি সঙ্গীত

দেশবন্ধু ভারতইন্দু বঙ্গগগন-সূর্য্য হে
মৃত্যুঞ্জয় জয় তব জয় বাজিছে আজি তূর্য্য হে।
　　করিলে মাতার অবশ অস্ত
　　সুবাস বিলায়ে দিকদিগন্ত
বঙ্গ-নন্দন-চন্দনতরু-পূত পাদপ তূর্য্য হে।
　　দাঁড়ায়ে আজিকে বিরজার তীরে
　　তব রজো বলে রাখ দেশে ঘিরে
গোলোক হইতে বিতর আলোক হে অমর নরধুর্য্য হে॥

শ্রীনিরুপমা দেবী

চিত্তরঞ্জন

মনস্বী অরবিন্দ বলিয়াছেন—বঙ্গদেশে কালোচিত কৌশলের সহিত দূরদর্শিতার সমবায় একমাত্র চিত্তরঞ্জনেই দেখা গিয়াছে। অরবিন্দের এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ উক্তির সত্যতা যতই উপলব্ধি করি, ততই দেখি চিত্তরঞ্জন যথার্থ ই একাধারে কবি, দার্শনিক, স্বজাতিবৎসল ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাবপূর্ণ জীবনে যাহা তিনি স্বপ্নে দেখিতেন, তাহা বাস্তবে পরিণত করিতেন। তাঁহার পক্ষে যাহা বাস্তব অপরের পক্ষে তাহা স্বপ্ন অথবা স্বপ্নাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে তথাকথিত সংস্কার আইনকে লোক-লোচনের সমক্ষে প্রবল রাজশক্তির কবচের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া বঙ্গের লোকমতরূপী প্রস্তরখণ্ডের উপর আছড়াইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন যে অপ্রতিম শক্তিমত্তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিলাতের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ও অধ্যাপকের ছায়ায় বসিয়া যৌবনের প্রারম্ভভাগে চিত্তরঞ্জনের জীবনের ধারা যে অভিনব খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল, যেভাবে কর্ম্মময় জীবন গঠিত হইয়াছিল, সত্যের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধুর সমন্বয়ে চিত্তরঞ্জনের জীবন যে কতদূর মধুময় হইয়াছিল, সে সমুদয় তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কর্ম্মধারার আলোচনা করিলেই আমরা কতকটা বুঝিতে পারি। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে তাঁহার জীবন উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর ছিল, তাই ইতরভদ্র শিক্ষিতাশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই তাঁহার প্রসার ও প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়া ভারতে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে।

একবার ক্ষণেকের জন্য দেশবন্ধুর জীবনের প্রারম্ভকালের দিকে তাকাও, ঐ দেখ, বিলাত হইতে আসিয়া, প্রবল প্রতিযোগিতার কণ্টকিত ক্ষেত্রে অভিমন্যুর ন্যায় চিত্তরঞ্জন অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত, একা এক সহস্র হইয়া, স্বীয় দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সোৎসাহে যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখ, অন্যান্য নবাগত ব্যবহারাজীবের ন্যায় নিঃসম্বল চিত্তরঞ্জন দুরদৃষ্টের প্রতিকূলে সিংহের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া কটাক্ষে আপন ভাস্বর ভবিষ্যতের ভাস্বরতম আলেখ্য দর্শন পূর্ব্বক চারিদিকে উৎসাহের অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন। শত অভাবে ও শত অভিযোগেও তাঁহাকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারিতেছে না। বরঞ্চ প্রত্যেক নিরর্থকতাকে তিনি আপন মহিমায় সার্থকতায় বিমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছেন। দুরন্ত পারিবারিক অভাবে অবিচলিত বীর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সব্যসাচীর ন্যায় আপন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মৎস্যচক্র ভেদে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন,—চিরদিনের মত চিত্তরঞ্জনের ভালবাসার সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। ছোট বড় সকল নদনদীই যেমন সারা পথ ছুটিতে ছুটিতে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করে, আপন সত্তা সাগরে মিশাইয়া দিয়া জুড়াইয়া যায়, চিত্তরঞ্জনের বন্ধুগণও তেমনই—তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন,—এমনই তাঁহার

আকর্ষণী শক্তি ছিল। চরিত্রের এই আকর্ষণী শক্তিই, এই বৈদ্যুতিক প্রভাবই নেতৃত্বের প্রধান ও সর্ব্বজয়ী উপাদান। যে নেতার প্রকৃতিতে এই উপাদান যত অধিক, তাঁহার প্রভাব তত বিপুল। কিন্তু চিত্তরঞ্জনে ইহার যত প্রাচুর্য্য ছিল, না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়, ভারতের অন্য কোনো নেতায় বুঝি ততটা ছিল না, আর হইবে কি না, জানি না।

যৌবনের প্রারম্ভে, আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুরন্ত প্রতিযোগিতার সংগ্রামে কোন মতে আত্মসত্তা বজায় রাখিয়া ধীরে ধীরে চিত্তরঞ্জন আপনার ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছিলেন, দীর্ঘ নিদ্রার পর যেন উষার স্বর্ণচ্ছটা আসিয়া তাঁহার নির্ম্মল ও প্রতিভাময় মস্তকে পড়িয়া, শুধু তাঁহাকে নহে, তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুবান্ধবদিগকে পর্য্যন্ত আলোকিত—স্বর্ণময় করিয়া তুলিতেছিল, আর দেরী নাই, ঐ দেখিতে দেখিতে সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত প্রায়, সকলেরই দৃষ্টি এইভাবে যখন অদম্য উৎসাহের ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের প্রস্রবণ চিত্তরঞ্জনের প্রতি নিবদ্ধ, এমনই সময়ে ইংরাজী ১৮৯৭ সালে বাসন্তী প্রতিমার ন্যায় বাসন্তী দেবী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, সাগরের সহিত সুরধুনীর মিলন হইল। এদিকে চিত্তরঞ্জনও সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া বিজয়ী বীরের মত, যেন নবজীবন সঞ্চারে দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ হইয়া হাইকোর্টের ফৌজদারি বিভাগে অপ্রতিরথ হইয়া দাঁড়াইলেন। কি একটা অতিমানুষ শক্তি আসিয়া, বসন্তের প্রকৃতির ন্যায় তাঁহাকে অভিমানবত্তা দান করিল। হাইকোর্টের আদিম বিভাগেও তিনি অতীব দক্ষতার সহিত ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। উভয় ক্ষেত্রে তাঁহার তুলাকক্ষ আর কেহ ছিলেন বলিয়া ত মনে পড়ে না। যথার্থই সব্যসাচীর ন্যায় তিনি দুইদিকে জুড়িয়া বসিলেন, উভয়ত্রই বিজয়ের দীপ্তি সাফল্যের কিরীট আসিয়া তাঁহার মস্তক বিমণ্ডিত করিল। তখন অনেকের মনে হইত, ভাগ্যবতী বাসন্তীর সংস্রবে চিত্তরঞ্জনের সৌভাগ্যের ভাণ্ডার এতদিনে খুলিয়াছে। আদিম বিভাগে যখন এইরূপে তিনি প্রচুর প্রসার প্রতিপত্তির সম্পদে সুসম্পন্ন হইয়া স্বীয় সৌভাগ্য মন্দিরের সোপান গঠন করিতেছিলেন, সেই সময়ে, অসাড় ভারতের শবদেহে এক নূতন স্পন্দন অনুভূত হইল। সেই অনুভূতিতে—ভারতের সেই বহুকাল-বাঞ্ছিত অকাল উদ্বোধনে চিত্তরঞ্জন অন্যতম পুরোহিত হইয়া মাতৃপূজায় ব্রতী হইলেন। চিরস্মরণীয় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এবং বাগ্মিপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। একজন—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য, অন্য জন—বিপিনচন্দ্র—তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে সাক্ষীরূপে আহূত হইয়াও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করার জন্য। এই উভয় ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন যেরূপ যোগ্যতার সহিত অভিযুক্ত পক্ষ সমর্থন করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের অন্য একটা দিক্, যাহা এতদিন কতকটা লুক্কায়িত ছিল, তাহা খুলিয়া গেল, হঠাৎ সকলে দেখিল আইন কানুনের খুঁটিনাটির মধ্যে,—একটা বিরাট মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার লুকাইয়া আছে—স্বদেশপ্রেমের পরশ পাথর লুকাইয়া আছে—কালে এই পরশ পাথরের স্পর্শেই বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের লক্ষ লক্ষ হৃদয় সোণা হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন কোটি কোটি প্রাণীর চিত্ত রঞ্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ের কত

কথা আজ মনে পড়িতেছে! সেই দুর্দ্দান্ত ক্ষুদিরামের কাহিনী, সেই কানাইলালের আত্মোৎসর্গ, সেই অরবিন্দ বারীন্দ্র প্রভৃতি দেশসেবকগণের নরমেধ যজ্ঞের বিরাট আয়োজন। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে যখন অরবিন্দপ্রমুখ দেশপ্রাণ যুবকবৃন্দ অভিযুক্ত, তখন সংবাদপত্রে ইঁহাদের পক্ষ সমর্থনকারী যে সমুদয় উকিল ব্যারিষ্টারদের নামের তালিকা বাহির হইল, দেখিলাম তাহাতে নামাকাঙ্ক্ষী অনেকেই আছেন, কিন্তু যাঁহার থাকার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, সেই চিত্তরঞ্জন নাই। অথচ অরবিন্দকে প্রকৃত অরবিন্দরূপে এক চিত্তরঞ্জন ছাড়া আর বড় কেহই জানিতেন না। এই সময়ে একদিন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে চিত্তরঞ্জন যেন ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াই আমাকে বলিলেন—"বিজয়, এখন না হোক, দেখিও তাঁহারা আমার নিকট আসিবেই থাকিবে।" হইলও তাহাই। দায়রায় সোপর্দ্দ হইবার পর—অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—আমার জীবনে কোনো আইন ব্যবসায়ীকে তাঁহার মক্কেলের জন্য—আমি চিত্তরঞ্জনের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রম বা আত্মত্যাগ করিতে দেখি নাই। অরবিন্দের মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জন যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা, ক্লান্তিশূন্যতা ও প্রশস্তহৃদয়তার সহিত আইনজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই দুর্লভ। সেই দশমাসব্যাপী মোকদ্দমার সময়ে, আমি দেখিয়াছি, কোন রাত্রিতেই চিত্তরঞ্জন দুইটার পূর্ব্বে বিশ্রাম লাভ করিতে যান নাই বা পারেন নাই। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব—চিত্তরঞ্জনের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর সমক্ষে যেন একেবারে আত্মসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সে যেন এক অপূর্ব্ব নাটকের অভিনয়। না না—প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভবিষ্যৎ মহা নাটকের প্রথম যবনিকার উত্তোলন। প্রকৃতপক্ষে ঐ অরবিন্দের মোকদ্দমা হইতেই চিত্তরঞ্জনের শিরে বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া তাঁহার জয়গাথা গীত ও দক্ষতা শতমুখে প্রশংসিত হয়। দামোদরের বানের মত চারিদিক হইতে বড় বড় মোকদ্দমা আসিতে থাকে, চিত্তরঞ্জনকে কিছুকালের জন্য সৌভাগ্য-দেবতা কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের পুত্তলিকা করিয়া তোলেন। চিত্তরঞ্জনের প্রভায় বঙ্গের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেংকিংসও চমকিত ও পুলকিত হন এবং মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত অরবিন্দ অভিযোগমুক্ত হইয়া সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের বল এত অতুল ছিল যে, যখন কোনো বিচারকের সমক্ষে তিনি দাঁড়াইয়া ছলজব করিতেন, মনে হইত, বুঝি কোনো বয়স্যের সহিত, সখার সহিত, সমব্যবসায়ীর সহিত তিনি আইন কানুনের বার্ত্তালাপ করিতেছেন। কোনো দিকে কোনোরূপ দুর্ব্বলতা তাঁহার ছিল না। যাহা ন্যায্য, সত্য,—তাঁহার জয় অবশ্যম্ভাবী, প্রমত্ত ঐরাবতেও তাহা একতিল বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না,—এই ছিল তাঁহার ধারণা এবং আমরণ এই ধারণার দুর্ভেদ্য কবচে সম্বদ্ধ হইয়া তিনি সঙ্কল্পিত বিষয়ে বিজয়ী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প-শুদ্ধি ছিল, তাই তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধিও ছিল। ক্রমে কত শত শত মোকদ্দমায় তাঁহার বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, ভারতের সর্ব্বত্র তিনি "একমেবাদ্বিতীয়" বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। চিত্তরঞ্জনের

দৃষ্টিশক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। সকলের চোক যাহা এড়াইয়া যাইত, তাঁহার চোখে তাহা পড়িত। তাই অনেক মোকদ্দমা—যাহা অন্য সকলে নিরাশ হইয়া "কিছু নাই" বলিয়া ছাড়িয়া দিতেন, তিনি তাহা হইতে আইনের নূতন রহস্য আবিষ্কার পূর্ব্বক মক্কেলকে জিতাইয়া দিতেন। তিনি বহির্দৃষ্টিতে জগত দেখিতেন এবং অন্তর্দৃষ্টিতে জগতের মানব সমাজের ভিতরকার অবস্থার ফটো তুলিয়া হৃদয়ের ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিতেন। জননী জন্মভূমির ব্যথায় যে তাঁহার কত বেদনা, লাগিত, তাহা যে তাঁহার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিয়াছে সেই জানে। দেশীয় আদালতে তিনি আইনের ব্যবসায় করিতেন, সংসার প্রতিপালনের জন্য, বন্ধুবান্ধব দীনদুঃখীর জন্য তিনি ব্যারিষ্টারি করিতেন সত্য, কিন্তু আইন কানুনের মধ্যেও বর্ণ বৈষম্যের প্রাচুর্য্য দর্শনে, কোন্ দেশে কাহার আইন প্রচলিত-ভাবিয়া মনে মনে হাসিতেন। তপস্বীর মত কি যেন একটা বড় জিনিষ তাঁহার অন্তর্নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা ভাসিত, আর বহির্নয়নে তাহার ছায়া পড়িত, তাই চিত্তরঞ্জনের চক্ষু অত শীতল অত মধুর ছিল। সে চক্ষুর চাহনিতে অতিবড় শত্রুও আপন হইত, অত্যন্ত দুর্দ্দান্তও ক্ষণকালের জন্য মাধুর্য্যে ভরিয়া যাইত। বিশ্বের অলীকতা, নশ্বর সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা সর্ব্বদা তিনি চিন্তা করিতেন। বিষয়ীর মনে শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায়, অনেকেরই মনে হয়ত সে চিন্তা উদিত হয়, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মত চিন্তায় ও কর্ম্মে তাহা মিলাইয়া কয়জনে দেখিয়াছেন, বলা শক্ত। আর্ত্তের ক্রন্দন, দুঃখিতের ম্লান মুখ, পতিতের অশ্রু তাঁহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। তাই তিনি—পরের অভাব অভিযোগ আপন ভাবিয়া মুক্ত হস্তে তাহা দূর করিতেন। ত্যাগের তিনি যে কত বড় প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে এ কথা বলিব যে,—উপনিষদের "হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ম্ সংবিদা দেয়ম্" এ উক্তি তাঁহাতে কখনো প্রযুক্ত হইতে দেখি নাই। কেহ কিছু চাহিলে—যাহা তাঁহার কাছে থাকিত, দিয়া দিতেন, কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত দান করিতেন, নতুবা যেন তাহার স্বস্তি হইত না। তিনি সৌন্দর্য্যের সেবক ছিলেন, অতি বড় অসুন্দরকেও তিনি সুন্দর করিয়া তুলিতেন,—নীচকে উচ্চ করিব, পাপীকে নিষ্পাপ করিব, প্রতপ্তকে শীতল করিব, যাহা উষ্ণ অস্পৃশ্য তাহাকে জুড়াইয়া সুখস্পর্শ করিয়া তুলিব এই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। দানের একটা সীমা বা সামঞ্জস্য তাঁহাতে ছিল না। দান করিতে পাইলেই তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইতেন। সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, শেষে পত্নী পুত্রের সহিত নিজকে পর্য্যন্ত দেশ সেবায় বিলাইয়া দিয়া তিনি আত্মারাম হইলেন,—যথার্থই "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" হইয়া ভারতের নরনারীর হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন। পশ্চিমের বিজ্ঞান-সঙ্গত উপায়ে জীবন যাপন অপেক্ষা, কৃত্রিম যন্ত্রের হাতের পুতুল হইয়া থাকা অপেক্ষা, প্রাচ্যের স্বপ্নময়ী প্রকৃতির ছায়ায় বসিয়া ভারতের ছায়াশীতল বনানীর শ্যামাঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া প্রাণে নিত্য নূতন ভাব, নূতন কল্পনা সঞ্চয় করিতে তিনি ভালো বাসিতেন, তাই দেশবাসীকেও সেইরূপ করিতে চাহিতেন। তিনি যে কত বড় ছিলেন, কত মধুর ছিলেন,—আরো কতকি ছিলেন,—তাহা

আজ তাঁহার অভাবে যতটা বুঝিতেছি, তিনি থাকিতে বুঝি ততটা বুঝিতে পারি নাই। অত বড় একজন মহাপুরুষ যে এদেশে—এই রুদ্র-রুক্ষ শ্মশানে আবির্ভূত হইতে পারেন, তাহা তাঁহার সত্তার পূর্ব্বে ভাবিতেও পারি নাই। তিনি ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষায় ভরপুর হইয়াও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী ছিলেন। মনে হয়, যদি পাশ্চাত্য আদর্শে মাত্র পত্নী পুত্র কন্যা লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহার কর্ম্মময় জীবন মাত্র আত্ম পরিবারের মধ্যেই বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইত, তবে বুঝি, আমরা, তাঁহাকে দেশবন্ধুরূপে পাইতাম না। নিয়ত বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী লইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের মত তিনি একটা দিক জুড়িয়া ছিলেন। জীবনের অপরাহ্ণে তিনি যে মহা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াছিলেন, প্রথম জীবন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। তুষারপুঞ্জ তিল তিল করিয়া গলিতে গলিতে যেমন ক্রমে আপন সত্তা প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেয়, তিনিও তদ্রূপ জীবনের প্রথম অরুণোদয় হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর সত্তায় মিশাইয়া দিয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, "যদ্ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—যাহা বিরাট তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। উপনিষদের এই উদাত্ত সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়াই তিনি "স্বরাজ" সাধনায় ব্রতী হন্। তাহার "সাগর সঙ্গীতে" দেখি, এই স্বল্পপরিসর সংসার যেন তাঁহার আশা মিটাইতে পারিতেছে না, তিনি যাহা চান, তাহা দিতে পারিতেছে না, তাই অনন্ত শক্তিধর মহাপুরুষ অনন্ত নীলিমার বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িতে চাহিতেছেন, আপনাকে মিশাইয়া দিতে কত কাকুতি-মিনতি করিতেছেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অন্তর, তাহা যখন এইভাবে বাইরের সকল বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য আকুল তেমনই সময়ে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে মহাত্মা গান্ধীর বিরাট্ ব্যক্তিত্ব আসিয়া সেই বিক্ষুব্ধ অন্তরে সাড়া দিল, হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিল। তীর্থস্নাত ঋত্বিকের মত হাসিতে হাসিতে এক মধুর মূর্ত্তিতে চিত্তরঞ্জন আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। "মা ভৈঃ" স্বরে অবসন্ন দেশবাসীর প্রাণে নবীন আশার বিদ্যুৎ বিলসিত করিলেন। বাংলার শ্যামা দোয়েল পিকের তানে যে প্রাণ এলাইয়া পড়িত, গোধূলির স্নিগ্ধ-মধুর আবিল্যে যে হৃদয় কেমন যেন পাগলের মত হইত, তাহা সাধকের বহুসাধনার চরম পরিণতির মত, সিদ্ধির মত, নিরঙ্ক হইয়া চিত্তরঞ্জনকে "দেশবন্ধু" করিয়া দেশমাতৃকার ক্রোড়ে তুলিয়া দিল। বাংলার চিত্তরঞ্জন—ভারতের চিত্তরঞ্জন হইলেন, বিশ্বের দেশবন্ধু হইয়া অমর লোকে তিরোধান পূর্ব্বক স্বদেশবাসীদিগকে অমরত্ব দান করিয়া গেলেন।

বি, সি, চাটার্জ্জি

দেশবন্ধু

(১)

হিম-গিরি-কোণে দেব-দারু-বনে 'পাগ্‌লা-ঝোরা'র ধারার ন্যায়
অশ্রু-দরিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া মিলিত ভারত ভাসায়ে যায় !
নাহি সে মরমী বাঙালীর কবি,—বাণীর প্রসাদী সে মৃগনাভি
জীবন্-মৃতের অমৃত বিলায়ে মিটায়ে গিয়াছে দেশের দাবী।
ভোগ-মধু, 'মালা,' 'মালঞ্চ' ছাড়ি' লভি' 'অন্তর-যামীর' বর
মহামিলনের অভয় শঙ্খে উদ্বেল যাঁর প্রাণ-'সাগর' ;
ভাগ্যবন্ত সন্তান সেই, বিলাসী দুলাল বাঙ্‌লা-মা'র
নিল সন্ন্যাস, খদ্দর-বাস-কল্যাণ-ধ্রুব-ভূষণ-সার।
একতায় পূত চর্‌কার সুতো দীক্ষার বীজ-মন্ত্র যাঁর,
দেশ যাঁর প্রাণ, জপ-তপ-ধ্যান,—সে দেশ-বন্ধু নাহিরে আর !

(২)

যাঁর মুখ-পানে তৃষিত-নয়নে চেয়েছে ভারত নির্নিমেষ,
যাঁর তপোবলে অভিশাপ থেকে মুক্ত হ'য়েছে এ-মহাদেশ,
এসিয়ার নব বোধন-লগনে, গাহিলেন যিনি সেবার সাম,
শুচি অশুচির বিচার ছাড়িয়া ঢালিলেন প্রেম, মুক্তি-কাম,
সে গিয়াছে চলে' হাজার কাঁদিলে আর না ফিরিবে সে মহাজন,
পূর্ণ আহুতি সঁপে' দিয়ে গেছে, বরণ করিয়া নির্য্যাতন।
অসীম শূন্যে তাকাই মৌনে,—কেন গো অকালে পড়িল বাজ !
আব্‌ছায়া-ঢাকা চন্দ্র-তপন চোখের জলের কুহেলি-মাঝ।
চঞ্চল কাল অচল হইয়া, জয়-টীকা দিল ললাটে যাঁর,—
সে আজি নাহিরে, প্রাসাদে-কুটীরে ওঠে হাহাকার দিগ্‌-বিদার !

(৩)

নীরব আজি সে বিরাট-কণ্ঠ, লোক-মনে যাঁর সিংহাসন,
নাহি সে ভক্ত, স্বেচ্ছা-সেবক ; শুনি' বিবেকের অনুশাসন
কর্ম্মেরে যিনি ঈশ্বর মানি' অর্ঘ্য দিলেন সকলি তাঁর,
মণি-কাঞ্চনে লোষ্ট্র-জ্ঞেয়ানে বিচূর্ণিয়া মৃৎ-পাত্র-সার,

সর্ব্ব-পাবন ত্যাগের অনলে নির্ম্মল হ'য়ে যে দান-বীর
যশের শরীরে পূজা পান হেথা—মৃত্যু নাহি সে গৌরবীর।
সত্যসন্ধ ধর্ম্ম-জীবন, সে চিরঞ্জীব নাহিরে আর,
অহিংসা যাঁর রক্ষা-কবচ,—হারায়ে তাঁহারে দেশ আঁধার!—
মর্ত্ত্য হইতে অমর্ত্ত্য-পুরে, অনিত্য থেকে নিত্যলোক,
তিমির হইতে জ্যোতির পুলিনে চলে' গেছে সেই পুণ্য-শ্লোক।

(৪)

ওরে বাঙলার কিশোর-কিশোরী, তোদের এ-শোক সহেনা আর!
তোরাই যে তাঁর মমতার ফুল, নয়নের মণি ছিলিরে তাঁর!
তোদেরই বুকের দরদ জুড়াতে করেছেন যিনি অটল পণ,
শাশ্বত যাঁর প্রতিষ্ঠা-বেদী, অন্তরে মধু-বৃন্দাবন,
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তর্পণ তাঁর,—হও আগুয়ান্ অহিংসার
তাঁরি বাঞ্ছিত স্বরাজের পথে, প্রণমিয়া দেশ-দেবীর পায়।
সেই এক ঠাঁই ভেদ-জ্ঞান নাই—খ্রীষ্টান-হিন্দু-মুসলমান,—
চোখের জলের যুক্ত-বেণীতে করগো সকলে মুক্তি-স্নান!—
হে ব্যথা-হরণ নিখিল-শরণ, দাও শোকাতুরে শান্তিজল,
মুছাও নয়ন, ঘুচাও বেদন, দাও সান্ত্বনা, দাওগো বল।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবন্ধু স্মৃতি

বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে চিত্তরঞ্জনের পৈত্রিক বাসভূমি। তিনি কদাচিৎ বাড়ী যাইতেন বটে, কিন্তু 'আমার গ্রাম' বলিয়া তাঁহার বরাবর অভিমান ছিল; গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজনকে চিনিতেন, শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন ও স্কুল, ডাক্তারখানার জন্য সাহায্য করিতেন। আমি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকার মোকদ্দমা বুঝাইবার জন্য অধিকাংশ সময় তাঁহার কাছে থাকিতাম, তাঁহার রাখাল কাকার খুব আধিপত্য দেখিতাম। রাখালবাবুকে তিনি বরাবর খুব শ্রদ্ধা করিতেন। বিভুরঞ্জন দাশ নামে প্রায় সমবয়সী তাঁহার একটী জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার ক্লার্ক ছিলেন। প্রায়ই শুনিতাম 'বিভু ঐ কাজটা কর্, ঐখানে যা, এই বন্দোবস্ত কর্'। এত বড় 'ব্যারিষ্টারের' মুখে বাঙ্গালী ভাবের এত সহৃদয়তাপূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিস্মিত হইতাম। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি এখনও তাঁহার উদারতা বুঝিতে পারি নাই।

দার্জ্জিলিং—মল

"ফরওয়ার্ড" পত্রের সৌজন্যে]

শবানুগমনে জনসমুদ্র

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে]
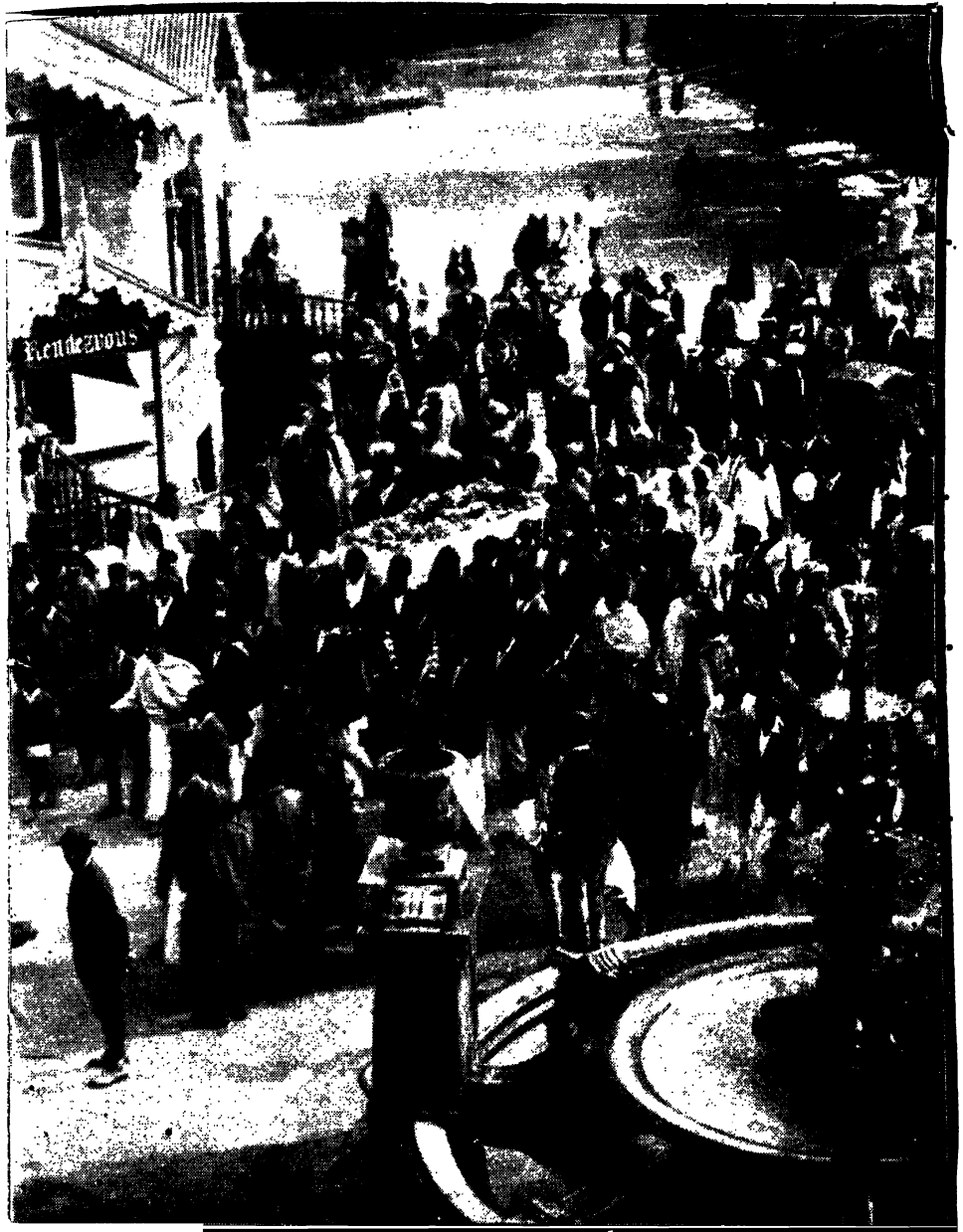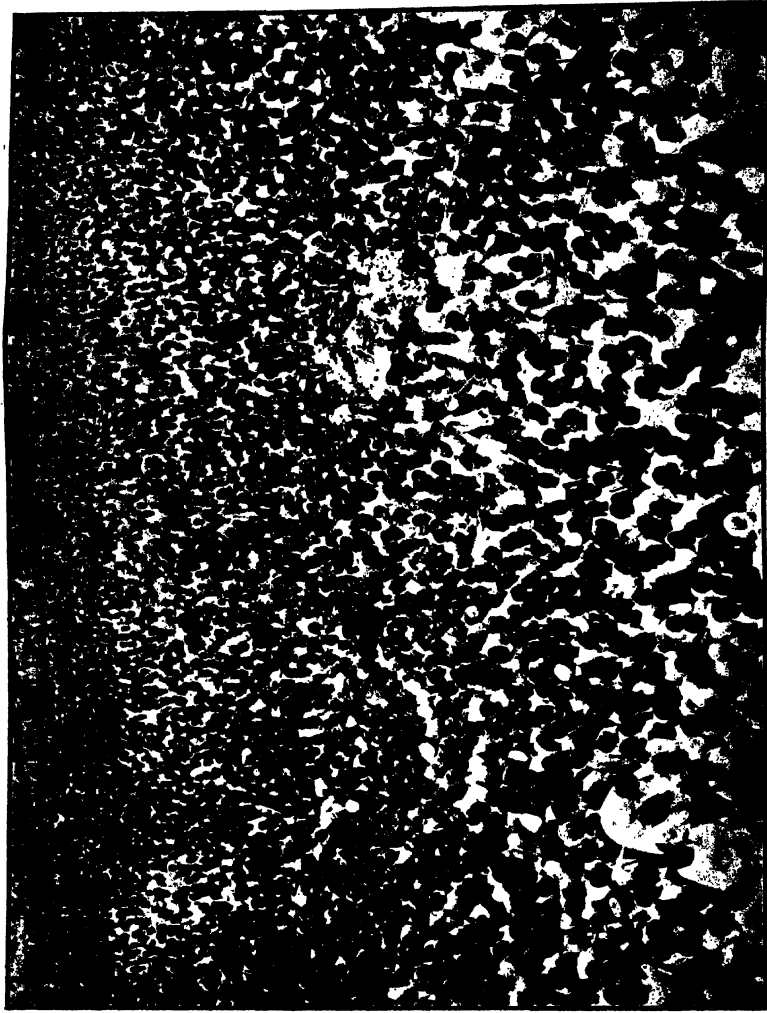
বিক্রমপুরের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যে তিনি সর্ব্বদা গৌরবানুভব করিতেন। অতীত গৌরব-বাহিনী রামপালে বেড়াইতে গিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। বিক্রম সম্মিলনীর তত্ত্বাবধানে পল্লী সংস্কারের জন্য মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করিতেন। বিক্রমপুর বৈদ্য জাতির সামাজিক উন্নতি বিষয়ে তিনি খুব আগ্রহ দেখাইতেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৈদ্য সম্মিলন তাঁহার বাড়ীতে হয় ও তিনি সমস্ত খরচ বহন করেন। বরপণ-প্রথার কুফল দেখাইবার নিমিত্ত আমরা সেই উপলক্ষে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের অভিনয় করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সামাজিক কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব্বদা এই পরিবারে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। এবং তিনি ইহার গৌরব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কালীমোহন দাশ মহাশয় হাইকোর্টের খুব একজন প্রতাপশালী উকিল ছিলেন। তিনি তাঁহার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় বিচারপতিদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ব্যবহার রুক্ষ হইলেও, সেই কঠিন আবরণের অন্তরালে প্রাণের সরলতায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন। শুনিয়াছি এইজন্যই নাকি তিনি বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। কালীমোহন বাবুর মধ্যম সহোদর দুর্গামোহন বাবুরও হাইকোর্টে খুব পসার প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনিও খুব সদাশয় লোক ছিলেন। এড্‌ভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন, ও রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ্ যতীশরঞ্জন দুর্গামোহনের দুই পুত্র এখন জীবিত আছেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, আর কালীমোহন বাবু হিন্দুসমাজভুক্তই ছিলেন। দুর্গামোহন বাবুর উৎসাহে তাঁহাদের বিমাতার 'বিধবা বিবাহ' অনুষ্ঠিত হয়। এবং ইহার পরই নাকি কালীমোহন বাবুর সহধর্ম্মিণী "জাত গেল" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে, তিনি উত্তর করেন "বড় বউ জাত্ আমার ক্যাস্ বাক্সের ভিতরে।" বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি স্বগ্রামে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করেন, অনেকবার এই মহা সমারোহের কথা গ্রামের লোকের নিকট শুনিয়াছি। আবাল্য ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিপালিত চিত্তরঞ্জনও বরাবর অন্তরে হিন্দুই ছিলেন এবং প্রাপ্ত বয়সে আনুষ্ঠানিক হিন্দু সমাজে ও সর্ব্বত্র আদর পাইতেছিলেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নহে—হৃদয় জয় করিয়া, হিন্দুর প্রকৃত মর্ম্ম অধিকার করিয়া, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব লাভ করিয়া। চিত্তরঞ্জনের ন্যায় আদর্শ হিন্দু অতি বিরল দেখিয়াছি। তারকেশ্বর সংস্কারে বদ্ধপরিকর হওয়ায় অনেক হিন্দু-নামধেয় ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ প্রশ্ন করিতে লজ্জিত হয় নাই যে, চিত্তরঞ্জনের হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষে কথা বলার অধিকার কি? তিনি উত্তরে বলেন, "I am a better Hindu than many of those who pose as such." কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য, তিনি ধর্ম্মের শাঁসই বুঝিতেন, খোসা লইয়া মারামারি করেন নাই।

চিত্তরঞ্জন জেষ্ঠতাতগণকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বসন্ত রঞ্জন দাশকে (ওরফে ভোলাকে) কালীমোহন বাবু পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার তীর্থ চিত্তরঞ্জনের বাড়ীখানি পূর্ব্বে কালীমোহন বাবুর সম্পত্তি ছিল কিন্তু চিত্তরঞ্জন পরে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতের নামানুসারে এখনও ইহার নাম "কালীমোহন আলয়"ই রহিয়াছে, চিত্তরঞ্জন সেই নামের কখনও পরিবর্ত্তন করেন নাই।

চিত্তরঞ্জনের মধ্যম সহোদর প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এখন পাটনা হাইকোর্টে জজিয়তি করেন। অনেকে অবগত আছেন তিনি বিলাত হইতে ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশে আইসেন। চিত্তরঞ্জনের বাড়ীর শিক্ষানুসারে এই বিদেশী বধূকেও সর্ব্বদা বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার মানিয়া চলিতে হইত। চিত্তরঞ্জনের মায়ের নিকট বাসন্তীদেবীর স্থায় তিনিও বাঙ্গালী বধূই ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন সর্ব্বদা মায়ের কথা বলিতেন। মাতৃভক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। আলিপুর মোকদ্দমার সময়ে প্রতিদিন উপরে গিয়া তিনি মায়ের পদধূলি লইয়া কাছারীতে যাইতেন। মাও পুত্র-অন্ত-প্রাণ ছিলেন

যদিও চিত্তরঞ্জনের বাল্য ও যৌবন আমার গোচরীভূত নহে, পরিণত বয়সের কথাই আমি কিছু কিছু জানি, কিন্তু তিনি জীবনের অনেক কথা আমাদিগকে গল্পচ্ছলে বলিতেন।

ঢাকায় অবস্থান কালে আলিপুরে অরবিন্দ প্রসঙ্গ প্রায়ই উত্থাপন করিতেন। বারীন্দ্রের উপরও তাহার খুব শ্রদ্ধা ছিল। কর্ম্মপদ্ধতি স্বতন্ত্র হইলেও স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগে বারীন্দ্রের কথা উঠিলেই তিনি আনন্দিত হইতেন, বলিতেন, নর্টন সাহেবও অনেক সময়ে স্বীকার করিয়াছেন "Das, none can conduct the case without feeling an admiration for Barindra."

অরবিন্দ বাবুর মোকদ্দমার কথায় বলিতেন যে, "যখন ডিফেন্সফণ্ডের সংগৃহীত অর্থ সব্ ফুরাইয়া গেল, কৌন্সিলিরা একে একে হাল্ ছাড়িতে লাগিলেন, তখন আমার ডাক হইল। কনসাল্টেসনের সময়ে আমার উপস্থিতির প্রস্তাবেও যাঁহারা অসহিষ্ণু হইতেন তাঁহারা ছাড়িয়া দিলে অরবিন্দের বন্ধুগণ 'প্রত্যাশিত ভাবেই' আমার কাছে উপস্থিত হইয়া অনেক অক্ষমতা ত্রুটী দেখাইতে লাগিলেন। আমিত পূর্ব্ব হইতেই ঠিক ছিলাম, তাহাদিগকে হাসিয়া বলিলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, অরবিন্দ কি আমার কেহই নয়? সেই দিন হইতেই ব্রিফ্ লইলাম, সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি সেই দিকে প্রধাবিত হইল, অন্য বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতাম না। ক্রমে অর্থাভাবে গাড়ীঘোড়া বেচিলাম, খরচ কমাইতে লাগিলাম ও কোন হুণ্ডি কাটিয়া দেনা করিতে লাগিলাম।" তিনি কাছারীতে অবিশ্রান্ত খাটিয়াও প্রতি রাত্রে ১টা, ২টা পর্য্যন্ত খাটিতেন, কোন দিন বা রাত্রি ভোরই হইয়া যাইত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মোকদ্দমার (State Trial) তাঁহার অভিভাষণ, বিদ্যা ও জ্ঞানের খনিস্বরূপ, যুক্তির উৎস এবং বেদান্তের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। চিত্তরঞ্জনের সমস্ত যুক্তির সহিত একমত হইয়া জজ্ বিচ্ক্রফ্ট্ অরবিন্দকে দায়রার কোর্টেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার্ লরেন্স্ জেঙ্কিংস ও জষ্টিস্ কার্ণডাফের বেঞ্চে আপিলের

শুনানী হয়। স্যার লরেন্স্ দাশ সাহেবের সুদক্ষ পরিচালনা ও ঐকান্তিক নম্র ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়েন্ যে, ইহার পরে তিনি শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরূপে সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ও নিজের রায়ে দাশ সাহেবের অনেক প্রশংসার কথা লিপিবদ্ধ করেন। চিত্তরঞ্জনও জেঙ্কিস্ সাহেবকে খাঁটি বিচারক বলিতেন ও তাঁহার মুখে মাঝে মাঝে শুনিতাম "একবার কল্‌কাতা গিয়ে বুড়োর সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বো।"

আত্মসম্মান চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব ছিল। স্পষ্ট কথা বলিতে তিনি কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। মনের ভাব গোপন করিতেও ভালবাসিতেন না। আলিপুর মোকদ্দমার সময়ে জজ্ সাহেবের মুখ হইতে "non-sense" কথাটা একদিন হঠাৎ বাহির হইয়াছিল। সহসা চিত্তরঞ্জনের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, তার পরে ধীরভাবে বলিলেন "It is a regret that you are on the Bench. Were it elsewhere, I could have given you the proper reply."

আপিলের শুনানীর অল্প দিন পরে চিত্তরঞ্জন শারদীয় অবকাশে বিলাত ভ্রমণার্থ সমুদ্র যাত্রা করেন। চিফ্ জষ্টিস্ এবং কার্ণডাফ্ও একই জাহাজের আরোহী ছিলেন। কার্ণডাফ্ ইতিপূর্ব্বে চিফের সঙ্গেই আলিপুর মোকদ্দমার আপিল শুনিয়াছিলেন। জাহাজেও তাঁহার সিভিলিয়ান মেজাজ দেখিয়া তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জন কোন আলাপাদি করেন নাই। যাহা হউক চিফ্ অনেক সময়েই কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই চিত্তরঞ্জন তন্ময় হইয়া যাইতেন সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে। ঐ বিশাল নিলাম্বুর তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতেন, নীলজলে তরঙ্গায়িত শুভ্র বীচিমালা দেখিতেন, আর দেখিতেন দূরে, ঐ দূরে—অন্ত নাই, পার নাই; কূল নাই—কোন্ দিগন্ত প্রদেশে ঐ ঊর্দ্ধের নীলাকাশ এই বিস্তীর্ণ জলরাশির সহিত মিশিয়াছে। আরও ঊর্দ্ধে চাহিতেন, দেখিতেন এই অদ্ভুত সৃষ্টি যাঁহার রচনা—কি অনন্ত তাঁহার রূপ, কত সুন্দর সেই বিশ্বস্রষ্টা, কত অসীম তাহার মাহাত্ম্য। সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত, আর সেই অর্ণবের গানে অন্তরবিজনে অসীমকে বাঁধিতে চাহিতেন। এই স্মৃতি লইয়াই তাঁহার "সাগর সঙ্গীত" রচিত হয়। প্রথমবারে সাগর পার হইয়া আসিবার সময়ে অসীমের সন্ধান পাইয়াছিলেন, এবার তাহাকে ছন্দে একেবারে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রাণের ভিতরে রাখিলেন। ঢাকায় "সাগর সঙ্গীতের" manuscript (কপি) আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন।

কিরূপে অরবিন্দের মোকদ্দমা 'প্রত্যাশিতভাবে' গ্রহণ করিয়াছিলেন এইবারে সেই কথা বলিব। চিত্তরঞ্জন অলৌকিকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ীর কাছে বকুল তলার মোড়ে মোটার দুর্ঘটনা হইত, তিনি বলিতেন নিশ্চয়ই এখানে কাহারও আত্মা পরিভ্রমণ করে। অরবিন্দের মোকদ্দমা যখন হয়, সে সময়ে আমোদ স্বরূপ প্রায়ই টেবিলে বসিয়া স্পিরিট্ আনিতেন। একদিন কেবল একটী কথাই বারম্বার আসিতেছিল "You must defend Arabinda"—অরবিন্দের পক্ষ

নিশ্চয়ই আপনাকে সমর্থন করিতে হইবে। তিনি প্রশ্ন করেন, "আপনি কে?" উত্তর আসিল "উপাধ্যায়।"

"ভাল বুঝিলাম না।"

আবার উত্তর হইল, "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়!"

ইহার পরে তিনি বুঝিলেন অরবিন্দের মোকদ্দমা নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে আসিবে, এবং কথাপ্রসঙ্গে কোন কোন বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন, "আমি এখানে বসে আছি ইহা যেমন সত্য, এ মোকদ্দমা আমার হাতে আসবে ইহাও তদ্রূপ সুনিশ্চিত।"

উপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতায় চিত্তরঞ্জনের তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। একবৎসর পূর্ব্বে "সন্ধ্যায়" রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে দুইটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। দুইটী মোকদ্দমার বিচারই স্বনামপ্রসিদ্ধ মাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে হয়। এই সময়ে "বন্দেমাতরম্ মামলা" "লিয়াকত্ হোসেনের মোকদ্দমা" এবং অন্যান্য স্বদেশী মোকদ্দমার বিচারও সেই আদালতেই হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন উপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, উপাধ্যায় আমার বাড়ীতে আসিয়া মোকদ্দমা বুঝাইতে বুঝাইতে অধিক রাত্রিতে আর গৃহে ফিরিয়া যাইত না, আমার বাড়ীতেই বিছানা থাকা সত্বেও ভূমিশয্যায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিত। ২রা অক্টোবর (১৯০৭) যখন চিত্তরঞ্জন গভর্ণমেণ্ট অনুবাদক নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে জেরা করিতেছিলেন, দেখিলেন মাজিষ্ট্রেট ভয়ানক চটিয়া টিফিনের জন্য যথাসময়ে ছুটিও দিলনা আর ৪টার পরেও বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। পাঁচটা বাজিলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি বোধ হয় এখন উঠিবেন, আমি অসুস্থ বোধ করিতেছি আমি আর পারিব না।

ম্যাজিষ্ট্রেট্—আপনাকে পারিতে হইবে।

দাশ—আমি ১০টা হইতে আজ্ কিছু খাই নাই, বড়ই ক্লান্ত।

ম্যা—কেন, আমি তো টিফিনের ছুটি দিয়াছিলাম।

দাশ—অন্যান্য দিন এক ঘণ্টা ছুটি থাকে, হাইকোর্ট হইয়া ভোজন সারিয়া আসি, আজ আপনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসিয়াছিলেন।

ম্যা—আপনাকে জেরা করিতেই হইবে, আমি আর সময় দিব না।

দাশ—আমার শরীর অসুস্থ, আমি বড় ক্লান্ত, আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব।

ম্যা—আপনাকে করিতেই হইবে।

ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া চিত্তরঞ্জন আবার আধ ঘণ্টা জেরা করিবার পর জিজ্ঞাসা করেন,—আমি ইচ্ছা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে জেরা শেষ করিয়াছি, বাকী বিষয় আগামী কল্য ধরিব। অদ্য ৬টা বাজিতেছে, আপনি অন্যান্য দিনতো ৪টার সময় উঠেন।

ম্যা—অদ্যই আপনাকে সারিতে হইবে।

দাশ—আমি পারি না।

ম্যা—আমি পারি।

দাশ—আমার অসুখ করিয়াছে, আমার পক্ষে অসম্ভব, ৯টার পরে আমার খাওয়া হয় নাই।

ম্যা—করিতেই হইবে, খাওয়ার কথা ভুলিয়া আমি গোলমাল ভালবাসি না, আপনি খান না খান, আমার তাহাতে কিছু আসে যায় না।

দাশ—আমি কিছুতেই পারিব না, আমি চলিলাম। এই বলিয়া চিত্তরঞ্জন অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর চিত্তরঞ্জন মোকদ্দমায় আর আসেন নাই। ২।১ দিন মধ্যে উপাধ্যায়ও তাঁহার জবাবে বলিলেন, "আমি ইংরাজের আদালত মানি না, আমি জেরা করিব না।" মোকদ্দমা আবার মুলতুবি হইল। দাশ মহাশয় তাঁহাকে বলেন—বোধ হয় আপনাকে জেলে যাইতে হইবে, আমারও ঐ আদালতে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।

উপাধ্যায়—আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ইংরাজের সাধ্য নাই আমাকে জেলে পাঠায়।

উপাধ্যায়ের কথা সত্য হইয়াছিল। ইহার পরে তাঁহার অন্ত্রবৃদ্ধির জন্য দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, এবং ঐ অবস্থায়ই ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁহার মুক্তাত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। বিদেশীর আইন শৃঙ্খল তাঁহার কেশস্পর্শও করিতে পারেনাই। যাহাহউক দাশমহাশয় উপাধ্যায়কে খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া অরবিন্দের মোকদ্দমার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়ের কথা ঢাকায় মাঝে মাঝে হইত। ইতিপূর্ব্বে তিনি ঢাকার শরৎ ঘোষের গুলিমারার মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়া হাওড়া গ্যাংগ কেস্ করিতে গিয়াছিলেন। আমরা বলিতাম "আপনাকে না পেলে আমরা জে, এন, রায়ের কাছে যাইতাম।" তিনি বলিতেন "জ্ঞান খুব Brilliant।" তাঁহার জুনিয়ার নিশীথ সেন ও বিজয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও প্রশংসা করিতেন।

ইহার অনেক দিন পরের কথা বলিতেছি। তখন আমি তাঁহারই বাড়ীর কাছে থাকিয়া আলিপুরে প্রাকটিস্ করি। একদিন শুনিলাম ৭৫০০০৲ দেনা দিয়া তিনি পিতৃঋণ শোধ করিয়াছেন। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ পড়িবার সময় মুখে একটা উজ্জ্বলাভা দেখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে সভায় বক্তৃতাও শুনিতাম। কিন্তু একেবারে প্রাণে সাড়া আসিল, যখন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে তিনি অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করেন। ভাল মন্দ চিন্তা না করিয়া হঠাৎ ঠিক করিয়া ফেলিলাম, আমিও ব্যবসা ছাড়িব। কিন্তু তবু প্রায় কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, পরে যখন শুনিলাম খাঁটি কর্ম্মীর বড়ই অভাব, তখন তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাই ও প্রাকটিস সস্পেণ্ড করি। এই সময় হইতে বরাবর শিষ্যের ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছি ও ভাগ্যক্রমে তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম।

সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২১ খৃঃ) পীর বাদ্‌সা মিঞার মোকদ্দমার সময়ে তিনি ফরিদপুর গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। সেখানে পঁহুছিয়া তথাকার প্রাচীন নেতা অম্বিকা মজুমদার মহাশয়ের সহিত সর্ব্বাগ্রে সাক্ষাৎ করেন। বৃদ্ধ নায়কের পদধূলি মাথায় লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। কথোপকথনের সময় সার্জ্জেণ্টের মনোমোহন বাবু কি টুকিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দেন "এখানকার কোন কথা যেন কাগজে বাহির না হয়"। মাঝে বলিয়াছিলেন "এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, স্বরাজ ছাড়া আমার কোনও চিন্তা নাই, কেবল তপ্তখোলার মত ছট্‌ফট্‌ করিতেছি"। অতঃপর তিনি জগদ্‌গুরুর আশ্রমে রওনা হয়েন। তিনি তখন দেহরক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু শিষ্যগণ দেহ ঘিরিয়া ধুনা গন্ধক চন্দনের ধূমে সযত্নে উহা সমাধিস্থ না করিয়া রক্ষা করিতেছিলেন। বাসন্তীদেবী, কল্যাণী, সত্যেন্‌ বাবু ও আমি সঙ্গে ছিলাম।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলীই একখানি পুস্তকাকারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক ইহার পরের স্মরণীয় ঘটনা ১৭ই নবেম্বরের হরতাল। এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমি "গল্পলহরী"তে বলিয়াছি। কিন্তু এতকথা বলা যায় যে, কিছুতেই ফুরাইবে না, কারণ উহার অব্যবহিত পরেই প্রচণ্ড দমননীতির সূত্রপাত হয়। ভবানীপুরস্থ ভলণ্টিয়ারগণের কর্ম্মশৃঙ্খলা দেখিয়া তিনি সানন্দে বলিয়াছিলেন "এমন না হইলে যুদ্ধের সৈনিক হয়?" ষ্টেশন হইতে সুভাষচন্দ্র গাড়ীর উপরে বসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে গন্তব্যস্থানে পঁহুছাইয়া দিতেছিলেন এবং বাহিরে লেখা ছিল "On national service।" কোনও যান্‌ চলে নাই। বাইসিকিল পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। এমন সুনিয়ন্ত্রিত হরতাল পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কোনও গোল, দাঙ্গা, বচসা হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা সচকিতে বাড়ী বসিয়া আমাদের কার্য্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অধীনস্থ বীরগণের জয় সুনিশ্চিত। এই বিশ্বাস তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও অটুট ছিল। দার্জ্জিলিঙ্গে রামতারণবাবুকে বলিয়াছিলেন, "জানেন আমি কেন এত আশান্বিত, আমি civil disobedience করতেও ভয় পাইনা। আমার একদল এমন সংযত, সুগঠিত ও স্বার্থশূন্য কর্ম্মী আছে যে, আমার কথায় তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে পারে। তাহাদের বলেই আমি পরাজয় জানিনা, হার আমার নাই"। বাস্তবিক জীবনে জয় সর্ব্বদাই তাঁহার পশ্চাতে অনুসরণ করিত। আর তাঁহার প্রেমবন্ধনের এত জোর ছিল যে, ইঙ্গিতমাত্রে গায়ে শতহস্তীর বল আসিত। তাঁহার অলৌকিক স্নেহবলে বাঘমহিষে একসঙ্গে জল খাইত। হালদারের নির্ব্বাচনের পরে একবার কয়েকটী ইংরাজ মহিলা কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "আপনি এত কোমল, অথচ প্রতিকার্য্যে এত জয়ী!" তখন অনিলবাবু, বসন্তবাবু ও আমি বসিয়াছিলাম। তিনি হাত দিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন 'এই "faithful band" এর সহায় বলে'। কিন্তু আমরা জানিতাম তিনি যন্ত্রী ছিলেন, আমরা কেবল যন্ত্রপুত্তলিকার মত যুক্তিতর্ক না করিয়া কাজ করিয়া যাইতাম। যাহা হউক সেই হরতালের রাত্রে বারোটার সময় আমাদিগকে নিজে বসিয়া খাওয়ান। বাসন্তীদেবী মূর্ত্তিমতী দেশমাতৃকার

স্নায় আমাদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক কথা ঐ বিরাট পুরুষের কেবল থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা দিতেছিল "আজ ঐ দুইটি ছেলেকে যদি না ধরতো, ওদের জন্য বড় কষ্ট হ'চ্চে"। মতিলাল ও রমেশ নামক দুইটী সেবককে সেদিন পুলিশ প্রহার করিয়া হাজতে নিয়াছিল, তাহাদের কথাই বলিতেছিলেন।

এইরূপ দুর্ব্বলতা দেখিয়াছিলাম পূজার পূর্ব্বে বিডন স্কোয়ারের একটী সভায়। আমার যতদূর মনে হয় সুপ্রভা দেবী ও "নারী কর্ম্ম মন্দিরের" কয়েকটী মহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সভার লোকদের কাছে পরিধেয় বিলাতী কাপড় চাহিলে চারিদিক হইতে বস্ত্রবর্ষণ হইতে লাগিল। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল ৮৷১০ বৎসরের একটী বালক গায়ের কোটটী একবার খুলিয়া কাছে আসিতেছে, আবার গায়ে দিয়া পেছনে যাইতেছে। বালকের ভাব দেখিয়া তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খোকা, তুমিও দিবে ?" বালক কাঁদিয়া জানাইল, আমি এই কোট গায়ে রাখিব না। কিন্তু মা যে গালি দিয়া মারিবেন, আর কোট দিবেন না। তিনি বালকটীকে স্বহস্তে উপরে উঠাইয়া সকলের নিকট বালকের প্রাণের কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অনেকে বালককে খদ্দরের কোট চাদর দিতে আসিল। বাস্তবিক তাঁহার চরিত্রের মধুরতাতেই অতিবড় শত্রুও গলিয়া যাইত। আবার অন্যদিকে ছিলেন তিনি ভয়ানক দুর্দ্ধর্ষ, অনতিক্রমনীয়, দুর্নিবার। মেরু কক্ষচ্যুত হইলেও তাঁহাকে টলাইতে পারিত এমন প্রতিপক্ষ জন্মে নাই। কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবে তাঁহার গুরু গান্ধীও পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক শক্তিবলেই আমলাতন্ত্র পরাজিত। দ্বৈতশাসন ব্যর্থ ও তাহার বর্ণিত "মায়া" ছিন্ন হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি সব পারিতেন, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দেশে ভয়ঙ্কর সঙ্কটসময় আসিবে বলিয়া শক্তিলাভের জন্য নভেম্বর পর্য্যন্ত শৈলশিখরেই অবস্থান করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন "আমার ত জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য কোন দুঃখই নাই'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আমার যে শক্তি ও একাগ্রতার আবশ্যক, দেশ যদি তাহা না পায়, বড়ই ক্ষোভের কারণ হইবে"।

জেলে সকলের সঙ্গে সকালে বৈকালে কথা বলিতেন। একদিন খুব জোরের সহিত বলিতেছিলেন "পতঙ্গ যখন উড়িয়া আগুনের কাছে যায় সে ত মনে করেনা, আগুন তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিবে। সেইরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আসিতে হয়, এমন যার হ'য়েছে, তার দ্বারাই হ'বে।"

তাঁহার উদারতার কথায় বলিয়া বুঝাইতে পারিব না, এ অনুভবের জিনিষ। একদিন জেলখানায় অসুস্থ হইয়া বিছানায় শুইয়া আছেন, আমি কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরের একটী ভদ্রলোক দেখিতে আসিলেন। সেণ্ট্রাল জেলে visitors (ভিজিটরদের) তাঁহার ঘরেই যাইতে দেওয়া হইত, পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত রাগ করিয়া আমরা

interview বন্ধ করায় তিনিও স্বেচ্ছায় বাসন্তী দেবীকে পর্য্যন্ত দেখা করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পরে ৩।৪ মাস যত দিন জেলে ছিলেন, বাহিরের কাহারও সহিত দেখা করেন নাই। যাহা হউক উপরোক্ত ভদ্রলোকটী কি একটা হিসাব দেখাইয়া বলিলেন "আমি একটা হিসাব এনেছি, হিসাবটা একবার দেখ্‌বেন না ?" তিনি উত্তর করেন "হিসাব আর কি দেখ্‌বো, আমার মনে হয়, আমি যা দিয়েছি, তুমি তার চেয়ে বেশী করেছ"। এই তাঁহার মহানুভবতা, অথচ আমরা শুনিয়াছিলাম সেই ভদ্রলোকটীর হাত দিয়া অনেক টাকার আদান প্রদান হইয়াছিল।

বাস্তবিক টাকার সম্বন্ধে তাঁহার কখনও কোন হিসাব ছিল না। একদিন কথাচ্ছলে বলিলেন, অমুক আসিয়া দুই তিন দিন বলিল, পৈত্রিক বাড়ীখানি নিলাম হয়ে যাবে, ভাই চিত্ত, এই টাকাটা দিয়ে তুমি বাড়ীখানি রক্ষা কর। তাই আমি ২৫০০০৲ টাকার একখানি চেক্ দিয়াছিলাম। মাসিক সাহায্য তিনি কত লোককে করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি উহার লিষ্ট সেই বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। প্রাক্‌টিস্ ছাড়িবার পরেও দুই তিন মাস সেই সমস্ত টাকা দিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানি ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ১৫০৲ পাইতেন আর একজন মাসিক ৭৫৲ পাইতেন। ইহার পরে তাঁহারা চিত্তবন্ধুকে গালাগালি না দিয়া জলস্পর্শ ও করিতেন না। ২০০৲ ৫০০৲ হাজার, দশহাজারের তো কথাই নাই, এবং অনেক সময়েই তাহা করিতেন; ঢাকায় অবস্থানকালে ঋণ করিতেন তথাপি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা তিনি খুব শ্রদ্ধার সহিত কহিতেন। কাউন্সিল আন্দোলনের সময়ে মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। বলিতেন, আশুবাবু যদি আসরে নামেন তবে কাকেও ভয় করিনা। Nation buildingএর মস্তিষ্ক ও ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। আশুবাবুর মৃত্যুর সময়ে তিনি জুলুতে মহাত্মার কাছে ছিলেন। খুব বিচলিত হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া আমাদের কাছে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

গত বৈশাখ মাসে পাট্‌নায় আমি ও গিরিজাবাবু ('নারায়ণের' গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী) প্রায় ৫।৬ দিন ছিলাম। আমি আমার একজন আত্মীয়ের বাসায় থাকিতাম। সেখানকার 'পূবে হাওয়ায়' আমার শরীরটা একটু অসুস্থ বোধ করায় একদিন আমি যাইতে পারি নাই। শুনিয়াছি তিনি আমার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "ওর নিশ্চয়ই থাক্‌বার কোন অসুবিধা হ'য়েছে। আমাকে ও কোনকথা বলেনা।"

একদিন বাসন্তী দেবী বলিলেন "হেমেন্দ্রবাবুদের সভায় বড় গোল হয়, সকলই বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক।"

তিনি হাসিয়া বলেন, "ওদের সকলের মাথায়ই একটু ছিট্ আছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? সব্ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এসেছে, একটা নিয়ে ত থাক্‌তে হবে।"

চিতাপার্শ্বে মহাত্মা গান্ধী

প্রজ্জ্বলিত চিতা
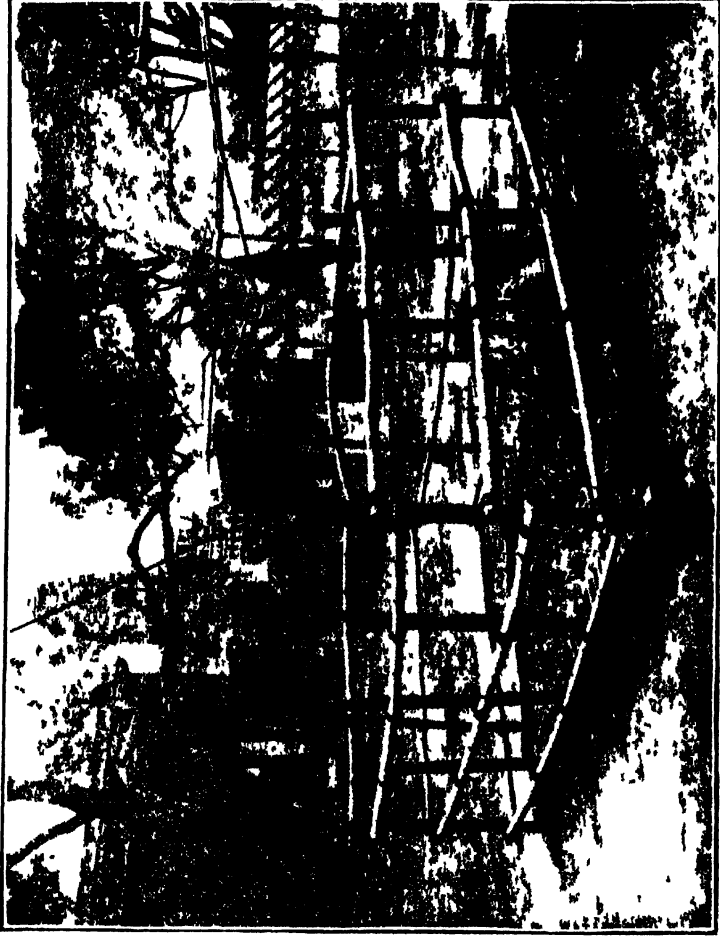
অবশেষে

বাসন্তী দেবী—তাবলে কি আমার কাছেও আইনের তর্ক,—আমি মেয়ে মানুষ, আমি আইনের কি বুঝি বলত ?

তিনি—তা, তুমি যখন সভানেত্রী হয়েছিলে, তোমাকে এইটুকুও সহ্য কর্‌তে হবে না ? (তিনি চট্টগ্রামের প্রাদেশিক সম্মিলনীর কথা বলিতেছিলেন, আমরা তখন জেলে ছিলাম)।

আমরা সকলে হাসিলাম।

দার্জ্জিলিংএ আমি ১৩ই জুন শনিবার পৌঁছি, রাত্রি প্রায় ৮টার সময়ে তিনি বেড়াইয়া আসিলেন, দেখিলাম বৃষ্টিতে উপরের কোট্‌টা ভিজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি কোট্‌টা খুলিয়া দিলাম। বসিয়াই এমনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, প্রাণ যেন দ্রব হইল। খাওয়ার পরে সকলে উপরে চলিয়া গেলে, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সে সমস্ত কথা বলার সময় এখনও হয় নাই।

দার্জ্জিলিংএ শনিবার রাত্রিতেই আমার দুই একটী বিষয়ে ভুল দেখাইয়া মৃদু তিরস্কার করেন। আজ আমি খুব খুসী যে, মরিবার সময়েও আমার সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণে বিন্দুমাত্র মলিনতা ছিল না। কোন সংবাদপত্র উপলক্ষে কথা হইতেছিল—একটী বিষয়ে আমি অপরাধ স্বীকার করিয়া লওয়াতেই তিনি খুব খুসী হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি নাকি ফরওয়ার্ডে ভাদুড়ীর থিয়েটারের বিরুদ্ধে খুব লিখিতে ?" আমার মনে হইল নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি সমস্ত সত্য প্রকাশ না করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। আমি উত্তর করিলাম "শিশির বাবুর অভিনয়-কুশলতার আমি প্রশংসা করিতাম, আমার Historyতেও করিয়াছি, কিন্তু হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাকে রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা সাজাইয়া অভিনয় করিবার আমি ভয়ানক বিরোধী ছিলাম। কেবল Forwardএ নয়, এই সম্বন্ধে আমি অনেক কাগজেই লিখিয়াছিলাম।" আমি এই উত্তর খুব দৃঢ়তার সহিত দিয়াছিলাম এবং তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন্। থিয়েটার সম্বন্ধে আরও কথাবার্ত্তা হয় এবং কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন," বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গড়িতে হইবে। রঙ্গমঞ্চ একটা শিক্ষার স্থল, কেবল সাময়িক আমোদে পরিণত না হইয়া উহা জাতীয়তা প্রচারে সহায়তা করিবে।"

দার্জ্জিলিঙ-এ আমার সঙ্কলিত History and development of the Bengali Stage এর গবেষণা ও ঘটনা সন্নিবেশে এমন আনন্দিত হইয়াছিলেন যে বলেন, "তোমার ইংরাজী আমি সংশোধন করিয়া দিব, সভ্য দেশে এই বইর খুব আদর হইবে। এখন আমার কোন কাজ নাই, অনেক সময় আছে, তুমি সমস্ত manuscriptগুলি আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে।" আমার গিরিশ জীবনী তিনি জেলখানায়ই শুনিয়া বলিয়াছিলেন "আমি বাহির হইয়া এই বই ছাপাইয়া দিব।" কিন্তু আমি তাঁহার অর্থের অবস্থা জানিতাম, ইহার পরে আর কোন কথা বলি নাই।

রবিবার দিন আমি সর্ব্বদা কাছে ছিলাম। সকালে বাসন্তী দেবীকে বলিয়া গেলেন, "হেমেন্দ্র

যেন অগ্রে খায় না, আমার সঙ্গে বসিয়া খাইবে।" ভোজনান্তে বিশ্রাম করিবার পরে আমার সঙ্গে বসিয়া ২।৩ ঘণ্টায় সমস্ত কাজ সারেন। সেদিন জ্বরের তারিখ ছিল বলিয়া দিবাভাগে শয়ন করেন নাই। করপোরেসনের পাঁরের ব্যাপারে তিনি বড় অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। সেই সম্বন্ধে তাঁহার মতামত দরকার বলিয়া ডেপুটী মেয়র ও শরৎ বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও উপদেশাদি দেন। ২।১ খানি চিঠি নিজে লেখেন, স্বহস্তে দুইখানি টেলিগ্রাফ্ করিয়াছিলেন, এবং কালীঘাটের একটী ভদ্র মহিলার একখানি নিবেদন পত্র সমর্থন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে উপরে গিয়া ২।১ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। ৫টার সময়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে রওনা হয়েন। ঘণ্টা দুই রিক্সতে করিয়া বেড়ান। দার্জ্জিলিঙ্গের রাস্তায় সাদা কালো সকলেই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করেন। রাজা মন্মথ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "Now better" ?

তিনি উত্তর করেন " Yes, better."

বাসায় ফিরিয়া আমাকে বার বার হাত দেখান্। বৈকালে ভালই ছিলেন। বারাণ্ডায় বসিয়া আমাদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা, আয়ুর্ব্বেদের কথা, পুরুলিয়ার বাড়ীর কথা ও অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন। ভাস্কর বাবু ও আমি ছিলাম আর ছিলেন, মা, কল্যাণী ও সতী (উর্ম্মিলাদেবীর মেয়ে)। কিছুক্ষণ পরে নাটোরের ছোট তরফের কুমার দেখা করিতে আসেন, আমি কাছে ছিলাম। তিনি যাহাতে মহাত্মা নাটোরও যায়েন্ সেই বিষয়ে বলিতে আসিয়াছিলেন।

রাত্রিতে খাওয়ার পরে রাজনীতি, সমাজনীতির কথা উঠে, আমরা কয়জনই ছিলাম। তিনি বলেন "তুমি 'আত্মশক্তিতে' প্রবাসীর উত্তর দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলে, তাহা খুব ভাল হইয়াছিল, তুমি বাঙ্গলায় সর্ব্বদা লিখিবে"। তিনি আমাকে খবরের কাগজ হইতে অনেক কথা দেখিতে' বলিয়াছিলেন। জীবনে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া কার্য্য করিতে যেন পারি, স্বর্গ হইতে তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ইহার পরে সাহিত্যের কথা উঠে। তিনি তাঁহার "কাব্যের কথা" আনাইয়া অনেক কথা পড়িতে লাগিলেন, আর্টের প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন। আমরা সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সাহিত্য ও কাব্য তাঁহার অতি আদরের জিনিষ ছিল। তিনি কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব শক্তি অসাধারণ ও সৃষ্টি অপূর্ব্ব। তিনি "নূতন বাঙ্গলা" স্বহস্তে গড়িয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র "সিরাজদ্দৌলা" ও "মিরকাশিমে" বাঙ্গালার নেতার আভাস দিয়াছিলেন আর তিনি তাঁহার স্বহস্তগঠিত ও স্বহস্ত চালিত বাঙ্গলার সাহিত্য ও কাব্যের ধারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দেশের নায়ক হইলেও, সাহিত্যে চিত্তরঞ্জনের সমধিক অনুরাগ ছিল। চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক বন্ধুগণের অবগতির জন্য বলিতেছি তাঁহার শেষ সংলাপন—সাহিত্য সম্বন্ধে। মা আসিয়া

বলিলেন "রাত্রি ১২টা হয়েছে, শু'তে চলো"। তিনি বলিয়া উঠিলেন "তাতে কি হয়েছে, খুব ভাল ছিলুম, জ্বরের বাসা ভাঙ্‌লো"। উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার মনের জ্বর গিয়াছিল বটে, কিন্তু দেহজ্বর আবার দেহ আক্রমণ করিল, ভয়ানক শীত ও কম্পে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। বাসন্তীদেবীর কাছে পরে শুনিয়াছি, তিনি জ্বরের সময়ে বলেন "হেমেন্দ্রকে আমার কাছে ডাকো"। আমি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শুইতে গিয়াছি বলিয়াই মা আমাকে ডাকেন নাই। ভোর হইতে না হইতেই সতী আসিয়া তাঁহার জ্বরের সংবাদ বলিলে দেবেন বাবু ও আমি উপরে যাই। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "হেমেন্দ্র, বলেছিলে না আর জ্বর হবে না"—সেই কথায় আমার প্রাণ ফাটিয়া গেল। ২।৩ ঘণ্টা মাত্র সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম। হায়, কেন তাহা স্থায়ী হইল না। তিনি একবার বলিলেন, তোমার ত যাইতে হইবে, তোমার রান্না তৈয়ার আছে ত? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। মা যে পূর্ব্ব রাত্রিতেই ঠাকুরকে ৭টার মধ্যে রান্না তৈয়ার করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। আটটার পরে আমি প্রণাম করিয়া বিদায় নিলাম। আমি অল্পবুদ্ধি, বুঝি নাই, ইহাই শেষ বিদায়! মাও তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। বেলা ২টার সময় ঘুম হইতে উঠিয়াই ভুলুকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হেমবাবু চলা গিয়া"——

হ্যাঁ সাহেব, বাবু ত আট্ বাজেই চলা গিয়া।

তিনি—আভি কেত্‌না হুয়া?

ভুলু—দু হুয়া।

আমি যখন আসি তখন ১০৩ ডিগ্রি জ্বর ছিল, বৈকালে ১০১ ডিগ্রি হয়। রাত্রিতে আবার ১০৪ ডিগ্রি জ্বর হয়, মঙ্গলবার প্রাতে ৯৯ ডিগ্রি হয় এবং ক্রমে নাড়ী ডুবিতে থাকে ও তাপও সাব্‌নরমেল হয়। মঙ্গলবার বৈকালে ডেপুটী মেয়রের সহিত শরৎ বাবু ও আমি কথা বলিতে-ছিলাম, অল্পক্ষণ মধ্যেই শরৎ বাবু টেলিফোন ধরিয়া আসিয়া খবর দিলেন, "Karta is no more." একেবারে বজ্রাহত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিনি খুব ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ১৫ বৎসর যাবৎ দেখিয়াছি ভগবানে খুব আত্মনির্ভর করিতেন। জেলে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার কর্ম্মীদের সহায় নারায়ণ, তিনিই তাহাদের পথ দেখাইয়া দিবেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন শেষ জীবনে অমৃতের সন্ধান পাইবেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গুরুকরণ হয়। ইহা আমি অপরের কাছে শুনিয়াছি। হেমায়েত্‌পুরের আশ্রমে যাইতে ভাল বাসিতেন। দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বেও সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানকার ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাতও আমি। আশ্রমস্থ একটী যুবক একদিন (সিরাজগঞ্জ কনফারেনসের পূর্ব্বে) আমাকে মানিকতলায় ঠাকুরের কাছে লইয়া যায়। ঠাকুর আমার কোলে মাথা রাখিয়া নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন　একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে সময় করিয়া কৃষ্ণবাবু ও আর ২।১টী

ভক্তের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিই। ইহার পরে শুনিয়াছিলাম তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কোন কথাবার্ত্তা বলি নাই, পরের কথা কিছু জানিতামও না। জ্বরের সময় (সোমবার ১৫ই) একবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমাকে পাব্‌না নিয়ে যেতে পার্‌বে ?" আমি বুঝি নাই, ঠিক তাঁহার কথা কি ভোম্বলের কথা বলিতেছিলেন।

আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি। তিনি যে নাই, কিছুতে মনে করিতে পারিতেছি না। জীবনে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অমরত্বেও সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে বঞ্চিত হইব না, ইহা আমার খুব ভরসা আছে।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দেশবন্ধু

তড়িতের মত তীব্র ও দ্রুত আঘাতে বাঙ্গলার প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলের অন্তর বিদীর্ণ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বর্গারোহণ বার্ত্তা আজ অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়াছে।

দেশবন্ধু গিয়াছেন তাহাতে আমাদের ক্ষোভ নাই। মরিতে সবারই হইবে, কিন্তু এমন মরণ লোভের বিষয়—ক্ষোভের নয়। বেশীদিন চিত্তরঞ্জন লোকনয়নের গোচরে আসেন নাই, কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত অবসরে তিনি যে বিরাট দিগ্বিজয়ের গৌরবলাভ করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আর সে সৌভাগ্য গৌরব অমলিন রাখিয়া তিনি বিশ্বদেবতার স্নিগ্ধ আহ্বানে প্রশান্তচিত্তে লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন—সমস্ত দেশবাসী তাঁর অভাবে সন্তপ্ত, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির অশ্রু তাঁর স্বর্গ-যাত্রার পথ মুক্তামালায় ভূষিত করিয়াছে—এ মরণ সুকৃতির ফল, অমর-বাঞ্ছিত।

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার বা ভারতের কি ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া দেশ কি ক্ষতি বোধ করিবে সে কথার বিচারের সময় এখন নহে।—জীবিত ব্যক্তির বিষয়েই সমসাময়িক ব্যক্তির মতামত গ্রহণ যোগ্য হয় না। সন্ত বিরহের তাপক্লিষ্ট চিত্তের বিচার এ বিষয়ে আরও বেশী ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কেহ বা তাঁহাকে অভ্রান্ত দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে, কেহ বা দেশের পরম উপকারী মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, আর কেহ বা অম্লানবদনে তাঁহাকে দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া তাঁহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়াছে। এসব মতামতের সত্যতা কেবল কালের নিকষমণিতে যাচাই হইতে পারে, সে কথার বিচারের সময় এখন নহে।

চিত্তরঞ্জন যাহা করিয়াছেন তাহাতে দেশের মঙ্গল হইয়াছে, কি অমঙ্গল হইয়াছে ইহার ফল বিষময় কি মধুময় ইহা লইয়া মতদ্বৈধ যতই থাকুক এ সম্বন্ধে আজ মতভেদের অবসর নাই যে চিত্তরঞ্জন আত্মোপান্ত নিঃশেষরূপে দেশের কল্যাণকামী ছিলেন। আর সে কল্যাণ কামনা তাঁহার অন্তরে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আপনার চিত্তেই বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা প্রকাশ হইয়াছে একটা বিশাল

ত্যাগ ও কঠোর নিষ্ঠায়—একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রকাশে—একটা সকল-সত্তা-পরিব্যাপ্ত বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টায়। এত বড় অন্তর দিয়া দেশকে কয় জন ভাল বাসিয়াছে? এমন নিঃশেষ ভাবে সে ভালবাসার কাছে কে আত্মবিক্রয় করিয়াছে? নিজের কর্ম্ম-জীবনের ভিতর সে দেশপ্রীতিকে এমন পরিপূর্ণ ও নিঃশেষরূপে কে কবে বিকশিত করিয়াছে?

চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রেমিক, কবি। তাঁর স্নেহপ্রবণ অন্তর আপনার ভালবাসার তৃষ্ণার প্রেরণায় স্বপ্ন দেখিয়াছে, সে ভালবাসার তৃপ্তি খুঁজিয়াছে আজীবন। তাই প্রেম ও রূপের নেশা তাঁর যৌবন ভরিয়া দিয়াছিল—"মালঞ্চ" ও "সাগর সঙ্গীত", "কিশোর-কিশোরী" তার এই রূপ তৃষ্ণার মদিরায় বিভোর। এই সব কাব্যে তাঁর অন্তরের রূপ পিপাসার ক্রমিক পরিণতি দেখিতে পাই, আর দেখিতে পাই এক আকুল অন্তর যাহা শ্রীরাধার মত বাঁশীর শব্দে আকুল হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, মোহের বশে তমাল তরুকে প্রিয়তম বোধে আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁর অন্তরে পূর্ব্বরাগের যে বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছিল, যে মদিরায় তাঁর অপ্রবুদ্ধ যৌবন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল ইহাতে তাহার পরিনিষ্ঠা লাভ কেমন করিয়া হইবে? তাই ইহারই ভিতর দিয়া ক্রমে ব্রাহ্ম চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম্মে অধিকার লাভ করিলেন ও দেশের সেবায় সর্ব্বস্ব দান করিয়া প্রেমের সে প্রচণ্ড তৃষ্ণার একমাত্র পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিলাভ করিলেন।

চিত্তরঞ্জন দেশের যে কাজ করিয়াছেন তাহা ছোট কি বড়, এবং কত বড় তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু দেশের সেবায় তিনি যে বস্তুটি দিয়া গিয়াছেন তাহা যে খুব বড় জিনিষ, দরিদ্র বঙ্গভূমির একটা শাশ্বত সম্পদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি দিয়াছেন তাঁর সমগ্র অন্তর, তাঁর দুই কূলপ্লাবী প্রেম। তাঁর দানের ভিতর কোনও দিন কোনও হিসাব কিতাব ছিল না; দেশের সেবায় আপনাকে দিতে গিয়াও তিনি কোনও হিসাব কিতাব করেন নাই। একটা প্রবল বন্যার মত প্রচণ্ড আবেগে তাঁর বিরাট সত্তা দেশকে ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে। হইতে পারে যে বাণ চলিয়া গেলে তার পিছনে পড়িয়া থাকে ঊষর শুষ্ক মাঠ, কি যে নদী দুই কুল বাঁচাইয়া আপনার জলের সঞ্চয় হিসাব করিয়া বিলাইয়া যায় সে দিয়া যায় উর্ব্বর শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র। চিত্তরঞ্জন যদি দুই কূল বাঁচাইয়া হিসাব করিয়া আপনাকে বিলাইতেন তবে দেশ হয় তো ইহা অপেক্ষা অধিক উপকার পাইত, ইহার চেয়ে বেশী স্থায়ী কিছু লাভ করিত। কিন্তু বন্যার যে বিশালতা—তার যে প্রচণ্ড গৌরব—তাহা তো কুলকুলনাদিনী তটিনীতে সম্ভবে না।

চিত্তরঞ্জনের অন্তরের প্রধান সমৃদ্ধি ছিল একটা তীব্র উজ্জ্বল কল্পনার শক্তি; আর একটা উগ্র অবাধ আবেগে স্বপ্নের কাজল পরিয়া তিনি বাঙ্গলার অতীতের রূপ দেখিয়াছিলেন, স্বপ্নের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তাই বর্ত্তমানে ছিল তাঁর ঘোর অতৃপ্তি। তাই তাঁর অন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা সেই স্বপ্নকে সত্য করিবার।

তিনি যখন যে বস্তুটির প্রতি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন তখনই তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য

সর্ব্বত্যাগী হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন—আর সফলতা অর্জ্জন না করিয়া কখনও বিরত হন নাই। দেশের যে গৌরব দেশবাসীর জন্মগত অধিকার বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন তাহা লাভ করিবার পক্ষেও তিনি ঠিক তেমনি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, অদম্য উৎসাহ ও অপরিশ্রান্ত চেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সফলতালাভ করিয়াছিলেন কি না সে কথা তাঁর চরিত্রগৌরবের বিচারে একান্ত অবান্তর।

তার চরিত্রের ভিতর সব চেয়ে বড় কথা বোধ হয় ছিল তাঁর ইচ্ছার এই জোর। ভগবানের কাছেও তিনি ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সাধনার পথ ছিল প্রেমের পথ, সর্ব্বস্ব দানের পথ, কিন্তু সে প্রেমের ভিতর একটা প্রবল অধিকার বোধ ছিল, দানের সঙ্গে সঙ্গে দাবী ছিল। যে প্রেমের জোরে রাধিকা সর্ব্বস্ব দান করিতে ও মান করিতে পারিয়াছিলেন সেই জোর ছিল তাঁর। যে জোরে বিশ্বামিত্র বিধাতাকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমনি জোর লইয়া চিত্তরঞ্জন দেশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। নিজের শক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল, তাঁর দেশের শক্তিতে অসাধারণ বিশ্বাস ছিল তাঁর। সেই শক্তির বলে সব লাভ করা যাইতে পারে—এই প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসই তাঁর সমস্ত কর্ম্মজীবনকে বোধগম্য করিতে পারে।

তিনি অত্যন্ত নম্রস্বভাব ছিলেন। শিষ্টতায় বা স্নিগ্ধ ব্যবহারে তাঁর চেয়ে কেহ বড় ছিল না। কিন্তু সেই নম্রতার ভিতর সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল একটা শক্তিবোধ, একটা অনমনীয় দৃঢ়তা ও অপূর্ব্ব তেজস্বিতা। যে বিনয় আপনাকে মুছিয়া ফেলিতে চায়, সবার পায়ের তলায় আপনার স্থান খুঁজিয়া লয়, সে বিনয় তাঁর ছিল না। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার শক্তি অনুভব করিতেন এবং সে শক্তির কোনও সীমা সহজে স্বীকার করিতেন না। এই আত্মপ্রত্যয়ের মার্গে তিনি সাধনায় ও দেশ সেবায় সফলতার সন্ধান করিয়াছিলেন।

তাই তিনি কবি হইয়াও কর্ম্মী ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন কেবল স্বপ্নে পর্য্যবসিত হয় নাই, তাঁর প্রীতি কেবল প্রেমেই বিলুপ্ত হয় নাই। যেমন উগ্র ছিল তাঁর প্রেম, তেমনি উগ্র ছিল তাঁর প্রেমের বুভুক্ষা। তাঁর স্বপ্ন নিঃশ্বাসে বিলুপ্ত হয় নাই, একটা বিপুল বিরাট কর্ম্ম প্রচেষ্টায় তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁর প্রীতির অসহনীয় আবেগ তাঁহাকে পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিল, অশ্রান্ত উৎসাহে, সকল বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে অক্লান্ত চেষ্টায় যুদ্ধ করিয়া তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন অলব্ধ লাভের আয়াসে।

দেশবন্ধু যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন তাহা তিনি পান নাই। স্বপ্ন দেখিবার রোগ যার আছে আশাভঙ্গ তার নিত্য সহচর। চিত্তরঞ্জনের জীবন বাহ্য দৃশ্যে যেমন সফলতামণ্ডিত, অন্তরে তাহা ছিল তেমনি নিদারুণ হতাশায় ভরা। কত আশা তাঁর ছিল, কয়টা তার সফল হইয়াছে? তাঁর জীবনের সমাপ্তি লাভ হইয়াছে সংখ্যাহীন ভগ্ন আশার সমাধি-স্তূপের উপর। তাঁর অন্তরের এই নৈরাশ্যের দিক লোকনয়নের গোচর ছিল না, ইহা ছিল তাঁর অন্তরের গোপন সম্পত্তি—

স্বপ্নদর্শনের অপরিহার্য্য পুরস্কার। লোকে তাঁর জীবনের যে সফলতায় চমৎকৃত হইয়াছে, তিনি তাহা সফলতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কেন না, তাঁর আশার দৃষ্টি ছিল তাহা হইতে বহুদূরে। তাই সে সফলতায় এক দিনের তরেও তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাই ব্যবসায়ে অনেক ব্যথার পর যখন বিপুল সম্পদ, যশ ও প্রতিষ্ঠা তাঁর করতলগত হইল তখন তিনি তাহা তীব্র উপেক্ষার সহিত দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। যে অর্থের অভাবে তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ কাল নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় কাটাইতে হইয়াছে, সেই অর্থ তিনি দারুণ অবজ্ঞার সহিত ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ব্যবহারবিদ্যার সফলতায় অতৃপ্ত হইয়া সাহিত্যসেবায় অন্তরের তৃপ্তির সন্ধান করিয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে বার্ত্তা দেশবাসীকে শুনাইতে যত্ন করিয়াছিলেন, সে কথা দেশবাসী গ্রহণ করিতে পারে নাই। তার ভিতর যে সত্য একেবারে ছিল না তাহা নহে। রাজা রামমোহনের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে বাঙ্গালার যে একটা প্রাণের সুর ছিল তাহা পরবর্ত্তী যুগে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে —সেই সুরের সঙ্গে যোগ রাখিয়া আবার বাঙ্গলার নূতন জীবন্ত সাহিত্য গড়িতে হইবে;—এ কথা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। তিনি সেই অতীতের বাঙ্গলার প্রাণের উপর যতখানি জোর দিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদকে যতখানি তুচ্ছ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য সহজ বুদ্ধির বিচারে অগ্রাহ্য। কিন্তু এই কথার ভিতর তাঁর প্রাণের সুর লুকান ছিল—সে সুরের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল তাঁর পরবর্ত্তী চেষ্টায়। রস-সাহিত্যের ভিতর তিনি যে স্বপ্ন লইয়া বৃথা খেলা করিয়াছিলেন তাহা যখন তার প্রকৃত সার্থকতার ক্ষেত্রে, দেশসেবার মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাঁর ভিতরকার সমস্ত প্রাণ অশেষ শক্তি লইয়া সাড়া দিয়া উঠিল, সমস্ত জগৎ হঠাৎ চমকিত হইয়া দেখিতে পাইল তাঁর ভিতর একটা এত বড় শক্তি লুকায়িত আছে যাহা কখনও কেহ পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারে নাই। যে উগ্র দেশপ্রীতি তাঁহার অন্তরকে সাহিত্যে বিদেশী সকল বস্তুর উপর বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, পলিটিক্সের ভিতর তাহাই তাঁর শক্তির প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে আশাভঙ্গের বেদনা পাইয়াছিলেন নূতন ক্ষেত্রে সে ব্যথার প্রতিকার লাভের প্রয়াসী হইলেন।

পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তিনি যখন যে বস্তুটির উপর বিশেষ করিয়া ঝোঁক দিয়াছেন, তখনই সেটি সম্পন্ন না করিয়া ছাড়েন নাই। তাই বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁর কর্ম্মজীবন অপূর্ব্ব সফলতা মণ্ডিত বলিয়া সবার মনে হইয়াছে। যখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর মত শিরোধার্য্য করিয়া যুবরাজের অভিনন্দন চেষ্টা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁর সে চেষ্টা তাঁর প্রত্যাশার অতীত সফলতা দিয়াছিল,, তারপর যখন কাউন্সিল বর্জ্জন নীতি পরিহারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনুচরগণ ও পরে স্বয়ং গান্ধিজির সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত হইলেন, তখনও তিনি অপূর্ব্ব সফলতা লাভ করিলেন। তারপর কাউন্সিল প্রবেশ করিয়া দ্বৈতশাসনের সমাধি সাধন করিবার চেষ্টায় সকল

বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই যাঁহারা তাঁর জীবনকে আদ্যোপান্ত সাফল্য মণ্ডিত বিবেচনা করিয়া তাঁর অন্তরের হতাশার কথা অবিশ্বাস করিতে চান তারা চিত্তরঞ্জনকে চিনিতে পারে নাই। এই সবই কি তিনি চাহিয়াছিলেন? তাঁর বিরাট আত্মা ও হিমাচলচুম্বী আশা যে এ সব ক্ষুদ্র সংকল্পের কত উপর ডিঙ্গাইয়া ছিল, তাহা যে অনুভব করিতে পারে না, সে অন্ধ। যে বৃহৎ সফলতার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এ সব ব্যাপার তো তার তুচ্ছ আয়োজন মাত্র—ইহা তো তাঁর কর্ম্ম চেষ্টার শেষ নয়। তাঁর বৃহৎ আদর্শ ভাগ্যের ভাণ্ডার হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টার এ কেবল একটা পাঁয়তাড়া মাত্র! সে আদর্শ তাঁর পড়িয়া রহিল—দেশবাসী তাহা বুঝিল কি না, তাও বুঝি তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বরং একদিকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন, অশক্তির দীনতায় ভরা দেশবাসী, অপর দিকে শক্তির মদিরা-অন্ধ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট—উভয়েই তাঁর সে বিরাট স্বপ্ন আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইয়া তাঁর শেষ জীবন হতাশার বিষে তিক্ত করিয়া দিয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

পলিটিক্সে কোনও দিনই আমি দেশবন্ধুর মত ষোল আনা মানিয়া লইতে পারি নাই। যে কয়টি বিশিষ্ট বিষয়ে তিনি তাঁর বিপুল শক্তি নিয়োগ করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁর কোনওটিকেই আমি তাঁর চক্ষে দেখিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁর অন্তরের ভিতর যে বিরাট স্পষ্ট স্বপ্ন ক্রমে আকার লাভ করিয়াছিল, তার আংশিক আভাস মাত্র তিনি তাঁর ফরিদপুরের বক্তৃতায় দিয়াছিলেন—সেই স্বপ্নই আমাকে চিরদিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার অল্পই হইয়াছিল, কিন্তু যে কয়দিন তাঁর সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের অবসর পাইয়াছিলাম, তাহারই ভিতর আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম একদিকে তাঁর ভিতরকার একটা বিরাট বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর একদিকে তাঁর সকল কর্ম্মের অন্তর্নিহিত আর সকল কর্ম্মের অতীত এই মহান্ স্বপ্ন!

সে স্বপ্ন এক মহাভারতের! মহামানবের সমাজে সে ভারত এক সমৃদ্ধ অতিথি, বিশ্বের কাছে সে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইয়া নাই তার অশেষ সমৃদ্ধি মুক্ত হস্তে সে বিতরণ করিতেছে। অতীতের ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে পদরক্ষা করিয়া সে ভবিষ্যতের গৌরবমাল্য দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতেছে। সে ভারত অভিজাতের নয়, ধনীর নয়, সমৃদ্ধের নয়—সকলের।—সে খানে শক্তির অত্যাচার নাই অশক্তির দীনতা নাই, আছে এক সর্ব্বব্যাপী অধ্যাত্ম শক্তির অপূর্ব্ববিকাশ—অপূর্ব্ব লাবণ্য; আছে সমাজের এক অপরূপ শৃঙ্খলা যাহাতে দীনতম, হীনতম যে তারও অনিবার্য্য অধিকার আছে মানবত্বের চরম গৌরবে।

এ স্বপ্ন আয়ত্ত করিবার জন্য ভারতকে নূতন ভাবে জাগিতে হইবে—পুরাতন সুরে গাহিতে হইবে। নূতন করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভারতের পুরাতন সম্পদ, অধ্যাত্ম গৌরব উপলব্ধি করিতে হইবে, অশক্তির মোহ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকের অন্তরের ভিতর উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে একটা প্রচণ্ড শক্তি বোধ। সমাজকে ভাঙ্গিয়া এমনভাবে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে

একজাতি আর এক জাতির উপর, এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে না—সকলে সমানভাবে ব্যস্ত ও সমস্তভাবে স্বারাজ্য লাভ করিবে।

গয়ার বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন নূতন করিয়া সমাজের গাঁথুনী বাঁধিবার যে খসড়া প্রণালীর পরিচয় দিয়াছিলেন তার ভিতর এই স্বপ্ন অনুস্যূত ছিল। ফরিদপুরে বিশ্ব মানবের সমাজে ভারতের যে স্থানের আভাস দিয়াছিলেন তাহার ভিতরও ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, দেশবন্ধুর এ স্বপ্ন আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে কি? যদি করিয়া থাকে তবে তাদের অন্তরে তাঁর অক্ষয় স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যদি তাঁর দেশবাসী তাঁর সে স্বপ্নের সন্ধান না পাইয়া থাকে তবে তৈলচিত্র বা মর্ম্মরে তাঁর নশ্বর দেহের প্রতিকৃতি আঁকিয়া বা কোনও বৃহৎ হিতানুষ্ঠানে তাঁর নামের স্মৃতি জগাইয়া তাঁর সে বিরাট আত্মার স্মৃতিরক্ষা হইবে না।

একমাত্র এই সাধনায় তাঁর আত্মার পরলোকে তৃপ্তি সাধন হইবে, এই সাধনায় তাঁর অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রতিধ্বনি

(১)

" ইয়ং ইণ্ডিয়া " পত্রে

মহাত্মা গান্ধী লিখিত

চিত্তরঞ্জন দাশ

(২৫শে জুন ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অনুবাদ)

(নবযুগ হইতে উদ্ধৃত)

পুরুষর্ষভ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন—বঙ্গদেশ আজ বিধবার মত। তাঁহার এক সমালোচক কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমায় বলিয়াছিলেন যে, "আমি তাঁর খুঁৎ ধরি সত্য, কিন্তু আমায় সোজা কথায় স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে তাঁর জায়গায় দাঁড়াবার লোক আর কেউ আমাদের দেশে নেই" এই কথাগুলি খুলনায় সভায়—যেখানে আমি প্রথম এই নিদারুণ বার্ত্তা শুনি—বলিলে আচার্য্য রায় চীৎকার করে বলেছিলেন "আমাদের দুর্ভাগ্য যে একথা সম্পূর্ণ সত্য। যদি আমি বলতে পার্ত্তুম যে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আসনে কে বসতে পার্ব্বেন, তাহলে আমি বলতে পার্ত্তুম যে, নেতা হিসাবে দেশবন্ধুর স্থানে কে দাঁড়াতে পার্ব্বেন। বাঙ্গলার দেশবন্ধুর আসনের কাছেও যেতে পারে এমন মানুষ কেউ নেই"—তিনি শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর ছিলেন, দোষ ত্রুটী মার্জ্জনা করিতে সততই উদারহৃদয় ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করিলেও তিনি নিজেকে কখন 'ধনী' ভাবিতেন না—এমন কি শেষে প্রাসাদতুল্য বাসভবন, তাও দান করেছিলেন।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাব তদন্ত সমিতিতে প্রথম এই মানুষটীর সঙ্গে আমার সত্য পরিচয় ঘটে। আমি সমিতিতে ত্রস্ত অন্তঃকরণে সন্দেহসঙ্কুচিতচিত্তে যোগ দিয়েছিলাম। কারণ, তকাৎ থেকে তাঁর ব্যারিষ্টারীর যশ ও

প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের খ্যাতি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল; তিনি মোটারকারে পত্নী ও পরিবারবর্গ সহ এসেছিলেন এবং রাজার হালেই থাক্‌তেন, প্রথমটা এসব দেখে আমি অবশ্য খুব খুসী হইনি। হণ্টার তদন্তের মূল সাক্ষ্যগুলির সম্বন্ধে বিচার করাই আমাদের মিলনের উদ্দেশ্য ছিল। আমি দেখেছিলাম যে, আইনের মার প্যাঁচ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল কর্ত্তে, এবং সামরিক আইনসম্মত শাসন-প্রণালীর দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, আমি মনে মনে চিন্তা কর্ত্তে লাগলুম; কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইবার পর আমার সকল সন্দেহের অবসান হইল এবং আমার আশঙ্কাও দূর হইল। তিনি যেন যুক্তির অবতার ছিলেন এবং আমার যা বলবার ছিল তা খুব আগ্রহের সঙ্গেই শুন্‌লেন। ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়া—সেই আমার প্রথম। দূর থেকে কেবল নামেই আমাদের চেনা পরিচয় ছিল। কংগ্রেসের ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বে আমি বড় একটা সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়েছিলুম বলেই আমার একটু আধটু যা নাম ছিল। কিন্তু আমার সহযোগিগণ সকলেই আমার সঙ্গে খুব অসঙ্কোচভাবে মেশামেশি করেছিলেন এবং সব চেয়ে বেশী মিশেছিলেন ভারতের এই বরেণ্য সন্তানটী। আমিই তদন্তসমিতির সভাপতি ছিলাম এবং আমাদের মতেরও প্রায় ঐক্য হয়ে আস্‌ছিল, তথাপি তাঁর প্রতি যে আমার সামান্য একটু সন্দেহ জেগেছিল সেটুকু দূর কর্ব্বার জন্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন "যদিও কোথাও আপনার সঙ্গে আমার মত না মেলে সেখানে আমার যা বলবার আছে তা আমি বলব, তবে এটা স্থির জানবেন যে, বিচারে যা সিদ্ধান্ত হবে তা আমি মাথা পেতে নেব।" তাঁর কথা শুনে, এমন যোগ্য সহযোগী পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি ভেবে, বুক যেন গৌরবে ভরে গেল; তেমনি আবার নিজের মনের ক্ষুদ্রতার কথা মনে পড়াতে একটু যেন নিজেকে 'ছোট' ভাবতে লাগলুম—কারণ আমি তো মনে মনে জানতুম যে, ভারতীয় রাজ-নীতিতে তখন আমি একজন শিক্ষানবীশ বল্লেই চলে সুতরাং সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হবার আশা করাই আমার পক্ষে দুরাশা। কিন্তু দস্তুর মত কাজের কাছে ছোট বড় বিচার নেই। কারণ রাজাও যখন তাঁর কোন চাকরের উপর কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচার ভার দেন তখন তার বিচারই তিনি মেনে নেন, আমার অবস্থাও ছিল অনেকটা এই রাজবাড়ীর ভৃত্যের মত, এবং একথা লিখতে গর্ব্বে আজ আমার হৃদয় ভরে উঠ্‌ছে যে, আমার সহযোগীর মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়ে বেশী প্রাণ খুলে আমাকে কেউই মেনে নিতে পারেন নি।

তারপর অমৃতসরের কংগ্রেস,—সেখানে আর আমি আদব কায়দার দাবী কর্ত্তে পারিনি, কারণ সেখানে আমরা ছিলাম প্রতিপক্ষ। জাতির মঙ্গলার্থ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে লড়তে গিছলুম। এখানে সহজে কেহই নীচু হতে পারেন না, তবে দলের খাতির বা যুক্তিতর্কের কথা ছিল স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রথম যুদ্ধ কর্ত্তে আমার ভারী আনন্দ হয়েছিল। মালবীজি—একবার একজনের সঙ্গে তর্ক করচেন, একবার একে অনুরোধ কর্চ্চেন, এমনি করে সমতা রক্ষা কচ্ছিলেন। সভাপতি মতিলালজি ভেবেছিলেন যে, সব বুঝি শেষ ফেঁসে গেল। লোকমান্য আর দেশবন্ধুকে নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের দুই দলের অনেকটা মিল ছিল এবং বাকিটুকুর জন্য অপর দলকে স্বমতে আনবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কেউ কাউকে ঠিকমত লওয়াতে পাচ্ছিলেন না। সকলেই ভাবছিলেন যে, শেষটা বুঝি দৃশ্যটী বিয়োগান্ত হয়ে দাঁড়াবে। আলী ভায়েদের আমি জানতুম এবং ভালবাসতুম—যদিও এখন তাঁদের যতটা জানি ততটা তখন জানতুম না—তাঁরা তখন আমায় দেশবন্ধুর প্রস্তাব সমর্থন কর্ত্তেই অনুরোধ করেছিলেন। মহম্মদ আলী তাঁর স্বাভাবিক বিনয়-নম্র ভাবে আমায় বলেছিলেন "অনুসন্ধান সমিতিতে যা ক'রেছেন এখন যেন সেটা নষ্ট

কর্ব্বেন না"—আমি কিন্তু তখনও ভাল রকম বুঝতে পাচ্ছিলুম না, এমন সময় জয়রাম দাস নামক এক সিন্ধুবাসী এগিয়ে এসে সবদিক রক্ষা কল্লে'ন ; আমি তাঁকে ভালরকম চিনতুম না। কিন্তু তার মুখে ও চোখে এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল যাতে আমি মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। তিনি এক কর্দ্দ কাগজে আপোষজনক কয়েকটী প্রস্তাব লিখে আমায় দিলেন, আমি সেগুলি পড়ে দেখলুম যে সেগুলি সত্যই উত্তম এবং সেটা দেশবন্ধুকে দিলাম, তিনি পড়ে বল্লেন "হাঁ, এতে আমি রাজী হতে পারি যদি আমার দল এতে স্বীকৃত হন"। দলপতির পক্ষে দলের এই আনুগত্য স্বীকার—দলকে খুসী রাখার চেষ্টা—যে তাঁর কত বেশী ছিল, তা এথেকেই বেশ বোঝা যায়—এবং লোকের উপর যে আশ্চর্য্য প্রভাব তিনি বিস্তার কর্ত্তে পারতেন এইই তার গূঢ় কারণ ছিল। ক্রমশঃ কাগজটী অনেকেই দেখলেন। এসব ব্যাপার শ্যেন-চক্ষু লোকমান্যের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি—বেদী থেকে মালবীজির বক্তৃতাস্রোত ভাগীরথী প্রবাহের মত গম্ভীর নাদে প্রবাহিত হচ্ছিল, আর আমরা মানবকেরা এক টুকরা কাগজ নিয়ে তখন জাতির ভাগ্যনির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলাম। লোকমান্য বল্লেন "আমি ও দেখতে চাই না—দাশ যদি ওটা অনুমোদন করে থাকেন, তবে আমার অনুমোদনও হয়ে গিয়েছে"। মালবীজি তা শুনতে পেয়ে কাগজখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষণা কল্লেন যে, আপোষ হয়েছে—অমনি চারিদিক থেকে এমন আনন্দধ্বনি উঠল, যে কাণ ঝালা পালা হয়ে যায় আর কি। এসব ব্যাপারের সব খুঁটিনাটি বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এর ভিতর দাশের মহত্ব, তাহার দলপতিত্বের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা, কার্য্যে দৃঢ়তা, বিচারে যুক্তি-মানার স্বভাব এবং দলের প্রতি আনুরক্তি প্রভৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তার পরের কথা বলি, জুহু আমেদাবাদ, দিল্লী ও দার্জ্জিলিংয়ের কথা। জুহুতে তিনি ও মতিলালজী আমাকে তাঁহাদের মতে আনবার জন্য এসেছিলেন—তখন তাঁরা যেন দুটী যমজ ভাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু আমাদের দৃষ্টি প্রণালী ছিল বিভিন্ন। তাঁরা আমার সঙ্গে অনৈক্য সহ্য কর্ত্তে পার্ত্তেন না, তা যদি কর্ত্তেন তাহলে আমি তাঁদের পঁচিশ মাইল তফাতে যেতে বল্লে তাঁরা পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতেন।

কিন্তু দেশের মঙ্গল যেখানে জড়িত, সেখানে তাঁরা অতি প্রিয় বন্ধুকেও কোন কারণে ছেড়ে দিতে পার্ত্তেন না। আমাদের একরকম আপোষ হল—আমরা বেশ প্রাণ খুলে খুসী হতে পারুম না কিন্তু তা বলে নিরাশও হয়নি। আমরা পরস্পরকে জয় কর্ব্বার জন্য প্রাণপণ কচ্ছিলাম, তারপর, ফের আমেদাবাদে সাক্ষাৎ। দেশবন্ধু প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন এবং কূট কৌশলীর মত চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন—তিনি আমাকে চমৎকার হারিয়ে দিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে আরও কতবার হয় তো হারতুম এবং আনন্দ পেতুম—কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আজ আর তিনি শরীরী নহেন। গোপীনাথ শাহা সম্পর্কিত প্রস্তাবের জন্য তাঁর ও আমার মধ্যে কোন বিদ্বেষ জাগেনি—উভয়ের প্রত্যেকেই ভাবতুম, অপর জন ভুল বুঝেছেন—যেমন প্রণয়ীর মধ্যে কলহ হলে হয়। একনিষ্ঠ স্বামী বা স্ত্রী তাঁদের প্রণয় কলহের কথা স্মরণ করুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাঁদের একজন কলহকালীন অপরকে যে মনোবেদনা দেন সেটা পুনর্ম্মিলনকে আরও মধুর, আরও দৃঢ় কর্ব্বার জন্যই নয় কিনা? আমাদেরও অবস্থা ছিল ঠিক এই রকম। কাজেই দিল্লীতে আবার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হল, সেখানে তাঁর ভীষণ দংষ্ট্রা ও মধুর কান্তি নিয়ে পণ্ডিত মতিলাল আর বিনয়নম্র দাশ—যদিও বাইরের লোকে তাঁর বাহির দিকটা দেখে তাঁকে অনেক সময় উদ্ধত বলে ভুল কর্ত্তো—রাজীনামার খসড়া প্রস্তুত কল্লেন এবং অনুমোদিত হল। এই চুক্তি বন্ধন এক্ষণে একজনের মৃত্যুতে চিরদিনের জন্য অচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে।

দার্জ্জিলিংয়ের কথা বলবো—একটু পরেই। তিনি প্রায়ই আত্মার শক্তি সম্বন্ধে অনুশীলন কর্ত্তেন এবং

নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যতদিন আমি দার্জ্জিলিংয়ে ছিলাম ততদিন তাঁহার উক্তির অকপট সরলতায় আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহার এই গৌরবজনক মৃত্যুতে কি সমস্ত অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ দূরীভূত হইবে না? আমি একটী সহজ প্রস্তাব করিতেছি, সরকার কি চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন্ করিয়া—এখন তিনি আর তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিবেন না এই মনে করিয়া—যে-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবেন? আমি নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহাদের মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি না। সরকার হয়ত তাঁহাদের দোষের বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন; আমি পরলোকগামী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন স্বরূপেই তাঁহাদের মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। যদি গভর্ণমেণ্ট লোক রঞ্জন করিতে চাহেন তবে বন্দিগণকে মুক্তিদান করিবার এমন উপযুক্ত সুযোগ ও এমন অনুকূল ভাব প্রবাহ আর পাইবেন না। আমি বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। কেবল স্বরাজদলের নহে, সর্ব্বত্র সকল লোকই এইজন্য দুঃখিত। যে অগ্নিতে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নিতেই যেন এই নশ্বর অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভয় ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহার পর যদি সরকার ইচ্ছা করেন, তবে একটী সভা আহ্বান করিয়া ভারতীয়গণের অভাব অভিযোগ যাহাই থাকুক না কেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করুন।

যদি সরকার নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন তবে আমাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। আমাদিগকেও দেখাইতে হইবে যে, আমরা ব্যক্তিবিশেষের পরিচালিত "ক্রীড়াপুত্তলি" নহি। গত যুদ্ধের সময় মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল যেরূপ বলিয়াছিলেন আমরা যেন সেইরূপ বলিতে পারি "কাজ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে" স্বরাজদলকে অবিলম্বে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। পঞ্জাবের হিন্দু মুসলমানও এই আকস্মিক বিনামেঘে বজ্রাঘাতে আত্মকলহ বিস্মৃত হইয়াছে, উভয় দলেরই কি সম্মিলিত হইবার বল ও সুবুদ্ধির আবির্ভাব হইবে? দেশবন্ধু হিন্দু মুসলমান মিলনের অনুরাগী ছিলেন এবং উহাতে বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিতান্ত সঙ্কট সময়েও হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চিতাগ্নি কি আমাদের অনৈক্যকে ভস্মীভূত করিতে পারে না? একটী সাধারণ মিলন ভূমিতে সকল দলের সভার অধিবেশনই বোধ হয় ইহার পূর্ব্ব সূচনা। দেশবন্ধু ইহার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহার বিরোধীদের উল্লেখ করিবার সময় তিনি উগ্র ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। আমার দার্জ্জিলিংয়ে অবস্থানকালে আমি কোনও দিনই তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার কোনও বিরোধীর সম্বন্ধে তীব্র ভাষা বহির্গত হইতে শ্রবণ করি নাই। সমস্তদলকে একতাবদ্ধ হইতে সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমাকে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। আমাদিগকে অর্থাৎ শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকেই দেশবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিয়া স্বরাজ সৌধের শিখরে আরোহণ করা সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ ইহার সোপানে অবিলম্বে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিব যে "দেশবন্ধু মরেন নাই—দেশবন্ধু চিরজীবী হউন।"

"শ্রাবণে"

ধন্য হইয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবনে, কেননা তিনি নিজের মনে উদ্ভাসিত আলোকে কর্ত্তব্য পালনের যে পথ দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি সকল বাধা পায়ে ঠেলিয়া ও সকল ক্লেশ সহিয়া প্রফুল্ল ও নির্ভীকচিত্তে অনুসরণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের অনুসরণই কর্ম্মের সফলতা,—ইচ্ছার অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির উপর সফলতা নির্ভর করে না; কাজেই সফল হইয়াছে,—সার্থক হইয়াছে তাঁহার জীবন। জীবনের চেষ্টা যেখানে, মরণে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া যেখানে উহা অধিকতর জীবন্ত হয়, সেখানে জীবন সার্থক, মৃত্যু সার্থক। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু কিভাবে তাঁহার কর্ম্মের প্রচেষ্টাকে অধিকতর জীবন্ত করিয়াছে, এমাসের বঙ্গবাণী সেই বিবরণে পূর্ণ। যাঁহারা এদেশের শিক্ষিত নেতাদিগকে দেশের লোকসাধারণের প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররূপে স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত, আশা করি তাঁহারা আপনাদের ভুল বুঝিয়াছেন, এবং সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝিয়াছেন যে চিত্তরঞ্জন সারা ভারতবর্ষের লোকের পরম সম্মানিত মুখপাত্র ছিলেন। ব্রিটিশারেরা ইহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই পার্লামেণ্ট মহাসভা তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল ব্যক্তিভাবে চিত্তরঞ্জনকে সম্মানিত করিয়া—অর্থাৎ মৃতের প্রতি সম্মান দেখাইয়া ব্রিটিশারেরা ভারতবাসীকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না; যাহা ছিল চিত্তরঞ্জনের জীবনের লক্ষ্য, সেইদিকে ভারতবাসী দিগকে অগ্রসর হইতে দিলেই এদেশের লোকেরা ব্রিটিশারদের সহানুভূতির পরিচয় পাইবেন। ব্রিটিশারেরা কি করিবেন তাঁহারাই জানেন; কিন্তু আমরা বলিতে পারি, ধন্য হইয়াছে চিত্তরঞ্জনের জীবন, সফল হইয়াছে তাঁহার চেষ্টা ও সার্থক হইয়াছে তাঁহার মৃত্যু।

* * * *

তাহারাই ধন্য তাহাদেরই জীবন সার্থক, যাহারা মৃত্যুর দৃশ্যে জীবনের গৌরব ভোলে না, মানবসমাজের স্থিরত্বে ও উন্নতিতে বিশ্বাস হারায় না,—সংসার বৈরাগ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয় না। ইহাই মানুষের প্রাণে বিধাতৃ-বিহিত খাঁটি প্রকৃতি, যে প্রতিদিন যমের লীলা দেখিয়াও "শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি।" দুঃখ-শোকের বোঝা মাথায় বহিবার নয়,—উহা ভূতের বোঝা; দুঃখের চিহ্ন ও নিদর্শন অলঙ্কাররূপে গলায় পরিবার নয়,—উহা পরিত্যাজ্য। দুঃখকে পায়ে দলিয়া জীবনের প্রফুল্লতা ও আনন্দ বাড়াইয়া কর্ম্মপথে চলাই মনুষ্যত্ব। শোকের পরিচ্ছদ না পরিয়া যাঁহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মৃত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্মে, উৎসাহে ও আনন্দে অগ্রসর, তাঁহারাই মৃতের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন,—যাহা যথার্থ শ্রাদ্ধ তাহা করিতে পারেন। যিনি পৃথিবীর সকল বাধা পায়ে ঠেলিয়া আনন্দে ও উৎসাহে কর্ত্তব্য পালন করিয়া মরিয়াছেন, সেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর যেন তাঁহার "মৃত্যু" কাহারও কর্ত্তব্য পথের বাধা না হয়। ইউরোপীয় ভাষায় প্রচলিত cross-

bearing কথাটির গৌরব নষ্ট হইয়া যদি—cross-crushing কথাটির গৌরব বাড়ে, তবে সমাজের যথার্থ মঙ্গল হয়। পৃথিবী কান্নার ভূমি বা vale of tears নয়, ইহা আনন্দ ও বিকাশের জননাস্পদ।

* * * *

ব্রিটিশারেরা ভারতের মাটিতে অতি গভীর ও দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের স্বার্থের খোঁটা পুঁতিয়াছেন, যাহাতে উহা অচল ও অটল থাকে তাহা তাঁহারা প্রাণপণে করিবেনই করিবেন। তাহা ছাড়া Prestige-নামক অশরীরী পদার্থের,—অর্থাৎ নামের মহিমার দব্‌দবাই বজায় রাখিবার জন্য শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের জিদ্ রাখিবেন, অর্থাৎ ১৯২৯ অব্দের পূর্ব্বে আমাদের জন্য রাষ্ট্রনীতি সংস্কারের নূতন লাড্ডু গড়িবেন না। তবে শ্রীযুক্ত রেডিঙ্গ বাহাদুর বিলাতী বুদ্ধির নূতন মসলায় সুরভি করিয়া দিল্লীর প্রাচীন খোলায় নূতন লাড্ডুর ভিয়ান চড়াইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইবে কে, জানি না। এই অবশ্যম্ভাবী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া চিত্তরঞ্জন নিজের কর্ম্মপদ্ধতি একটু-খানি পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপে এদেশের বিভিন্ন দলের লোকেরা একসঙ্গে মিলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কোন স্থায়ী উন্নতির উপায় ভাবিবেন কি না, তাহা এখন বলা শক্ত। চিত্তরঞ্জনের অভীষ্ট সাধনের সঙ্কল্পে মহাত্মা গান্ধিজি কিছুদিনের জন্য বঙ্গে স্থায়ী হইলেন। শ্রাদ্ধ-বাসরের এই অনুষ্ঠানটির জন্য যে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত মহাত্মা গান্ধিজি, তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। এবারকার আলোচনায় আমরা এ পথের বাধা-বিঘ্নের বিচার করিব না, কেবল দেশের সকল শ্রেণীর লোককে আহ্বান করিয়া বলিব, সকলে যেন কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সরল মনে এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উদ্যোগী হ'ন্।